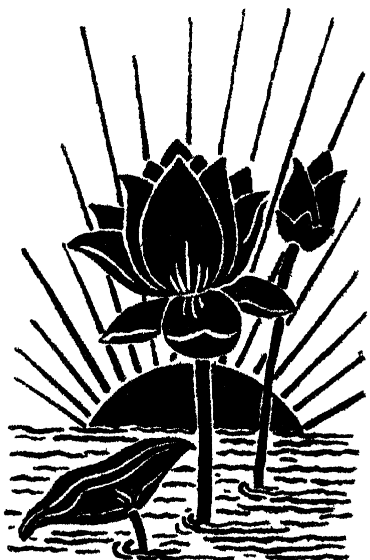

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

উদ্বোধন



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ, ১৩৭৬



৭২তম বর্ষ — ১ম সংখ্যা

[illegible]কার্যালয়, কলকাতা ৩

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭২তম বর্ষ

(১৩৭৬-মাঘ হইতে ১৩৭৭-পৌষ)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য ৭৲ প্রতি সংখ্যা ৭০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭৬ হইতে পৌষ—১৩৭৭)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয় পৃষ্ঠা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।



দিব্যবাণী

ভারত-সাবিত্রী

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে ॥ ৬০
হর্ষস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ৬১
ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৬২
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥ ৬৩

—মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব, ৫ম অঃ

(জীবনের স্রোতে ভাসি জন্মজন্মান্তরক্রমে
জীবগণ আসি এ সংসারে)
পাইয়াছে সহস্র সহস্র জন মাতা পিতা,
শত শত পুত্র ও জায়ারে,
অনুভব করিয়াছে সঙ্গসুখ তাহাদের ;
(এ জন্মেও ভুঞ্জিয়া আবার
জীবনেরে,) গেছে কেহ, কেহ বা যাইবে পরে
জীবননদীর পরপার। ৬০

জীবনের পথে কীর্ণ সহস্র আনন্দ আর
শত শত আতঙ্কেরো স্থান
স্পর্শে যার প্রতিদিনই হর্ষশোকান্বিত হয়
চিত্ত তার, যে জন অজ্ঞান ;
জ্ঞানী যারা তাহাদের চিত্তে কিন্তু এসকল
কখনো না পারে প্রবেশিতে। ৬১

'(অর্থকাম চাও সবে ? যে চাও সে) ধর্ম হতে
অর্থ-কামও পার তো লভিতে!
কেন তবে করিছ না ধরমের সেবা সবে ?'—
উচ্চকণ্ঠে কহি বারবার
ঊর্ধ্বে তুলি দুই বাহু, অথচ শোনে না কেহ
সে-কথা আমার! ৬২

ধর্ম নিত্য, অনিত্য এ সুখ-দুঃখ ; (নিত্য তুমি,
জীবন তোমার দু-দিনের)—
জীব নিত্য, অনিত্য এ দেহাদি যা হেতু জীবনের ;
(অনিত্যের তরে কভু পরিত্যাগ কোরো না নিত্যেরে,)
কাম-ভয়-লোভবশে, জীবনেরো তরে কভু
পরিত্যাগ কোরো না ধর্মেরে। ৬৩

মহর্ষির্ভগবান্ ব্যাসঃ কৃত্বেমাং সংহিতাং পুরা।
শ্লোকৈশ্চতুর্ভির্ধর্মাত্মা পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্ ॥ ৫৯

ধর্মপ্রাণ মহাঋষি ভগবান ব্যাসদেব
চারি শ্লোকে রচি এ সংহিতা
নিজপুত্র শুকদেবে শিখায়েছিলেন, এর
বুঝায়েছিলেন মর্মকথা ॥

['ভারত-সাবিত্রী' অর্থে 'মহাভারত-সাবিত্রী' হইলেও ইহা ভারতেরও প্রাণবাণী —সাবিত্রী বা গায়ত্রী, চিরযুগের মহামন্ত্র।—সঃ]

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর ধরিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনে উপলব্ধ ও যুগোপযোগিরূপে প্রকট ভারতের সর্বজনীন সনাতন ভাবধারা পরিবেশনের কাজে শ্রীভগবানের কৃপায় এবং লেখক, পাঠক ও অনুরাগিগণের সহযোগিতায় সমভাবে ব্রতী থাকিয়া উদ্বোধন পত্রিকা ৭২তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের যাত্রারম্ভে আমরা শ্রীভগবানের আশীর্বাদ এবং সুধীবর্গের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বেদান্ত-ভিত্তিক ভারতের এই সনাতন আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট করাইতে পারিলেই ভারত বর্তমান যুগের সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া সর্ববিষয়ে উন্নত হইবে এবং সমগ্র জগৎকেও পথ দেখাইতে পারিবে; পারিবে নয়—মানবজাতির ভবিষ্যৎসম্বন্ধে স্বচ্ছদৃষ্টি স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন ভারত উহা করিবেই। আধ্যাত্মিক উন্নতি জাগতিক উন্নতির পরিপন্থী—তৎকালীন এই মনোভাবের, যাহা বর্তমান সময়ে সারা জগতেই প্রবলতর হইয়াছে তাহার অসারতা দেখাইবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব এবং জগৎ-কল্যাণের জন্য জীবনে এই উভয়ের মিলনের দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রচার—"এতদিন পর্যন্ত ভারতে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে কেবল বহিরুন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই শক্তির সম্মিলনের সময় আসিয়াছে।...আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রবল হইলেই যে বহিঃ-কার্য বন্ধ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। ভারতে এই দুটি একত্রীভূত করিতে পারিলে আমরা জগতে এক মহান্ আদর্শ দেখাইতে পারিব। রামকৃষ্ণ পরমহংস এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের গভীরতা কাহারও অবিদিত নাই, অথচ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কর্মশীলই বা কে ছিল?"*

এই মিলনের কাজে সহায়তা করাকেই স্বামীজী উদ্বোধনের জীবন-ব্রত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উদ্বোধন পত্রিকার প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের লেখা যে 'প্রস্তাবনা'টি বুকে ধরিয়া সগৌরবে উদ্বোধন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, ১৪ই জানুআরি), সেটি নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল:

"উদ্বোধনের প্রস্তাবনা"

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসংঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা-রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম-ক্রোধ-ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায়; তাহা হয়তো প্রাচীন ভারতে একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-

* 'স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন'—উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬১-৬২

বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান্ অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাবপরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী, প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদবিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষবিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটীকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগ-যুগান্তরব্যাপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

এই জাতি মধ্য-আসিয়া, উত্তর ইউরোপ বা সুমেরু-সন্নিহিত হিমপ্রধান প্রদেশ হইতে শনৈঃ পদসঞ্চারে পবিত্র ভারতভূমিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন বা এই তীর্থভূমিই তাঁহাদের আদিম নিবাস—এখনও জানিবার উপায় নাই।

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারত-বহির্ভূত-দেশবিশেষনিবাসী একটি বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন—কতিপয় ইউরোপীয় জাতির ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন্ জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এসকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। তবে যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর—মানসপুত্র—তাঁহাদের ভাবরাশির, চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে।

হয়তো আমাদের ভাগে সার্বভৌম পৈতৃক সম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা-পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত; ইঁহাদের নিজ নাম—গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায়—সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আমরা আধুনিক বাঙ্গালী—আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ঐ যবনগুরু-দিগের পদানুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।

সমগ্র ইউরোপ আজ সর্ববিষয়ে প্রাচীন

গ্রীসের ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী; এমনকি একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, “যাহা কিছু প্রকৃতি সৃষ্টি করেন নাই, তাহা গ্রীকমনের সৃষ্টি।

সুদূরস্থিত বিভিন্ন-পর্বতসমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয়; যখনই ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতা-রেখা সুদূরসম্প্রসারিত [হয়] এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।

অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শন-বিদ্যা গ্রীক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সূত্রিত করে। সিকন্দর শাহের দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহা-জলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধভূভাগ ঈশাদি-নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে। আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করে; এবং বোধ হয় আধুনিক সময়ে পুনরায় ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র ‘ত্যাগ’, অপরের ‘ভোগ’; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন, অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখ-লাভে সমুদ্যত।

এ যুগে পূর্বোক্ত জাতিদ্বয়ই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের শারীরিক বা মানসিক বংশধরেরা বর্তমান

ইউরোপ-আমেরিকা যবনদিগের সমুন্নত মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন।

কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।

প্রস্ফুরিত হইয়া কি হইবে?

পুনর্বার কি বৈদিক যজ্ঞধূমে ভারতের আকাশ তরলমেঘাবৃত প্রতিভাত হইবে, বা পশুরক্তে রন্তিদেবের কীর্তির পুনরুদ্দীপন হইবে? গোমেধ, অশ্বমেধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি আদি প্রাচীন প্রথা পুনরায় কি ফিরিয়া আসিবে বা বৌদ্ধোপপ্লাবনে পুনর্বার সমগ্র ভারত একটি বিস্তীর্ণ মঠে পরিণত হইবে? মনুর শাসন পুনরায় কি অপ্রতিহত-প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বা দেশভেদে বিভিন্ন ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচারই আধুনিক কালের ন্যায় সর্বতোমুখী প্রভুতা উপভোগ করিবে? জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিবে?—গুণগত হইবে বা চিরকাল জন্মগত থাকিবে? জাতিভেদে ভক্ষ্য সম্বন্ধে স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট-বিচার বঙ্গদেশের ন্যায় থাকিবে, বা মান্দ্রা-জাদির ন্যায় কঠোরতর রূপ ধারণ করিবে, অথবা পঞ্জাবাদি প্রদেশের ন্যায় একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে? বর্ণভেদে যৌন[1] সম্বন্ধ মনূক্ত ধর্মের ন্যায় এবং নেপালাদি দেশের ন্যায় অনুলোমক্রমে পুনঃ প্রচলিত হইবে বা বঙ্গাদি দেশের ন্যায় একবর্ণ-

১ বৈবাহিক

মধ্যে অবান্তর বিভাগেও প্রতিবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিবে? এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। দেশভেদে, এমনকি, একই দেশে জাতি- এবং বংশভেদে আচারের ঘোর বিভিন্নতা দৃষ্টে মীমাংসা আরও দুরূহতর প্রতীত হইতেছে।

তবে হইবে কি?

যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুদাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই—সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।

ত্যাগের অপেক্ষা শান্তিদাতা কে? অনন্ত কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক ঐহিক কল্যাণ নিশ্চিত অতি তুচ্ছ। সত্ত্বগুণাপেক্ষা মহাশক্তি-সঞ্চয় আর কিসে হয়? অধ্যাত্মবিদ্যার তুলনায় আর সব 'অবিদ্যা' —সত্য বটে, কিন্তু কয়জন এ জগতে সত্ত্বগুণ লাভ করে,—এ ভারতে কয়জন? সে মহাবীরত্ব কয়জনের আছে যে, নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়-জনের ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হয়? সে বিশাল হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য- ও মহিমাচিন্তায় নিজ শরীর পর্যন্ত বিস্মৃত হয়? যাঁহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয়।—আর এই মুষ্টিমেয় লোকের মুক্তির জন্য কোটি কোটি নরনারীকে সামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে? এ পেষণেরই বা কি ফল?

দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে; যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্য-তার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে; যেথায় ক্রূরকর্মা তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে; যেথায় নিজের সামর্থ্যহীন-তার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই · কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ; বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম-কীর্তনে—সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরমহংস-পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে [হইবার] আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?

অপর দিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ, সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণপ্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণপ্রধান যেন চিরজীবী; ইহার সাক্ষী ইতিহাস।

ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ-প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক

কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।

এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।

যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্য-তরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?

কত পর্বতশিখর হইতে কত হিমনদী, কত উৎস, কত জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশাল সুর-তরঙ্গিণীরূপে মহাবেগে সমুদ্রাভিমুখে যাইতেছে। কত বিবিধ প্রকারের ভাব, কত শক্তি-প্রবাহ—দেশদেশান্তর হইতে কত সাধু-হৃদয়, কত ওজস্বী মস্তিষ্ক হইতে প্রসৃত হইয়া নর-রঙ্গক্ষেত্র কর্মভূমি—ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। লৌহবর্ত্ম-বাষ্পপোতবাহন ও তড়িৎসহায় ইংরেজের আধিপত্যে বিদ্যুদ্বেগে নানাবিধ ভাব—রীতিনীতি দেশমধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অমৃত আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গরলও আসিতেছে; ক্রোধ-কোলাহল, রুধিরপাতাদি সমস্তই হইয়া গিয়াছে—এ তরঙ্গরোধের শক্তি হিন্দুসমাজে নাই। যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে মৃতজীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্যন্ত সকলই বহু বাগাড়ম্বরসত্ত্বেও নিঃশব্দে গলাধঃকৃত হইল; আইনের প্রবল প্রভাবে ধীরে ধীরে, অতি যত্নে রক্ষিত রীতিগুলিরও অনেকগুলি ক্রমে ক্রমে খসিয়া পড়িতেছে,—রাখিবার শক্তি নাই। নাই বা কেন? সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যেগুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষাশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়।

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি- হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।

বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা—নিঃস্বার্থপরতা*

স্বামী সারদানন্দ

......গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জুন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, তাহা আমি; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা! সাধন ভজন সব এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায় যে—স্বার্থত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া—যে আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাধন ভজন সব হইয়াছে। ঈশ্বর কি খোসামোদের বশ যে, যে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন? না, তিনি এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তার ব্রত, ইহাই তার প্রধান সাধন। জানিও, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাস্বার্থপর, তার সাধন ভজন পণ্ডশ্রম মাত্র। সর্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলকেই তাঁর মূর্তি জানিয়া সেবা করিতে হইবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা অধিকার করিয়া বলিতেছি, আমার মন। তুমি একটু লইয়া বলিতেছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার কোন অংশে বেড়া দিয়া আমি এক একটা নাম দিলাম ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি সকলেই কিন্তু জানেন বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল, এক তরঙ্গ, কেবল নামরূপে প্রভেদ। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিতেছি। যখন দুই জনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, একভাবে ভাবিত হয়, তখন তাহাদের শরীর পৃথিবীর দুইপ্রান্তে থাকিলেও মনের কথা জানিতে পারে; আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইজন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহা এক মহাসত্য। যখন মনে পাপচিন্তার উদয় হয়, অন্যান্য মনের পাপচিন্তা সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আরো পাপে নিমগ্ন করে। আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তার উদয় হইলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা তাহার মনের উপর কার্য করিয়া তাহাকে আরো উন্নত করিতে থাকে। আমাদের সমস্ত সাধন ভজন আমাদিগকে স্বার্থশূন্য করিয়া এই বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

---

* উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (পৃঃ ৩০, ৩১) হইতে 'সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতা' প্রবন্ধের আংশিক পুনর্মুদ্রণ।—সঃ

আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শ

স্বামী আদিনাথানন্দ

হিন্দু সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝিব আর্য ঋষিগণের মনীষা সামগান-মুখরিত তপোবনে যে মহান সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই মহাসাধনার মহামহীরুহ বিগত ৬ হাজার বৎসরব্যাপী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া একটি আধ্যাত্মিক জীবনদর্শনমূলক যে সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছন্দে এই সাধনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে বেজেছিল রনরনি
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে
আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি
বিরাট হিয়া।'

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে :

'যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ।
যো ঔষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমো নমঃ॥'

'এই যে ভারতের সাধনা ইহা ভূমার সাধনা, বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যানুভূতির সাধনা। স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হইয়া উঠা লক্ষ্য নহে, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠাই চরম পরিণাম।' ঐশ্বর্য সঞ্চিত করিয়া জাগতিক ভোগে মগ্ন থাকা নহে—আত্মার ব্যাপৃতি দ্বারা বিশ্বাত্মাকে নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতে দর্শন করাই জীবনের সফলতা।

আজ আমাদের সম্মুখে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতি তাহাদের আত্মগত বৈশিষ্ট্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের সংঘর্ষ অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে চলিতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদসর্বস্ব জীবনদর্শন, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, যন্ত্রশিল্পের বিপুল সমাবেশ, ধনোৎপাদনের চমকপ্রদ আবিষ্কারসমূহ এবং যান্ত্রিক অভ্যুদয়ের বিজয়-অভিযান। অন্যদিকে ধ্যান, ধারণা, যোগ, সমাধি, মুমুক্ষুত্ব, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরলাভের ব্যাকুলতা, চিত্তশুদ্ধির কঠোর ব্যবস্থা, ত্যাগ, তপস্যা, সংযম প্রভৃতি চিরন্তন প্রাচ্য আদর্শের চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মানবচিত্ত বিভ্রান্ত হইয়া এই জাগতিক অভ্যুদয়ের জন্য অভিযানপ্রয়াসী। কিন্তু প্রশ্ন এই—প্রাচ্যের আদর্শকে বিসর্জন দিয়া মানবপ্রগতি মঙ্গলময়, শান্তিময় হইবে কি? জড়ের উপাসনা দ্বারা আমরা তৃপ্তি পাইব কি? আজ ইহা ঐকান্তিকভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

সুতরাং প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে আমাদের চিরন্তন জাতীয় জীবনাদর্শের সম্যক অর্থবোধ। আত্মসংবিদ ব্যতীত আমরা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ মার্গ বাছিয়া লইতে পারিব না।

আজ আরও একটি কথা দৃঢ়ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ ও অনুসরণের সম্বন্ধ নয়। আদান ও প্রদানের সম্বন্ধ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহাকে বলা হয় সহাবস্থান (co-existence)। আমাদের যদি নূতন কিছু দিবার না থাকে তবে অপরের সঙ্গে আদান-প্রদান চলে না। সমকক্ষ ভাবে কাহারও সঙ্গে ব্যবহার করা যায় না।

সুতরাং ভারতবর্ষ যদি খাঁটী ভারতবর্ষ হইয়া না উঠে তবে বিশ্বের বাজারে মজুরী করা ছাড়া তাহার আর কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। তাহা হইলে আত্মসম্মানবোধ চলিয়া যাইবে এবং দাতার আনন্দ হইতে আমরা বঞ্চিত হইব।

নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ লইয়া রাশিয়া বৃটেন বা আমেরিকা আজিকার পৃথিবীর আতঙ্ক কাটাইতে পারিতেছে না। আন্তর্জাতিক শান্তি সুদূর-পরাহত হইতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভুখণ্ডের চিন্তাশীল বহু ব্যক্তি মনে করিতেছেন যে, আধ্যাত্মিক-আদর্শমূলক ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে যথার্থ শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইবে।

সেইজন্য অবহিতচিত্তে বিচার করিতে হইবে, যে-সত্য ভারত নিশ্চিতরূপে লাভ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে দান করিবে এবং বিশ্বশান্তির ভিত্তি পত্তন করিবে, সেই সত্যটি কি? 'সে-সত্য বণিকবৃত্তি নহে—রাজনৈতিক স্বারাজ্য নহে, স্বাদেশিকতা নহে—উহা বিশ্ব-জাগতিকতা।' সেই সত্য ভারতের তপোবনে সাধিত হইয়াছে, উপনিষদে উচ্চারিত হইয়াছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বুদ্ধদেব সে-সত্যকে পৃথিবীতে সকল মানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করিয়া তুলিবার জন্য তপস্যা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন যুগে দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, আচার্য শঙ্কর ও শ্রীরামানুজ প্রভৃতি পরবর্তী মহামানবগণ সেই সত্যই প্রচার করিয়াছেন। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সাধনার তত্ত্ব 'জ্ঞানে অদ্বৈত তত্ত্ব, ভাবে বিশ্ব-মৈত্রী, কর্মে যোগসাধনা।' এই সত্যলাভের উপায় ব্রহ্মচর্য, শ্রীভগবানের চিন্তায় একাগ্রতা-অভ্যাস, সর্বজীবে দয়া এবং সর্বভূতে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া সেবায় আত্মদান। ভারতে ইহা কেবল কাব্যকথা- বা মতবাদরূপে ছিল না। প্রত্যেকের জীবনে উহাকে ফুটাইয়া তুলিবার অনুশাসন ছিল।

'যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তৎ তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ হরিভক্তিপরায়ণঃ॥'

এই অনুশাসন যদি আমরা বিস্মৃত না হই এবং আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষাকে যদি এই জীবনদর্শনের অনুগত করি তবেই আমাদের জাতীয় জীবন পুনরায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য পুনরায় নূতন সমাজনীতি, নূতন রাজনীতি, নূতন অর্থনীতি, নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া তুলিবে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয়বিধ সম্পদশালী এক বিরাট মহীয়ান সভ্যতার বনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে। ইহাই বিশ্বের অপরাপর জাতির পথপ্রদর্শক হইবে।

আমাদের এই জগৎ শ্রমবিভাগনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলের নিকট সব কিছুর অধিকার থাকিবে, ইহা বলার কোন তাৎপর্য নাই। সেইজন্য পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি ভাবিয়া বসে যে, ঐ শক্তি একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু। প্রগতি বা সংস্কৃতির অর্থ উহাই। আবার অন্য জাতি জড়বাদী সভ্যতাকে একান্তই নিরর্থক মনে করে। ইহা প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গী, অপরটি পাশ্চাত্ত্য। প্রত্যেকটির নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের সংমিশ্রণে সামঞ্জস্যবিধান করাই বর্তমান যুগসমস্যার সমাধান।

আমাদের জাতির প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও তেজোদীপ্ত করিবার একমাত্র পন্থা ভারতীয় ভাবধারার মাধ্যমে বিশ্ব-বিজয়।

ভারতের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-রাজিকে পুনরায় দেশের বাহিরে প্রচারিত করিয়া জগতের চিন্তারাজ্য দখল করিতে

হইবে। উহা কেবল কথায় হইবে না, জীবন দেখাইতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য সমাজের নিকট যাহা পাইব তাহার বিনিময়ে তাহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ দিতেই হইবে। আমাদের শিখিতে হইবে এবং শিখাইতেও হইবে। আমার বিশ্বাস—শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতেরই কল্যাণপথে আলোকবর্ষী, মনুষ্যত্বের উদ্বোধক ধর্মানুশীলন ও বেদান্তের সার্বজনীন ভাবের ব্যাপক প্রচারকে বাদ দিয়া রাজনৈতিক বা অন্য কোন আন্দোলনই ভারতের যথার্থ উন্নতিসাধনে সক্ষম হইবে না। যথার্থ ধর্মকে আমরা জীবনে রূপায়িত করিব, তাহার উদ্বোধন, সংরক্ষণ ও প্রচারে আমরা আত্ম-নিয়োগ করিব—এই দৃঢ় ব্রত আমরা গ্রহণ করিলে ভারতের নব জাগরণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে, অমিতশক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য হইবে।

আত্ম-দর্শন

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

[পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্
পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
উপস্থায় প্রথমজামৃতস্য
আত্মনাত্মনমভি সংবিবেশ॥]

যজুঃ ৩২.১১।

জানি না, আমার আত্মা
কবে যে বিচ্যুত ভেবেছিল
আপনারে বিশ্ব-আত্মা থেকে!
জানি নাকো কত জন্ম ধরি
কত লোক-লোকান্তরে
শ্রান্ত হয়ে খুঁজেছে বৃথাই
বহির্বিশ্বেতে তার আপন আশ্রয়!
পায়নি সন্ধান,
কোন্ মহাসিন্ধু মাঝে
মিলিত হবার তরে
জন্মে জন্মে চিত্তে তার উঠেছে তুফান।

এবার আমার অন্তরে
উদয় হয়েছে শ্রদ্ধার!
জ্যোতিষ্মান সে শ্রদ্ধার প্রথম কিরণে
উদ্ভাসিত হ'ল সত্য
বিন্দু হ'ল সাগর সমান,
অন্ধ অন্তর হ'ল দিব্য চক্ষুষ্মান!
দেখিলাম অভেদ আবার
বিশ্ব-আত্মার সাথে এ আত্মা আমার!
"আমার 'আমি'র ধারা" মিশে গেল ক্রমে
"পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে!"

বিবেকানন্দ ও বেদান্তদর্শন

ডক্টর ঝরণা ভট্টাচার্য

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর—উপনিষদের এই বাণী ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি নর-নারীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে ভারতেরই এক সন্তান, অমৃতের পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ। মোহতমসাচ্ছন্ন প্রতিটি মানুষের কাছে এগিয়ে গেছেন তিনি আশার বাণী নিয়ে, কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন তাদের তমোঘোর, নিদ্রাচ্ছন্নভাব। বলেছেন—উঠ, জাগো, আত্মজ্ঞান লাভ কর:

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

কঠ, ১।৩।১৪

এই উপনিষদের অনুপ্রেরণায় তাঁর সারা জীবন গড়ে উঠেছিল। উপনিষদ্ ও বেদান্তের শিক্ষায়-দীক্ষায় যে-জীবন তিনি লাভ করেছিলেন তা জড় নয়, মোহগ্রস্ত নয়, আবার অবাস্তবও নয়। তা ছিল নিছক চৈতন্যময়, জ্ঞানময়, আবার কর্মবহুল। জ্ঞান ও কর্মের এই যে সমন্বয় তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্রে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'কর্মজীবনে বেদান্ত' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তাতে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, কর্মজীবনে বেদান্তদর্শনের উপযোগিতা আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-ও বাহকরূপে এই বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আধ্যাত্মিকতা ও ব্যাবহারিক জীবনের কাল্পনিক প্রভেদ দূর করতে পারে এই বেদান্তদর্শন। কর্মজীবনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে, তেজ ও বীর্যে বলীয়ান করতে সমর্থ এই বেদান্তদর্শন।

তাই দেখি, বেদান্তের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন গড়ে উঠেছিল বলে শুধু আধ্যাত্মিকতাবাদ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না—সাধারণ বাস্তব জীবনে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন—"ব্যাবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করা আমাদের যত প্রয়োজন, আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন ততটা নয়।"

বেদ আমাদের প্রাচীনতম শাস্ত্র এবং প্রামাণ্য শাস্ত্র। বেদের যে শিক্ষা তা অভ্রান্ত, কারণ বেদ অপৌরুষেয়। এই বেদের মধ্যেই রয়েছে দুটো দিক—এক কর্মকাণ্ড আর এক জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির কথা আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে বেদের আধ্যাত্মিক উপদেশ—যা পরে উপনিষদ্ বা বেদান্ত নামে পরিচিত হয়েছে। এই বেদান্তকে ভিত্তি ক'রেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি। এই বিভিন্ন মতবাদগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই তা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। তাই সমস্ত মতবাদের মূল উপনিষদের বাণীকেই অবলম্বন করে এগিয়ে গেছেন জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনায় ও ব্যাবহারিক জগতের উন্নতিসাধনে। তিনি বলেছেন—"আমি এই সকল উপনিষদেই একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, প্রথমে দ্বৈতভাবের কথা—উপাসনা প্রভৃতি আরম্ভ হইয়াছে, শেষে অদ্বৈত-ভাবের অপূর্ব উচ্ছ্বাসে সেগুলি সমাপ্ত হইয়াছে।"

এই বেদান্তদর্শনের চরম ও পরম তত্ত্ব আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। মানবমন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই দুঃখ, কষ্ট, পাপ, তাপ থেকে মানুষ অব্যাহতি পেতে চায়—পেতে চায় সুখের সন্ধান, আনন্দের আলো। কিন্তু যতক্ষণ না তার মন থেকে এই অজ্ঞানতারূপ দুঃখের আবরণ অপসারিত হচ্ছে ততক্ষণ সে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সংসাররূপ আবর্তে—যেখানে অহরহ অভাব, অনটন, দুঃখকষ্ট তাকে ঘিরে রয়েছে। বেদান্তে একেই বলা হয়েছে জগৎ—জড় জগৎ। তাই পাশ্চাত্য মনীষিগণ বলেছেন: ভারতীয় দর্শনে নৈরাশ্যবাদই স্থানলাভ করেছে। প্রত্যহই যদি মানুষ দুঃখকষ্টের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে তাহলে আনন্দ কোথায়? দুঃখের হাত হতে মুক্তি কোথায়? কিন্তু নৈরাশ্যবাদ যে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি নয়—সর্ববিধ দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তিই যে বেদান্তের চরম কথা, একথা ভারতের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছেন, আশাবাদই ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি। আশাবাদের মূল কারণই হ'ল ব্রহ্মস্বরূপে নিজেকে উপলব্ধি করা। উপনিষদে আছে—'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জান, নিজেকে পরম ব্রহ্ম ব'লে জান, নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি কর।

এই যে ব্রহ্মস্বরূপে নিজেকে উপলব্ধি করা—এই ব্রহ্মস্বরূপ বলতে আমরা কি বুঝি? এই জীবজগৎরূপ মায়াময় সগুণ ব্রহ্ম? না জীবজগৎ থেকে মুক্ত নিগু'ণ ব্রহ্ম? আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্বরূপ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। সগুণ ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, জগতের কারণস্বরূপ। আর নিগু'ণ ব্রহ্ম দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত—কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত; ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অমেয়, অনির্দেশ্য; ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্মই সত্য বস্তু—বিশ্বের সমস্ত বস্তুই মিথ্যা। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই চিন্ময় জ্ঞানস্বরূপ। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশিত হয়—কিন্তু ব্রহ্মকে প্রকাশ করবার জন্য অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা থাকে না। ব্রহ্ম স্বয়ং-প্রকাশ। চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থই ব্রহ্মের দ্বারা প্রকাশবান।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" কঠ, ৫।১৫

উপনিষদে যেরূপ ব্রহ্মের নিগু'ণ তত্ত্বের কথা আছে, সেরূপ সগুণ তত্ত্বের কথাও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এই সগুণ ও নিগু'ণ একই তত্ত্ব। যিনি নিগু'ণ, তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ হন। নিগু'ণ ব্রহ্ম অনাদি মায়াজালে নিজেকে আবৃত ক'রে সগুণ ও সবিশেষ হন। মায়াই ব্রহ্মের আবরণ, এই মায়াই প্রকৃতি আর মায়াশ্রিত ব্রহ্মই ঈশ্বর।

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্ব. ৪।১০। জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই মায়িক বিকাশ। জগতের বাহিরেও তিনি, ভিতরেও তিনি। যাহা কিছু ব্যক্ত, যাহা কিছু অব্যক্ত—সমস্তই তিনি। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মময়, সমস্তই আত্মময়। ঈশোপনিষদেও বলা হয়েছে—"ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্ ··" —ঈশ (১)। ঈশ্বরই মায়া দ্বারা নাম ও রূপের ভেদ সাধন করে দ্বৈত জগতের সৃষ্টি করেছেন। এই নাম, রূপ ও দ্বৈত জগৎ সমস্তই মিথ্যা, অনিত্য—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, নিত্য বস্তু। যেমন একখণ্ড মাটিকে জানলে সেই মাটির দ্বারা নির্মিত যাবতীয় বস্তুরই জ্ঞান হ'য়ে থাকে, কারণ মৃন্ময় বস্তু ঐ মাটিরই বিকার

মাত্র। কেবলমাত্র নাম ও রূপে ঐ বস্তুগুলি পরস্পর পৃথক্, কিন্তু উহারা মাটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেরূপ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের—যেমন সাগর, পর্বত, বৃক্ষ, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতির নাম ও রূপে পার্থক্য থাকলেও স্বরূপতঃ তারা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। জাগতিক পদার্থের মধ্যে নাম ও রূপের যতই পার্থক্য থাকুক, তাদের মূলে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিরাজমান। জগৎকে ব্রহ্মরূপে দেখলেই যথার্থ দেখা আর ব্রহ্মভিন্নরূপে দেখলে সেই জগৎ-দর্শন মিথ্যা হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মসত্তা থেকে নিজেকে পৃথক্‌ভাবে চিন্তা করলেই হয় দুঃখের উৎপত্তি। আর আনন্দের সন্ধান মেলে, যখন নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সঙ্গে আমাদের একত্বজ্ঞান হয়। এই নির্গুণ ব্রহ্মসত্তায় একাত্মীভূত হওয়াতেই মুক্তি—এই মুক্তিই অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবেদান্তের এই দিকটিকে নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তি ব'লেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রত্যেক জাতির ভিতর এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে—সকলকে নিজের মত ভালবাসিবে। প্রাণি-নির্বিশেষে সকলকেই নিজের মত প্রীতি করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অপর প্রাণিগণকে নিজের মত ভালবাসিলে কেন কল্যাণ হইবে, কেহই তাহার কারণ নির্দেশ করেন নাই। একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মবাদই ইহার কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে এক ও অখণ্ড বলিয়া বোধ করিবে, যখন জানিবে অপরকে ভালবাসিলে নিজেকেই ভালবাসা হইল, তখনই বুঝিবে অপরের ক্ষতি করিলে নিজেরই ক্ষতি করা হইল; তখনই আমরা বুঝিব কেন অপরের অনিষ্ট করা উচিত নয়। সুতরাং এই নির্গুণ ব্রহ্মবাদেই নীতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের যুক্তি পাওয়া যায়।"

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে যেমন হৃদয়ে অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তেমনি আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম (সোঽহম্)—এই জ্ঞান যখন হয় তখন হৃদয়ে অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়। তাই স্বামীজী বলছেন, এই 'সোঽহম্' জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই আসবে বীর্য, আসবে শৌর্য, আসবে তেজস্বিতা। মানুষ যেভাবে নিজেকে চিন্তা করে, সেভাবেই নিজেকে গ'ড়ে তোলে। যদি মানুষ নিজেকে দুর্বল ভাবে তাহ'লে সে দুর্বল হবে, নিজেকে পাপী ভাবলে পাপী বলেই পরিচিত হবে। এভাবে দেখা যায় নিজের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি নিজের চিন্তাধারার উপরই কার্যকরী হ'য়ে থাকে। যদি মানুষ নিজেকে 'সোঽহম্' ভাবতে শেখে, সেই তেজঃস্বরূপ চিন্ময় রূপকে নিজেরই সত্তা ব'লে চিন্তা করতে শেখে, তাহলে সে সহজেই তেজস্বী হ'তে পারবে। আমাদের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে জ্ঞান, সকল শক্তি ও পবিত্রতার ভাব। অদ্বৈতবাদ থেকে আমরা এই যে শিক্ষা পেলাম, তা আমাদের জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবে। সকল বাধা-বিপত্তিকে দুহাতে সরিয়ে এগিয়ে যাবে মানুষ উন্নতির পথে, জয়ের পথে—আর এর জন্য চাই সাহস ও শক্তি। স্বামীজী এ সম্বন্ধে বলছেন—"আমাদের প্রয়োজন শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষদ্ শক্তির বৃহৎ আকর। উপনিষদ্ যে শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ, সেই শক্তি সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত, শক্তিমান্ ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়।"

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা তো সেই চিন্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি না—ক্ষণিক

সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশায় আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। চৈতন্যময় আত্মাকে তখন জড় বলে ভাবতে শিখি। আত্মাকে জড়ভাবে দেখা আত্মার স্বরূপ দর্শন নয়। আত্মার যথার্থ স্বরূপটি তখন অজ্ঞানে আবৃত। উপনিষদ্ বলে, এই অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। আচার্য শঙ্কর বলেন—চিদানন্দস্বরূপ আত্মা অপরিবর্তনীয়, সুতরাং সত্য আর জড়স্বভাব দৃশ্য বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল, সুতরাং মিথ্যা। এই সত্য ও মিথ্যার অধ্যাস বা মিলনের ফলেই জীবের সংসার-জীবন চলছে আর তা সত্য ব'লে মনে হচ্ছে [সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য 'অহমিদং' 'মমেদমিতি' নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ—ব্রঃ সূঃ শং অধ্যাসভাষ্য]। এই অজ্ঞানের বশেই যা আপাতসুখকর বলে মনে হয় তাতেই মানুষ আকৃষ্ট হয়, আবার যা দুঃখদায়ক বলে মনে হয় তার থেকে সে নিবৃত্ত হয়। মানুষের জীবনেও পশুসুলভ অজ্ঞানতাই কাজ করে চলেছে। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ অজ্ঞানতাকেও সত্য বলে, স্বাভাবিক বলে মনে ক'রে চলেছে। সমস্ত অনর্থের মূল এই অজ্ঞানতার নিবৃত্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ই বেদান্তের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেন—"অজ্ঞানই সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ। অজ্ঞানবশতই আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি, পরস্পরকে জানি না বলিয়াই আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা নাই।" এই যে পরস্পরের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি—এই তো অজ্ঞানতার কাজ। পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই—এই চরম তত্ত্বের জ্ঞান হয় তখনই, যখন অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত হয় মানুষ। স্বামীজী বলছেন—"যারা অসৎ কর্ম করে ও যাদের মন শান্ত নয়, তারা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না। কেবল যাঁদের হৃদয় পবিত্র, যাঁদের কার্য পবিত্র, যাঁদের ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁদের নিকটই সেই আত্মা প্রকাশিত হন। তখনই তাঁরা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে থাকেন। 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বেদান্ত-মহাবাক্যের শ্রবণ ও মননের ফলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হ'য়ে থাকে।

স্বামীজী বলছেন—"মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্ক দ্বারা কখনও ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন।"

কঠোপনিষদে আছে—

"এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

কঠ, ১।৩।১২

অর্থাৎ সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থিত আত্মা—চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহাদের মন পবিত্র হইয়াছে তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান।—স্বামীজীও বলছেন—"সমগ্র উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই অপরোক্ষানুভূতি।" এই অপরোক্ষানুভূতির দ্বারাই তিনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন—আত্মদর্শন করেছেন। আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন—বেদান্তের এই চরমতত্ত্বকে তিনি স্থান দিয়েছেন প্রাত্যহিক কর্মজীবনের মধ্যে। তিনি চেয়েছেন ভারতের তথা বিশ্বের প্রতিটি নরনারীর মধ্যে এই আত্মদর্শনের বীজ উপ্ত করতে। তাই উপনিষদের বাণী স্মরণ ক'রে তিনি বলেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

আমেরিকায় কালীপূজা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মে প্রতিমা পূজা করা অত্যন্ত বিগর্হিত আচরণ। বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে দেখিতে পাই ইহুদী জাতির ঈশ্বর জিহোভা বার বার তাঁহার ভক্তদের সাবধান করিয়া দিতেছেন—খবরদার, মূর্তি গড়িয়া দেবদেবীর পূজা করিও না, তাহা হইলে আমার ক্রোধ তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে। জিহোভার অন্যতম বিশ্বাসী ভক্ত এয়ারন (Aaron), যাঁহার স্থান ছিল ভক্তোত্তম মজেসের (Moses) পরেই, এক দুর্বল মুহূর্তে প্রতিমাপূজা করিতে গিয়া কত তিরস্কৃত এবং দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা বাইবেল-পাঠকের অবিদিত নাই। জিহোভার আদেশে মজেস্ গিয়াছেন সিনাই পর্বতে প্রভুর নিকট হইতে প্রত্যক্ষ উপদেশলাভের জন্য। দলের নরনারী নীচে অপেক্ষা করিতেছে। মজেসের অবর্তমানে এয়ারন হইলেন নেতা। মজেসের ফিরিতে দেরী হইতেছে। ভয় সংশয় বিরক্তি সকলের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এয়ারনও ব্যতিক্রম নন। তাঁহার চিত্তে পূর্বের সংস্কার মাথা তুলিয়াছে—প্রতিমা গড়িয়া দেবতাদের প্রসাদ ভিক্ষা করা। যেমনি চিন্তা অমনি কাজ। দলের মহিলাদের নিকট হইতে অনেকগুলি সোনার মাকড়ি চাহিয়া লইয়া ঐগুলি গালাইয়া একটি বাছুর তৈরি করিলেন এবং সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, মজেস্ কোন্ অদৃশ্য ঈশ্বরের সঙ্গ করিতে গিয়াছে। তিনি আছেন কি নাই কে জানে? এই দেখ প্রত্যক্ষ দেবতা। এস সকলে মিলিয়া এঁর পূজা করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করি। প্রতিমাপূজার নামে সকলের মধ্যে দারুণ উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। অলক্ষ্যে জিহোভা ভ্রূকুটি করিলেন। এই দুর্বলতার জন্য শুধু এয়ারনকে নয়, সমগ্র ইহুদীগোষ্ঠিকে মহাপ্রতাপান্বিত জিহোভার কঠোর অভিশাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে যীশুখ্রীষ্টের উপদেশের মধ্যে প্রতিমাপূজার সপক্ষে বা বিপক্ষে বিশেষ কোনও প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু খ্রীষ্টের তিরোভাবের পর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তেরা দেশ-দেশান্তরে যখন খ্রীষ্টবাণী প্রচার করিতে বাহির হইয়াছেন তখন পৌত্তলিকদের সহিত জায়গায় জায়গায় তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে দেখিতে পাই। তদানীন্তন গ্রীসের প্রসিদ্ধ শহর এফেসাস্ (Ephesus)। প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের বসতি। এখানে ডায়না (Diana) দেবীর মার্বেল পাথরের সুবৃহৎ মন্দির—পৃথিবীর সপ্ত বিস্ময়ের এক বিস্ময়। উহা নির্মাণ করিতে ২২০ বৎসর লাগিয়াছিল। দেবী ডায়নার প্রতি এফেসাসবাসীদের ছিল অকুণ্ঠ ভক্তি। এই এফেসাস শহরে সন্ত পল খ্রীষ্টের বার্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহুদীর রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত। পৌত্তলিকতা দেখিলে ঐ রক্তের উত্তাপ ভীষণ বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু পল খুব বুদ্ধিমান। দেবতার ও মন্দিরের প্রতিবাদ সামনাসামনি করিলে এফেসাসবাসীর উদ্যত রোষ তাঁহার জীবন নাশ করিবে, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই প্রচার করিয়াছিলেন পরোক্ষে, অত্যন্ত

কৌশলে। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছিল। ডায়না দেবীর উপাসকগণ দলে দলে দেবীর উপাসনা ছাড়িয়া পরিত্রাতা যীশুখ্রীষ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিল।

হিন্দুদের প্রতিমাপূজা অবশ্য প্রাচীন মধ্য-প্রাচ্য বা গ্রীসের পৌত্তলিকতা নয়। তথাপি মূর্তিপূজা তো! খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম-সংস্কৃতিতে উহা অপাঙ্‌ক্তেয়। পাশ্চাত্যদেশে বেদান্তের সমাদর হইতেছে, কিন্তু হিন্দুধর্মের পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির ধারণা ও অনুশীলন পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে কঠিন। যে-সব পাশ্চাত্য লেখক ও সাংবাদিক ভারতবর্ষের বিরোধী সমালোচনা করিতে চান, তাঁহাদের লিখিবার এক প্রধান উপাদান হইল হিন্দুদের প্রতিমাপূজা। হিন্দুদের মন্দিরে পাঁচমাথা-যুক্ত দেবতা, কোথাও সাপের মূর্তি, কোনও মন্দিরে হস্তীর মস্তকধারী নরাকার দেবতার পূজা—আবার কোথাও রক্তপিপাসু ভীষণ-দর্শনা কালী—ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব মূর্তির উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব, করুণা, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ভাগবত গুণের ধ্যানধারণা কি করিয়া সংযুক্ত হইতে পারে, তাহা এই সব পাশ্চাত্য সমালোচক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যাহা হউক, পাশ্চাত্যের লোক শিল্প বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি শিক্ষার মতো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সারা পৃথিবীর পথপ্রদর্শক—এমন উদ্ধত মনোভাব এখন ক্রমশই কাটিয়া যাইতেছে। বাইবেলের বাহিরেও যে ধর্মের উচ্চ অভিব্যক্তি আছে এবং থাকিতে পারে তাহা ধীরে ধীরে বহু শিক্ষিত পাশ্চাত্য-বাসীর হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

হলিউড বেদান্ত মন্দিরে প্রতিমায় কালীপূজা আরম্ভ হয় ১৯৫০ সালে। আমেরিকাবাসীর ইহুদী-খ্রীষ্টীয় শিক্ষাদীক্ষার কথা স্মরণ রাখিয়া আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী খুব সন্তর্পণে এই আনুষ্ঠানিক হিন্দুপর্ব প্রচলন করেন। প্রথম প্রথম বিশেষ অন্তরঙ্গ ভক্তদেরই ডাকা হইত। ক্রমশঃ ভক্তেরা এই পূজার মর্ম যত বুঝিতে আরম্ভ করিল ততই প্রতি বৎসর বেশী বেশী লোক আসিতে লাগিল। এখন কালীপূজা হলিউড আশ্রমের একটি প্রধান বাৎসরিক উৎসব। এই বৎসর স্যানফ্রান্সিস্‌কো হইতে আমরা দুজন সন্ন্যাসী—স্বামী শ্রাহানন্দ ও আমি এই পূজায় উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে দুবার এখানে কালীপূজা দেখিয়াছি। প্রতিবারই গভীর আনন্দ ও উদ্দীপনা লইয়া ফিরি। খ্রীষ্টানদের দেশে জিহোভার উদ্যত শাসনদণ্ড আমেরিকানদের মাথায় পড়িতে পারে এমন কথা আদৌ মনে হয় না। মনে হয় জগজ্জননী মহাকালিকা ভারতবর্ষের লীলাক্ষেত্রে যেমন অগণ্য বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে একটি জাগ্রত সত্য হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তেমনি এই দশ হাজার মাইল দূরে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মসংস্কার-বিশিষ্ট নরনারীর কাছেও তিনি ভুক্তিমুক্তি-দায়িকা চিন্ময়ী মহাশক্তিরূপে নিজেকে প্রকট করিতে পারেন। ডায়না ছিলেন এফেসাস-নগরবাসীদেরই দেবী, তাঁহার দৈবী সত্তা একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর সীমার মধ্যেই ছিল ক্রিয়াশীল। কিন্তু হিন্দুর কালী বা বিষ্ণু বা শিব এইরূপ গোষ্ঠিদেবতারূপে পরিকল্পিত নন। তাঁহারা পরব্রহ্মেরই রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষায়—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। অতএব আমেরিকায় কালীপূজা যে ভারত-বর্ষেরই মতো প্রাণবন্ত এবং সার্থক হইতে পারে হলিউডে কালীপূজা দেখিয়া এই বিশ্বাস দৃঢ় হইল।

যে রাত্রে পূজা সেই দিনই বিকালে লস্

এঞ্জেলেস ইন্‌টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামিয়া সন্ধ্যার কিছু আগে হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে পৌঁছিলাম। মন্দিরে ঠাকুরপ্রণাম করিয়া পূজনীয় প্রভবানন্দ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিছুদিন আগে তাঁহার শরীর বেশ অসুস্থ হইয়াছিল। এখন সারিয়া উঠিয়াছেন। সদানন্দ পুরুষ। কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট বসিলে প্রাণ আনন্দময় হইয়া উঠে। দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার বেদান্ত সমিতির অনেকগুলি শাখা এবং প্রতি শাখায় নানাবিধ কাজ। সমস্ত কাজ প্রভবানন্দ মহারাজের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় তিনি কিছুতেই লিপ্ত নন, কোন উত্তেজনাই তাঁহার কাছে ঘেঁষিতেছে না।

আমাদের দেশের আশ্রমসমূহের মতো হলিউড আশ্রমেও মন্দিরে প্রত্যহ সন্ধ্যারতি হয়। শঙ্খ বাজে না, তবে ঘণ্টা বাজে। আরতির সময় সাধুরা এবং অনেক ভক্তও উপস্থিত থাকেন। গানও হয়। আজ একটু সকালেই আরতি শেষ করা হইল, কেননা ৺কালীপূজার আয়োজন মন্দিরেই করিতে হইবে।

আরতি হইয়া গেল। চার জন আশ্রমিক মায়ের প্রতিমা আনিয়া মূল পূজাবেদীর পাশে রাখিয়াছেন। প্রতিমা গড়িয়াছেন একটি আমেরিকান ব্রহ্মচারী—নাম নির্মলচৈতন্য। ইনি শিল্পী এবং ভাস্কর। এঁর আঁকা ঠাকুর, মা, স্বামীজী, রাজা মহারাজ প্রভৃতির তৈলচিত্র হলিউড আশ্রমের নানা ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভক্তও সাগ্রহে এঁর আঁকা ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ছবিতেই নিখুঁত কাজ পরিস্ফুট। মা কালীর প্রতিমাটিও ব্রহ্মচারী বড় দরদ দিয়া গড়িয়াছেন

বহু বৎসর ধরিয়া এখানে কালীপূজা হইতেছে—কাজেই পূজার আয়োজনের সকল খুঁটিনাটি সেবক-সেবিকাদের নখাগ্রে। চারজন আশ্রমিক আশ্চর্য তৎপরতার সহিত বেদী সাজাইয়া ফেলিলেন এবং পূজার উপচারসমূহ ঠাকুর-ভাঁড়ার হইতে আনিয়া পূজাস্থানে সাজাইয়া রাখিলেন। কে বলিবে আমেরিকার এই পূজামণ্ডপে ভারত-ভারতীর আবির্ভাব হয় নাই? স্বামী প্রভবানন্দজী কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া আয়োজন দেখিয়া এবং কর্মীদের উৎসাহ দিয়া গেলেন। মন্দিরের বৃহৎ হলে ভক্তদের জায়গা হইয়াছে। যাঁহাদের খুশি মেঝেতে আসন করিয়া বসিবেন। অন্যেরা চেয়ারে বসিবেন। দুই রকম ব্যবস্থা আছে। এক কোণে কোরাস গায়ক-গায়িকাদের আসর। আর এক কোণে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছেন হিন্দুস্থানী পা-জামা- ও পাঞ্জাবী-পরিহিত আমেরিকান যুবক ড্যানিয়েল ব্রুক্‌সম একটি সুরবাহার যন্ত্র লইয়া। ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ড্যানিয়েল বা ড্যানের ভীষণ টান—মাদকতা বলিলেও বিশেষ ভুল হয় না। এমন কোনও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র নাই যাহা তাঁহার বাড়ীতে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হয় নাই। সব যন্ত্রেই একটু না একটু অভ্যাস তাঁহার আছে। ছয় বৎসর আগে তাঁহাকে সেতার বাজাইতে দেখিয়াছিলাম। এবার তাঁহার হাতে সুরবাহার। ড্যান ভারি দিলখোলা লোক। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। স্বামী প্রভবানন্দজী তাঁহার নাম দিয়াছেন রামদাস।

রাত দশটায় পূজা আরম্ভ হইল। পূজক স্বামী অসক্তানন্দ, তন্ত্রধারক স্বামী স্বাহানন্দ। স্বামী প্রভবানন্দজী তন্ত্রধারকের পাশে একটি আসনে বসিয়াছেন, তাঁহার পাশে আমি। স্তবস্তোত্রের বই সামনে রাখা, সময়মতো

পড়িব। পিছনে একটি হারমোনিয়ম আছে। প্রয়োজনমতো ভজন গাহিবার কথা। বেদীর নীচে হল ভরিয়া গিয়াছে। প্রায় দুইশত ভক্ত সমবেত। পূজার পরিবেশ বেশ জমজমাট হইয়া উঠিয়াছে। অসক্তানন্দ সুন্দর পূজা করেন। ভারতে থাকিতেই ইঁহারা আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা শিখিয়াছিলেন। মিষ্ট গম্ভীর গলায় তিনি ও তন্ত্রধারক স্বাহানন্দ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ভক্তদের আনীত নানাপ্রকার অলঙ্কার পূজক নিপুণভাবে বহু যত্নে মায়ের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। কালিকা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভীষণা নন, বালিকার কমনীয় সরল মুখচ্ছবি।

আমেরিকান ভক্তদের কোরাস গান আরম্ভ হইল। ইংরেজী রচনা, সুরতালও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের। কিন্তু কথাগুলি বড় প্রাণস্পর্শী, অনেকবার 'কালী' নাম গানের মধ্যে রহিয়াছে। স্বামী প্রভবানন্দজী আমাকে মায়ের ভজন গাহিতে অনুরোধ করিলেন। একবার গাহিলাম—'সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে', শেষের দিকে আর একবার—'মজলো আমার মনভ্রমরা'। ভারতীয় ভজন অনেক ভক্তের পছন্দ।

ইহুদীয়-খ্রীষ্ট পটভূমিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এই আমেরিকান ভক্তমণ্ডলীর হিন্দুপূজার্চনার মন্ত্র, ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি বুঝিবার কথা নয়। কিন্তু ইহাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী তো ইহারা পড়িয়াছে। তিনি কালীকে কি দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা ইহারা জানে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও কালী যে ভিন্ন নন তাহাও ইহারা ঠাকুরের সন্ন্যাসী পার্ষদদের কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছে। তাই কালীপূজার আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ইহাদের হৃদয়কে মাতাইয়া রাখিয়াছে।

ড্যান্ তাহার সুরবাহারের তারে মীড় তুলিতেছে। নিস্তব্ধ রাত্রির মর্মদেশ কাঁপিয়া উঠিতেছে। পূজকের গন্ধপুষ্প-নিবেদনের সহিত ঐ সঙ্গীতের মূর্ছনাও দেবীর চরণে নিবেদিত হইতেছে। এইবার স্তবপাঠ হইতেছে—তিনজন সন্ন্যাসী পর পর দেবীর নানা স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। স্বামী প্রভবানন্দজীর আদেশে শ্রীমতী পাপিয়া সেনগুপ্ত দুটি গান গাহিলেন। তিনি বাঙালী, ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যাণ্টাবারবারা ক্যাম্পাসে পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করিতেছেন। ভক্ত-পরিবারের কন্যা।

ভোগারতি হইতেছে। ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য বহুপ্রকার ভোজ্য নানাপাত্রে দেবীকে নিবেদন করা হইয়াছে। আরতির সময় সন্ন্যাসীরা দাঁড়াইয়াছেন। ভক্তদেরও অধিকাংশ দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন, কোথায় যেন গিয়াছেন, সাদা চামড়ার ভক্তেরা সব আশেপাশে। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন, ভক্তের জাতি নেই। তাঁহার এই দুটি উক্তিই বিশেষ করিয়া আজ চিত্তে জাগিতেছিল।

মন্দির-বেদীর কাছে ধূমনির্গমনের কোন চিমনি নাই বলিয়া মন্দিরের ভিতর হোমের আয়োজন করা চলে না। হোমের ব্যবস্থা হইয়াছে আশ্রমের সাবেক বাড়ির সুবৃহৎ বসিবার ঘরে। ফায়ার-প্লেসের কাছে হোমের আনুষঙ্গিক উপচারাদি সব গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। সন্ন্যাসীরা হোমকুণ্ডকে বেড়িয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা ঘরের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি পূর্ণ করিয়া ঠাসাঠাসি করিয়া উপবিষ্ট। বসিবার অসুবিধার কথা কাহারও মনে হইতেছে না। হোম বা fire ceremony দেখিতে আমেরিকান ভক্তদের খুব উৎসাহ।

অগ্নিকে ভগবানের প্রতীকরূপে উপাসনা করিবার পশ্চাতে যে উচ্চ দার্শনিক ভাবনা রহিয়াছে তাহা আমেরিকান বেদান্তীদের কাছে সহজভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। হোমের পর প্রত্যেকের কপাল যজ্ঞতিলক-ভূষিত হইল।

তিলক পরিয়া সকলে আবার মন্দিরে আসিয়াছেন। প্রত্যেকের হাতে ফুল দেওয়া হইয়াছে। একে একে বেদীর কাছে গিয়া ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। আমাদের দেশে মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় যেমন একটা সোরগোল পড়িয়া যায়—কে আগে দিবে, কে পরে, এখানে সেরূপ নয়। বহু লোক লইয়া যেখানে কারবার সেখানে ইহাদের শৃঙ্খলাবোধ বিশেষ লক্ষ্য করিবার মতো। প্রত্যেকে ধীরভাবে নিজের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে।

স্বামী প্রভবানন্দজী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে পূজারী এবং পূজার কলসবাহী একজন আমেরিকান সাধু। শান্তিজলের মন্ত্রগুলির মূল সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী অনুবাদ পড়া হইল। অতঃপর ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ উচ্চারণ করিয়া প্রভবানন্দ মহারাজ ধীরে ধীরে ভক্তদের মধ্যে চলিতেছেন এবং সকলের গায়ে শান্তিজলের ছিটা দিতেছেন। আমেরিকান ভক্তদের নিকট ইহাও এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটা প্রসাদগ্রহণের জন্য সকলে আশ্রমের একটি বৃহৎ হলঘরে সমবেত হইয়াছেন। বড় বড় টেবিল ও বেঞ্চি পাতা। সকলে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ভূরিভোজনের আয়োজন। তেলমসলা-দেওয়া খাবার আমেরিকানদের বড় সহ্য হয় না। তবে আজ রাত্রে ব্যতিক্রম। এ যে প্রসাদ! প্রসাদের ধারণা ইহাদের বেশ ভালভাবেই জানা হইয়া গিয়াছে। কাজেই খুব আনন্দের সঙ্গে ইহারা খিচুড়ি, পাঁপর, তরকারী, ভাজাভুজি, চাটনি, পায়স, মিষ্টি প্রভৃতি গলাধঃকরণ করিতেছেন। একটি জিনিসের শুধু অভাব—জয়ধ্বনি। "কালীমায়ীকী জয়, মহামায়ীকী জয়"—এই ভূয়োভূয়ঃ জয়রব ইঁহারা এখনও শোনেন নাই।

আগে কালীপ্রতিমা-বিসর্জনের ব্যাপারে প্রভবানন্দজী খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। খুব ভোররাত্রে নৈশ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মোটরে করিয়া কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন দিয়া আসিত। এখন আর অত সাবধানতার প্রয়োজন হয় না। আমেরিকা ক্রমশই melting pot of nations (জাতিসমূহকে গালাইয়া এক করিবার পাত্র) হইয়া আসিতেছে, শুধু ইউরোপীয় জাতিগুলির নয়, এশিয়া-আফ্রিকার জাতিগুলিরও। নানা দেশের পোশাক, খাদ্য, আচার-ব্যবহার, ধর্মচর্যা অ্যাংলো-স্যাক্সন আমেরিকানদের চোখ-সওয়া হইয়া আসিতেছে। পথচারী বিবেকানন্দের পাগড়ি ধরিয়া টান দিবার মতো মনোবৃত্তি এখন আর কোনও আমেরিকানেরই নাই। তাই কালীপ্রতিমা যদি সমুদ্রের তটে দিবালোকে কাহাদের চোখে পড়ে, পড়িলই বা?

লস্ এঞ্জেলসের উপকণ্ঠে নিউপোর্ট বিচে প্রতিমা-বিসর্জনের ব্যবস্থা হইয়াছে। রবিবার রাত্রে পূজা গেল। মঙ্গলবার বিকালে বিসর্জনের সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। একটি বড় মোটর-বোট ভাড়া করিয়া সাধু ও ভক্তদের প্রায় ষাট-জনের একটি পার্টি দেবী-প্রতিমা লইয়া সমুদ্রের তিন মাইল অভ্যন্তরে চলিয়াছেন। কোরাস গান হইতেছে। আবার উহা যখন থামিতেছে

তখন দিগন্তহীন মহাসমুদ্রে শুধু মোটরবোটের ইঞ্জিনের শব্দ। সমুদ্রের মহাপ্রশান্তিকে সেই শব্দটুকু বিন্দুমাত্র চঞ্চল করিতে পারে না। আরোহীদের হৃদয়ে ইঞ্জিনের শব্দের সহিত তাল মিলাইয়া জগজ্জননীর নাম ধ্বনিত হইতেছে—কালী, কালী, কালী। স্বামী প্রভবানন্দজী কিছু পরে বোটটি থামিবার নির্দেশ দিলেন। এইবার দেবীপ্রতিমা মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে। আমাকে বলিলেন, একটি মায়ের গান গাহিতে। গাহিলাম 'মা ত্বং হি তারা।' বিকালবেলায় ভৈরবী সুর; তা আমেরিকার বিকালে তো ভারতের সকাল। আমেরিকানরা গানের শব্দ বুঝিতেছে না, তবে গানের মর্ম সুরের মাধ্যমে তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে এই গানটির একটি প্রাণস্পর্শী ঐতিহ্য আছে। অনেক আমেরিকান ভক্ত তাহা জানেন। ঠাকুর নরেনকে কালীমন্দিরে পাঠাইয়াছেন, সাংসারিক বিপত্তি-দূরীকরণের প্রার্থনা জানাইবার জন্য। পরিবর্তে নরেন্দ্র মন্দিরে মায়ের জীবন্ত চিন্ময়ীসত্তা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বারবার তিনবার চেষ্টা করিয়াও সাংসারিক প্রার্থনা মনে আনিতে পারিলেন না। ঠাকুর দুঃখিত ও আনন্দিত দুই-ই। দুঃখিত—কেননা নরেন্দ্রের সাংসারিক কষ্টের সুরাহা হইল না। হর্ষিত—কেননা সংসার নরেন্দ্রের জন্য নয়। যাহা হউক, এতকাল পরে নরেন্দ্রের কালীতে বিশ্বাস হইয়াছে। ঠাকুরকে ধরিয়াছেন, মায়ের গান শিখাইয়া দিতে হইবে। ঠাকুর গাহিয়া ঐ গানটি শিখাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র সারা রাত ঘরে এবং বারান্দায় পায়চারি করিয়া গাহিয়াছিলেন, 'মা ত্বং হি তারা।'

পরের দিন সকালে আমরা উভয়ে দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া হইতে উত্তরে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম। আমেরিকায় কালীপূজার স্মৃতি হৃদয়ে একটা বড় সম্পদ হইয়া থাকিবে।

ব্রত

শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু

বন্ধু, যখনি স্বার্থে লেগেছে ঘা—
তখনি বলেছ,—'তোমার সঙ্গে না'!
যখনি বলেছি,—'কর্ম পালিতে হবে'—
তখনি বলেছ,—'চলিলাম আমি তবে।'
সত্যের পথে যখনি দাঁড়াতে বলি,
তখনি শুনেছি,—'এবার তাহলে চলি।'
অন্যায় কাজে বলেছি,—'খড়্গ হানো'—
শুনি গুঞ্জন,—'নেতারে আর না মানো।'
বল, আজ শুনি, কিবা ছিল অপরাধ?
ন্যায় ও সত্যে হত্যা করিয়া, পুরিল কি মনোসাধ?
আবার আসিব, আবার হাসিব, আপন কর্মস্রোতে,
যা কিছু করেছি তাহাই করিব আমার সত্যব্রতে।

শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা

স্বামী তেজসানন্দ

ভারতের জীবনেতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মানবকল্যাণসাধনকল্পে যুগে যুগে এই পুণ্যভূমিতে এমন এক এক জন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহার সাধনাপূত অত্যুজ্জ্বল জীবন, চরমতত্ত্বজ্ঞানোপলব্ধি, সর্বজনীন আদর্শ ও শিক্ষা এবং শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রবহমান ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-ধারাকে আরও বেগশালী ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও মহিমময় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সহিত উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন,—"এই সেই প্রাচীন ভারতভূমি, অন্যান্য দেশে যাইবার পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান যে-স্থানকে নিজ বাসভূমিরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ; এই সেই ভারতভূমি, যে ভূমির আধ্যাত্মিক প্রবাহ জড়রাজ্যে সাগরসদৃশ প্রবহমান স্রোতস্বতীসমূহের তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উত্থিত হইয়া হিমশিখররাজিদ্বারা যেন স্বর্গরাজ্যের রহস্য-নিচয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ; এই সেই ভারত, যে ভারতভূমির মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠতম ঋষি-মুনিগণের চরণরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এইখানেই সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্য-উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছিল, এখানেই মানব-মন নিজ স্বরূপানুসন্ধানে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল, এখানেই জীবাত্মার অমরত্ব, অন্তর্যামী ঈশ্বর এবং জগৎপ্রপঞ্চ ও মানবে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত পরমাত্মাসম্বন্ধীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল এখানেই চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, আর এখান হইতেই আবার তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে। এই সেই ভারত, যাহা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত প্রকার রীতিনীতির বিপর্যয় সহিয়াও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সেই ভূমি, যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত হইতেও দৃঢ়তরভাবে এখনও দণ্ডায়মান। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মা যেমন অনাদি, অনন্ত ও অমৃতস্বরূপ, আমাদের এই ভারত-ভূমির জীবনও তদ্রূপ। আর আমরা এই দেশের সন্তান।"

সুদূর অতীতের মহাভারতীয় যুগে এই ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই রাজ্যসমূহ পরস্পরের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিত। মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়,—কুরু, পঞ্চাল ও অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্ব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে একটি ভয়াবহ সমরাঙ্গনে পরিণত করিয়াছিল! সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার পবিত্র নিকেতন এই ভারত অশান্তি ও অবিচার, নৃশংসতা ও অত্যাচারের রঙ্গমঞ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। অবহেলিত ও নির্যাতিতের মর্মন্তুদ আর্তনাদ নিয়ম ও শান্তি-সংরক্ষকদের অনেকের অন্তরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাইত

না। মাৎসর্যমদমত্ত আত্মবিস্মৃত স্বার্থান্বেষী ক্ষমতাসীন নৃপতিবৃন্দের অধিকাংশই শান্তিকামী প্রজাগণের অন্তরে ভীতি ও ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সঙ্কীর্ণতাপুষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ ধর্মীয় জগতের আবহাওয়াও বহুল পরিমাণে দূষিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দ্বাপরযুগে এমন একজন মহাপুরুষের আগমনের প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সমুন্নত আদর্শ ও শিক্ষা, বিচক্ষণতা ও সৃজনী প্রতিভা দ্বারা সেই যুগের জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধানপূর্বক পুনঃ প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাই নিপীড়িত মানবের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া পরম করুণায় জনচিত্তের অশান্তি-তুফানতুল্য বহিঃ-প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ ও ঝঞ্ঝার মধ্যে অজ অব্যয় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আত্মমায়াবশে নিষ্ঠুরতার মূর্তবিগ্রহ মথুরাধীশ কংসের কারাগৃহে অবতীর্ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণরূপে,—সাধুসজ্জনের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতি-কারীদের বিনাশ ও ধর্মস্থাপন করিবার জন্য; তথা সংসার-কারায় আবদ্ধ জ্ঞানচক্ষুহীন মায়া-মুগ্ধ মানবের মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে ও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে শুদ্ধা ভক্তি ও স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়া প্রকৃত শান্তি ও অমৃতপথের সন্ধান দিতে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত যে-সকল ব্যক্তির চক্ষু আজও চিত্ত-চমৎকারী জড়সভ্যতার তীব্র আলোকে ঝলসাইয়া রহিয়াছে, তাহাদের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত জীবন, শৌর্য-বীর্যগাথা, শ্রীবৃন্দাবন-লীলা প্রভৃতি যে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও প্রচণ্ড আক্রমণের বিষয়-বস্তু হইবে এবং তাহাদের দৃষ্টিতে যে এ-সকলই কল্পনা-বিলাসীদের নিছক কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব কাহিনী, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী পুরাতত্ত্ববিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আজও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন,—এই ভারতের বক্ষের উপর দিয়া অগণিত বৈদেশিক আক্রমণ ও ধর্মান্ধতাপ্রসূত অশোভনীয় গোঁড়ামির প্রবল তরঙ্গ শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন ধর্ম-সংঘ ও সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কালসমুদ্রের অতল গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যজীবন, পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা এখনও কোটি কোটি মানবহৃদয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার অফুরন্ত প্রেরণা ও পাথেয় যোগাইতেছে। বস্তুতঃ যাঁহারা আপনাদিগকে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তশুদ্ধি- ও আত্মজ্ঞানলাভাপেক্ষা বিষয়-ভোগকেই সর্বাধিক কাম্যবস্তু বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা ও জীবন-কাহিনী চিরদিনের জন্য রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইবে।

পুণ্যভূমি ভারতের অন্যতম ব্রহ্মবিদ্‌ ঋষি বেদব্যাস তদ্‌রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগ-বতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনের* যে পবিত্র লীলা অপূর্ব-ভাষায় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণালী আলেখ্য আজও ভক্তসমাজে চিরভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সে-লীলাকাহিনীর মধুর ঝঙ্কার অদ্যাপি শ্রদ্ধাশীল শুদ্ধচিত্ত ভক্তবৃন্দের শ্রবণে অনুরণিত হইয়া তাহাদিগকে

* "কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশাদ্‌ যৌবনং চ ততঃ পরম্‌।"
—১২শ অধ্যায় ৩৭ শ্লোকের
শ্রীমৎ শুকদেবকৃত সিদ্ধান্তপ্রদীপ তথা শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকা—দ্রষ্টব্য।

তদ্ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় আমরা দেখিতে পাই ভগবৎপ্রেমের বিচিত্র বিকাশ। দেখিতে পাই, কেমন করিয়া শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর-ভাবসমূহ এই লীলায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং মানবসুলভ পার্থিব ভালবাসা ঈশ্বরে সমর্পিত হইয়া কেমন করিয়া নিষ্কলুষ স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য, দেহাত্মবুদ্ধি অতিক্রম করিতে না পারিলে একদিকে যেমন বৃন্দাবন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজাঙ্গনাগণের পবিত্র প্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, অপর দিকে অসংস্কৃত মনবুদ্ধিসহায়ে সেই দিব্য প্রেমের আলোচনা মানবচিত্তকে ভগবন্মুখী না করিয়া অনেক ক্ষেত্রে স্বতই নিম্নগামী করিয়া থাকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের 'টান'-টাই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য তাহাদের মনের তীব্র ব্যাকুলতাকেই গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, ভগবানলাভের জন্য এই প্রবল ব্যাকুলতাই একনিষ্ঠ ভক্তসাধককে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তিমে এই স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী করিয়া তুলিতে সক্ষম।

কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং যৌবনসুলভ দুর্জয় তেজ বিক্রম ও বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী হইয়া তাঁহার বিচিত্রলীলা-জড়িত প্রিয় বৃন্দাবনকে অচিরে শান্তিপূর্ণ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বিশ্বহিতকল্পে যিনি নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, তিনি কি কখনও প্রাকৃত জনের ন্যায় সীমিত পরিমণ্ডলে নিবদ্ধ থাকিতে পারেন? কঠোর কর্তব্যের আহ্বানে, কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীগণের ও অপরাপর স্বজনবৃন্দের অপরিসীম স্নেহ, প্রীতি ও প্রেমের মধুর বন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিয়া তিনি নূতন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের এই অতুলনীয় লোকোত্তর নির্লিপ্ততার আদর্শ ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে চির উজ্জ্বল ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। যিনি কংস-কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার পিতামাতা ঐ কারাগৃহে শৃঙ্খলিত হইয়া অশেষ যাতনা ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তিনিই আজ স্বহস্তে হিংস্র পশুতুল্য কংসদৈত্যকে নিধন করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে স্থাপনপূর্বক যাদবরাজ্যে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অতঃপর বসুদেব যদুকুলপুরোহিত গর্গাচার্য ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপনয়ন-সংস্কার যথাবিধি সম্পাদন করাইলেন এবং উপনয়নান্তে উভয়ে দ্বিজত্ব-প্রাপ্ত হইয়া ও নিয়মনিষ্ঠ হইয়া আচার্যের নিকট হইতে গায়ত্র-ব্রত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সর্বজ্ঞ হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত অবন্তিপুরনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ সান্দীপনির শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক কিভাবে তাঁহার নিকট হইতে করিয়া সর্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-পঞ্চকে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রভবৌ সর্ববিদ্যানাং সর্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গুহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥৩০॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥৩১॥
যথোপসাদ্য তৌ দান্তৌ গুরৌ বৃত্তিমনিন্দিতাম্।
গ্রাহয়ন্তাবুপেতৌ স্ম ভক্ত্যা দেবমিবাদৃতৌ ॥৩২॥
তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রবাচ বেদমখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ ॥৩৩॥

সরহস্যং ধনুর্বেদং ধর্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা ॥
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ
ষড়্‌বিধাম্ ॥৩৪॥
সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ ॥৩৫॥

—অর্থাৎ যাঁহারা সর্ববিদ্যার উদ্ভবস্থল, লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যলীলার দ্বারা যাঁহারা নিজেদের স্বাভাবিক নির্মল জ্ঞান গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গুরুকুলে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া অবন্তিপুরনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় সান্দীপনি নামক মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৩০-৩১॥

তাঁহারা উভয়ে যথানিয়মে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া গুরুর প্রতি কিরূপ অনিন্দিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা অপর সকলকে শিক্ষা দিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে ও ভক্তি-সহকারে দেবতার ন্যায় গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরু সান্দীপনি তাঁহাদের বিশুদ্ধ-ভাবযুক্ত সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে উপদেশ করিলেন ॥৩৩॥

সান্দীপনি মুনি মন্ত্রজ্ঞান ও দেবতাজ্ঞানের সহিত ধনুর্বেদ, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা এবং সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়—এই ষড়বিধ রাজনীতি-বিদ্যা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে উপদেশ করিলেন ॥৩৪॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সর্ববিদ্যার প্রবর্তক নরবরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একবার গুরুর উচ্চারণমাত্রেই সমস্ত বিষয় শিখিয়া লইলেন ॥৩৫॥

কিন্তু সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্যের অবসান ঘটিল না। এই শিক্ষা তাঁহাদের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণের প্রস্তুতিমাত্র। তাহারই কিঞ্চিদাভাষ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভারতের মহাকাব্য মহাভারত সাক্ষ্য দেয়,—দুর্যোধনের পাণ্ডবদ্বেষের জন্য কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ জন্মান্ধ বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষভাবে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। যাহাতে ইহা পারস্পরিক বিদ্বেষে ও পরিণামে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত না হয়,—যাহাতে উভয়ের মধ্যে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে, তদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুর্যোধনপ্রমুখ শত-পুত্রকে হস্তিনাপুর প্রদান করিলেন এবং ইহারই অনতিদূরে পাণ্ডবদের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নামক অপর একটি নগর নির্মাণ করাইলেন। অচিরে এই নগর সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিল। অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এই ইন্দ্রপ্রস্থে দানবগণের বিশ্বকর্মা ময়দানব একটি অতুলনীয় সভাগৃহও নির্মাণ করিল, যাহা দর্শন করিয়া দূরদেশাগত রাজন্যবর্গ ও ঋষিমুনিবৃন্দ শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ এই নানারত্নভূষিত মনোরম সভাগৃহদর্শনে মুগ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণকে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। এই মহাযজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আহ্বান করিয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "রাজসূয়-যজ্ঞের যোগ্য অধিকারী আপনি। কিন্তু তৎপূর্বে প্রবল পরাক্রান্ত অত্যাচারী মগধরাজ জরাসন্ধ ও তাহার সহায়ক চেদিরাজ শিশু-পালকে নিধন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, জরাসন্ধ তাহার রাজধানী গিরিব্রজে বহু নৃপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে রুদ্রদেবতার প্রীত্যর্থে তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করিবার

জন্য।" অধিকন্তু তিনি ইহাও জানাইলেন যে, জরাসন্ধের অত্যাচারে তিনি তাঁহার রাজধানী মথুরা হইতে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভীম ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে ব্রত-ধারীর বেশে রাজধানী গিরিব্রজে প্রবেশ করিলেন,—উদ্দেশ্য জরাসন্ধকে বধ করা। জরাসন্ধ পাদ্যার্ঘ্য দিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে নিজের পরিচয় প্রদানপূর্বক বলিলেন, "আমরা ধর্মরক্ষার্থে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি রুদ্রদেবের নিকট বলি দিবার জন্য নির্দোষ রাজন্যবর্গকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। এখনই এইসকল নৃপতিকে মুক্ত করিয়া দাও; নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।" মদ-গর্বিত জরাসন্ধ তাঁহার আদেশপালনে অস্বীকৃত হইলে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেনের সঙ্গে প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চৌদ্দদিনব্যাপী এই মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধ শ্রান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িলেও, শক্তিধর ভীমসেন যখন তাহাকে নিধন করিতে সমর্থন হইলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধের পদদ্বয় দৃঢ়হস্তে উর্ধ্বে উত্তোলনপূর্বক তাহার দেহ দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, জরাসন্ধের জন্মকালে তাহার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জরা নাম্নী রাক্ষসী সেই দুই ভাগ এক সঙ্গে সংযোজিত করিয়াছিল বলিয়াই তাহার নাম জরাসন্ধ হইয়াছিল।

এইভাবে জরাসন্ধ নিধনপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বন্দী নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। মুক্তি-লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের সংকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া সেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে সানন্দে ও কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর চারি ভ্রাতা—ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে দিগ্বিজয় ও অর্থাদিসংগ্রহের উদ্দেশ্যে চারিদিকে যাত্রা করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানের রাজন্যবর্গকে বশীভূত করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। এই মহাযজ্ঞে কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রায় সকলেই মিলিত-ভাবে স্ব স্ব দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সর্বজন-পূজ্য হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণ-গণের পাদপ্রক্ষালনের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাসমারোহে এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। যজ্ঞান্তে পিতামহ ভীষ্মের নির্দেশে যুধিষ্ঠির উক্ত সভায় সমবেত সকলের মধ্যে তেজ, বল ও বিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূজ্যতম শ্রীকৃষ্ণকে সর্বোত্তম অর্ঘ্যটি প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে দাম্ভিক চেদিরাজ শিশুপাল ক্ষিপ্ত হইয়া ভীষ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নানা কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলে সর্বসমক্ষে স্বীয় সুদর্শন চক্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া এই মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—

"অপ্রমত্তো স্থিতো নিত্যং প্রজাঃ পাহি বিশাংপতে।
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ॥"—

অর্থাৎ, হে মহারাজ! আপনি সদা অপ্রমত্ত থাকিয়া প্রজাপালন করুন। জীবগণ মেঘকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করে; পক্ষিকুল আশ্রয় করে বৃক্ষকে। তেমনি বন্ধুজনেরা যেন আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতে পারেন।

ইহার কিছুকাল পরেই ভারতের রাষ্ট্রগগন ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন কপট দ্যূতক্রীড়ায় আহূত যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া সভাস্থলে দ্রৌপদীকে অপমানিত করিলেন, পাণ্ডবগণের রাজ্য হস্তগত করিয়া তাঁহাদের বনবাসে পাঠাইলেন এবং পরে কথামত তাঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়াও দিলেন না। ফলে কুরু-পাণ্ডবের কলহ অতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পরিণত হইল। হিমাচল হইতে কুমারিকা এবং গান্ধার হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত রাজন্যবর্গ রণসাজে সজ্জিত হইয়া কেহ কৌরবপক্ষে কেহ বা পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিলেন। এই সঙ্কটমুহূর্তে কুরু ও পাণ্ডব পক্ষের প্রতিনিধিদ্বয় যথাক্রমে দুর্যোধন ও অর্জুন দ্বারকাধামে শ্রীকৃষ্ণসমীপে এই আসন্ন মহাযুদ্ধে তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া গমন করিলেন। স্বল্প[illegible] দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা (সংশ[illegible] সৈন্যবাহিনা) লাভে পরিতুষ্ট হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্জুন আধ্যাত্মিক জগতের শিরোমণি সর্বজ্ঞ বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সৌখ্যলাভে ধন্য হইলেন। অতীত যুগের ইতিহাসে এই দুইয়ের মিলন গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। আজ দ্বারকাধামে মহাশক্তিধর পুরুষ-দ্বয়ের মিলনে যে শক্তি-উৎসের উদ্ভব ঘটিল, তাহাই শতধারে উৎসারিত হইয়া প্লাবনাকারে ভারতবক্ষে প্রবাহিত হইয়া যুগসঞ্চিত পুঞ্জীভূত আবিলতা ও কল্মষ ধৌত করিয়া পুনঃ শান্তি-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীকৌশিকচন্দ্র দাস

প্রভু মোর, দয়াময় !
এসো গো আমার হৃদয় আকাশে
জ্ঞানের আলোর বিপুল বিকাশে
তোমারে পাইলে আঁধারে করিব জয়
দূর হবে সব ভয় ॥

হেথা খেলা মিছামিছি
এ কথা তো আমি বুঝি ;
তবু বাসনায় অতৃপ্ত মন
শুনেও সে কথা বোঝে না কখনো—
সুমুখে যা কিছু পায়
'আমার' বলিয়া আঁকড়ি থাকিতে চায় ॥

আলোকে আঁধারে গড়া এ ভুবন
দেখায় আমায় কত প্রলোভন—
আসলে সে কিছু নয়,
তোমারে পাইলে সকলি আলোক
তুমি ছাড়া কিছু নাই—
তোমার আলোর পরশ লভিয়া
আঁধার করিব জয়
প্রভু মোর, দয়াময় ॥

স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১৩০৫-৬) 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে স্বামীজীর যে সরস ভ্রমণকাহিনীটি প্রকাশিত হয়, উহার চলিত-রূপের বৈশিষ্ট্য সমকালীন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে চমকপ্রদ ছিল, সন্দেহ নাই। তৃতীয় বর্ষ হইতে রচনার নাম হয় 'পরিব্রাজক'। স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার আমেরিকা ও ইয়োরোপ-পরিক্রমার পটভূমিকায় রচিত এই 'পরিব্রাজক'-গ্রন্থটি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-কাহিনী। স্বভাবতই এই পরিক্রমা-কালে স্বামীজীর অন্তরে ভারত তথা প্রাচ্য আদর্শ ও য়ুরোপ তথা পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক মূল্যায়ন দেখা দিয়াছে। সেই তুলনামূলক আলোচনারই মনোজ্জ্বল রসসমৃদ্ধ প্রকাশরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনাটি 'উদ্বোধন'-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৬-৭) হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বঙ্গমনীষা রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—এই তিন জনের মাধ্যমে ভারত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনসাধনকল্পে সাংস্কৃতিক দূত প্রেরণ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ কালের দিক হইতে ইঁহাদের অনুজ হইলেও পাশ্চাত্যের নিকট ভারত তথা প্রাচ্যের অধ্যাত্মমহিমা ঘোষণা এবং পাশ্চাত্যের রজো-গুণদীপ্ত জীবনপ্রবাহ ভারতে সঞ্চারের প্রয়াসের দ্বারা তিনি যে ভাব-বিনিময়ের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই পাশ্চাত্যের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর ধারণা আমূল পরিবর্তিত হয়। একদিকে 'চিকাগো বক্তৃতাবলী' অন্যদিকে 'ভারতে বিবেকানন্দ'-গ্রন্থে বিধৃত প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত ভারতব্যাপী অভিনন্দনের উত্তররূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী— স্বামীজীর চিন্তাধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনামূলক বিচারের পটভূমি।

আমেরিকা-গমনের অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমার দ্বারা রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রজনের পর্ণকুটির, সর্বত্র ভারতবাসীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া আপাত-ম্রিয়মাণ ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিদেশকে ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বদেশকে পরিপূর্ণভাবে জানা। আবার প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিভ্রমণের ফলে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-পরিক্রমা-কালে সেই অভিজ্ঞতার পরিমার্জনার দ্বারা তিনি ভারতীয় বা প্রাচ্য সভ্যতার সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে আরও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন। স্বামীজী মনে-প্রাণে অনুভব করিতেন যে, বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে বিশেষ বাণী ছিল, তেমনি তাঁহারও জীবনোদ্দেশ্যের অন্যতম পাশ্চাত্যের প্রতি বিশেষ বাণী। সেইসঙ্গে একথাও ঘোষণা করিয়াছেন—"পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে আমার বাণী বলিষ্ঠ, প্রাচ্যবাসীদের উদ্দেশ্যে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।"

স্বামীজীর জীবনের সমগ্র ধ্যানধারণার মূল উৎস এই স্বদেশ-জননীর যে বাণী সমগ্র

বিশ্বের অবগতির জন্য ঘোষণা করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে 'India's Message to the World' —নামে একটি গ্রন্থের প্রাথমিক সূচনাও তিনি করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ না হইলেও উহার প্রথম সূচনায় সূত্রাকারে 'জগতের প্রতি ভারতের বাণী'-র যে মূল বক্তব্যসমূহ বিধৃত, তাহাদের অবলম্বন করিয়া স্বামীজীর বিস্তৃত রচনা ও ভাষণাবলীর সাহায্যে এ বিষয়ে স্বামীজীর সমগ্র চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের অধিকাংশ ইংরেজী-শিক্ষিতের মতো স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের পদতলে বসিয়া বিদেশী বিদ্যা-অর্জনে উৎসাহী ছিলেন না। প্রয়োজনমত বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতার শ্রেয় দিকগুলিকে গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে ভারতীয়ভাবে আত্মস্থ করাই তাঁহার আদর্শ। মনে রাখিতে হইবে, তাঁহার ধারণায় আগামী যুগের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল য়ুরোপ নহে, ভারতবর্ষ। 'উদ্বোধন' পত্রিকার আদর্শ-আলোচনা-প্রসঙ্গে (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এ দ্রষ্টব্য) তাঁহার 'প্রস্তাবনায়' ('ভাববার কথা'-গ্রন্থে পরিবর্তিত নাম 'বর্তমান সমস্যা') তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের আসন্ন 'সম্মিলন-কাল'-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান; একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা; একের মূলমন্ত্র 'ত্যাগ', অপরের 'ভোগ'; একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী; একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত; একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ; একজন ইহলোক-কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ; একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন; অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।...ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রতি-বাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনের' জীবনোদ্দেশ্য।"

স্বামীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীই বিস্তৃত বিশ্লেষণে ও চলিতভাষার সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-গ্রন্থে অভিব্যক্ত। বলা বাহুল্য, ভারতের সব মানুষই যে অধ্যাত্ম আদর্শে সমুন্নত অথবা পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তিই যে ঐহিক সুখে আসক্ত—এমন কথা স্বামীজীর অভিপ্রেত নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান মানসপ্রবণতার দিকটিই তাঁহার আলোচনার বিষয়। ব্যতিক্রম সব দেশেই সম্ভব।

বাংলা গদ্যের চলিত ভাষার ইতিহাসে এই গ্রন্থখানির বিশিষ্ট স্থান সকল শ্রেণীর সমা-লোচকই স্বীকার করেন। উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' গ্রন্থদ্বয়ে চলিতভাষার যে উদাহরণ দেখা যায়, তাহা ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপেক্ষা বৈচিত্র্যের উদাহরণরূপেই গ্রহণীয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র ভাষাই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে চলিত-ভাষার প্রয়োগের দিক হইতে সর্বাগ্রে

উল্লেখযোগ্য। 'আলালের ঘরের দুলালে'র মূল ভাষা সাধু হইলেও সংলাপের ক্ষেত্রে চলিতভঙ্গিমার প্রকাশে প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব অসাধারণ। 'হুতাম পঁ্যাচার নক্সা'র ভাষায় কলিকাতার স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র প্রকাশ গ্রন্থটির আদ্যন্ত ইহার বিষয়বস্তুকে রঙ্গরসে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাভঙ্গিমায় চলিত ভাষার প্রভাব দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে লেখা য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (১২৮৮) এবং য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী (লেখার সময়: ২২শে আগস্ট—৪ঠা নভেম্বর, ১৮৯০; বাংলা ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) বই দুটিই বিবেকানন্দপূর্ব বাংলা গদ্যের ইতিহাসে চলিত-ভাষার রচনারূপে উল্লেখ-যোগ্য। সমকালে লিখিত তাঁহার 'পত্রাবলী'র ভাষাকৃতিত্ব এ ক্ষেত্রে আরো বেশী স্মরণীয়। তবু প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে সবুজপত্রে (১৯১৪) নিয়মিত লেখা শুরু করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যকে তাঁহার রচনার বাহন করিতে পারেন নাই। 72200

প্রথম বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকায় চলিত ভাষায় রচিত স্বামী বিবেকানন্দের "ভাববার কথা" শীর্ষক কাহিনীগুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার পরেই 'বিলাতযাত্রীর পত্র' (১লা ভাদ্র, ১৫শ সংখ্যা, ১৩০৬ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যা হইতে তৃতীয় বর্ষের ১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সংখ্যা অবধি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রকাশকাল। ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ সংখ্যাটির দুই সংখ্যা আগে (১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭) 'বর্তমান ভারত' পরিসমাপ্ত হয়। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-রচনার সূচনায় ভাষাভঙ্গী যে বর্তমান ভারতের অনেকটা অনুরূপ, সেকথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিছু পরেই অবশ্য সংস্কৃত ভাষার সংহত ভঙ্গিমা পরিবর্তিত হইয়া চলিতভাষার জোয়ার দেখা দিয়াছে। স্বামীজীর মূল বাংলায় লেখা গ্রন্থ-হিসাবে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ই ১৩০৯ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত; 'পরিব্রাজক' ও 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩১২ সালে; 'ভাববার কথা' ১৩১৪ সালে। গ্রন্থাকারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-প্রকাশকালে স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে প্রাপ্ত অংশ যোগ করা হয়। গ্রন্থ-সমাপ্তির ধরনে মনে হয় স্বামীজীর ভবিষ্যতে আরও কিছু বক্তব্য-সংযোগের কল্পনা ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যরীতি-আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার 'পত্রাবলী' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পূর্বে এই পত্রাবলী পাঁচ ভাগে (প্রথম ভাগ—১৩১১) প্রকাশিত ছিল। ১৩৫৫ ও ১৩৫৬ সাল হইতে দুই ভাগে সমগ্র পত্রাবলী প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই 'পত্রাবলী'র গদ্যে স্বামীজী সাধু ও চলিত দুই ধরনের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে লিখিত স্বামীজীর পত্রা-বলীতেই ধীরে ধীরে সাধু হইতে চলিত ভাষায় আত্মপ্রকাশের সূত্রপাত। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র ষষ্ঠ খণ্ডে বিধৃত ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩ তারিখে শ্রীহরিদাস মিত্রকে এবং ১৯শে মার্চ, ১৮৯৪ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা পত্র দুইটিতে স্বামীজীর এই ভাষাগত বিবর্তন লক্ষণীয়। দ্বিতীয় পত্রটি হইতে স্বামীজীর একালের গদ্যভঙ্গীর প্রাসঙ্গিক উদাহরণ— "দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে ব'সে, ভারতবর্ষের শেষ পাথরটুকরার উপর ব'সে -

এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। 'খালিপেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবনযাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।"

'উদ্বোধন'-পত্রিকা-প্রকাশকালে বাংলা-ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে দুই ধরনের বক্তব্য স্বামীজীর মনে দেখা দিয়াছিল। এক, "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন"[১]—তাঁহাদের ব্যবহৃত সর্বজনবোধ্য ভাষা। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সেই ভাষাভঙ্গিমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দুই, "বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়"।[২]—এই সচেতনতার ফলে সৃষ্ট সাধুগদ্যের অভিনব রীতি, যাহার সর্বোত্তম প্রকাশ স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত'

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গ্রন্থচতুষ্টয়ের মূল বিষয় 'ভারতচিন্তা'। কিন্তু এই ভারতকে কেন্দ্র করিয়া বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিশ্বপরিক্রমায় রত। সেদিক হইতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দুই জীবনাদর্শের আচার-বিচার, অশন-ভূষণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক পরম লক্ষ্য অবধি উভয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ অবধি অনতিক্রান্ত গ্রন্থ

১ উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩০৬ 'স্বামী বিবেকানন্দের পত্র' দ্রষ্টব্য। ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০০ তারিখে লেখা এই পত্রের 'কিয়দংশ' ক্ষুদ্র অক্ষরে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে ঐ সংখ্যায় পরিচিত। পরবর্তী কালে 'ভাববার কথা'-গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামই বহাল থাকে। 'বাণী ও রচনা' : ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রঃ।

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : বাণী ও রচনা ৯ম খণ্ড : পৃঃ ৯৩

স্বামী সুন্দরানন্দ-সম্পাদিত ১৩৫৪ সালের সুবর্ণ জয়ন্তী-সংখ্যা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের 'উদ্বোধনের জয়যাত্রা' প্রবন্ধের অংশবিশেষ এ-প্রসঙ্গে পাঠকচিত্তে আগ্রহ-সঞ্চার করিবে—"দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গ-দর্শন'-প্রকাশের কিছুদিন পরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর লেখকের নিকট আসিয়া 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাহিলেন। লেখক বলিলেন, 'কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে উহা পড়িবার জন্য সাধিয়াছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গ-সাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া দেখুন—বলিয়া বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়িতে চাহেন নাই। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হইল?' দীনেশচন্দ্র বলিলেন, 'আমি এই মাত্র রবিবাবুর নিকট থেকে তোমার কাছে আসছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করছিলেন। আমি উহা পড়ি নাই শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বল্লেন, "আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বই-খানি পড়বেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে, তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব, তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।"

ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধি-দীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গী, বিদগ্ধ পরিহাসনৈপুণ্য এবং ভারতাত্মার গভীরতম ধ্যানসত্যের মিশ্রণে বাংলা গদ্যের চিরোজ্জ্বল আদর্শসৃষ্টির নিদর্শন-রূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অক্ষয় কীর্তি

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র

তারকনাথ ঘোষ

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদটি—যেটির কিছু অংশ 'স্বদেশমন্ত্র' নামে খ্যাত সেটিতে স্বামী বিবেকানন্দের ভারত সম্বন্ধে সব চিন্তা যেন বীজাকারে কেন্দ্রীভূত। যে বিবেকানন্দ চলিত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি এই গ্রন্থে উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে গাঢ়-নিবদ্ধ সাধুভাষায় ধ্রুপদী আদর্শে ভারতবাসীর কাছে তার চিরায়ত জীবনধারার সত্যটি ঘোষণা করেছেন। স্বদেশমন্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দ সজীব। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন,

'একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জগতঃ স্বর্গে
লোকে চ কামধুগ্ ভবতি।'

স্বামীজী যে-সব শব্দের সুপ্রয়োগ করেছেন, সেগুলির অর্থ যদি সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি করা যায় তাহলে তা থেকে চতুর্বর্গই লাভ হবে। 'স্বদেশমন্ত্র' নামটি কে দিয়েছিলেন জানি না। যিনিই দিয়ে থাকুন, এই নামকরণ সার্থক—বিবেকানন্দের এই বাণী মন্ত্রের মতোই তেজোগর্ভ, শক্তিসঞ্চারী।

মন্ত্রের সূচনাতেই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান—'হে ভারত'! উনিশ শতকের সব মনস্বী পুরুষের মতোই স্বামী বিবেকানন্দ ভারত-পথিক। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে তিনি এখানে অন্য বাণী প্রচার করতে চাননি; সারা বিশ্বে তিনি অমৃতের বাণী শুনিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ফিরে এসে ভারতবাসীকে শুধু জাগাতে চেয়েছেন। এই চাওয়ার মূলে আছে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রেম। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বিবেকানন্দ-চরিত' থেকে একটা ঘটনার বিবরণ পড়লেই বোঝা যাবে ভারতবর্ষকে তিনি কতখানি ভালো-বাসতেন।—

"লণ্ডন পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী! চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরবমুকুটধারী মহাশক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃ-ভূমি কেমন লাগিবে?' স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্যভূমিতে আসিবার পূর্বে ভারতকে আমি ভালবাসিতাম; এক্ষণে ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পবিত্রতামাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থস্বরূপ।'"

বিবেকানন্দেরই কথা—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—ভারত জাগবেই নিজস্বতা নিয়ে এবং সমগ্র বিশ্বকে যুগোপযোগী কল্যাণপথ দেখাবেই। শুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতিতে বিবেকা-নন্দের চেতনা সদাসমুজ্জ্বল থাকলেও তিনি অন্য সাধনা বাদ দিয়ে দেশজননীকে আগামী পঞ্চাশ বৎসরের জন্য একমাত্র উপাস্য দেবতা করতে বলেছিলেন—দেশসেবাকেই ধর্মসাধনায় রূপায়িত করতে বলেছিলেন। ইহা নবযুগের বাণী—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।

'হে ভারত ভুলিও না'—। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। এই আত্মবিস্মৃতি শুধু বাঙালীর নয়, সারা ভারতবাসীর। উনিশ শতকে যখন ইংরেজের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের সভ্যতার ঢেউ আমাদের দেশে এসে পৌঁছল তখন নগর বা নগরোপকণ্ঠ-

বাসী সমাজের একটা সেরা অংশ তাতে ভেসে গেল। পশ্চিমের সাহিত্য, পশ্চিমের দর্শন, পশ্চিমের ইতিহাস—পশ্চিমের সংস্কৃতির সব কিছুই তাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে উঠেছিল। মেকলে এ দেশকে ইংলণ্ডের নয়া সংস্করণ বানাবার কল্পনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর ঐ কল্পনা এ দেশের সে-কালীন ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজেরই আশার প্রতিচ্ছবি। আলোর একটা ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এই পরানুবাদ আত্মহননেরই সামিল। সে যুগের মনীষিমাত্রেই আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। আত্মবিস্মৃতি পতনের সবচেয়ে বড়ো কারণ; আত্মবোধই প্রতিষ্ঠার মূলগত প্রেরণা। আমরা তখন জাতীয় আদর্শ ভুলে ছিলাম; মাঝে একটু জেগে আবার ভুলেছি। তাই স্বামীজীর 'হে ভারত, ভুলিও না'-র প্রয়োজন তখন যতখানি ছিল, এখনো ততখানিই বা তার চেয়ে বেশী।

বিবেকানন্দ ভারতকে প্রথমে তার নারী-জাতির আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানতেন যে, জাতির অর্ধাংশ নারী, দুই পক্ষে ভর দিয়েই বিহঙ্গের নভোযাত্রা—এক পক্ষ দুর্বল হলে ঐ যাত্রা শুধু যে ব্যাহত হবে তা নয়, তার পতন অবশ্যম্ভাবী। নারীশক্তি যদি অনুকূল হয় তবেই পুরুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সারদাদেবীর পুণ্য ছবি বিবেকানন্দের হৃদয়ে নিরন্তর ভাস্বর ছিল। আমেরিকায় নারীর যে শক্তিমূর্তি তিনি দেখেছিলেন তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে জগদম্বা বলে স্মরণ করেছিলেন। নারীর অভ্যুদয় তাঁর কাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু নারীজাগরণের নামে বিলাসমগ্ন পশ্চিমের নারীসমাজের আদর্শের অন্ধ অনুকরণ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তিনি ভারতীয় নারীর কাছে ভারতীয় জীবন-কল্পনায় আদর্শায়িত তিনটি নারীর উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের গগনে চির-ভাস্বর সেই তিন নারী—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

সীতা-চরিত্রের মর্মবাণী তাঁর পতিগত-প্রাণতা, তাঁর অপার সহিষ্ণুতা। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে স্বামীই তাঁর একমাত্র ধ্যান। কৃত্তিবাসের সীতা সুশীলা কোমলা বঙ্গবধূ—কিন্তু বাল্মীকির সীতার চরিত্রে যেন একটা নিগূঢ় শক্তি আছে। ধরিত্রীকন্যা সর্বংসহা হয়ে অসামান্য ধৈর্য আর নম্রতার পরিচয় দিয়ে পাতিব্রত্যধর্ম পালন করেছেন। কৈকেয়ীর পণ-পূরণের জন্য যখন রাম বনবাসে যেতে উদ্যত, তখন তিনি তাঁর সহচারিণী হতে চেয়েছেন, বনের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেননি। রাবণ-বধের পর যখন তাঁকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হল তখন তিনি রাঘবের ধ্যান করতে করতে অগ্নি-প্রবেশ করেছেন। অযোধ্যার রাজসভায় যখন আবার পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব উঠল, তখন কি এই সাধ্বীর অন্তর বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছিল, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সেই জন্যই কি সর্বংসহা জননী পৃথিবীর কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন? কিন্তু তখনও রামময়জীবিতা কোন অভিযোগই করেননি রামের বিরুদ্ধে, তাঁর সারা সত্তা অনির্বাণ পতিপ্রেমের স্থির দ্যুতিতে অপরূপ।

সীতার মধ্যে প্রেমের শান্ত শ্রী; সাবিত্রীর মধ্যে প্রেমের সঙ্গে আশ্চর্য তেজ মিশেছে। সাবিত্রী আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্যমানা। চারিত্রদীপ্তি তাঁর প্রেমকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। সত্যবানের সঙ্গে পরিণয়ের পর তাঁর বর্ষকালের জীবন তো একটা বিপুল সাধনা! সত্যবানের মৃত্যুর পর যমরাজের সঙ্গে তাঁর আলোচনা প্রেমের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিলনের অতুলন দৃষ্টান্ত।

সীতা একটা অলৌকিকী দীপ্তি, সাবিত্রী সবিতৃমণ্ডলের দ্যুতি, আর দময়ন্তী যেন 'প্রেমগগনে চিররাকা'। নলের প্রেমে দময়ন্তী দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন; কলিপীড়িত নলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় বনবাসিনী হয়েছেন; কলির ছলনায় হৃতবাস নলের সঙ্গে একবাসা হয়েছেন; নল যখন ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চলে গেলেন ভীমরাজদুহিতা তখনও পিতৃগৃহে সম্পদের মধ্যে আশ্রয় না নিয়ে সৈরিন্ধ্রীর জীবন যাপন করেছেন।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—হ্রী, ধী, শ্রী। এঁরা নারীদেহধরা—মানবী; নারীত্বের পরিপূর্ণ সম্পদে এঁরা জীবনকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই তিন আদর্শ ভারতের নারী-সমাজকে যুগ যুগ ধরে শক্তি দিয়ে আসছে; স্বামীজী জানতেন এই তিন আদর্শের অনু-গামিনী হলেই ভারতীয় নারীর জীবন বিকশিত কোকনদের মতো অনুপম হয়ে উঠবে।

'ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।'—দেবাদিদেব মহাদেব ভারতবাসীর সভক্তি উপাসনার মহৎ আশ্রয়, বিশেষতঃ সন্ন্যাসিগণের।

ধ্যানতন্ময় যোগেশ্বরই ত্যাগিগণের উপাস্য। কিন্তু এই আদর্শ সর্বমানবের নয়। যে মহাদেব তপশ্চারী একক, তাঁর আরাধনা সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব, কিন্তু গৃহীর জীবনের আদর্শ শিবশক্তির মিলিত মূর্তি

স্বামী বিবেকানন্দ যে বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন তার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। 'উমানাথ'! উমা-নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কালিদাস বলেছেন,

উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥

'উমা-'নামের সঙ্গে তপশ্চরণের ভাবনাটি সংযুক্ত। দেবদেবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিসম্পাতে পঞ্চশর দগ্ধ হবার পর, পার্বতীকে কঠোর তপস্যা করে শিবলাভ করতে হয়। পঞ্চতপা অপর্ণা উমাই নারীত্বের—দেবীত্বেরও চরম আদর্শ। এইজন্যই 'উমানাথ' বিশেষণ। সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ উভয়েরই আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি বিবেকানন্দের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কি?

অপর দুটি বিশেষণও তাৎপর্যময়। অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহলক্ষ্মী তিনি সর্বত্যাগী। কবির কল্পনা তাঁকে ভিখারি করে ছেড়েছে। যিনি বিশ্বেশ্বর তাঁকে সর্বত্যাগিরূপে উপাসনা করতে পারলেই ভোগের বাসনা দূর হয়ে যেতে পারে। তিনি শঙ্কর—কল্যাণকারী। তিনি বিশ্বের শিবসাধন করছেন- এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কল্যাণব্রতে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের শেষার্ধের নির্দেশ—
'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥' 'সেইহেতু ত্যাগের দ্বারা (অথবা তাঁর ত্যক্ত বস্তু দ্বারা) ভোগ কর, কারও ধনে লোভ কোরো না। বিবেকানন্দের বাণী যেন এই উপদেশকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। কেবল যে পরের ধনে লোভ করবে না তা নয়, নিজের বস্তুতেও লোভ করবে না। 'ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।'—বিবেকানন্দ সমাধিতে নিমগ্ন থাকতে চেয়েছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে হীন বুদ্ধি বলে-ছিলেন। বিশ্বজগতের মুক্তিই তাঁর জীবনাদর্শ। জীবন থেকে স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে—পরার্থে জীবনোৎসর্গই বিবেকানন্দের শিক্ষা।

কিন্তু এই পরহিতব্রতসাধন একটা শুষ্ক আদর্শ নয়। এর মূলে আরও অনেক বড়ো একটা চেতনা আছে। 'ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট-মহামায়ার ছায়ামাত্র।' তোমার কাজ বা আমার কাজ নয়, সবই মায়ের। সেই নিগূঢ় শক্তি, গুণাশ্রয়া গুণময়া মহামায়ার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের এই জন্ম। শুধু তাই নয়, সবই মা! সব কাজই তাঁর পূজা। এই হল বিবেকানন্দের 'বনের বেদান্তকে ঘরে টেনে আনা।' এই যে বিরাট মানবসমাজ ব্রহ্মময়ী জগদম্বার সৃজনলীলার একটি কণা, গুণাতীত ব্রহ্মেরই রূপ, এর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করতে হবে। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা; 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই চিরায়তা মহাবাণীর ক্রিয়াত্মক প্রকাশ; 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য চৈতন্যের গভীরে উপলব্ধি করার জন্য প্রেরণাবিদ্ধ জীবনের সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে প্রতিফলিত! সবই মা, সবই কালী! 'ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'—এ পশ্চিমের মানবতাবাদ বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ধুয়া নয়। এই উপলব্ধির মূলে আছে অদ্বৈত অনুভূতি। এই বিশ্বসংসার সেই জননী থেকে সমুদ্ভূত! চৈতন্যের একটি অখণ্ড প্রবাহ, সৃষ্টির মূল উপাদানের উপলব্ধির উপনিষদ্!

কিন্তু এ শুধু কথার কথা নয়। জীবনে এই সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন যে, ক্ষীণপ্রাণ আমাদের পক্ষে এই বিরাট ভাবনা করা সম্ভবপর নয়। পাছে আমরা এই সুমহতী কল্পনার কাছে ভীত সংকুচিত বিহ্বল হয়ে পড়ি এই জন্য তিনি প্রথমে আমাদের বীর্য জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—কঠোপনিষদের এই বাণী তাঁর কত প্রিয় ছিল! ভারতবাসীর অন্তরে সাহস সঞ্চার করে তিনি তাকে উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর।'—বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের শক্তিভূতা সনাতনীর উপলব্ধি ক্ষুদ্র চেতনায় সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই বুঝি তিনি ভারত-বাসীর কাছে দেশজননীকে সেই মহামায়ার প্রতিমূর্তিরূপে স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশজননীর সেবার মধ্য দিয়েই বিশ্বজননীর আরাধনার পথ প্রশস্ত হয়; স্বদেশবাসীর সঙ্গে আত্মিক সংযোগের অনুভূতিই তো বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে অভেদ-মিলনের ভাবনায় প্রথম পদক্ষেপ। স্বদেশমন্ত্রেই সাধনার শুরু। তিনি তিনি বলেছেন, 'সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারত-বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' ভারত-বর্ষের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এই একাত্মবোধের উৎস হবে প্রেম। অন্তরে প্রেম না থাকলে কোনো সত্যকেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায় না। ভারতের সব কিছুকে ভালবাসতে হবে। ভারতের মানুষের সঙ্গে প্রাণের সংযোগ অনুভব করতে হবে; ভারতকে সারা অন্তর দিয়ে নিজের করে নিতে হবে। বিবেকানন্দের বাণীতে ভারতের আত্মার সঙ্গে সংযোগের এই উপলব্ধিটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের

সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

কেবল ঘোষণায় আদর্শ সম্পর্কে একটা চেতনার আবছায়া অন্তরে জাগে। কিন্তু জীবনে যদি তার প্রতিষ্ঠা না হয় তাহলে তা নিছক বুলিমাত্র থেকে যায়। মহৎ আদর্শকে জীবনে ফলবান্ করে তুলতে হলে ঐকান্তিকী সাধনা চাই, আর চাই দৈবী করুণা। কালের বিচিত্র বিধানে ধর্মক্ষেত্র ভারত আজ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু পশ্চিমের অনুকরণে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের বিশিষ্টতা যাই হোক না কেন, জীবনে যদি গভীর ধর্মবোধ অনুস্যূত না হয় তাহলে এখানে সব সাধনাই নিষ্ফল হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই গৌরীনাথ আর জগদম্বার কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেছেন, সেই সঙ্গে মানুষের জীবনসাধনার যেটি সবচেয়ে বড়ো জিনিস সেইটি চাইতে বলেছেন: "আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর'।"

এইটাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। ঐ মনুষ্যত্ববোধ—পরিপূর্ণতার চেতনা নেই বলেই আমাদের জীবন জড়তায় আচ্ছন্ন, ক্লেদাবিল। ক্ষুদ্রচিত্তদৌর্বল্য পরিহার করে আত্ম-জাগৃতির সাধনাই প্রথমে করতে হবে। মানুষ মনুষ্যত্বের সাধনায় যতই এগোবে ততই জীবনে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ যদি মানুষ হতে না পারে তাহলে সাধনায় সিদ্ধির প্রশ্ন নিরর্থক।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

১

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Belur Math,
1st. April,
1902

My Dear Sasi Maharaj,

Alasingaকে যে পত্র লিখিয়াছি তাহাতে নরেনের সংবাদ পাইয়া থাকিবে। নরেন এখন ভাল আছে। নুনজল বন্ধ করিয়া treatment হচ্ছে। আশা করা যায় আর একমাসে খুব একদম ভাল হইয়া যাবে। কোন চিন্তার কারণ নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় আবার বেশ সারিয়া যাবে। তোমার grand utsav হয়েছে শুনে বড় খুশী সকলে।

শরৎ বোধ হয় Benaras Centre খুলতে শীঘ্র যাবে। তুমি কেমন থাক মধ্যে ২ লিখে খুশী করবে। ইতি—

With love to you & Basanta.

Yours afftly.
Rakhal

২

[স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণ ভরসা

Math, Belur
13th, Feb.
1903

My Dear Pessan,

অদ্য Registered চিঠির ভিতর ১৬ শত টাকার Govt. Paper পাঠাইলাম। প্রাপ্তি-সংবাদ পাইবামাত্র পত্রে (খামের ভিতর) লিখিয়া পাঠাইবে। যেখানে তোমার সহি করিতে হইবে তথায় Pencil [দিয়া] × mark দিয়াছি। সে লাইনটির উপরে সই করিবে। তোমার নাম উক্ত কাগজে যেরূপ spell করা আছে সেইরূপ সই করিবে। একখানাতে একরকম আর তিনখানিতে আর একরকম। সই করিবার পূর্বে spelling দেখিয়া ঠিক সেই রকম করিবে।

তুমি শীঘ্র আবার সই করিয়া Registered envelopeর ভিতর পুরে পাঠাইবে। ভাল করিয়া যেন Seal করিয়া দেওয়া হয়; কারণ শুধু Registered letter খোয়া গেলে Govt. দায়িক নহে। এজন্য বিশেষ সতর্কের সহিত উপরে গালার Seal করিয়া দিবে।

আমি ধার করিয়া Kankhal [-এ] 1500/- জমি ক্রয় জন্য পাঠাইয়াছি। তোমার সই হইলে পর আমি সই করিয়া বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা শোধ করিব।

আশা করি তুমি ভাল আছ।

With love and greetings.

Yours afftly.
Rakhal

৩

[স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত]

(ইংরেজী হইতে অনূদিত)

The Math,
15th Jan. 1904

My Dear Khanda Dada,

আমাদের প্রিয় স্বামীজীর জন্মতিথি বেশ সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পাইয়াছেন। নিবেদিতা খুব বাগ্মিতার সহিত এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াছিল। তাহার ভাষণ বাস্তবিকই অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সে সত্বরই তোমার ওখানে যাইবে এবং তোমার কাজের সাহায্যের জন্য কিছু করিবে। পরে তোমাকে জানাইব। তোমার ভালবাসা ও প্রীতিপূর্ণ পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তোমার চিঠি পড়িয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে, তোমার প্রতি আমার সেই পূর্বেকার আকর্ষণ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। ভাল কথা, ভায়া, আমার মোটা রেশম কোথায়? যত সত্বর পার উহা পাঠাইয়া দাও। সার্টের অভাবে আমার খুবই অসুবিধা হইতেছে। তুমি যেমন একটা থান দিয়াছিলে, সেই রকমের হইলে বড় ভাল হয়। শীঘ্র পাঠাইবে। ভালবাসাদি জানিবে।

Yours affly.
Brahmananda

৪

[স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে লিখিত]

The Math, Balur
23rd. Feb. 1904

My Dear Pessan,

তোমার Telegram কল্য পাইয়াছি। অদ্য registered যোগে Govt. Paper of Rs. 700/- দুই কেতায় ও নগদ C. notes একশত পাঠাইলাম পত্রপাঠ acknowledge করিবে।

যেরূপ spelling Girish Babu Bankতে endorse করিয়া দিয়াছে সেইরূপ spelling তুমি লিখিবে। তা না হলে বিক্রয় করিবার অসুবিধা হইবে। যেখানে Pencil দিয়া × mark দিয়াছি সেইখানে সহি করিবে।

উৎসব বেশ হয়ে গেছে। তোমার ওখানকার সবিশেষ লিখিবে, আমার নিকট বক্রি ৮০০ শত ছিল, কল্যাণকে ইতিপূর্বে একশত পাঠাইয়াছি। অদ্য অন্য তহবিল হতে ১০০৲ ধার করিয়া পাঠাইলাম, Building fund-এ জমা করিয়া লইতে বলিবে। কাগজ বিক্রয় হলে শীঘ্র বক্রি সমস্ত টাকা পাঠাইয়া দিব। তুমি Girish বাবুকে একখানা পত্র লিখিবে যে আমি থাকিয়া Plan করিয়া বাটীর কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। Excuse haste, more in my next.

Affly yours
Brahmananda

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণ ভরসা

The Math,
Belur, P. O. (Howrah)
Dated 5. 3. 09

ভাই শশী,

শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় এখানকার উৎসব একরূপ হইয়া গেল। তুমি আর কতদিন শ্রীশ্রীমহারাজজীকে ওখানে রাখিবে। সকলেই মহারাজজীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে। এখানে মহারাজজীর উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়, সেই সঙ্গে তোমার উপস্থিতি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কৃপা করে আমাদের একবার দর্শন দিয়ে যাও ইহা সকলেরই ইচ্ছা। মহারাজজী কবে আসিবেন সকলের মুখে কেবল এই কথা। তাঁহাকে আটকে রাখা তোমার আর উচিত হয় না। মহারাজের ও তোমার শরীর কেমন আছে? শুনিলাম শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শরীর খেটে খেটে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। শরৎ ভায়া শীঘ্র তথায় গিয়া শ্রীশ্রীমাকে কলিকাতা আনিবার চেষ্টা করিবে। মঠের জলবায়ু আজকাল ভাল। কিন্তু মহারাজ না থাকায় সকলই নীরস। মহারাজজীকে আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইবে ও তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা জানিবে। আর আর ভক্তদের ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। আগামী ২৯শে ফাল্গুন কাঁকুড়গাছির কালীর উদ্‌যোগে শ্রীশ্রীকামারপুকুরধামে শ্রীশ্রীপ্রভুর উৎসব হইবে।

দেবমাতা কেমন আছে? তাহাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইবে। তোমার কুশলাদি লিখিয়া বাধিত করিবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত]

১

শ্রীহরিঃ
শরণম্

হৃষীকেশ
২১।১।০৬

শ্রীমান্ নিকুঞ্জলাল,

তোমার ১৭ই তারিখের পোঃ কাঃ প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। তুমি কল্যাণানন্দ প্রভৃতির সহিত একত্রে আছ জানিয়া প্রীত হইয়াছি। সেবাকার্য্য বেশ নির্ব্বাহ হইতেছে জানিয়া স্বতঃই আনন্দের উদয় হইতেছে। আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ। দয়াই ধর্ম্মের মূল। বাক্‌চচ্চড়ি অনেকেই করিতে পারে। কায করা শক্ত। অবশ্য ঠিক ঠিক কায হওয়া দুষ্কর। নিষ্কাম কর্ম্ম প্রকৃত আত্মজ্ঞ ভিন্ন করিতে পারেন না। তবে সৎকর্ম্ম যতটা হয়ে ওঠে ততটাই মঙ্গল। তোমাদের শরীর সব ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। আমার শরীরও মন্দ নাই। এখানকার জলবায়ু অতীব মনোরম। শীত অসহ্য নহে, বরং প্রীতিপ্রদ। এখানকার অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বড় ২ অট্টালিকা, মস্ত বাজার সুতরাং লোকজন বৃদ্ধি। বাড়ী কিঞ্চিৎ নির্জ্জন হইলেও ঘরবাড়ীর বাড়াবাড়ি সেখানেও সেঁধিয়েছে। তবে এখানকার বিমল ভাব ও শান্তি সেইরূপই অক্ষুণ্ণ আছে ও থাকিবে। এখানকার মোহন্তের গতকাল শরীরত্যাগ হইয়াছে। কলিকাতা সত্রের অধ্যক্ষ নাথজির প্রস্তাবে ও সাধারণসম্মতিক্রমে বাজারহাট কাজকর্ম্ম সব কালকার জন্য বন্ধ ছিল। সুতরাং বুঝিবে এখন আর ঋষিজনসেবিত হৃষীকেশ নয়। আর ২ সংবাদ মঙ্গল। আমার ভালবাসাদি সকলকে জানাইবে ও তুমিও জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

২

শ্রীহরিঃ
শরণম্

মায়াবতী
২।৯।'০৫

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ২১ আগষ্ট তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তুমি একটু ভাল আছ ও পুনরায় নবীন উৎসাহে এবং প্রাচীন অভিজ্ঞতাসহায়ে শ্রীভগবদ্ভজনে মনঃসমাধান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছ জানিয়া যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হইয়াছি তাহা আর

কি জানাইব। মনুষ্যজীবনের বিশেষত্বই ভগবচ্চিন্তার অবসর এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই ইহার সাফল্য। কারণ জীবনে অন্য যাহা কিছু ভোগসুখাদি তাহা মনুষ্যেতর যোনিতেও সুলভ। প্রভু তোমার মতি স্থির রাখিয়া আপন সেবায় নিযুক্ত রাখুন এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা। আমার শরীর আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল তবে অনিদ্রা অবসাদ প্রভৃতি উপদ্রব যেন সঙ্গের সাথী হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণে চিত্তে সমূহ আনন্দের উদয় হয়। ত্রিপুরাকুঞ্জের কামদারের দেহান্তসংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। লোকটী বেশ সজ্জন ছিলেন। তথাকার সকল পরিচিতদিগকে আমার সম্ভাষণ শুভেচ্ছাদি দিবে। কৃষ্ণলাল এখনও কনখলেই আছে, চাতুর্ম্মাস্য উদ্‌যাপন করিয়া কলিকাতা যাইবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং মধ্যে ২ আপনার কুশল লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

ওঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

২৮শে চৈত্র, ১৩৪০
Belur Math, P.O.
Dt. Howrah

শ্রীমান্ ধীরেন,

তোমার বিস্তারিত পত্র পাইলাম। কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহার নাম করিলে অনেক কষ্টের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। যাহা খারাপ বুঝিয়াছ তাহা আর করিতে যাইও না। দীক্ষা লওয়ার সময় তোমার এখনও হয় নাই। তোমার এখন জীবিকা-উপার্জনের পন্থা স্থির করা উচিত। ঋণমুক্ত হওয়ার ও নিজে রোজগার করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ও পরিবার প্রতিপালন করার চেষ্টা আগে কর। তার পর পত্র লিখিও। এবং ইতিমধ্যে খুব নিয়ম করিয়া সকাল-সন্ধ্যা যেমন হিন্দুদের নিয়ম আছে, সেইরূপ ভগবানের যে নামটি ভাল লাগে তাহাই করিবে এবং তাঁহার নিকট সরলভাবে বালকের ন্যায় প্রার্থনা করিবে। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন। কোন ভয় বা চিন্তা করিও না। তুমি তাঁহার শরণাগত হও, তিনি তোমাকে সব রকম অসুবিধা হইতে রক্ষা করিবেন। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কথা সর্বদা চিন্তা করিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

স্বামীজীর স্মৃতি*

গ্রীভস্ ক্যালকিনস্

[অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ]

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। তিনি গিয়েছিলেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে, আর আমি ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রত্যাগত নূতন ধর্মযাজক খৃষ্টানদের ইতিহাস আলোড়নকারী চমকপ্রদ শক্তির জন্য এবং প্রাচ্যের নবতারকারূপে ঘোষিত হওয়ার দরুন তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। আমি মনে করি তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ চালচলনই আমার (আমেরিকার) গণতান্ত্রিক বোধটাকে আঘাত করেছিল। তিনি যে বিরাট ব্যক্তি এ বিষয়ে তিনি কোন তর্ক করতেন না এবং তিনি ইহা স্বীকার করতেন।…সেই থেকে বহু বছর আমি তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছুই শুনি নাই।

প্রাচীন ইতালীয় সড়কের 'রুবাটিনো' জাহাজে করে নেপলস্ বন্দর থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমি ভারতে পৌঁছেছিলাম। ঘটনাক্রমে ভোজন-কক্ষের মধ্যবর্তী টেবিলের এক পার্শ্বে আমার নির্দিষ্ট স্থান ছিল এবং উহাই আমার গল্পের পাথেয়। মধ্যপ্রদেশের মিষ্টার ড্রেক ব্রুকম্যান, আই.সি.এস., ডান পাশের প্রথম আসনটি দখল করেছিলেন এবং অপর একজন ইংরেজ, যাঁর নাম আমার স্মৃতি থেকে বিদায় নিয়েছে, তাঁর উল্টোদিকে বসেছিলেন। সুয়েজ বন্দরে এসে ভোজন-কক্ষের টেবিলের রদবদল হল, কারণ কতিপয় যাত্রী জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। লোহিতসাগরে আমাদের প্রথম ভোজনের আসর দেখল ভারতীয় আদবকায়দায় এক অদ্ভুত আগন্তুককে; তিনি বসেছিলেন মিঃ ড্রেক ব্রুকম্যানের ঠিক পাশে। প্রথম ভোজনের আসরে তিনি নির্বাক ছিলেন এবং সকলের ভোজন শেষ হবার পূর্বেই একখানা বিস্কুট ও কিছু সোডাওয়াটার খেয়ে উঠে গিয়েছিলেন। এই মহামান্য আগন্তুকের পরিচয় নিয়ে সেই জাহাজে প্রশ্নাবলীর ঝড় উঠেছিল এবং ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি নিম্নস্তরের মানুষ নন। অপরদিকে একজন কর্কশভাষী উদ্ধত যাত্রী প্রধান পরিচারককে ডেকে ঘৃণিত সুস্বাদু মদের জন্য আদেশ করল। প্রকাশ্যে ঐ যাত্রীর মদ্য-সরবরাহের কার্ড দেখে তিনি তাঁহার সামনে টেবিলের উপর একখানা হাল্কা সোডাওয়াটারের স্লিপ রাখলেন। পেন্সিলে লেখা 'বিবেকানন্দ' নামাঙ্কিত স্লিপখানা পরিচারক আমার প্লেটের পাশ থেকে নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে হল, এই কি সেই লোক—যিনি ধর্মমহাসভায় উচ্ছ্বসিত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন?—কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলাম সমুদ্রযাত্রার পরবর্তী দিনগুলির জন্য।

স্বামীজীর সেই প্রথম দর্শন আমার মনের উপর এখনও গভীর রেখাপাত করে রয়েছে; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের জন্য আমি চেষ্টা করিনি। প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের জন্য পরিচারক সর্বদা টেবিলের কাছে থাকত।

* Prabuddha Bharata পত্রিকার ১৯২৩ খৃঃ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

একজন যাত্রী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করাতে আমি কান পেতে শুনেছিলাম ; তিনি বলছিলেন যে, "আমরা তাঁর সহিত পরিচয় করব।" আমি মনে করি যে, আমার সমজাতীয় জীবনের জন্য তাঁর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে মনে আমার অব্যক্ত বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন এবং ধরতে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন।

"আপনি একজন আমেরিকাবাসী ?"

"হ্যাঁ।"

"মিশনারী নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা দিতে যাচ্ছেন ?" তিনি দৃঢ়ভাবে বললেন।

"আপনি কেন আমাদের দেশে ধর্মপ্রচার করছেন ?" আমি প্রত্যুত্তর করলাম

তাঁর বিশালায়তন চক্ষের সামান্য একটু ভ্রূকুটি আমাদের সমস্ত বাধা ও যুক্তিতর্ক উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যাই হোক, আমরা জোরে হেসে উঠলাম এবং পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেলাম।

দুই-এক দিনের জন্য কতিপয় যাত্রী তাঁকে খাবার টেবিলে যুক্তিতর্কের মধ্যে টেনে আনতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর উত্তরগুলি ছিল ক্ষিপ্র এবং যথেষ্ট সমাধানপূর্ণ ; কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় কথা, সেগুলি ছিল প্রতিভাপূর্ণ। ঐ উত্তরগুলি ছিল যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি শাণিত ; যোগ্য উদ্ধৃতির সংযোগে ঐগুলি ঝলমল করে উঠত। সেই সময় একমাত্র ড্রেক ব্রুকম্যান ছাড়া সকল অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট যাত্রীর তর্কবাণ তাঁর সামনে নিরস্ত হয়ে পড়ত। ব্রুকম্যানের তীক্ষ্ণ বিচারশীল মন বিবেকানন্দের শাণিত উত্তরগুলিকে ক্রমাগত কেটে ফেলার এবং তাঁর তর্করাশিকে স্বীকৃত সত্যের মাধ্যমে বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করে তুলত। এতে স্বামীজী একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হয়ে পড়তেন। বাকী যাত্রীরা শীঘ্রই উৎসাহ হারিয়ে ফেলত এবং আমাদের ছোট দলটিকে ভোজন-সমাপ্তির পরেও আবার বাধাহীন সভা, প্রাতরাশ এবং ভোজন চালিয়ে যেতে অনুমোদন করত।

একদিন রাত্রে আমি একটি নূতন জিনিস আবিষ্কার করলাম। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিরাট প্রতিভাবান পুরুষ। তাঁর বাচনভঙ্গী ছিল খরস্রোতা গঙ্গার বাধাহীন ধারার মত। হয়তো কোন প্রশ্ন তাঁকে সাময়িকভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তীব্র ওজস্বিনী ভাষার দ্বারা তা সরিয়ে দিয়ে তাঁর মূল বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। কোন একদিন একটি বিশেষ বক্তৃতা শেষ হ'লে তিনি সকলের প্রতি অভিবাদন করে শান্তভাবে ভোজনকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর মিঃ ব্রুকম্যানের উল্টোদিকে উপবিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোকটি টেবিলের দিকে ঝুঁকে বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় ভদ্রলোকটি যখন বাধা পেয়েছিলেন তখন তিনি যেখানে থেমেছিলেন সেখান থেকেই আবার বলতে শুরু করলেন ?"

"হ্যাঁ, আমরা দুজনেই তা লক্ষ্য করেছি।"

"তিনি আমাদের ব্যক্তিগত উপকারের জন্য তাঁর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা বলে গেলেন।"

এইরূপ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনাগুলি ছিল আমাদের কাছে চমকপ্রদ অনুষ্ঠান ; এবং এমনকি জাহাজের ডেকের উপরকার সাধারণ ঠাট্টা-তামাসাগুলিও নির্মল আনন্দের ফোয়ারা ছোটাত।

দার্শনিক অপেক্ষা বিবেকানন্দ স্বদেশপ্রেমিকই বেশী ছিলেন। আমি মনে করি তাঁর বেদান্তপ্রচারের মূলে ছিল তাঁর এই স্বদেশপ্রেম এবং তাঁরও মনে হয়েছিল যে, ইহাই ভারতের জাতীয়তাকে বাঁচাবার একমাত্র নিশ্চিত পথ। আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে তিনি ভুল করেছেন[১]। তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতা আমার সেই প্রথম অসুখকর স্মৃতিকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং আমি মনে করি তিনি তাঁর স্বদেশবাসিগণের কাছে গৌরবের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন একজন প্রাচীন ধর্মমতের প্রচারক হিসাবে নয়, তবে একজন মহান দেশপ্রেমিক হিসাবে।

একদিন তাঁর তীব্র স্বদেশানুরাগ 'ক্রিশ্চিয়ান মিশনের' মূল উদ্দেশ্য ভুল বোঝার দরুন এক বিপর্যয় এনেছিল। এক সন্ধ্যায় বাদাম-কফির আসরে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তুতির দিকে আলোচনার মোড় ঘুরে গেল।

১ ভগিনী নিবেদিতার মতে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার দুইটি উদ্দেশ্য সফল করেছে—'একটি জগৎ-আলোড়নকারী এবং অপরটি জাতিসৃজনকারী'। ভারতের ব্যাপারে স্বামীজীর এই আন্দোলন তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে: 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিগুলির একতা প্রদর্শন ও তাহাদের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা'। পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহনের মূল উদ্দেশ্য তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলির মাধ্যমে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করে গেছেন, "আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বা জাতি যদি ঐ নিয়ম না মানে তবে তারা জীবনে কখনই উন্নতি লাভ করতে পারবে না, আমরা নিশ্চিতই ঐ নীতির অনুসরণ করব এবং ঐ জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম ···তারা দীর্ঘদিন যাবৎ তোমাদের দিয়ে আসছে তাদের অতুলনীয় ধন-সম্পদ আর বর্তমানে উহার বিনিময়ে তোমাদের অমূল্য সম্পদ দেবার সময় এসেছে। এবং তোমরা দেখবে কত শীঘ্র বিশ্বাস, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার দ্বারা পরস্পরের প্রতি ঘৃণিত বিদ্বেষভাব বিদূরিত হচ্ছে এবং কত সুন্দরভাবে তারা এগিয়ে আসছে বিনা জিজ্ঞাসায় তোমাদের কল্যাণের জন্য।" ভারতে এবং ভারতেতর দেশে স্বামীজীর এই অদ্ভুত 'সমর-নীতি' সফলতা লাভ করেছে তাঁর অক্লান্ত শ্রমের বিনিময়ে।"

—EDITOR

(প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনাটি ঘটেছিল বাইশ বছর আগে, যখন মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার বিল ছিল বহু দূরের এক কুহেলিকার আড়ালে··।)

স্বামী বিবেকানন্দ হঠাৎ রেগে গেলেন—"ইংলণ্ড আমাদের সুন্দর সরকার গঠনের কৌশল শিক্ষা দিক, কারণ এক্ষেত্রে বৃটেন সকল জাতির ভিতর শ্রেষ্ঠ।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "আমেরিকা আমাদের কৃষি, বিজ্ঞান এবং কোন নূতন জিনিস প্রস্তুত করবার অদ্ভুত কলা শিক্ষা দিক; ঐক্ষেত্রে আমরা তোমাদের নীচে বসব—কিন্তু" এবং বিবেকানন্দের সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ কঠিন ও তীব্রতর হয়ে উঠল—"পৃথিবীর অন্য কোন জাতি যেন ভারতকে ধর্ম শেখাবার স্পর্ধা না রাখে; কারণ এ ব্যাপারে ভারত জগৎকে শিক্ষা দেবে।"

সেই রাত্রে ডেকে পাদচারণা করতে করতে আমরা গভীর তত্ত্বালোচনায় ডুবে গিয়েছিলাম —সেখানে কোন বৃটেনবাসী, আমেরিকান বা ভারতীয় কেউ-ই ছিল না; সেখানে ছিল আমাদের বুভুক্ষু মানবিক প্রাণ এবং সেই এক মানবসন্তান যাঁর উৎসর্গীকৃত রক্ত এখনও পড়ে রয়েছে এশিয়ার কোন একটি উড়ন্ত বালুকণার উপর। এখনও আমার স্মৃতিপটে ভেসে আসছে যে, আমি স্বামীজীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, তাঁর ধারণামত কোন মিশনারী ভারতে ধর্মপ্রচার করতে চেষ্টা করছে না, বরং সেই মহামানবকে জানতে এবং ভালবাসতে ভারতকে সাহায্য করছে।

আমাদের যাত্রার শেষ দু-একদিন আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া খুব জমে উঠেছিল এবং আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল।

বিবেকানন্দের রহস্যবাদ ছিল আবেগময় ও মুগ্ধকর, কারণ উহা অস্বাভাবিক ছিল না। আত্মার রহস্যময় গূঢ় বিষয়গুলি নিয়ে যখন আমাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলাপ-আলোচনা চলত, তখন তাঁর সেই বিরাট অক্ষিগোলক দুটি আস্তে আস্তে বুজে আসত; এমনকি আমার সামনে তিনি বিচরণ করতেন কোন এক অজ্ঞেয় রাজ্যে, যেখানে আমি ছিলাম অনিমন্ত্রিত। এইরূপ কোন এক সময়ে আমি মন্তব্য করেছিলাম যে, সেই অতিমানবের সঙ্গে একত্ববোধ সম্বন্ধে ক্রীশ্চিয়ানদের সতর্ক ও জাগ্রত থাকা উচিত (যেমন ব্যক্তিগত একত্ব থাকে); সুতরাং হিন্দুদের সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হওয়ার সঙ্গে এখানে মূলতঃ একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। এ কথা শোনামাত্র তিনি ঝটিতি আমার দিকে একবার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

বোম্বেতে 'রুবাটিনো' জাহাজ ভিড়বার পূর্বরাত্রে আমরা ডেকের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিবেকানন্দ একটা ছোট সুন্দর পাইপ-এ ধূমপান করছিলেন এবং বেশ একটু আমোদ সহকারে বললেন যে, 'ইংরেজদের এই বদভ্যাসটা' তিনি পছন্দ করেন। মহানিশার সেই তরঙ্গায়িত সমুদ্র আর আগামী দিনের এক অজানা জীবনের ভাবনা এনে দিয়েছিল এক চরম নিস্তব্ধতা। বহু সময় ধরে একটা গাঢ় মৌনতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করছিল। তখন তাঁর মন কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করতে লাগল এবং তিনি বুঝলেন যে, আমার দ্বারা ভারতের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর তিনি খুব সৌহার্দের সহিত আমার কাঁধে তাঁর হাতখানা রাখলেন।

"মহাশয়", তিনি বললেন, "তারা তাদের বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং ক্রাইষ্টের বিষয় অনেক কিছু বলতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, বিশেষতঃ আপনি ও আমি, যে আমরা সেই সর্বাত্মক একের অংশ।"

সেই বন্ধুত্বব্যঞ্জক হাতখানি আমার কাঁধেই রইলো; আমার মনে একবারও জাগলো না যে, নির্দয়ভাবে সরিয়ে ফেলি। তারপর তিনি নিজেই হাতখানি তুলে নিলেন; আর সেই বন্ধুত্বের বিনিময়ে আমিও তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

আমি বললাম, "স্বামীজী, আপনি আপনার নিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলুন, আমাকে টানবেন না। আপনি যে সর্বাত্মক একত্বের কথা বললেন, তা নৈর্ব্যক্তিক এবং সেইহেতু তা অজ্ঞেয়। এই মহাসাগরের বুকে ডুবন্ত জাহাজের মত যদিও আমরা সেই একত্বে ডুবে রয়েছি তথাপি তা সেই অজানার রাজ্যে। কিন্তু স্বামীজী, আমি যাঁকে জানি, যাঁকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি—তিনি একজন স্বতন্ত্র পুরুষ এবং অত্যন্ত বাস্তব, এবং তাঁর ভিতর সেই সর্বাত্মক পূর্ণত্ব বিরাজ করছে।"

সেই মিষ্ট পাইপটি দ্রুত তাঁর ঠোঁট থেকে সরে গেল। তিনি একটি রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তাঁর সেই নিমীলিত অক্ষিগোলক দুটি ইঙ্গিত করছিল যে, বিবেকানন্দ চলে গেছে দূরে, বহু দূরে কোন এক বস্তুর অন্বেষণে। এ কি সেই সর্বাত্মক একত্ব অথবা বহুত্বে একত্ব—যা স্বামীজী সেই তমিস্রা-রজনীতে খুঁজেছিলেন?

অস্তিত্বের সীমা

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

যে ছিল একদিন প্রাণের চেয়েও প্রিয়, আত্মার সঞ্জীবনী-সুধা—যার হাসি, কথা, উদ্বেলিত প্রাণবন্যা জীবনকে রাখত সচল করে, হঠাৎ একদিন নির্মম মৃত্যু এসে তাকে কোথায় নিয়ে চলে যায়। পশ্চাতে পড়ে থাকে শুধু স্মৃতি। প্রিয়বিরহী মানুষ সে স্মৃতিকে অমর করে ধরে রাখতে চায় সাহিত্যে, শিল্পে, স্মৃতিসৌধে। একদিকে প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার অক্লান্ত প্রয়াস, আর একদিকে জীবনের তাড়নায় নিত্য নতুন কর্মের জগতে ভেসে চলা। একদিকে পিছনের টান, আর একদিকে সামনের দিকে দুর্নিবার গতি। আকর্ষণ ও বিকর্ষণে জীবন হয়ে ওঠে সংঘাতমুখর। এ টানাপোড়েনে স্মৃতির জগৎও একদিন ম্লান হয়ে যায়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে অবিরাম অবিশ্রাম কর্মের স্রোতে নিত্য আবর্তিত হওয়া! জীবনের কর্তব্যকঠোর রথচক্র চলে ঘর্ঘর রবে। মাড়িয়ে দিয়ে যায়, গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় জীবনের যত কিছু প্রিয় বস্তু। জীবনের দাবী, সংসারের দাবীর শেষ নেই। তোমার গোপনতম অনুভূতির জগৎ বিবর্ণ হয়ে উঠুক, বিদীর্ণ হোক্-তাতেও ক্ষতি নেই। তবু দিয়ে যেতে হবে। সমাজ-সংসারের অফুরন্ত চাহিদা পূরণ করে যেতে হবে তোমাকে।

জীবন-পরিবেশের প্রবল নিষ্পেষণে চিত্ত যখন উদ্‌ভ্রান্ত, অদৃশ্য সুদূর লোক থেকে প্রিয়-স্মৃতির স্বর্ণরশ্মি এসে পড়ে দিশেহারা সে চিত্তের ওপর। সে স্মৃতির স্নিগ্ধ আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে চিত্তদেশ। অন্তরের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ কিছুকালের জন্য হলেও স্তব্ধ হয়ে যায়। অদৃশ্য স্মৃতিলোকে অবস্থিত প্রিয়জন যেন সজীব হয়ে পথ দেখায়—'ভয় নেই, ভয় নেই, যাত্রী।' আমি মরিনি, আমার মৃত্যু নেই। হতাশা-গ্লানি-অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনপথে আলোক বিকীর্ণ করে সত্যপথের নির্দেশ দেবার জন্যে আমি এখনও বেঁচে আছি। সংসারের ভ্রূকুটি-কুটিল রূপ দেখে তুমি ভয় পেও না। ওটা মায়া। লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রেখে জীবনপথে এগিয়ে চলো। জীবনের ধ্রুবতারাই তোমাকে পথ দেখাবে। বিশ্বহিতে জীবন উৎসর্গ করো। তবেই তোমার জীবনে আসবে পরম সার্থকতা।

অদৃশ্য জগৎ থেকে এ পরম আশ্বাসের বাণী জীবনযন্ত্রণাপীড়িত মানুষকে জাগিয়ে তোলে নবতর কর্মের পথে। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার জগৎ উত্তীর্ণ হয়ে সবলে সে প্রবেশ করে বৃহত্তর চেতনার জগতে। মনের দৃষ্টি তার খুলে যায়। নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে জগতের যন্ত্রণাজর্জর মানুষের দুঃখবেদনা দূর করবার মহত্তর প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে সে। সংকীর্ণপরিধিমুক্ত হয়ে বহুব্যাপ্ত জীবন অভিনব সার্থকতায় ভরে ওঠে। জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায় সে। বাধাবন্ধনজয়ী ক্ষয়হীন সে মহাজীবন আকর্ষণ করে তাকে সর্বকলুষমুক্ত আনন্দময় অমৃতময় জীবনের অভিমুখে।

জগতের আনন্দ- ও অমৃতযজ্ঞে মানুষের এ আমন্ত্রণ ব্যর্থ হয়নি। আত্মস্বার্থবিস্মৃত মানুষ

যুগে যুগে যন্ত্রণাজর্জর বৃহত্তর মানবসমাজের দুঃখনিবারণের জন্য কত নিত্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছে, তার সীমা নেই। দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে শিল্পে সে যন্ত্রণা মুক্তির পথনির্দেশ। শুধুমাত্র পথনির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি পরহিতে সমর্পিতপ্রাণ বৃহৎ চেতনাময় মানুষ। আশা দিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ ভাষা দিয়ে, সক্রিয় সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা গ্রহণ করে দুঃখক্লিষ্ট মানুষের দুঃখনিবারণকার্যে এগিয়ে গেছে বারবার। কোন ধন্যবাদ বা পুরস্কারের আশা সে করেনি। শুধুমাত্র বৃহত্তর অস্তিত্বের জগতের প্রেরণাই তাকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করেছে অন্তহীন কর্মযজ্ঞে।

সে বৃহৎ অস্তিত্বের জগৎ প্রিয়স্মৃতির জগৎ। মৃত্যুর সর্ববিধ্বংসী আঘাত সে জগতের সজীবতাকে ম্লান করতে পারে না। স্থূল দেহ নিয়ে প্রিয়জন হয়ত একদিন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু স্মৃতির জগতে অশরীরী দেহে তার অবস্থান সজীব। সে-জগৎকে কেউ বলেছেন আত্মার জগৎ, আবার কেউ বলেন পরলোক। প্রিয়স্মৃতি সে বৃহৎ চেতনা-লোকে সক্রিয় থেকে মানুষকে নিত্যনিয়ত ঠেলে নিয়ে চলেছে কর্ম থেকে কর্মান্তরে, স্বার্থমগ্ন আত্মকেন্দ্রিক জীবনচেতনা থেকে সর্বস্বার্থমুক্ত উদার-প্রসার জীবনালোকে। এই প্রসারিত জীবনচেতনা আছে বলেই মানুষ এত হিংসা-দ্বন্দ্ব-হানাহানির মধ্যে বাস করেও একেবারে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যায়নি। বৃহত্তর অস্তিত্বের জগতে আত্মার জ্যোতির্ময় আলো এখনও তাকে জীবনের নিকষকালো অন্ধকারে পথ দেখায়, আকর্ষণ করে হিংসামুক্ত-প্রেম-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ আদর্শায়িত জীবনের দিকে।

সুতরাং মানুষের অস্তিত্বের জগৎ এই স্থূল জীবনালোকেই সীমাবদ্ধ এ-কথা বলি কী করে? আত্মকেন্দ্রিক ভোগলিপ্ত মানুষই প্রচার করেছে সে সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বের জগতের কথা যা সংখ্যাতীত প্রিয়বিরহী মানুষকে নিক্ষেপ করেছে নৈরাশ্যের মরু-প্রান্তরে। বস্তুতঃপক্ষে মানুষের চেতনার জগৎ যেমন কোন সীমার বন্ধন স্বীকার করে না, তেমনি অস্তিত্বের জগৎ-ও সীমাহীন। অনন্ত কাল- এবং দেশ-বিধৃত এ জীবনলোক সভ্যতার আলোকিত যুগ থেকে আকর্ষণ করে আসছে তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক, জীবনসন্ধানী কবি, এমন কি বস্তুলোকবিহারী বৈজ্ঞানিকের মনকেও। কত বিচিত্র কাব্যকাহিনী, জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে সে বিপুল অস্তিত্বের জগৎকে কেন্দ্র করে, শিল্প- ও সঙ্গীত-জগৎ ঐশ্বর্যময় এবং মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছে এ প্রসারিত জগৎ-চেতনার স্পর্শে :

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

অদৃশ্য অস্তিত্বলোকবিহারী প্রিয়জনের স্পর্শ-লাভের জন্য কবি-অন্তরের এ ব্যাকুল ক্রন্দন শ্রোতার মনকে স্থূল জীবন-পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়ে উত্তীর্ণ করে দেয় অনুভূতিগ্রাহ্য ভাবলোকে। সে ভাবলোক বস্তুর চাইতেও বাস্তব, জীবনের মর্মমূলে তার অধিষ্ঠান। কবির সমস্ত চেতনাকে আলোড়িত করে উৎসারিত হয়েছে এ জীবন-সঙ্গীত—সজীব স্মৃতির সুরভিত জগতে যার সার্থক উত্তরণ।

অসীম করুণাময়

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার করুণা বারে বারে পাই অসীম করুণাময়,
যখনি আঁধার, যখনি বেদনা, জীবনের সংশয়,
তখনি তোমার বরাভয় নামে, প্রসন্ন দীপালোক
ঘোচায় পথের সকল আঁধার, মোছায় দুঃখ শোক।

সে-আলোক তুমি পাঠাও কখনো বন্ধুর হাত ধরে,
কখনো সে আসে কিশোরের হাতে, কত না নিষ্ঠাভরে।
দেখায় সে আলো, পাই খুঁজে পথ, ঘোচে কালো নিরাশার,
কখনো সে আলো, রমণীর হাতে, জননীর রূপ তার।

দেখে কেটে যায় সব সংশয়, পাই তার পরশন,
সে যে কী গভীর স্নেহের প্রেমের, ভরে ওঠে দু'নয়ন!
বারে বারে মাথা নোয়াই স্মরণ ক'রে সেই রূপ তার;
দিয়েছ তোমার অকৃপণ দান, অহেতু কৃপা তোমার।

মনে মনে ভাবি, তোমার করুণা কী অসীম, কী সুলভ!
যে ডাকে তোমায় বারেক, তাকেই দাও সেই বৈভব।
সদা জাগ্রত সবার শিয়রে, দুটি কল্যাণ করে
মোছাও বেদনা ব্যথিতের, সব গ্লানিভার নাও হ'রে।

চিরসুন্দর হে করুণাময়, আর কোন দ্বিধা নয়,
মহাসম্পদ তোমার চরণ হোক চির আশ্রয়।

সমালোচনা

স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টিঃ লেখক ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার; প্রকাশক: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, পৃঃ-২১৭, মূল্য: আট টাকা।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বেশ ভাল লাগিল। এ-জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য লেখক পাঠকমহলে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর অনুপ্রেরণায় লেখক বর্তমান কার্যে ব্রতী। স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসূরী হিসাবে স্বামী অভেদানন্দ দার্শনিক মতবাদগুলিকে কিভাবে বৈজ্ঞানিক মেজাজের কষ্টিপাথরে পরখ করিয়া লইতেন এবং অভেদানন্দমানসে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে লেখক তাহা ত্রয়োদশটি পর্বে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-চেতনার সূচনা তিনি দেখাইয়াছেন শৈশবের গাণিতিক পারদর্শিতায়, কৈশোরের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তিতে ও যৌবনের মহা জিজ্ঞাসায়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্র-অধ্যয়নেও যে তর্ক-বিচার-প্রসূত বৈজ্ঞানিক ধর্মযুক্ত মনই তাঁহাকে পরম বৈদান্তিকে পরিণত করে এবং তাঁহার বেদান্তমত যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবিরোধী, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর, তাহাও লেখক বহু উদাহরণ সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অভেদানন্দের ভাষায়, বিজ্ঞান বিশ্বের চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করিতে প্রচেষ্টিত আর ধর্ম সেই চিরন্তন সত্যকে উপাসনা করার কাজে প্রবৃত্ত; আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত যাহার মিল নাই, সে সমস্তই আমাদের দূরে ঠেলিয়া দিতে হইবে; বেদান্ত যে শুধু বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় করিবে তাহা নহে, বিংশ শতাব্দীর যাহা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—ধর্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য-সাধনও করিবে।

অধ্যাত্ম-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লেখক স্বামীজীর প্রাণায়ামতত্ত্বের বিশদ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে স্বামী অভেদানন্দজীর মতে অখণ্ড প্রাণশক্তির কম্পন হইতেই ইলেকট্রন বা বস্তুকণার উৎপত্তি; সমগ্র জগৎ এই শক্তির বিকাশ, তন্ত্রে ইহাকে আদ্যাশক্তি বলে, বিজ্ঞান বলে energy। যোগশাস্ত্রের সুষুম্নার স্বরূপ জানিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দ শবব্যবচ্ছেদ ক্লাসেও যোগ দিয়াছিলেন। ইহার ফলেই তিনি শরীর-বিজ্ঞানীদের জড়ের বাহিরে প্রাণশক্তির অন্বেষণের পরামর্শ দিতে পারিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দজী ক্রমবিবর্তনবাদকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াও সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব-মতে বৈজ্ঞানিককে দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করিতে যেভাবে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সে বিষয়েও লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

পুনর্জন্মবাদ-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজীর অভিমত এই যে, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় অদৃশ্য শক্তি যখন বিজ্ঞানীর গ্রহণযোগ্য, তখন সূক্ষ্ম-কারণরূপ বীজের অস্তিত্বই বা কেননা বিজ্ঞান-সম্মত হইবে? কিভাবেই বা তাঁহার বিজ্ঞানী মন প্রেততত্ত্বের নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হয় ও 'Life Beyond Death'-গ্রন্থের অবতারণা করে,

বর্তমান পুস্তকে তাহাও বিশদভাবে আলোচিত।

মনোবিজ্ঞানীদেরও তিনি যে জড়বুদ্ধির সমস্ত স্তর ভেদ করিয়া তদূর্ধ্বে যাইতে বলেন, নচেৎ সহজাত বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি প্রভৃতির উৎস কোথায় তাহা বুঝা যায় না ; এ কথাও লেখক বর্ণনা করিয়াছেন।

লেখক আরও দেখাইয়াছেন, প্রাচীন ইতিহাসের পর্যালোচনার দ্বারা স্বামী অভেদানন্দজী যেভাবে বিদেশে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার গুণ বিশ্লেষণ করিতেন তাহা তাঁহার বিজ্ঞানী মনেরই পরিচায়ক।

জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দজীর আগ্রহ ও অন্যকে সে বিষয়ে জ্ঞান-পরিবেষণে দক্ষতা ও ফলিত বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন উপমা সংগ্রহ-প্রসঙ্গে লেখকের তথ্য-নিবেদন তাঁহার মূল বক্তব্যের সহায়ক।

ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ও সন্ন্যাস যে আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর পরিপন্থী নয়, বরং প্রগতিশীল চিন্তাধারার সহায়ক বিভেদ নয় সমন্বয়ই যে তাহাদের বাণী, সেকথা আলোচ্য গ্রন্থে পরিস্ফুট। তবে, এ-জাতীয় আলোচনা-গ্রন্থে বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশ করিলে উদ্দেশ্য অধিকতর সফল হয়। আমরা আলোচ্য গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগজ্যোতি : শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী। জ্ঞানদা সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। ২৫, মনোহর-পুকুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-২৯ ; পৃষ্ঠা ৯৬ ; মূল্য : আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ কৃপাধন্য ভক্তসংখ্যা আজ একান্ত বিরল। সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীমা সারদাদেবীর সাধু ও গৃহী ভক্তদের দর্শন আজও মেলে এবং তাঁদের পুণ্যস্মৃতি বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের পথিকদের কাছে অমৃততুল্য আস্বাদ বহন করে আনে। শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্তী তেমনি একজন আশীর্বাদধন্য ভক্ত, যাঁর রচনাভঙ্গীতে অধ্যাত্মপ্রেরণার সরল তন্ময়তা-টুকু পাঠকচিত্তকে নিবিষ্ট করে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা ছাড়াও স্বামী সারদা-নন্দজী মহাপুরুষ মহারাজ এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিও এ গ্রন্থে সংযোজিত। সমগ্র গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের স্নিগ্ধ সুবাসে পরিপূর্ণ।

তবে নিপুণতর সম্পাদনা এবং বানান-ভুলের আতিশয্য-পরিহার এ-জাতীয় গ্রন্থে অবশ্যকর্তব্য। প্রচ্ছদ ও কাগজ দুই-ই রুচি-পূর্ণ এবং মূল্যবান। স্বল্পায়তনে শ্রীশ্রীমায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-লিখনে লেখক স্থায়ী কীর্তি অর্জন করবেন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ ঃ গত ১৬ই পৌষ (৩১.১২.৬৯) বুধবার পুণ্য কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর ১১৭তম শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি এবং বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। তৎপরে ভজন, বিশেষ পূজা, হোমাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। নাটমন্দিরে বেলা ৯টা হইতে ১০টা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ এবং বেলা ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বীতশোকানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন ও বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে আরতির পর শ্রীশ্রীমায়ের আরতি হয়। সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে ভজন হইয়াছিল।

সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৫,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়; বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ঃ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে (১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩) পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, বহুপুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৭তম জন্মোৎসব গত ১৬ই পৌষ (৩১. ১২. ৬৯) বুধবার বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে মহা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলারতি, যোড়শোপচার পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বেলা দশটা হইতে এগারটা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও জীবনালোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। সন্ধ্যারতির পর স্বামী ঈশানানন্দ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' বলেন। রাত্রেও ভজন হইয়াছিল।

ভোর হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। আবহাওয়া ভাল থাকায় অন্যান্য বার অপেক্ষা বেশী ভক্তসমাগম হইয়াছিল—সারাদিনে প্রায় ৪ হাজার। সমাগত সকলেই হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন পূজাপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ও ভক্তসমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়া আনন্দ-মুখর ছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঃ গত ১লা জানুআরি ১৯৭০, বাংলা ১৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে ৩রা ও ৪ঠা জানুআরিও উৎসব হইয়াছিল।

প্রথম দিন ১লা জানুআরি বিশেষ পূজাদি, উচ্চাঙ্গ ধর্মসঙ্গীত, 'রসরঙ্গের' সভ্যবৃন্দ কর্তৃক কথা ও গানে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, আন্দুল কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন, স্বামী তীর্থানন্দ কর্তৃক ভাগবত-ব্যাখ্যা এবং শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণকীর্তন (স্বর্ণতরী) অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণে জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হেমচন্দ্র গুহ। বক্তা ছিলেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সময়োপযোগী সুন্দর ভাষণ দেন। স্বামী বীতশোকানন্দ হিন্দীতে বক্তৃতা করেন।

৩রা জানুআরি শনিবার শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কীর্তন, স্বামী দেবানন্দ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-ব্যাখ্যা, শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে জনসভায় কল্পতরু দিবস এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৪ঠা জানুআরি উৎসবের শেষদিন রবিবার মধ্যাহ্নে ভারতসরকারের প্রচারবিভাগের সৌজন্যে শ্রীপূর্ণদাস ও সম্প্রদায় কর্তৃক বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অপরাহ্ণে হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই 'নদীয়া-লীলা' কীর্তনাভিনয় হইয়াছিল।

উৎসবের তিন দিনই কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও গত ১লা জানুআরি বৃহস্পতিবার 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথা-রীতি আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল—বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম ও ভজনাদি। প্রতিটি অনুষ্ঠান সুন্দর-ভাবে সম্পন্ন হয়। ভক্তবৃন্দ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ভক্তসমাগমে ও ভজন-কীর্তনে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান সারাদিন আনন্দ-মুখর ছিল।

স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

উদ্বোধনে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২৮শে পৌষ, (১৩. ১. ৭০) মঙ্গলবার শুভ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দর-ভাবে সাজানো হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ এবং পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর পুণ্যজীবন আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারতির পর রাত্রে যন্ত্রসঙ্গীত (স্বরোদ-বাদন) এবং শ্রীনলিন মালাকারের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে উদ্বোধন-ভবন সারাদিন আনন্দমুখর থাকে। রাত্রেও কিছু ভক্তসমাগম হইয়াছিল। সমাগত ভক্ত-গণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার (শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয়): ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা: বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপিত হয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই মঠের প্রধান কার্য: শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের সেবাপূজা এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকা ও পুস্তকাবলী প্রকাশন।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের কর্মধারা নিম্নরূপ:

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য সেবাপূজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি উদ্‌যাপন করা হয়।

ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি, কালীপূজার রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শিবরাত্রিতে সারারাত্রি শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ক্রীস্‌মাস ইভ্, শঙ্করপঞ্চমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিনে সন্ধ্যারতির পর অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণী পঠিত ও আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী সন্তানগণের পুণ্য জন্মতিথিগুলিও অনুরূপভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকার ৭১তম বর্ষ। পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে, পূর্ব বৎসর অপেক্ষা পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে।

এখানকার গ্রন্থাগারটি ভক্তবৃন্দের জন্য সপ্তাহে একদিন—প্রতি রবিবার অপরাহ্নে খোলা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২,৩৯৩। আলোচ্যবর্ষে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ২,০৮১।

প্রকাশন-বিভাগ হইতে আলোচ্য বর্ষে দুইটি নূতন পুস্তক 'স্বামীজীর আহ্বান' ও 'ভগবানলাভের পথ' প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১১খানি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশন-বিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'উদ্বোধন কার্যালয়' হইতে ১৬৯ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মঠের সাধু-কর্মিগণ এখানে এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ২২৩টি ক্লাস ও ১০০টি বক্তৃতার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

কাছাড়ে বন্যার্তসেবা: শিলচরে— রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ২৭টি গ্রামের ৫,৬১৬ জন দুর্গতকে ৪,৩৫৩ কেজি চাল, ১,৭২৫ কেজি আটা, ৫৫০ খানি বস্ত্রাদি এবং ৩২৫ খানি কম্বল দেওয়া হইয়াছে। ১৬ জনকে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। এবং ২৭টি পরিবারকে বীজ-ধান দিয়া সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত ২১টি পরিবারের জন্য ২১টি গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

অন্ধ্রে ঘূর্ণবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা: ডিসেম্বর মাসে (১৯৬৯) ১৮টি গৃহের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এ পর্যন্ত দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য মোট ৪০টি গৃহ নির্মিত হইল। আরও গৃহনির্মাণের জন্য ব্যবস্থাদি সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হইতেছে। গত ২২শে ডিসেম্বর স্বামী ভূতেশানন্দজী চিরালায় একটি বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

বেদান্ত কলেজের জন্য প্রার্থনা-ভবন

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মহীশূর রামকৃষ্ণ আশ্রমের বেদান্ত কলেজের জন্য প্রার্থনা-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

নেফা কেন্দ্রের পরিবিস্তার

গত ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ওয়াই. বি. চাবন আলং (নেফা) কেন্দ্রে নিম্নলিখিত নূতন ভবনগুলির উদ্বোধন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, সাধুনিবাস, শিক্ষক-ভবন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও আসামের রাজ্যপাল শ্রী বি. কে. নেহরু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

গীতা-জয়ন্তী

গত ২১শে ডিসেম্বর দিল্লী আশ্রমে গী জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সভায় ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জি. কে. পাঠক সভাপতিত্ব করেন।

স্বামী অশোকানন্দের দেহত্যাগ

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ রাত্রি ১২টা ৪৫ মিনিটে (ইউ. এস. এ. সময়) স্যান-ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রে স্বামী অশোকানন্দ (যোগেশ মহারাজ) ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি নানাবিধ পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন। বৃক্কের গোলযোগের জন্য গত ১লা ডিসেম্বর তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়, চিকিৎসার ফলে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহাবসান ঘটে। ১৭ই ডিসেম্বর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, এই অনুষ্ঠানে উত্তর ক্যালিফর্নিয়া কেন্দ্রের সন্ন্যাসিগণের সহিত আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রের ৪ জন সন্ন্যাসী যোগদান করেন।

স্বামী অশোকানন্দ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভুবনেশ্বর মঠে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতে থাকাকালে স্বামী অশোকানন্দ 'বেদান্ত কেশরী' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার বিভিন্ন সময়ে বহন করিয়াছিলেন। তিনি সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লেখাগুলি গভীর চিন্তাশীলতা, আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার স্যান-ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্র পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেখানে গমন করেন। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় স্যানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের দুইটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে—একটি বার্কলিতে এবং অপরটি স্যাক্রামেন্টোয়। দীর্ঘ ৩৭ বৎসরব্যাপী আমেরিকায় তাঁহার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচার খুবই সাফল্যমণ্ডিত।

স্বামী অশোকানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সাহিত্যপ্রতিভা, বাগ্মিতা আমেরিকায় তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ভারতে ও আমেরিকায় তাঁহার অসংখ্য গুণমুগ্ধ ব্যক্তি আছেন।

এই সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা পরমপদে মিলিত হইয়াছে।

স্বামী কৃপানন্দের দেহত্যাগ

গত ১৩ই ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় বৃন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামী কৃপানন্দ (নগেন মহারাজ) সজ্ঞানে শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করিতে করিতে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ

করিয়াছেন। দেহাভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ তাঁহার দেহত্যাগের কারণ; ২৮শে নভেম্বর হইতে তিনি বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দেহ যমুনা নদীতে সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী কৃপানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। স্বামী কৃপানন্দ ১৯৩১ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম ও দেওঘর বিদ্যাপীঠের কর্মী ছিলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবন সেবাশ্রমে কর্মিরূপে প্রেরিত হন এবং ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রটির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি ইহার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। মথুরা রোডের উপর নবনির্মিত হাসপাতাল ভবনটি তাঁহারই দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

স্বামী কৃপানন্দ অতি মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন; যাঁহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহার চরিত্রের এই দিকটি তাঁহাদের সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিত। অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও মধুর ব্যবহার সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করিয়াছে।

পরলোকে স্বামী গঙ্গেশানন্দ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ৯ই জানুআরি রাত্রি ২-৪৪ মিঃ সময় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী গঙ্গেশানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল হাঁপানিতে ভুগিতেছিলেন, বয়সজনিত অন্যান্য উপসর্গও দেখা দিয়াছিল; দেহত্যাগের দুইদিন পূর্বে তাঁহাকে বেলুড় মঠ হইতে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি করা হয়। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর।

স্বামী গঙ্গেশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে চার বৎসর তিনি (তখন ব্রহ্মচারী শান্তিচৈতন্য) ব্রহ্মচারী বিমলের (স্বামী দয়ানন্দ) সহিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরে সুদীর্ঘকাল স্বামী শিবানন্দজীর সেবায় ব্রতী থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। কালিম্পঙ্-এ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি প্রতিষ্ঠাতা; মনোরম দৃশ্য-পরিবেষ্টিত এই আশ্রমটি গড়িয়া তুলিবার পর কয়েক বৎসর এখানকার অধ্যক্ষরূপে এবং পরে দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। শেষজীবন তিনি প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ একজন প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা অভয় পদে লীন হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পৃথিবীর জনসংখ্যা

[বর্তমানে যাহা আছে এবং বর্তমান বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকিলে বিংশ শতাব্দীর শেষে যাহা হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন।]

দেশ	১৯৬৯ খৃঃ	২০০০ খৃঃ
চীন	৭৫.৫ কোটি	১৫০.০ কোটি
ভারত	৫৪.২	১২৫.৯
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৭১.৪	১৭৫.৪
ইউরোপ	৪৫.৬	৫৭.১
আফ্রিকা	৩৩.৮	৮৬.০
দক্ষিণ আমেরিকা	২৭.৫	৭৫.৬
রাশিয়া	২৪.৮	৪০.২
উত্তর আমেরিকা	২২.৬	৩৮.৮
ওসেনিয়া	১.৮	৩.২
মোট—	৩৫৭.২ কোটি	৭৫২.২ কোটি

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর ১১৪তম জন্মোৎসব গত ৪ঠা জানুআরি হইতে আটদিন পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, ভজন, কীর্তন, লীলাগীতি, কথকতা, ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুই দিনের ধর্মসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী ক্ষমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিবানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ভজন-কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট গায়কগণ। কয়েক হাজার নরনারীর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ভজনকীর্তনাদিসহ শহর পরিক্রমা করে। ষোল হাজার নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগমে সুসজ্জিত উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর ছিল।

বৈকুণ্ঠপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা তীর্থে গত ৩১-১২-৬৯ তারিখে জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর ১১৭তম জন্মতিথি উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। উষা ৪ ঘটিকায় বেতারশিল্পী শ্রীমণিরাম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক চণ্ডীগীতি দ্বারা কার্যসূচীর সূচনা হয়। মঙ্গলারতি, মাতৃস্তোত্রম্ ও বৈদিক প্রার্থনা বিশেষ অঙ্গ ছিল। বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্মতিথি উৎসবের আর একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল দরিদ্র বালকদের মধ্যে ৮ টিন বিস্কুট বিতরণ।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৬ই মাঘ (৩০. ১. ১৯৭০) শুক্রবার কৃষ্ণাসপ্তমীতে পরম-পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।



দিব্য বাণী

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ২১
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌॥ ২২

[শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ১৮শ অধ্যায়]

বিবিধ প্রকার দেহমনভেদে ভিন্ন প্রতীত সকল জীবেতে,
সর্বভূতেরই প্রাণের গোপনে
একই অব্যয় আত্মা রাজিত—এ অভেদবোধ যে-জ্ঞানে আনে
সাত্ত্বিক তাহা, (সত্য প্রকট অবাধিত সেই অমল জ্ঞানে)॥

প্রতিটি প্রাণীরই মনবুদ্ধ্যাদি ভিন্ন বলিয়া বাহিরে তারা
একই আত্মার বিবিধ প্রকাশ হলেও দেখায় পৃথক্‌-পারা ;
যে জ্ঞান তারেই আত্মা ভাবিয়া প্রতি জীবকেই পৃথক্‌ বলিয়া,
ভিন্ন আত্মা বলিয়া জানে
রাজস সে জ্ঞান, (দেখে তা বাহির, চাহে না গভীরে সত্তা-পানে)॥

আত্মা অথবা ঈশ্বর যিনি তাঁর সবটুকু সীমিত আছে
কেবল কোনও ব্যক্তিবিশেষে, কেবল একটি প্রতিমা মাঝে,
অন্য কোথাও নাই তিনি আর—যে-জ্ঞানে এরূপ ধারণা হয়
যুক্তিবিহীন সত্যবিরোধী তুচ্ছ সে-জ্ঞানে তামস কয়॥

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ৪৫
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ ৪৬
অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সঃ ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ৪৭

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।২

ভগবানই আত্মা মোর, এই ভগবদ্ভাবে, অভেদত্বে করিয়া গাহন,
ভগবানে, নিজেরও সর্বভূতে করে যে দর্শন,
সবই দেখে সে সত্তায়—ভক্তমাঝে সেজন উত্তম॥
ঈশ্বর-প্রেমিক যেই, ভক্তজনে মৈত্রীভাব যার,
কৃপা করে অজ্ঞানেরে, ঈশদ্বেষী প্রতি যার ভাব উপেক্ষার,
মধ্যম সে, (নিজসনে ঈশসনে সর্বভূতে ভেদদৃষ্টি তার)॥
শ্রদ্ধাভরে হরিপূজা করে যেই শুধু প্রতিমায়
নাহি কিন্তু পূজে ভক্তে, অন্যজনে, সমান শ্রদ্ধায়,
সেজন প্রাকৃত ভক্ত ভকত-সভায়॥

কথাপ্রসঙ্গে

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

আধুনিক যুগে যে-দুটি চিন্তাতরঙ্গ বিশ্ব-মানবের চিন্তাসাগরে সর্বাধিক উত্তুঙ্গ, তাহার একটি হইল বিজ্ঞান, অপরটি সাম্যবাদ।

যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকেই বিশ্ব ও জীবনের মূল সত্তা, মূল কারণ বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, নিজজীবনে উপলব্ধ এই সত্যকে উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুমোদিত পথই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের ঈশ্বর-উপলব্ধির পথে বিশ্বাসই ছিল চিরসহচর একথা সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক চিন্তা ও সংশয়ের মূর্ত প্রতীক ; যুগপ্রয়োজনে তাঁহাকে তিনি শিক্ষাদান করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনেই। আর, ভগবদ্বিশ্বাস, ভগবদ্ভক্তিই যে সাম্যের সুদৃঢ় ভিত্তি তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল, কাহারো কথা শুনিয়া কোন কিছুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয় না। কেহ কোন সত্য আবিষ্কার করিলে তিনি কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনে সে সত্যে উপনীত হইলেন, তাহাও ঘোষণা করিতে হয়। তখন যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহারা সে পদ্ধতিতে নিজেরা সে-সত্যকে

যাচাইয়া দেখিয়া তবে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ কোন কিছু 'বিশ্বাস' করিবার প্রয়োজন নাই —নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইয়া তবে মানো। আর, সে সত্যকে যাচাই করিয়া লইবার দ্বারও সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন তাঁহার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-ভক্তগণকে, বিশেষ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে। বিজ্ঞানীর মতোই বারবার বলিয়াছেন, শুধু তিনি বলিতেছেন বলিয়া ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের কোন কিছু মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই, নিজে 'যাচাইয়া-বাজাইয়া' দেখিয়া নিঃসংশয় হইয়া তবে উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর। নরেন্দ্রনাথ তাহা করিয়াছিলেনও। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম হইতেই প্রাণদিয়া ভালবাসিলেও, প্রতিদানে তাঁহার ভালবাসা পাইবার আশা না রাখিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার দুটি কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিলেও এবং দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয় দর্শনের দিনই তাঁহার অসীম দৈব-শক্তির নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন বলিয়াই তাঁহার কথাগুলি তিনি মানিয়া লন নাই; যুক্তিবিচার সহায়ে, সাধারণজ্ঞান সহায়ে এবং সর্বোপরি নিজ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি সহায়ে সে কথা বা উপলব্ধি-গুলির সত্যতা নিজে 'যাচাইয়া-বাজাইয়া' লইয়া তবে মানিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে 'জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নর-রূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর-ধারণ করিয়াছ' বলিতেছেন শুনিয়া ভাবিয়া-ছিলেন, 'এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ!' ঈশ্বরের অনস্তিত্বের স্বপক্ষে 'তাঁহাকে দেখা যায় না' বলিয়া যে যুক্তিটি এখনো প্রযুক্ত হয়, সেটিও নরেন্দ্রনাথের চিত্তকে কিছুকাল বিপুলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল; দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন কি?" এবং তাঁহার মুখে ইতিবাচক উত্তর শুনিয়া তাঁহার সে কথায় পূর্ণ আস্থাও স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সে সত্যকে যাচাইয়া লইবার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বহু আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে, এমন কি তাঁহার আধ্যাত্মিকতা-প্রসূত আচরণগুলিকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ধাতুদ্রব্য স্পর্শে তাঁহার অঙ্গবিকৃতি ও দেহে যন্ত্রণা স্বতই আসে, না উহা ইচ্ছাকৃত, তাহাও পরীক্ষা করিতে ছাড়েন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণস্বরূপ ভবতারিণী-বিগ্রহকে তাঁহার মুখের উপর 'পুত্তলিকা' বলিতেও দ্বিধা করেন নাই নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন কথা বলিতেও ছাড়েন নাই যে, মাকালী তাঁহাকে অনেক কিছু দেখাইয়া দেন, তাঁহার সহিত কথা বলেন—এসব 'মাথার খেয়াল' মাত্র, ভুল দেখা; পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে মানুষ এমন অনেক ভুল দেখিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া কোন কিছু দেখিবার ইচ্ছা যদি মনে থাকে তাহা হইলে তো কথাই নাই!

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বৈজ্ঞানিক মনো-বৃত্তির দোহাই দিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি আজও আমরা প্রয়োগ করিয়া সগর্বে ভাবি এসব অকাট্য যুক্তি, নরেন্দ্রনাথ সত্যকে যাচাইয়া দেখিবার সময় তাহার কোনটিই প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই। আর বৈজ্ঞানিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে খুশীই হইতেন, ইহাই চাহিতেন—মানিয়া লওয়া নয়,

সর্বপ্রকারে যাচাইয়া লওয়া।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দোহাই যখন দিই, দুটি কথা যেন আমরা না ভুলি। একটি হইল, নরেন্দ্রনাথের মতো যথার্থ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি যেন অবলম্বন করি। মাকালীকে প্রত্যক্ষ করার পর নরেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ঈশ্বর-উপলব্ধি সম্বন্ধে যাহা বলেন, বা শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সত্য অথবা মিথ্যা—এ সম্বন্ধে অভিমত দিবার কোন অধিকারই কাহারো আসে না, যতক্ষণ না সে সে-সব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ঘোষিত নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়া নিজে উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখে। পরীক্ষা করিবার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা না করিয়াই, পরীক্ষাগারে না যাইয়াই বা না-যাওয়া লোকের কথা শুনিয়াই আমরা যেন অবৈজ্ঞানিকের মতো কোন মন্তব্য না করি।

অপর কথাটি হইল, প্রাথমিক বিশ্বাস। আমাদের মধ্যে কয়জন, বিজ্ঞানেরই হউক বা অধ্যাত্মজগতেরই হউক, উচ্চ তত্ত্বগুলিকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মতো যোগ্যতা-সম্পন্ন? কেহই এ যোগ্যতা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না, সকলকেই অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া দীর্ঘকালের চেষ্টায় এ যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। বিজ্ঞানীদের পটভূমিতে থাকে শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন। নরেন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট গমনের পূর্বে ও পরে ছিল চিত্তের শুদ্ধতা ও একাগ্রতার সাধনা। এগুলি যেন না ভুলি আমরা, আর যেন না ভুলি, এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য সকলকেই অগ্রসর হইতে হয় সত্যদ্রষ্টা বা বিজ্ঞানীদের কথায় প্রাথমিক বিশ্বাস অবলম্বনেই। 'আমি যাহা বিশ্বাস করি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যোগ্যতা অর্জনের বৃথা চেষ্টা করিব কেন?'—একথা বলিয়া যদি কেহ হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, সত্যলাভ তাঁহার কোন দিনই হইবে না। বিজ্ঞানের মতো ঈশ্বরতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ-কথা সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ফললাভ কিছু হয়ই, যাহা বিশ্বাস সংরক্ষণে ও বর্ধনে সহায়তা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর-উপলব্ধি বিষয়ে তাই পরীক্ষাগারের কাজের উপর, যোগ্যতা অর্জনের, মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ পবিত্র করার এবং অভ্যাস সহায়ে মনকে একাগ্র করার উপরই জোর দিয়াছেন সর্বাধিক, কারণ মাত্র ইহাই আমাদের সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্য করিতে সমর্থ; তর্ক বা প্রচেষ্টাহীন আলোচনা-মাত্র নহে। সিদ্ধি খাইলে নেশা হয় একথা মুখে বলিলে কি হইবে? চেষ্টা করিয়া সিদ্ধি যোগাড় করিয়া বাঁটিয়া খাইতে হইবে। সিদ্ধি যোগাড় করিয়া আনিয়া হাতে নাড়াচাড়া করিলেও নেশা হইবে না, বাঁটিয়া গায়ে মাখিলেও নেশা হইবে না, খাইতে হইবে। পদ্ধতি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, যেমন করিতে হয় বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে; তবে ফললাভ হইবে। পঞ্চাশ মাইল টেলিগ্রাফের তার হয়তো টানিলাম অশেষ পরিশ্রম করিয়া, কিন্তু তারে একটি জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক থাকিয়া গেল—খবর পাঠানো যাইবে না তাহাতে। রুচি ও সামর্থ্যানুসারে একটি পদ্ধতি অবলম্বনে সত্যকে প্রত্যক্ষ করানোর জন্যই ব্যগ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে বড় প্রমাণ আর নাই। কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া যুক্তি-অনুমানাদিও দাঁড়াইবার ভিত্তিভূমি পায় না। প্রত্যক্ষের সঙ্গে না

মিলিলে যুক্তি অনুমানাদি মূল্যহীন হইয়া যায়। যেমন আজ চাঁদ হইতে প্রত্যক্ষভাবে লব্ধ তথ্য-গুলির সঙ্গে যাহা মিলিতেছে না, বিজ্ঞানীদের এতদিনকার সে-সব অনুমানগুলি বাতিল হইয়া যাইতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান আসিলে অনু-মানাদির মূল্য আর কতটুকু? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন একদা বলিতেছেন, "বিচার আর কি করবো? দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন!"

সাম্যের বাণীর প্রভাব আজ সারা জগতের মানুষের মনের উপর বিস্তৃত। সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া তাহারই ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন প্রয়োজন—এ-চিন্তার পরিধি আজ বিশ্বব্যাপী। কিন্তু এ সাম্যের দৃঢ়ভিত্তি কিছু আছে কি? মানুষ বলিতে যতক্ষণ আমরা তাহার দেহকে এবং দেহের সঙ্গে জাত ও বিনষ্ট, দেহ হইতে অভিন্ন চিন্তাদিকে ভাবিব, তাহার দেহকেই তাহার অস্তিত্বের সর্বস্ব বলিয়া ভাবিব, ততদিন এই দৃঢ়-ভিত্তির সন্ধান পাওয়াই সম্ভব নয়। কারণ মানুষে মানুষে অসংখ্য ভেদ সেখানে আছে, চিরদিনই থাকিবে;—কর্মগত, জাতিগত, চিন্তা-গত, রুচিগত এবং আরো অসংখ্য ভেদ। বর্তমান সময়ে সাম্যবাদী দেশগুলিও যে পরস্পরকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছে না তাহার কারণ ইহাই—প্রয়োজনের বিভিন্নতা, স্বার্থের বিভিন্নতা, চিন্তার বিভিন্নতা প্রভৃতি সেখানে সমদৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই দেহসর্বস্ব ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখা সম্ভবই নয়। যেখানে দাঁড়াইয়া যথার্থ সমদৃষ্টি আসে, সে ভিত্তি কি তবে কিছু নাই? আছে; শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে ভিত্তির সন্ধান দিয়া গিয়াছেন—মানুষের অস্তিত্বের বৈচিত্র্যময় বহির্দেশে নয়, তাহার গভীরে, গভীরতম প্রদেশে দৃষ্টিকে প্রবেশ করাইয়া আসল মানুষটির দিকে তাকাইলেই সে ভিত্তির সন্ধান মিলিবে। সেখানে সত্য সত্যই সব মানুষ এক, সকলেই শিব বা ঈশ্বর—"ঈশ্বর শুদ্ধবোধস্বরূপ, তিনি আমাদের সকলেরই স্বরূপ।"

কিন্তু ইহা শুনিলেই বা বুদ্ধিগত করিলেই তো আর সমদৃষ্টি আসিবে না, এ সত্যকেও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। কারণ প্রত্যক্ষ ছাড়া পাকা বিশ্বাস আসে না। তাই নিজের এবং সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিবার যোগ্যতা যে পথে আসে, তাহাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার, সকলকে সমান-ভাবে ভালবাসিবার পথ বলিয়া গিয়াছেন। বলিয়াছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভক্তি-লাভের প্রচেষ্টাই সে পথ। যথার্থ ভক্তিই সমদৃষ্টি আনিতে সক্ষম—"সব দেশের সব ধর্মের সব লোককে ভালবাসা এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।" দয়া এখানে বিশ্বপ্রেম—"সকলকে সমানভাবে ভালবাসার নাম দয়া।" এ ভক্তি-লাভের, সর্বভূতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করার পথের নির্দেশও তিনি দিয়া গিয়াছেন—প্রাথমিক বিশ্বাস অবলম্বনে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।"

এই "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"ই যুগধর্ম, আধুনিক যুগের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সব সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। মানুষ-জ্ঞানে নয়, ঈশ্বর-জ্ঞানে মানুষের সেবা। নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া নয়, মানুষকে কৃপা করিয়াও নয়, ঈশ্বরারাধনা-জ্ঞানে মানবসেবা, সর্বভূতস্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি অবলম্বনে মানবসেবা। ইহারই মাধ্যমে আমরা কেবল আমাদের আত্মীয়দের, দেশবাসীদের, আমাদের মতাবলম্বীদের বা আমাদের ধর্মা-বলম্বীদের বেশী ভালবাসিবার প্রবণতার অবরোধ ভাঙ্গিয়া 'সব দেশের সব ধর্মের সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসিতে' পারিব, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সাম্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীই আধুনিক যুগের 'সংশয়রাক্ষস-নাশ-মহাস্ত্র' এবং সমদৃষ্টিলাভের শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক।

অপ্রকাশিত পত্র

(ক) স্বামী ব্রহ্মানন্দের : (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

(১)

The Math, Belur (Howrah)
10th June, 1904

My Dear Sashi,

আমি শুনিলাম যে, তোমার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমার ইচ্ছা যে তুমি দিন কতকের জন্য মঠে আসিয়া থাক ; বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এখন কলকাতায় রহিয়াছেন, তাঁহার দর্শনলাভও হইবে। সুতরাং তোমার এখানে একবার আসা খুবই উচিত। তুমি ওখানে অত কাজ করিতেছ। মধ্যে মধ্যে এইরূপ rest না লইলে শরীর breakdown হইবার সম্ভাবনা। অতএব তুমি যত শীঘ্র পার এখানে চলিয়া আসিবে, অন্যথা করিও না।

এখানে সকলে ভাল আছে। তুমি কেমন আছ ? তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। শুকুল ও বসন্তকে আমার ভালবাসা দিবে। আমার শরীর একরকম মন্দ নাই। তুমি কবে এখানে আসিতেছ লিখিবে।

Affly yours
Rakhal Raj

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Sasi Niketan (Puri)
25th July, 1906

My dear Mohantaji Moharajji of Madras Presidency,

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। কালী ভায়ার lecture-এর cuttings খগেন পাঠাইয়াছিল, পড়িয়া বিশেষ সুখ হইল। কালী মহারাজ কোথায় ২ যাইবে বিস্তারিত লিখিয়া যদি পাঠাও তাহা হইলে ভাল হয়। আমার শরীর তত ভাল নাই। প্রথমটা উপকার হইয়াছিল, এখন দিন দিন খারাপ বোধ হইতেছে। শরীরটা একেবারে বিগড়ে গেছে।

Entallyর উপেন এখানে আসিয়াছে। তাহার ৺রামনাথ দর্শন করিতে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। সে এখন বিরাগী বেশে ভ্রমণ করিতেছে। এ সময় ওদিককার climate কেমন ? বর্ষা অত্যন্ত হয় কিনা লিখিবে। আর এখন ওদিকে যাওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা সবিশেষ লিখিয়া সুখী করিবে।

তুমি কেমন আছ ? বাবুরাম দাদা ভাল আছে। তোমায় ও কালীকে প্রণাম, ভালবাসা দিতেছি। ইতি

Yours affly
Rakhal

P. S. How is Khagen ? Our love & best wishes to him.

(পুনঃ খগেন কেমন আছে ? তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে।)

(খ) স্বামী প্রেমানন্দের :

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Math, Balur P. O.
(Howrah)
Dated, 29/4/09

ভাই শশী,

তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অভিরামের হাতে শ্রীশ্রীপ্রভুর জন্য যে যে বাসন ও গামছা পাঠাইয়াছ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুলসীর চিঠি পাইয়াছি। তুলসী কবে বাঙ্গালোরে যাইবে? তাহাকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানাইবে। লাটু মহারাজের চক্ষু গত সোমবারে কাটানো হয়েছে, কোন কষ্ট হয় নাই। চোখের কোন দোষ হবে না। কালী বাগচি কেটেছে। খরচা গিরিশবাবু দিয়েছেন। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই মাসের শেষাশেষি কলিকাতা আসিবেন। শরৎ মা'র দেশেই আছে, মা'র সঙ্গে আসিবে। এবৎসর এখানে নিত্যই বৃষ্টি হচ্ছে, সে কারণ বেশ ঠাণ্ডা। শ্রীশ্রীমহারাজ কি এখন পুরীতে থাকিবেন? মঠে আর আসিতে চান না। মহারাজের অনুপস্থিতিতে এখানকার কাজ ভাল চলে না। কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ আসা উচিত ছিল। তবে সবই শ্রীশ্রীপ্রভুর ইচ্ছা। তুমি আমাদের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে ও সকল ভক্তদের জানাইবে। ইতি দাস

বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
২৫।৫।০৯ ইং

ভাই শশী,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গতকল্য তোমার পুস্তক পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। গত পরশ্ব পরম পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় নূতন বাটীতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁর শরীর খুবই শীর্ণ। ১২ নং গোপাল নিউগীর lane, বাগবাজার, তাঁর ঠিকানা। ভক্তিমতী দেবমাতাকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া মার পৌঁছান সংবাদ দিও। তিনি আমায় ১০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন আমের জন্য। তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে। তোমরা কেমন আছ? গতকল্য শুকুল এখানে এসেছে, আছে ভাল। এখানকার কুশল জানিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাস

বাবুরাম

(গ) স্বামী তুরীয়ানন্দের :

(১)

(আলমবাজার মঠ হইতে ৯. ৭. ১৮৯৭ তারিখ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত পত্রের শেষে যুক্ত)

ভাই গঙ্গাধর,

তোমার পোস্টকার্ড পাইয়াছি। তাই তো এবারেও যদি ভাল ফসল না হয় তো বড়ই ভয়ানক। যা আছে ভগবানের মনে, তাহাই হইবে। শশীর প্রেরিত ৫০০৲ টাকা আসিয়াছে। Miss Muller ৫২।৵০ আনার একখানি চেক পাঠাইয়াছে। শারদা শীঘ্রই যশোহর অঞ্চলে যাইবে। নিত্যানন্দকে রাজা এখানে চলিয়া আসিতে বলিয়াছেন। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে ও সুরেন··· -কে জানাইবে।

ইতি

শ্রী:

(২)

(নিকুঞ্জবিহারী মল্লিককে লিখিত)

শ্রীহরিঃ শরণম্

মায়াবতী
১৬. ৮. '০৫

প্রিয় নিকুঞ্জলাল,

তোমার ১২ তারিখের পোস্টকার্ড পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার ২রা তারিখের পোস্টকার্ডও যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তুমি আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এইবার নির্দ্বন্দ্ব হইয়া প্রভুর উপাসনায় পূর্ণ মনঃসংযোগপূর্বক প্রকৃত শান্তি অনুভব কর—তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা। বহির্মুখী হইয়া জগতের দিকে নেত্রপাত করিলে কেবল অশান্তি ও গোলমাল। বৃথা অশান্তি ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? তুমি পুনরায় রীতিমত আপন ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া সুখশান্তি উপভোগ করিতেছ জানিতে পাইলে বিশেষ প্রীতিলাভ করিব। আমার শরীর প্রায় পূর্ববৎই আছে। দু-এক মাস এখানে থাকিয়া শীতারম্ভে অন্য কোথাও যাইবার ইচ্ছা আছে। যথাসময়ে তোমায় জানাইব। বিপিনকে আমার শুভেচ্ছাদি দিবে। নাট্যনিকুঞ্জের উপরের ঘরে এখন কেহ আছে নাকি? কামিনীবাবু ওখানে আছেন কি? তাঁহার খবর পাই নাই। সকল পরিচিতদিগকে সম্ভাষণাদি জানাইবে। মোহন্তজিকে আমার নমস্কার দিবে। তুমি আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

পণ্ডিত জগন্নাথকে আমার সম্ভাষণ দিও, আমি তাহাকে পত্র লিখিতে পারি নাই, ইহাতে দুঃখিত আছি। ত্রিপুরাকুঞ্জের খবর লিখিও।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার রঙ্গ-কথা

স্বামী বুধানন্দ

(১)

'প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন ॥
সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কি ভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন এক মনে ॥'[১]

দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন শেষের দিনে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন : যাবার আগে প্রেমের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়ে যাব।[২]

যেমন কথা তেমন কাজ।

সেই হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গার দিনটি এসেছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুআরি তারিখে।

ভাবতে সত্যি আশ্চর্য লাগে না কি যে, অবতীর্ণ ভগবান নিজ প্রেমের হাঁড়ি ভেঙ্গেছিলেন আমাদের এই সমস্যা-সমাকীর্ণ কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে। হাঁড়ি ভেঙ্গে নিজ লীলা পুষ্ট করেছিলেন অপ্রকট হবার সাড়ে ছয় মাস আগে।

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তগণ ঠাকুরের ঐ দিনের আত্মপ্রকাশকে 'কল্পতরু রূপ প্রদর্শন'[৩] বলে বিখ্যাত করেছেন ; কিন্তু স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন : '...উহাকে ঠাকুরের অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।'[৪]

ঐ মহিমামণ্ডিত দিনটি কিন্তু গৃহী ভক্তদের কেন্দ্র করেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। সেই জন্যেই বোধ হয় গৃহী ভক্তদের দেওয়া 'কল্পতরু' নামটিই 'লীলার ঈশ্বর'-এর ইচ্ছায় সর্বজন-গ্রাহ্য এমন ভাবে হয়েছে যে, সন্ন্যাসীরাও ঐ নামেই ঐ দিনের উৎসব করেন।

তবে একটি কথা আছে। ভাববার কথা।

আমরা এমন যেন মনে না করি যে, ঐ 'কল্পতরু' নামের আধারে ঐ দিনে অভিব্যক্ত রামকৃষ্ণ-কৃপার সমগ্র আধেয়টি ধরতে পেরেছি। ঐ দিনের ঐ চৈতন্য-ভাস্বর ঘটনাটি একটি মূল-বৃন্ত-হীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ঐ ঘটনাটি অবতীর্ণ ভগবানের একটি কৃপা-প্রেরিত মরমিয়া আত্ম-প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের অনেক কথাই তাই এসে পড়ে।

একথা সম্পূর্ণরূপে মানি যে, আমাদের সহজ ঠাকুরকে কঠিন করে বুঝতে চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে যে, তিনি সহজ হয়েও অমেয়, কাছের মানুষটি হয়েও নিঃসীম। তাই কোন শব্দসমষ্টির বাঁধা ছাঁচে তাঁকে পুরোপুরি ধরে ফেলা যাবে না। মুঠোর মধ্যে গোটা আকাশটাকে যেমন যায় না ধরা, যদিও যায় ছোঁয়া, তেমনি কোন শব্দার্থের মুঠোয় শ্রীরামকৃষ্ণের কোন প্রকাশের সমগ্র বেদন-ব্যঞ্জনাকে যায় না ধরা, যদিও যায় আভাসে পাওয়া।

পূর্ণের এক কণাও পূর্ণ। তাই বলি 'কল্পতরু রূপ প্রদর্শন' কথাগুলিতে শুধু আভাষই আছে। আছে শুধু একটি ইঙ্গিত—একটি বিপুল আলোক-রাজ্যের অনু-রঞ্জন, তার বেশী নয়।

১ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৩১, পৃঃ ৬০৬

২ দ্রষ্টব্য : সেবক রামচন্দ্র : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত, যোগোদ্যান, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃঃ ১৮৩

৩ ঐ : পৃঃ ১৮৪

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৩৯৬

কল্পতরুর কাছে দাঁড়িয়ে চাইতে হয়। যা চাওয়া তাই পাওয়া যায়। ঐ দিনের ঘটনাটিই ধরা যাক। শরীর অত অশক্ত—আহা, বিছানায় উঠে বসতেও কতই না কষ্ট! তবু ভব-মূল শিথিল করে ভ্রাম্যমাণ হলেন কল্পতরু। ঐ উঁচু উঁচু কাঠের সিঁড়িগুলি বেয়ে নীচে নেবে এসে নিজেই ভাঙলেন অমৃত-গড়া প্রেমের হাঁড়ি ভক্তদের সত্তার নিগূঢ় অন্তরে—তবে না হল চৈতন্যের অত ছড়াছড়ি, যেন মুড়ি-মুড়কি।

হাড়গুড়ানো, গলা-কাটা সাধন করে যা হয় না জন্ম-জন্মান্তরে যুগ-যুগান্তে, সে চৈতন্য ঘটে ঘটে ফুটল খোলায় চড়ানো খই-এর মতো। এমন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কেউ কি কখনো শুনেছে পুরাণে, কল্পকথায়, ইতিহাসে? তবু হয়েছিল ঐরূপ ঐদিন আমাদের এই কলকাতায়।

কে চেয়েছিল চৈতন্য-স্ফুরণ সেদিন?
কে পেয়েছিল চাইবার পরে?
কে-ই বা ছিল অধিকারী?

কিন্তু তবু একটি ঈশ-অভীপ্সার কারুণ্য-বেগে সমগ্র কৃপাসাগর বিন্দুবদ্ধ করে যে মহাবাণী উচ্চারণ করলেন একটি মৃদু নিঃশ্বাসের পেলবতায়, তার অপার অমোঘ শক্তিতে কি না ঘটল খণ্ড পলকে! ছিন্ন হল কর্মপাশ, কলুষ হল কৃত্য, খণ্ডিত হল কালডোর। চৈতন্য হল পুষ্পিত জর্জরিত জড়ের অনাহত হৃদয়-গুহায়। চোখে দেখলো—যা ধ্যানেও দেখা যেত না।

সে দিন অধিকারি-নির্বিশেষে চৈতন্য জাগ্রত করলেন। তারপর উপরে এসে অসহ্য গাত্র-দাহ। গঙ্গাজল সারা পায়ে গায়ে মেখে তবে কোন প্রকারে স্বস্তি। মায়ের কথায়, শুধু রসগোল্লা খেতে তো আর আসেননি! তাই বিদ্যুৎ-পলকে সকলের পাপ টেনে নিয়েছিলেন ঐ ভগবতী-তনুতে। সে জ্বালাময় ইতিহাস কি আমরা মনে রাখি! উৎসবের আনন্দে মত্ত হয়ে ভগবানের বেদনাটুকু ভুলে যাই। ভাবি ভগবানকে পেয়েছি আমরা কেঁদে—সাধন করে। তিনি যে কত কেঁদে কেঁদে সেধে সেধে আমাদের অবরুদ্ধ চৈতন্যের দোর গোড়ায় ধন্না দিয়ে অনাহারে পড়েছিলেন, সে কথা আদপে জানিইনে।

(২)

ঠাকুর কল্পতরু—এ তো অতি সামান্য কথা। তাঁর অসামান্য ব্যথার কথা আমরা কি জানি? তিনি যে অযাচিত হয়ে দ্বারে-দ্বারে ঘুরে-ঘুরে চৈতন্য বিতরণ করেছেন গো! সাধনশেষে কলকাতার কাছাকাছি কোথায় যাননি অনাহূত, অযাচিত? যখনই শুনেছেন কোথাও কেউ আন্তরিক সাধন করছে, তারই দুয়ারে উপস্থিত হয়েছেন মান-অপমানের তোয়াক্কা না রেখে। শেষ-সহজের এই চৈতন্য-অভিসারের কাব্যকথা হয়ত কোন দিন কোন মহাকবি রস-নিপুণতায় ব্যক্ত করবেন। সে-দিন হয়ত জানিনি কে এসেছিলেন, কেন। আজ তো আমরা জানি কে এসেছিলেন চাদর মুড়ি দিয়ে সাধকের ঘুমন্ত চৈতন্যের উন্মুখতায় শাশ্বত চৈতন্যের অমর্ত্য অব্যর্থ স্ফুলিঙ্গ রেখে যেতে। অনগ্রতির অদৃশ্য শৃঙ্খলে যারা ছিল বদ্ধ, যাদের সত্য ছিল হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে আবৃত, পথের নেশায় যারা তীর্থ ছাড়িয়ে চলেছিল সেই হারানো নিরুদ্দেশে, যারা নুড়ি নিয়ে খেলতে যেয়ে ভুলে গিছল সোনার খনির কথা, যারা ইষ্টা-পূর্তের আবর্তে পূর্তি খুঁজে খুঁজে ভুলেছিল ইষ্টকে, যারা গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরেছিল ধর্ম বলে, যাদের ধর্মে ছিল না মর্ম, যারা অবস্তুকে মেনে নিয়েছিল বস্তু বলে, যাদের 'বস্তু'-বোধে ছিল অবুঝের তমো-তন্দ্রা—তাদের

কার প্রাণের মশাল জ্বালিয়ে দেননি ঠাকুর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে?

প্রভাতে উঠে দেখি ফুল ফুটেছে। কিন্তু তার পেছনে ধরিত্রীর রয়েছে কত অতন্দ্র সাধনা। এত যে যোগী সিদ্ধ আপ্ত পুরুষ-নারীদের হাট বসল দক্ষিণেশ্বরে তার পেছনে ঐ চৈতন্য-পুরুষের কত ছিল অতন্দ্র সাধনা তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। এ তো আর ঐন্দ্রজালিকের ভেল্‌কি নয়। এ যে প্রাণার্পণ জগত-তারণের সব দেওয়ার সাধনা—তবে তো কৃন্তন-কলিডোর।

কল্পতরুর কাছে গিয়ে চাইতে হয়। তাঁর কাছে গিয়ে যে চাইতেও হয়নি, একমাত্র প্রতিধ্বনির মত ছাড়া। নরেন্দ্রকে প্রথম দিনে কি বলেছিলেন? তুমি এত বিলম্বে এলে কেন? আমি যে তোমার পথ চেয়ে উন্মুখ হয়ে আছি! ঐটিই পুরাণো কবির বিশ্বজোড়া হৃদয়ের আদি ব্যথা—তুমি এত বিলম্বে এলে কেন? ভগবানের আকুতিতেই বিশ্ব ভরে রয়েছে। জীব আর কতটুকু চাইতে জানে!

তিনি তো নিম্নমূল বদ্ধমূল কল্পতরু নন যে, কাছে গিয়ে কথার ঝাঁকা দিয়ে দুটি ফল কুড়িয়ে নিলে ফুরিয়ে যাবেন। তিনি অস্পর্শ্য লোকের উর্ধ্বমূল অধঃশাখ শাশ্বত তরু; আপন করুণায় সদা পরিস্রিয়মাণ শাখা-প্রশাখায়, পল্লবে-ফুলে-ফলে সকল জীবকে সদাই ধারণ করে আছেন।

কবির সেই ব্যথার গাঁথা কি মর্মে-মর্মে সত্যি নয়:

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।"

তিনি চেয়েছিলেন আগে, আমরা চাইবার অনেক আগে। এত সাধনা করলেন কার জন্যে? অত সাধনার ফল নিঃশেষে কার জন্যে দিয়ে গেলেন? ঐ যে সাধন-শেষে কুঠির-ছাদের ওপর থেকে হৃদয়-নিঙরানো, অসহ-বেদনা-বিদগ্ধ আকাশভরা ক্রন্দন তার কি কোন তাৎপর্য নেই, নেই কোন যোগ-সূত্র হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গার সঙ্গে? এমনটি না হলে কি করে হল ঐ চৈতন্য তথ্য 'সুলভ সমাচার'? ঐ ঈশ-ক্রন্দন গিয়ে আঘাত করল অর্ধনিদ্রিত মোহাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়-তন্ত্রীতে। জাগৃতি অনুরণিত হয়ে উঠল প্রাণে প্রাণে। অভিযাত্রীরা একে একে আসতে শুরু করল।

খরস্রোতা ঘোর আবর্ত-সংকুলা বাসনা-নদীর উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ঢেউগুলি ভেঙে ভেঙে উজান বেয়ে গিয়ে আমরা কি ভগবানকে চাইতে জানি? না পারি? একছিটে ভক্তি নিয়ে বড়াই করি—এ আমার নিজস্ব দেয়! কিন্তু মরমীর হিসেব খতালে দেখা যাবে যে আমার এমন অণুটিও দেয় নেই যা তাঁর কাছ থেকে পাইনি। ভগবৎ-হৃদ্‌-স্পন্দনের যে অনুকম্পন জীব-হৃদয়ে হয়, সেই হল ভক্তি।

ভবতারিণীর জন্যে যত কেঁদেছিলেন—নরেনের জন্যে কি তার চেয়ে কম কেঁদেছিলেন? নরেনের জন্যে কাঁদা মানে জীবের জন্যে কাঁদা। জীবের জন্যে কাঁদা মানে তাদের চৈতন্য-জাগানোর আসর জমানো। কত ধৈর্য ধরে, কত দুঃখ সয়ে, কত আশা-প্রতীক্ষায় ধীর-অধীর হয়ে, হেসে-খেলে, নেচে-গেয়ে, কর্ম-কঠোর হয়ে, অতন্দ্র ভক্ত তপস্যা করে আধার তৈরী করে তবে চৈতন্য আধেয় রাখতে পেরেছিলেন। তা না হলে ভঙ্গুর মাটির সরায় কি আর মায়া-বিধ্বংসী চৈতন্যাগ্নির আধেয় ধরত?

চৈতন্য-জাগানোর কাজ ঠাকুর বরাবরই করে এসেছেন। তা না হলে ডোবার ঝিনুক ঐ চৌনু শাখারী ঐ সমুদ্রের শঙ্খকে চিনে-ছিল কি করে? এই গুরুমারা বিদ্যেটা

ঠাকুরের এতই মজ্জাগত ছিল যে, এমনকি নিজ গুরু ভৈরবী ও ন্যাঙটাও তাঁদের অলোক-সামান্য শিষ্যের সংস্পর্শে নব-চৈতন্য লাভ করেছিলেন।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে যখন আনন্দের হাট জমল তখন কত লোক যে এই লেলিহান চৈতন্য-মঙ্গলের উল্লম্ফমান বহ্নিশিখার স্পর্শে নিজ চৈতন্য দীপ্তিমান পেয়েছিলেন তার সংখ্যা কেউ রাখেনি। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন কল্পতরু দিনে চৈতন্য-জাগানো-প্রসঙ্গে :

"কোন কোন ভক্তের প্রতি করুণায় ও প্রসন্নতায় আত্মহারা হইয়া দিব্যশক্তিপূত স্পর্শে তাহাকে কৃতার্থ করিতে আমরা ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় নিত্যই দেখিয়াছিলাম…!"[৫]

কেন-না ঐ করতেই তো এসেছিলেন। কাজেই কল্পতরু দিনেও হয়েছিল পূর্বানুবৃত্তি —তবে একটু বিশেষ ভাবে।

৩

'সম্ভবামি যুগে যুগে' বলেছিলেন কৃষ্ণাবতারে। যিনি অসম্ভব তাঁর এই সম্ভব হবার দুর্বার ও দুরূহ প্রচেষ্টা কেন? এসব 'বে-আইনী'র ঝামেলা কেন?

উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য দুটো।

দুষ্কৃতনাশন ও ধর্মসংস্থাপন।

কিন্তু এই পাঁচ-পোয়ার ঘটিতে অসীমকে আঁটিয়ে নিয়ে এত সব কাণ্ড করতে এলেই বা কি হবে? কে চিনতে পারবে? আক্ষেপ করে কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে—মানুষ-তনুতে আশ্রিত হয়ে এসেছি বলে মূঢ়েরা চিনতে পারে না আমাকে।

ঠাকুরও বলেছেন রহস্যচ্ছলে অবতীর্ণ ভগবানের একটি গুহ্য শংকার কথা :

'বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল!. এলো—গেল, কেউ চিনলে না।'[৬]

এখন ভাল মানুষের মত বলা হচ্ছে 'কেউ চিনলে না'। চিনবে কি করে, রেখেছ যে চোখের মাথা খেয়ে। মায়ামোহে চুবিয়ে জীবকে করে রেখেছ উর্ধ্বশ্বাস, চিনবার অবসরটি কোথায়?

'…মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওমা) তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া
মিষ্টি বলে ঘুরি।'[৭]

নিজেই কিন্তু বলেছেন, তার মায়াতে ভুলে জীব সংসারী হয়েছে',[৮] আবার এখন বলা হচ্ছে: 'কেউ চিনলে না'; দাও না সরিয়ে চোখের আবরণ, দাও না ফুটিয়ে দিব্যচক্ষু, তখন দেখবে চিনি কি না চিনি তোমায়।

ভগবানে মানুষে তফাত সামান্যই। ভগবান হচ্ছেন সেয়ান-পাগল, মানুষ হচ্ছে অজ্ঞান-পাগল।

তাই শুধু যুগে যুগে এলেই হয় না। লজ্জার মাথাটি খেয়ে বলতেই হয়: ওগো, আমি এসেছি। চেয়ে দেখো না কেমনটি এসেছি আমি। কেমন নয়ন-অভিরাম রূপ, কিরীট, অলংকার, জ্যোতি, আয়ুধ-সমন্বিত হয়ে এসেছি। কেন এলাম? ও তোমরা যে সব গোলমাল করে বসে আছো গো। তাই সব আবার সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে এলাম।

---

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দ্বিতীয় ভাগ), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৩৯৫

৬ শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (তৃতীয় ভাগ), ১৩১৫, পৃঃ ২৬৪

৭ রামপ্রসাদের গান থেকে।

৮ শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (প্রথম ভাগ), কথামৃত ভবন, কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ৪৪

আসলে কিন্তু অবতরণ-উন্মুখ ভগবান। তর সয় না মোটে। ভক্ত ছাড়া থাকতে পারেন না। তাই অছিলা খুঁজে বেড়ান! সে যাই হোক, আমাদের বড় লোকের রহস্য-কথায় কাজ কি?

তাই অন্য কাজের কথাই হোক। সব অবতারকেই নানা ভাবে কতিপয় ভক্ত সাধকের কাছে আত্ম-পরিচয় দিতে হয়েছে। অর্জুনকে রথের সারথ্য করে, দিব্যচক্ষু দিয়ে, বিশ্বরূপ দেখিয়ে, নিজের বিভূতি নিজে বর্ণনা করে তবে বোঝানো গিয়েছিল তিনি এসেছেন। তবে তো অত স্তুতি করেছিলেন অর্জুন অন্তর থেকে :

> ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
> স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
> বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
> ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
> পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
> ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
> ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
> লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।[১]

পূর্বে কোন কোন অবতারে অনেক ঐশ্বর্য বিভূতি দেখিয়ে, অনেক মাথাকাটাকাটি রক্তারক্তিকাণ্ড করে তবে দুষ্কৃত-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপন করতে হয়েছিল।

বুদ্ধ-অবতার থেকে আরম্ভ করে বাইরের ঐশ্বর্য-বিভূতির যেমন কমতি পড়েছে, তেমনি মাথাকাটাকাটিও বাদ পড়েছ। মানুষ হঠাৎ বেশী সভ্য হয়ে গিয়েছিল বলে তত নয়। কারণ এরূপও হতে পারে যে কিছু সংখ্যক মাথা কেটে ফেলে আর ধর্মসংস্থাপনের উপায় ছিল না।

শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম যখন ছিলেন চার পায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো, তখন ছিল সত্য যুগ। সংস্থাপিত ধর্মের যুগ। অধর্ম তখন একটা সমস্যা ছিল না বললেই হয়। ক্রমে ধর্ম যখন হলেন তিন পায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো তখন কয়েকটি দুষ্কৃতের মাথা কেটে ফেলে ধর্মসংস্থাপন করতে হয়েছিল। পরের যুগে ধর্ম যখন হলেন দু পায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো, তখন দুষ্কৃত-নাশনের ব্যাপারে রক্তারক্তি আরো বেশী করতে হল। কলিযুগের ধর্মকে বলা হয়েছে শাস্ত্রে একপায়ে দাঁড়ানো গাভীর মতো। এ যুগে যদি মাথা কেটে ধর্মস্থাপন করতে হত তা হলে ঝাড়দুদ্ধ উজাড় হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কয়টা মাথা অবশিষ্ট রইল তা গুণবার লোক বেশী একটা থাকত না।

তাই মনে হয় অবতীর্ণ ভগবান ধর্মস্থাপন-কৌশল বদলে নিলেন। বুদ্ধ অবতার থেকে আরম্ভ করে দেখতে পাই **দুষ্কৃত**-নাশের উপর জোর না দিয়ে **দুষ্কৃতি**-নাশের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এমনি করে ধর্ম-সংস্থাপনের ব্যাপারে একটা বিবর্তনের ধারা স্পষ্টই চোখে পড়ে। এমন কি দেখা যায় যে হাড়-পাপীরাও ঈশ-করুণার একটি বিশেষ অংশ আয়ত্ত করে নিচ্ছেন।

অম্বাপলী ও অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধ বিশেষ কৃপা করলেন, ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেননি। ম্যারী ম্যাক্‌ডেলিন প্রমুখ অধর্মাচারী শ্লথ-চরিত্রের প্রতি যীশু দেখালেন বিশেষ করুণা। শ্রীচৈতন্যের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হল জগাই-মাধাইর উপর। অনেক পাপকর্ম করেও গিরিশ ও তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা ঠাকুরের বিশেষ কৃপার ভাগী হলেন। এই দুষ্কৃতিনাশের ও ধর্মসংস্থাপনের ব্যাপারে প্রত্যেক অবতারের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুধ্যানের বিষয়।

---

[১] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১১।৩৮,৪৩

বুদ্ধ অবতারে চরিত্র-বলে বোধি জাগিয়ে হল দুষ্কৃতি-নাশন ও পঞ্চশীলের শালীনতায় মৈত্রী-প্রেম-করুণায় অভিষিক্ত করে হল ধর্ম-সংস্থাপন।

যীশু অবতারে অবতীর্ণ ভগবান দুষ্কৃতের মাথা না কেটে অন্যথায় আপন রুধিরধারায় করলেন জীবের পাপ-মোচন। আর ধর্ম-সংস্থাপন করলেন ভগবৎশক্তির নিদর্শন সহায়ে —বাইরের বিভূতি ও ভেতরের সম্ভূতি সহায়ে। তাঁর মাঝেও ছিল বোধি-জাগানোর সৌকর্য। পুনরুত্থানের পরে যীশু নিজ শিষ্যদের মধ্যে বোধিকেই বিশেষভাবে জাগ্রত করলেন।

চৈতন্য অবতারে অবতীর্ণ ভগবান ভক্তির উদ্দাম জোয়ারে ভাসিয়ে নিলেন অধর্মের জঞ্জাল, আর তাতেই পড়ল মানুষের মনের জমিতে ধর্মের পলি, যাতে করে ফলেছিল অমন আধ্যাত্মিক সোনার ফসল।

(৪)

রামকৃষ্ণ অবতারে অবতীর্ণ ভগবান এলেন নিরাভরণ হয়ে, এলেন ঐশ্বর্যহীন প্রায়দিগম্বর, ধূলি-আসন, অত্যন্ত সাধারণ সর্বজনের মানুষ হয়ে। তাঁর দুষ্কৃতি-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপনের ব্যাপারটি যুগ-প্রয়োজনে হয়েছে বিচিত্র। প্রথমে ভক্ত হয়ে, সাধক হয়ে, অনেক খড়-কাঠ পুড়িয়ে হাতে-নাতে দেখালেন ভগবান আছেন। তারপর প্রকাশ করলেন কোন কোন ভাগ্যবানের কাছে যে, তিনি আর কেউ নন—যিনি ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে-কেঁদে বলছিলেন: ও জীব, তোমার পায়ে ধরে বলি হরি-নাম বলো, তিনিই—শ্রীহরি।

তারপর একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যস্ত হলেন।

রামকৃষ্ণ অবতারের ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি এই: শুধু যে এসেছিলেন তা নয়। মানুষের প্রাঙ্গণে-অঙ্গনে নৃত্যে-গানে-কথায়-অশ্রুতে নিজেকে ধূলির সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এতটুকু ব্যবধান রাখেননি, এসে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিলেই কি আমরা নিতে জানি? চাই একেবারে পাইয়ে দেওয়া। তাই অতন্দ্র সাধনায় একেবারে পাইয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর এই পাইয়ে দেওয়ার সাধনার সঙ্গে হাটে প্রেমের হাঁড়ি-ভাঙ্গার কাণ্ডটি বিশেষভাবে জড়িত।

তাই জগৎকে বেশীবার মিথ্যা না বলে বললেন: মা-ই সব হয়েছেন। ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে মর্ম-কেন্দ্রিক ধর্ম দিলেন। দিলেন একেবারে নির্যাস-বস্তু, অবস্তু বাদ দিয়ে। তাই বিজ্ঞানের কথা এত করে বললেন: দুধের কথা কানে শুনলে বা চোখে দেখলে বা মাত্র চেখে দেখলে চলবে না। ভাল করে খেয়ে পুষ্ট হতে হবে। তবে বাহাদুর।

নিত্য-লীলা দুই-ই নিলেন। তা না হলে ওজনে কম পড়ত যে! মায়া বলে জগৎকে উড়িয়ে না দিয়ে জগতের মা-কে ভিড়িয়ে দিলেন মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতন্যের দোর-গোড়ায়। কারণ মায়ের সন্তান না হলে জীব হয়ে পড়ে মায়ার কীট।

আর জগতের মাকে অমনভাবে 'আমার মা' বলে পেতে কি কম সাধ্য-সাধন করতে হয়েছিল! রুধির-প্রিয়াকে গলা কেটে দিতে চেয়ে তো হল দর্শন। এত করলেন কেন? মায়ার কীট যাতে মায়ের সন্তান হয়ে বেঁচে-বর্তে যায় সেজন্যে।

দুষ্কৃতি-নাশন করলেন ঠাকুর খণ্ডন-ভব-বন্ধন হয়ে। ভব-বন্ধন-খণ্ডন করলেন কেমন করে? বহু কেঁদে বুক ভাসিয়ে। সম্মুখে

প্রত্যক্ষ ভগবানকে ধরে দিয়ে। চির-উন্মদ প্রেম-পাথার হয়ে। কলুষকে কৃত্যে পরিণত করে। আর আচম্বিতে চৈতন্য-বিদ্যুদাঘাতে।

প্রথমে দেখালেন ভক্ত কেমন করে সব শক্তি দিয়ে একাগ্র হয়ে সাধন করে তাঁর কৃপায় তাঁকে হাতে-নাতে পায়। তারপর দেখালেন নিজ আচরণে ভক্তকে পরমার্থ পাইয়ে দিতে কত ব্যগ্র ভগবান নিজে। এতে দুষ্কৃতি-নাশন ও ধর্ম-সংস্থাপন দুই-ই হল।

ধর্ম-সংস্থাপন করতে ঐ যুগ-কুরুক্ষেত্রে ঠাকুরকে কম লড়াই করতে হয়নি। যুগ-সন্ধিক্ষণে ধর্মকে আপাতবিরুদ্ধ শক্তির লড়াই করে করেই দৃঢ়মূল হতে হয়। ইতিহাসের এ ধারা ঠাকুরের সময়েও অব্যাহত ছিল। তবে তার ছিল প্রকার-ভেদ।

তাই দেখতে পাই প্রবল শৌর্যশালী অবিশ্বাস ও সংশয়ের তরঙ্গ তুলে প্রমাণের সুতীক্ষ্ণ দাবী ঘোষণা করতে এলেন নরেন্দ্রনাথ। পাপ ও উচ্ছৃঙ্খলতার মূর্তি ধরে এলেন ভৈরব গিরিশ। ঐহিকতা ও প্রত্যক্ষবাদের ঠোঁট-কাটা স্পষ্টতায় ঝাঁঝানো হয়ে এলেন ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার। এঁরা যে জোড়ালো পূর্বপক্ষ উত্থাপন করলেন তাতে ছিল কালের কলহ-পরায়ণ কঠিন সংশয়-দ্বন্দ্বের প্রশ্নগুলি। ঐগুলির সুগ্রাহ্য সুমীমাংসা করেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম-সংস্থাপন করতে পেরেছিলেন অমন সহজ প্রফুল্ল স্নিগ্ধতায়।

নরেন্দ্র যেদিন কালী মানলেন, ঠাকুরের আনন্দ হয়েছিল অসীম। কারণ নরেন্দ্র কালী না মানলে সর্বজনকে চৈতন্যের অধিকারী করার মর্মটি সুদুরূহ থেকে যেত। মা-ই সব হয়েছেন কিনা। তিনিই চতুর্বর্গদাত্রী জীবের চৈতন্য খালি-পেটে তো আর হবে না। এখন এত লোককে পেট ভরে হরেক রকমের খেতে দেয় কে? তাই জগতের মা-কে আমার মা বলে না পেলে জীবের গতি নেই। চতুর্বর্গ-দাত্রী আর কেউ নেই। রামকৃষ্ণের এই পরম-কুশলী সর্বকালের সর্বজনের সর্বলাভ-পরিকল্পনাটি একটি অত্যাশ্চর্য ভাববার বিষয় নয় কি? নরেন্দ্র ঐ সত্যধারাটি ধরে যুগধর্ম পরে প্রচার করে ভাবিকালের চৈতন্য-জাগানোর উপায়টি সুভগ করে রেখে যাবেন বলেই হয়ত অত আনন্দ হয়েছিল ঠাকুরের নরেন্দ্র কালী মানায়।

গিরিশের পাপ নিলেন। কেন না তিনি কপালমোচন। মেঘের আবরণ না ঘোচালে সূর্যের আলো প্রকাশিত হত কি করে?

প্রত্যক্ষবাদের ও বিজ্ঞানের প্রতিনিধি ভারতে সায়েন্স এসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সরকারের সকল বাক্যবাণ সয়ে ওঁকে ধীরে ধীরে আয়ত্তে আনলেন ঠাকুর, কারণ এ যুগে ধর্ম-সংস্থাপন বিজ্ঞানের প্রশ্ন না মিটিয়ে করা চলবে না। তাই নরেন্দ্র ও অন্যদের হাতে ত্রস্ত বালকের মতো বারে বারে পরীক্ষিত হতে উদ্‌গ্রীবভাবে রাজী হলেন। নিজেই বললেন বাজিয়ে নিতে তাঁর অনুভূতি ও কথা। প্রত্যক্ষের উপেক্ষা নেই, অপেক্ষা আছে। ভগবানের শ্রদ্ধার নিদর্শন তাই দেখতে পাই অণুর অন্তরের বিচিত্র বিশ্বে।

ঠাকুর তাঁর বিচিত্র ধর্ম-সংস্থাপনের ধারাটি প্রবাহিত করেছিলেন ঐ রুগ্ন শয্যায় শায়িত থেকে। কেনই বা নয়—'একাংশেন স্থিতো জগৎ' যে।

(৫)

আরো কথা আছে। নিগূঢ় কথা। ঠাকুর আরো আন্তর ভাবে ও গোষ্ঠি-ব্যষ্টির মাঝে ধর্ম-সংস্থাপন করলেন, তন্ত্র-যোগ-ভক্তি-বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ করে ও করিয়ে।

মা-কে সদাই দেখছেন—কথা কইছেন—সঙ্গে নিয়ে ফিরছেন—মা বৈ কিছুই জানেন না। একঘর লোকের সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ এলেন মা বানারসি শাড়ি পরে—স্বাগত জানালেন ঠাকুর। অন্য কেউ দেখতে পেল না—কিন্তু শুনতে পেল তো সত্যপুরুষের মুখ থেকে: মা এসেছেন। এই না-দেখার দেখা, ঐ কি কম দেখা গো? কার গাত্র হয়ে ওঠেনি কণ্টকিত?

মা আছেন ও এসেছেন—এ পরোক্ষ অনুভূতিই কি কম প্রত্যক্ষ? এখন শুধু দর্শন সাফ করে নিলেই হলো। কতটা পথ এগিয়ে-এগিয়ে থাকা গেল। এ যে একেবারে পথের শেষের ঈশ-অঙ্গন। এত আলো ক'রে রেখে গেছেন সব। আর কেন অন্ধের দ্বারা নীয়মান হব—সে অন্ধ যত বড় পণ্ডিতই হোক?

কাশীপুরে থাকাকালীন শরীরে এত নিদারুণ যন্ত্রণা অথচ ঈশ্বরীয় কথার বিরাম নেই। বসে আছেন সহাস্যবদন। খেলছেন ফুল নিয়ে। সংসারের কণ্টকিত দুঃখবৃন্তে ফুটে আছেন একটি আলোক-ঝলমল আনন্দ-শতদল।

এই সেই কূটস্থ যোগীর অবস্থা—কামারের নাই-এর ওপর শত-সহস্র আঘাত করছে—তবু নির্বিকার। 'যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' যাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন এ অবস্থা, যোগশাস্ত্রে তাঁদের বিশ্বাস না হয় কিরূপে?

সে রাত্রিতে অসুখের খুব বাড়াবাড়ি। কলকাতায় লোক পাঠানো হল। নবগোপাল কবিরাজকে নিয়ে গিরিশ এলেন গভীর রাত্রিতে। ঠাকুরকে ঘিরে ভক্তেরা বসে আছেন—বিমর্ষভাবে। ঠাকুর বলছেন মৃদু স্বরে সেই আশ্চর্য কথা:

'দেহের অসুখ, তা হবে। দেখছি পঞ্চভূতের দেহ।'

গিরিশের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি। তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি।'[১০]

মণির হাত থেকে পাখাটি হাতে নিয়ে বললেন: "এই পাখা যেমন দেখছি,—সামনে প্রত্যক্ষ, ঠিক অমনি আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি। আর দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি…।"[১১]

কে ঐ কথাগুলি বলছিলেন?

ভাল করে ভেবে দেখেছি কি যিনি ঈশ্বর তিনিই বলছিলেন ঈশ্বরীয় কথা? তাই বলছিলুম ঠাকুর বরাবর চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করার কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। কল্পতরুর দিনে বাচ-বিচার না করে সকলকে ধন্য করেছিলেন তাতেই একটু বেশী প্রচার হয়ে পড়েছিল। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গাতেই হৈ-চৈ হয়েছিল খুব।

চৈতন্য কি ঠাকুর ঐ একদিন জাগিয়েছিলেন আর তারপর সব হয়েছে অন্ধকার? আমরা যে আলোক-দ্যুলোকের উত্তরাধিকারী গো! একথাটি জানতে হবে।

এই যে আমাদের সংসারের দগ্ধ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আনন্দের পূর্ণ ঘটটি বসিয়ে রেখে গেলেন, এই যে আমাদের মা—এঁকে কি আমরা সাধন করে পেয়েছি? এমন লোক কে আছে চরাচরে একজন যে আমাদের মাকে দেখেছে অথচ যার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হয়নি? জেগে ওঠেনি ভেতরে একটি ঘুমন্ত শুভ শক্তি? ক্রিয়াশীল হয়নি অন্তরে একটি শিব-সংকল্প?

১০ শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় খণ্ড, ১৩৭৪, পৃ. ২৪৯

১১ ঐ, পৃ. ২৫৮

মা-ই ঠাকুরের জ্ঞানাঞ্জন। ঐ অঞ্জন যার চোখে লেগেছে তার দৃষ্টি খুলে গেছে। তাকে আর আঁধারে কেঁদে বেড়াতে হবে না। মা-কে যে অত করে বললেন যে, তাঁকেও দেখতে হবে ঐ অসংখ্য নিম্নদৃষ্টি কীটগুলিকে, যারা আঁধারে কিল-বিল করছে, এতেও ছিল না কি জীবের চৈতন্য-স্ফুরণের জল্পনা? আর ঐ যে পিঁপড়ের সারিকে মা অতন্দ্র সাধনায় পরমান্ন জোগালেন এত কষ্ট সয়ে, এ দেখেও কি হবে না আমাদের চৈতন্য যে পিঁপড়ের মা-ই জগতের মা? ঐ যদি হল আর বাকি রইল কি?

আর ঐ যে প্রোজ্জ্বল হিরণ্যপুরুষ যাঁর বাণীতে অগ্নি-বিন্যাস, দৃষ্টিতে প্রেমপীযূষ, গতিতে ধর্ম-বিস্তার—তিনি যে দেশে-দেশান্তরে কম্বু-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন: 'ওঠ, জাগো, চরৈবেতি,' আর ঐ যে চলল মানুষের মিছিল ইতিহাসের তেপান্তরের নানা পথে, রত হল জগৎ জুড়ে ভেতর-বাইরের শৃংখল-ভাঙ্গার সাধনায়, নবারুণরূপে আবাহন করল সব জাগরণকে, ভাষা দিল মূকের মুখে, আশা দিল পিষ্ট হৃদয়ে—ঐটিও ছিল ঠাকুরেরই চৈতন্য-জাগানোর শৈলী। নরেনকে যে এত যত্নে ও সতর্কতায় গড়ে তুললেন দিব্য ভাস্করের মতো এর পেছনে ছিল জীবোদ্ধারের স্বচ্ছ জল্পনা জীবোদ্ধারের শৈলীটিই এ যুগে চৈতন্য-জাগানো তাই নরেনকে করলেন ভ্রাম্যমাণ চৈতন্য-মশাল। সমাধিলাভের পরেও নরেনের শান্তি কেড়ে নিলেন। আর তাঁর বিশাল হৃদয়ে ধরিয়ে দিলেন অহেতুক জীব-প্রেমের আগুন। তারপর সে-আধারে নিজ সকল আধ্যাত্মিক শক্তি ঢেলে দিয়ে হলেন ফকির। ফিকিরটি কিন্তু এই: আরো অনেক দিন ধরে জীবো-দ্ধারের দুরূহ কর্মে, চৈতন্য-জাগানোর কর্মে রত থাকা। বিবেকানন্দের মাধ্যমে ঠাকুর জগতে যে কি কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন তার খোঁজ কয় জন ঠিক-ঠিক রেখেছে!

ঐ পুণ্যদেহে অত কঠিন ব্যাধি হল কেন? দেখতে আমাদের মতো হয়ে এসেছিলেন কিনা। আমাদের মতো রোগজীর্ণ দেহে বাস করেও যে ঈশ-রসে মজে থাকা যায় এটি বিশেষ করে প্রমাণ করতে কি?

অন্য কারণও ছিল।

প্রথম কারণ গিরিশের পাপ গ্রহণ করে তাঁর দেহে ব্যাধি। বললেন: 'গিরিশের পাপ! আহা! ও যে কষ্ট ভোগ করতে পারবে না!'

এই যে জীব-কারুণ্যের হৃদয়বিদারী নিদর্শনটি দিলেন অবতীর্ণ ভগবান, এতেও কি জীবের চৈতন্য উদ্‌বুদ্ধ হবে না? ভগবানের যে কত প্রাণের বস্তু মানুষ, আমরা যে তাঁর কাছে কি, এতেও কি হাড়ে হাড়ে বুঝব না?

অসুখের দ্বিতীয় কারণ: ভক্ত সেবকদের তাঁর চার পাশে একত্র করা, এক সূত্রে গেঁথে দেওয়া, এক সংঘে সংহত করা।

তৃতীয় কারণ নিজেই নির্দেশ করেছেন এ কথায়: "এরই ভেতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন। যখন প্রথম এই অবস্থা হল দেখলাম জ্যোতিতে দেহ জ্বল জ্বল করছে। বুক লাল হয়ে গেছে। মা-কে বললুম, মা, বাইরে প্রকাশ হয়ো না, ঢুকে যাও। তাই তো এখন এই হীন দেহ।"[১৩]

এই হীন দেহ হয়েছিল বলেই আকাশের অযুত সূর্য আপন কিরণ স্নিগ্ধ করে শুকনো খড়ের ওপর মানুষের দাওয়ায় বসে অত অমৃত প্রেমালাপ জমাতে পেরেছিলেন। এত কাছে এত নিবিড় ভাবে এত সহজে অবতীর্ণ

১৩। শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ খণ্ড, ১৩৭৩, পৃ: ২৪০

ভগবানকে কে কবে পেয়েছিল? অযুত সূর্যের প্রভায় যদি বিভাসিত হতেন, পারতুম কি আমরা তখন তাঁকে নিজের ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসতে বলতে? আর তাতে দুষ্কৃতিনাশন ও ধর্মসংস্থাপন এমন ভাবে হচ্ছিল যে, শুকনো মাঠের আল বেয়ে আর যেতে হচ্ছিল না—মাঠের ওপর দিয়েই সোজা পাড়ি!

ঐ প্রবাহ আজো বয়ে চলেছে। পরম কারুণিক ঠাকুরের করুণাপ্রবাহ কত ভাবে যে জীবের চৈতন্য-জাগরণের কর্মে রত আছে আজ এই ভূ-বিশ্বে তার পরিমাপ করা সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। পরিমাপের প্রয়োজনও নেই।

(৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর কাছে প্রণত-বদ্ধাঞ্জলি হয়ে এ কথাটি শুধু বলব উপসংহারে: আমরা রামকৃষ্ণভক্ত, এ সত্যটির যাথার্থ্য যেন অনুভূত হয় আমাদের মর্মে মর্মে। এ কথাটি যেন আমরা স্বপ্নেও না ভুলি।

প্রথম কথা: যাঁরা রামকৃষ্ণভক্ত তাঁরা হবেন সত্যাশ্রয়ী, ধর্মাচারী ও অভয়।

তাঁরা যে শুধু সত্যাশ্রয়ী হবেন তা নয়, তাঁরা সত্যকে করবেন বহ্নিমান ও বেগবান।

তাঁরা যে শুধু ধর্মাচারী হবেন তা নয়, তাঁরা ধর্মকে করবেন প্রাণবান, হৃদয়বান।

তাঁরা যে শুধু অভয় হবেন তা নয়, তারা করবেন অভয়দান।

তাঁরা সত্যের, ধর্মের ও অভয়ের অগ্নি-বিন্যাস করবেন সকল চিন্তায় ও কর্মে।

যাঁরা জেনেছেন-মেনেছেন ভগবান আছেন ও ভগবানলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, তাঁরা এমন ভাবে চিন্তা ও কর্ম করবেন যাতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে প্রতি পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া চলে সহস্র বিরুদ্ধ ভাব ও বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে। অন্যেরা অধর্ম করছে বলেই তাঁরা বিভ্রান্ত বা পথভ্রান্ত হবেন না। এক বর্ষায় জল হল না বলে কি খানদানী চাষী চাষ ছেড়ে দেবে?

যাঁরা রামকৃষ্ণ-ভক্ত তাঁরা ঐহিকতার বর্ণাঢ্যে ভুলবেন না কিছুতেই। যাঁরা 'বস্তু'র সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরা কি আর 'অবস্তু'র ঝলকে ভোলে? তাঁরা নিশ্চিতই হবেন 'বস্তু'-বাদী।

যাঁরা রামকৃষ্ণ-ভক্ত তাঁরা হবেন মায়ের ঘরের ছেলে। তাঁরা শক্তি সাধন করবেন: দেহের শক্তি, মনের শক্তি, আত্মার শক্তি। তাঁরা মনের শক্তি দিয়ে দেহের শক্তিকে সংযত—সংহত করবেন ও আত্মার শক্তিতে মনের শক্তি লয় করবেন। আর তাঁরা এ কথাও নিশ্চয় জানবেন: ভক্তিই শক্তি।

এই ভক্তি-শক্তির জোড়ে-তোড়ে তাঁরা এগিয়ে যাবেন অন্তরে-বাহিরে, ধাপে-ধাপে, ত্যাগে-সেবায়, করায়ত্ত করবেন অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স।

যাঁরা সত্যি শক্তিশালী তাঁরাই প্রেমিক হতে পারেন। এই প্রেমটিই সব চেয়ে বিশেষ-ভাবে দেয়। রামকৃষ্ণ-ভক্ত হবেন প্রেমের প্রস্রবণ, কারণ তিনি ছিলেন 'চির-উন্মদ-প্রেমপাথার।'

প্রেমিক হবেন নীলকণ্ঠ। তাঁকে সব দিয়ে বিষটুকু কেড়ে নিতে হবে যাতে সকলে উত্তীর্ণ হতে পারে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর সোপানে। তাই চাই বিষ হজম করার শক্তি। প্রেমই সেই শক্তি। পবিত্রতাই প্রেমের উৎস। তাই চাই চিত্তশুদ্ধি।

আজকের এই বৈপ্লবিক দিনে ধর্মান্বেষীদের চাই স্বচ্ছ দৃষ্টি, সোৎসাহ কর্মকুশলতা আর

বুকভরা সাহস। এই ধর্মক্ষেত্রে তাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। ভগবান তাই এই শাশ্বত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন: 'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।' আবার বললেন: 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।' এই আদেশ শিরোধার্য করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বিরুদ্ধ শক্তির মাঝ দিয়ে। তবে অনাহত থাকবার ও নিশ্চিত জয়ী হবার কৌশলটি জানা থাকা চাই। কৌশলটি অতি সহজ: চাই স্মরণে মননে জীবনের সকল সংগ্রামে ভগবানকে জড়িয়ে নেওয়া। আর তাঁর জ্ঞানের আলোকে, প্রেমের আলোকে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যুঝে যাওয়া। তারপর ফলাফল তাঁতে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হওয়া।

এমন ভাবে এগিয়ে গেলে একদিন নিশ্চয় আমরা দেখতে পাব কেমন অভাবিত ভাবে আমাদেরই জীবনে সত্য হয়েছে অবতীর্ণ ভগবানের প্রাণ-নিঙড়ানো শেষ আশীর্বাদ: "তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।"

এ কথাটি একটি শুধু শুভ ইচ্ছা নয়। এটি অবতীর্ণ ভগবানের একটি বিশেষ পূর্ণ আবির্ভাব। এতে রয়েছে ভগবানের যা দেয় তারই ঘনীভূত নির্যাস, আর ভগবানের জ্ঞান-শক্তি ও ত্রাণশক্তি এক-কেন্দ্রিক করে দেওয়া। সকলকে দেওয়া।

তাই এ আশীর্বাদ অক্ষয় ও অব্যর্থ।

"কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর।
আপনি বিরাজমান লীলার ভিতর॥"[১৪]

১৪ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৩১, পৃঃ ৬০৩

নাহং নাহং

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এ কথা বলিতে যেন পারি মুহুর্মুহুঃ—
—আমি নহি, আমি নহি, তুহুঁ তুহুঁ তুহুঁ।
জীবনের কুরুক্ষেত্রে ভগ্ন-উরু আমি
কাঁদিয়া আকুলকণ্ঠে কহি, অন্তর্যামী,
তোমার তোমার আমি! নহি কারও আর।
তুচ্ছ বিত্ত, তুচ্ছ খ্যাতি, তুচ্ছ অহঙ্কার!
হৃদয়ের দ্বার-প্রান্তে আছো প্রতীক্ষিয়া—
কখন্ দুয়ার খুলি লইব বরিয়া
তোমারে আমার রিক্ত নিরাসক্ত মনে!
যাই, যাই, যাই প্রভু! কমল-চরণে
এখনই সঁপিয়া দিব শূন্য মোর হিয়া!
জীবন-বাঁশরি মোর দিবে না ভরিয়া
দিব্যসুরে প্রিয়তম! মৃতকল্প মোরে
ডুবাও ডুবাও তব অমৃত-সাগরে।

শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার আদর্শ ও শিক্ষা

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী তেজসানন্দ

বিবদমান কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ নিবারণকল্পে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাষ্ট্রদূতরূপে শান্তির প্রস্তাব লইয়া কৌরবসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি শান্ত, সংযত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! জ্ঞান ও বিদ্যায় পারদর্শী, আত্মসংযমশীল, সাহসী ও বিচক্ষণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে আপনারা সন্ধি করুন। এই সন্ধি হইতে কেবল যে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনগণেরই আনন্দ বৃদ্ধি হইবে তাহা নহে; সমগ্র ভারতেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহারা হিতৈষী বন্ধুগণের হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য না করে, তাহারা অন্তিমে অপরিসীম দুঃখভাগী হয়।"

শ্রীকৃষ্ণের এই জ্ঞানগর্ভ হিতোপদেশ কৌরব-সভায় সমবেত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের অন্তরে সাড়া জাগাইলেও, দুর্মতি দুর্যোধন উহাতে কর্ণপাত না করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন—

"যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥"

—হে মাধব! তীক্ষ্ণসূচ্যগ্রদ্বারা বিদ্ধ ভূমিটুকুও আমি পাণ্ডবগণকে (বিনাযুদ্ধে) প্রদান করিব না! দুর্যোধনের এই দম্ভ ও হঠকারিতার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল এবং দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইল। পাণ্ডব-সেনাপতি গাণ্ডীবধারী অর্জুনের নির্দেশে তাঁহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথস্থাপন করিলে, অর্জুন যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতৃতুল্য ব্যক্তিগণ, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, তথা শ্বশুর ও সুহৃদ্‌বর্গ যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি সেই বান্ধববর্গকে দর্শন করিয়া অতীব করুণাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে মধুসূদন! যাঁহাদের জন্য আমাদের রাজ্যভোগ ও ধনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহারাই এই রণক্ষেত্রে ধন-প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সমবেত হইয়াছেন। হে সখে! ইঁহারা আমাকে হত্যা করিলেও আমি ইঁহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। এই পৃথিবীর কি কথা, ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্তও আমি ইঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। শোক-ব্যাকুলহৃদয়ে অর্জুন এই কথা বলিয়া ধনু ও শর পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি নিশ্চেষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, অর্জুনের এই মানসিক চাঞ্চল্য ও ক্ষত্রিয়জন-বিগর্হিত দুর্বলতা সাময়িক মাত্র। তাই, মোহগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষাত্রধর্মোচিত কর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার হিতার্থে ত্রিকালদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমবেত সৈন্যগণের তুমুল হুঙ্কার ও অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মধ্যে তাহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই হিতোপদেশই পুণ্যভূমি ভারতে ও বহির্জগতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে অভিহিত। তিনি বলিতে লাগিলেন—

হে অর্জুন! জীবমাত্রেরই আত্মা কোন সময়েই জন্মগ্রহণ করে না এবং কখনও হত হয় না। দেহাদির ন্যায় একবার জন্মলাভ করিয়া ইহা পুনর্বার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

বস্তুতঃ, অস্ত্র এই আত্মাকে ছিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না। অজ্ঞানতা-বশতই সকলে এই ভূমারূপে বিদ্যমান এক সর্বব্যাপী আত্মাকে নানাভাগে বিভক্ত মনে করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকে অনন্ত, অজর, অমর ও অবিভাজ্য বলিয়াই জানেন। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহের বিনাশ হইলেও ধীর বিদ্বান ব্যক্তি কখনও মোহের বশবর্তী হইয়া আত্ম-বিস্মৃত হন না। এমতাবস্থায় তোমার মতো বিজ্ঞ বীরের পক্ষে এইপ্রকার দুর্বলতা শোভা পায় না। তুমি এই অশোভনীয় ক্লৈব্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

এই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপাতবিরোধী সকল যোগ, মত এবং পথেরও সমন্বয় সাধনপূর্বক অর্জুনকে মাধ্যম করিয়া বিশ্ববাসীকে আরও শুনাইলেন—

"জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, ফলাভিসন্ধিবর্জিত কর্মযোগিগণও সেই স্থানই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্য ও যোগ— এই দুইটি উপায়কে যিনি এক বলিয়া দেখিতে পারেন, তিনি যথার্থ বস্তুদর্শন করিয়া থাকেন।" ৫।৫

"সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজন্য ফল পরিত্যাগপূর্বক জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনাময় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" ২।৫১

"সমাহিতচেতা যোগী সর্ববস্তুতেই সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন এবং আত্মাতেও সকল ভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া থাকেন।" ৬।২৯

"তুমি আমাতেই (বিশ্বরূপ পরমেশ্বরেই) সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণকে স্থাপিত কর এবং আমাতেই অধ্যবসায়বতী বুদ্ধি নিবেশিত কর। তাহা হইলেই তুমি আমাতেই বাস করিতে পারিবে অর্থাৎ আমার স্বরূপপ্রাপ্ত হইয়া আমাতেই মিলিত হইতে পারিবে—ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।" ১২।৮

তিনি অবশেষে ইহাও বলিলেন,—"আমাতে হৃদয় অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ সর্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ-রূপ ভক্তি করিলে আমাকেই পাইবে—ইহা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।" ১৮।৬৬

বস্তুতঃ জ্ঞানযোগী 'নেতি নেতি'-মূলক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দ্বারা অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মায় আরোপিত উপাধিসমূহ বর্জনপূর্বক যে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, কর্মযোগী ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া সকল কর্মফল শ্রীভগবানে সমর্পণপুর্বক নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে সেই চরমজ্ঞানেরই অধিকারী হইতে সমর্থ হন। এইরূপে যোগ-ধ্যাননিরত যোগী পুরুষ আত্মসংযমরূপ যোগা-ভ্যাস দ্বারা এবং ভক্তবৃন্দ ভগবানে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া অবিচল দৃঢ় নিষ্ঠা ও অব্যভিচারিণী ভক্তির সাহায্যে অন্তিমে সেই লক্ষ্যেই পঁহুছিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিলেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥" ৪।১১

—হে পার্থ, যে-সকল ব্যক্তি যে প্রয়োজনের জন্য আমাকে অবলম্বন করে, আমি তাহা-দিগকে সেই প্রয়োজনদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকি। সর্বপ্রকারেই মনুষ্যগণ আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

শিবমহিম্নঃস্তোত্রেও অনুরূপ কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" ৭

—যেরূপ ঋজু-কুটিল বিভিন্নপথগামী নদীসমূহ অন্তিমে একমাত্র অনন্ত সাগরেই মিলিত হয়, হে ঈশ্বর! তদ্রূপ রুচিভেদে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও, অবশেষে তাহারা পরমাত্মাস্বরূপ তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পরমকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা অর্জুনকে সর্বশেষে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার অবিদ্যাজনিত সকল ভ্রান্তি চিরতরে অপনোদনপূর্বক বলিলেন,—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥" ১৮।৬৬

—অর্থাৎ তুমি সর্বপ্রকার ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর; তুমি শোক করিও না। আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব।

শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে
বচনং তব॥" ১৮।৭৩

—হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি আত্মতত্ত্ববিষয়ক স্মৃতি (অর্থাৎ জ্ঞান) লাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং আমি স্থির হইয়াছি। আমি তোমারই কথানুসারে কাজ করিব।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। মিথ্যা বা শঠতা কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। তাই, সত্যদ্রষ্টা ঋষি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয় ভগবদ্গীতার অন্তিম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"
১৮।৭৮

—যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয় বর্তমান, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, সম্পদ এবং অব্যভিচারিণী নীতি,—ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।

কুরুক্ষেত্র মহারণে ধর্ম-ও নীতিপরায়ণ পাণ্ডবগণেরই জয় হইল,—বিশ্বমঙ্গলবেদীমূলে দানববৃত্তির মহাবলি ঘটিল। জগৎকল্যাণ-চিকীর্ষু যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি গীতা-মুখে সর্ব মত ও পথের সমন্বয়বার্তা প্রচার করিয়া মানবজাতির সম্মুখে যে উদার সর্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিলেন, তাহা চিরকাল সত্যপথযাত্রী সকলের পক্ষেই পথপ্রদর্শকরূপে প্রোজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। বিশ্বজগতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আমরা গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবা, নিরভিমানিতা ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে,—তিনি সর্বজনপূজ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে গৃহীত হইলেও, তিনিই স্বেচ্ছায় ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়যজ্ঞে আমন্ত্রিত সমবেত অতিথিবর্গের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন,—'কোন কাজই তুচ্ছ বা নীচ নহে।' তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রেমের অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার রাতুলচরণ বন্দনা করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃজনী-প্রতিভা

বিদ্যমান এবং প্রত্যেকেই অনন্তশক্তির আধার। অজ্ঞতাবশতঃ সে তাহার অন্তর্নিহিত অমিত শক্তি বিস্মৃত হইয়া নিজকে দুর্বল ও হীন মনে করে এবং তজ্জন্য কর্মদক্ষতা হারাইয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরাশ হইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে দিনাতিপাত করিয়া থাকে এবং সমাজ-দেহে পরগাছাতুল্য হইয়া সমাজ-শরীরের রক্তশোষণ করে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের অন্তরের সুপ্ত পুরুষকার জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"
৬।৫

—সংসার-নিমগ্ন আত্মাকে আত্মার শক্তির সাহায্যেই সেই সংসার হইতে উর্ধ্বে উঠাইবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু।

বস্তুতঃ, এই পুরুষকারই সকলের ভাগ্য-নিয়ন্তা ও ভাগ্যনির্মাতা। আত্মবিস্মৃত ভারত অমিত শক্তির আধার হইয়াও আজ নিজকে দুর্বল মনে করিয়া প্রগতির পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা ও পাথেয় হারাইতে বসিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, —দুর্বলতাই পাপ। আত্মশক্তি জাগ্রত করিয়া এই দুর্বলতারূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন,—আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য, এমনকি জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। এই ধর্মেই আমাদের জাতীয় মন, জাতীয় প্রাণ-প্রবাহ দেখিতে পাইবে। ইহাই অনুসরণ কর, তোমরা মহত্ত্ব-পদবীতে আরূঢ় হইবে; যদি উহা পরিত্যাগ কর তোমাদের মৃত্যু নিশ্চয়। বেদান্তের আলোক প্রত্যেকের গৃহে লইয়া যাও, প্রত্যেক গৃহে বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবন গঠিত হউক, —প্রত্যেক জীবাত্মায় গূঢ়ভাবে যে ঈশ্বরত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে জাগ্রত কর। তাহা হইলেই তোমার সফলতার পরিমাণ যতটুকুই হউক না কেন, তোমার মনে এই সন্তোষ আসিবে যে, তুমি মহাকার্যের জন্য জীবনযাপন করিয়াছ এবং মহাকার্যে প্রাণ দিয়াছ। যেরূপেই হউক, সেই মহাকার্য সাধিত হইলেই মানবজাতির ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণ হইবে।

আজ হইতে কিঞ্চিদধিক সত্তর বৎসর পূর্বে ত্রিকালদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন, আর কেহই এক্ষণে ইঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃশক্তিই এক্ষণে ইঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।" তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক ও সফল হইয়াছে। ভারতবাসী পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা-অর্জনের পর হইতে ভারত-বাসীর সম্মুখে যে-সকল গুরুতর সমস্যা সহস্র-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রগতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইলে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের নর-নারীকে সংঘবদ্ধ হইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। চারিদিক হইতে আজ বহিঃশত্রু ভারতের সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করিবার জন্য হুমকি দিতেছে। এই সঙ্কট-মুহূর্তে অসীমবীর্যশালী ভারতের পক্ষে কোনপ্রকার দুর্বলতাই শোভা পায় না। ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দেশ-প্রেমিকের কণ্ঠে তাই উদাত্ত গম্ভীর স্বরে উদ্গীত হইয়াছে,—

"ঈশান, তুমি বাজাও বিষাণ, কর চেতনা দান।
কোটি কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক, দীপক রাগিণী গান॥
তাথৈয়া তাথৈয়া রুদ্রতালে নাচুক
সকল প্রাণ
জন্মভূমির সম্মানতরে হও সবে আগুয়ান॥
হের নাকি ঐ অরাতিসৈন্য, ভারতসিংহদ্বারে।
হুঙ্কারে সদা দম্ভভরে, স্বাধীনতা হরিবারে?
আত্মকলহে জীর্ণ তোমরা শিথিল
সমাজ-মূল
জান না কি তুমি এই দুর্দিনে শত্রু
হানিতে শূল?
ডাকিছে জননী বীর সন্তানে, রাখিতে
তাঁহার মান।
লক্ষ কোটি জোয়ান যেথায়, হবে তাঁর অপমান?
মৃত্যুভীতি দূর হোক, শুনি জননীর
আহ্বান।
বীরদাপে চল উন্নত শিরে, হিন্দু-মুসলমান॥
জাগরে ভারত! এ ঘোর নিশায়, ঘুম কি
তোমার সাজে?
দুর্বার বেগে এগিয়ে চল,
নিখিল বিশ্ব মাঝে॥

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে বিষাদগ্রস্ত মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে মহা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—"ক্লৈব্যং মাস্মি গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"২।৩ —সেই শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সর্বপ্রকার ভীতি ও দুর্বলতা পরিহারপূর্বক ভারতের নর-নারীকে তাহাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষাকল্পে ও তাহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আজ সমবেতভাবে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে,—ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও আদর্শকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিগর্ভ বাণী ও সর্বজনীন আদর্শ সার্থক ও সফল হইবে।—ভারত-সংস্কৃতির মূল উৎস উপনিষদও এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া উদাত্ত গম্ভীর স্বরে বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

—তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপর দিয়া গমন যেমন বিপজ্জনক, সংসারের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কুটিল পথে বিচরণ করাও তেমনি দুষ্কর। সুতরাং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সমুন্নত জীবন ও আদর্শকে অবলম্বন করিয়া আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর এবং মনুষ্যত্বাপহারী সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া জীবনপথে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হও। শিবাঃ সন্তু নঃ পন্থানঃ।—মঙ্গলময় হউক আমাদের সকলের যাত্রাপথ।

এস মধু ফাল্গুন

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

বিশ্বদুলাল!
এই মধু ফাল্গুনে পুণ্য লগনে
নিখিল হৃদয়ে এস গো আজ,
সাজায়ে তোমারে মানস কুসুমে
পূজিব হৃদয়ে হৃদয়রাজ।

আজি আর্ত ধরার দুঃখ ঘুচায়ে
তোমারি আলোয় সবারে জাগায়ে
দ্বন্দ্ব-বিভেদ কলুষ ঘুচায়ে—
ঘুচাও ধরার বেদনা-লাজ,
সাম্যের রথে জগতের নাথ
হে রামকৃষ্ণ! এস গো আজ

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাস। আমি ৯ম শ্রেণীতে পড়ি, দশম শ্রেণীতে উঠব। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়ে আমি বাড়ীতে বসে আছি এমন সময় আমার এক কাকা কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এলেন! তাঁর যখন ফিরে যাবার সময় হলো তখনও আমার স্কুল বন্ধ। তিনি হঠাৎ একদিন আমাকে ডেকে বললেন—'কিরে, যাবি আমার সঙ্গে বেড়াতে? তোর তো স্কুল এখনও বন্ধ, চল্ না বেড়িয়ে আসবি।' এ প্রস্তাবে আমি একেবারে লাফিয়ে উঠলাম। চিরকাল আমার বেড়াবার সখ, এ সুযোগ কি ছাড়ি? কাজেই চললাম তাঁর সঙ্গে বেড়াতে তাঁর কর্মস্থলে। তিনি তখন কাজ করতেন রংপুর জেলার ছোট একটা শহরে। লালমণিরহাটের কাছেই এই শহর।

কাকার কাছে আছি, এমন সময় লালমণির-হাট স্কুল খুলে গেল। আমার ছোট ভাই অর্থাৎ কাকার বড় ছেলে হরিপদ (প্রেমরূপানন্দ) এই স্কুলে পড়তো। তার আহ্বানে চললাম তার স্কুল দেখতে একদিন। সেখানে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সান্যালের সঙ্গে ঘটনা-ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। তিনি দু-একটা প্রশ্ন করার, পরেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'তুমি পড়বে আমাদের স্কুলে?' আমিও না ভেবেচিন্তে বলে বসলাম—'তা পড়তে পারি, বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে দেখব।' বাড়ী থেকেও সহজে অনুমতি পেয়ে গেলাম। কাজেই লাল-মণিরহাট স্কুলে ভরতি হয়ে গেলাম।

প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমারও তাঁকে অত্যন্ত ভালো লাগতো। নিত্য তিনি তাঁর বাসায় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। একবার বা একাধিক বার আমি যেতাম। কখনও কখনও ছুটির পর যেয়ে রাত নটা পর্যন্ত কাটিয়ে আসতাম। কেন যেতাম? কিসের আকর্ষণে যেতাম? প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য। শুধু তিনি নন, তিনি, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রীও। তাঁর দুই মামা মঠের সন্ন্যাসী, তাঁর দুই জ্ঞাতি-ভাইও মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আমাকে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা শুনাতেন। শুনতে শুনতে আমি কোন্ জগতে চলে যেতাম, সময়ের খেয়াল থাকতো না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনে যাচ্ছি—তাঁর ক্লান্তি নেই, আমারও নেই। কখনও কখনও বই পড়তে দিতেন, তাও পড়তাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাঁর মা শুনতে চাইতেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি

করে পড়ে শুনাতাম তাঁকে। প্রধান শিক্ষক ধ্যান-জপ করতে বলতেন। বাড়ীতে ফিরে যেয়ে যতক্ষণ পারি ধ্যান-জপ করতাম। অন্য শিক্ষকেরা বলতেন—বৃত্তি পেতে হবে, পরে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে। প্রধান শিক্ষক বলতেন—'ওসব কথায় তুমি কান দিও না, তুমি ভালো সাধু হও—এই আমি চাই।' একদিন তাঁর এই কথা শুনে তাঁর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন—'এ কি তোমার কথা? পরের ছেলেকে সাধু হতে বলছ; পার তুমি তোমার নিজের ছেলেকে সাধু হতে বলতে?' প্রধান শিক্ষক উত্তর দিলেন, 'আমার ছেলে যদি সাধু হয়, তাহলে সেটা তার এবং

আমাদের সমস্ত বংশের সৌভাগ্য বলে আমি মনে করব। প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-সব সন্তানদের দেখেছেন, তিনি তাঁদের কথা বলতেন। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ—এঁদের সঙ্গ তিনি করেছিলেন। আমাকে বলতেন—'মহাপুরুষ মহারাজ মঠে বিরাজ করছেন। এই বেলা যেয়ে তাঁকে ধরো, তাঁর কৃপাভিক্ষা কর, তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে চেষ্টা কর।' আমি মনে মনে তখন থেকেই মহাপুরুষ মহারাজকে গুরুপদে বরণ করে নিলাম। ভাবলাম যে-ভাবে হোক মঠে যেয়ে তাঁর পাদপদ্মে শরণ নেবো।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি কলকাতায় এলাম। ইচ্ছা মঠে যাব, তারপর দেশে ফিরব। বিদায় নেবার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁর মামা পূজনীয় সত্যেন মহারাজ (স্বামী আত্মবোধানন্দ)-এর নামে এক পত্র আমার হাতে দিলেন। তিনি জানতেন না যে, সত্যেন মহারাজ তখন মায়াবতীতে তাতে কিন্তু আমার কোন অসুবিধা হয়নি। ট্রেনে আসতে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা কিনলাম। যত দূর মনে পড়ে—'স্বাধীনতা'। সেইটাই তার প্রথম সংখ্যা। পাতা উল্টাতেই দেখি মহাপুরুষ মহারাজের ছবি। তিনি আশীর্বাদ করেছেন পত্রিকাটিকে। বার বার তাঁকে প্রণাম করলাম। কলকাতায় খিদিরপুরে দাদার কাছে উঠলাম। সেখানে দু-এক দিন থাকার পর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মঠের উদ্দেশে। কোন্ দিকে মঠ কোন ধারণাই ছিল না। সমস্ত পথ জিজ্ঞেস করতে করতে চললাম। কলকাতায় সাইকেল চড়ার কি নিয়ম-কানুন কিছুই জানতাম না। যেভাবেই হোক মঠে পৌঁছুতে হবে এই ছিল খুব সম্ভব সকাল দশটায় বেরিয়ে পড়েছিলাম, মঠে যখন পৌঁছুলাম তখন বিকেল তিনটে। ঠাকুরঘর কেবল খোলা হয়েছে। বেলুড় বাজারের পথ দিয়েই বোধ হয় মঠে ঢুকেছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরের সামনে আসতে একজন মহারাজকে .পেলাম। শ্রীশ্রীমহারাজের মন্দিরে প্রণাম করে ঐ মহা-রাজের নির্দেশ অনুসারে ঠাকুরঘরের দিকে চললাম। তখনও মন্দির হয়নি, পুরাতন ঠাকুরঘরে ঠাকুর রয়েছেন। দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে পা দিতেই মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের পশ্চিম দিককার জানালা খুলে গেল। কি দেখলাম, ভাষায় তা বর্ণনা করতে পারব না। কি দিব্যকান্তি মূর্তি! মানুষের এমন রূপ হয় জানতাম না! আমাকে দেখে ভয়ানক খুশী। বললেন—"তুই কোথা থেকে এলি? আয়, আয় আমার কাছে।" কয়েক বার বললেন এ কথা। আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। কি বলব, কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তখন মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"যা, ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়।" স্বপ্নাবিষ্টের মতো আমি ঠাকুরঘরে যেয়ে প্রণাম করে নীচে নেমে এলাম। ততক্ষণে দুজন সন্ন্যাসী আমাকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে উপরে গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি আমার পরিচয় নিলেন। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি এবং সাইকেলে করে খিদির-পুর থেকে সমস্ত পথ এসেছি শুনে তিনি অবাক্। এত ছোট ছেলে কি করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল, কি করে কলকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়ে সাইকেলে করে এলো—এ তিনি ভাবতেই

পারেন না! সবাইকে ডেকে ডেকে তিনি বলতে লাগলেন—"দেখ, দেখ, এইটুকু ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে আবার এতটা পথ সাইকেলে করে এসেছে!" আমি বাস্তবিক অতটা ছোট ছিলাম কিনা সন্দেহ। আমার বয়েস তখন ষোল, তবে দেখতে হয়তো ছোট ছিলাম। তিনি অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোন কথারই উত্তর গুছিয়ে দিতে পারলাম না। চিরকাল আমি মুখচোরা আর ঐ বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে এসে আমার জিহ্বা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয় ভক্তি মিশিয়ে আমি একেবারে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো অন্তর্দ্রষ্টা, তাই আমি কথা বলতে না পারলেও আমার মনের কথা বুঝতে পারছিলেন। তাই এত ধৈর্য ধরে আমাকে বারবার প্রশ্ন করে আমাকে দিয়ে আমার কথা বলিয়ে নিচ্ছিলেন। বেশ অনেকক্ষণ এইভাবে চলার পর একজন সেবককে বললেন,—"একে জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে পরিচয় করে দাও, আর কিছু প্রসাদ দিয়ে দাও।" আর আমাকে সাবধানে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন, আমি জ্ঞান মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের প্রণাম করে পরিপূর্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের প্রতি এমনই আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম যে, তারপর দিন আবার ঠিক সেই সময়ে মঠে যেয়ে উপস্থিত। আমাকে দেখেই মহাপুরুষ মহারাজ বলে উঠলেন—"তুই আবার এসেছিস্? তোর কি পড়াশুনা নেই?" আমি বললাম—"মহারাজ, আমার তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন আবার কি পড়াশুনা?" তিনি বললেন—"তা হোক, তুই এরকম ঘন ঘন আসবি, তারপর তোর বাড়ীর লোক আমাদের দোষ দিক, বলুক আমরা তোকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি।" আমার বাড়ীর লোক এ বিষয়ে খুবই উদার ছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগলো। আমি সেদিন জ্ঞান মহারাজ ও অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে এলাম।

তার দু'এক দিন পরে আবার মঠে গেলাম। খুব ভয়ে ভয়ে গেলাম, পাছে আবার ধমক খাই। এবার কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ বিশেষ কিছু বললেন না। একটু যেন ঔদাসীন্য দেখালেন। তাতে আরো ভয় পেয়ে গেলাম। আমি সেদিন হয়তো যেতাম না, কিন্তু দেশের বাড়ীতে যাচ্ছি, তাই যাবার আগে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম। সাহস করে সে কথা যদি বলতে পারতাম, তাহলে হয়তো তিনি আমাকে ক্ষমা করতেন। কিন্তু বলতে পারলাম না।

পরীক্ষার ফল বেরুলে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। কলেজে পড়ার সময় প্রায় প্রত্যেক রবিবার মঠে যেতাম। সকালে যেতাম, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতাম। বিশেষ বিশেষ উৎসব-দিনেও যেতাম। কখনও-কখনও রাত্রি-বাসও করেছি। মঠে যেয়েই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতাম, আবার আসার সময় তাঁকে প্রণাম করে আসতাম। কোন কথা বলতে আমার সাহস হতো না, কিন্তু তিনি করুণাভরে আমার দিকে তাকাতেন, তাতেই আমি যথেষ্ট মনে করতাম। কখনও হয়তো তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"কিরে, কেমন আছিস্?" আমি কোনমতে উত্তর দিয়ে পালিয়ে আসতাম। ৩।৪ মাস এভাবে যাতায়াতের পর মঠের কয়েকজন মহারাজ আমার অভিভাবক-স্থানীয় হয়ে গেলেন। তাঁরা আমার ইহকাল-পরকালের চিন্তা করতেন। তাঁদের একজন একদিন আমাকে

জিজ্ঞেস করলেন আমি দীক্ষার কথা ভেবেছি কিনা। আমি নিত্য নিজের খেয়ালমত ধ্যান-জপ করতাম দীক্ষার কথাও ভাবতাম, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজকে বলতে সাহস হতো না। এই কথা শুনেই বললাম—'যদি ব্যবস্থা করে দেন, খুব ভালো হয়।' তিনি বোধহয় সত্যেন মহারাজকে বলেছিলেন, কারণ কিছু-দিনের মধ্যেই সত্যেন মহারাজ এসে আমাকে ডেকে বললেন —'আয়, আমার সঙ্গে।' সঙ্গে আরও দু-একজন মহারাজ চললেন। আমি সত্যেন মহারাজের পিছনে চললাম জড়সড় হয়ে। বুক কাঁপতে লাগলো, ভয় যদি মহাপুরুষ মহারাজ অযোগ্য বলে ফিরিয়ে দেন। অযোগ্য তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে আমার এত দিনের স্বপ্ন ও সাধ যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সত্যেন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে যেয়ে বললেন—'মহারাজ, এই ছেলেটি বেশ ভালো, এ কি বলতে চায় আপনাকে।' আমাকে উনি ঠেলে দেবেন এভাবে—আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। এ সব ক্ষেত্রে কি বলতে হয় তাও জানতাম না। কোন রকমে বলে ফেললাম—'মহারাজ, আমাকে কৃপা করুন।' বলেই কাঁদতে লাগলাম। একটু স্মিত হাসি হেসে করুণাসাগর মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"তুমি দীক্ষা চাচ্ছ? তা দেখ, বাবা, আমরা তো আর পেশাদারী গুরু নই। তুমি ঠাকুরের নাম করবে, সে তো ভালো কথা। বল আমার সঙ্গে সঙ্গে", বলেই মহামন্ত্র বলতে লাগলেন। তাঁর চক্ষু মুদ্রিত, ধ্যানাসনে তাঁর বিছানায় বসেই মন্ত্র বলতে লাগলেন। ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে মহা-রাজরা সবাই বেরিয়ে গেছেন। আমি মেঝেতে তাঁর দিকে মুখ করে বসে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলাম। কতক্ষণ এ ভাবে কাটল আমি বলতে পারি না। মহা-পুরুষ মহারাজের কণ্ঠস্বর থামতেই আমার খেয়াল হলো। তিনি বললেন—"যাও, এবার ঠাকুরঘরে যাও।" আমি নীচে নামতেই একজন মহারাজ বললেন—'তুমি স্নান করে ঠাকুরঘরের বারান্দায় যেয়ে বসে থাক, মহা-পুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরে তোমাকে আবার মন্ত্র দেবেন।' তাঁর কথায় আমি তা করলাম বটে, কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ আর আমাকে ডাকলেন না। আমি বিকেলে প্রণাম করতে যেয়ে সামান্য প্রণামী দিয়ে এলাম তাঁকে।

এর কিছুদিন পর একদিন গঙ্গার দিক্‌কার বারান্দার বেঞ্চ ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা, এই সময় আমি যেয়ে তাঁকে জানালাম যে, আমি যেখানে থাকি সেখানে ধ্যান জপ করতে বসলে অন্যেরা ভয়ানক ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। আমি তাই রাস্তায় চলতে চলতে ঈশ্বরের নাম করি। শুনে তিনি খুব খুশী হলেন, বললেন, "যেখানেই হোক ঈশ্বরের নাম করলেই হলো, যত পার তাঁর নাম কর, নাম করে ধন্য হয়ে যাও।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তবে দেখ, বাবা, গাড়ী চাপা পড়ো না যেন।" বলে একটু হাসলেন। আমিও হাসলাম। তাঁর ধারণা আমি তখনও ছেলে-মানুষ। এ সব কথার পর হঠাৎ আমার বুকে হাত দিয়ে দু-একটা কথা বললেন। অদ্ভুত সে-সব কথা! সে-সব কথার তাৎপর্য তখন বুঝিনি, এখনও বুঝতে পারিনি। সব শেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তাও বলে দিলেন। এই শুভ দিনের স্মৃতি মনে জাগলে আমি অবাক্ হয়ে যাই। আমার জীবনেও যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে—এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না!

প্রায়ই মঠে গেলেও সবদিন মহাপুরুষ মহারাজকে একা পেতাম না। প্রায়ই ঘরে ভক্ত বা সাধুরা থাকতেন। প্রণাম করে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমিও থাকতাম। অনেকে অনেক প্রশ্ন করতেন মহাপুরুষ মহারাজকে, তিনি উত্তর দিতেন শুনতাম। আমারও ইচ্ছা হতো প্রশ্ন করি, কিন্তু কখনও সাহস হয়নি প্রশ্ন করতে। আমার যে কোন প্রশ্ন ছিল তা নয়, তবে সবাই করছে দেখে আমারও করতে ইচ্ছা হতো। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কখনও কোন প্রশ্ন যদি সত্যসত্যই মনে জাগতো, তাহলে প্রায়ই দেখতাম সেই প্রশ্ন কেউ না কেউ করেছে আর মহাপুরুষ মহারাজ তার উত্তর দিচ্ছেন। আরো মজা লাগতো যখন দেখতাম, ঐ প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় তিনি মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন প্রশ্নটা আমিই করেছি! একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। অনেক লোকের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রায়ই দেখতাম মহাপুরুষ মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন ইশারা করে বলছেন! তাঁর ইশারার অর্থ অন্ততঃ আমি যা করতাম তা হচ্ছে—"খুব হবে, বাবা, খুব হবে।" এ হয়তো আমার কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনা করে আমি অনেক সাহস পেতাম। একবার কিন্তু আমাকে মুখেও একথা বলেছিলেন আমি কি একটা যেন বলেছিলাম, তাঁর উত্তরেই একথা বলেছিলেন। তখন আমি সাধু হয়েছি এবং মঠে আছি। সেদিন তাঁকে একা পেয়েছিলাম। আর একদিনও আমাকে অভয় দিয়েছিলেন, আমি তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠে থাকি, কোন এক ছুটিতে মঠে এসেছি। ছুটি শেষ হবার মুখে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম। বললাম—'মহারাজ, আমি বিদ্যাপীঠে ফিরে যাচ্ছি।' তিনি বেশ জোর গলায় বললেন—"যা না, বাবা বৈদ্যনাথ আছেন, তিনি দেখবেন। ভয় কি?" এই সময়ে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে 'দেওঘরের কানাই' বা 'লম্বা কানাই' বলতেন। আমি ততদিনে বেশ লম্বা হয়ে গেছি।

একবার এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমি মঠে আছি, এমন সময় আমার চেয়ে কয়েক ক্লাস নীচে পড়তো এমন একটি যুবক এসে বললো, 'আমি দীক্ষা নেবো আপনি ব্যবস্থা করে দিন।' সে আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে মঠের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে সোজা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেলাম। সেদিন কোথা থেকে এত সাহস হলো বলতে পারি না। যেয়ে ছেলেটির পরিচয় দিয়ে বললাম—'মহারাজ, আপনি একে কৃপা করুন।' কী এক দিব্য হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! বললেন—"বেশ, হবে। বস্ তোরা দুজন।" আমরা মেঝেতে বসে পড়লাম। কেন বসতে বললেন বুঝতে পারছিলাম না। বসতে পারব কিছুক্ষণ তাঁর কাছে—এই তো যথেষ্ট। আমরা বসলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোকে কি মন্ত্র দিয়েছিলাম বল্।" আমি তো প্রমাদ গনলাম। অন্য লোক থাকতে মন্ত্র বলি কি করে? আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি বললেন—"আরে ছোঁড়া, আমাকে বলতেও তোর আপত্তি?" তখন আশ্বস্ত হয়ে বললাম। আশ্চর্যের বিষয়, আমার ঐ সঙ্গীটিকে আমার মন্ত্রই দিলেন, ঠিক যেভাবে আমাকে দিয়েছিলেন, সেই ভাবেই দিলেন। আমার ঐ সঙ্গীটি এত সহজে তাঁর কৃপা পাবে তা ভাবতেই পারেনি। সে বুদ্ধিমান। ফুল, ফল সঙ্গে করে কিছু এনেছিল, সেগুলি মহাপুরুষ মহারাজকে দিল, আর তাঁকে প্রণাম করে মহাখুশী হয়ে বাড়ী চলে গেল।

একবার মহাপুরুষ মহারাজের জন্মদিন। সেবার খুব ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। কী চোখ-ঝলসানো রূপ তাঁর সেদিন দেখেছিলাম! কতবার যে লুকিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি তার ইয়ত্তা নেই! মাঝে মাঝে যেয়ে প্রণামও করছিলাম তাঁকে। প্রত্যেকবারই আমার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি এবং মৃদু হাসি। বারবার এভাবে যেয়ে প্রণাম করছি দেখে একজন সেবক বলে উঠলেন—'তুমি কতবার প্রণাম করবে?' আমি বেশ স্পর্ধা সহকারে বললাম—'আজ যতবার খুশি প্রণাম করব, কারো বাধা মানব না।' বলেই মহাপুরুষ মহারাজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি মৃদু হাসি দিয়ে আমার এই উক্তির সমর্থন করছেন।

এ ভাবের ছোট-খাটো ঘটনা মনে পড়ে, কিন্তু তার তাৎপর্য আমার কাছে যতটা, ততটা অন্যের কাছে হবে তা আমি আশা করতে পারি না। এই সব ছোট-খাটো ঘটনার ভিতর দিয়ে যে করুণা আমি লাভ করেছি, তার স্মৃতি এখন আমার সহায় ও সম্বল। দুঃখ হয়, কেন আরো তাঁর কাছে যাবার চেষ্টা করিনি। এত সহজলভ্য তিনি ছিলেন অথচ দায়সারা প্রণাম করা ছাড়া তাঁর কাছে ঘেঁষবার আর কোনো চেষ্টাই করিনি। যতটুকু কৃপা তাঁর পেয়েছি, তা তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলেই পেয়েছি—আমার যোগ্যতার জোরে নয়, চেষ্টার ফলেও নয়।

এসো মা জগদ্ধাত্রী

সেখ সদরউদ্দীন

এসো মা জগদ্ধাত্রী ধরায়, কোলে তুলে ধরো,
তোমার ছেলে—জগৎ কাঁদে, দুঃখ হরণ করো।
অনেক দিন সে কোল পায়নি, নাও মা কোলে নাও,
ধুলো-কাদা লেগেছে গায়, দাও মা ধুয়ে দাও।

অবোধ শিশু, তাই বোঝে না অনেক কিছুই হায়,
দিবস-রাতে কত হাজার করছে সে অন্যায়।
ভুল করেছে, তবুও মা, তোমারই সে ছেলে,
পাপের গ্লানি মুছবে মাগো স্পর্শ তোমার পেলে।

তাইতো বলি জননী গো, কাঁদিয়োও নাকো আর,
নাও তুলে মা কোলে আবার জগৎকে তোমার।
অজ্ঞানতায় বদ্ধ জমাট দূর হোয়ে যাক্ রাত্রি,
নূতন আলোয় ভুবন ভরে এসো জগদ্ধাত্রী!

সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

দুই অধ্যাপক বন্ধু পরস্পর আলাপরত। একজন বললেন, "এমন একটি নাম করুন তো যে নাম শোনামাত্রই বিশ্ববাসীর মনে মহা আনন্দ ও অসীম উদারতার ভাব জাগে।" অপর জন উত্তর দিলেন, "নিঃসন্দেহে বলা যাবে. লোকপাবন সেই নাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। যে নাম অগণিত মানুষের ইষ্টনাম, যে রূপ সাধকের ধ্যানগম্য, যাঁর কথামৃত শুনলেই মনে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, সে নামের, সে রূপের মহিমা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। জগতে জন্মগ্রহণ করেছেন বহু মহাপুরুষ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে যেমন সর্বজনীন ভাব আছে. তেমন আর কোথাও নেই। সর্বসংস্কারমুক্ত সর্বভাবময় দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাই সব দেশের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে আকৃষ্ট হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ, সন্দেহ ও সংশয়বাদের যুগও। এই যুগে শিল্প-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি, নব নব আবিষ্ক্রিয়া। ঊনিশ শতকে যখন পাশ্চাত্য দেশ শিল্প-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন ক'রে সমগ্র পৃথিবীতে জড়বাদ-প্রচারে সচেষ্ট, তখন ভারতবাসীও পাশ্চাত্যের আপাতমনোরম ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাই-ই জীবনে একমাত্র অবলম্বনীয় ব'লে ভেবেছিল। ভারত তখন বৈদেশিক শক্তির নাগপাশে পরাধীন, তার স্বাধীন সত্তাও অবলুপ্ত-প্রায়। ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আধ্যাত্মিকতা সব কিছু মন্দ এবং পাশ্চাত্যের যা কিছু সবই ভাল—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তৎপর হয়েছিল।

প্রাচ্য মনীষা ও অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতিভূ ভারতবর্ষ। উৎকট ভোগবাদের করাল কবল থেকে জগৎকে রক্ষা করবার গুরুদায়িত্ব যেন ভারত-প্রতিভার উপর ন্যস্ত। ভারতের প্রাণ-পুরুষ জেগে উঠলেন। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই যে শ্রীভগবান আবির্ভূত হন! মানুষ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভুলে গেলে যুগে যুগে যাঁর আবির্ভাব হয়, তিনিই এবার ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হলেন।

কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ একের পর এক সাধনা করলেন। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের মন বিচারশীল. সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চায় না, তাই এত সাধনার প্রয়োজন হ'ল। সাধনা দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী জগজ্জননীকে প্রত্যক্ষ করলেন। নানা ধর্মের বিরোধে তখন চারিদিক মুখরিত। বিভিন্ন ধর্মের সাধনায় তিনি উপলব্ধি করলেন সর্ব ধর্ম সত্য এবং স্বার্থপূর্ণ ভোগবাদের জগতে যাপন করলেন অভূতপূর্ব নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনত্যাগের মহিমময় জীবন। সংশয়বাদের যুগে যথার্থ বিজ্ঞানীর মতো একটির পর একটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সর্বসংশয়ের মূলোচ্ছেদ করলেন। যুগ-যুগ-প্রবাহিত 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণে মিলিত হয়েছে। মনীষী রোঁমা রোঁলার ভাষায়: "Sri Ramakrishna was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people."—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক পরিণতি।

একটি জীবনে যেন অনন্ত জীবন! যে শক্তি ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রে অভিনব দিব্যভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, যে শক্তি দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণে আবির্ভূত হয়ে গীতামৃত বর্ষণ করেছিল, যে শক্তি শ্রীবুদ্ধকে রাজ্যসুখ ভোগ করতে না দিয়ে করুণামৈত্রীর জীবন্ত মূর্তিতে পরিণত করেছিল, যে শক্তি যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের অন্তরে বৈরাগ্য ও প্রেমের অনির্বাণ অনল জ্বালিয়েছিল, সেই শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে পূর্ণভাবে বিদ্যমান।

শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে যখন যুগলীলায় অবতীর্ণ হন, তখন কেউ বোঝেনি যে ইনিই তিনি—যিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের ধর্মমহাসমরে :

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥"

তাঁর কৃপায় যাঁরা দিব্য দৃষ্টি পেয়েছিলেন তাঁরাই বুঝেছিলেন, তাও অনেক পরে। যখন তাঁর অলৌকিক সাধনার ফল—সহস্রদল কমল পূর্ণভাবে বিকশিত, চতুর্দিক সৌরভে আমোদিত, তখন আর তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না, ভক্তের আকৃতিতে ধরা দিলেন—স্বমুখে ঘোষণা করলেন স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ বেদমূর্তি—তাঁর জীবনে বেদ-বেদান্ত মূর্ত—তাঁর জীবনালোকে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটিত। কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠার নিখুঁত উদাহরণ তাঁর মহাজীবন। তিনি জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে সব সমর্পণ করেছিলেন, কেবল শুদ্ধা ভক্তি চেয়ে বলেছিলেন, "মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও, মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।" সব মাকে দিয়েছিলেন, দিতে পারেননি কেবল সত্য। সত্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তিনি, সত্যবিগ্রহ। মনে এক, বাইরে অন্য—এরূপ নয় এক মুহূর্তের জন্যও; শুদ্ধ মনে যা উঠেছে তাই করতে হয়েছে এমন ছোট-বড় অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে। অসত্যের অভিনয় পর্যন্ত নেই তিলমাত্র। 'যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ'—এ উক্তি সত্যমূর্তি রামকৃষ্ণেরই। বলেছেন 'মন মুখ এক করা'র কথা, 'সত্য কথাই কলির তপস্যা।'

অন্যান্য অবতারের ন্যায় বিশেষ ক'রে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন আবাল্য অলৌকিকতায় ভরা নয়। শ্রীরামচন্দ্রের মতো তিনি ধনুকে টঙ্কার দেননি, শ্রীকৃষ্ণের মতো পাঞ্চজন্য বাজাননি। রাক্ষস বা অসুর নিধন করেননি, কিন্তু নিহত করেছেন মানুষের মনের সংশয়রূপী মহারাক্ষসকে, মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন তার রিপুদলের। মৃৎশিল্পী যেমন মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করেন, তিনি তেমনি মানুষের মন নিয়ে ইচ্ছামত ভাগবত ভাবের গড়ন দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে অলৌকিকত্বের প্রকাশ কোথায়? তাঁর অলৌকিকত্ব সাধনায়, ত্যাগে, প্রেমে, পবিত্রতায়, লোকশিক্ষায়।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ক'রে বলেছিলেন: "আমরা এত বেদ-

বেদান্ত পড়েছি, কিন্তু এই মহাপুরুষে তার ফল দেখছি; এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে, পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।"

ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে অবাক্ হয়েছেন: "কি আশ্চর্য, এ যে ঠিক যীশুখৃষ্টের মতো কথা! গ্রাম্যভাষা! সেই গল্প ক'রে ক'রে বুঝানো—যাতে স্ত্রী পুরুষ ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। যীশু 'ফাদার, ফাদার' (পিতা, পিতা) ব'লে পাগল হয়েছিলেন, ইনি 'মা, মা' ক'রে পাগল! শুধু জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার নয়—ঈশ্বরপ্রেম 'কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়!' ইনিও যীশুর মতো ত্যাগী, তাঁরই মতো এঁরও জ্বলন্ত বিশ্বাস। তাই কথাগুলি এত জোর।···কি আশ্চর্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব নাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন—কারও সহিত ঝগড়া নাই।"

আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নানা তীর্থ দর্শন ক'রে, অনেক দেশ ঘুরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে বসে বলেছিলেন: "কি ব'লবো! দেখছি, যেখানে এখন ব'সে আছি, এইখানেই সব। কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এঁরই এক আনা, কি দুই আনা; কোথাও চারি আনা, এই পর্যন্ত; এইখানেই পূর্ণ ষোল আনা দেখছি।"

প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সাধক বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা ক'রে ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁর অবতারত্ব কীর্তন করেছিলেন।

বিখ্যাত সাধক পণ্ডিত গৌরীকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট এসে কিছুকাল তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে অবস্থান করেছিলেন। শাস্ত্রের সঙ্গে ঠাকুরের অবস্থা মিলিয়ে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তিনি ঘোষণা করেন: শাস্ত্রে যে-সব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা আছে, সে-সবই সাক্ষাৎ তাঁতে বিদ্যমান, তাঁর অবস্থা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম ক'রে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, তিনি মানুষ নন, অবতারসকলের যাঁর থেকে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তাঁর ভিতরে রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে ব্রহ্মোপলব্ধি ক'রে তদ্গতভাবে অবস্থান করলেও সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ জ্বালাযন্ত্রণা শোকতাপ ও নানা সমস্যার কথা ভুলতে পারেননি, তাই বলেছিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' শ্রীচৈতন্যদেবের মতো তাঁর তিনটি দশা হ'ত—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা, বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন, অর্ধবাহ্যদশায় তাঁকে ঐশ্বরিকভাবে বিভোর দেখা যেত; বাহ্যদশায় তিনি পরমার্থপ্রসঙ্গ করতেন, শোকসন্তপ্ত মোহগ্রস্ত মানুষকে দুর্লভ মানবজীবন মধুময় করবার পথের সন্ধান দিতেন। যে জড়বাদের যুগে মানুষ বুদ্ধিকে বড় ক'রে দেখতে অভ্যস্ত, সে যুগে তিনি এমন এক জগতের সন্ধান দিয়েছেন, যা পার্থিব জগতের বাইরে আর এক জগৎ- সে জগৎ হ'ল সত্যের জগৎ, অমৃতের জগৎ, আনন্দের জগৎ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা কোন জাতি বা ধর্মের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের প্রত্যেক নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে তাঁর অমৃতময়ী বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব শুধু একটি দেশের কতকগুলি মানুষের জন্য নয়, তাঁর আবির্ভাব পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বভাবময়। তিনি এসেছিলেন সর্বধর্মসমন্বয় ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখাতে। অসংখ্য সম্প্রদায়ে ভরা পৃথিবীতে আর একটি সম্প্রদায় গড়বার জন্য তিনি

আসেননি। দীনদুঃখী রিক্ত পতিত অবহেলিত মানুষের তিনি বড়ই আপনার জন। আবার জ্ঞানী গুণী এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরও তিনি আপন জন। তিনি সকলের সুখদুঃখের সাথী—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়রূপে অবতীর্ণ হয়ে যথার্থ শান্তিলাভের পথ দেখিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন: "ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব; যার যে নামে ও যে ভাবে ঈশ্বরকে ডাকতে ভাল লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে আন্তরিকতার সহিত ডাকলে তাঁর দেখা পায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল কথা হচ্ছে—যদি সত্যনিষ্ঠা, সংযম, ভক্তি, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা থাকে, তবে যে-কোন পথ অবলম্বন করা যাক না কেন, সিদ্ধিলাভ হবেই।

জীবসেবার মহাবাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। সেবাব্রতের বীজও তিনি নিজহস্তে বপন করেছিলেন। তিনি তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব কুমার বৈরাগ্যবান্ ত্যাগী সন্তানদের 'হোমাপাখীর দলকে' রেখে গিয়েছিলেন 'বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য', তাঁর উদার মহাভাব প্রচারের জন্য। বিরাট সমাজ-জীবনে বেদান্তকে কার্যকর ক'রে তোলবার জন্য স্বামীজী সেবাব্রতকে স্বীয় সঙ্ঘের আবশ্যিক অঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ—শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান্ ভাবে নিহিত রয়েছে এই অপূর্ব তত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষাপ্রদানের প্রণালী ছিল অভিনব। তিনি কারও ভাব নষ্ট করতেন না। মানুষের বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র তার মনের গঠন। অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ভাব। বিভিন্ন অধিকারীকে তিনি আধার অনুযায়ী উপদেশ দিতেন। জ্ঞান-পথের অধিকারীকে জ্ঞানপথ, ভক্তিপথের অধিকারীকে ভক্তিমার্গ, কর্মীকে নিষ্কাম কর্ম, যোগমার্গের অধিকারীকে যোগসাধনা শিক্ষা দিতেন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নিম্নস্তরের অধিকারীকে, প্রবর্তককে তার মনের ভাব অনুযায়ী পথনির্দেশ দিতেন, তাকে ধাপে ধাপে চরম লক্ষ্যে, অপার আনন্দের রাজ্যে নিয়ে যেতেন। আবার যার মধ্যে যেটির অভাব থাকত, সেটি পূরণের জন্যও তার প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। যাঁদের তিনি তাঁর যুগমহাভাবের ধারকরূপে তৈরি করে-ছিলেন, তাঁদের তিনি জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-সেবা—সর্বভাবের উপযুক্ত ক'রে গড়েছিলেন।

গৃহে থেকে কেমন ক'রে ভগবানে মন রাখা যায়, কেমন ক'রে জীবনে কৃতকৃত্যতা লাভ করা যায়, তার জন্য তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর গৃহী ভক্তগণের অনাসক্ত ভক্তিময় জীবন দেখলেই তা বোঝা যায়। আবার মহিলাগণের জীবন কেমন হবে তা তাঁর মহিলা-ভক্তগণের জীবনীপাঠে জানা যায়। স্বামীজী বলেছেন: "There is no chance of welfare of the world unless the condition of women is improved."—নারীজাতির অভ্যুদয় না হ'লে জগতের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। "সেই জন্যই রাম-কৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রীগুরু'-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব-সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।"

আমরা খৃষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ (Brotherhood of Christianity) এবং ইসলামধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধের (Brotherhood of Islam) কথা সকলেই জানি এবং তাঁদের ঐক্যের কথা ব'লে থাকি, কিন্তু এই উভয়ের দ্বারা brotherhood of man অর্থাৎ মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ খৃষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ

খৃষ্টানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার বাইরে তাঁদের ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটেনি, তেমনি ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধও মুসলমানদের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ, তার বাইরে তার কোনরূপ প্রসার নেই। অতএব সব মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে মাতৃভাব, যে উদার সর্বজনীন মহান্ ভাব রয়েছে, তার মধ্য দিয়েই তা জাগবে এবং সম্ভব হবে। আমরা সকলেই জগন্মাতার সন্তান, অতএব আমরা ভাই ভাই। আমাদের মধ্যে বিদ্বেষভাব কেন থাকবে, dogmatism কেন থাকবে? শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মহাভাবে সমস্ত বিদ্বেষ প্রশমিত হবে, 'মতুয়ার বুদ্ধি'র অবসান হবে। তাঁর মহাভাবে আছে সর্বভাবের সমন্বয়; tolerance নয়, acceptance—অর্থাৎ অপরের ধর্মের প্রতি শুধু সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনই নয়, তাকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া। রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মা যেমন ছেলেদের আহার্য দেন, সেই মায়ের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা দেবার রীতি; যার যেমন সামর্থ্য, যে যেমন অধিকারী তাকে তেমনিভাবে অভূতপূর্ব উপায়ে অনন্ত-ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে চলেন।

'কথামৃত'কার শ্রীম বলেছেন: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কষ্টিপাথর ভক্তি। তিনি কেবল দেখেন অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি আছে কিনা। যদি তা থাকে, অমনি সে তাঁর পরম আত্মীয়—মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তাঁর আপনার লোক—খৃষ্টানের যদি যীশুর উপর ভক্তি থাকে, সেও তাঁর পরম আত্মীয়। সকল ধর্মাবলম্বীরই তিনি পরম আত্মীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, "তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-বিদ্বান-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ সব তিনি দূর ক'রে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু-মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু-ভেদ ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।" তিনি যে "Love personified"—মূর্তিমান প্রেম!

স্বামীজী আরও বলেছেন: 'What our sages thought in ages, he lived in one life'. পূর্ব পূর্ব যুগে মুনি ঋষি ও অবতার-পুরুষগণ যা চিন্তা করেছিলেন, তিনি এক জীবনেই তা যাপন ক'রে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব হ'লেন যুগ-যুগান্তের অনন্ত আধ্যাত্মিক ভাবরাশির জমাটবাঁধা মূর্তি! তিনি হ'লেন পূর্বগ যুগধর্মপ্রবর্তকগণেরই বর্তমান যুগোপযোগী পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।—"The most recent or rather latest edition of the Vedas." এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ যুগের সকলের আরাধ্য দেবতা। তাঁকে অবলম্বন ক'রে অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা হয়। তাই তাঁর বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ! ধর্ম যে জাতির প্রাণ, ত্যাগ যে জাতীয় আদর্শ—এ ধারণা হবে তাঁর জীবন-অনুধ্যানে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যুক্তাক্ষরবর্জিত 'যত মত তত পথ'—এই মহাবাণী দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ সনাতন ও সার্বভৌম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ বাণীর আবেদন সার্বলৌকিক ও সার্বকালিক। এ বাণীর অনুধ্যানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ভাবগত কলহের চির অবসান হয়। সর্বধর্মের

ও সর্বভাবের সমন্বয়সাধন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক। সমন্বয়াচার্য বলেই তিনি সর্বমানবের; কোন ব্যক্তির বা দেশ-বিদেশের সম্পত্তি নন তিনি। এইজন্যই তিনি পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষগণ হতে সমধিক উজ্জ্বল প্রভায় মহিমান্বিত।

প্রকৃত সাম্য শুধু রাজনীতির দ্বারা হতে পারে না, রাজনীতির দ্বারা আংশিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যেতে পারে, ধনবৈষম্য দূর করা যেতে পারে; কিন্তু তার দ্বারা অন্তরের বৈষম্য দূর হবে না। সব মানুষের মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ রয়েছেন, এই ভাব যত প্রসার-লাভ করবে ততই প্রকৃত সাম্যের দিকে মনুষ্য-সমাজ অগ্রসর হবে সারা বিশ্ব হবে একটি পরিবার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ'—এই উদারতম বাণীর মধ্যে পাওয়া যায় প্রকৃত সাম্য ও মৈত্রী এবং পরম শান্তির সন্ধান।

পূজা-পুষ্প*

মহাকবি জি. শংকর কুরুপ

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

হে সত্য সৌন্দর্য !
তোমার প্রকাশে
সদা প্রফুল্ল হোক আমার জীবন !

আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হোক
তোমারই কল্পনার
সার-তত্ত্বের সরস মাধুরী !

সদানন্দ আমার এই জীবন-কমল থেকে
উদ্‌গত সেই
অনির্বচনীয় মকরন্দের সুরভি সঞ্চারে
উল্লসিত হোক চতুর্দিক !

তোমার ওই করুণার উজ্জ্বল দ্যুতি
চির-বর্ণাঢ্য করুক আমায় !

কভু যদি ঝ'রে যাই, ঝরি যেন
তোমার ওই পদমূলে পূজা-পুষ্প হয়ে !

* [কবির "জ্ঞানপীঠ পুরস্কার" প্রাপ্ত মূল মলয়ালম কাব্যগ্রন্থ "ওটক্কুঝল" সঞ্চয়নের 'পূজাপুষ্পম্' কবিতা (পৃঃ ১১১, ৫ম সংস্করণ, ১৯৬৭) হইতে অনূদিত]

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে একটি শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাংলাদেশের নানা প্রান্তের শিক্ষাবিদেরা সে সম্মেলনে সমবেত হয়ে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার উৎস ও প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে নানাদিক থেকে আলোচনা করেছিলেন। যতদূর জানি, সে সম্মেলনে স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-প্রসঙ্গে উদ্বোধন ও অদ্বৈত-আশ্রম-প্রকাশিত বইগুলিই ছিল প্রধান অবলম্বন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনাও স্বাভাবিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছিল। হার্বার্ট স্পেন্সারের Education : Intellectual, Moral and Physical' নামে যে গ্রন্থখানি স্বামীজী তাঁর প্রথম জীবনে অনুবাদ করেছিলেন, সে বইখানি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা তখন সম্ভব হয়নি। কারণ বসুমতী-প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের 'শিক্ষা'-গ্রন্থটিই যে হার্বার্ট স্পেন্সারের বইটির অনুবাদ তখনো সেকথা আমরা জানতাম না। অথচ বসুমতী-কার্যালয় থেকে এই বইখানির অনুবাদ 'শিক্ষা' 'স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত' এই পরিচয়ে বহু আগে থেকেই মুদ্রিত হয়ে আসছে। বইখানি স্বামীজীর প্রণীত নয়, অনূদিত। তবু স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা-আলোচনায় গ্রন্থখানি অপরিহার্য। এ বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা দেবার চেষ্টা আগে করেছি।[১] বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা।

বিবেকানন্দ-দর্শনের মূল প্রতিজ্ঞা যে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ, সে বিষয়ে নরেন্দ্রপুরে আয়োজিত স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা-চক্রে যোগদানকারীরা মোটামুটি একমত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর শিক্ষা-দর্শনও এই অদ্বৈতবাদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন দার্শনিকদের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেদিক থেকে ছাত্রজীবনে তাঁর সতীর্থকল্প[২] বন্ধুবর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতিচারণ আমাদের অনেক পরিমাণে সহায়তা করে। তারপরেই উল্লেখযোগ্য স্বামীজীর মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী।'

বিবেকানন্দ-মানসের গঠনপর্বের অন্যতম সাক্ষী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কথায়—"খুব কম লোকেই তাঁর অন্তরের মানুষটির সংগ্রামের কথা জানতো, তাঁর অন্তরাত্মার সমস্ত বিক্ষোভ রূপ পেতো বেপেরোয়া অস্থিরতায়।

মানস-ইতিহাসের এই সঙ্কটমুহূর্তেই তিনি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন, স্থাপিত হয়েছে তাঁর ভবিষ্যৎ-ব্যক্তিত্বের ভিত্তি। ব্রাহ্মসমাজের বহিরঙ্গ অংশ থেকে যে বালকসুলভ আস্তিক্য ও সহজ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের 'ধর্ম-সম্পর্কিত তিনটি প্রবন্ধ' (Three Essays on Religion) পড়ে তা

১ 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যের একটি অনালোচিত অধ্যায়': প্রণবরঞ্জন ঘোষ: আনন্দবাজার পত্রিকা: ১৫ই জানুআরি, ১৯৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২ স্বামীজী বয়সে একটু বড়ো হলেও ব্রজেন্দ্রনাথ ক্লাশে তাঁর এক শ্রেণী উপরে পড়তেন।

বিপর্যস্ত হলো। সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে হেতুবাদ এবং বিশেষ পরিকল্পনার ব্যাখ্যা তাঁর পক্ষে আর নির্ভরযোগ্য রইলো না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন; স্রষ্টার সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার ধারণার সঙ্গে কিছুতেই এই অমঙ্গলবোধকে তিনি মেলাতে পারছিলেন না। জনৈক বন্ধু তাঁকে হিউমের সংশয়বাদ এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়-বাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়ার পর তাঁর অবিশ্বাস ক্রমে দার্শনিক সংশয়বাদের রূপ ধারণ করল।[৩]"

মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা-অনুযায়ী স্বামীজীর দর্শন-চর্চা-প্রসঙ্গ—"কলেজে তিনি হ্যামিল্টনের 'মেটাফিজিক্স' পড়িয়াছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ও হার্বার্ট স্পেন্সার তিনি অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেন্সারের প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য করিয়াছিল। তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের এডুকেশন পুস্তকখানা বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত করিয়াছিলেন। এই সময় হার্বার্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিষ না বিবেচনা করায় যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই।"[৪]

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মূলতঃ স্বামীজীর অনুবাদগ্রন্থটি সম্বন্ধেই বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবো বলে তার দর্শনচিন্তার পটভূমি নিয়ে আর বিস্তৃত তথ্যে অগ্রসর হবো না। প্রধানতঃ যে কয়টি কারণে আমাদের কাছে স্বামীজীর অনূদিত 'শিক্ষা'-গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান তা এই—(ক) বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ-বিভাগে দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ যে বিশেষ প্রয়োজনীয় সেকথা স্বামীজী তাঁর তরুণ বয়সেই অনুধাবন করেছিলেন এবং মাতৃভাষাকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। আলোচ্য অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা' সে প্রচেষ্টার এযাবৎ প্রাপ্ত একমাত্র সম্পূর্ণ উদাহরণ।[৫] স্বামীজীর আর একটি অসম্পূর্ণ অনুবাদ আমাদের প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনার কারণ—সেটি টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশানুসরণ' ('ভাববার কথা' দ্রষ্টব্য)। (খ) বিবেকানন্দ-মানসে দার্শনিক স্পেন্সারের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণরূপে এ অনুবাদগ্রন্থের বিশিষ্ট মূল্য। (গ) বিবেকানন্দ-শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম প্রধান উপকরণরূপে হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারার পর্যালোচনা। (ঘ) সামগ্রিকভাবে বিবেকানন্দ-সাহিত্যের নবলব্ধ সংযোজনরূপে অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা'র তাৎপর্য।

হার্বার্ট স্পেনসারের Education (শিক্ষা) বইখানির প্রথম সংস্করণে দেখি প্রকাশক Williams And Nograte, London, বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯০। বসুমতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' বইখানি ছোট আকারের মাত্র ৯৯ পৃষ্ঠার বই। মূল বইটির আক্ষরিক অনুবাদ স্বামীজী করেননি, মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আলোচনার মূল বক্তব্য কোথাও বাদ যায়নি এবং অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ।

---

৩ অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত Life of Swami Vivekananda (বিবেকানন্দ-জীবনী): Eastern & Western Disciples (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যবৃন্দ-রচিত); পঞ্চদশ সংস্করণ; পৃঃ ৭৭

৪ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী: মহেন্দ্রনাথ দত্ত: দ্বিতীয় সংস্করণ: পৃঃ ১৬৩-১৬৪

৫ স্বামীজীর অনূদিত একাধিক গ্রন্থ থাকা আশ্চর্য নয়।

পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহল-নিরসনের জন্য হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ ও স্বামীজীর অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—

Chapter—I

What Knowledge Is of Most Worth ?

It has been truly remarked that, in order of time, decoration precedes dress. Among people who submit to great physical suffering that they may have themselves handsomely tattooed, extremes of temperature are borne with but little attempt at mitigation. Humbolt tells us that an Orinoco Indian, though quite regardless of bodily comfort, will yet labour for a fortnight to purchase pigment wherewith to make himself admired; and that the same woman who would not hesitate to leave her hut without a fragment of clothing on, would not dare to commit such a breach of decorum as to go out unpainted. Voyagers find that coloured beads and trinkets are much more prized by wild tribes, than are calicoes or broadclothes. And the anecdotes we have of the ways in which, when shirts and clothes are given, savages turn them to some ludicrous display, show how completely the idea of ornament predominates over that of use."

স্বামীজীর অনুবাদ—

শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?

কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, বসনের পূর্বে ভূষণের সৃষ্টি। ইহা অতি সত্য কথা। অসভ্যেরা সর্বাঙ্গে উল্কি ভূষিত করিবার তীব্র যাতনা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সহ্য করিবে, তথাপি নিদারুণ শীত হইতে আত্মত্রাণের কোনও চেষ্টা করিবে না। হম্বোল্ট একটি আদিম আমেরিকের বিষয় লিখিয়াছেন যে, সে সামান্য অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত করিয়া, স্ব-সমাজে গৌরবলাভের আশায় দুই সপ্তাহ-কাল সকল প্রকার ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত ছিল। তিনি আরও বলেন যে, যে-সকল অসভ্য স্ত্রীলোক চীরমাত্রবিরহিতা হইয়া অসঙ্কোচে গৃহের বাহিরে গমন করে, তাহারাও জনসমাজে অচিত্রিত বপু প্রদর্শন অতি লজ্জাকর মনে করে। সমুদ্রযাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

(ক্রমশঃ)

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

শিবদাস

'আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, মানবদরদী' ও দার্শনিক এবং বিশ্বশান্তিকামী বার্ট্রাণ্ড রাসেল আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অমর চিন্তারাশি।

তাঁর কথা 'ইউরোপের বিবেকের কণ্ঠস্বর' নামে খ্যাত। যুদ্ধ, পারমাণবিক অস্ত্র ও জাতিবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন নির্ভীকভাবে। তাঁর চিন্তারাশি সুগভীর, বহু ক্ষেত্রে বিদ্রোহী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলও। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেছিলেন, 'যুদ্ধের অসংখ্য ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও যুদ্ধকে আমি সানন্দে বরণ করতে রাজী আছি, যদি কম্যুনিজমকে ধরাধাম থেকে নির্মূল করার জন্য যুদ্ধ হয়'; কিন্তু শেষ জীবনে তিনিই হয়ে ওঠেন তার সমর্থক। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি বোধ হয় তাঁর আত্মজীবনীতে লেখা এই কথাটি—"তিনটি প্রবৃত্তি আমাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ; একটি হল ভালবাসার তৃষ্ণা, দ্বিতীয়টি জ্ঞানের স্পৃহা এবং তৃতীয়টি হল মানুষের দুর্গতি দেখে অসহনীয় বেদনার

বিট্রেনের বেডফোর্ডের বিখ্যাত রাসেল-পরিবারে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭শ শতাব্দী থেকে এই পরিবারই বেডফোর্ডের ডিউক ছিল। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের জনৈক পূর্বপুরুষ ২য় চার্লসের রাজত্বকালে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন ; তাঁর পিতামহ ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী।

তিনবছর বয়সেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল পিতা-মাতাকে হারিয়ে পিতামহের কাছে মানুষ হতে থাকেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ থেকে তিনি অঙ্কশাস্ত্র ও নৈতিক বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হন এবং এই কলেজেই অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁকে 'ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর প্রতিভার প্রতি প্রদত্ত অন্যান্য সম্মানগুলির অন্যতম হল সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। এইকালে রাজনীতির সঙ্গেও তিনি জড়িত হয়ে পড়েন; পার্লামেন্টের সভ্য হওয়ার জন্য বার তিনেক ব্যর্থ চেষ্টাও করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁকে অধ্যাপকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়; কিছুদিন কারাবাসেও রাখা হয়েছিল তাঁকে।

যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের সদস্যরূপে রাশিয়া যান। ফিরে আসার পর ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে অধ্যাপকপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে চলে যান।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে সহায়তার জন্য কিছুকাল তিনি ইংলণ্ডে 'ইণ্ডিয়া লীগের' চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে তিনি চিকাগো এবং ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য আমেরিকা গমন করেন। সেখানে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদও প্রদত্ত হয়। এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে—তাঁর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'ম্যারেজ এণ্ড মর‍্যাল্‌স' বইটির জন্য পাদ্রীরা এই 'নাস্তিক ও নীতিবোধহীন' ব্যক্তিকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এমন কি কোর্টে মামলাও জুড়ে দেন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে রাসেল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন। ট্রিনিটি কলেজ 'ফেলোশিপ' দিয়ে সসম্মানে তাঁকে গ্রহণ করেন।

পরবর্তীকালে বহুবিধ প্রণালীতে তাঁর কার্যধারা প্রবাহিত হতে থাকে।

সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তাঁর মতে যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে রাসেল বিভিন্ন সময়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাশিয়ার ইহুদিদের প্রতি আচরণ, যুক্তরাষ্ট্রের পৌর অধিকার, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন ঘটনা, পশ্চিম এশিয়ায় বৃটিশজাতির নীতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নিঃসঙ্কোচে নিজমত প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দেও পর্তুগীজদের বন্দীদের প্রতি অন্যায় আচরণ, কিউবার ওপর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান প্রেরণ, কেনেডি হত্যা সম্পর্কে প্রদত্ত ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্ট প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন।

তিনি চারটি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর সন্তান তিনটি।

দর্শন, গণিত, সমাজসেবা, বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৫০ খানির অধিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কিছু গল্পও লিখেছেন। আত্মচরিত লিখেছেন তিন খণ্ডে।

ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রাসেল অঙ্ক, দর্শন ও তর্কশাস্ত্রের কয়েকখানি অনবদ্য পুস্তক রচনা করেন। ব্রিক্‌স্‌টন জেলে বাসকালে জেলের জীবন সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং 'ইন্‌ট্রোডাক্‌শন টু ম্যাথম্যাটিক্যাল ফিলজফি'-র অধিকাংশই রচনা করেন। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা 'দি থিওরী অব বলশেভিজম্‌' গ্রন্থে বিধৃত। চীনের সমস্যা ও বিংশ শতাব্দীতে তার ভবিষ্য রাজনীতিক রূপ সম্বন্ধেও তিনি একখানি বই লেখেন। 'হিসষ্ট্রি অব্‌ দি ওয়েস্টার্ন ফিলজফি' লেখেন ৭৫ বৎসর বয়সের সময়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, 'হিউম্যান সোসাইটি ইন্‌ এথিক্‌স এণ্ড পলিটিক্‌স্‌', 'মাই ফিলজফিক্যাল ডেভেলপ্‌মেণ্ট', 'উইজ্‌ডম অব দি ওয়েস্ট', 'পলিটিক্যাল আইডিয়াজ' প্রভৃতি।

শিক্ষা বিষয়েও তাঁর গভীর চিন্তা ছিল। ইংলণ্ডের হ্যাম্পশায়ারের পিটার্সফিল্ড-এ তিনি ও তাঁর পত্নী ডোরা আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষার একটি স্কুলও খুলেছিলেন।

গত ৩রা ফেব্রুআরি ১৯৭০, রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় ওয়েলস-এর পোর্ট ম্যাডক শহরের নিকটস্থ নিজ বাসভবনে প্রায় ৯৮ বৎসর বয়সে বার্ট্রাণ্ড রাসেল শান্তিতে দেহত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছামত তাঁর দেহ দাহ করা হয় এবং শেষকৃত্য করার সময় কোন ধর্মানুষ্ঠান করা হয়নি।

জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড

ব্রহ্মচারী শ্যামল

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার বেলুড় মঠ। শান্ত সকাল। শুধু মঠবাড়ীর দিকটাতে কিছু সোরগোল ও ব্যস্ততা চলেছে, কারণ চোর ধরা পড়েছে, গভীর রাত্রে গেস্ট হাউসের দোতলার ঘরে এক বিদেশিনী বৃদ্ধার গলা থেকে একটি সোনার হার নিয়ে পালাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে। প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বিচারের ব্যবস্থা হচ্ছে। হঠাৎ দ্রুতপদে সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন বৃদ্ধা বিদেশিনী। উন্নত ললাট, ঋজু দীর্ঘ দেহ, সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ আভিজাত্যের ছাপ, মুখে পবিত্র অনুপ্রেরণার আভা। মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আমার মনে হয় চোরটি ভক্ত। তা না হলে ঘরে কত জিনিস ছিল, সে-সব না নিয়ে আমার গলার নেক্‌লেস্‌টা নিতে যাবে কেন? আপনি তো জানেন, ঐ নেক্‌লেস্‌টার মধ্যে স্বামীজীর প্রদত্ত 'লকেট্‌টি' আছে। আমার বিশ্বাস সেই লকেট্‌টা নেওয়াই চোরটার মতলব ছিল।"[১] বৃদ্ধার সরল বিশ্বাসে সায় দিলেন স্বামীজীর গুরুভাই মহাপুরুষজী। চোর বেকসুর খালাস পেল। গঙ্গাস্নান করিয়ে, নতুন কাপড়-চাদর পরিয়ে এই অদ্ভুত ধরনের 'ভক্ত' চোরকে বিদায় দিয়ে মঠবাসীরা মর্যাদা দিলেন স্বামীজী-গতপ্রাণা এই বৃদ্ধাকে। স্বামীজীর দেওয়া, তাঁর দিব্যস্মৃতিবিজড়িত লকেট চুরি করার জন্য যে আসে, সে কখনও চোর হতে পারে না, বরং ভক্ত—এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, স্বামীজীর সামান্যতম সান্নিধ্যও মানুষকে মহত্তর ক'রে সত্যের পথে অনুপ্রাণিত করে। এ বিশ্বাসের শক্তিতেই সারা জীবন কাটিয়েছিলেন বিবেকানন্দগতপ্রাণা এই মার্কিন মহিলা জোসেফিন ম্যাক্‌লাউড অথবা স্বামীজীর প্রিয় 'জো'।

স্বামীজীর সান্নিধ্যে কি পেয়েছিলেন এই বিদেশিনী নারী যা তাঁকে সারা জীবন ধরে এক বিরাট অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, তা আমাদের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। বয়সে স্বামীজীর থেকে বছর পাঁচেক বড় ছিলেন। জন্ম আমেরিকায় ইলিনয়েস্‌-এ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। পিতা ডেভিড্‌ ম্যাক্‌লাউড স্কটিস্‌ হাইল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন নতুন ঘর বাঁধবার আশায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডেভিডের কাছে কোন কিছুই যথেষ্ট নয়। শুধু জাগতিক ব্যাপারে নয়, ধর্মের ব্যাপারেও ডেভিড কিছুটা বেশী উদারভাব পোষণ করতেন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে একদিন কনিষ্ঠা কন্যা জোসেফিনকে ভারতীয় বেদান্তধর্মের নতুন বই পড়তে দেখে আগ্রহান্বিত হয়ে সেই তত্ত্ব শুনেছিলেন। শোনা হয়ে গেলে বলেছিলেন, "জীবনে আজ প্রথম একটা বাণী শুনলাম।"[২] বালিকা জোসেফিন সেদিন বেদান্তধর্মের কি বই পড়ে পিতার মন হরণ করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই, তবু স্বামীজীকে দেখার আগেই জোসেফিন আর তাঁর বড় বোন 'বেটি' সম্পূর্ণ গীতা মুখস্থ করেছিলেন, এ কথা জো নিজেই তাঁর স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

'প্রকৃত জন্মদিন'

২৯শে জানুআরি, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ। নিউইয়র্কের

১ শিবানন্দ-স্মৃতিসংগ্রহ—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪

২ Late and Soon by Francis Legget, p. 46

55 West 33rd Street-এর একটি ছোট ঘরে বসে যুগপ্রাচীন বেদান্ত বিশ্লেষণ করছিলেন তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা সব পরিপূর্ণ করে বসে তাঁর কথা শুনছিলেন বিমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ। এঁদের মাঝখানে সেদিন প্রথম এসেছিলেন দুই বোন, জোসেফিন আর বেটি ম্যাক্‌লাউড, হাড্‌সন্ নদীপথে দীর্ঘ ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে। অপরিচিত এই হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রথম দর্শনেই জো উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে পড়েছেন।[৩] বিস্মিত এবং গভীর শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ জো এই প্রথম দর্শন সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যা লিখেছিলেন তা তাঁর স্মৃতি থেকেই তুলে ধরছি—"স্বামীজী সেদিন একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন, সে ভাষণের সঠিক ভাষা আজ আর মনে নেই। তবে সেই মুহূর্তেই অনুভব করেছিলাম, এ বাক্যটি একটি সত্য। দ্বিতীয় বাক্যটি যা স্বামীজী উচ্চারণ করলেন তাও একটি সত্য, আর তৃতীয় বাক্যটিও সত্য। তার পর থেকে সাত বছর ধরে তাঁর কথা আমি শুনেছি। আর তিনি যা যা বলেছিলেন তাই আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকে জীবনের অর্থটাই পালটে গিয়েছিল। আমাকে যেন তিনি অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি অনন্তের মধ্যেই আছি।"[৪]

প্রথম দর্শনের এই দিনটিকে জো-র জীবনের একটি বৈপ্লবিক দিন বললেও অত্যুক্তি হয় না। জড়বাদসর্বস্ব পাশ্চাত্যের দ্বারে স্বামীজী সেদিন এনেছিলেন অন্তর্জগতের দেবত্বের বাণী। মানুষের দুর্বলতা ও পাপ অলীক কল্পনা, তাঁর অন্তর্নিহিত দেবত্ব আর পূর্ণত্বটাই চিরন্তন সত্য। ধর্ম গির্জাতে নেই, গোঁড়ামিতেও নয়, তা রয়েছে সমস্ত জীবনে। মানুষের পূর্ণত্বের প্রকাশের মধ্যেই তার যথার্থ পরিচয়। জো লিখেছিলেন, "তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়ে দিতেন জীবনের কিছুই ধর্মের বাইরে নয়, সবটাই পবিত্র।" জো-কে আহ্বান করেছিলেন স্বামীজী অমৃতের সন্তান বলে, বলেছিলেন, "সব সময় মনে রেখো তোমার আসল পরিচয় হল তুমি চিরদিন ঈশ্বরের সন্তান, কেবল বাইরের দিক দিয়েই একজন আমেরিকান এবং নারী।" এ বিরাট আহ্বানের তাৎপর্য গ্রহণ করার মতো শক্তি সেদিন এই বিদেশিনীর ছিল বলেই মনে হয়। আর ছিল বলেই এমন ভাবে সাড়া দিতে পেরেছিলেন স্বামীজীর আহ্বানে। স্বামীজীকে সত্যস্বরূপ দেখেছিলেন জো। আর এ দেখার অর্থ হল জো-র কাছে—এই মহামানবের সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা। এই আত্মোৎসর্গের প্রেরণাতেই ঘরের, আত্মীয়স্বজনের, দেশের, বিবাহের সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করেছিলেন জো। প্রথম দর্শনের দিনটি থেকেই জো-র জীবনে এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। জো তাই বিশ্বাস করতেন এই দিনটি তাঁর নবজন্মের দিন। পরবর্তীকালে কোন কৌতূহলী জিজ্ঞাসু যখন বৃদ্ধা জো-র বয়স জিজ্ঞাসা করতেন, জো তাঁর বয়স গুণতেন এই দিনটি থেকে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে জো বলতেন এইটিই তাঁর "real birthday" অর্থাৎ প্রকৃত জন্মদিন। আরও বলতেন, "After I met him I was never the same." অর্থাৎ "তাঁকে দেখার পর থেকে আমি আর আগের ব্যক্তি ছিলাম না।"[৫]

৩ Late and Soon by Francis Legget, p. 95.

৪ Reminiscences of Swami Vivekananda (2nd Ed.), p. 233

৫ Vedanta And The West—No. 158, P. 61

মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে

মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষ-সংশ্রব—এ তিনটি সুযোগ জোসেফিনের জীবনে এসেছিল পূর্ণমাত্রায়। প্রথম দর্শনেই যুগাচার্য বিবেকানন্দকে সত্যস্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা জো-র যথার্থ সত্যানুসন্ধানের ফলস্বরূপ। স্বামীজীকে দেখার আগে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন জো সত্যের সন্ধানে; স্বামীজীর পদপ্রান্তে আসার পরে আর কারও কাছে যাবার প্রয়োজন মনে করেননি, বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষের সংশ্রবের দুর্লভ সুযোগও জো পেয়েছিলেন অভাবনীয়ভাবে বিভিন্ন সময়ে নিউইয়র্কে, রিজলী ম্যানরে, ক্যালিফোর্নিয়ায়, কাশ্মীরে এবং বেলুড় মঠে। জো-র দিক থেকে এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রিজলী ম্যানরের দিব্য দিনগুলোর স্মৃতি, যেখানে স্বামীজী তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমেরিকান বন্ধু ও গুণগ্রাহী মিঃ ফ্রান্সিস্ লেগেটের আমন্ত্রণে দুবার পদার্পণ করেছিলেন।

আমেরিকার Catskill পর্বতের মধ্যস্থ ফ্রান্সিস (স্বামীজীর প্রিয় ফ্রাঙ্কিন্সেন্স)-এর রিজলী ম্যানর নামক এই নির্জন পার্বত্য নিবাসে প্রথমবার এসেছিলেন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র কয়েক দিনের জন্য, সেদিন তিনি বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী রণক্লান্ত সৈনিক, অতিশয় পরিশ্রান্ত।

দ্বিতীয়বার এসেছিলেন চার বছর পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে। সেদিন স্বামীজীর জীবনে বহু পরিবর্তন এসেছে। স্বদেশে যুগাচার্যের আর বিদেশে 'Prophet'-এর সম্মান পেয়েছেন, স্বীয় গুরুর নামে সঙ্ঘ প্রবর্তন করেছেন এবং দেশবিদেশে নতুন আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। এবার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দুই গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজীকে এবং ভগিনী নিবেদিতা আর মিসেস্ ওলিবুল্কে। রিজলীর সেই অবিস্মরণীয় গ্রীষ্মকালটিতে ('Great Summer') দেশবিদেশের বহু লোক এসেছেন স্বামীজীর সান্নিধ্য ও বাণী লাভ করার জন্য। দুবারই সঙ্গে ছিলেন জো। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল স্বামীজী তাঁর স্বরূপেই আছেন। অনেকখানি ভারমুক্ত হওয়াতে অপেক্ষাকৃত শান্ত, মৌন এবং গম্ভীর; কিন্তু সেই তরুতলবাসী, একাকী, আত্মানন্দে বিভোর, নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী—যিনি রিজলীর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে একাকী পায়চারী করতেন আর সন্ধ্যায় ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে নির্বাক বিমুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে ব্যাখ্যা করতেন বেদান্তের বাণী।

মিঃ ও মিসেস লেগেট্ (ইনিই জো-র বড় বোন বেটি) স্বামীজী, তাঁর গুরুভাই এবং অনুরাগী ভক্তবৃন্দের সেবার কোন ত্রুটি রাখেননি, কিন্তু জো-ই হয়েছিলেন স্বামীজীর সবচেয়ে কাছের মানুষ। ছোটখাট ব্যাপার থেকে সমস্ত বিষয়ে স্বামীজী সাহায্য চাইতেন অন্য কারও কাছে নয়, জো-র কাছে। বলতেন, "জো আমাদের মধ্যে সব চেয়ে মাধুর্যময় হৃদয়ের অধিকারিণী। (Joe is the sweetest spirit of us all)."[৬] দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসার সময় অতি সযত্নে জো-র জন্যে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এসেছিলেন এক বোতল আচার।[৭] প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতেন জো-কে। নিজের নির্ভীক সরলতা আর পবিত্র সেবাপরায়ণতার জন্য জো কোনদিন স্বামীজীকে ভয় পাননি, কখনও দূরত্ব অনুভব করেননি। স্বামীজীর বহু গভীর ভাবঘন দৈবমুহূর্তের সন্ধান আমরা তাই পাই জো-র স্মৃতি থেকে। আবার অদ্ভুত

৬ Reminiscences, 372
৭ „ 271

বৈচিত্র্যময় এই মহাপুরুষটির শিশুসুলভ সরল হাস্যময় মুহূর্তের জো ছিলেন সাক্ষী। মাঝে মাঝে বড় বড় বক্তৃতা শেষ করে স্বামীজী ঘরে ফিরে "Prophet"-এর সমস্ত গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে নিজেই ঢুকে পড়তেন রান্না করবার জন্য। পোশাক-পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন হওয়ার কথা ভাবতেন না, অন্য কারও কথাও শুনতেন না। জো-ই এ সব দিনে স্বামীজীকে ধরে নিয়ে আসতেন। আবার ঈশদূত যীশুর সম্বন্ধে বক্তৃতাশেষে যেদিন স্বামীজী এক স্বর্গীয় আভায় ভরে উঠেছিলেন, সেদিন জো-ই ছিলেন ঐ ভাবঘন মুহূর্তের অন্তরঙ্গ সাক্ষী। মহাপুরুষ-সান্নিধ্যের এই দিব্য স্মৃতিগুলি জো-র অজ্ঞাতসারেই পরবর্তীকালে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল এক ত্যাগসমুজ্জ্বল মহৎ জীবনের পথে।

মুক্তিদাতা

লেগেট পরিবারের কাছ থেকে স্বামীজী পেয়েছিলেন যথেষ্ট সাহায্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং saint (মহাপুরুষ)-এর সম্মান, কিন্তু জো-র কাছ থেকে পেয়েছিলেন এক সমুন্নতচরিত্রা নারীর নিঃস্বার্থ প্রেম ও পূর্ণ সেবাপরায়ণতা। মহাপ্রয়াণের দু' দিন আগে স্বামীজী ভগিনী নিবেদিতাকে জো-র সম্বন্ধে বলেছিলেন, "সে পবিত্রতার মতোই পবিত্র এবং প্রেমের মতো প্রেমস্বভাবা।"[৮] স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরঙ্গ অনুরাগীদের মধ্যেও এত বড় ভক্তির অধিকারী জীবন অতি বিরল।

কোন্ দেবদুর্লভ আকর্ষণে এত বড় একটি চরিত্র স্বামীজীর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে জো-র নিজের কথাই বলতে হয়। স্বামীজীর তিরোধানের পর বেলুড় মঠ থেকে লিখিত একটি পত্রে জো লিখছেন, "স্বামীজীর জীবনের মধ্যে যে ভাবটি আমাকে ধরে রেখেছিল" সেটি হল তার "অসীমতা।... ও-রকম একটি জীবন মানুষকে কতখানিই না মুক্তস্বভাব করে তোলে! আমাকে মুক্ত করার জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন। নিবেদিতাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার এবং মিসেস্ সা-র জীবনে অদ্বৈতের অনুভূতি দেওয়ার মতো, এটাও তাঁর জীবনের একটা ব্রত ছিল।"[৯]

"আমাকে মুক্ত করার জন্যই স্বামীজী এসেছিলেন"—প্রত্যক্ষ অনুভূতিলব্ধ এ বিশ্বাসের খুঁটি জো-র জীবনে মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি। আর 'মুক্তিদাতা' বিবেকানন্দের প্রতি এই প্রচণ্ড বিশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে ছিল জো-র অফুরন্ত আত্মত্যাগ এবং অমানুষিক জীবনীশক্তির মূল উৎস। আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ হল তা মানুষকে শক্তি যোগায় এবং সমস্ত ভয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে—স্বামীজীর মধ্যে জো এ দুটোই পেয়েছিলেন পরিপূর্ণভাবে। বিবেকানন্দ-চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে জো তাঁর স্মৃতিতে যা লিখেছেন তা শুধু মর্মস্পর্শীই নয়, জো-র নিজের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিচায়কও বটে। "অপরের মধ্যেই যেন তিনি দেখতে পেতেন," জো লিখেছেন, "সমস্ত শক্তি, শ্রদ্ধা এবং গৌরবের মহিমা। যিনিই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তিনিই অনুভব করেছেন তাঁর নিজের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে, তাই যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন সকলেই নতুন উদ্দীপনা শক্তি আর ভরসা নিয়ে ফিরেছেন। সেইজন্য লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমার কাছে আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি?' আমি সব সময়ই বলেছি, 'মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এলে মানুষ যে শক্তি

৮ Reminiscences, p. 249

৯ Reminiscences, p. 250

অনুভব করে, তাই হল আধ্যাত্মিকতা

স্বামীজীর দেবজীবনের সান্নিধ্যটাই জো-র কাছে ছিল বড় কথা। ভগিনী নিবেদিতা অথবা ক্রীষ্টিন-এর মত আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি জো স্বামীজীর কাছে। "আমি ছিলাম তাঁর বন্ধু, শিষ্য নয়।"[১১] বলতেন জো। তাই গুরুশিষ্যের দায়িত্ব ও আনুগত্য, ভার-সমর্পণ বা শাস্ত্রীয় রীতিনীতির বাঁধন তাঁকে স্বীকার করতে হয়নি। আর এই স্বাধীনতা-টুকুর জন্য স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য ও বহুতর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন এই অক্লান্তকর্মী আমেরিকান নারী।

দয়াবতী বন্ধু

পাশ্চাত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য গুণ—সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং তীক্ষ্ণ কর্মতৎপরতা—জো-র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। আর এই প্রচণ্ড কর্মতৎপর-তার সঙ্গে স্বামীজীর কাছ থেকে জো পেয়ে-ছিলেন মুক্ত জীবনবোধ। এ গুণাবলীর জন্য বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী যে জো-কে বিভিন্ন ব্যাপারে কতখানি বিশ্বাস করতেন, এ তথ্যের সাক্ষ্য আমরা পাই স্বামীজীর বহু পত্রে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই লণ্ডন থেকে লেখা একটি পত্রে স্বামীজী লিখছেন, "আমি জো-র বুদ্ধিমত্তা এবং নীরব কার্যপ্রণালীর প্রশংসা না করে পারছি না। তাঁকে একজন সুচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বলা যেতে পারা যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। মানুষের মধ্যে এমন সব বিষয় ধরার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা আমি খুব কমই দেখেছি।" ১৮৯৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরে মিসেস লেগেটের কন্যা আলবার্টাকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী জো-কে তাঁর "সবসময়ের দয়াবতী, সৎ এবং পবিত্রস্বভাবা বন্ধু" বলে অভিহিত করেছেন।

তীক্ষ্ণ সৎবুদ্ধি এবং বাস্তবানুগ কর্মশক্তির জন্য ছোটখাট ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে আমেরিকায় এবং ইউরোপে বেদান্ত-প্রচারের বড় বড় কর্মোদ্যোগ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে জো হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্যে স্বামীজীর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাহায্যকারী। Ridgely Manor-এ একদিন হঠাৎ স্বামীজী বললেন, তিনি চলে যাবেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জো-কে বলেছিলেন, "আমার পরিষ্কার পোশাক পরিচ্ছদ নেই।"[১২] মিঃ লেগেটের উদার অতিথিপরায়ণতার মধ্য দিয়ে জো স্বামীজীর প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। আর একবার জীবনসায়াহ্নে বেলুড় মঠ থেকে জো-কে স্বামীজী জানালেন তাঁর কিছু অর্থের প্রয়োজন, কারণ যা ছিল সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। বুঝে সুঝে খরচ করার মত সাধারণ সাংসারিক মনোবৃত্তি স্বামীজীর কোনদিনই ছিল না তাই প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে অভিভাবকসুলভ দায়িত্বের ভাষায় জানিয়েছিলেন, "২০০ ডলার পাঠালাম। মাসে ৫০ ডলারের বেশি খরচ করতে পারবেন না।" কিন্তু সে অর্থ শেষ হবার আগেই স্বামীজী মর্ত্যধাম থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

আমেরিকায় স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারকার্যে সব সময় পশ্চাতে থেকে সাহায্য করেছেন জো, নিউইয়র্কের এবং লণ্ডনের বেদান্ত-কেন্দ্রের কাজে জো ব্যক্তিগতভাবে প্রভূত সাহায্য করেছেন স্বামীজীকে। জো-র প্রধান কাজ ছিল

১০ Reminiscences, p. 246
১১ " p. 248
১২ Late and Soon, P. 237

বেদান্তপ্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং সুধী-সজ্জনদের বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করা। লণ্ডনের ৬ই জুলাই, ১৮৯৬-এর পত্রে মিঃ লেগেটকে স্বামীজী লিখছেন, "গলসওয়ার্দিরা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছেন। জো বড় অদ্ভুতভাবে তাদের এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।" নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির গোড়ার দিকে মিঃ লেগেট যে অনেক ব্যক্তিগত সাহায্য করেছিলেন এবং পরে তিনি যে ঐ সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব বরণ করেন, এ ব্যাপারেও জো-র অবদান অনস্বীকার্য। প্যারীতে ধর্মসম্মেলনে যোগ-দানের জন্য স্বামীজী যখন যান তখন জো-র উদ্যোগে তিনি মিসেস লেগেটের অতিথি হয়েছিলেন এবং জো-র সাহায্যে প্যারীর বহু সুধী গুণগ্রাহীদের সঙ্গে পরিচিত হন। আমেরিকার পূর্ব উপকূলে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারকার্য শুরু হয়েছিল জোসেফিনের জীবনেরই একটি বিষাদময় অথচ নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে।

Ridgely Manor-এ থাকাকালীন একদিন জো আর বেটি সংবাদ পেলেন তাঁদের একমাত্র ভাই Taylor লস্‌এঞ্জেলেসের মিসেস্ ব্লজেট নামক জনৈকা মহিলার গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে পড়লেন জো। যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তে স্বামীজী সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন, "যাও, ক্লাসের ব্যবস্থা করো। আমি আসছি'।" দূরপথ অতিক্রম করে যেদিন অপরিচিতা প্রৌঢ়া মিসেস্ ব্লজেটের গৃহে পৌঁছালেন, জো দেখলেন বড় ভাই Taylor আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় শায়িত। হঠাৎ চোখে পড়ল জো-র—ভ্রাতার মৃত্যুশয্যায় শিয়রে টাঙানো রয়েছে বিরাট এক প্রতিকৃতি—স্বামী বিবেকানন্দের। বিস্মিত জো জিজ্ঞাসা করলেন বুড়ীকে—কি করে তিনি জানলেন বিবেকানন্দকে। শিকাগো ধর্মমহাসভার শ্রোতৃবৃন্দের অন্যতমা বুড়ী সগর্বে উত্তর দিলেন, "পৃথিবীতে যদি কোন দেবতা থেকে থাকেন, ইনিই সেই ব্যক্তি"।[১৩] তিন সপ্তাহ পরে টেলর চিরবিদায় নেন, এবং ছয় সপ্তাহ পরে বৃদ্ধা ব্লজেটের ভক্তি-বিশ্বাসকে পূর্ণ করে স্বামীজী তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির হন। ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্তপ্রচারের শুরু এইখানেই।

জাপানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন স্বামীজী শিল্পী ওকাকুরার কাছ থেকে। শেষ দিনগুলোয় অসুস্থতাবশতঃ জাপান যাত্রা আর হয়ে ওঠেনি স্বামীজীর পক্ষে। গিয়েছিলেন জো এবং জাপানের কাছ থেকে ভারতবর্ষের অনেক কিছু শেখার আছে—এই মর্মে যে পত্র লিখেছিলেন স্বামীজী তাঁর উত্তরে এ মতের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। স্বামীজীর যাওয়া না হলেও ভারত-জাপান সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছিল; এবং তা হয়েছিল বেলুড়ের মঠ-প্রাঙ্গণে। শিল্পী ওকাকুরাকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জো স্বামীজীর কাছে মহাপ্রয়াণের বছরখানেক আগে।

উত্তরকালে বিশ্বের যে-কোন জায়গাতে—লণ্ডন, সানফ্রান্সিস্‌কো, প্যারি, ক্যালিফোর্নিয়া—রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্তপ্রচারকরা গিয়েছেন, জো গিয়ে হাজির হতেন তাঁদের সাহায্য করার জন্য। কৌতূহলী কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতেন জো-কে, কেন তিনি ঘুরে বেড়ান এমন করে বিভিন্ন বেদান্ত কেন্দ্রে, গৌরবের সঙ্গে উত্তর দিতেন বৃদ্ধা, "To make lovers of Swamiji." অর্থাৎ "স্বামীজীর ভক্ত তৈরি করার জন্য।" ব্যক্তি বিবেকানন্দের অন্তরালে জো

[১৩] Reminiscences P. 245

দেখেছিলেন নৈর্ব্যক্তিক যুগাদর্শের ঘনীভূত রূপ বিবেকানন্দকে। জো-র কাছে তাই স্বামীজীর ব্রত উদ্‌যাপনের কাজ দেহী বিবেকানন্দের সেবারই সমতুল। বেদান্তপ্রচারের মাধ্যমে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সাম্য, মৈত্রী, আধ্যাত্মিকতার নতুন প্লাবন এনে নতুন যুগের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা—জো-র কাছে একাজ স্বামীজীকে তাঁর বৃহত্তর সত্তায় অনুধ্যান করারই পথ। এ বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি করেই জো স্বামীজীর শিষ্য বিরজানন্দজীকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর বাণীপ্রচারের কাজে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন, "হিমালয় কেন্দ্রে আমাদের প্রভুর কাজ চালাবার জন্য উপযুক্ত একদল নতুন কর্মী গড়ে তোলা যেতে পারে। কী গৌরবময় এই কাজ!······এখনও হয়তো চল্লিশ বছর আমাদের এ কাজ করতে হবে। বেশ মজা লাগে যখন দেখতে পাই অন্তঃপ্রবাহিত স্রোত উপরে উঠে চোখের গোচরীভূত হচ্ছে। তাই নয় কি?······আমার কাজ ছিল স্বামীজীকে চেনা। প্রথম যখন তাঁর দর্শন পেলাম তখনই যেন আমি সত্যকে দেখতে পেয়েছিলাম। আজও তাই দেখছি, সেই সত্যের মহিমান্বিত আলো কখনও কাঁপেনি, বাড়েনি বা কমেনি। সেইদিন থেকে আজ উনিশ বছর কেটে গেছে, আজ আমি এই কথা বলা শুরু করতে পারছি। কিন্তু তুমি? তুমি? তুমি তো তাঁর বাণী হাজার হাজার ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিয়েছ!"[১৪]

শিষ্য না হলেও, সত্যস্বরূপ বিবেকানন্দে এই অচঞ্চল বিশ্বাসের জন্য জো একটি বিশেষ স্থান পেয়েছিলেন ঋষি-বিবেকানন্দের অন্তরে, স্বামীজীর বহু পত্রে তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। ১৯০০, ১৮ই এপ্রিল আলামেডা থেকে লিখিত যে অবিস্মরণীয় পত্রটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নরেন', সপ্তর্ষির ঋষি তাঁর অন্তরের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, সে চিঠি লিখিত হয়েছিল আর কাউকে নয় পবিত্রস্বভাবা জো-কে। নিজ-নিকেতনের আহ্বানে আকুল, নির্বাণস্বপ্নে বিভোর "ধ্যানসিদ্ধ" বিবেকানন্দ পরমাত্মীয়-বোধে জো-র কাছে প্রকাশ করেছেন তাঁর অন্তরের গভীরতম আকুতি :

"কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়। ···যতই যা হোক, জো, আমি এখন পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর আর বিভোর হয়ে যেত।···আমার সামনে অপার নির্বাণসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি।···সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ করছে না। ···শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস।"

(ক্রমশঃ)

১৪ অতীতের স্মৃতি, পৃঃ ১৭৭-৭৮

সমালোচনা

মহাপুরুষপ্রসঙ্গ (১৬শ সংস্করণ)— স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ২৩৪ ; মূল্য : তিন টাকা।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পরিচয়প্রদান অনাবশ্যক। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সহিত জনসাধারণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে সুপরিচিত। বর্তমান সংস্করণটি শুধু পুনর্মুদ্রণ নয়, পাঠক-গণের নিকট ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনটি বিষয় এই সংস্করণে সংযোজিত : পওহারী বাবা, বুদ্ধের বাণী, ভারতীয় মহাপুরুষগণ।

'পওহারী বাবা' মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার জন্য ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধ, 'বুদ্ধের বাণী' ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ এবং 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' মাদ্রাজে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ।

সাধু নাগমহাশয় (১১শ সংস্করণ)— শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা : ১৪৪ ; মূল্য : দুই টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ গৃহস্থ ভক্ত নাগমহাশয় সম্বন্ধে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। গিরিশবাবু নাগ-মহাশয়ের নিরহঙ্কার ভাব দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন : "...নাগমহাশয় এত ছোট হয়ে যান যে, মহামায়া তাঁকে বাঁধতেই পারেন না।"

নাগমহাশয়ের দেবোপম চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার দীনতা, শ্রদ্ধাভক্তি, তপস্যা, কঠোরতা, তেজস্বিতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। পুণ্যচরিত্রের অনুধ্যান আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়ক। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত এই মহাপুরুষের জীবনকাহিনী মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণিত।

বিশ্বরূপিণী মা সারদা : শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃঃ ২৮৮ ; মূল্য : আট টাকা।

শোভন প্রচ্ছদে ও নিপুণ মুদ্রণে আদ্যন্ত সুরুচিমণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী সারদাদেবীর এই নূতন জীবনীগ্রন্থখানি সরল ভক্তিমণ্ডিত ভাষায় বঙ্গসরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে লেখিকা স্বয়ং কৃতার্থ এবং পাঠকেরাও যে নবযুগের মাতৃমহিমার প্রতি নতুন আলোক-পাতে আনন্দিত হবেন, সন্দেহ নেই। ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী ভারতীয় দর্শনচিন্তার পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণশক্তিস্বরূপিণীর অলোক-মহিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃ-আহ্বানের মহামন্ত্রে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী যেমন জাগ্রত হয়ে-ছিলেন, তেমনি জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্জের মেয়ে সারদামণিরও আবির্ভাব ঘটে-

ছিল। সেই মহামাতৃশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে আরম্ভ করে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, ভক্ত গিরিশচন্দ্র, সাধু নাগমহাশয়, ভগিনী নিবেদিতা, গৌরী মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা), লক্ষ্মীমণি দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন সাধক ও মনীষীর দৃষ্টিকোণে কিভাবে ধরা দিয়েছিল, লেখিকা একুশটি অধ্যায়ে তারই তথ্য সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। পড়তে পড়তে শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবনরূপ মহামন্দির-পরিক্রমার ভাবপরিমণ্ডল আপনি অন্তরে সৃষ্ট হয়।

বঙ্গসাহিত্য-প্রাঙ্গণে লেখিকার এই প্রথম প্রয়াস সর্বজনসমাদৃত হবে—এই আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বরাহনগর আলমবাজার মঠ :—শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শ্রীপ্রণবেন্দ্র ভট্টাচার্য, ২১বি, রতনবাবু রোড, কাশীপুর, কলিকাতা ২। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১০৪ ; মূল্য : ১.৭৫।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদগণ তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর ত্যাগ-তপস্যা সহায়ে নিঃসম্বল অবস্থায় কিভাবে বরাহনগর মঠ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিভাবে আলমবাজার মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী পুস্তকখানিতে পাওয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানা পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বিভিন্ন সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, সেই প্রবন্ধগুলি এবং আরও দুইটি প্রবন্ধ পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠক-সমাজে পুস্তকখানির সমাদর হইবে, আশা করি।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা (ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ, ১৩৭৬) শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া ৪ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা : ৮০।

এই বৎসরের পত্রিকাখানি মহাত্মা গান্ধী স্মরণে প্রকাশিত। গান্ধীজীর সম্বন্ধে অনেকগুলি লেখা স্থান পাইয়াছে। খান আবদুল গফ্ফর খান-এর গান্ধীজীর স্মৃতি (Bhavan's Journal পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ) বেশ উপভোগ্য। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রের 'খাওয়ার ছড়া' কবিতা ও 'আমেরিকার স্কুলে একটি বছর' লেখাটি ভাল লাগিল। অন্য রচনাগুলিও সুসম্পাদিত। 'আমাদের কথা'য় বিদ্যালয়ের পড়াশুনা, খেলাধুলা এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৬ই মাঘ (৩০.১.১৯৭০) শুক্রবার পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৮তম জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে মঙ্গলারতির পর প্রত্যূষে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতি ও বেদ-আবৃত্তি হইয়াছিল। তৎপরে স্বামীজীর ঘরে ভজন হয়। সকাল ৭টা হইতে স্বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পূজাদি ও শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরেও বিশেষ পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ৯টা হইতে ১০টা নাটমন্দিরে কঠোপনিষৎ পাঠ এবং ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সমাগত প্রায় ছয় হাজার ভক্ত হাতে হাতে অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন। কয়েক সহস্র নরনারী এই দিন স্বামীজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়; বক্তা অধ্যাপক শঙ্করী-প্রসাদ বসু, এবং অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার।

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, 'বিরাট কল্পনা ও তপস্যার তীর্থ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত এই বেলুড় মঠ। প্রমিথিউসের মতো অসীম বেদনাকে বরণ করে নিয়েও তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন, তাকে দেবত্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন। আজ ধর্মের প্রতিবন্ধক তিনটি—ক্ষুধা, বিজ্ঞান ও সাম্প্রদায়িকতা। এই তিনটির বিরুদ্ধে লড়াই-এ জয়ী হবার জন্য তিনি যথেষ্ট চিন্তাসম্ভার দিয়ে গেছেন। বিপুল কর্মোদ্যম, বেদান্তের ভাবাবগাহন এবং বিভিন্ন মতবাদের ঊর্ধ্বে অবস্থিত ধর্মের সর্বজনীন ভাবগ্রহণের কথা বলে গেছেন তিনি, যা সব বাধা ঠেলে বিশ্বমানবকে দেবত্বে উন্নয়নের পথে বিশ্বভ্রাতৃত্বস্থাপনরূপ তাঁর বিরাট কল্পনাকে রূপ দিতে সক্ষম।' অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার বলেন, 'তরুণদের কাছে আজ প্রশ্ন—স্বামীজী যে অদ্বৈতবাদকে জীবনের সঙ্গে অভিন্ন করে রেখেছিলেন, সমাজসেবা ও রাষ্ট্রসেবার ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন আছে কি না? তরুণদের এই বিভ্রান্তির কারণ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি—বর্তমানে মানব-জাতি স্বর্ণযুগের দোর-গোড়ায় পৌঁছেছে কিন্তু সেখানে তাকে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে ধর্ম, এবং কার্ল মার্কস-এর একটি উক্তি—ধর্ম আফিমের মতো, মানুষকে ঝিমিয়ে রাখে। স্বামীজী পরিষ্কার বলে গেছেন ধর্মই মানব-জাতিকে স্বর্ণযুগে পৌঁছে দেবে, কারণ মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে শেখাতে, মানুষকে যথার্থ উন্নত করতে পারে একমাত্র ধর্ম—অদ্বৈতভাবধারাই। স্বামীজী সেজন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আগে দেশকে উপনিষদের ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে; আগে লোকের দুঃখ দূর করে পরে ধর্ম করতে নয়, ধর্মকে অবলম্বন করেই সে কাজ করতে; তাহলেই আমরা মানুষকে নিজের মতো দেখতে, মানব-সেবায় আত্মদান করতে সক্ষম হবো।' স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, 'জীবন ও সমাজে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই স্বামীজী

এসেছিলেন। প্রাচীনপন্থীরা অনেকে ভাবেন, কেবল ধর্ম করলেই হবে, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। আবার প্রগতিবাদীরা অনেকে ভাবেন, স্বামীজী আসলে সমাজসেবার কথাই বলেছেন, তাঁর ধর্মের কথা গৌণ—ভারতের লোক ধর্ম ছাড়া কিছু বোঝে না বলেই ধর্মের কথার ভেতর দিয়ে তা বলে গেছেন। স্বামীজীর বিভিন্ন আংশিক উক্তিকে দু-দলই নিজ নিজ মতের সমর্থক বলে মনে করেন। ফলে অনেকেরই মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, স্বামীজী যে শূদ্রজাগরণের কথা বলেছিলেন, যে সমাজবাদের কথা বলেছিলেন, সমাজবাদ যেভাবে আজ আমাদের সামনে এসেছে, সেইটাই স্বামীজীর কাম্য রূপ। এ ধারণা ভ্রান্ত—স্বামীজী ধর্মকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই চাননি। তিনি সংস্কৃতিকে নষ্ট করে সকলকে এক করতে চাননি, সকলকেই উচ্চ-সংস্কৃতিমান করে এক করতে চেয়েছিলেন—শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করে এক করতে চেয়েছিলেন। তিনি তথাকথিত বিপ্লবের পথে ভেঙ্গেচুড়ে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, চেয়েছিলেন স্বেচ্ছায় দেওয়ার মাধ্যমে, ভগবদ্বুদ্ধিতে মানবসেবার মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। সমাজসেবা রাষ্ট্রসেবা সব কিছুই তিনি করতে বলেছেন ধর্মকে আঁকড়ে থেকে—বেদান্তের ইতি-বাচক ধর্মকে, যা সব মানুষের যথার্থ একত্বের সন্ধান দিয়ে মানুষকে সাম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।'

সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে ভজনাদির ব্যবস্থা ছিল

দ্বারোদ্ঘাটন

করিমগঞ্জ: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ১৩ই জানুআরি করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের নবনির্মিত বিবেকানন্দভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এপ্রিল, ১৯৬৭ হইতে মার্চ, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠ বিভাগ: ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক ভুবনেশ্বরে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে নিয়মিত পূজা, প্রার্থনা, ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালী-পূজা, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্ট-জন্মদিন, আচার্য শঙ্করের জন্মতিথি এবং অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। মঠে এবং ভুবনেশ্বর ও কটক শহরের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা ও সাময়িক বক্তৃতার মাধ্যমে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচার করা হয়। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে এই সমস্ত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

মঠ বিভাগে একটি গ্রন্থাগার আছে, এখানে অনেক তথ্য-পুস্তক রাখা হইয়াছে; এই পুস্তকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকের মতো ব্যবহৃত হয় না। ওড়িয়া ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সহিত্যের কতকগুলি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মিশন বিভাগ: সর্বসাধারণের জন্য বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালিত হয়। ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে, স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী সময়ে। দরিদ্র ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তকের একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। শিশুদের পড়াশুনায় উৎসাহ দিবার জন্য লাইব্রেরীর শিশুবিভাগটি

ভাল কাজ করিতেছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৭,৮৬১। পাঠাগারে ৭টি দৈনিক এবং ৪৩টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য সময়ে গ্রন্থাগারের গ্রাহকগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ৩২,৩১০। মিশন কর্তৃক গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্য নির্মীয়মাণ নূতন ভবনটি সমাপ্তির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

মিশন-পরিচালিত বিবেকানন্দ এম ই স্কুল ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়: উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর যাবৎ স্থানীয় দরিদ্র শিশুগণের মধ্যে শিক্ষাবিতরণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহা এম. ই. স্কুলে উন্নীত হইয়াছে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৬৪, তন্মধ্যে ছাত্র ১৯৪। এম ই. স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩৫।

দাতব্য চিকিৎসালয়: ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে মিশন কর্তৃক একটি অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণ এই ডিস্পেন্সারীর মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা লাভ করিতেছে। ভুবনেশ্বরতীর্থে আগত ভারতের বিভিন্ন অংশের তীর্থযাত্রীরা অসুস্থ হইয়া পড়িলে অসহায় অবস্থায় এখানে চিকিৎসালাভ করেন। ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ২১,৮১৬ ও ২১,৫৭৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা: চিরালায় ৭০টি বাসগৃহ এবং একটি বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং নির্ধারিত কর্মসূচীর কার্যাদি শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: জলপাইগুড়ি জেলায় ৩৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১৩টি বোর্ড, গ্লোব ইত্যাদি শিক্ষা-সরঞ্জাম দেওয়া হইয়াছে। জলপাইগুড়ি শহরের নিকটে মোহিতনগরে বাসগৃহনির্মাণের কাজ ভাল ভাবেই হইতেছে।

গত ১০ই জানুআরি গুজরাটের গভর্নর শ্রীশ্রীমন্নারায়ণ সুরাটে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বন্যার্তসেবা-কেন্দ্রের ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

উৎসব সংবাদ

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি পূজা-ভজনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে সমবেত বহু নর-নারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়।

ফরিদপুরের মহিলাগণের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ৯ই জানুআরি। ঐদিন শ্রীযুক্তা রমা লাহিড়ীর সভানেত্রীত্বে আহূত সভায় সর্বশ্রেণীর বহু মহিলা সমবেত হন। উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন মীরা রায়। উৎসবকমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সুকুমারী ভদ্র অসুস্থা থাকায় তাঁহার ভাষণ পাঠ করিয়া শুনান আভা অধিকারী। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীযুক্তা হেনা রায়। সভানেত্রীর ভাষণে শ্রীযুক্তা রমা লাহিড়ী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীসারদা মায়ের জীবন-দর্শন আলোচনা করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীযুক্তা ছবি বিশ্বাস। সর্বশেষে ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষ

হইতে সম্পাদক শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী সভানেত্রীকে ও উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির মহিলাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার পর অন্যূন তিন হাজার নর-নারী খিচুড়ি প্রসাদ পরিতৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করেন।

উক্ত মহিলাগণের প্রচেষ্টায় ১০ই জানুআরি শনিবার সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর জীবনী অবলম্বনে একটি "গীতি-আলেখ্য" অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী ভীমানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ২৭শে জানুআরি রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী ভীমানন্দ (সুধীন মহারাজ) করোনারী থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হইয়া রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাত্র ৪৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন

সুদীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল তিনি রাঁচি স্যানা-টোরিয়ামে থাকিয়া এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটির উন্নতিসাধনে স্বীয় কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিলেন। স্বামী ভীমানন্দ কর্মঠ ও মধুরস্বভাব সন্ন্যাসী ছিলেন। অকালে তাঁহার দেহত্যাগে সঙ্ঘ ভবিষ্যৎসম্ভাবনাপূর্ণ একজন সন্ন্যাসীকে হারাইল

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চির-শান্তি লাভ করিয়াছে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

১। বছরের মাঝখানে ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখান হইতেই হাতে লিখিয়া উহা পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে অনেকের ধারণা হয়, বোধ হয় পুরাতন ঠিকানা হইতে রি-ডাইরেকটেড' হইতেছে। সত্যই 'রি-ডাইরেকটেড' হইল কিনা, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার পর পত্র দিলে আমাদের কাজের সুবিধা হয়।

২। প্রেসের গণ্ডগোলের জন্য সম্প্রতি আমাদের পত্রিকা প্রকাশে খুবই বিলম্ব হইতেছে। দয়া করিয়া আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনা করিবেন এবং সময়মত পত্রিকা না পাইলে বাংলা মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত দেখিবার পর পত্র দিবেন।

৩। চিঠিপত্র বাংলায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। উত্তরের জন্য রিপ্লাই পোষ্টকার্ড প্রয়োজন।

বিবিধ সংবাদ

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক যুব শিক্ষণ শিবির ১০ই জানুআরি হইতে ১৪ই জানুআরি বজবজের নিকটবর্তী সারেঙ্গাবাদে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী এই শিবিরে যোগ দেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র, শিক্ষক, চাকরিজীবী, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

শিবিরের নিয়মিত সূচী মনঃসংযোগ, ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, প্রাথমিক চিকিৎসা, খেলাধূলা, ব্রতচারী, স্কাউটিং, প্রার্থনা, ইত্যাদি ছাড়াও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দিনে 'ত্যাগ ও সেবার আদর্শ', 'বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ', প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষার আসরে যোগদান করেন। এইসব শিক্ষার আসরে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ও মহামণ্ডলের সভাপতি অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার মহাশয় ভাষণ দেন। ১০ই জানুআরি সন্ধ্যায় শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী অনন্যানন্দজী।

শিবিরের দ্বিতীয় দিনে প্রায় একশত শিশু একদিনের জন্য ঐ শিবিরে যোগ দেন।

শিশিবের তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীরা সারেঙ্গাবাদ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কচুরিপানা-বোঝাই প্রশস্ত পুকুরটি পরিষ্কার করেন। চতুর্থ দিনটি অতিবাহিত হয় শিক্ষার্থী দিবস হিসাবে। এই দিন সকালে শিক্ষার্থিগণ স্থানীয় একটি রাস্তা মেরামত ও একটি পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার করেন।

শিবিরের শেষ দিনটিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৪ জন কেন্দ্রীয় ভ্রাম্যমাণ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করেন।

গত ১লা ফেব্রুয়ারি অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে ময়দানে শহীদ-মীনারের পাদদেশে একটি যুবসমাবেশের আয়োজন করা হয়। দেশপ্রিয় পার্ক, এণ্টালী পদ্মপুকুর পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও শ্যাম স্কোয়ার হইতে চারটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ময়দানে আসিয়া মিলিত হয়। ময়দানের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ডঃ হীরালাল চোপরা ও স্বামী পরহিতানন্দ। সভায় প্রায় দশ হাজার শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

তারাপুরে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পারমাণবিক কারখানা

গত ১৯শে জানুআরি ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বোম্বাই শহর হইতে ৬৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত তারাপুরে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের কারখানাটির উদ্বোধন করিয়াছেন। কারখানাটি নির্মিত হইয়াছে সাত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের

ফলে। এশিয়ার মধ্যে এটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বৃহত্তম কারখানা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় জেনারেটর চালাইয়া; পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাইবার পূর্বে জেনারেটর চালাইবার জন্য শক্তির উৎস ছিল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম জলপ্রপাত, তেল ও কয়লা। পারমাণবিক চুল্লীতে পরমাণু ভাঙ্গার ফলে যে তাপ-শক্তির উদ্ভব হয়, সেই শক্তিকেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানায় কাজে লাগানো হয়। তারাপুরের এই কারখানায় প্রতিদিন ইউরেনিয়াম ভরা চুল্লী হইতে যে তাপশক্তি পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া সেই বাষ্প দ্বারা দুটি জেনারেটর চালানো হয়। জেনারেটর দুটির উৎপাদন-ক্ষমতা দুই লক্ষ করিয়া চার লক্ষ কিলোওয়াট। এই কাজে যদি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার না করিয়া কয়লা পুড়াইয়া শক্তি সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রতিদিন ১ কোটি কুড়ি লক্ষ টন করিয়া কয়লা লাগিত।

উৎসব-সংবাদ

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ইং ২৯শে জানুআরি বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগাদি, প্রসাদবিতরণ এবং জীবন ও বাণী আলোচনার মাধ্যমে যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

সিমুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শিশু মিলনীতে গত ২৯শে পৌষ, ১৩৭৬ বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারে শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি প্রতিপালিত হইয়াছে।

সুরবিতান গত ৩১শে ডিসেম্বর এক নিষ্ঠাপূর্ণ অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীসারদামাতার শুভ আবির্ভাব-দিবস পালন করিয়াছে।

পরলোকে শ্রীসুধাংশুমোহন দত্ত

বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাসের ৺হরিপদ দত্তের পুত্র সুধাংশুমোহন দত্ত ৭৪ বৎসর বয়সে বিগত ১৭ই জানুআরি ১৯৭০ সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মিলিত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মহাষ্টমীর দিন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও বেলুড় মঠে তাঁহার যাতায়াত ছিল, এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের সহিত ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে চিরশান্তি-লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ (৯. ৩. ৭০) সোমবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার ১লা চৈত্র (১৫. ৩. ৭০) বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান হইবে।



দিব্য বাণী

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ৩।২৯

ভগবদ্‌-গুণগান শোনামাত্র সারা মন যে পথ ধরিয়া
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আকারে
বয়ে গিয়ে মিশে যায় সবার অন্তরবাসী
আমাতেই, গঙ্গাধারা যেমন সাগরে,
সে পথ ত্রিগুণাতীত অহেতুকী ভকাতর,
চাহে না তা কোন প্রতিদান,
ভক্ত আর ভগবান পুরুষোত্তম মাঝে
রাখে না তা কোন ভেদ, কোন ব্যবধান ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

—শ্রীরূপগোস্বামী

পরম বদান্য যিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা
নমি সেই অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচরণে—
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে আসিলা যে ধরাধামে
উজলিয়া দশদিশি গৌরাঙ্গ কিরণে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ভগবদ্ভক্তি শিখাইবার জন্য এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব, শচীমাতার নিমাই। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির একটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, "সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্। হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তি-রুচ্যতে॥" দেহমন প্রভৃতিকে এবং জাতি-কুল-শীল প্রভৃতিকেও উপাধি বলে ; এগুলিতে আমি বা আমার বোধ যাঁহার একেবারেই নাই, যাঁহার চিত্ত ভগবচ্চিন্তায় সদা মগ্ন থাকায় শুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সহায়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিরাজ শ্রীভগবানের যে সেবা, তাহাই ভক্তি। এরূপ ভক্তির অধিকারী গীতোক্ত শ্রেষ্ঠ ভক্ত—জ্ঞানী ভক্ত—যিনি অদ্বয়ানুভূতির পরও ভক্তিভাব লইয়া থাকেন। এরূপ ভক্তিই 'অহৈতুকী', 'অব্যবহিতা' ভক্তি ; কারণ যাহা লাভ করিবার পর চাহিবার বা পাইবার আর কিছুই থাকে না, তাহা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন এবং ভগবানের সঙ্গে নিজের ভেদরাহিত্যও উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের চোখের সামনে এই ভক্তিরই রূপ তুলিয়া ধরিতে আসিয়াছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। আমাদের ইহা শিখাইবার জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ, নিজের প্রয়োজনে নয়। সব অবতারেরই জীবনের সব ঘটনাই অবশ্য তাই, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, লোকশিক্ষার জন্য অভিনয়মাত্র।

তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে আজ সেরূপ ভক্তিলাভের জন্যই প্রার্থনা জানাই তাঁহার চরণে, যাহা ভক্তকে সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত করে ; প্রার্থনা জানাই ভগবদ্‌গুণগানে মতির জন্য, তাঁহারই ভাষায় 'যাহা পরাবিদ্যার জীবনস্বরূপ, যাহা শ্রবণমাত্র অন্তরে আনন্দাম্বুধি উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়, চিরশান্তিস্নাত করে।'

শিব

(১)

দোল-দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে বছরে কয়েকটি দিন আসে, যাহা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মনে সারা জাগাইয়া তোলে। শিবরাত্রি উহাদের অন্যতম। এই দিন ভারত জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ চিত্তকে সর্বত্যাগী মহেশ্বরের চিন্তা দোলা দিয়া যায়। উপবাস, পূজা, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে এইদিন অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় মহাদেবের চরণে। নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা মতো বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রার্থনা জানায় তাঁহার কাছে ; কেহ চায় কোন জাগতিক কামনার বস্তু, কেহ বা উচ্চতর লোকে যাইবার জন্য পুণ্য, কেহ বা ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভের জন্য কৃপা। প্রার্থনা যাহাই হউক, সকলেরই বিশ্বাস, আন্তরিকভাবে যে যাহা চাহিবে তাঁহার নিকট হইতে সে তাহাই পাইবে। পাওয়া যায়ও।

আমাদের এই শিবঠাকুর কোন্ সুদূর অতীত হইতে ভারতের চিত্তে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়াছেন কে জানে। তিনি অদ্বয়তত্ত্বের প্রতীক, আর উমা তাঁহার শক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি অভেদ হইলেও, ব্রহ্ম নামরূপা-তীত, মনবুদ্ধির অতীত হইলেও তাঁহাকে সাকার শিবরূপে ও তাঁহার শক্তিকে পৃথকভাবে উমারূপে কল্পনা করিবার আসল কারণ হইল—এরূপ না করিলে আমরা প্রায় সকলেই সে অদ্বয়তত্ত্ব

সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারিব না। আমাদের ধারণার জন্য মনবুদ্ধি ধরিতে-ছুঁইতে পারে, এমন একটি কিছু চাই—নামরূপবিশিষ্ট কিছু চাই-ই। এরূপ কোন অবলম্বনের মধ্য দিয়া সত্যকে যতটা সম্ভব ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে করিতেই, অসংখ্য চিন্তায় এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়া মনকে একটি ঈশ্বরীয় রূপের চিন্তায় একাগ্র করার চেষ্টা করিতে করিতেই ক্রমে মন যত শুদ্ধ হয়, ততই সে মনে সত্য অধিকতররূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। শেষে এই চেষ্টার ফলে মন যখন সম্পূর্ণ শুদ্ধ, একাগ্র হয় তখন সত্য পূর্ণ-প্রকাশিত হয়। তখনই আমরা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি শিব কি, শক্তি কি, অদ্বয়তত্ত্ব বলিতে, শিবশক্তি অভেদ বলিতে কি বুঝায়।

সেই মনবুদ্ধির অতীত সত্যকে আমাদের মনের নাগালের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অরূপের এই সব রূপ-কল্পনাগুলি ; বিভিন্ন শাস্ত্রে এগুলি পাওয়া গেলেও আসলে এ রূপ-কল্পনা তাঁহারই —"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"— আমাদের ভগবানলাভ করাইবার জন্য, আমাদের হিতের জন্য তিনিই এসব রূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

চরম সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-দুয়ারে আনিয়া দিয়াছে পুরাণগুলি। দেবী-ভাগবতে তাই নামরূপাতীত অদ্বয়সত্তার প্রথম রূপকল্পনা হইল অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি—এক দেহের অর্ধেক শিব, অর্ধেক উমা। ধারণার জন্য অরূপকে রূপের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিতে হইলেও ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি যে অভেদ, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই, সেজন্যই এই অর্ধনারীশ্বর-মূর্তি। তাহার পর উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখানো হইয়াছে।

(২)

আমরা মানুষ—যতক্ষণ না আমরা মনবুদ্ধির পারে যাইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে তাঁহাকে মানুষেরই মতো রূপ-ও গুণবিশিষ্ট, অন্ততঃ গুণবিশিষ্ট বলিয়া ভাবা ছাড়া গত্যন্তর নাই, যতই না আমরা দার্শনিক তত্ত্ব মুখে আওড়াই না। কাজেই শিবঠাকুরকে আমরা উত্তুঙ্গ অদ্বয়তত্ত্ব হইতে নামাইয়া আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণে লইয়া আসিয়াছি। তাঁহার সংসার আছে, উমা তাঁহার গৃহিণী, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁহার সন্তান। তিনি ভাঙ খান, তিনি কোন কাজ করেন না, শুধু ধ্যান করেন। তাঁহার চেলাগুলিও তাঁহারই মত 'নিষ্কর্মা'। মা-উমাকে তাঁহাদের খাওয়াইতে হয়—তাই মা তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে কড়া কথাও শোনান। যেমন ঘটে আমাদের সংসারে। শিব কিন্তু সর্বাবস্থায় নির্বিকার। অতি অল্পে তুষ্ট, আর সদা কল্যাণকামী সকলের জন্য। দক্ষরাজা সব দেবতাদের সামনে শিবকে গালাগাল করিতেছেন, অজস্র কটূক্তি বর্ষণ করিতেছেন (শক্তিকে কখনো হিমালয়-দুহিতা উমারূপে, কখনো আদ্যাশক্তিরূপে, কখনো অন্নপূর্ণা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি রূপে, কখনো দক্ষরাজার কন্যা সতীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে); শিব তখন কি করিতেছেন? নির্বিকার চিত্তে বসিয়া আছেন। 'সহ্য করা' বলিতে যাহা বুঝি আমরা তাহাই করিতেছেন কি? না ; মর্মর-মূর্তিতে বারিধারা-বর্ষণ যেমন কোন রেখাপাত করিতে পারে না, শিবের চিত্তেও দক্ষের কথাগুলি তেমনি কোন রেখাপাতই করিতে পারিতেছে না। তাঁহার দৃষ্টিও স্থির ; একবার শুধু তাহা করুণামৃতবর্ষী হয়ে দক্ষের উপর

পড়িল—দক্ষের যেন কোন অকল্যাণ না হয়! এই অপরূপ পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি মনে ভাসিয়া উঠে আমাদেরই যুগের একটি শিবচরিত্রের বাস্তব ঘটনার ছবি—গিরিশ ঘোষের অকথ্য কটূক্তি শুনিয়াও নির্বিকারচিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অযাচিতভাবে নিজেই গিরিশবাবুর বাড়ীতে চলিতেছেন তাঁহাকে কৃপা করিতে, তাঁহার যেন কোন অকল্যাণ না হয়—"ও আমাকে যাই বলুক, আমার 'মা'-কে তো কিছু বলেনি"!

এই হলেন আমাদের শিবঠাকুর—আমাদের হাতের নাগালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই আমাদেরই মতো একজন ভাবিয়া তাঁহাকে আমরা আপনজন করিয়া লইতে পারি, ভালোবাসিতে পারি নিজের মতো করিয়া, সর্বাবস্থায় ক্ষমা পাইতে পারি তাঁহার। আবার নিজেকে ক্রমোন্নত করিতে করিতে সেই শিবকেই অন্য মূর্তিতে দেখিতে দেখিতে তাঁহার অরূপসত্তাতেও পৌঁছুতে পারি, যাহা 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', মনবাক্যের অতীত—চিন্তার মাধ্যমে ধরার ও ভাষার মাধ্যমে প্রকাশের অতীত হইলেও সব সংশয় নিঃশেষে মুচিয়া যায় সেই উপলব্ধিতে—কবির ভাষায় "সেই নৈশব্দ্যচূড়ায়, সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে লুকায়।" সেই নিঃশব্দ মৌন উপলব্ধি-হিমাচলের জ্ঞানতুহিনশুভ্র সর্বোচ্চ শিখরই শিবের সর্বোচ্চ আসন—সেখানে 'চিদানন্দরূপ' শিব আমাদের স্বরূপের সঙ্গে, জগতের স্বরূপের সঙ্গে অভেদ হইয়া আসীন।

(৩)

ভারতীয় জাতিকে যুগে যুগে কত পরিবর্তনের, কত ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে হাজার হাজার বছরের পথ অতিক্রম করিয়া। বর্তমান সময়েও তাহার বিশ্বাসের গগনে দুর্যোগের অন্ত নাই। কিন্তু শিবঠাকুর এই জাতির চিত্তাসনে সবসময় একই ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সরাইবার চেষ্টা কি হয় নাই কখনো? হইয়াছিল; এখনো তো হইতেছে। বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন মতবাদ, জড়বিজ্ঞান, যুক্তি, প্রগতিপরায়ণতা, প্রভৃতি সে আসন একবার করিয়া নাড়া দিয়াছে ও এখনো দিতেছে পুতুলপূজা বলিয়া, কুসংস্কার বলিয়া, জ্ঞানহীনতা বলিয়া, আমাদের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? ভারতীয় জাতির চিত্ত হইতে শিবঠাকুরকে সরাইতে কেহ পারে নাই, পারিবেও না কোনদিন। স্বামীজীর ভাষায়, শিবঠাকুর এখানে ষাঁড়ে চড়িয়া এতদিন যেমন ডমরু বাজ'ইয়া বেড়াইয়াছেন, তেমনি চিরদিনই বেড়াইবেন।

সে ডমরু গম্ভীর নিনাদে আমাদের ডাকে জাগ্রত হইতে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলা শুরু করিতে এবং তাঁর অদ্বয়স্বরূপে পৌঁছিবার আগে না থামিতে।

(৪)

সারা বছর শিবের কথা যাহারা ভাবে না, তাহাদের কেবল শিবরাত্রির দিন উপবাস করিয়া পূজাদি করিবার কোন সার্থকতা আছে কি?

আছে বৈকি। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে জোর, ইচ্ছাশক্তি অনেকটা বাড়াইয়া দেয়, অনেকখানি আত্মবিশ্বাস আসে। মন যখন কিছু চায়, ইচ্ছা করিয়া তখন তাহাকে উহা না দিয়া মনের রাশ যতবার আমরা টানিতে পারি, ততবারই ইচ্ছাশক্তি ও

আত্মবিশ্বাস কিছুটা বাড়িবেই। খাবার সময় হইলেই মন খাইতে চাহিবে, সংকল্প লইয়া উপবাস করিলে মনের রাশ তখন টানিতেই হয়। এইরূপ বিশেষ দিন উপলক্ষে উপবাস করা আমাদের জাতীয় মানস গঠনের সহজ ও সাবলীল পদ্ধতিগুলির অন্যতম। বলা বাহুল্য উপবাস সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই, নতুবা খাইতে না পাইয়া বা অন্য কোন কারণে হয়তো বাধ্য হইয়া উপবাস করিলাম, তাহাতে এ ফল পাওয়া যায় না।

দেহের ক্ষুধার মতো মনের ক্ষুধাও আছে—ভোগ্যবস্তুর চিন্তা; সেখানেও তাহার রাশ টানিতে পারিলে ফল আরো অধিক পাওয়া যায়। ইহার ইতিবাচক উপায় হিসাবেই শিবরাত্রি প্রভৃতি বিশেষ দিনে সর্বক্ষণ সদ্‌গ্রন্থপাঠে, সৎকর্মে ও জপ-ধ্যান-পূজাদিতে মনকে ব্যাপৃত রাখার ব্যবস্থা। তাছাড়া শিবরাত্রিতে বা অন্যান্য পুণ্যদিনে উপবাসের অন্য উদ্দেশ্যও রহিয়াছে; দেহ হাল্কা থাকিলে তাহা মনকে একাগ্র করার, দীর্ঘকাল পূজা-জপধ্যানাদি করার বিশেষ সহায়ক হয়।

আরও একটি বড় দিক রহিয়াছে এই সব অনুষ্ঠানের। বছরে একদিনের জন্য হইলেও দেহের চাহিদাকে ও মনের চাহিদাকে অগ্রাহ্য করিয়া আন্তরিকভাবে আমরা যদি মনকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র রাখিবার ও একাগ্র করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদ—যত সামান্যই হউক—একটু পাওয়া যায়ই। এই জাতীয় স্মৃতি আমাদের মনে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যায়, একটু শুভ সংস্কার সৃষ্ট হয় বলা চলে। যাঁহারা এসব কখনো করেন নাই, তাঁহাদেরও জীবনে অন্য কোন বিষয়ে, যেখানে মন খুবই একাগ্র হইয়াছিল, একদিনের এমন কোন ঘটনায় নিশ্চয়ই কিছু খুঁজিয়া পাইবেন, যাহার স্মৃতি আজীবন উজ্জ্বল থাকে। যে কোনও রূপ বিষয়ভোগ-জনিত আনন্দই হউক, বা শিল্প-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-গবেষণাদি সম্ভূত বুদ্ধিজ আনন্দই হউক, বা আধ্যাত্মিক আনন্দই হউক—সব আনন্দের দুয়ার খুলিবার চাবিকাঠি হইল একাগ্রতা। একাগ্রতা যেখানে যত গভীর, আনন্দ সেখানে তত অধিক। আনন্দের গভীরতা ও মনের উপর তাহার প্রভাব—কতখানি সময় তাহার স্থিতি, তাহার উপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে একাগ্রতার নিবিড়তার উপর। আমাদের ভিতরেই এই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার রহিয়াছে, একাগ্রতা সর্ববিধ আনন্দলাভের ক্ষেত্রে তাহারই দ্বার কমবেশী উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আমরা ভুল বুঝি পদে পদে, নিজের অন্তরে নিহিত এই ভাণ্ডারটিকে দেখিতে পাই না বলিয়া ভাবি, উহা বাহিরে বিষয়ে আছে।

শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্বদিনে বহির্বিষয় হইতে আনন্দ আহরণে সাময়িকভাবে বিরত থাকিয়া সারাক্ষণ মনকে ঈশ্বরচিন্তায় একাগ্র করার প্রচেষ্টায় যখন বহির্বিষয়ের সংস্পর্শ ছাড়াও মন এই 'অকারণ আনন্দের' আস্বাদ পায়, তখন তাহার দৃষ্টি যায় অন্তরের এই আনন্দ-ভাণ্ডারটির, আনন্দের আসল অবস্থানটির দিকে—নিজের স্বরূপের দিকে, শিবেরই দিকে। এই সত্যদৃষ্টি ও আনন্দের আস্বাদলাভ কোন শুভ মুহূর্তে একবার হইলে তাহাই আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে টানিয়া তুলে এই চরম সত্যের উপলব্ধিতে—"চিদানন্দ-রূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

১

শ্রীশ্রীগুরুদেবশরণম্

(বেলুড়) মঠ
২২।৭।০৯

ভাই শশী,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। এখানকার সকলে ভাল আছে। ভক্তিমতী দেবমাতা দুই দিন এখানে এসেছিল। তার ভক্তি বিশ্বাস দেখে স্বামীজী যেমন বলেছিলেন যে তারা সিদ্ধা গোপী, ঠিক তাই—শ্রীশ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, তাঁর চুল, হাতের লেখা প্রভৃতি দেখে পরম আনন্দিত, দর দর নয়নাশ্রুপাত। কি ভক্তি হে, কে এসব শেখালে! এসব স্বামীজীর মহিমা, না তোমার? এখানে কি আছে তুমি তাহা নিখুঁত করে বলেছ। কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য! আজ এরা এখানে এসেছে। স্বামীজী থাকিলে কত যত্ন করিতেন, কত আনন্দিত হতেন! শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করে মহা আনন্দিত, যেন কতকালের পরিচিত! ঠিক তাই। তোমার ভক্তির কথা বলে শেষ করতে পারে না। তুমি ধন্য, ধন্য, ধন্য। আশীর্বাদ কর যেন তোমার মত একটু ভক্তি বিশ্বাস পাই। ইতি

দাস
বাবুরাম

২

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
১৩।৮।'০৯

ভাই শশী,

তোমার শরীর অসুস্থ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন কেমন আছ লিখিয়া জানাইবে। এখানকার সকলে ভাল আছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভাল আছেন। তুমি কতদিনে তাঁর দর্শনে আসিবে?...দেবমাতা শ্রীশ্রীমার খুব সেবা কচ্ছে। কি বিশ্বাস, কি ভক্তি, ভাই! দেখে সবাই আশ্চর্য। শুকুল কবিরাজী ঔষধ খাচ্ছে, খারাপ নাই। দেবমাতার ভারী ইচ্ছে তুমি একবার এখানে আইস। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে ও ভক্তদের জানাইবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

৩

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ

3rd September, 1909

শুক্রবার

ভাই শশী,

তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। তুমি কেমন আছ কৃপা করে জানাইলে আনন্দিত হইব। দেবমাতা কেমন আছে, তাহাকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানাইবে। তার কল্যাণ হউক প্রভুর কাছে এই প্রার্থনা করি। তাহার চিঠি পেয়েছি, তাহাকে কহিও অনুগ্রহ করে। তাহাকে বলিও শ্রীশ্রীমার ইচ্ছায় যা ভাল তাই হয়েছে, তাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। গত কয়েক দিন ভয়ঙ্কর বন্যা হয়ে আমাদের ঘাট সব ভেসে গেছে, উঠানে এক হাঁটু জল। গরুদের আমাদের ঘরে এনে রাখা হয়েছে। দুটো পুকুরে অনেক মাছ ছিল, সব ভেসে গেছে। শাক, সবজি সব মাটি। গাছ-পালা অনেক যাবে দেখছি। দৈবের উপর হাত নাই। শুকুলের জ্বর হয়ে কলিকাতায় গেছে। আর সব ভাল আছে। তুমি আমার প্রণাম জানিবে ও ব্রহ্মচারীদের ভালবাসা জানাইবে। তোমার আসিবার কি হ'ল? ইতি　　দাস

বাবুরাম

৪

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ

বুধবার

December 29, 1909

ভাই শশী,

মঙ্গলবার ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ৪॥ ঘটিকার সময় গোপালদাদা স্বধামে গমন করেছেন। সামান্য জ্বর হয়েছিল মাত্র, কেহ ঠাওরাইতে পারে নাই যে এত শীঘ্র উনি দেহরক্ষা করিবেন। শেষ-সময়ের মুখ-কান্তি অতি সুন্দর। শ্রীশ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য। সে সময়ে মতি ডাক্তার উপস্থিত ছিল। লেবু, দুধ খেলেন। মতিবাবুকে নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ। যখন এখানকার কেহ যাইবে তার মুখে শুনিও। তুমি আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানিবে। ইতি　　দাস

বাবুরাম

৫

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

মঠ
শুক্রবার
4-2-10

ভাই শশী,

তোমার প্রেরিত Path of Perfection পুস্তিকা পাইয়াছি। অতুলকে তোমার নিকট পাঠাইবার জন্য মহারাজকে লিখেছিলাম। কৈ, এখনও কি যায় নাই? 'সঙ্গী জুটে না জুটে, একাই কর মেলা, মন ক'রো না কাজে হেলা' (ও ভাই শশী, কাজে করো না হেলা)। আমারও এই দশা জানিবে। দাঁতের অসুখে কষ্ট পাচ্ছি তবু সবই কত্তে হচ্ছে। ভাল সঙ্গী মেলা দায়। গত ১০ই পৌষ গোপালদাদার উদ্দেশে বেশ এক মহোৎসব হয়ে গেছে। প্রায় ৪০০।৫০০ শত ভক্ত- ও গরীবনারায়ণ প্রসাদ পেয়েছে। গত মঙ্গলবার পূজ্যপাদ স্বামীজীর জন্মতিথিপূজাও মন্দ হয় নাই। কাঙ্গালী-ভোজন যেন নির্বিঘ্নে হয়ে যায়, এই প্রার্থনা। তারকদাদা এসেছেন। কালীকৃষ্ণ, অমূল্য ও গুরুদাস মঠে এসেছে। তুমি আমাদের ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Sevashram
Kankhal (Hardwar)
Dist. Shaharanpur
Date 9-4-10

ভাই শশী,

প্রায় ১০।১২ দিন হইল কাশীধাম হয়ে ২।৩ দিন এখানে এসেছি। হরি মহারাজের খুব অসুখ হয়েছিল, এখন অনেক সেরেছেন। হরি ভায়াকে নিয়ে মঠে যাইবার ইচ্ছা আছে। আমি মন্দ নাই, তুমি কেমন আছ। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী হরি ভায়ার কাছে একটি ছেলেকে পাঠাইয়াছেন; যদি তোমার দরকার হয় ঐ ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠান, তুমি লিখিও। তোমার শীঘ্র একবার বাঙ্গালোরে গমন বিশেষ আবশ্যক। তোমার শরীর ভাল হবে।···তুমি একবার শীঘ্র বাঙ্গালোরে যাইবে—ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ। আমি বোধ হয় একমাস কাল এখানে থাকিব। তুমি আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে এবং রুদ্র ও আর আর ভক্তদের জানাইবে। ইতি

দাস
বাবুরাম

পু:—ঐ ছেলেটি ব্রাহ্মণ ও Entrance পাশ। বয়স কম, স্বভাব ভাল। ইতি

দাস
বাবুরাম

মনের বাজে খরচ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মনের ষোলো আনা শক্তি ঈশ্বরলাভের জন্য খরচ করতে পারলে তবেই তাঁকে লাভ করা যায়। তিনি আমাদের ষোলো আনা মনই চান। গীতার পরম-তত্ত্ব তো অষ্টাদশ অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে। আমরা কৃতার্থ হই শুধু ভগবানের অনুগ্রহে। এই অনুগ্রহ অন্য-নিরপেক্ষ। তাঁর করুণা বিত্তের অপেক্ষা রাখে না, পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না, বংশমর্যাদারও অপেক্ষা রাখে না। সেই পরমানন্দঘনমূর্তি অনন্ত ভগবানকে ভজনা করতে হয় অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা। উপরে গীতার যে দুটি শ্লোকের কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি শুরু হয়েছে 'মন্মনা ভব' দিয়ে। দ্বিতীয় শ্লোকটির গোড়াতেই বলা হয়েছে: "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য।" ঈশ্বরের শরণাগতি এবং তাঁর করুণা তো নিঃসংশয়ে আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রায় আমাদের শেষ সম্বল। আমাদের অন্তরে কামনার এবং অহঙ্কারের অসুরটা খাড়া থাকতে দিব্য-জীবনযাপন অসম্ভব। কোন মানুষই জোর করে বলতে পারে না, সংসারসমুদ্রে আমার জীবনতরী চলবে আমারই ইচ্ছায়। ঈশ্বরের দরজায় পৌঁছানোর পথে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড দুর্লঙ্ঘ্য গুঁড়ি এবং ঠাকুরের ভাষায় এই গুঁড়িটা হচ্ছে অহঙ্কার। তাই ঠাকুর বিশ্বাস এবং শরণাগতির উপরে এতটা জোর দিয়েছেন। বারংবার বলেছেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো। বলেছেন, নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ।

কিন্তু 'মামেকং শরণং ব্রজ', শরণাগতি, ভগবদনুগ্রহ—এর সঙ্গে আর একটা সত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে: মন্মনা ভব। ভগবানের করুণার দরজা আমি ঢুকতে চাইলে খুলে যাবে ঠিকই, কিন্তু আমাকে সেই দরজায় আঘাত করতে হবে। খ্রীষ্টের কথায়, তুমি চাও, তবেই তো পাবে! ভগবানের অনুগ্রহ আমি পাবোই পাবো, কিন্তু সেই অনুগ্রহ চাইতে হবে আমাকেই। এইখানেই দৈব অনুগ্রহলাভের জন্য সাধনের সার্থকতার কথা এসে পড়ে। ভগবানের করুণা লাভ করতে হলে নিজেকে নিয়ত জাগ্রত এবং উদ্যত রাখার প্রয়োজন আছে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' পাতায় পাতায় যেমন শরণাগতির কথা আছে, তেমনি সাধনের কথাও আছে। নির্জনবাস এই সাধনের পক্ষে অনুকূল ব'লেই ঠাকুর বারংবার বলেছেন 'ঠাঁই-নাড়া' হ'য়ে বাস করতে। ঈশ্বরের রাস্তায় কেউ কারও হ'য়ে চলতে পারে না। কবি হুইট্‌ম্যানের ভাষায়:

Not I, not anyone else can
travel that road for you,
You must travel the road for
yourself.

আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকবো আর ঈশ্বর আপনা থেকে আমার কাছে এসে ধরা দেবেন, এমনটি হ'তেই পারে না। ঠাকুর পুরুষকারের উপরে, কর্মের উপরে তাই কতই না জোর দিয়েছেন!

এই সাধন-ভজনের কথা যখনই এসে পড়লো তখনই প্রশ্ন উঠলো,—সাধন-ভজন বলতে আমরা কি বুঝবো? ঠাকুর সাধনের জন্য বলতেন মনের বাজে খরচ বন্ধ করতে। ঠাকুর বলতেন, 'কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। কেন? কারণ সংসার করলে মনের বাজে খরচ হ'য়ে পড়ে।' মন নিয়েই তো সব। ঠাকুর বলতেন, 'মানুষ মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত।' ধর্মসাধনার সমস্ত নাট্যলীলাই তো মনেরই রঙ্গমঞ্চে এই মনের ক্রমাগত বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে। মন ছড়িয়ে আছে বিত্তে, খ্যাতিতে, ক্ষমতায়, আরও কত কিছুতে। এ সবই মনের বাজে খরচ। ইতস্তত: ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরের পাদপদ্মে জড়ো করতে না পারলে তো তাঁর কাছে কখনই পৌঁছানো যাবে না! গীতায় ভগবান বলছেন,—'মন্মনা ভব', অর্জুন, তোমার ষোলো আনা মন আমাকে দাও। তবেই আমাকে তুমি পাবে, মামেবৈষ্যসি, to me thou shalt come. এই মন্মনা শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী লিখেছেন, সর্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়। ভগবানের কাছে পৌঁছাতে হলে মনের বৃত্তি হওয়া দরকার তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন। চেতনার ক্ষেত্রে যে-চিন্তাপ্রবাহ বইতে থাকবে, তার মধ্যে এমন ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও থাকবে না যে-ছিদ্রপথে বিষয়-চিন্তা ঢুকতে পারে ভাবনায়। ভজন বলতে মধুসূদন সরস্বতী অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা ভজনার কথাই বলেছেন। মনের ষোলো আনা শক্তি যদি বিষয়চিন্তা করতে করতেই ফুরিয়ে যায়, সেই শক্তির সবখানি যদি চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর-চিন্তাকে সর্বক্ষণের জন্য অনির্বাণ দীপশিখার মতোই অম্লান দীপ্তিতে জ্বালিয়ে রাখতে ব্যয়িত না হয় তবে ম্যামনের (mammon) অনুগ্রহ লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নয়। তিনি আমাদের ষোলো আনা মনই চান, এক পাইও কম নয়। "Love thy Lord, thy God with all thy mind."—খ্রীষ্টের কথা।

শূন্যের প্রতি প্রকৃতির একটা বিতৃষ্ণা আছে, Nature abhors vacuum. কিন্তু ঈশ্বরের লোভ এই শূন্যতার প্রতি! আমাদের শূন্য হৃদয়ের দিকে তাঁর সদা জাগ্রত লুব্ধ দৃষ্টি। কবে আমরা বলতে পারবো, "দুঃখ-সুখের বিচিত্র এ জীবনে তুমি ছাড়া আর কেহ না রবে?" এই কথাটি শুনবার জন্য আমাদের হৃদয়ের দ্বারদেশে উৎকর্ণ হয়ে তিনি বসে আছেন যুগযুগান্ত ধ'রে। তিনি আমাদের শুধু ভালোবেসেই খুশী নন। আমাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যও তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই। ঠাকুর বলতেন, 'আমরা এক পা এগিয়ে গেলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।' এখানে আর একটা কথা যোগ ক'রে না দিলে সত্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কথাটা হচ্ছে: আমরা তাঁকে শুধু ভালোবাসবো না, ষোলো আনা হৃদয় দিয়ে, ষোলো আনা মন দিয়ে ভালোবাসবো তাঁকে। ঈশ্বর চান, ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবী করেন, আমরা কেবল তাঁকেই ভালোবাসবো, আমরা আমাদের দিবারাত্রির ভাবনায় শুধু তাঁকেই রেখে দেবো, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে কেবল তাঁরই আসনটিকে আমরা সযতনে পেতে রাখবো। God is a jealous God. আমাদের হৃদয়ে তাঁর সাম্রাজ্য হওয়া চাই অসপত্ন। বক্ষের দরজায় নিশিদিন অপেক্ষা ক'রে তিনি বসে আছেন কখন আমরা দরজা খুলে অন্তরের মধ্যে তাঁকে গ্রহণ করবো।

"তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছো জাগি।"
(গীতাঞ্জলি)

এ বিশ্বভুবনে তাঁর তো কোনো অভাব নেই। তিনি তো শুধু রাজা নন, রাজার রাজা। "কত মণি প'ড়ে আছে চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।" "চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে!" এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হ'য়েও মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তার বুকের দরজায় তিনি নিত্য জেগে আছেন! তাঁর জন্য অন্তরে তো কোনো জায়গা রাখিনি, ম্যামন হৃদয়ের সবখানি দখল ক'রে আছে, ধনে জনে মানে অনুক্ষণ জড়িয়ে আছি, কত রকমের আসক্তি হৃদয়কে কানায় কানায় পূর্ণ করে রেখেছে, জাগতিক সুখের কত কামনা মর্মের গভীরে গিজ্ গিজ্ করছে পায়রার গলায় মটরের মতো! "কত যে ভাঙা-চোরা ঘরেতে আছে পোরা, ফেলিয়া দিতে পারি না যে!" আর বসনাগুলোকে হৃদয়-মন্দির থেকে ফেলে দিতে পারছিনে ব'লেই ভগবান মন্দিরে ঢুকতে পারছেন না। হৃদয়কে একদম খালি ক'রে না ফেললে তিনি সেখানে ঢুকবেন কেমন ক'রে?

এই যে 'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে'—এই বাসনাগুলোকে মন থেকে অপসারিত ক'রে মনটাকে খালি করতে পারলেই, বাস্। কেল্লা ফতে! ভগবানের লুব্ধ দৃষ্টি তো আমাদের ঐ খালি মনটার উপরে! মনে বিষয়-চিন্তার লেশমাত্র যখন থেকে আর রইলো না, মনের বাজে খরচ একদম যেই বন্ধ হয়ে গেল তখন থেকেই তো এই জন্মেই দিব্যজীবনের মধ্যে আত্মার জন্মান্তরের পালা শুরু হোলো! কামনার আবর্জনারাশিতে মন্দির ভ'রে ছিলো বলে যে-ভগবান হৃদয়ের দরজায় বহু ধৈর্যে অপেক্ষা করছিলেন ভিতরে প্রবেশ করতে, আর তো তাঁর কুণ্ঠার কোনো কারণ থাকতে পারে না। ভক্তকে তিনি তো প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, 'মন্মনা ভব,—ষোল আনা মন আমাকে দাও, তা'হলেই আমাকে তুমি পাবে।' ভগবান সৎ। তিনি সত্যনারায়ণ। নারায়ণ কখনো সত্যভ্রষ্ট হ'তে পারেন? তাই মন থেকে সমস্ত বিষয়-চিন্তা স'রে গিয়ে সেই মন ঈশ্বর-চিন্তায় যখন কানায় কানায় ভ'রে গেলো তখন সে তো বৈকুণ্ঠে রূপান্তরিত হোলো। বৈকুণ্ঠে ঢুকতে ভগবান কুণ্ঠিত হবেন কেন? ভগবান হচ্ছেন সর্বাগ্রে ভক্তবৎসল ভগবান।

আহা, গীতার 'মন্মনা ভব' কথাটিরই তো প্রাঞ্জল ভাষ্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' পাতায় পাতায় কোহিনূরের মতোই জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মধুসূদন সরস্বতী ঐ 'মন্মনা' শব্দটির ভাষ্যপ্রসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার উপমা দিয়েছেন। উপমাটি খুবই লাগ-সই সন্দেহ নেই! কিন্তু 'কথামৃতের' উপমাগুলির বুঝি তুলনা নেই! সারাদিন শত কর্মের মধ্যেও অনুক্ষণ ভাবনায় ভগবানকে ধ'রে রাখতে হবে, ধর্মের এই পরম তত্ত্বটিকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করবার জন্য ঠাকুর ছবির পর ছবি তুলে ধরেছেন! আমাদের গ্রাম্যজীবনে দৈনন্দিন যে সকল ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে, সেই ঘটনাগুলিই ঠাকুরের উপমাগুলির মালমসলা। কষ্ট ক'রে তাঁকে কোনো কল্পনা করতে হোতো না। কোনো সত্য তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সত্যের প্রতিফলন তিনি দেখতে পেতেন বাহিরের প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে। অনাসক্তির আদর্শের কথা মনে হতেই

তিনি দেখতে পেতেন পাঁকালমাছের ছবি। বিবেক-বৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্যের প্রতীক দেখতেন আকাশের শকুনিতে।

স্মরণমননের আদর্শের তিনি প্রতিফলন দেখেছিলেন বড়লোকের বাড়ীর দাসীতে যার মন দিবানিশি পড়ে আছে তার গাঁয়ের কুটিরে। 'মন্মনা' কথাটির ব্যাখ্যায় গ্রামের সেই ছুতারনীর দৃষ্টান্তটিও প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। ছুতারনী ঢেঁকিতে চিঁড়া কুটছে, ছেলেকে মাই দিচ্ছে, খদ্দেরের সঙ্গে দর-কষাকষি করছে; কিন্তু মন তার পড়ে আছে ঢেঁকির ঐ মুসলের দিকে! হাতে পড়লে হাত ছেঁচে যাবে! গীতার পরমতত্ত্বের ব্যাখ্যা ঠাকুর যেমন উপমার পর উপমার সাহায্যে করেছেন, এমনটি কি আর কারও দ্বারা সম্ভব হয়েছে? স্বয়ং বাগ্‌বাদিনী পিছন থেকে বসে ঠেলে দিতেন বলেই হিন্দুদর্শনের গভীরতম সত্যগুলি এমন সহজবোধ্য সরলতম ভাষায় 'কথামৃতের' পাতায় পাতায় অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে!

আবার বলি, সাধনার প্রথম এবং শেষ কথা 'মন্মনা ভব।' ঈশ্বরলাভই যদি জীবনের চরম লক্ষ্য হয় তো সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর অপরিহার্য পথ হচ্ছে অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁর ভজনা। সাধন মানেই স্মৃতিসাধন, নিরন্তর ঈশ্বরের স্মরণমনন। এটা খুবই কঠিন। মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ—এ দুয়েরই অদ্ভুত মিশ্রণ। মানবপ্রকৃতিতে কিছুটা মাটি, কিছুটা নক্ষত্রখচিত আকাশ। তাই আমাদের মন শুধু যে ভূমার জন্য ক্ষুধিত, তা নয়। সেই মন মত্ত হস্তীর মতো দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেগুলি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী! মাঠাকরুণ বলতেন, 'মন না মত্ত হস্তী! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে!' অর্জুন বলেছিলেন, 'মনকে সংযত ক'রে রাখা বায়ুকে শাসনে রাখার মতোই দুঃসাধ্য।' অথচ সমস্ত মনটা ভগবানে না দিলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যাবে না! ভগবান অবশ্য অর্জুনকে অভয় দিয়ে বলেছেন, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা অবাধ্য মনকেও বশে আনা যায়।

তবেই দেখা যাচ্ছে ধর্মসাধনার সমস্তটাই মানুষের মনেরই ব্যাপার। অধ্যাত্ম-সাধনার সমস্ত নাট্যলীলার অভিনয় মনেরই মঞ্চে। চেতনার ক্ষেত্রে ঈশ্বরচিন্তার দীপশিখাকে অম্লান রাখার পুনঃপুনঃ প্রযত্নই অভ্যাস। কিন্তু কি কঠিন মনকে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরচিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা! বাইরে থেকে বিষয়-চিন্তার ঝাপটা পড়ছে মনের উপরে আর সেই ঝাপটায় ঈশ্বর-চিন্তার দীপশিখা নিভে যাচ্ছে। 'যত বার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।' কিন্তু খানদানী চাষী অনাবৃষ্টিতেও কখনো চাষ ছাড়ে না। সাধকও তেমনি নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সাধনায় অবিচলিত থাকবে। যেমন বাহিরের বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তেমনি অন্তরের বাধার বিরুদ্ধেও সংগ্রামে জয়ের একই মন্ত্র: No resting on one's oars. মন না মত্ত হস্তী! —মাঠাকরুণের সেই কথা। মনকে শাসনে আনা যদি সহজসাধ্য হোতো তবে উপনিষদে দিব্যজীবনে পৌঁছানোর পথকে ক্ষুরের ধারের মতোই শাণিত এবং দুর্গম বলার কোন হেতু ছিল না।

জোসেফিন ম্যাকলাউড

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারী শ্যামল

যাযাবর "Tantine"

৪ঠা জুলাই, ১৯০২। রামকৃষ্ণের নরেন প্রভুর কাজ শেষ করে নিজনিকেতনে চলে গেছেন। বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে অগণিত অনুরাগীর স্তম্ভিত বেদনার মধ্যে মহাসমাধিমগ্ন বিবেকানন্দের মরদেহের উপর প্রজ্বলিত হুতাশন জ্বলে উঠেছে। সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন নির্বাক ভগিনী নিবেদিতা। ভাবছিলেন জো-র জন্যে যদি স্বামীজীর শেষ স্মৃতি কিছু রাখা যেত। জো নেই, মাত্র দুমাস আগে চলে গিয়েছেন বিলাতে। চিন্তার মাঝখানেই লেলিহান অগ্নিশিখার মাঝখান থেকে উড়ে এল একটুকরো গৈরিক বস্ত্রাঞ্চল—জো-র জন্য শেষ আশীর্বাদ স্বামীজী দিয়ে গেলেন। নিবেদিতা পাঠিয়ে দিলেন জো-কে এই অমূল্য সম্পদ; লিখলেন, "তোমার জন্য স্বামীজীর শেষ বাণী।"[১৫]

"স্বামীজী চিরনির্বাণে সমাহিত হয়েছেন"—এ তার-সংবাদটি সেদিনই পেয়েছিলেন জো লণ্ডনে। মুহূর্তমধ্যেই সমস্ত আলো তাঁর কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল। নিজের সমস্ত শক্তি আর প্রেরণার উৎসস্বরূপ এই সূর্যটি যে এত তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে একথা জো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। বিলেত যাবার আগে জো-কে মঠের নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমি চল্লিশ পেরুচ্ছি না।" কিন্তু সে মর্মান্তিক সত্যকে বিশ্বাস করার কোন চিন্তাই সেদিন ওঠেনি জো-র মনে। কিন্তু এ সত্যের নির্ভুল পরিণতিতে যে আঁধার নেমে এল জো-র জীবনে তা থেকে আলোর সন্ধান পাবার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কেঁদেছিলেন জো। অবশেষে হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করে আলোর সন্ধান পেয়েছিলেন মেটারলিঙ্কের একটি ছোট কথায়, "তুমি যদি কখনও কারও দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকো তবে তা প্রমাণ করো অশ্রুবিসর্জন করে নয়, জীবনে রূপায়িত করে।"

আর অশ্রুবিসর্জন করেননি জো। করার সময়ও পাননি। স্বামীজীর ভালবাসাকে পরম-কৃতজ্ঞতাবোধে পরিশোধ করার জন্য নতুন করে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন জো, বিবেকানন্দের আরব্ধ বিশ্বজনীন কাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করে। নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির পর "Paris-dressed young lady"[১৬] (প্যারীর পোশাকে সজ্জিতা) জো-র রূপান্তর হয়েছিল স্বামীজীর "angel" (দেবদূত), "everlasting Joe" (চিরদিনের জো)-তে; বিবেকানন্দ প্রয়াণে নবতর রূপান্তর হল "Universal aunt" (সার্বজনীন পিসীমা) Tantine (টান্টিন)-এ, যে বহু পরিচিত নামে প্রায় এক অর্ধশতাব্দী ধরে জো বেঁচেছিলেন বিবেকানন্দানুরাগীদের মধ্যে বিবেকানন্দময় হয়ে। এ নামেই জো ঘুরে বেড়িয়েছিলেন দেশ থেকে দেশান্তরে গৃহহীন যাযাবরের মতো। তবে তফাতটা ছিল, এই যাযাবরের উদ্দেশ্য-হীনতার বদলে জো-র জীবনে এসেছিল

১৫ Late and Soon, p. 244

১৬ Late and Soon, p. 238

স্বামীজীর বিশ্বজনীন যুগাদর্শকে কার্যে পরিণত করার উন্মাদনা, যে উন্মাদনা জো-কে ধূমকেতুর মতো উড়িয়ে নিয়ে যেত স্থান থেকে স্থানান্তরে—আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা অথবা ভারতবর্ষ। "She rested best 'on wheels'."[১৭] অর্থাৎ "পথ চলাতেই তাঁর সবচেয়ে ভাল বিশ্রাম ছিল," একথা জো-র সম্বন্ধে বলেছিলেন বেটির কন্যা ফ্রান্স।

সাত বছরের বিবেকানন্দ সান্নিধ্যকে পরবর্তী সাতচল্লিশ বছর ধরে জো এ ভাবেই যাপন করেছিলেন। বাইরের দিক থেকে তাই তাঁকে আত্মীয়বর্গের কাছে এক অবাস্তব চরিত্র বলেই মনে হতো। Ridgely-র আত্মীয়স্বজন জো-কে "unreal" (অবাস্তব), "woman with a mission"[১৮] (মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত নারী), এমন কি অতিমানবিক ইত্যাদি আখ্যাও দিয়েছিলেন। অথচ অনুপ্রাণিত হলেও কখনও স্বপ্নবিলাসী হননি জো ; বরং ঠিক তার বিপরীতই ছিলেন —কঠোর বাস্তববাদী। গভীর ভাবপ্রবণতার সঙ্গে কঠোর বাস্তবানুগ কর্মশক্তির এই সমন্বয়ের জন্য জো-প্রমুখ পাশ্চাত্য অনুরাগীদের স্বামীজী "living Vedantin"[১৯] বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তাদের সম্বন্ধে স্বামীজী বলতেন, "তোমরা যখন কোনকিছু বিশ্বাস কর, সে বিষয়ে তোমরা কেবল স্বপ্নই দেখ না, তাকে কার্যে পরিণত কর। এটাই তোমাদের শক্তি

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে কোন জায়গায় স্বামীজীর কাজের জন্য বেরিয়ে পড়বার একটা অবিশ্বাস্য রকমের প্রস্তুতি ছিল জোসেফিনের। কাঁধে ঝোলানো একটি স্যাময় চামড়ার ব্যাগের মধ্যে সব সময়ই থাকত ১০০০ ডলারের সমান বিভিন্নদেশীয় মুদ্রা—টাকা, লায়ার, স্টার্লিং, ড্রাক্‌মা ইত্যাদি। এমন কোনো টুপি ছিল না যেটা মাথায় দিয়ে জাহাজে অথবা ট্রেনে ঘুমোননি। Leopard skin-এর কোটটি যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্রায় পরিধানের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। খাবারের মধ্যে দুধ ছিল তাঁর সব সময়ের খাদ্য, যা পথের ধারে যে কোন station থেকে জো কিনে নিতেন। সৈনিকের মতো এক ডাকে বেড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতিটাই ছিল বড় কথা। বহুদিন হয়তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই ; কোনো খবর না দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একদিন জো হাজির হতেন Ridgely-র চায়ের টেবিলে। একবার পৃথিবী-ভ্রমণ শেষ করে, Hamlet-এর কথার প্রতিধ্বনি করে জো প্রায়ই বলতেন, "The readiness is all."[২০] অর্থাৎ 'প্রস্তুত থাকাটাই বড় কথা'। 'চরৈবেতির' এই মন্ত্রই ছিল জো-র কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মূলকথা।

বাইরেই হোক, ঘরেই হোক, স্বামীজীই জুড়ে ছিলেন জো-র এই বিরাট যাযাবর জীবনকে। Ridgely-র যে ঘর পরবর্তী জীবনে জো ব্যবহার করতেন, সেখানে টাঙানো থাকতো স্বামীজীর বড় রঙীন ছবিটি যেটি মিসেস ব্লজেটের বাড়ীতে প্রথম দেখেছিলেন জো। স্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন-এভনে যে বাড়ীটি Legget পরিবার কিনেছিলেন জো-র প্রভাবে সেখানেও নতুন গৃহদেবতা হয়েছিলেন স্বামীজী। Alabaster-এর একটি বড় শ্বেতমূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন জো। আর যে ঘরে স্বামীজীর

১৭ Late and Soon, p. 240

১৮ Late and Soon, p. 238

১৯ Reminiscences, p. 249

২০ Late and Soon, p. 239

এই ধ্যানমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জো সে ঘরের নাম ছিল "Prophet's Chamber"[২১] অর্থাৎ "যুগাচার্যের ঘর।" এ ঘরটিতে জো সাজিয়ে রাখতেন গেরুয়া কাপড়ে বাঁধানো স্বামীজীর বিভিন্ন রচনাবলী।

গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠ

কিন্তু স্ট্রাট্ফোর্ড নয়, নিউইয়র্ক নয়, ক্যালিফোর্নিয়া অথবা প্যারিও নয়, এমন কি বহুস্মৃতিবিজড়িত রিজলীও নয়, গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠই হয়েছিল Tantine জোসেফিনের শান্তিময় বিশ্রাম এবং ঈশ্বরসান্নিধ্যের স্থান। ঘরছাড়া জে.-র ঘর বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা হ'ল গঙ্গাতীরের স্বামীজীর এই মঠটি। বহুদিন আগে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন জো, "স্বামীজী, কিভাবে আপনাকে সবচেয়ে ভালভাবে সেবা করতে পারি?" চকিতে উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজী, "ভারতবর্ষকে ভালবাস।" কিন্তু সেদিনকার পরাধীন অনুন্নত ভারতকে সেবা করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার সে সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে স্বামীজী ভারতে আসার ব্যাপারে জো-কে লিখেছিলেন, "হ্যাঁ, আসতে পার, যদি দেখতে চাও আবর্জনাস্তূপ, অবনতি, দারিদ্র্য, আর কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসীর মুখে ধর্মের বাণী। যদি অন্য কিছু চাও তবে এসো না। আমরা আর একটিও সমালোচনা সহ্য করতে রাজী নই।"

বিনা দ্বিধায় প্রথম জাহাজেই জো ভারতে এসে হাজির হয়েছিলেন স্বামী সারদানন্দজী এবং ধীরামাতা মিসেস্ ওলিবুলকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে। আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজী অতিথিদ্বয়কে এবং অল্প কয়েকদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা, জো এবং ধীরামাতাকে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারত-দর্শনে। এ ভ্রমণের অবিস্মরণীয় স্মৃতি ভগিনী নিবেদিতা লিখে রেখেছেন তাঁর 'Notes on Wanderings' গ্রন্থে। ভারতকে যদি সেবা করতে হয় তবে তার রীতিনীতি, জীবনধারণ সব কিছুকে স্বীকার করে নিয়ে সেবিকার মতো সেবা করতে হবে, কিছুই ভাঙ্গা চলবে না—এই ছিল পাশ্চাত্য অনুরাগীদের প্রতি স্বামীজীর কঠোর আদেশ। তাই কাশ্মীরে যেদিন জো স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গার কপালে বৈষ্ণব-তিলক দেখে অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ দৃপ্তভাষায় তিরস্কার করে স্বামীজী বলেছিলেন, "চুপ কর। তুমি আমার জন্যে এমন কি করেছ?" তিরস্কারের প্রচণ্ডতায় জো সেদিন কেঁদে ফেলেছিলেন। পরে আলাসিঙ্গার অতুলনীয় গুরুভক্তির পরিচয় পেয়ে জো বুঝেছিলেন কেন স্বামীজী তাঁর প্রিয় শিষ্যের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাতেও এত গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

ভারতে এসে আর একবার স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলেন জো। এবার দৃশ্যপট পরিবর্তিত—রিজ্লী নয়, গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠ; স্বামীজীর শত আশা- ও স্বপ্ন-বিজড়িত জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। মঠের পাশে একটি পুরানো বাড়ী নতুন করে সারিয়ে নিলেন জো এবং ধীরামাতা। এ বাড়ীটিই পরবর্তীকালে মঠের লেগেট হাউস্ নামে সুপরিচিত। সম্মুখে প্রবহমাণ ভাগীরথী, সকাল-সন্ধ্যায় স্বামীজীর দিব্যসান্নিধ্য, মন্দিরে পূজা, আরতি, ধ্যান, গভীর দার্শনিক চিন্তা, আর অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বজুড়ে স্বামীজী-প্রবর্তিত নূতন যুগধর্মপ্রচারের স্বপ্ন—এ সবের মাঝখানে

২১ Late and Soon, p. 241

এক নূতন জীবনের আস্বাদ পেলেন জো। মঠের সন্ন্যাসীরা হয়ে উঠলেন আপন জন, স্বামীজীর মঠটি হয়ে উঠল যাযাবর জো-র জীবনের সবচেয়ে স্থায়ী ঠিকানা যা স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর থেকে জো-র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপারবর্তিত ছিল।

বিবেকানন্দ-সান্নিধ্যে যে বেলুড় মঠ হয়ে উঠেছিল দিব্য আনন্দের বাসস্থল, তাঁর তিরোধানে তাই হয়ে উঠেছিল Tantine-এর ধ্যানক্ষেত্র। গেস্ট হাউসের দোতলায় প্রায় প্রতি শীতে এসে হাজির হতেন বৃদ্ধা তাঁর পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে। মঠবাসের দিনগুলো হয়ে উঠত কথায়, কাজে, চিন্তায়, ধ্যানে আর স্মৃতিচারণে বিবেকানন্দময়। বিশ্বাসের প্রচণ্ডতায় আর প্রেমের গভীরতায় স্বামীজীকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতেন জো। সেদিনকার স্বল্পপরিসর মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে জো ছিলেন স্বামীজীর দূত। জো-র সান্নিধ্যে এসে স্বামীজীর শক্তির এক জীবন্ত প্রকাশকেই অনুভব করতেন সকলে; সরলতা, সপ্রেম ব্যবহার, তেজস্বিতা এবং কিছুটা রাজকীয় ধরনের চালচলন নিয়ে বৃদ্ধা Tantine স্বামীজীর স্মৃতিকথায় মশগুল করে রাখতেন নবীন অনুরাগীদের; কখনও বা কোন নবীন সন্ন্যাসী যখন জো-কে অনুরোধ জানিয়েছেন স্বামীজীর কথা বলবার জন্য, অনুভূতির তীব্রতাকে গোপন করে উত্তর দিতেন বৃদ্ধা, "তোমরা কি বুঝবে স্বামীজীকে? তোমরা তো এখনও পরাধীন জাতি, স্বামীজীকে আমরাই বুঝেছি।"

মঠের পরিবেশে জো-র জীবনধারণও ছিল কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। স্বামীজীর সময়কার ভাবেই থাকতে চাইতেন জো। পাশ্চাত্যবাসীরা এসে যাতে থাকতে পারেন, এ উদ্দেশ্যে মঠের গেস্ট হাউসটি নিজের অর্থানুকূল্যে তৈরি করিয়েছিলেন জো। নবনির্মিত এই গৃহে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা হবে, জো কিন্তু কিছুতেই রাজী নন। স্বামীজী কি মঠে বৈদ্যুতিক আলো দেখে গিয়েছিলেন? নিজের প্রয়োজন না হলেও অপরের প্রয়োজন হতে পারে—এ কথা বুঝিয়ে দিতেই বৃদ্ধা আবার রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু শর্ত হয়ে রইল তাঁর নিজের ঘরে কখনও বৈদ্যুতিক আলো জ্বলবে না, জ্বলবে তেলের প্রদীপ। তাই ব্যবস্থা হল। কিন্তু এক উৎসবের দিনে জনৈক ব্রহ্মচারী গিয়েছেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে Tantine-এর খোঁজে। আবছা অন্ধকারে ঘরে কাউকে না দেখে জ্বালিয়ে ফেলেছেন বৈদ্যুতিক আলো, সঙ্গে সঙ্গে তুমুলকাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন জো এই অমার্জনীয় অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ করে।[২২]

নীরব কর্মী

সেদিনকার ক্রমবিস্তারশীল রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যে গৌরব বোধ করতেন বৃদ্ধা ট্যান্টিন। স্বামীজীর আরব্ধ সেবাব্রতের আদর্শে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গড়ে উঠেছে অনেক মঠ, মিশন, বহু শিক্ষাকেন্দ্র, সেবাসঙ্ঘ স্বামীজীরই অনুপ্রাণিত ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধা পরিষ্কার দেখতেন স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত গড়ে উঠছে, বেলুড় মঠে থেকে একটি চিঠিতে এ আনন্দের অভিব্যক্তি করে লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হচ্ছে—এটি দেখা এবং এ কাজে মুক্তভাবে সাহায্য করা—এই হল আমার কাজ। আর এ কাজ আমার কতখানিই না প্রিয়! সংসার-অরণ্যের মাঝখান থেকে এই অগ্নিময় অনুপ্রাণিত সেবকদল কেমন করে নতুন মুক্তির পথ

২২ জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসি-কথিত

তৈরি করছে…।"[২৩] মঠের ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে বৃদ্ধা জো নবযুগের পথপ্রদর্শকদেরই দেখতে পেতেন। আর তাঁদের পশ্চাতে থেকে নীরবে সর্বপ্রকার সাহায্য করাই ছিল জো-র পক্ষে স্বামীজীর সেবার সমতুল। মিশনের দল-মত-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সেবাব্রতের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতিতেই জো কেবল অনুপ্রেরণাই দেননি, অনেক সময় প্রথম আর্থিক সাহায্য এবং দেশী-বিদেশীকে সংঘের তথা ভারতের দিকে শ্রদ্ধান্বিত করে বিভিন্ন সময়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। জো-র প্রদত্ত ৮০০ ডলার দিয়েই স্বামীজী শুরু করতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণসংঘের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'। আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচারের জন্য তাঁর জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং দেববাণী (Inspired Talks)-কে একত্র করে তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন জো স্বীয় অর্থানুকূল্যে এবং একনিষ্ঠ আগ্রহে।[২৪] একবার মঠের জমির ওপর দিয়ে রেললাইন বসানোর ব্যবস্থা করেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। এ অভাবনীয় ব্যবস্থায় সেদিনকার মঠের যে বিপন্ন অবস্থার উদ্ভব হয়, তার থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন বৃদ্ধা ট্যান্টিন্। বিলাতের লেডী স্যাণ্ডউইচ (ইনিই পূর্বে বেটি ম্যাক্‌লাউডের কন্যা, স্বামীজীর প্রিয় আলবার্টা নামে পরিচিতা ছিলেন)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিলাতের সরকারের মারফত এ ব্যবস্থা বর্জন করান জো।

মনীষী রোঁমা রোঁলার প্রতি ভারতবাসীমাত্রেই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের দুটি অমর জীবনীগ্রন্থ রচনা করে পাশ্চাত্যের সুধীজনকে শ্রদ্ধান্বিত করেছিলেন ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতার প্রতি। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে এই সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে রোঁমা রোঁলাকে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নীরব ভারতপ্রেমিক 'জো'।[২৫] আরও কতভাবে যে এই মহানুভবা বিদেশিনী স্বামীজীর সংঘ তথা ভারতবর্ষের জন্য সাহায্য করেছেন তার বহু তথ্য আজও পাওয়া যাবে সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের কাছে। আজও তাঁরা জো-র কথা বলতে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত না হয়ে থাকতে পারেন না।

'চিরকালের জো'

বিবেকানন্দগতপ্রাণা বিদেশিনী এই বৃদ্ধার শেষ জীবনের বৈরাগ্যোজ্জ্বল, আনন্দময় মুহূর্তগুলি কেটেছে মঠের তাঁর প্রিয় গেস্ট হাউসটিতে, গঙ্গার ধারে স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের অদূরে এই গেস্টহাউসের দোতলায় বসে জো লিখেছিলেন, "গেস্ট হাউসের ওপরের দুটো ঘর নিয়ে আমি অনেকখানি ফাঁকা জায়গা আর প্রাচুর্যের মধ্যে আছি। এমন প্রাচুর্যের স্বপ্নও আমি কোনদিন দেখিনি। অনাড়ম্বরের প্রাচুর্য—কোন আসবাবপত্রের যত্ন নিতে হয় না—শুধু একটি চায়ের সেট্। রকমারি জিনিসপত্রের বোঝা আর নেই। এটা করতে হবে, ওটা দেখতে হবে—এ সব ভাবনা হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে। তবুও আমি কখনও নিঃসঙ্গ বোধ করি না…স্বর্গের পবিত্র আনন্দের জন্য মানুষকে এ দেহ ত্যাগ করতে হয় না।"[২৬]

নিউইয়র্কের প্রথম দর্শনের দিনটির পর থেকে যে নবজীবনে পদার্পণ করেছিলেন

---

২৩ Remininscences, p. 251
২৪ Vedanta and the West, p. 29 (Jan. Feb. 1950)
২৫ Vadanta and the West, Jan-Feb., 1950. P. 29.
২৬ Reminiscences, P. 251

জোসেফিন, তারই শেষ পরিণতি এই বৈরাগ্যোজ্জ্বল ধ্যানময় নিঃসঙ্গ ঈশ্বরসান্নিধ্যের আর পবিত্র আনন্দের দিনগুলিতে। স্বামীজীই তাঁর কাছে সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। আর স্বামীজীর চিন্তাতেই তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে। এই একাত্মবোধের রূপটি বড় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে মহাপ্রয়াণের মাত্র দিন কুড়ি আগে (১৪ই জুন, ১৯০২) জো-কে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠিতে। সম্ভবতঃ এইটিই স্বামীজীর কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠি। স্বামীজী লিখছেন, "আমাদের জীবনে এত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে আমরা এখন আর ওর বুদ্বুদ-গুলিতে আকৃষ্ট হই না, তাই নয় কি জো? ...মা তার পথ করে নেবেন। তবে তোমাকে ও আমাকে একযোগে তিনি এই সংসার-সমুদ্রে ফেলে দিয়েছেন এবং একসঙ্গেই আমাদিগকে ভেসে চলতে হবে বা ডুবে মরতে হবে। আর নিশ্চিত জেনো—এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

স্বামীজীর কথাই সত্যি হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে এই একাত্মবোধটি আরও গভীরতর ভাবেই জো-র জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল, সমাজের দেশের আত্মীয়স্বজনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোন আকর্ষণই জো-কে স্বামীজীর ধ্যান আর তাঁর আরব্ধ কাজ থেকে টেনে নিতে পারেনি। বরং আরও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলেন জো এই সত্যদ্রষ্টার আদর্শকে। জো-র নিকটতম আত্মীয়া বেটির কন্যা ফ্রান্স তাই বিস্ময়ে লিখেছিলেন, জো সম্পূর্ণভাবে 'স্বামীজীময়' হয়ে গিয়েছিলেন।"[২৭]

এই একাত্মবোধটি অটুট ছিল বৃদ্ধার জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। "হাসপাতালে যারা দায়-সারা দিনে দুঘণ্টা কাজ করে চলে যান" তাদের মাঝখানে মরবার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন জো; চেয়েছিলেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভক্তসান্নিধ্যে থাকতে, জো-র এ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। দেহরক্ষার মাস ছয়েক আগে ১৯৪৯ সালের বসন্তে একানব্বই বছরের বৃদ্ধা একদিন তাঁর নিউইয়র্কের বাড়ী চিরদিনের মত ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের আশ্রমে; বলেছিলেন, "I have come home to die."[২৮] অর্থাৎ "আমি মরবার জন্য নিজের বাড়ী এসেছি," বৃদ্ধার শেষ দিনগুলো কেটেছিল হলিউডের স্বামীজীর ব্যবহৃত এবং বহুপূতস্মৃতিবিজড়িত বাড়ীটিতে যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে ১৮৯৯ সালে জো-র অনুরোধেই স্বামীজী প্রথম এসেছিলেন বেদান্ত-প্রচারের জন্য। বিবেকানন্দস্মৃতিবিজড়িত, তীর্থস্বরূপ এই বাড়ীটিতে ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর একানব্বই বছরের স্বামীজীগতপ্রাণা মহানুভবা নারী যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেদিন তাঁর পাশে ছিলেন হলিউড আশ্রমের বিবেকানন্দ-প্রেমিক সন্ন্যাসী ও ও ভক্তবৃন্দ।

রামকৃষ্ণের নরেন, সপ্তর্ষির ঋষি বিবেকানন্দ, আর পবিত্রস্বভাবা মহানুভবা জো—এ দুই মহাপ্রাণের সংযোগ বিবেকানন্দ-জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। জো-র স্বামীজী ছিলেন মুক্তিদাতা[২৯] যুগপুরুষ; আর স্বামীজীর জো ছিলেন "মঙ্গলময় দেবদূত," "সাদাসিদে ও স্নেহময়ী জো, আমাদের চিরকালের আপনার জো"।[৩০]

২৭ Late and Soon P. 238

২৮ Vedanta and the West, Jan-Feb. 1950, P. 30

২৯ স্বামীজীর পত্র, ১৪ই জুন, ১৯০২

৩০ „ ১৫ই মে, ১৯০২

দুই আর এক

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের কথা ঠিক বলা হচ্ছে না এখানে; সেজন্য 'দুই আর এক' নাম দেওয়ার প্রয়োজন হল। সাধারণ মানুষদের তো বটেই, এমন কি ডাকসাইটে পণ্ডিতদেরও, দুই আর এক নিয়ে কলহ চলে আসছে আবহমান কাল। যেখানে দুই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তাও যে মূলতঃ এক, তা একটু ভেবে দেখলেই অনুধাবন করা যায়। তাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় অবাঞ্ছিত বিসংবাদও দূর করে দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা এমনই আংশিক দৃষ্টিতে বিশ্বাসী ও মুগ্ধ যে, সহজ বিষয়ে অনাবশ্যক জটিলতার আমদানী করি। কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত নিলে বক্তব্য পরিষ্কার হবে মনে হয়।

গরম ও ঠাণ্ডা দুটি স্বতন্ত্র নাম। সাধারণভাবে এরা পরস্পর বিপরীতার্থক। একই সময়ে যেটা গরম সেটা ঠাণ্ডা নয় বা যেটা ঠাণ্ডা সেটা গরম নয়। সুতরাং তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু বাস্তবিকই কি তারা তাই? তারা কি সত্যিই দুটি আলাদা জাত? বেশি ভাবতে হয় না; সহজেই ধরা পড়ে যে, তাপমাত্রার পার্থক্যকেই আমরা ঠাণ্ডা-গরম বলছি। কখনো কখনো এই মাত্রার এত পার্থক্য হতে পারে যে, শ্রেণীগত পার্থক্য বলেই অনুভূত হবে। যেমন, জল বরফ ও জলীয় বাষ্প। দেখতে, শুনতে ও ফলাফলে এদের প্রভাব জীবজগতে নিঃসন্দেহে আলাদা। কিন্তু এও আমরা সবাই জানি (খুব বেশি বিজ্ঞানের জ্ঞানের দরকার হয় না) যে, একই বস্তু তাপমাত্রার পার্থক্যে কখনো জল, কখনো বরফ, কখনো বা জলীয় বাষ্প হচ্ছে (এখন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররাও freezing p int ও boiling point কত তাপমাত্রায় তা জানে)। সুতরাং জল ও বরফ আসলে দুই নয়, এক। অনুরূপভাবে বরফ ও জলীয় বাষ্প দুই নয়, এক। দুই হয়েও দুই নয়. বহু হয়েও বহু নয়; মূলে এক। নিশ্চয়ই একথা স্বীকার্য—"The difference of d g e may be so great as it may appear to be almost a difference in kind." কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য যখন 'মত্বা কর্মাণি সীব্যন্তি' অর্থাৎ পরিণাম বিচার করে যে কাজ করতে পারে সেই মানুষ, তখন তাকে appearance'ও জানতে হবে, reality'ও জানতে হবে। অর্থাৎ জল, বরফ ও জলীয় বাষ্প আলাদা কেন তাও জানতে হবে, তেমনই জানতে হবে যে, মূলতঃ তারা এক। তাহলেই পুরো জানা হল; নতুবা অর্ধদৃষ্টি, অর্ধসত্য ও তার বিড়ম্বনা অনিবার্যভাবে দেখা দেবে।

আর একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই দুই নিয়ে দ্বন্দ্ব কতকাল ধরে যে চলে আসছে, তার হিসেব নেই। এখনো চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। কারণ মানুষের প্রবণতা দ্বন্দ্বের দিকে। Pair of opposites সে অনেক সময় ইচ্ছে করেই তার মনে রাখে, কারণ তাতে তার সহজাত জিগীষা ও জিঘাংসা অনেকাংশে চরিতার্থ হয়। অদৃষ্ট (বা দৈব) ও পুরুষকার নিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প আছে ভারত ও ভারতের বাইরে। এখনো হামেশাই রচিত হচ্ছে।

সেই সব গল্পের মূল সুর কিন্তু একই—এরা দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু তাই কি? 'অদৃষ্ট' কথাটি তো খুব সার্থক বলেই মনে হয়। আক্ষরিক অর্থে 'ন দৃষ্ট' অর্থাৎ যা আগে থাকতে দেখা যায়নি। এমন তো কাজ অহরহই হচ্ছে, যার ফল ফলতে দেরী হয় এবং ফল যখন ফলে তখন ধরা যায় না যে, ঐ পূর্বতন কর্মের জন্যই ফলটি ফলেছে। জন্মান্তরের কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ সবাই ওতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এক জীবনের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটে যা অদৃষ্ট বলে প্রতিভাত হয়। কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে না পেলেই তা অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি (এরকম উদাহরণ Neurologist, Psychiatristদের কাছে অজস্র জমা পড়ছে নিত্য)। একটি লোক খুব নিয়ম-মাফিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, ভাল উপায় করেন, নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী, বছর পঞ্চান্ন বয়েস। হঠাৎ কিছুর মধ্যে কিছু নেই—তার পা দুটো ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে যেতে থাকল, ক্রমে আরো উঁচুতে কোমর পর্যন্ত, শেষে হাতও ধরল। বহু চিকিৎসায়ও কিছু ফল হচ্ছে না। রোগী শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন—অদৃষ্টের হাতে সঁপে দিয়েছেন নিজেকে এবং মৃত্যুর জন্য দিন গুণছেন। ভাবছেন (যদি সনাতনী হিন্দু হন), পূর্বজন্মের কোন কর্মদোষেই তার এই অদৃষ্ট। এখন মনে করা যাক, কোনো ভাল Neurologist তাকে দেখছেন। হাসপাতালে ভরতি করিয়ে myelography (মায়েলোগ্রাফি) করালেন এবং তাতে ধরা পড়ল যে, তার spinal column-এ meningial fluid-এ obstruction হচ্ছে বলেই এই পক্ষাঘাত। মেরুদণ্ডের হাড়ের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ বহুকাল আগে ভেঙে গিয়েছিল এবং তাই কালক্রমে (ভগ্ন অংশটি সামান্য মোটা হয়ে যাওয়াতে) স্নায়ুমণ্ডলীর কাজকে ব্যাহত করাতে এই দুরবস্থা। রোগীকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি কোনো দিন উঁচু থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিনা। রোগী প্রথমতঃ সরাসরি বলে বসলেন, 'না'। ডাক্তার তাকে সময় দিলেন চিন্তা করতে। দিন-দুয়েক বাদে রোগী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ডাক্তারকে বললেন, তার বছর-দশেক বয়সের সময় তিনি বেশ উঁচু একটা পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তখন পিঠে খুব জোর চোট পেয়েছিলেন; কিন্তু মালিশ-টালিশ করাতে কয়েকদিন বাদেই ব্যথা কমে যায়। আর কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি কখনো। তাই একদম ভুলেই গিয়েছিলেন; এখন অনেক চিন্তার পর স্মরণে আনতে পেরেছেন। কিন্তু তার সঙ্গে এই পক্ষাঘাতের কি সম্পর্ক? ডাক্তারের উত্তর হল, সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গী। তিনি এখন সঠিক কারণ খুঁজে পেয়েছেন এবং একটা ছোট অপারেশন করলে রোগী সম্পূর্ণ সেরে যাবেন। হলও তাই। তখন ডাক্তার রোগীকে সব খুলে বললেন কি হয়েছিল তার। এখন যিনি পুরোপুরি অদৃষ্টবাদী, তিনি বলবেন পড়ে যাওয়াটাও অদৃষ্ট। আর যিনি পুরুষকারে বিশ্বাসী, তিনি বলবেন পেয়ারার লোভে বাচ্চা ছেলে গাছে উঠেছিল—পা ফস্‌কে পড়ে যায় নীচে; বহুকাল বাদে তার পরিণাম হয় পক্ষাঘাত। এভাবে দেখলে চিরকালই অদৃষ্ট ও পুরুষকার আলাদা বলে মনে হবে; তারা স্বরূপতঃ ভিন্ন বলে মনে হবে। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। মানুষের জীবনে কর্ম আছে, তার ফলও আছে। কোন ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়; কোন

ফল পেতে দেরী হয়; এমন দেরীও হতে পারে যাতে কর্মটির সঙ্গে ফলটি যুক্ত করা সাধারণ বুদ্ধিতে কুলিয়ে ওঠে না—তখনই অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া হয়। উপরের দৃষ্টান্ত তারই একটি নমুনামাত্র। আসলে একই বিষয়ের এপিঠ আর ওপিঠ হচ্ছে অদৃষ্ট ও পুরুষকার। পূর্বতন পুরুষকারের না-বুঝতে-পারা ফলকেই অদৃষ্ট বলতে পারি। সামগ্রিক বিচারে পুরুষকারেরই অদৃষ্ট, আবার অদৃষ্টেরই পুরুষকার। যেমন, পেয়ারা গাছে চড়ারূপ পুরুষকারের অদৃষ্ট হল পক্ষাঘাত; আর পক্ষাঘাতরূপ অদৃষ্টের পুরুষকার হল উপযুক্ত চিকিৎসা। কারণ, কার্য, ফল একসূত্রে গাঁথা।

আরও একটি দীর্ঘস্থায়ী দ্বৈতের দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। শিল্পকর্মের আঙ্গিক (art form) বড়, না বিষয়বস্তু (art content) বড়—এই নিয়ে বিদগ্ধ বিতণ্ডা সাহিত্যিক ও দার্শনিক আলোচনায় বহুকাল ধরে চলে আসছে। কেউ বলেছেন, আঙ্গিকই বড়, বিষয়বস্তু গৌণ; কেউ-বা ঠিক উল্টোটা বলেছেন অর্থাৎ বিষয়বস্তুই বড়, আঙ্গিক গৌণ। চরমপন্থীরা আরো এককাঠি ওপরে গিয়ে বলেছেন, আঙ্গিকই সব অথবা বিষয়বস্তুই সব। এই দ্বন্দ্বের আজও নিবৃত্তি হয়নি। যতদিন বিশ্লেষক-সমালোচকের এই দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ততদিন এ দ্বন্দ্ব থাকবেই। কিন্তু সার্থক শিল্পকর্মমাত্রই আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর এক বিস্ময়কর সমন্বয়, একথা নিরপেক্ষ বিচারে মানতেই হবে। উপযুক্ত বিষয়বস্তুবিহীন সুন্দর আঙ্গিক কি সত্যিই সম্ভব? সম্ভব হলেও তার মূল্য মাকাল ফলের বেশি নয়। উপযুক্ত আঙ্গিক ছাড়া কি সুন্দর বিষয়বস্তু ঠিক ঠিক প্রকাশিত হয় শিল্পকর্মে? প্রকাশিত হলেও তা' সার্থক শিল্পকর্ম হয় না; হয়ে ওঠে টেলিফোন গাইড বা দৈনিক সংবাদপত্র বা বড়জোর পরীক্ষার খাতার প্রবন্ধ। Art বা শিল্পকর্মের form বা আঙ্গিকও যেমন দরকার, content বা বিষয়বস্তুও তেমনই দরকার। এই দুইয়ে মিলিয়ে শিল্পকর্ম, কোনোটাকে বাদ দিয়ে নয়। কে বড়, কে ছোট; কে মুখ্য, কে গৌণ—এ প্রশ্ন অবান্তর। আর এই অবান্তরকে নিয়েই আমাদের যত ঝগড়া।

আলো ও অন্ধকার, দিন ও রাত্রি, ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়—এরূপ বহু pair of opposites নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা চলে। আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে আমরা এদেরকে দুই বিপরীত মেরুতে স্থাপিত করে আলোচনা করি এবং তা' যথেষ্ট স্বাভাবিকও। ব্যবহারিক দিক থেকে এর প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর কোন জোড়াই দুটি স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে গঠিত নয়। একটি মুদ্রার যেমন দুটি পার্শ্ব; কিন্তু মুদ্রা একটিই। অনুরূপভাবে, অন্ধকারের কোলে আলো শোভা পায় আর আলোর বৈপরীত্যে অন্ধকার ঘনায়মান হয়। এখানে একেরই দুই, আবার দুইয়ে মিলিয়ে এক। দ্বৈত যেমন সত্য, অদ্বৈতও তেমনই সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণ, অখণ্ড, অপ্রতিরোধ্য দৃষ্টিতে বুঝি তাই দেখেছিলেন, "যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা, যাঁর লীলা তাঁরই নিত্য।" কখনো মনে হবে গাছেরই বীজ, কখনো বা মনে হবে বীজেরই গাছ। আবার পূর্ণকে যখন উপলব্ধি করা যায় তখন দেখা যায় গাছও যে, বীজও সে। জীবন ও মরণকে উপনিষদের ঋষি এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই দেখেছেন—দুটি আলাদা কিছু ব্যাপার নয়, যাঁর ছায়া জীবন, তাঁরই রকমফের ছায়া হচ্ছে মরণ।

এই দৃষ্টিতে একই (অদ্বৈত) সত্য, দুই বা বহু (দ্বৈত) তার ছায়ামাত্র।

আর একটি দ্বৈত সংক্ষেপে আলোচনা করে এই ক্ষুদ্র রচনা সমাপ্ত করব। পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদ (Idealism) ও বস্তুবাদ (Materialism) এর দ্বন্দ্ব বহুকাল ধরে চলে আসছে। আমাদের দেশেও ছিল এবং আছে। হাল আমলে বহু দেশে বস্তুবাদেরই প্রাবল্য। ভাববাদ-বস্তুবাদে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নিষেধ। কিন্তু কতটা যুক্তিসহ এই দৃষ্টিভঙ্গী তা' বিচার করে দেখা প্রয়োজন। ভাববাদের মূলকথা হল, মনই সব ; তার অবর্তমানে বস্তুজগতের কোন সত্তাই নেই। মন-নিরপেক্ষ কোন বস্তুই নেই ; মন আছে বলেই বস্তু আছে, জীবজগৎ আছে। মনের লয়ে ওদেরও লয়। আর বস্তুবাদের মূলকথা হল বস্তুই সব, মন বলে আলাদা কিছু নেই-ই মোটে। যাকে মন বলা হয় তা' তো মস্তিষ্ক নামক বস্তুপিণ্ডের ক্রিয়া। একদল বলছেন, মনই সব, বস্তু নেই। আর একদল বলছেন, বস্তুই সব, মন নেই। দুই দর্শনের চরম রূপ হল এই। সমন্বয়ের চেষ্টা যে কখনো হয়নি তা' নয় ; তবে বিরোধকে জীইয়ে রাখার চেষ্টাই হয়েছে বেশি। ফল হয়েছে মারাত্মক —সহিষ্ণুতা গিয়েছে কমে, বিবাদ গিয়েছে বেড়ে। সংকীর্ণতা এত দৃঢ়নিবদ্ধ হয়েছে মানবমস্তিষ্কে ও হৃদয়ে যে, দুই দুই-ই থেকে যাচ্ছে ; বস্তুতঃ দুই যে একেরই দুইদিক মাত্র তা' একবারও মনে উদিত হচ্ছে না। গীতাতে মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হয়েছে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যে ইন্দ্রিয় সংহত করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে তারই নাম মন। এও বস্তু, তবে এত সূক্ষ্ম যে, অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেই তার অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাই প্রমাণের মাপকাঠি হলে তো পরমাণু, নিউট্রন, পজিট্রন, ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নেই ; অস্তিত্ব নেই নভোমণ্ডলের বহু নক্ষত্রমণ্ডলীর ; অস্তিত্ব নেই পৃথিবীর বহু ভৌগোলিক বিবর্তনের, এমনকি আমাদের বহু পূর্বপুরুষদেরও। সুতরাং সুস্থ মানসিকতা বলবে মন আর বস্তুকে স্বতন্ত্র দুটি শ্রেণীতে না ফেলে একই বস্তুর সূক্ষ্মরূপ (এতো সূক্ষ্ম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়) ও স্থূলরূপ বলে ধরলে বিরোধের নিরসন হয়। ভাববাদ ও বস্তুবাদ একই ভুয়োদর্শনের দুই শাখামাত্র মনে করা চলে তখন। যেমন, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা' বললে পুরো বলা হল না ; 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ওর সঙ্গে জুড়ে দিতেই হবে। নতুবা বলাও হয় আংশিক ; বিরোধও লেগে থাকে নিত্য।

দুই যে দুই নয়, আসলে এক তা' কি করে জানা যাবে? একমাত্র সত্যসন্ধ বিজ্ঞানী দৃষ্টিলাভের নিরন্তর প্রয়াস করলে হবে, নচেৎ নয়—বিবাদের পথে নয়, আপসের পথে, স্বামীজী যাকে বলেছেন, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত অধ্যবসায়, সর্বোপরি প্রেম—তাই থাকলে হবে ; নিশ্চয়ই জানা যাবে যে, একই দুই বা বহু হয়ে আছেন। কবির (রবীন্দ্রনাথ) ভাষায় বলা যায়—

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে নিশি-আঁধার-মাঝে

প্রেমে প্রেমে বাজে॥

জন্মমরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে,
ভকতহৃদয় নাচে, বিশ্বছন্দে মাতিয়ে—

একই রম্যবীণা নিখিলবিশ্ব জুড়ে বাজছে—আমরা দেখছি বহু, শুনছি বহু

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

ব্রহ্মসূত্রে (১।৩।২৬) বাদরায়ণ মুনি স্থির করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানে কেবল যে মনুষ্যের অধিকার আছে তাহা নহে, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতাদেরও ইহাতে অধিকার আছে। আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, '…ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোঽস্তি। তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদ্ যে দেবাদয়স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রমিতি বাদরায়ণ আচার্যো মন্যতে।' অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞানে যে কেবল মনুষ্যের অধিকার—এমন কোন নিয়ম নাই। মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে দেবতারা তাঁহাদিগকেও অধিকার শাস্ত্র দিয়াছেন, ইহা আচার্য বাদরায়ণ মনে করেন।' কারণ আচার্য শঙ্কর তাঁহার উক্ত ভাষ্যে বলিতেছেন, 'বিকারবিষয়বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্।' অর্থাৎ তাঁহাদের 'স্ব স্ব বিভূতিসকল বিকারপ্রাপ্ত হয়; সে-সকল অনিত্য এইরূপ আলোচনা (দেবতাদের) মনে উঠিতে পারে।' মনে ঐশ্বর্যাদিবিষয়ে অনিত্যত্ববুদ্ধি হইলে বৈরাগ্য হয়, বৈরাগ্য হইলে নিত্যবস্তু-ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন, সে বিষয়ে সাধনা ও শেষে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে আরও বলিয়াছেন, 'মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ।' অর্থাৎ 'বেদ, অর্থবাদ, ইতিহাস, পুরাণ এবং লোকেদের নিকট হইতে জানা যায় যে, দেবতাদের শরীর আছে।' শরীর থাকিলেই তাহার ধ্বংস আছে—এই কথা মনে করিয়া দেবতাদের নিত্যবস্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এই সাক্ষাৎকারের জন্য বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন। এ-বিষয়ে উপনয়নবিধি তাঁহাদের পথরোধ করিতে পারে না। এই ভাষ্যে সেই জন্য আচার্য বলিয়াছেন, 'নচোপনয়নশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্তেত, উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ। তেষাঞ্চ স্বয়ম্প্রতিভাতবেদত্বাৎ।' অর্থাৎ উপনয়নশাস্ত্রের বিধি উল্লেখ করিয়া উপনয়নপূর্বক বেদ-অধ্যয়ন-বিধি, দেবতাদের উপনয়ন হয় না, এই জন্য তাঁহাদের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার অধিকার নাই—এ কথা বলা যায় না, কারণ দেবতাদের নিকট বেদ স্বয়ম্প্রকাশ,' কাজেই তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই সে বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারেন।

তাছাড়া উপনয়নাদিগ্রহণের কথাও আছে। এবিষয়ে আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'অপিচ এষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্যাদি দর্শয়তি'—অর্থাৎ 'দেবতাদেরও উপনয়নগ্রহণপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনের কথা শাস্ত্রে আছে।' যথা—'একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস' (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।১১।৩)। 'ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্ম।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ—৩।১)। অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ ইন্দ্র একশত বৎসর প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বাস করিয়াছিলেন।' (ছা-৮।১১।৩)। আরও আছে, 'ভৃগু স্বীয় পিতা বরুণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আমায় ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করান। (তৈ—৩।১)।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে দেবতাদের বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উপনয়নগ্রহণের পর আচার্যগৃহে বাসপূর্বক বেদবিদ্যা ও বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনার কথা পাওয়া যায়। ঋষিদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, এই কথা আচার্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, যথা— 'ন ঋষীণামার্ষেয়ান্তরাভাবান্', 'ন ইতি ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদিসগোত্রতয়া।' অর্থাৎ—'ঋষিদের অন্য ঋষিকোগোত্র নাই বলিয়া যাগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকার নাই, কিন্তু সে জন্য ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই বলা যায় না। ঋষিদের যাগযজ্ঞাদি করিবার প্রয়োজন নাই, এই জন্য ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদের (অন্য ঋষি) গোত্র থাকিবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মবিদ্যালাভ গোত্র না থাকিলেও হইতে পারে।

আচার্য্য বাদরায়ণ বলিয়াছেন, 'পশ্বাদিব্যক্তিবদ্দেবাদিব্যক্তয়োঽপি সন্তত্যোবোৎপদ্যেরন্নিরুধ্যেরংশ্চ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।৩।৩০) অর্থাৎ 'মনুষ্য পশু প্রভৃতির যেমন প্রবাহাকারে জন্মমৃত্যু হয়, দেবতা ঋষি প্রভৃতিরও সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যু হয়।' এই জন্ম-মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান আবশ্যক, তাহার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রয়োজন, তাহার জন্যই বেদ-অধ্যয়ন দেবতা এবং ঋষিদিগকেও করিতে হয়।

ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতির বিষয়ে এই (১।৩।৩০) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'অতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং ...কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ।' অর্থাৎ 'যাঁহারা পূর্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম (পুণ্য) বা অদৃষ্ট (সৎকর্মফল) অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কল্পান্তরীয় ব্যবহার (জন্মান্তরের কথা) স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে।' 'তথাচ শ্রুতিঃ—যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।১৮)। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'যিনি ব্রহ্মার জন্মদান করিয়াছেন, যিনি বেদ (ব্রহ্মাকে) প্রদান করিয়াছেন, মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছুক আমি সেই আত্মজ্ঞানপ্রকাশক দেবতার (পরব্রহ্মের) আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।' ইহা হইতে ব্রহ্মারও জন্ম হয়, ইহা জানা যাইতেছে। জন্ম হইলে তাঁহারও জন্মান্তরের কথা স্মরণ হয়। ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ইঁহাদের জন্ম হয় অতএব মৃত্যু হয়, জন্মান্তর আছে। সুতরাং তাঁহাদের এই জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যা, বেদবিদ্যার আবশ্যক। তাঁহারা সেসকল লাভও করিয়া থাকেন। কাজেই দেখা যাইতেছে তাঁহাদের সে সবে অধিকার আছে। এই কথাই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে। যথা, 'ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি' (ব্রহ্মসূত্র—১।৩।৩৩) অর্থাৎ দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা বাদরায়ণ মুনি মনে করেন। ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, 'বাদরায়ণস্ত্বাচার্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে' অর্থাৎ বাদরায়ণাচার্য মনে করেন, দেবতাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এই দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু প্রভৃতিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তেমনি ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ইঁহাদিগকেও

লওয়া হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, "তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ১।৪।১০)। অর্থাৎ 'যে-যে দেবতা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই-সেই দেবতা তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান, ঋষিদের মধ্যে এইরূপ হয়; মনুষ্যদের মধ্যেও এইরূপই হয়।' ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে দেবতারা—ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও মনুষ্যের ন্যায়ই ব্রহ্ম হইয়া যান।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছা যেমন মনুষ্যের হয়, সেইরূপ দেবতাদেরও হয়। এই বিষয়ে আচার্য শঙ্কর শ্রুতি হইতে প্রমাণ দিয়াছেন, "তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানিতিন্দ্রো···।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।৭।২)। অর্থাৎ, 'সেই দেবতারা বলিলেন, আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—যে-আত্মার অন্বেষণ করিলে যাবতীয় লোক ও যাবতীয় কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়।' এখানে আত্মা বলিয়া পরমাত্মার কথাই বলা হইতেছে। সর্বব্যাপী পরমাত্মা যাবতীয় লোক ও কাম্যবস্তু ব্যাপিয়া আছেন; সেই পরমাত্মাকে পাইলে লোক-ও কাম্যবস্তুসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য তাঁহার অন্বেষণ দেবতারা করিতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য দেবতাদের সন্ন্যাসগ্রহণের কথাও শ্রুতিতে আছে—যথা, "ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্—৮।৭।২)। অর্থাৎ 'দেবতাদের মধ্যে (দেবরাজ) ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।'

ব্রহ্মজ্ঞানে দেবতাদের অধিকার আছে—ইহা আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন (পূর্বোক্ত ১।৩।৩৩ সূত্রের ভাষ্যের শেষের দিকে)—"তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রাদিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ।" অর্থাৎ 'শ্রুতির বিভিন্ন মন্ত্র হইতে জানা যায় দেবতাদের শরীর আছে, সেই জন্য তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রার্থী হওয়া সম্ভব—সেই কারণে শ্রুতিবাক্য হইতে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন—ইত্যাদি যাহা পাওয়া যায় সে-সকল যুক্তিযুক্ত।

দেবতাদের ন্যায় গন্ধর্বদের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে—এই কথা আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।৩৩) ভাষ্যে একস্থানে বলিয়াছেন, যথা, "স্মার্তমপি চ গন্ধর্বযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদি"—অর্থাৎ 'স্মৃতিতে কথিত গন্ধর্ব-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ হইতে জানা যায় গন্ধর্বদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।'

যাঁহারা বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষি; তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে—একথাও আচার্য শঙ্কর ঐ পূর্বোক্ত সূত্রের আর এক স্থানে বলিয়াছেন। যথা, "ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যম্" অর্থাৎ 'সংহিতা ও ব্রাহ্মণের মন্ত্রদর্শনকারী ঋষিদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।'

অসুরদেরও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে—ইহা আচার্য শঙ্কর শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যথা—"ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাম্" (ছান্দোগ্যোপনিষদ—৮।৭।২)। অর্থাৎ 'দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন।' এখানে রাজা বলিয়া ইন্দ্রের বা বিরোচনের অপর সকল দেবতা ও অসুর হইতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইন্দ্রো হৈব দেবানাম্"

"দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র" অর্থাৎ ইন্দ্র অপর দেবতাদের ন্যায়ই একজন দেবতা। সেইরূপ বিরোচন যে অপর অসুরদের ন্যায়ই একজন অসুর ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিরোচনোঽসুরাণাম্" অর্থাৎ, 'অসুরদের মধ্যে বিরোচন।'

"তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতি-সকাশমাজগ্মতুঃ"। (ছান্দোগ্য—৮।৭।২) পূর্বোক্ত শ্রুতির শেষে এই অংশ আছে। ইহার অর্থ—'তাঁহারা পরস্পরকে সংবাদ না দিয়াই সমিধ হস্তে লইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন।' সংবাদ না দিয়া অর্থাৎ পরামর্শ না করিয়া, একে অপরের দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইয়া। দুই জনেরই সমান অধিকার, এইজন্য একে অপরের সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া গমন করিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, ইন্দ্র-প্রমুখ দেবতাদের যেমন অধিকার, অসুরদেরও সেইরূপ অধিকার থাকায় অসুরদের মধ্য হইতে বিরোচন ইন্দ্রের ন্যায় একই আচার্য প্রজাপতির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে, ব্রহ্মবিদ্যা বেদবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গেলেন।

উক্ত শ্রুতিভাগে ইহার পরের মন্ত্রে আছে—"তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমূষতুঃ" (ছান্দোগ্য—৮।৭।৩) "তাঁহারা, ইন্দ্র ও বিরোচন বত্রিশ বৎসর (প্রজাপতির নিকটে) ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া (বেদমন্ত্রশ্রবণ ও শিক্ষা এবং গুরুসেবাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া) বাস করিলেন।' পরে আছে, "তৌ হ প্রজাপতি-রুবাচ কিম্ ইচ্ছন্তৌ অবাস্তম্ ইতি" (ছা ৮।৭।৩)। 'তোমরা কোন্ অভিলাষে এখানে এতদিন বাস করিলে—এই কথা প্রজাপতি ইন্দ্র এবং বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন।' অর্থাৎ 'এতদিন তোমরা বেদমন্ত্রও শ্রবণ করিলে। আর কি চাই?' উত্তরে 'তাঁহারা বলিলেন, যে-আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ, যিনি জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুধা-বর্জিত ও পিপাসারহিত, যিনি সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই জানিতে চাহিবে।' এই উপদেশ আছে—'যে সেই আত্মাকে আচার্য ও শ্রুতি হইতে জানিতে পারে, সে যাবতীয় লোক জয় করে, তাহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।' এই কথাও আছে—'এই উপদেশ ও কথা আপনারই, ইহা আমরা জানি। সেই আত্মার সাক্ষাৎকারের ইচ্ছায় এতদিন বাস করিতেছি।' (ছান্দোগ্য—৮।৭।৩)। আমরা এখানে মন্ত্রের অর্থ দিলাম। এই মন্ত্র হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য, আচার্যগৃহবাস, উপনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচন উভয়ের সমান অধিকার। স্বয়ং প্রজাপতি সে-অধিকার দিতেছেন। এখানে মন্ত্রভাগ, যাহার অর্থ পূর্বে দেওয়া হইল, সুন্দর। যথা—"তৌ হোচতুর্য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বি-শোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮।৭।৩)।

প্রজাপতি দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচনের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার সমান অধিকার বলিয়া উভয়ের আচার্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, নিজের গৃহে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক আচার্যগৃহবাস করিতে দিয়াছেন। তাহার পূর্বে উভয়ের উপনয়ন-সংস্কার করাইয়াছেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ব্রহ্মচর্য-সময়ে উভয়কে বেদপাঠ করাইয়াছেন, ইহাও বেশ বোঝা যায়। এখন ব্রহ্মজ্ঞান-

লাভার্থে উভয়ে ব্রহ্মবিদ্যার অন্বেষণ করিতেছেন জানিয়া আচার্য প্রজাপতি সেই বিদ্যার উপদেশ দিতে লাগিলেন। যথা, "তৌ হ প্রজাপতি-রুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেত্যথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়-মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেষন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ" ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৭।৪)। অর্থাৎ 'উভয়কে (ইন্দ্র ও বিরোচনকে) প্রজাপতি বলিলেন, এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষকে দেখা যায়, ইনিই আমার কথিত আত্মা, ইনিই অমৃত অভয়, ইনিই ব্রহ্ম। (তখন উভয়ে প্রশ্ন করিলেন), হে ভগবন! যাঁহাকে জলে দেখা যায়, আর যাঁহাকে দর্পণে দেখা যায় ইহার মধ্যে কোন্‌টি তিনি (ব্রহ্ম)। উত্তরে প্রজাপতি বলিলেন, ইনিই (ব্রহ্মই), (চক্ষু, জল, দর্পণ ইত্যাদি) সকলের মধ্যে (প্রতিবিম্বরূপে) দৃষ্ট হন।"

এই প্রশ্ন-প্রতিবচন হইতে দেখা যায়, আচার্য প্রজাপতি দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচনকে একই প্রকারের অন্তেবাসী (আচার্যগৃহে অবস্থানকারী শিষ্য) বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

আমরা দেখিলাম, দেবতা গন্ধর্ব ঋষি ও অসুরদের ব্রহ্মজ্ঞানে সমান অধিকার আছে।

[ক্রমশঃ]

প্রতীক্ষা

ডক্টর মতিলাল দাশ

আমারে তুমি করিবে শুচি সোনার মতো আগুনে জ্বালি
গড়িবে তুমি নূতন করি তোমার মতো ছাঁচে ঢালি !
তোমার গড়া আমার লাগি
জীবনে সদা রহিব জাগি
প্রদীপশিখা অমল রবে আঁধার এলে বিজন ঘরে,
নিশীথ রাতে যদি বা কভু এস হে কাছে করুণাভরে।

গরবে মম হৃদয় নাচে ললাটে আঁকা তোমার টীকা
আঁধার মম ভবন মাঝে জ্বলিছে আগমনীর শিখা।
তোমারে অতি আপন জানি
আঁকড়ি আছি তোমার বাণী
পুলকে তাই কাঁপিছে হিয়া, কাঁপিছে হিয়া পরম সুখে
জানি হে জানি হে মোর প্রিয়, আমারে তুমি নেবে যে বুকে।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' এ সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে জীবনোপযোগী শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যে আদিম নরনারীর মতোই বসনের অপেক্ষা ভূষণের বেশী পক্ষপাতী, সেকথা বোঝাতে গিয়ে স্পেন্সার যা বলেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ —"সমুদ্র-যাত্রীরা দেখিতে পান যে, অসভ্যেরা রঞ্জিত কাচখণ্ড অথবা সামান্য ক্রীড়া-অলঙ্কারের প্রতি মূল্যবান ক্যালিকো অথবা বনাত অপেক্ষা সমধিক সমাদর প্রদর্শন করে এবং কামিজ অথবা কোর্তার তাহারা যে প্রকার হাস্যাস্পদ ব্যবহার করে, তদ্দ্বারা প্রয়োজন অপেক্ষা ভূষণ যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনোনীত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।"[১]

মূল গ্রন্থের ভাষা—"Voyagers find that coloured beads and trinklets are much more prized by wild tribes, than are calicoes or broadclothes. And the anecdotes we have of the ways in which, when shirts and clothes are given, savages turn them to some ludicrous display, show how completely the idea of ornament predominates over that of use."[২]

'শিক্ষা' সম্বন্ধে এই ব্যবহারিক ও আলঙ্কারিক প্রয়োজনের তুলনামূলক চিন্তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আমরা রাজা রামমোহনের চিন্তাধারাতে এর আগেই পাই। রামমোহন এক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন বেকনের দ্বারা। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা এই বিখ্যাত পত্রটি আধুনিক ভারতের শিক্ষা-চিন্তার ইতিহাসে অন্যতম দিক-নির্দেশক। তদানীন্তন সরকার বহু অর্থ-ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ-স্থাপনে উদ্যোগী হলে রামমোহন সংস্কৃত-শিক্ষার উপকারিতার কথা জেনেও আধুনিক কালের সঙ্গে তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিচিত করবার জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার দাবী জানিয়েছিলেন লর্ড আমহার্স্টের কাছে। প্রাসঙ্গিকবোধে রামমোহনের এই পত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি[৩]—"দেখতে পাচ্ছি, বর্তমানে সারা-দেশে অনুসৃত ও প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রসারের জন্যই সরকার এখন হিন্দু পণ্ডিতদের

১ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ; বসুমতী সংস্করণ (মুদ্রাকর: শ্রীশশিভূষণ দত্ত) পৃঃ ২। এ পর্যন্ত 'শিক্ষা' বইটির যে কটি মুদ্রিতরূপ হাতের কাছে পেয়েছি, তার কোনটিতেই প্রকাশের তারিখ নেই এবং বইটি যে মৌলিক রচনা নয়, অনুবাদ-সে কথাও উল্লেখিত নেই। অবশ্য বিবেকানন্দ-জীবনী-পাঠকদের কাছে এ অনুবাদের কথা সুবিদিত। যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, এ গ্রন্থ কখনো অনুবাদরূপে এর আগে পরিচায়িত হয়েছিল কি না।

২ Education: Intellectual, Moral and Physical by Herbert Spencer; 1861, Edition [First Edition], p. 1.

৩ মূল পত্রটির জন্য The Life and Letters of Raja Rammohan Roy: Sophia Dobson Collet [সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্করণ, ১৯৬২] পৃঃ ৪৫৬ দ্রষ্টব্য। অনুবাদ লেখককৃত।

অধীনে একটি সংস্কৃত-বিদ্যালয়-স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানটি (লর্ড বেকনের আগেকার আমলের ইউরোপীয় শিক্ষায়তন-গুলির মতো) তরুণদের শুধু কেবল ব্যাকরণ ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চর্চা ও বিচারের দিকেই নিয়ে যাবে—যে ধরনের শিক্ষা তাদের নিজেদের বা সমাজের বিশেষ কোনো কাজেই লাগবে না। ভারতবর্ষের সর্বত্র যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত—দু'হাজার বছর আগে-কার লব্ধ বিদ্যা এবং অর্থহীন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের টীকাভাষ্যের ধারা—এই জাতীয় বিদ্যাই ছাত্রেরা সেখানে (সংস্কৃত কলেজে) পাবে।"

বলা বাহুল্য, রামমোহন নিজে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বলেই শাস্ত্র-অনুবাদ ও শাস্ত্র-বিচারে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছিলেন। তবু সংস্কৃতে আবদ্ধ প্রাচীন জ্ঞানের ধারা ও পদ্ধতি—এ দুয়ের সম্বন্ধেই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল। সমকালীন য়ুরোপের তরুণেরা গণিত, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে দক্ষতা অর্জন করতো, রামমোহন তাঁর স্বদেশীয় তরুণদের মধ্যে সেই প্রয়োজন-মূলক শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং ইংরেজ সরকার যেন শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্যই প্রধানতঃ অর্থব্যয় করেন—এই ছিল রামমোহনের আকাঙ্ক্ষা।

বেকনের যুগ থেকেই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই আধুনিক যুগের সূচনা। উন-বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, স্বামীজীর জন্মের প্রায় দু'বছর (মে, ১৮৬১) আগে লণ্ডনে বসে হার্বার্ট স্পেন্সার শিক্ষাপ্রসঙ্গে যে চিন্তা-রাশি লিপিবদ্ধ করছিলেন, তা বেকনের চিন্তাধারারই পরিণত ফল। এর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। স্পেন্সারের পরি-কল্পিত বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার অবশ্য ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থাতেও ঠিক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রেরণা ইংল্যাণ্ডের মারফত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে অনেক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দুকলেজের প্রথম যুগের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে রাধানাথ সিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে সমকালীন অক্ষয়কুমার দত্তের কথা আমাদের বিজ্ঞানচিন্তার ইতিহাসে সুবিদিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নলগ্নে বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারিত পটভূমিকায় হার্বার্ট স্পেন্সার বিজ্ঞানকেই জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় ও যথার্থ শিক্ষার বিষয় মনে করেছেন। জীবনধারণ ও জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার দ্বারা স্পেন্সার যে সিদ্ধান্তে উপনীত, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ—"দেখিলাম, আমরা যাহা নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যে শিক্ষার সর্বাপেক্ষা উপ-যোগিতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সে প্রশ্নের সকল দিক হইতে একমাত্র উত্তর আসিল—বিজ্ঞান। যদি জীবন সুনিয়মে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি জীবিকানির্বাহরূপ অপরোক্ষ প্রাণরক্ষা শিক্ষা করিতে হয়, শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি সমাজের একটি প্রকৃত অঙ্গ হইতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান। যদি প্রাণ-বিমোহন সঙ্গীত-শিল্পাদি শিখিতে চাও, তবে শিক্ষা কর—বিজ্ঞান।"[৪]

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থ 'Education'-এর ভাষা—"Thus to the question we set out with—what knowledge is of most

৪ 'শিক্ষা' : পৃঃ ৪৫

worth?—the uniform reply is—Science. This is the verdict on all the counts. For direct self-preservation, on the maintenence of life and health, the all important knowledge is—Science. For that indirect self-preservation which we call gaining a livelihood, the knowledge of greatest value is—Science. For the due discharge of parental functions, the proper guidance is to be found only in—Science. For that interpretation of national life, past and present, without which the citizen cannot rightly regulate his conduct, the indispensable key is—Science. Alike for the most perfect production and highest enjoymet of art in all its forms, the needful preparation is still—Science. And for the purpose of discipline—intellectual, moral, religious—the most efficient study is, once more—Science"[৫]

মূল ইংরাজীর সঙ্গে স্বামীজীর অনুবাদ মেলালেই দেখা যাবে প্রয়োজনবোধে স্বামীজী স্পেন্সারের বক্তব্যকে সংক্ষেপিত করেছেন। আবার স্পেন্সারের ভাষাভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা, উপস্থাপনা ও গতিবেগ—এ সবই স্বামীজীর গদ্যভঙ্গীতে যথাযথভাবে রূপায়িত। দার্শনিক বক্তব্যের অনুবাদে স্বামীজীর এই নৈপুণ্য তাঁর অনুবাদকালীন বয়ঃসীমার কথা মনে রাখলে বিস্ময়কর বৈ কি! সেই সঙ্গে এও বলা চলে যে, ভাষার সামান্য পরিবর্তনেই আধুনিক পাঠকের কাছে আর এ অনুবাদকে খুব দূরের জিনিস বলে মনে হবে না। স্বামীজীর নিজস্ব ভাষাভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাসে এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা বিশেষভাবেই স্মরণীয় আবার পরবর্তীকালে মননশীল গদ্যরীতির প্রবর্তনায় স্বামীজীর নৈপুণ্য যে স্বাভাবিক, এই অনুবাদের স্বচ্ছতা ও গভীরতা তার ইঙ্গিতবহ।

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এই 'শিক্ষা'-গ্রন্থটির যে সংস্করণটি আছে, তা জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকা অনুসারে ১৯১৭ সালের। বইয়ের সূচনায় বা অন্য কোথাও কোনো তারিখ নেই। যদি প্রথম সংস্করণ হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় প্রথম থেকেই বইটি যে অনুবাদ সেকথা বলা হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর জীবিতকালে প্রকাশিত কোনো গ্রন্থে এমন অনুল্লেখ অসম্ভব। বিশেষতঃ স্বামীজী যখন স্পেন্সারের লিখিত অনুমতি নিয়েই এ অনুবাদ করেন। তাই মনে হয়, জাতীয় গ্রন্থাগারের বইটি পরবর্তী কোনো সংস্করণ। গ্রন্থাগারের তালিকায় উল্লেখিত '১৯১৭'—বইটি গ্রন্থাগারের তালিকাভুক্ত হওয়ার কাল এবং ঐ বৎসরে প্রকাশিত সংস্করণ হতে পারে॥

তরুণমনের উৎসাহে স্পেন্সারের এই বিজ্ঞানসর্বস্বতা স্বামীজী তাঁর অনুবাদের মাধ্যমে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে এমন মনে হতে পারে যে, স্বামীজী একদা নিজেও এজাতীয় মতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু স্পেন্সারের সমগ্র গ্রন্থটি পড়লে মনে হয়, আধুনিক শিক্ষাচিন্তার জগতে এই বইটির বিশেষ গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেই স্বামীজী অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন। গ্রন্থকারের সমস্ত বক্তব্য সমর্থন করাই তাঁর অভিপ্রেত নাও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এ গ্রন্থের কোনো সংস্করণেই এ পর্যন্ত স্বামীজীর স্ব-লিখিত কোনো ভূমিকা পাওয়া যায়নি, সেজন্য অনুমান ছাড়া এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অসম্ভব। আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। মূল গ্রন্থে স্পেন্সারের নিজস্ব ভূমিকাও স্বামীজীর

৫ 'Education'; Herbert Spencer; p. 53

অনুবাদগ্রন্থে অনুপস্থিত। অবশ্য প্রথম সংস্করণে ছিল কি না, তা বলা যাচ্ছে না।

জগৎ ও জীবনের সর্ব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে স্পেন্সার বিজ্ঞানের যে ব্যাপক তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন, তা কিছু পরিমাণে যান্ত্রিক মনে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত ও বিজ্ঞানের যে নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধির দ্বারা চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেই চিন্তাধারায় স্পেন্সারের প্রভাব কিছু পরিমাণে কার্যকরী, এ কথা বোধ হয় বলা চলে।

বন্ধু ও গুরুভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যদি 'শিক্ষা'-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক হয়ে থাকেন, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের দিনগুলিতে (পিতৃবিয়োগের পরে) অথবা সন্ন্যাসজীবনের সূচনায় এই অনুবাদগ্রন্থটি স্বামীজী লিখেছেন। এই সময়ে বিজ্ঞানের সর্বময় আধিপত্য মেনে নেবার কোনো কারণই স্বামীজীর ছিল না। সেই সঙ্গে এও স্মরণীয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানমাত্রকেই বৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন করার হাস্যকর চেষ্টাও স্বামীজী কখনো করেননি। এ বিষয়ে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের মতো নিরপেক্ষ অথচ আগ্রহী অনুসন্ধিৎসুর ভাবই স্বামীজীর চরিত্রলক্ষণ। পরবর্তীকালেও দেখা যায়, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও জাতীয় জীবনে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ সর্বদা সজাগ। ভগিনী নিবেদিতা যে আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় উৎসাহদানে ব্রতী হয়েছিলেন, তারও মূলে স্বামীজীর বিজ্ঞান-নিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানচর্চার প্রসারে অমিত উৎসাহের প্রেরণা।

স্পেন্সারের গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'Physical Education'—'শারীরিক শিক্ষা'। এই অধ্যায়ে এসে দেখি, দেহ-মনের সুসমঞ্জস পরিণতিই স্পেন্সারের মতে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূলতঃ গ্রন্থকীটরূপেই ছাত্রদের গড়ে তোলার যে মনোবৃত্তি, দেখা যায়, স্পেন্সার তার ভ্রান্তি দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীনির্বিশেষে স্বাস্থ্যচর্চার উপরে জোর দিয়েছেন। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য এবং পূর্ণাঙ্গ মননের এই আদর্শও তাঁর বিজ্ঞানদৃষ্টিরই স্বাভাবিক পরিণাম। এ অধ্যায়ের অনুবাদেও স্বামীজী কিছুটা সংক্ষেপিত করেছেন মূল গ্রন্থের বক্তব্য। অধ্যাত্মচিন্তার জগতে স্বামীজীও সর্বাগ্রে জোর দিয়েছেন আশিষ্ট, বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ দেহের উপর। সাধারণতঃ ধর্মজগতের মহাপুরুষেরা শারীরিক যত্নবিষয়ে যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, স্বামীজীর চিন্তাধারায় তার ব্যতিক্রমই।

[ক্রমশঃ]

নব বৃন্দাবন ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী চেতনানন্দ

এমন একখানি নাটকের মহাউদ্বোধন আমরা করতে যাচ্ছি—যেখানে অভিনেতা জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। নাট্যশাস্ত্রে শিবকে নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই মহানট বলতে পারি, কারণ এই জগৎ-রঙ্গমঞ্চে সমস্ত অভিনয়ের পশ্চাতেই তো তিনি। তাঁর সামনে কোন অভিনয় যদি অনুরূপ না হত, তিনি বলে দিতেন—তা মঞ্চের উপরেই হোক বা দৈনন্দিন সংসার জীবনেই হোক। এই 'নব বৃন্দাবন' নাটকে তাঁর খুঁটিনাটি মন্তব্য আমাদের মুগ্ধ করবে।

পাঠক যদি 'নব বৃন্দাবন' দেখার আগে চোখ বুঁজে শ্রীরামকৃষ্ণের একটু অভিনয় দেখে নেন তবে প্রকৃত অভিনয় কি করে করতে হয় তার পরিচয় পাবেন এবং সে ভাবে 'নব বৃন্দাবনে'র রস আস্বাদ করতে পারবেন। "আমরা যখন ঠাকুরের নিকট যাই, ঠাকুরের বয়স তখন ঊনপঞ্চাশের কাছাকাছি। ঠাকুরের কাছে যাবার পূর্বে মনে হত ছোটছেলে নাচে অঙ্গভঙ্গী করে, তা লোকের বেশ লাগে। কিন্তু একটা বুড়ো মিন্‌সে, সাজোয়ান মরদ যদি ঐরূপ করে, তা হলে লোকের বিরক্তিকর বা হাস্যোদ্দীপকই হয়। 'গণ্ডারের খেমটা নাচ কি কারো ভাল লাগে'—স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন। কিন্তু ঠাকুরের কাছে এসে দেখি সব উল্টো ব্যাপার। বয়সে প্রৌঢ় হলেও ঠাকুর নাচেন, গান করেন, কত হাবভাব দেখান—কিন্তু তাঁর সকলগুলিই কী মিষ্ট! বাস্তবিক 'একটা বুড়ো মিনসেকে নাচলে যে এত ভাল দেখায়, একথা আমরা কখন স্বপ্নে ভাবিনি।' —গিরিশবাবু এ কথাটি বলতেন।" (লীঃ প্রঃ ৪।২৮৯)। প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের বালক বা স্ত্রীলোকের অভিনয় হুবহু হবার কারণ ভাবের সঞ্চার। তাঁর যখন যে ভাব হত সে ভাবের ষোল আনাই প্রকাশ পেত। তাতে কোন ভেজাল থাকত না—তাই তাঁর সব অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

নাটক হচ্ছে যাতে কিছু আটক নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিনয়ে কোন আড়ষ্ট ভাব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের অভিনয়ও ঐরূপ ছিল। ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, "বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত।"

'নব বৃন্দাবনের' দৃশ্যগুলি ঊনবিংশ শতকের জনমানসের প্রতিচ্ছবি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-কেন্দ্রিক ভোগময় জীবন কী করে ভারতে দ্রুত প্রবেশ করছিল এবং ভারতবাসী কী করে ঐ সব অনুকরণ করে সুমহান আর্যসভ্যতাকে ধিক্কার দিয়ে লালসা-মদিরাপূর্ণ সভ্যতাকে নিজের করে নিচ্ছিল এবং নিজেদের ধর্ম ছেড়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করছিল—এ নাটকে সে-সব আছে। 'নব বৃন্দাবন' ঐ সাইক্লোনের মুখে ছিল। সে যুঝছিল ঐ দুরন্ত ঝড়ের সঙ্গে। আমরা অগ্রে দেখাব 'নব বৃন্দাবন' দপ্ করে জ্বলেই নিভে গেল। কারণ তার বনিয়াদেই ছিল

একটা স্বদেশী-বিদেশী mixture: "The higest Christian ethics was combined with the deepest spirituality belonging to India, and the result was a combination..."—Liberal, Dec. 10, 1882. নাটকখানির প্রচ্ছদে লেখা আছে—'নব বৃন্দাবন বা ধর্মসমন্বয় নাটক'। এ নাটক যদি এখন অভিনীত হয় তবে প্রায় সমস্ত দর্শকই যে হতাশ হবেন—এ কথা সুনিশ্চিত। অথচ এইটিই ছিল আমাদের তদানীন্তন সমাজের প্রতিচ্ছবি।

কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভাব নিয়ে 'নব বৃন্দাবন' রচনা করেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। অবশ্য তিনি 'শ্রীচিরঞ্জীব শর্মা' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। ত্রৈলোক্যের নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' বহু জায়গায় আছে। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান খুব পছন্দ করতেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুআরি ব্রাহ্মদের আমন্ত্রণে কেশবের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ নাটকের অভিনয় দেখেন। 'The *Nava Brindaban* was again acted this afternoon January 25th, 1883, in connection with the 53rd Anniversary of the Brahmo Samaj and among those present we noticed the Venerable Paramhansa of Dakshineswar."—*The New Dispensation*, Feb. 18, 1883.

আমাদের হাতে 'নব বৃন্দাবনের' তিনটি সংস্করণ এসেছে। প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠাগুলি ছেঁড়া, তাই তার রচনাকাল গ্রন্থদৃষ্টে সম্ভব হল না। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মনেতা শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থে রয়েছে —প্রথম সংস্করণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত নাটকের প্রথম উদ্বোধন হয় লিলি কটেজে (কেশব সেনের বাড়ীতে) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার ঐখানেই দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। ১৮৮২ খৃ: ১লা অক্টোবর Liberal পত্রিকায় বেরিয়েছিল: Among the audience···we noticed the Maharajah of Kuch Behar, Maharajah Sir Jotindra Mohun Tagore, Hon'ble Kristo Das Pal, Rai Kannye Lal Dey Bahadur, Pandit Mohesh Chunder Nayaratna, Doctor Mohendra Lall Sircar, Kumar Surendra Mullick, B. L. Gupta, Esq., Abdur Rahman, Esq. There is a general complaint that the drama is a little too long. It is proposed to curtail it so long as to bring the representation on the stage within three or four hours." এই নাটক পরে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ীতে, শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে, গ্রেট ইস্টার্ণ সার্কাস প্যাভেলিয়ান প্রভৃতি জায়গায় অভিনীত হয়। এতে অভিনয় করতেন ভাই প্রতাপচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, উমানাথ, রমাচন্দ্র, কেদারনাথ, গৌরগোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, দীননাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মগণ।

আমাদের হিসাব অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় সংস্করণের অভিনয় দেখেন। এই সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮০৫ শকের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃ:-এর জানুয়ারী নাগাত। খুব সম্ভব তখন ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব। আমরা পূর্বেই The New Dispensation-এর বিবরণ উল্লেখ করে এসেছি। এই গ্রন্থ শ্রীরামসর্বস্ব ভট্টাচার্য কর্তৃক বিধান যন্ত্রে, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হতে প্রকাশিত হয়। আর তৃতীয় সংস্করণ ১৮২৭ শকে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে কোচবিহার রাজকীয় যন্ত্রালয়ে রাজকীয় সাহায্যে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে: "নব বৃন্দাবন, প্রথম

সংস্করণে যে-সকল গর্ভাঙ্ক ছিল তাহাদের কয়েকটি অভিনীত হইত না, এই জন্য তাহা এবার উঠাইয়া দেওয়া গেল।···গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত কেহ এই নাটক অভিনয় করিতে পারিবেন না।—গ্রন্থকার।"

পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত (প্রথম সংস্করণে ছয়টি এবং তৃতীয় সংস্করণে সাতটি) এই নাটকখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করবার পূর্বে গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করছি: "জননী বাগ্দেবী, বিদ্বজ্জনমনোরঞ্জিনী এই 'নব বৃন্দাবন' রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া রসগ্রাহী কবিকুলের চিত্ত বিনোদন করুন! স্বদেশ মাতৃভূমির মঙ্গলোদ্দেশে তাঁর প্রেমলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি, মা নিরাকারা জননীর প্রসাদে যেন আমরা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে সাধুভাব উদ্দীপন করিতে সক্ষম হই। তাঁর পবিত্রপাদস্পর্শে এই রঙ্গভূমি পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হউক।—স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।" এখানে লক্ষ্যের বিষয় ব্রাহ্মরা খ্রীষ্টানী ধাঁচে 'জগৎপিতা' মানত; কিন্তু পরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে তা 'জগন্মাতা'তে রূপান্তরিত হয়েছে। এ নাটকে 'জগৎপিতা' ও 'জগন্মাতা' যে এক—তার উল্লেখ আছে।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের বসু পরিবারের কাহিনী-অবলম্বনে এ নাটক। বাড়ীর কর্তা নরহরি বসু। তিন পুত্র—তিন রকম। জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ পেশাদারী উকিল, মাতাল ও কুক্রিয়াসক্ত। মধ্যম পুত্র রাখালমাধব সস্ত্রীক সাহেবীভাবাপন্ন। সাহেবদের সঙ্গে মেশেন, থাকেন এবং দেশীলোকদের তীব্র ঘৃণা করেন। আর কনিষ্ঠ পুত্র হরিসুখ ধর্মপ্রাণ, সত্যবাদী ও নব ব্রহ্মজ্ঞানী।

নাটকের প্রথম অঙ্কে ফুটে উঠেছে সে সময়কার ছবি: "কুলধর্ম প্রাচীন রীতিনীতি কিছুই মানতে চায় না। সাহেব হওয়ার দিকে সকলের ঝোঁকটা বেশী।" "বরং বিজাতীয় প্রভুত্ব সহ্য হয়, কিন্তু হেরো-তেরো রাম-কেষ্টা যে লাট মেজেষ্টর হবে তা সইবে না।" "ইংরেজরা এ দেশের মঙ্গলের জন্যেই রাজা হয়েচে। ওরা বেশ রাজকর্ম কচ্চে, দেশ শাসনে রেখেচে, ওদের গায়ে খুব বলও আছে, ঐ বিষয় নিয়ে ওরা থাক; আমরা ফাঁকের ঘরে পরকালের কাজ গুচিয়ে নেই। ওরা ক্ষেত্রি (ক্ষত্রিয়) হয়ে দেশশাসন করুক, আমরা মুনি ঋষি হয়ে যোগসাধন করি। মিছে অসার বিষয় ভেবে কি হবে?" গৃহস্বামী নরহরিবাবু জবাবে বললেন: "বেশ কথা বলেচ। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজদের যথেষ্ট মানতেন। তাঁর কাছে আমরা অনেক তত্ত্বজ্ঞান শিখেছি।" "কি গো কবিরত্ন মশায়, ইন্দুরের লেজের মত রিফাইণ্ড টিকি কোথায় পেলে?" "বেশী চালাকী কোরো না। এখনও ফোমেণ্ট কল্লে পেট থেকে মুরগীর ছানা বেরিয়ে পড়বে।" "আজকাল যে নানারকমের ব্রহ্মজ্ঞানী দেখতে পাই হে! রামমোহন রায়ের ধর্মটা নিয়ে ছোঁড়ারা যাচ্ছে তাই করে তুলেচে। খোল-কর্তালও বাজায়, বাইবেলও পড়ে, আবার নিরামিষও খায়। কালে কালে কতই হবে!" এর পরেই রয়েছে ক্লাইম্যাক্স—গুরুপুত্রকে নিয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশের মাতলামি। মাতালের মাথায় জল ঢালায়, "কে রে বাবা, এত রেতে ঠাণ্ডা জল দেও, দেখো যেন আমার নেশা ড্যামেজ না হয়।"

তদানীন্তন সমাজের মনোভাব, কাজকর্ম সব সাজান আছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পাঠক, কেবল চোখ বুঁজে চিন্তা করবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সূক্ষ্ম নিখুঁত মন নিয়ে নাটক দেখছেন। তাঁর মন্তব্য এখন করব না, কারণ তাতে রসভঙ্গ হবে।

জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাল অবিনাশের স্ত্রী চারুশীলা আদর্শ সতী নারী। স্বামীকে বিপথ থেকে ফিরাবার তাঁর কী প্রাণপণ চেষ্টা! স্বামী অনেক সময় বাড়ীতেই আসে না। কনিষ্ঠ ধর্ম-প্রাণ দেবর হরিসুখ মাঝে মাঝে বড় বৌদির খোঁজ নেন, তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এনে পড়তে দেন। 'সুখী পরিবার' গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে চারুশীলা বলছে, "ঠাকুরপো, এ যে কি বস্তু তার মর্ম জানলাম না।···মহর্ষি যিশুর জীবনচরিত পড়তে আমার বড় ইচ্ছা হয়।" তারপর ননদ এসে ভাগ্যহীনা বড় বৌকে উপদেশ দিয়ে বলল, "তুই বড় হাবা মেয়ে। ফিকির জানিস নে স্বামী কেমন করে বশ কর্তে হয়।" মেজজা হিরণ্ময়ী স্বামীর সঙ্গে মেম সেজে ঘোরেন। বড়জাকে দেখতে এসে বলছেন: "এখন সাহেবদের সঙ্গে বসে খেতে হয়। এই দেখ, এরূপ পোষাক পরতে হচ্ছে। কখনও ঘোড়ার ওপর চড়ি। টেবিলে কাঁটা চামচে ধরে খানা খাই। অন্য অন্য সবগুলো না একপ্রকার শিখিচি, কিন্তু ইংরেজী কথাটা মুখ দিয়ে ভাল বেরোয় না! হিন্দুর মেয়ে মেম সাজা ভাই বড় মুস্কিল।···কাঁচা গোরুর মাংসগুলো কি আর ভাল লাগে? গা যেন বোমি বোমি করে আসে। এখন তবু অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে। সাহেবদের ভেতর আবার এমন নিয়ম আছে যে, খেতে বসে যদি বোমি আসে তা অমনি গিলে ফেলতে হয়।" স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ছাড়াছাড়ির আইন বলবৎ, তার উল্লেখ করলেন মেজবৌ: "মেমেরা হলে কাছারিতে গিয়ে ত্যাগপত্র লিখে দিত।"

আমরা তদানীন্তন নারীসমাজের গতি-বিধির পরিচয় পেলাম।

খ্রীষ্টানদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন, তারপর মার খেয়ে টলতে টলতে অবিনাশ রাতে বাড়ী ফিরে সতী সাধ্বী স্ত্রীকে বলছে, "তুই নাচতে জানিস নে, গাইতে জানিস নে, একটু মদ তাও পেটে বরদাস্ত হবে না, পেঁয়াজের গন্ধে তোর বমি হয়। তোরে নিয়ে কোথায় বেড়াব?" জ্বরগ্রস্ত পুত্রকে মদ খাইয়ে ভাল করতে যাচ্ছে অবিনাশ। ঈশ্বর নেই বোঝাচ্ছে স্ত্রীকে! ঈশ্বরের কাছে সতীর প্রার্থনার উত্তরে অবিনাশ বলছে: "হাঁরে, তুই ভগবানকে ডাকছিস্ কি? তিনি যে মরেছেন। আহা! বিলাত থেকে সেদিন তার এসেছে তিনি নেই। বয়সও ঢের হয়েছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা সব তাঁর শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করে চুকেছে।"

তদানীন্তন কালে পাশ্চাত্য-জড়দর্শন ও বিজ্ঞানের কতদূর প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় সমাজের উপর তার একটু নমুনা: "আজ ভাই, ল্যাবরেটরিতে এক মজার কথা শুনলেম —প্রাণকান্তবাবু বললেন, কুকুরের আত্মা ও মানুষের আত্মা একই জিনিস। তিনি একটা জ্যান্ত কুকুর কেটে দেখেছেন। সেদিন ডঃ ডক্মিন গোটা কতক পরমাণু নিয়ে কার্বন আর ফস-ফরাসের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে অ্যালকহল দিয়ে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য মনোবৃত্তিসকল তৈয়ের করছিলেন যে, সকলে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলেম।···সায়েন্সের সঙ্গে হাসি তামাসা চলে না। আমাদের সিলি সাহেব বিলাত থেকে ফিরে আসবার সময় আফ্রিকা দেশের একটি নীল বাঁদর এনেছেন। সে হাসে মানুষের মত। সাহেব বলেছেন বাঁদরের ভেতর থেকে মানুষ বের করে দেখাবেন।···এ যে সায়েন্সের কথা গা—আদেশও নয়, ভক্তিপ্রলাপও নয়। মরাকাটার ঘরে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, মানুষের শরীরের মধ্যে আত্মা-টাত্মা কিছুই নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে সব দেখা হয়েছে। সিলি সাহেব আরও বলেছেন, ঠিক মাল-মসলার

যোগাড় হলে এবং মাপযোক বুঝতে পারলে তিনি মানুষ তৈয়ের করে তুলতে পারবেন।"

পাঠক, ভুলে যাবেন না—জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এ সব অপূর্ব বিজ্ঞানের কথা বিভিন্ন বেশ-ধারী অভিনেতার মুখ থেকে শুনছিলেন। এ সব শুনে তিনি কী ভাবছিলেন—বলুন তো ???

বসুপরিবারে দুর্দিনের কালমেঘ ঘনিয়ে এল। বিপদ আসে দল বেঁধে। কনিষ্ঠপুত্র হরিসুখ ইংরেজ সরকারের শিক্ষা ও আবগারি পলিসির সমালোচনা করায় এবং স্কুলে ধর্মা-লোচনা করায় চাকরী হারালেন। মেজপুত্র রাধামাধব নাস্তিক সাহেবঘেঁসা হয়ে এবং "নেটিভ বড় পাজি জাত, এদেশের কিছুই ভাল নয়, আমার ইচ্ছে হয় ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করি"—এ সব কথা বলে বেড়াতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র অবিনাশ জালিয়াতী ও খুনী মামলায় জড়িত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হলেন। কর্তা নরহরি বসু পুত্রদের ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে সস্ত্রীক কাশীবাসী হলেন।

আন্দামানে অবিনাশের অনুতাপ এল। জন্মজন্মান্তরের মনের গ্লানি অনুতাপ-অশ্রুতে ধুয়ে মুছে যায়। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার এবং তার সদুপদেশে অবহেলা, পুত্র-কন্যার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, নিজের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ—সব মিলে অবিনাশকে দাহ করতে লাগল। প্রচণ্ড দুঃখের পর বিধাতার কিঞ্চিৎ করুণা বর্ষিত হল অবিনাশের জীবনে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে অবিনাশ পেলেন মুক্তি। ফিরলেন দেশে। স্ত্রী চারুশীলা ও কনিষ্ঠ সহোদর শত দুঃখের মধ্যেও ধর্মের অচঞ্চল দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ধর্মই ধার্মিককে রক্ষা করে—একথা খুবই সত্য।

অবিনাশ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সদ্‌গুরুর অন্বেষণে বেরুলেন। অবশেষে নীলগিরি উপত্যকায় যোগিবর স্বামী অভেদানন্দের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে নিলেন। পাঠক মনে রাখবেন—এই অভেদানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বামী বিবেকানন্দ (তখনকার নরেন্দ্রনাথ) এবং পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন কেশব সেন।

নব বৃন্দাবন নাটকে স্বামীজীর অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সমন্বয়মার্গ' গ্রন্থের ১৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, তিনি "একবার ঋত্বিকের অংশ অভিনয় করেছিলেন।" শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন যে, তিনি সঠিক বলতে পারেন না, স্বামীজী কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আরও জানালেন যে, লোকমুখে তিনি শুনেছেন যে, স্বামীজী বিবেকের ভূমিকায় অভিনয় করে-ছিলেন। কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'যুগ-নায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "নরেন্দ্রনাথ কেশবের সমাজে যখন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-প্রণীত 'নব বৃন্দাবন' নাটক অভিনীত হয়, তখন আমন্ত্রণ পাইয়া অভেদানন্দের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।...গায়কের অভাব মিটাইবার জন্য সুগায়ক নরেন্দ্রনাথ নব বিধানের অনুরোধে ঐ যোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'ও এই অভিনয়ের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দের কথা পরে উল্লেখ করব।

যাহোক, স্বামী অভেদানন্দ অধ্যাত্মপিপাসু দম্পতীকে ধর্মোপদেশ দিয়ে বললেন, "পাহাড়ী-বাবার নিকট তোমরা নব বিধানের বীজমন্ত্র পাবে।" নাট্যকার অভেদানন্দের মুখে বাইবেল, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের কথা লাগিয়ে একটা সমন্বয়ের ইঙ্গিত করেছেন। পরে শিষ্য-শিষ্যাকে আশীর্বাদ করে

বলছেন: "ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, মহম্মদ, শাক্যসিংহ, শংকরাচার্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পল, সক্রেটিস প্রভৃতি ভক্তসন্তানগণকে কোলে নিয়ে মা আনন্দময়ী জগদীশ্বরী তোমার হৃদয়মন্দিরে দর্শন দিবেন। এই তাঁর নবীন মূর্তি।"

অবিনাশ ও চারুশীলাকে গৃহস্থাশ্রমে সদ্ভাবে জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে অভেদানন্দ বললেন, "আমি সম্প্রতি মেকা, জেরুসালেম তীর্থে গিয়েছিলাম। এরপর বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকব।" তারপর গুহা থেকে উত্থিত হলেন পাহাড়ীবাবা। তিনি দীক্ষা ও উপদেশ দিয়ে বললেন: "তোমরা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ কর। একহৃদয় হয়ে সংসারমধ্যে দ্বিজধর্ম পালন করবে। সুখ-সম্পদে, দুঃখ-বিপদে 'সচ্চিদানন্দ' এই মহামন্ত্র জপ করবে। তোমাদের বিপদ-পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। সংসারের দুর্গম পথে বড় ভয়। সাবধান! বীজমন্ত্র ভুলো না।"

এখন কেশববাবুর নব বিধানের দু'চার কথা না বললে নাটকখানি কুহেলিকার মধ্যে থেকে যাবে। অভেদানন্দের কথাতে রয়েছে ঈশা-মুসা থেকে শঙ্কর-সক্রেটিস এবং অদ্ভুত তীর্থপরিক্রমাতেও রয়েছে মহাসমন্বয়ের কথা। তদানীন্তন ব্রাহ্ম আন্দোলনে প্রাধান্য পেয়েছিল—পাশ্চাত্যের যুক্তিসম্মত বৌদ্ধিক ধর্মের সঙ্গে ভারতের সগুণ নিরাকার ঈশ্বর; নৈতিকতা, নিয়মিত স্বাধ্যায়, ভজন-প্রার্থনা; পুরোহিতকুল, গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছেদ; প্রতিমাপূজাবর্জন, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, স্ত্রীস্বাধীনতা, জাতিবিভাগের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহের প্রচলন ইত্যাদি। ধর্মের সঙ্গে সমাজসংস্কারের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ। এই নাটকে বিধবা-বিবাহের একটা সুন্দর মন্তব্য আছে: "বৃথা আন্দোলন করে কি হবে?" এ কথার উত্তরে পাড়ার নরকান্ত ডাক্তার বলছেন, "কেন? এই তো সেদিন আমার বিধবা জেঠাইমার বে দিলাম। সমাজ-সংস্কারের কাজ মন্দ কি চলছে?" এই নাটকে দেশী দেবতাদের পরিবর্তে মহাযোগী ঈশার উল্লেখের ছড়াছড়ি দেখা যায়। উপরন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্ট ভাবে রয়েছে। আর আছে ব্রাহ্মদের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্থার কথা—যেমন 'সুরাপান-নিবারণী সভা', 'আশালতা' প্রভৃতি।

খ্রীষ্টানদের 'পাপবাদ'টিও এ নাটকে বাদ যায়নি। গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমনকালে অবিনাশ ও চারুশীলা বনের ভিতর পাপপুরুষ 'কর্তৃক প্রলুব্ধ হন। অবশেষে স্বর্গীয় দূতরূপে বিবেক-বৈরাগ্যের উপস্থিতি ও উপদেশে তাঁরা রক্ষা পান। বিবেকের উক্তি: "কে আছে হরিভক্তের প্রাণসংহার করতে পারে? সুবোধ ভক্ত, তোমাকে মহর্ষি ঈশা এই দুর্জয় অস্ত্র দান করলেন। এর অব্যর্থ সন্ধানে যুগে যুগে মহাযুদ্ধে অসংখ্য রিপুরা আহত হয়েছে। অতএব বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে এই ধনু ধারণ কর, সমস্ত পৃথিবী তোমার বশীভূত হবে।" নাটকের এ দৃশ্যটা স্মরণ করিয়ে দেয়, জন বুনিয়ানের বিখ্যাত রূপক-গ্রন্থ 'Pilgrim's Progress'কে।

কুঞ্জবাবু ঐ পাপপুরুষের অভিনয় করেন। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন: "এমন কি যারা সৎ, অভিনয়েও তাদের মিথ্যাকথা বা কাজ ভাল নয়। কেশব সেনের ওখানে 'নব বৃন্দাবন' দেখতে গিছিলাম। কি একটা আনলে ক্রস! একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করছে। ভক্তের পক্ষে ওসব সাজাও ভাল নয়। ওসব বিষয়ে মন অনেকক্ষণ

ফেলে রাখায় দোষ হয়। মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।" (কথামৃত, ১ম ভাগ, ১০৪ পৃ:)।

চরম দুঃখের পর মিলনসুখ বেশী অনুভূত হয়। রোগশয্যায় বা মৃত্যুকালেই মিলনের ঘটা বেশি দেখা যায়। বসুপরিবারে দীর্ঘ তমিস্রার পর অরুণোদয় হল। ধার্মিক হরি-সুখকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নব বিধানের পরিকল্পিত 'সুখী পরিবার'। মেজপুত্র সাহেব-ঘেঁসা রাখালমাধব কোন একটি হোটেলে ঢুকে একজন ইংরেজের গুঁতো খেয়ে বিদেশীয়ানা ছেড়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ধর্মীয় জীবনে ফিরে এল এবং খোল বাজিয়ে কীর্তন শুরু করল।

সত্যি বলতে কি, প্রতিবেশীরা বসুপরিবারের ঐ নবীন ব্রাহ্ম মতটা যে কী, ধরতে পারত না। "মতটা যে কি, কিছুই বোঝবার জো নেই। ব্রহ্মও বলছে, হরি হরিও কচ্চে, আবার মা বলেও ডাকছে। কখনও দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, ঈশা, মুসা, নিতাই, গৌর, মহম্মদ, শুক, শিব, ধ্রুব, প্রহ্লাদ—যা মুখে আসে তাই বলে।" অপর প্রতিবেশী: "স্বদেশ-বিদেশের সমুদায় ধর্মশাস্ত্র, সাধু, সত্য, সুনিয়ম-সদাচার—সমস্তকে দেশীয়ভাবে হিন্দু আকারে পরিণত করছে। বেশ চুম্বুক ধর্ম বটে!" অপর প্রতিবেশী: "ওহে, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। ও একরকম ঘাসিরামের গর্মাগরম চ্যানাচুর।"

ওদিকে পাপপুরুষের কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অবিনাশ ও চারুশীলা নিজেদের বাড়ী রামকৃষ্ণপুর ফিরে এলেন। তারপর তিন ভাই একত্র বধূদের নিয়ে পিতামাতার অন্বেষণে বেরুলেন। এখান থেকেই নাটকটি মিলনান্ত হতে শুরু করেছে। বসুপরিবারের গৃহস্বামী নরহরি বসু ও তাঁর স্ত্রী অলকাসুন্দরী যথাক্রমে চরণদাস বৈরাগী ও রাইবিলাসিনী নাম ধরে বৃন্দাবনধামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এখানে স্বামী অভেদানন্দের আশ্রমে আপন পুত্র ও পুত্রবধূদের সঙ্গে দৈবাৎ তাঁদের সাক্ষাৎ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের যখন খুব দহরম-মহরম—নব বৃন্দাবন সেই কালে লেখা। বৃন্দাবন দৃশ্যে নাট্যকার অবিনাশের সমাধি দেখিয়েছেন। অবশ্য সমাধি কথাটার প্রয়োগ না করে তিনি বৈষ্ণবী ভাষায় 'দশাপ্রাপ্তি এবং দর্শনানন্দের উচ্ছ্বাস' বলে উল্লেখ করেছিল। "আহা! মুখের কি শোভাই হয়েছে! নয়নদ্বয় স্থির অথচ প্রেমনীরে ঢলঢল, শরীরে পুলক যেন কদম্বাকৃতি। ললাটে পূর্ণচন্দ্রের উদয়।" এরূপ হুবহু জীবন্ত বর্ণনাদৃষ্টে মনে হয় নাট্যকার অবশ্যই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধিকে ওখানে রূপ দিয়েছেন।

নব বিধানের প্রভাবে দুঃখী পরিবার সুখী পরিবারে পরিণত হল। স্বামী অভেদানন্দ ঐ পরিবারকে যুগধর্মলীলার মাহাত্ম্য প্রচার করতে নির্দেশ দিলেন। গেরুয়াধারী সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী অভেদানন্দের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথকে কেমন মানিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দ: "ব্রাহ্মসমাজে নাটক হয়েছিল। তাতে স্বামীজী সাধু সেজেছিল। ঠাকুর সেই নাটক দেখতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী যখন সাধু সেজে প্লে করতে এল, ঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীকে ঐ বেশেই নেমে আসবার জন্য বলতে লাগলেন। স্বামীজী ইতস্তত: করছে দেখে কেশব বাবু বললেন, 'উনি যখন বলছেন, নেমে এস না।' তারপর কাছে এলে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে স্বামীজীর হাত ধরে

বললেন—'এই ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে।" (সৎকথা, পৃঃ ১১৪)

প্রথম সংস্করণে নব বৃন্দাবনে হাল্কাভাব ঢোকেনি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বাজিকর চোবেজীর দ্বারা নব বিধানের ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রকাশ দেখাতে গিয়ে নাট্যকার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। বৃন্দাবনধামে সুখী পরিবার শুনলেন বাজিকরের ডাক: লাগ লাগ ভেল্কী লাগ। লাগ ভাঙ্গা ধর্ম জোড়া লাগ। নগরবাসী জাগ জাগ, ভেদাভেদ দূরে ভাগ। হরি সচ্চিদানন্দকী খেলা, নব বৃন্দাবনকী মেলা।

ম্যাজিসিয়ান চোবেজী সকলের অনুরোধে নব বিধানের অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাতে শুরু করলেন। এ বাজি ভোজবাজি নয়। সর্ব-বস্তুতে ব্রহ্ম ও ধর্মসমন্বয়—এই ছিল চোবেজীর ইন্দ্রজালের বিষয়বস্তু। চোবেজী প্রথমে জড় কলাগাছের পাতায় হরিনাম দেখালেন। তারপর উপস্থিত মানুষের গায়ে হরিনাম দেখালেন। শুধু নামে তৃপ্ত না হয়ে কলাগাছ থেকে হরিপ্রেম-রস বের করে সকলকে আস্বাদন করালেন। বসুপরিবারের সঙ্গে বসে স্বামী অভেদানন্দও ঐ ইন্দ্রজাল দেখছিলেন।

এরপর চোবেজী ধর্মসমন্বয় শুরু করেন: এই দেখুন, কত রঙের কাঁচ। লাল নীল সাদা সবুজ। এক এক ধর্মের এক এক রঙ। কিন্তু সকলি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন! এই নব বিধানের সুতা দিবামাত্র সকলি একত্র বদ্ধ হল। এই দেখুন। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে লাগল।

চোবেজী শুরু করলেন: এই দেখুন—বেদ, বাইবেল, কোরান ও ললিতবিস্তর। এদের মধ্যে বড়ই বিরোধ। কিছুতেই মিল হয় না, কিন্তু নব বিধানের ঐন্দ্রজালিক বাক্স মধ্যে রাখামাত্র সংযুক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে চারখানা গ্রন্থ এক হয়ে গেল।

আবার খেলা শুরু হল: আর একটা তামাসা দেখুন। হিন্দুদের ওঁকার, খ্রীষ্টানদের ক্রুশ, মুসলমানদের চন্দ্রাংশ, শৈবদের ত্রিশূল, বৈষ্ণবদের খুন্তি। এরা কি কখনও মিলেছে, না মিলতে পারে? কিন্তু নব বিধানের সম্মিলনী শক্তির কাছে এরা হার মেনেছে। চোবেজী ম্যাজিকের সাহায্যে এক করে দিলেন; আর কেউ টেনে খুলতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়তে লাগল। তারপর চোবেজী ইংরেজদের ফ্লুট, হিন্দুর খোল, মুসলমানের সারেঙ্গ, বাঁশী, বেহালা প্রভৃতির সুর এক করে ব্রহ্মধ্বনিতে মিশিয়ে দিলেন।

এক মৃত কপোতের কাহিনী দিয়ে ইন্দ্রজাল শেষ হল। খ্রীষ্টানী ঢঙে উচ্চারিত হল 'ঐ স্বর্গরাজ্য আসছে।' চোবেজী একটা মৃত কপোতের প্রাণদান করে আকাশে ছেড়ে দিলেন। উড়ন্ত পক্ষীর গলায় দেখা গেল একটা পত্র। তাতে লেখা আছে: "নব বিধান সমুদায় ধর্মের সমন্বয় এবং পৃথিবীতে শান্তিধাম করবে।" ম্যাজিক শেষ। তারপর 'নব বৃন্দাবন' কবিতাপাঠান্তর নব বিধানের বিজয়-নিশান চতুর্দিকে সমুদায় ধর্মশাস্ত্র এবং সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়ে নাটকের উপর যবনিকা পড়ল।

নাটকের ইতিবৃত্ত বিবৃত করবার কালে আমরা বেশী কথাবার্তা বলার সুযোগ নেইনি। কারণ তাতে পাঠকের রসভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল। এবার নব বৃন্দাবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে দুচার কথা বলব।

নাটক দেখার সময় পাশে বসে কেউ যদি গল্প করে তবে অন্যান্য দর্শক বিরক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণও বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায়: "একজন ডেপুটি আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়ীতে (নব বৃন্দাবন) নাটক দেখতে গিছলো। আমিও গিছলাম; আমার সঙ্গে রাখাল, আরও কেউ কেউ গিছলো। নাটক শুনবার জন্য আমি যেখানে বসেছি তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটু উঠে গিছলো। ডেপুটি এসে ঐখানে বসলো। ···যতক্ষণ নাটক হলো ডেপুটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা।···একবারও কি থিয়েটার দেখলে না!" কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮১

পূর্বে আমরা ইঙ্গিত করেছি ব্রাহ্মমতগুলি 'নব বৃন্দাবনে' কি করে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিবৃত হয়েছে। এবার নব বিধানের আর একটু ইতিহাস অনাবৃত করছি। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবের সাক্ষাৎ ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে। কোচবিহারের রাজবাড়ীতে কেশবের কন্যার বিবাহ হয় ১৮৭৮ খৃঃ-এর ৬ই মার্চ। ঐ বিবাহ সমাজের নিয়মমাফিক না হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 'লীলা-প্রসঙ্গ'কার বলেন: "কেশববাবু ঠাকুরের 'সর্বধর্ম সত্য—যত মত তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসার-ভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নব বিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়—শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমত-সম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। ·· দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক (কেশববাবুকে) 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।" লী. প্র. ২য় ভাগ, পৃঃ ৪০৪

আমরা ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটিত করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ। সুতরাং ঐভাব অবলম্বনে রচিত নাটক তাঁর তো ভাল লাগবার কথা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কথাবার্তায় যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয়, তাঁর ঐ নাটকখানি তত ভাল লাগেনি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ফিরে যাই: "কেশব সাধু সেজে শান্তি জল ছড়াতে লাগলো। আমার কিন্তু ভাল লাগলো না। অভিনয় করে শান্তিজল!" (কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৪)। পাপের অভিনয়ও ঠাকুরের ভাল লাগেনি—একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার-যাত্রার অদ্ভুত সমঝদার ছিলেন। স্টারে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' দেখবার কালে বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, "আসল নকল এক দেখলুম।"

'নব বৃন্দাবন' নাটক হিসাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সেটা বড় কথা নয়। প্রকৃত বিষয় হল তার প্রয়োজনীয়তা। 'নব বৃন্দাবন' তদানীন্তন সমাজের সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েছে—একথা অনস্বীকার্য।

'নির্বাসনা হও'

শ্রীমতী সান্ত্বনা দেবী

'কি করে ভগবান লাভ হয়?'—কোনো এক মুমুক্ষু ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা একদা বলেছিলেন, "নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুনি হয়।" [শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৮৬] 'নির্বাসনা হওয়া'—কিনা বাসনাশূন্য হওয়া। শব্দের লেশমাত্র আড়ম্বর নাই, ভাষার মার-প্যাঁচ নাই, যুক্তি-তর্ক-শাস্ত্র-প্রমাণের কচকচি নাই—অর্থবোধের জন্য খুঁজতে হয় না অভিধানের পৃষ্ঠা—সর্বজন-বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় ছোট্টো একটি কথায় মুক্তিলাভের উপায়টি নির্দেশ করেছেন শ্রীশ্রীমা আর ভাবের গভীরে প্রবেশ না করে আমরাও হয়তো নিশ্চিন্ত হই—ভাবি 'মুক্তি-লাভের কি সোজা উপায়ের কথাই না বলেছেন আমাদের মা! নির্বাসনা হলেই তো হল।'

রাজরাজেশ্বরী হয়েও যিনি নিজের হাতে ঘর নিকোচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন, বাসন মাজছেন, অনন্তশক্তি-স্বরূপিণী হয়েও বাহ্যিক দৃষ্টিতে যিনি অতি সাধারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের এক গ্রাম্যবধূ মাত্র, তাঁর পক্ষে 'নির্বাসনা' কথাটি অতি সহজ হলেও আমাদের পক্ষে এই নির্দেশটি পালন করা সহজসাধ্য তো নয়ই বরং যথেষ্ট আয়াসসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না।

'মা' তাঁর সহজ সরল ভাষায় মুক্তিলাভের যে উপায়টি নির্দেশ করেছেন—শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করলেও আমরা বারংবার সেই কথাটিরই উল্লেখ দেখতে পাই—বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্ বাসনাক্ষয়ঃ, [মুক্তিক উপনিষদ্, ৬৬ শ্লোক]। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন—"কি জান, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, ধর্মের সূক্ষ্ম গতি, ছুঁচে সুতা পরাচ্ছ—কিন্তু সুতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতর প্রবেশ করবে না।······কামনা থাকতে যত সাধন কর না কেন সিদ্ধিলাভ হয় না।" আবার বলেছেন—"বাসনা থাকলেই শরীর-ধারণ হয়। বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে ত!" ('কথামৃত', তৃতীয় ভাগ)

'বাসনাক্ষয় না হলে মুক্তি অসম্ভব'—এ কথাটি সর্বশাস্ত্রসম্মত এবং অবিসংবাদিত ভাবে সত্য বটে, কিন্তু বাসনার স্বরূপ কি অর্থাৎ এক কথায় বাসনা কাকে বলে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে 'নির্বাসনা' বা বাসনাক্ষয় কথাটিই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কেন না কোনো বস্তুর স্বরূপ অবগত না হলে সেই বস্তুটির বিনাশসাধন করা অসম্ভব। শত্রুর সঙ্গে যার কোনো পরিচয় নাই—শত্রুর গতি-প্রকৃতি-অবস্থান সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নাই সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কেমন করে?···

সাধারণভাবে 'বাসনা' বলতে আমরা আমাদের স্থূলকামনাগুলিকেই বুঝি, যেমন—যশ, বিত্ত, পুত্রাদি লাভের ইচ্ছা ইত্যাদি।

বশিষ্ঠদেব বাসনার স্বরূপ নির্দেশ করে বলেছেন—

"দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তং পূর্বাপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্তিতা॥"

[যোগবাশিষ্ঠ, উপশম প্রকরণ, ৯১।২৯
(মুক্তিকোপনিষদ্-৫৫)]

অর্থাৎ পূর্বাপর বিচার না করে পূর্বজন্মার্জিত দৃঢ়সংস্কারের বশবর্তী হয়ে লোকে যে দেহ ইত্যাদিকে 'আমি' বলে মনে করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে সেইটিকেই বলা হয় 'বাসনা'। যোগবাশিষ্ঠের টীকাকার বলেন—"বাসয়তি ইতি বাসনা", 'বাস' শব্দটির অর্থ আবরণ বা আচ্ছাদন, 'বাসয়তি' অর্থাৎ যা বস্ত্রের ন্যায় আবৃত বা আচ্ছাদিত করে রাখে। 'বিচারশূন্য দেহাদিভাব' আত্মার স্বরূপকে আবৃত করে রাখে বলেই একে বাসনা বলা হয়।

অপরিসীম শক্তিশালী এই বাসনা, শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিতেই পাই 'বাসনা থেকেই সব।…বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ। যেমন বিন্দু-পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই।' মাদক-দ্রব্যের প্রভাবে মত্ত ব্যক্তির যেমন যথার্থ বিচার-শক্তি বিলুপ্ত হয়, 'বাসনাবিবশীকৃতঃ' পুরুষও তেমনই বাসনা-মদে মত্ত হয়ে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর যথাযথ বিচার-শক্তি না থাকায় বাসনামত্ত পুরুষ যখন বিচার করার চেষ্টা করে তখনও যথার্থ জ্ঞানলাভে অসমর্থ হয়ে "সর্বং সদ্বস্তিতি বিমুহ্যতি" অর্থাৎ যা কিছু আছে সবই সৎ অতএব উৎকৃষ্ট ব'লে নশ্বর দ্রব্যাদিতেই আসক্ত হয় এবং তার ফলস্বরূপ মোহগ্রস্ত মানব 'গতাগতং কামকামা লভন্তে' অর্থাৎ জন্মমরণরূপ গতাগতিই লাভ করে।

স্থূলসূক্ষ্মভেদে এই বাসনা আবার দ্বিবিধ—শুদ্ধ বাসনা ও মলিন বাসনা। পুনর্জন্মনাশের হেতু, জ্ঞাতব্য সৎ বস্তু বা স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের যে ইচ্ছা তাকে অর্থাৎ মুক্তিকামনাকে বলা যায় শুদ্ধ বাসনা। পুনর্জন্মের কারণ যে বাসনা—তাই মলিন বাসনা। "অজ্ঞান-সুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী। পুনর্জন্মকারী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ ॥" [যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ—৩।১২, মুক্তিক উপনিষদ্, ৬০]

মলিন বাসনা কিরূপ?—'অজ্ঞানসুঘনাকৃতিঃ' অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা বিশেষরূপে ঘনীভূত আকৃতি। অজ্ঞান কি? জড় ও চেতনের—দেহ এবং আত্মার ভেদজ্ঞানের অভাবই হল অজ্ঞান। জড় এবং চৈতন্যের এই তাদাত্ম্যাধ্যাস হেতুই 'আমি ও আমার'-রূপ অহঙ্কার জন্মে আবার অজ্ঞানজাত এই মিথ্যা-অহঙ্কার হেতু কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধি অনাত্মা অচেতন জড় দেহে আরোপিত হয় এবং একান্তরূপে সৎ, নিত্য বর্তমান, চেতন, আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপ বিস্মৃত হওয়ায় দেহকেই আত্মা বলে ভ্রম হয়। মলিন বাসনা শুধু যে অজ্ঞানের দ্বারা আবরিত তা নয়—বহু জন্মের সংস্কারের ফলে অজ্ঞানের দ্বারা ঘনীভূত। বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকারও বলেছেন যে, বাসনাবীজ অঙ্কুরিত হবার পক্ষে অজ্ঞানই প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। নিবিড় অহংকার তার উপসেচক, যেমন ক্ষেত্র ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না তেমনই আবার জলসেচনাদি কর্মের জন্য ক্ষেত্রিক না থাকলে বীজ হতে বৃক্ষাদির উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। তাই মলিন বাসনার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে কেবল-মাত্র 'অজ্ঞানসুঘনাকারা' বলা হয়নি, 'ঘনাহং-কারশালিনী'ও বলা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রিকের ন্যায় অজ্ঞান এবং অহংকার পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধযুক্ত। অজ্ঞান থেকেই অহংকার জন্মে, আবার অহংকারের ফলেই তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় না।

অজ্ঞান দ্বারা ঘনীভূত-আকৃতি-নিবিড় অহঙ্কারযুক্ত এই মলিন বাসনা স্বীয় স্বভাব-বশতই জ্ঞানের অত্যন্ত বিরোধী হওয়ায় পুন-

র্জন্মের কারণ হয়। মলিন বাসনাকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আসুরীসম্পদরূপে বর্ণনা করে এটিই যে পুনর্জন্মের হেতু তা বলেছেন—"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি, মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।" [গীতা, ১৬।২০]

এই মলিন বাসনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) লোকবাসনা, (২) শাস্ত্রবাসনা ও (৩) দেহবাসনা। আমরা প্রথমতঃ 'লোকবাসনার' কথাই আলোচনা করতে পারি। 'লোকবাসনা' নেই—এমন ব্যক্তি এ সংসারে বিরল। লোকবাসনা কি? না,—মান-যশাদির আকাঙ্ক্ষা। জগতে যশ কে না চায়? লোকে যেন আমার সকল প্রকার কার্যের, সকল আচরণের প্রশংসা করে, আমি যেন কারও নিন্দাভাজন না হই—এরূপ প্রবল ইচ্ছার নাম 'লোকবাসনা'।

এই 'লোকবাসনা' হেতু লোকে সৎ কার্যাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলে আপাতঃ দৃষ্টিতে লোকবাসনাকে শুভকরী বলেই আমাদের মনে হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, এ বাসনার পূর্তি কোন দিন সম্ভব নয়; তাই এ বাসনা শুধুমাত্র 'পুনর্জন্মকারী' মলিন বাসনা।

আপাতঃ শুভবেশধারী এই বাসনা পূরণ করা মানুষের পক্ষে শুধু যে দুঃসাধ্য তা' নয়, অসম্ভব। ইতিহাস, পুরাণ, মহাপুরুষ-জীবনী প্রভৃতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তেই আমরা পৌঁছুতে বাধ্য হই। কেন না তা' না হলে অপাপবিদ্ধা পবিত্রতা-স্বরূপিণী রামগতপ্রাণা স্বয়ং সীতাদেবীকে লোকাপবাদ সহ্য করতে হত না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রমুখ অবতারপুরুষগণকেও দেহধারণ-কালে কত না লোকনিন্দা সহ্য করতে হয়েছে! শুধু নাই নয়—অবতারপুরুষগণের একজনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভাবপোষণ হেতু অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন—এরূপ ব্যক্তি এখনও জগতে বিরলদৃষ্ট নন। 'অখণ্ডের ঘর হতে যার আগমন'—'সপ্তর্ষির একজন' শিবসদৃশ স্বামীজীর চরিত্রেও মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করতে কুণ্ঠিত হয়নি স্বার্থপরায়ণ ঈর্ষাতুর ইহসর্বস্ব অজ্ঞ মানব

বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির মনের গঠন সমান নয় এবং কার্যকালে প্রত্যেকে তার নিজের বিশেষ মানসিক গঠনানুযায়ী অপরের কাজের বিচার করে। শাস্ত্র তাই বলেছেন—"বিদ্যতে ন খলু উপায়ঃ সর্বলোকপরিতোষকরো যঃ।" সুতরাং 'সর্বজনপ্রশংসিত আচরণ' করার বাসনা অতি উত্তম বলে মনে হলেও এই বাসনার নিবৃত্তি কখনও সম্ভব না হওয়ায় তা' কেবলমাত্র দুঃখপ্রদ পুনর্জন্মেরই কারণ হয়ে থাকে। এই লোকবাসনার নিবৃত্তির উপায় হল—বিবেক-বিচার আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'লোক না পোক' উপদেশটির অনুধ্যান। গীতামুখেও শ্রীভগবান যোগীর লক্ষণ নির্দেশ-কালে বারংবার 'তুল্যনিন্দাস্তুতি'র কথা বলেছেন। সমনিন্দাস্তুতি কি না লোকবাসনা-পরিত্যাগ।

(২) দেহবাসনা—'অচেতন-অনিত্য জড় দেহই চৈতন্যময় সৎস্বরূপ আত্মা'—এই ভ্রান্ত ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ ও তদনুযায়ী কাজ করার ফলেই হয় 'দেহবাসনা'র উদ্ভব।

দেহবাসনাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(ক) দেহাত্মবুদ্ধি, (খ) গুণাধান ভ্রম (গ) দোষাপনয়ন ভ্রম।

(ক) দেহাত্মবুদ্ধি—অস্থি-চর্ম-শোণিত-মেদ-মজ্জাদির সমবায়ে গঠিত এই জড়দেহ অন্যান্য

জড় পদার্থাদির ন্যায় অচেতন। এই দেহের নিজস্ব কোন চৈতন্য নাই—চৈতন্যস্বরূপ আত্মার চৈতন্যেই দেহকে 'চেতনবৎ' মনে হয়, যেমন চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই, সূর্য-কিরণ চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হয় এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু আমরা সেই আলোকেই 'চাঁদের আলো' বলে মনে করি। তেমনই যথার্থ জ্ঞানের অভাবহেতু অর্থাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা সাধারণ মানুষ এই দেহকেই চেতন আত্মা বলে মনে করে ক্ষণিক আনন্দের জন্য, দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য কত না প্রয়াস করি! অনিত্য-অচেতন জড়দেহে আসক্তির ফলে চিত্তে অহঙ্কার, মমতা, দম্ভ, দর্প-অভিমানাদি আসুর সম্পদের উদয় হয়। এই আসুরী সম্পদই পুনর্জন্মের কারণ। সুতরাং পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আপাততঃ দৈহিক সুখসম্ভোগ সম্ভব হলেও পরিণামে তা' অশেষক্লেশপ্রদ পুনর্জন্মের কারণ হওয়ায় এ বাসনা যে অতি মলিন বাসনা তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই।

(গ) গুণাধান ভ্রম যে-সমস্ত দৈহিক গুণাবলী লোকসমাজে আদৃত, সেগুলি লাভ করার চেষ্টাকে বলা হয় গুণাধান ভ্রম। এই ভ্রমটিও দেহ-বাসনার অন্তর্গত, কেন না দেহে আত্মবুদ্ধি হেতুই মানুষ প্রশংসাযোগ্য শারীরিক গুণাবলীর অধিকারী হতে চেষ্টা করে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই গুণাধান ভ্রমকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) লৌকিক গুণাধান ও (খ) শাস্ত্রীয় গুণাধান।

(ক) লৌকিক গুণাধান—সুকণ্ঠ গায়ক বা পাঠক সর্বত্র সমাদৃত হন। সেজন্য সুকণ্ঠ-লাভের ইচ্ছায় অনেকে মরিচভক্ষণ, ঔষধ-সেবনাদি নানা উপায় অবলম্বন করেন। কমনীয় সুগঠিত দেহলাভের জন্য লোকে নানা-বিধ পুষ্টিকর দ্রব্যাদি সেবন করে, বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করে, শরীর-চর্চায় অমূল্য মানব-জীবনের প্রায় সকল সময়ই ব্যয় করে।

কিন্তু দেখা যায় বিশেষ প্রযত্ন করা সত্ত্বেও সকলেই সুকণ্ঠের অথবা কমনীয় ত্বকের বা সুগঠিত শরীরের অধিকারী হতে পারে না। আবার কেউ কেউ সাময়িকভাবে দৈহিক পুষ্টি-লাবণ্যাদি সম্পাদনে সমর্থ হলেও নানা কারণেই অর্জিত লাবণ্য, স্বাস্থ্যাদির ক্ষয় হতে পারে। সুকণ্ঠ গায়কেরও স্বরভঙ্গ হয়, লাবণ্যময়ী সুন্দরী নারীও জরা-ব্যাধি-শোকের কবলে প'ড়ে হারান তাঁর রূপ-লাবণ্য, আধি-ব্যাধি-জরা জীর্ণ করে সুগঠিত তনুকে—আবার কালবশে মানুষ হয় আয়ুহীন। প্রাণহীন দেহ পরিগণিত হয় অশুচি বলে। দৈহিক রূপ-গুণ-স্বাস্থ্য কোনটিরই আর সমাদর থাকে না তখন।

বিচার করলে দেখি বাস্তবিক পক্ষে দৈহিক গুণাধানের প্রয়াস কার্যে পরিণত করা অসম্ভব —এ প্রয়াস কেবল দেহবাসনাকেই সুদৃঢ়কারী পুনর্জন্মের কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥

(মুক্তিক উপনিষদ্, ৬৭)

(খ) গঙ্গাস্নান, যাগ-যজ্ঞ ব্রতনিয়মাদির পালন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত পুণ্য কর্মসমূহের অনুষ্ঠান সহায়ে পুনর্জন্মের প্রচেষ্টাকে বলা হয় শাস্ত্রীয় গুণাধান। লৌকিক গুণাধানের ন্যায় শাস্ত্রীয় গুণাধানও বাস্তবিক পক্ষে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কেননা প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত সকল আচার-অনুষ্ঠান বিধিমত যথাযথ পালন করা বর্তমান যুগে অসাধ্যপ্রায়। তাছাড়া শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত হওয়ায় কোন্ মতটি যে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টি ত্যাজ্য সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ

শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি পুণ্যার্জনের সহায়ক হলে তা' কখনও মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে না।

দোষাপনয়ন ভ্রম—যে-সকল দোষ নিন্দনীয় বলে ইহলোকে প্রসিদ্ধ সেগুলি দূর করার ইচ্ছাই হল দোষাপনয়ন বাসনা। প্রকৃতিভেদে এই বাসনা আবার দ্বিবিধ—লৌকিক ও বৈদিক। তাম্বুলাদি চর্বণ, ঔষধ বা সুগন্ধী-অনুলেপনাদির ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা দেহের শুচিতা আনয়নের প্রচেষ্টা দ্বারা লৌকিক দোষাপনয়ন বাসনা এবং আচমন, শৌচাদির দ্বারা বৈদিক দোষাপনয়ন বাসনা পূরণ করার প্রয়াস ইহজগতে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু যথাসাধ্য প্রযত্ন করা হলেও প্রকৃত-পক্ষে দোষাপনয়ন বাসনা পূরণ করা অসম্ভব। অজ্ঞানতাবশতই লোকে এরূপ অলীক বাসনা করে। কেননা নবদ্বারবিশিষ্ট ঘৃণ্য শোণিত-অস্থি-মেদ-মজ্জা-শ্লেষ্মাদির সমবায়ে গঠিত মলমূত্রাদির আধার এই দেহের শৌচাদি অসম্ভব আর দেহী—যিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—তাঁর শুদ্ধিতা-সম্পাদনের কথা সূর্যকে দীপালোকে আলোকিত করার ন্যায় বাতুলের প্রলাপ মাত্র।···

প্রকৃতপক্ষে যে-দেহের পুষ্টি-সম্পাদন, অশুচিতা-নিবারণ প্রভৃতির জন্য অজ্ঞ মানবের অন্তহীন প্রয়াস—সেই দেহ স্বরূপতঃ চৈতন্যময় নিত্য বস্তু তো নয়ই বরং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, তার মত নিকৃষ্ট বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। যে পুরীষ-মূত্র-শোণিতাস্থি প্রভৃতিকে আমরা অশুচি ও ঘৃণ্য বলে মনে করি—সেই সকল অশুচি দ্রব্যের সমবায়েই এই দেহ গঠিত।

দেহই যখন অশুচি তখন সেই নিকৃষ্টতম দেহ-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বাসনাই যে অতি মলিন বাসনার মধ্যে পরিগণিত হবে তাতে আর সন্দেহ কি! সেইজন্য শাস্ত্র বারংবার বলেছেন—'সা ত্যাজ্যা সর্বযত্নেন।'

শাস্ত্রবাসনা—শাস্ত্রাদি পাঠ এবং শাস্ত্রানু-যায়ী আচারাদি পালন করার ইচ্ছার নাম 'শাস্ত্রবাসনা।' শাস্ত্রবাসনাকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পাঠব্যসন, (২) শাস্ত্র-ব্যসন, (৩) অনুষ্ঠানব্যসন।

শাস্ত্রাদি পাঠের প্রবল ইচ্ছা বা শাস্ত্রাদিতে অতি-অনুরাগেরই নামান্তর পাঠব্যসন। আপাত-দৃষ্টিতে পাঠব্যসনকে মলিন বাসনার অন্তর্গত বলে মনে হয় না—কারণ শাস্ত্রপাঠাদি তো বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করে, মনকে ঈশ্বরাভিমুখী হতে সাহায্য করে, সাধু-মহাপুরুষগণও স্বাধ্যায়ের উপদেশ দেন আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তিকে। বেদও বলেছেন—'স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদিতব্যম্।' উপরোক্ত যুক্তিগুলি সবই সত্য। শাস্ত্রাদির আলোচনা ঈশ্বরচিন্তার, মনোমল মার্জনার সহায়ক বটে কিন্তু শাস্ত্রপাঠে অত্যন্তা-নুরাগ হেতু অনেক সময় আমরা এই সহায়ক বা উপায়টিকেই উদ্দেশ্য বলে ভুল করি। ফলে শাস্ত্রপাঠাদি তখন সাধকের অনুকূল না হয়ে প্রতিকূলই হয়ে দাঁড়ায়, কেননা শাস্ত্রাদিতে পথনির্দেশ করা আছে মাত্র—নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ না করে কেবলমাত্র পথটির সম্বন্ধে যত জ্ঞানই অর্জন করি না কেন, তা কখনই আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে সাহায্য করবে না—লক্ষ্যস্থল থেকে যতদূরে আছি ততদূরেই থাকব।

'প্রথমে সব শাস্ত্রাদিপাঠ সমাপ্ত করে তারপর শাস্ত্রনির্দেশিত পথে চলব'—এরূপ চিন্তা করাও অর্থহীন। বেদাদি শাস্ত্ররাজি এত বিপুল যে, স্বল্পায়ু মানব-জীবনে এক জন্মে সর্বশাস্ত্রপাঠ শেষ করা সম্ভব নয়। ফলে এই বাসনা শুধুমাত্র পুনর্জন্মেরই কারণ হয়—যে

উদ্দেশ্যে শাস্ত্রপাঠ সেই উদ্দেশ্যটিই হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কথিত আছে—তিন জন্ম বেদাধ্যয়নে রত থেকেও ঋষি ভরদ্বাজ অধ্যয়ন সমাপ্ত করতে পারেননি - তাঁর পাঠব্যসনও বিদূরিত হয়নি। পরে তাঁর চৈতন্যোদয়ের জন্য ইন্দ্র যখন তিনটি সুবিশাল পর্বতসদৃশ পুস্তকরাশি দেখিয়ে বললেন—"এই পর্বতসমূহের প্রতিটি ধূলিকণাও বেদ', তখন দুষ্পূরণীয় বাসনার স্বরূপ বুঝতে পেরে ঋষি ভরদ্বাজ শাস্ত্রপাঠেচ্ছা ত্যাগপূর্বক সাধনায় মগ্ন হলেন। পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর জীবনেও প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন আশৈশব ব্রহ্মচারী—নিষ্ঠাবান বেদান্তবিচারপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকুমার। একদা বেদান্তাদি শাস্ত্রচর্চায় বিশেষ রত থাকায় তিনি কিছুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেতে পারেননি। শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, উপনিষদ্-বেদান্তাদি-চর্চায় রত থাকায় তিনি আর পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরে আসতে পারছেন না। কয়েকদিন পর স্বামী তুরীয়ানন্দ (তখন হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে আসামাত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর বলে উঠলেন—"তুমি নাকি খুব বেদান্ত-চর্চা করছ? তা বেদান্ত আর কি—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই তো বেদান্ত, না আর কিছু।'

সরল প্রাণস্পর্শী এই কথায় হরি মহারাজের চমক ভাঙল শাস্ত্রচর্চায় অত্যন্তাসক্তিরূপ সাধনপথের বিঘ্ন দূর হল।

(খ) শাস্ত্রব্যসন—শাস্ত্র যে আবার সর্বদাই এককথা বলছেন তা' নয়। 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্' বলেছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। সত্যই নানা মুনির নানা মত। গন্তব্যস্থল এক হলেও নানা জনে নানা পথ অনুসরণ করেছেন। মতের পার্থক্য হেতু সাংখ্য, ন্যায়, যোগ, বেদান্তাদি শাস্ত্রও বহুবিধ। অপরা এবং পরা—উভয় বিদ্যারই অসংখ্য বিভাগ রয়েছে। এই বিবিধ বিদ্যাসক্তিই হল শাস্ত্রব্যসন। স্বভাবতই এ বাসনা মলিন বাসনা, কেননা একজন মানুষের পক্ষে এককালে বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া সুদুষ্কর; এবং কোনরূপে দৈববশে নানাশাস্ত্রে পারঙ্গম হলেও সাধন ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব—"অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা।" (মুক্তিকোপনিষৎ)

(গ) শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি যথাযথভাবে পালন করবার ইচ্ছাই হল অনুষ্ঠানব্যসন। অনুষ্ঠানব্যসনও মলিন বাসনার অন্তর্ভুক্ত। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে এরূপ বাসনার কখনই নিবৃত্তি হয় না—প্রথমতঃ, বিপুলতাহেতু সকলশাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি স্বল্পায়ু মানবজীবনে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়—দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সর্বদা মতৈক্য না হওয়ায় সাধারণ লোককে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়—আবার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত শ্রদ্ধা পরিণামে শ্রদ্ধাজড়তায় পরিণত হয়। সর্বোপরি কেবলমাত্র শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কখনই মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন হতে পারে না—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ।"

এভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, লোকবাসনা দেহবাসনা ও শাস্ত্রবাসনা থাকলে মানুষ কখনই প্রকৃত জ্ঞানের—'মুক্তির' অধিকারী হতে পারে না। মুক্তিকোপনিষদ তাই বলেছেন, "লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ। দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥"

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—বাসনার স্বরূপ, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানাই তো যথেষ্ট

নয়। এই বাসনার নিবৃত্তি হয় কিরূপে? অবয়বী পদার্থেরই বিনাশ হয়। কিন্তু বাসনার তো সেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন অবয়ব আমরা অনুভব করি না, সুতরাং অবয়বহীন বাসনার 'বিনাশ' কথাটিও অর্থহীন। তদুত্তরে বলা যায় যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কেননা ব্রতাদি পালনের সময় উপবাস জাগরণাদি বিধি পালন করি অর্থাৎ সাময়িকভাবে ক্ষুধা-নিদ্রাদির ভাব ত্যাগ করি। উপবাস অর্থাৎ ভোজনেচ্ছাত্যাগ, জাগরণ অর্থাৎ নিদ্রাত্যাগ—এস্থলে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল অবয়ব না থাকা সত্ত্বেও যদি ত্যাগ সম্ভব হয় তবে 'বাসনার' ক্ষেত্রেই বা হবে না কেন? প্রথমোক্ত ব্যাপারে অন্ন-ব্যঞ্জন-শয্যাদি স্থূলবিষয় ত্যাগের ন্যায় বাসনার 'বিষয়সমূহ' ত্যাগ করা চলে। আবার ক্ষুধানিদ্রাদিত্যাগে সহায়তা করার জন্য যেমন ভজন, পাঠ, পূজাদি বিকল্প-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়, 'বিষয়-বাসনা'-ত্যাগস্থলেও তেমনি ভগবদনুরাগ, মৈত্র্যাদি অমল বাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের উপলালনের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

বশিষ্ঠদেব বাসনাক্ষয়ের ছয়টি সোপান বা ক্রমের কথা বলেছেন। তার মধ্যে প্রধান দুটি হল—(১) বিষয়-বাসনা-ত্যাগ (২) মানস-বাসনা-ত্যাগ।

বিষয়-বাসনা কিনা বিষয়-সংসর্গজনিত বাসনা। বিষয়সংসর্গহেতু জাত দম্ভ-দর্প-মমত্ব-অভিমান-অহঙ্কারাদি আসুরী সম্পদকে বিষয়-বাসনা বলতে পারি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽ-
ভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥
২য় অধ্যায়, ৬৪।৬৫

অর্থাৎ 'বিষয়-চিন্তা থেকেই বিষয়ে আসক্তি আসে, আসক্তি থেকে আসে কামনা ; কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ ; ক্রোধ থেকে জন্মায় মোহ (অবিবেক) ; মোহের পর আসে স্মৃতিবিভ্রম, তারপর ঘটে বুদ্ধিনাশ ; শেষে মানুষ একেবারে পশু হয়ে যায়'—(সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩)। বিবেক-বিচারাদি দ্বারা এই বিষয়-বাসনা ত্যাগ করতে হয়। সাধুসঙ্গ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি বিবেক-বিচার জাগ্রত করার প্রকৃষ্ট উপায়।

ভোগ্য বিষয়ের কামনা করা কালীন মনে যে অতি সূক্ষ্ম অথচ অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার জন্মে সেটিই 'মানসবাসনা' নামে প্রসিদ্ধ। মানস-বাসনা পরিত্যাগ করলে মন তার প্রধান অবলম্বন হারায়, বৃত্তিশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মন সম্পূর্ণরূপে আলম্বনহীন বা বৃত্তিশূন্য সহজে হতে পারে না। তাই মানসবাসনা-ত্যাগের সহজ উপায় হল মৈত্র্যাদি অমল বাসনা গ্রহণ। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বলা হয়েছে—"মৈত্রী-করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্' (১।৩৩)। অর্থাৎ সুখিতের প্রতি মৈত্রী, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবানের প্রতি মুদিতা, পুণ্যহীনের প্রতি ঔদাসীন্য পোষণ করলে চিত্ত প্রসন্ন থাকে।

রাগ-দ্বেষাদিহেতুই চিত্ত কলুষিত বা অপ্রসন্ন হয়। রাগ কি? সুখের প্রতি অত্যন্তাসক্তি হেতু মনে সুখলাভেচ্ছারূপ যে বৃত্তির উদয় হয় সেইটিই রাগ। আর যখন চিত্তবৃত্তি দুঃখের অনুশায়িনী হয় অর্থাৎ 'দুঃখ যেন আমাকে ভোগ করতে না হয়'—এরূপ আকার ধারণ করে তাকে বলা হয় দ্বেষ। অবিমিশ্র সুখলাভ বা সর্বদুঃখনিবারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় রাগদ্বেষাদিজনিত অপূর্ণ

বাসনা চিত্তকে কলুষিত করে। কিন্তু সুখিতের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করলে অর্থাৎ অপরে যে সুখ অনুভব করছে তা' যেন আমার নিজেরই হয়েছে ভেবে অপরের সুখে সুখী হলে সুখ-বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি বা রাগ নিবৃত্ত হয়। দুঃখবিষয়ে দ্বেষও অনুরূপভাবে নিবারণ করা যায়। আমাকে যে দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে অপরে যেন সেরূপ দুঃখ ভোগ না করে—এরূপ ভাবলে অথবা অপরের দুঃখে আন্তরিক দুঃখবোধ করলে মনে যে দয়া বা করুণার উদয় হয় তার ফলে 'দ্বেষ'ভাব দূর হয় ও রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হওয়ায় চিত্তহ্রদে তরঙ্গ ওঠে না, চিত্ত প্রসন্ন হয়। শাস্ত্র তাই বলেছেন, "শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি॥" শুভ এবং অশুভ উভয় পথেই বাসনানদী প্রবাহিত হয়। পৌরুষ-প্রযত্ন সহকারে এই বাসনা-নদীকে শুভপথে পরিচালিত করাই মানুষের কর্তব্য।

মৈত্র্যাদি অমল বাসনা সহায়ে মলিন বাসনাগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় তখন এই বাসনাকেও পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র চিন্মাত্র বাসনা নিয়ে—চৈতন্যেরই বাসনা-পরায়ণ হয়ে অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরলাভের বাসনা নিয়ে থাকতে হয়। পুনর্জন্মের বীজ-ধ্বংসকারী এই বাসনা শুদ্ধ বাসনা, এতে কোনও ক্ষতি হয় না, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলতেন, "মিষ্ট খারাপ জিনিস, অম্ল হয়, কিন্তু মিছরীতে বরং উপকার হয়; হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়"—তেমনি ভক্তি-কামনাও ঠিক কামনার মধ্যে নয়।

সর্বশেষে জীব যখন স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করে, যখন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি, তখন আর কোনো বাসনাই থাকে না, অবশ্য অবতার-পুরুষ বা ঈশ্বরকোটির কথা স্বতন্ত্র, কারুণ্য-ও প্রেমপরবশ হয়ে তাঁরা লোককল্যাণার্থে অবতীর্ণ হবার জন্য সামান্য কামনা স্বেচ্ছায় রেখে দেন। তবে সাধারণ জীবের ক্ষেত্রে মলিন বাসনা পরিত্যাগের জন্য প্রয়োজন শুদ্ধ বাসনা। পরিশেষে তাও পরিত্যাজ্য; এই দুরূহ তত্ত্বটিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম ভাষায় বলা যায় 'একটি কাঁটা দিয়ে আরেকটি কাঁটা তুলে শেষে দুটিই ফেলে দিতে হয়। জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হবে।' শুভাশুভ সকল বাসনাকে সম্পূর্ণ নিঃশেষও করতে হবে ভৃষ্ট বীজের ন্যায়, নতুবা বিন্দুমাত্র বাসনা থাকলে শরীরধারণ করতেই হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী উপদেশবাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই দুরূহ সাধনার ইঙ্গিত—"ভগবানের কাছে কোন্ জিনিসটা প্রার্থনা করতে হয়?……এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়, কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল আর মুক্তিপথের অন্তরায়।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামীজীর জন্মোৎসব

গত ২৮শে ফেব্রুআরি কলিকাতায় ১৫১ নং বিবেকানন্দ রোড-স্থিত বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক 'স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির'-এ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

সোসাইটির সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার এবং সেক্রেটারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির কার্যবিবরণী পাঠ করিবার পর স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক সমাজচিন্তার কথা আলোচনা করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন :

"বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মোৎসবের সভাপতিরূপে আমি প্রথমেই তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আপনাদের সঙ্গে একত্র হয়ে এই শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ যাঁরা আমাকে দিয়েছেন স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত সেই বিবেকানন্দ সোসাইটির কর্তৃপক্ষকেও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।...

"স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের এই পুণ্য মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ—বড় বড় ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগধর্মের প্রচারক্ষেত্র। তাঁর এ উক্তির মধ্যে যে কোন অতিরঞ্জন নেই তার প্রমাণ তিনি নিজে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত তাঁর গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং তিনি নিজে নৈরাশ্যক্ষুব্ধ ও তিমিরপঙ্কে নিমজ্জিত গোটা জাতিকে যেভাবে আত্মস্থ হতে সাহায্য করেছিলেন, ইতিহাসে সেরূপ নজির খুব বেশি পাওয়া যায় না। নির্ভীক ত্যাগব্রতী সাধনার মাধ্যমে তাঁরা যে ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলস্বরূপ বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা।

"স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একাধারে মহাকর্মী, মহাযোগী ও মহাত্যাগী। এমন দুর্লভ আদর্শ চরিত্র ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর ইতিহাসেও মুষ্টিমেয়। মাত্র ৩৯ বৎসরের জীবনে তিনি যে অসাধ্য সাধন করে গেছেন সে-কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি শুধু পরাধীন দরিদ্র ভারতকেই শক্তি ও মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে যাননি—গোটা পৃথিবীর জনসমাজের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন ভারতের সনাতন ধর্মের ত্যাগ তিতিক্ষা ও মুমুক্ষার বাণী। তিনি ছিলেন সহায়সম্বলহীন সন্ন্যাসী। একক প্রয়াসে তাঁর এ বিশ্ববিজয় একেবারে রূপকথার মত।

"আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম আমাদের ভগবান, দেশ ও মানুষ—এই তিনটিকে এক করে দেখতে শেখান। ভগবৎ-প্রেমকে কি করে দেশসেবা ও মানবকল্যাণের সঙ্গে সম্মিলিত করতে হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ স্বয়ং বিবেকানন্দ। তাঁর প্রচারিত মতবাদ ইতিহাসের কোন পরিত্যক্ত বস্তু নয়, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপর সে মতবাদের প্রভাব অপরিসীম। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামীজী

মানবসমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সব উক্তি করে গেছেন, যত দিন যাচ্ছে ততই সে-সব উক্তির যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করছি।

"আমাদের স্বাধীনতা-অর্জনের ৪৫ বৎসর পূর্বে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। অথচ ভারতের স্বাধীনতা ও তার সুমহান ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। তাই এ অভীঃ-মন্ত্রের সাধক উদ্দাত্তকণ্ঠে দেশবাসীদের বলতে পেরেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।' স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই সময়-সীমার মধ্যেই কি আমরা স্বাধীনতা পাইনি ?

"স্বদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর ছিল সুগভীর আস্থা। তিনি বলেছেন—'বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণ এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে আর আনন্দিত হইবে। তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র।' গত ২২ বৎসরের স্বাধীন ভারতে আমরা স্বামীজীর এই সুগভীর বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পেরেছি কি না সে কথা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

"সমাজে ও রাষ্ট্রে শূদ্রশক্তির অভ্যুদয় স্বামীজী স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর এই শূদ্রশক্তি আজকের নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ। এই ঐতিহাসিক অভ্যুদয়কে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এই অভ্যুদয়ের মধ্যেই দেখেছিলেন মানবসমাজের মহামুক্তি।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহামিলন ছিল স্বামীজীর অন্যতম জীবনব্রত। তিনি প্রায়ই বলতেন যে এমন দিন আসবে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন ভেদরেখা থাকবে না। তাঁর মতে সার্বজনীন মানব-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মের মধ্য দিয়ে এই মহামিলন সম্ভব হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে ভারতের একটি বড় আধ্যাত্মিক ভূমিকা আছে—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাঁর সে বিশ্বাসের কতখানি মর্যাদা আমরা রাখতে পেরেছি সে কথা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে।

"তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ যদি তার ভগবদ্-জিজ্ঞাসাকে অব্যাহত রাখে তো তার মৃত্যু নাই। যদি সে রাজনীতি বা সামাজিক সংঘর্ষে ডুবে যায় তার মৃত্যু নিশ্চিত।' আমরা আজ অন্যান্য দেশের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে রাজনীতি ও সামাজিক সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়ে সেই মৃত্যু বরণ করতে চলেছি কি না একথা গুণী জনের বিচার্য। দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর, নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ ছিল স্বামীজীরও জীবনব্রত—তবে সেটা সংঘর্ষের পথে নয়, আধ্যাত্মিক শুভবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত মহামিলনের পথে। স্বামীজীর এই কর্মনীতি মহাত্মা গান্ধীর উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামীজী-প্রদর্শিত সেই পথ থেকে বিচ্যুত হলে বিশ্বের মানবসমাজকে শোনাবার মত কোন আধ্যাত্মিক বাণী কি আমাদের অবশিষ্ট থাকবে ?……"

সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীনীলমণি পাল এবং সভান্তে ধন্যবাদ জানান সোসাইটির সহ-সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।

প্রেমের ঠাকুর

[গান]

শ্রীপ্রীতীশ মিত্র

এসেছে প্রেমের ঠাকুর
দেখবি যদি আয় চলে।
সে যে, হাসে, কাঁদে, থির হয়ে যায়,
আপন মনে কি বলে ॥

বলে বুঝি, আমার কথা শোন্,
ওরে ওরে বিশ্বজন,
তোরা, মা নামটি বীজ-মন্ত্র করে
কাম কাঞ্চন যা দলে ॥

মা যে জগৎ-তারিণী,
জীবধাত্রী, পালিনী,
মায়ের, পায়ের ছোঁয়ায় তরে যে যায়
দুঃখী, তাপী, সকলে ॥

তার যে পূজা বোঝাই ভার,
এমন, দেখি নাই তো আর,
সে যে মায়ের পূজার ফুলের ডালি
আপন অঙ্গে দেয় ঢেলে ॥

বলে, টাকায় কিবা হয়,
অসার মাটি বৈ তো নয়।
এই না বলে' টাকা মাটি
অগাধ জলে দেয় ফেলে ॥

বলে, নারীর আসল রূপ—
সে যে জননীস্বরূপ,
তাই, আপন জায়ার পায়ে লুটায়
জগৎ-জননী বলে ॥

অন্য কাউকে চেনে না,
মুখে সদাই মা, মা, মা।
বলে, মা যদি না দেয় দেখা তো
জীবন বিফলে ॥

এমন কে দেখেছিস্ আর,
যেমন রামকৃষ্ণ অবতার।
তার ভাবের শেষ পেতে মহা-
যোগীর মাথা যায় টলে ॥

সমালোচনা

গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ— বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২ নন্দন বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ১৮৩, মূল্য চার টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূর্তবিগ্রহ। গীতোক্ত সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে 'টাকা মাটি মাটি টাকায়' অভিনবভাবে রূপায়িত। "দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয় তা-ই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর।"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অমৃতবাণীর মাধ্যমে সমগ্র গীতাগ্রন্থের মর্মবাণী মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে।

'গীতায় শ্রীরামকৃষ্ণ' পুস্তকখানিতে গীতার বাণীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মিল, ভাবগত ঐক্য, উভয়ের তাৎপর্য সুপরিস্ফুট। প্রকাশ-ভঙ্গী সহজ সরস। ভক্তগণের হাতে দিবার উপযোগী গ্রন্থ।

শেষরশ্মি—বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীনারায়ণ সাহা, ২ নন্দনবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৮৭; মূল্য দুই টাকা।

'শেষরশ্মি' কবিতা-গ্রন্থ। গ্রন্থকার শিক্ষক-কবি। বহু বৎসর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তিনি জানেন ছাত্রজীবনে কিরূপ কবিতা ভাল লাগে এবং কি প্রকারের কবিতা তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। ত্রিশটির বেশী কবিতা এই পুস্তকে পরিবেশিত, সবগুলিতেই ভাব ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বয়স্ক ব্যক্তিগণেরও পুস্তকখানি ভাল লাগিবে, বিশেষ করিয়া ভক্তিরসাত্মক কবিতাগুলি।

গীতিরূপা—বিজয়গোপাল। প্রকাশক—শ্রীদিলীপ রায় চক্রবর্তী, ২, নন্দনবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৬৩; মূল্য এক টাকা।

৬০টি গানের সমষ্টি 'গীতিরূপা'। ভাষা, ভাব ও ছন্দ বেশ সুন্দর। গানগুলি পড়িয়া খুব ভাল লাগিল, তবে রসোত্তীর্ণ কিনা গায়ক-কণ্ঠে ধরা পড়িবে।

তন্ত্র-পরিচয়ঃ সত্যবান। লিপিকা, ৩০।১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৯২; মূল্য সাত টাকা।

তন্ত্র-পরিচয় গ্রন্থখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। বিরাট তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত পরিচত হওয়া বহু অধ্যয়ন-সাপেক্ষ। সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই গ্রন্থে পাঁচটি পর্বে আলোচিত হইয়াছেঃ শক্তিপূজা ও তন্ত্রমতের প্রাচীনতা ও বিস্তার, শক্তির উপলব্ধি ও দেহ-তত্ত্ব, শক্তির রূপকল্পনা, শক্তিপূজা-পদ্ধতি বা প্রাণতত্ত্ব, দেবী দুর্গা। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টে আলোচিত বিষয়ঃ শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী-পাঠের রহস্য ও শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যা-রহস্য।

দুরূহ বিষয়বস্তুকে সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে। যাঁহাদের তন্ত্রসম্বন্ধে জানিবার অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

ধর্মপরিচয়ঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ প্রকাশনী, ৮১বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১১২; মূল্য চার টাকা।

ধর্ম বলিতে কি বুঝায়, বর্তমানে মানুষের ধর্মভাবের কতখানি প্রয়োজনীয়তা—এই উভয় দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টাও অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে না। ধর্মের উৎপত্তি ও বিভিন্ন ধর্ম, হিন্দুধর্মের বিবর্তন, বৌদ্ধধর্ম, জৈন-ধর্ম, শিখধর্ম, কনফিউসিয়াসের ধর্ম, জোরাথুষ্ট্রার ধর্ম—বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়গুলি সুলিখিত।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৬ (৯. ৩. ৭০) সোমবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম পুণ্য জন্মতিথি উৎসব মহানন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, পূর্বাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী মঠে সমাগত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১৫ হাজার ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। বক্তা ছিলেন স্বামী ভাষ্যানন্দ, স্বামী বুধানন্দ ও ডক্টর নরম্যান অ্যাডম্‌স্।

সভারম্ভে স্বামী ভাষ্যানন্দ ও চিকাগো কেন্দ্রের ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক শান্তিপাঠ ও স্বামী তপনানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত গীত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোচনা শুরু হয়।

স্বামী ভাষ্যানন্দ বলেন, "বর্তমান যুগ শত-সমস্যাজর্জরিত। এ সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে। পাশ্চাত্য মানসে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণীগুলি সর্বাধিক প্রভাবশীল তাহা হইল: ভগবান লাভের প্রচেষ্টা চাই—তাঁকে দেখা যায়; মানুষ স্বরূপতঃ ভগবান—জীব আসলে শিবই; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত একত্ব—ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্ত সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একই নিয়মাধীনে, ভগবানের দৃষ্টিতে সবাই সমান; সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়—মত ধর্ম নয়, মত বহু, বিভিন্ন পথমাত্র, লক্ষ্য সব পথেরই এক।" স্বামী বুধানন্দ বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ 'চির-উন্মদ প্রেমপাথার'। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আসতে পারি না, তিনিই তাঁর প্রেমে আকর্ষণ করে নেন আমাদের। তাঁর এই প্রেম ছিল প্রথমে ঈশ্বরাভিমুখী; বাল্যকাল থেকেই তার প্রকাশ দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরে দেখা যায় তার বিপুল উচ্ছ্বাস—'মা দেখা দে' ব'লে কেঁদে কেঁদে মাটিতে মুখ ঘষছেন, মাকে পেলাম না ব'লে দেহত্যাগে উদ্যত হচ্ছেন। মাকে পাবার পর এই প্রেমই ছুটলো মানবাভিমুখী হয়ে, তখন মানবকল্যাণ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ যুবক ভক্তদের জন্য দক্ষিণেশ্বরে কুঠির ছাদের ওপর উঠে কাঁদছেন, 'ওরে তোরা সব কে কোথায় আছিস আয়রে!' শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণকেও হতে হবে মানবপ্রেমিক।"

ডক্টর নরম্যান অ্যাডাম্‌স্ বলেন: "মানবজাতিকে আজ একসূত্রে গ্রথিত হতেই হবে। সে সূত্র দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি মতেও সাধন করে তিনি ধর্মের মধ্যে ও মানুষের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে গেছেন।"

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের কাছে প্রেমের বাণী, মিলনের বাণী রেখে গেছেন। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, রোঁমা রোঁলার ভাষায় তিনি ছিলেন বিশ্বাত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু তত্ত্বালোচনার কথা বলেননি, জোর দিয়ে গেছেন সত্যকে জীবনে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টার ওপর। ভারতকে আজ তাঁর বাণী অনুধাবন করতে হবে, জাতীয় জীবনে

রূপায়িত করতে হবে; কেবল দৈহিক ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ নয়, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যও সমানভাবে সচেষ্ট হতে হবে। যে অদ্বয় মহান সত্য বিশ্বের সর্বত্র ওতপ্রোত, তার বিভায় অনুরঞ্জিত করতে হবে জীবনের সবকিছুকে।"

রাত্রে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালী-মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রি-শেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৫ জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ১৯ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

অন্ধ্রে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্তদের সেবা

গুণ্টুর জেলার কুরথালার ঘূর্ণিবাত্যা-বিপর্যস্ত জনগণের জন্য চিরালায় ৭০টি বাসগৃহের একটি নূতন কলোনী, একটি বিদ্যালয়ভবন এবং একটি কম্যুনিটি-হল মিশন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুআরি, ১৯৭০ কলোনী ও ভবন-গুলির উদ্বোধন-কার্য সুসম্পন্ন হয়।

লখনৌ সেবাশ্রমে পলিক্লিনিক

গত ১৮ই ফেব্রুআরি, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নব-নির্মিত বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন; এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রায় ১৫০ জন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত থাকিয়া আশ্রম-প্রাঙ্গণকে কয়েকদিন আনন্দমুখরিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

কার্যবিবরণী

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬৭তম বর্ষের (এপ্রিল ১৯৬৮ হইতে মার্চ ১৯৬৯) কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই সেবাশ্রম হিমালয়ের পাদদেশে হরি-দ্বারের নিকটে মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে এবং পবিত্র পরিবেশে অবস্থিত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম কনখল সেবা-শ্রমটি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবৎ-কালেই ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে।

সেবাশ্রমের প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ: ইন-ডোর ও আউটডোর।

ইনডোর হাসপাতাল: আলোচ্য বর্ষে ৫০টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে মোট ১,৪৮১ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১,৪৫৩। বর্ষশেষে ১,২৯০ জন রোগমুক্ত হইয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায় এবং ৪৮ জন চিকিৎসাধীন থাকে। গড়ে দৈনিক ৪৪.৭টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত থাকে। অন্তর্বিভাগে ২১৭টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

আউটডোর ডিসপেন্সারী: আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,২৬,৪৫৭ (নূতন—৩৫,২৪৩); অস্ত্রচিকিৎসা ৫,২৯৮, দন্তচিকিৎসা ১৭৪, চক্ষু এবং কর্ণ-নাসিকা ও গল চিকিৎসা ৩,৯৪৬।

ল্যাবরেটরিতে ৬,৮৩৬টি স্পেসিমেন পরীক্ষা করা হয়। ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে চিকিৎ-সিতের সংখ্যা ৪৫১। এক্স-রে বিভাগে ১,২০৭টি এক্স-রে তোলা হয়।

গ্রন্থাগারে ৪,৩৫৪ খানি পুস্তক আছে, ৫টি দৈনিক ও ৪৭টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

মন্দিরে প্রতিদিন পূজাদি এবং একাদশীতে রামনাম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি এবং অন্যান্য পুণ্য

তিথিগুলি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে কনখল সেবাশ্রম জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্ত নারায়ণের অকুণ্ঠ সেবায় রত। হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তপঃ-ক্ষেত্রের সাধুসন্তগণও পীড়িত অবস্থায় এখানে সুচিকিৎসা ও সেবা যত্ন লাভ করিয়া থাকেন; যুগাচার্য স্বামীজীরই নির্দেশে পুণ্যভূমি কনখলে সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন কার্যনির্বাহক সমিতির উদ্যোগে গত ৩১শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মতিথি উৎসব পূজা, পাঠ, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে গত ২০শে ফেব্রুআরি শুক্রবার অপরাহ্নে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভক্তগণের প্রচেষ্টায় একটি আলোচনা-সভা আয়োজিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুরের জেলা জজ মাননীয় ইকবাল হোসেন চৌধুরী সাহেব এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ প্রথমে স্তব পাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। পরে সঙ্গীতাদির পর স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন ডাঃ প্রফুল্লকুমার রায় ও শ্রীত্রিবেদী। ইঁহাদের এবং ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও সভাপতি মহাশয়ের ভাষণ খুবই মর্মস্পর্শী হয়। ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

চাঁদপুরস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎসব এই বৎসর ১লা হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১লা জানুআরি ভগবান রামকৃষ্ণ-দেবের, ২রা জানুআরি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর, ৩রা জানুআরি স্বামীজীর পূজা, হোম এবং প্রসাদবিতরণ করা হয়। ঐ তিন দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ভগবান রামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এবং স্বামীজীর লীলাপ্রসঙ্গে বক্তৃতা হয়। ৪ঠা জানুআরি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার স্ত্রী-পুরুষ ভক্তবৃন্দ বসিয়া খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা, বাগেরহাট ও হবিগঞ্জ হইতে ভক্তবৃন্দ এই উৎসবে যোগদান করেন। শঙ্কর মঠের স্বামী জ্যোতীশ্বরানন্দ গিরি, নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী যোগদানন্দ, ঢাকা মঠের ব্রহ্মচারী দেবব্রত, বাগেরহাট আশ্রমের ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, হবিগঞ্জ মিশনের হরিবোল ব্রহ্মচারী এবং কুমিল্লা আশ্রমের কানু মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ভোপাল রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ১০৮ তম জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গত ৩০শে জানুআরি পূজা, পাঠ,

হোম ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১লা ফেব্রুআরি দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয়, ১,৫০০ জন পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ ভাষণ দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'বর্তমানে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রয়োজনীয়তা'।

বড় আন্দুলিয়া: প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও পবিত্র মাঘী পূর্ণিমায় পরমপুরুষ যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে বড় আন্দুলিয়া লোকসেবা শিবিরে ৮ দিন (২০শে—২৭শে ফেব্রুআরি) ব্যাপী 'গদাধরের মেলার' আয়োজন করা হইয়াছিল। মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল ৮ রাত্রি যাত্রা প্রতিযোগিতা, হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতা, বাউল গান, তরজা গান, প্রদর্শনী, আলোচনা প্রভৃতি। প্রায় ১৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নরনারীর সমাগমে মেলা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠে।

২০শে ফেব্রুআরি বৈকাল ৩ ঘটিকায় মেলার উদ্বোধন করেন শ্রীসত্য চক্রবর্তী। পরে মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মেলা কমিটির সভাপতি কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

২১শে ফেব্রুআরি বৈকাল ৪ ঘটিকায় আলোচনা-অনুষ্ঠানে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। ২০শে এবং ২১শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় "স্বামী বিবেকানন্দ' ও "শ্রীশ্রীমা" শীর্ষক দুইটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

২২শে ফেব্রুআরি দিনটি 'কস্তুরবা দিবস' রূপে পালিত হয়। ২৭শে ফেব্রুআরি একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কৃতী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। ২৫শে ফেব্রুআরি এক মনোহর বাসন্তী-সন্ধ্যায় আয়োজিত কবি-সম্মেলনে নদীয়ার প্রবীণ ও নবীন কবিরা মিলিত হন।

হালিসহর—রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে ২০, ২১ ও ২২শে ফেব্রুআরি তিনদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব পালিত হয়।

২০শে ফেব্রুআরি বৈকালে শ্রীমতী কান্তি-লতা দেবী কর্তৃক শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যায় নাট্যানুষ্ঠান হয়।

২১শে ফেব্রুআরি পূর্বাহ্ণে উষাকীর্তন, পূজাদির পর বৈকালে শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী কর্তৃক রামায়ণ গান পরিবেশিত হয়।

২২শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজান্তে দুপুরে দেড় সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২১শে ও ২২শে দুদিনই বৈকাল ৪টায় ধর্ম-সভা হয়। উভয় দিনই সভাপতিত্ব করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী। ২১শে ও ২২শে প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ গিরি (ভোলাগিরি আশ্রম) ও শ্রীসুধীর-রঞ্জন দাশগুপ্ত। তাঁহাদেরও ভাষণ কালোপ-যোগী হইয়াছে।

২১শে ও ২২শে সন্ধ্যায় শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃক "কুরুক্ষেত্র" ও "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" এবং "হৈমবতী উমা" ও "সাধক রামপ্রসাদ" যাত্রাভিনয় হয়। উভয় দিনই যাত্রাভিনয় সার্থক হওয়ায় সমবেত ভক্তবৃন্দ যথেষ্ট আনন্দ-লাভ করিয়াছে।

প্রতিদিন ৫।৬ হাজার ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে।

নববারাকপুর—বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের গত ১লা মার্চ রবিবার নিজস্ব ভবনে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব সারাদিন-ব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত এক জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী জ্যোতিরূপা-নন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

'সুরবিতান', খিদিরপুর: গত ৯ই মার্চ অপরাহ্ণে 'সুরবিতানে' এক মনোজ্ঞ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের আবির্ভাব-তিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।



দিব্য বাণী

ক্ষীরযোগাদ্ যথা নীরং ক্ষীরবৎ দৃশ্যতে তথা।
আত্মযোগাদনাত্মায়মাত্মবদ্দৃশ্যতে মুধা॥ ৭৭
নীরাৎ ক্ষীরং পৃথক্কৃত্য হংসো ভবতি নান্যথা।
স্থূলাদেঃ স্বং পৃথক্কৃত্য মুক্তো ভবতি নান্যথা॥ ৭৮
ক্ষীরনীরবিবেকজ্ঞো হংস এব ন চেতরঃ।
আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞো যতিরেব ন চেতরঃ॥ ৭৯

'অদ্বৈতানুভূতিঃ'—শঙ্করাচার্য

জলে দুধ মিশালে যেমন
দেখায় তা দুধেরই মতন,
সেইরূপ অনাত্মাতে, অচেতন দেহাদিতে
চৈতন্যের, আত্মার সংযোগে
সে-সকলও আত্মা বলি', সে-সবও চেতন বলি'
ভ্রান্ত বোধ জাগে॥ ৭৭
মেশা দুধ-জল হতে দুধটুকু পৃথক করিতে
পারিলেই তবে তার 'হংস' পরিচয়;
স্থূলদেহ-আদি হতে আপনারে পৃথক করিতে
পারিলেই তবে জীব মুক্ত হয়ে যায়,
নহে অন্যথায়॥ ৭৮
দুধে জলে পার্থক্য কোথায়—
কেবল হংসেরই আছে সে-বিবেক, অন্য কারো নাই;
অনাত্মা দেহাদি হতে আত্মা যে পৃথক—এই জ্ঞান,
এ বিবেক আছে যার যতি বলে তাহাকেই,
যতি নয় অন্য কোন জন॥ ৭৯

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর

ভারতে সনাতন ধর্মে যখনই গ্লানি আসিয়াছে, ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তখনই তাহা দূর করিয়াছেন। কিন্তু জগতের নিয়মই হইল, কোন কিছুই স্থায়ী হয় না সেখানে। তাই একবার কোন অবতার বা আচার্য আসিয়া ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া যাইবার কয়েক শতাব্দী পরেই আবার তাহার মধ্যে মালিন্য আসিয়া দেখা দেয়, মানুষ ধর্মের মূল কথা আবার ভুলিয়া যায়। তাই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে হয় ভগবানকে—আমাদেরই মতো মানুষ হইয়া আসিয়া জীবনে বাস্তবরূপায়িত করিয়া দেখাইতে হয় মানুষ কেমন করিয়া ধর্মের মূল লক্ষ্য সত্যলাভের দিকে অগ্রসর হইবে।

তবে প্রতি অবতারে তাঁহারা একইরূপ জীবন দেখান না কেন, একই কথা বলেন না কেন? আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশের প্রকারভেদ থাকিলেও আসলে একই জীবন তাঁহারা দেখান, একই কথাই বলেন; কারণ মূল সত্য কখনো পরিবর্তিত হয় না, উহা লাভ করিবার মূল উপায়ও একটিই—বহির্বিষয়ে ছড়ানো মনকে ফিরাইয়া আনিয়া সত্যে একাগ্র করা। তবে যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারা পরিবর্তিত হয় বলিয়া তৎকালীন জীবনোপযোগী হয় তাঁহাদের বহির্জীবন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবানলাভ; আর যুগোপযোগী চিন্তাধারায় অভ্যস্ত মানুষের বোধগম্য ভাবেই তাঁহারা কথা বলেন, কিন্তু সে কথার তাৎপর্য সর্বক্ষেত্রেই এক, যাহা ব্যাসদেব 'ভারত সাবিত্রী'তে সংক্ষেপে বলিয়াছেন: "ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ। নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥"—জীবনের সুখ-দুঃখ অনিত্য, কিন্তু ধর্ম নিত্য; যে-দেহ অবলম্বনে, যে দেহের মধ্যে থাকিয়া, যাহার মাধ্যমে আমরা জীবনের সুখ-দুঃখ উপভোগ করি তাহা অনিত্য, কিন্তু আমরা, দেহীরা, জীবেরা নিত্য—আমরা জন্ম-জন্মান্তরে বহু দেহ, বহু জীবন উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু দেহের বিনাশে আমাদের বিনাশ হয় নাই, আমাদের বিনাশ বলিয়া কিছু নাই-ই। কাজেই জীবনপথে সর্বদা ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া চলিবে—অনিত্য সুখ-লাভের কামনায়, লোভে, বা দুঃখকে এড়াইবার ভয়ে, এমন কি জীবনরক্ষার জন্যও কখনো কোন অবস্থাতেই নিত্য ধর্মকে ত্যাগ করিও না। এখানে যে আসল মানুষের কথা বলা হইয়াছে, তাহাকে চিনিতে আমাদের কাহারো কোন অসুবিধা নাই, আমি বলিতে আমরা যাহা সকলেই বুঝি তাহাই—কেবল স্থূলদেহটি বাদ দিয়া। মৃতদেহের মতো, মাটি-জল-আলো-হাওয়ার মতো যে বেহুঁস নয়, যে চেতন, যে চিন্তা করে, বিচার করে, সুখ-দুঃখ অনুভব করে, স্বপ্ন দেখে, সেই আমি; তাকেই জীব বলে। একটি দেহ যখন নষ্ট হয়, স্থূলদেহ না থাকিলেও এই মন-বুদ্ধি, এই চিন্তা-অনুভবাদি সবই আমাদের যেমন আছে তেমনি থাকে—সেগুলির সঙ্গে জড়িত থাকিয়াই আমরা আবার একটি নতুন স্থূলদেহে প্রবেশ করি—একটি নবজাতক আসে পৃথিবীতে। ইহাকেই আমরা আমাদের জন্মমৃত্যু বলিয়া ভাবি—আসলে ইহা স্থূলদেহেরই

জন্মমৃত্যু, আমাদের নয়; যেন, গীতার ভাষায়, পুরাতন পোষাক ছাড়িয়া নতুন পোষাক পরা। তফাত শুধু, আগের স্মৃতি আমাদের মনের উপরে থাকে না, অবচেতনে লুকাইয়া থাকে।

মানুষ বলিতে আমরা তাহার স্থূল দেহকেই এবং তাহার মধ্য দিয়া তাহার মনবুদ্ধি ও চেতনার যেটুকু বিকাশ দেখা যায় সেটুকুকেই বুঝি, সেটুকু লইয়াই তাহার সম্বন্ধে ধারণা করি, তাহার ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে চাই। সত্যদ্রষ্টারা কিন্তু মানুষ ব'লিতে দেহের অভ্যন্তরস্থ আসল মানুষটিকেই দেখেন, দেহীকে, জীবকে, মনবুদ্ধ্যাদিজড়িত চেতনাকেই দেখেন, এবং তাহার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাহার কল্যাণ-অকল্যাণের পথ-নির্দেশ করেন। একটা দেহের, একটা পোষাকের, স্থূল বিষয় গ্রহণের উপযোগী একটা স্থূলযন্ত্রের স্থায়িত্বকে—একটা জীবন যাহাকে বলি আমরা তাহাকেই—দেহীর সর্বস্ব বলিয়া কখনো দেখেন না তাঁহারা, তাহার অসংখ্য জীবনের একটি মাত্র বলিয়াই প্রত্যক্ষ করেন। তাই দেহীর কল্যাণকেই আমাদের যথার্থ কল্যাণ জানিয়া, আমরা যাহাতে সে-কল্যাণসাধনে আগ্রহী হই এমন কথাই বলেন। কারণ এজীবনে আমাদের মনবুদ্ধিকে আমরা যে রঙে রাঙাইয়া লইব পরজন্মে সে-রঙ্‌ই তো সঙ্গে যাইবে।

সত্যের এই প্রথম ধাপ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের বা আচার্য শঙ্করের বা সনাতন ধর্মের কোন আচার্য বা অবতারের কথায় মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থ দেহীর এভাবে অবিনাশিত্ব পৃথিবীর সব ধর্মেই স্বীকৃত, কিন্তু এই জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত কেবল ভারতীয় ধর্মে—হিন্দুধর্মের সব সম্প্রদায়ে এবং তাহারই 'বিদ্রোহী' বা অনুরূপ বৌদ্ধ বা জৈন ও শিখ ধর্মে। পৃথিবীর আর সব প্রধান ধর্মের মতে পৃথিবীতে স্থূলদেহে আমরা একবার মাত্র থাকিতে পারি—পৃথিবীতে এই জীবনই আমাদের শেষ।

কিন্তু দেহীর এই জীবত্ব এই জন্মে-জন্মে দেহ-দেহান্তরগ্রহণও তো চরম সত্য নয়—ইহাও আপেক্ষিক সত্য, প্রথম ধাপ মাত্র। চরম সত্য লাভ করিতে হইলে ইহারও উপরে উঠিতে হইবে—স্থূল দেহ হইতে আমি আলাদা এটুকুমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; মনবুদ্ধি প্রভৃতিও যে আমাদের স্থূল দেহের মতোই দেহ, (যদিও তাহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম) এবং আমরা দেহীরা সে সূক্ষ্মদেহ হইতেও পৃথক, ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যেমন স্থূলদেহ হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে সে দেহের সুখদুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি মন-বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়া গঠিত সূক্ষ্ম দেহ হইতেও নিজের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে মনবুদ্ধির সুখদুঃখ-বেদনাদি কোন পরিবর্তনই আর 'আমার পরিবর্তন' বলিয়া অনুভূত হয় না; কাজেই আমাদের জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ-ভয় বলিয়া কোন বেদনাই আর থাকে না তখন। কারণ এসব বোধ ওঠে আমাদের দেহমনবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়াই, সব পরিবর্তন ঘটে সেখানেই। আমরা যতক্ষণ সেগুলির সহিত নিজেকে জড়াইয়া রাখি, আমি বলিতে দেহমনবুদ্ধি সব জড়াইয়া বা সূক্ষ্মদেহে থাকাকালে (স্বর্গাদি সূক্ষ্মলোকে) কেবল মনবুদ্ধি প্রভৃতিকে জড়াইয়া সেই জড়িত অস্তিত্বকেই 'আমি', আমার অস্তিত্ব মনে করি, তখনই ভাবি আমার সুখ দুঃখ হইতেছে, আমার জন্মমৃত্যু হইতেছে, বা আমিই যেন জন্মে জন্মে দেহ পাল্টাইতেছি—যেমন পোষাক পাল্টাই।

এই চরম অনুভূতি যখন আসে, আমরা

আসলে যাহা, আমাদের যাহা স্বরূপ তাহা যখন উপলব্ধি করি, আমার তখন কি থাকে? কি রকম সে উপলব্ধি? তাহা ইতিবাচক কিছু দিয়া বোঝানো যায় না, ভাষায় বলা যায় না, মনবুদ্ধি দিয়া ধারণা করা যায় না, কারণ যাহা ধারণা করার বা কথা বলার মাধ্যম সেই মনবুদ্ধিরই অতীত তাহা। কিন্তু এবিষয়ে এই-সত্যের প্রচারকগণ সবাই একমত যে, নেতিবাচক ভাবে তাহার কথা বলা যায়; আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, অনুভব করি বা করিতে পারি, তাহার কিছুই তখন থাকে না—মনবুদ্ধির ভিতর দিয়া প্রকাশিত চেতনার আলোক, মন-বুদ্ধির দর্পণে প্রতিবিম্বিত চেতনা-সূর্য, আমাদের পরিচিত চিন্তা-বেদনাদিসমন্বিত 'আমি,'—আমাদের পরিচিত ধারণার বা কল্পনার সব আলোক-শিখাই নির্বাপিত হইয়া যায় তখন।

এই পর্যন্তই, এই নির্বাণের কথাই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন। যেটুকু যুক্তিতে বুদ্ধিতে অন্ততঃ ধরা-ছোঁয়া যায়, সেটুকুই বলিয়াছেন।

কিন্তু বলা না যাইলেও কিছু একটা থাকে তো তখন? না সব শূন্য হইয়া যায়? বুদ্ধদেব এবিষয়ে নীরব ছিলেন, কিছুই বলেন নাই।

আমাদের সনাতন ধর্মের মূল শাস্ত্র বেদান্তের ভিত্তিতে আচার্য শঙ্কর কিন্তু জোর দিয়া বলিতেছেন—শূন্য হইতে কিছুই সৃষ্ট হইতে পারে না, কোন কিছুকেই শূন্য করিয়াও দেওয়া যায় না, (এ সত্যটি আধুনিক জড়-বিজ্ঞানেও স্বীকৃত) কাজেই মন-বুদ্ধিও যখন থাকে না, তখন সত্তা কিছু একটা থাকিবেই—যাহা হইতে মন-বুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহা বুদ্ধিরও কারণ (শাঙ্করভাষ্য, কঠোপনিষদ্, ২।৩।১২); তাহাই আমাদের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ—অস্তিত্ববান চেতন আনন্দময় সত্তা। তবে 'সচ্চিদানন্দ' বা 'ব্রহ্ম' তো শব্দ মাত্র—আসলে তাহা কি? তাহার উত্তর: তাহা নিজে উপলব্ধি করা ছাড়া সোজাসুজি বুঝিবার বা বুঝাইবার কোন ভাষা নাই, উপায় নাই—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

আচার্য শঙ্কর- ও বুদ্ধদেব-প্রচারিত সত্য মূলতঃ একই, পার্থক্য শুধু এইটুকুই।

এই সত্যে উপনীত হইবার পথও মূলতঃ একটিই: বাসনা ত্যাগ করা, মনকে সত্যে একাগ্র করা। তাহারই প্রকারভেদ দেখাইয়াছেন বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য যুগ-প্রয়োজনে একটি বিশেষ দিকে জোর দিয়া, একটি বিশেষ দিককে অস্বীকার করিয়া। আবার শুধু জ্ঞানের পথের নয়, যোগের পথেরও, ভক্তির পথেরও মূল কথা এইটাই। সত্য সম্বন্ধেও বিভিন্ন যুগে মানুষের প্রয়োজনবোধে যে ধাপ পর্যন্ত যতটুকু বলা, যেভাবে বলা প্রয়োজন হইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টাগণ।

বৈশাখী পূর্ণিমা ও বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথি আজও আমাদের হৃদয়দ্বারে বুদ্ধদেব ও আচার্য শঙ্করের পুণ্য আবির্ভাবের, তাঁহাদের লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনের বার্তা বহন করিয়া আনে। অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতে আজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করি তাঁহাদের কাছে; আমাদের মন-বুদ্ধিতে প্রতিফলিত 'আমি'র শিখা চিরনির্বাপিত হউক, উদ্ভাসিত হউক চৈতন্যালোকের নিত্য উৎস।

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Advaita Ashrama
Benares City
বিজয়া দশমী
The October 13th, 1910

ভাই শশী,

সুরেন্দ্রবিজয়ের মুখে তোমার অসুখের বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন কেমন আছ জানিলে আনন্দিত হইব।

আমি ও শ্রীযুক্ত তারকদাদা প্রায় ২০।২৫ দিন হইল এখানে এসেই জ্বরে পড়েছিলাম, এখন অনেক ভাল হয়েছি। এখানে কিছুদিন থাকিয়া পরে মঠে যাইব।

তুমি আমার ৺বিজয়ার প্রণাম, উদ্দেশে আলিঙ্গনাদি জানিবে। রুদ্র ও প্রকাশকে আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে।

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কয়েকদিন হ'ল কাশী আসিয়াছেন। এখানে এসে কিছু ভাল আছেন। তারকদা শীঘ্র দার্জিলিং যাইবেন। চন্দ্র এখানে বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। আর সকলে ভাল আছে।

কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অনেক সুস্থ আছেন। সাণ্ডেলের মুখে শুনিলাম। সাণ্ডেল ৩।৪ দিন হইল এসেছে। তোমার কুশলাদি লিখবে। শ্রীযুক্ত হরি মহারাজ সিমলায় পূর্ণভায়ার কাছে আছেন। ভাল আছেন শুনেছি। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

দাস বাবুরাম

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Advaita Ashrama
Benares City
22. 10. 10

ভাই শশী,

তোমার অসীম স্নেহ, অপার করুণা ও অকৃত্রিম ভালবাসাপূর্ণ পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

আমরাও তোমাকে শ্রীশ্রীবিজয়ার নমস্কার দিয়া এক চিঠি লিখেছি, তাহা কি তুমি পাও নাই?

অমরনাথ দুর্গম তীর্থ সন্দেহ নাই, তবুও সৎসঙ্গে পড়ে গিয়েছিলাম। সুখে দুঃখে দর্শন করে প্রায় মাসাধিক হইল এখানে এসেই জ্বরে পড়ি। এখন অনেক সুস্থ।

আমি অমরনাথে ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলাম। অবশ্য অনেক স্থলে হাঁটিতেও হয়েছিল। তিন দিনের রাস্তায় পশু পক্ষী বৃক্ষাদি কিছুই নাই। মানুষ সে স্থলে বসবাস করিতে পারেই না। দুরন্ত শীত। চারিদিকে তুষারমণ্ডিত পর্বত। Season flower-এর উপর দিয়া ঐ তিন দিন যেতে হয়। দৃশ্য অতি মনোহর। সঙ্গে আমাদের তাঁবু বাঁধিবার বাউন ও রসদ ছিল। সুতরাং বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে প্রভুর কৃপায় বৃষ্টি না হওয়ায় রক্ষা, নতুবা শীতে …জমে যেতুম আর কি?

আমি অমরনাথ হ'তে নেবেই খঠম নামক স্থান হতে তোমার জন্য মান্দ্রাজ ঠিকানায় এক চিঠি ও তাহার মধ্যে প্রসাদী বিভূতি পাঠাইয়াছিলাম। তুমি কি তাহাও পাও নাই? পাইলে উত্তর লিখিতে। তবে মনে করেছিলাম তুমি অন্যত্র গিয়াছ কিম্বা অসুস্থ। পরে শরৎ ভায়ার চিঠিতে কনখলে জানিলাম যে তোমার অসুখ হওয়ায় বাঙ্গালোরে গিয়াছ। সুরেন্দ্রের মুখে তোমার অসুখের খবর সব পাইয়া দুঃখিত হইলাম। আরও কিছুদিন বাঙ্গালোরে থাকিলে না কেন? শরীর ভাল থাকিলে তবে ত কাজ। শ্রী হরি মহারাজ অমরনাথ হইতে ফিরিয়া সিমলায় শ্রীপূর্ণভায়ার কাছে গিয়াছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তথা হ'তে কনখলে আসিবেন। গুরুদাস কনখলেই আছে। আমরা কনখলে ১৪।১৫ দিন থাকিয়া প্রায় একমাস শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-ধামে এসেছি।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করে এখানে একদিন মাত্র থাকিয়া কলিকাতায় পূজার পূর্বেই গিয়াছে।

আমি ঘুরে ঘুরে বড়ই বিরক্ত হয়েছি, সে জন্য তোমার আদরের আহ্বান রক্ষা করিতে অসমর্থ। অপরাধ ক্ষমা করিও। আর মান্দ্রাজ অনেক দূর। তোমার দয়ায় ওদিক দর্শন হয়ে গেছে।…

বসন্তকে আমার বিজয়ার ভালবাসা ও স্নেহ-সম্ভাষণ জানাইবে। দেবমাতা এখন কোথায় ও কেমন আছে, তাহাকেও আমার বিজয়ার সম্ভাষণ দিও, অমরনাথ যাত্রার বিষয় জানাইও।

প্রকাশ রুদ্র ও আর আর ভক্তদের আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। আমারও ইচ্ছা তোমায় দেখি, কিন্তু রেলে বিতৃষ্ণা জন্মেছে। যদি পরে ইচ্ছা হয় তোমায় জানাইব। তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা ইত্যাদি জানিবে। তুলসীর কাজ বেশ চলিতেছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। ডাক্তার হেলককে দেখিলে কেমন? ইতি—

তোমার দাস
বাবুরাম

(৩)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

The Ramakrishna Advaita Ashrama, Benares City
4. 12. 10.

ভাই শশী,

অনেক দিন তোমার কোন খবর পাই নাই, কেমন আছ লিখিবে। আমরা ভাল আছি। হরি মহারাজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছেন। তিনি বেশ সুস্থ আছেন। মহারাজ মঠে আসিয়াছেন, শুনিলাম। তাঁর এখানে আসিবার কথা আছে। যদি না আসেন তাহলে আমরাই শীঘ্র মঠাভিমুখে যাইব। Dr. Hallock শুনিলাম তোমার ওখানে আসিয়াছে। তাহার শরীর কেমন আছে জানাইলে সুখী হইব।

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু কাশীতেই আছেন। তাঁর শরীর অনেক সুস্থ হইতেছে। আমরা নিত্যই প্রায় তাঁর কাছে গিয়া থাকি। আহা! তাঁর স্বভাব কি চমৎকারই হয়েছে! শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা ছিল "তোমায় দেখে লোকে অবাক্ হবে।" ঠিক তাই ফুটে বেরুচ্ছে। কি চমৎকার কথাই তাঁর কাছে শুনি—যেমন উদারতা তেমনই শ্রীশ্রীপ্রভুর [প্রতি] নিষ্ঠা। অভিমান, লোকমান্যি তাঁর কাছে থ্যাক্ থু হয়েছে। অনেকানেক সাধুরও অমন স্বভাব দেখি নাই। পরশ-পাথর ছুঁয়ে সোনা হয়েছেন, তাই প্রত্যক্ষ কচ্চি। আর আমাদের উপর কি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা! ৬৮ বৎসর বয়েস, কিন্তু বালকের মত স্বভাব দেখচি! তুমি যদি এখানে থাকিতে, কত আনন্দ হ'ত। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর কথায় একেবারে মাতোয়ারা। ইচ্ছা হয়, তোমরাও এসে এ আনন্দে যোগ দাও। আমাদের পেলে যেন আর এক মানুষ হয়ে যান! তাঁর চাকর-বাকর পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। সব প্রভুর মহিমা। প্রভুর কৃপায় এ সব দর্শন হচ্ছে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আজ কোঠার যাইবার কথা শুনিয়াছি। রামের মা ও আমার মা এখানে ছিলেন। তাঁরা ৮।৯ দিন হইল গিয়াছেন। রামের মা পরম-পূজনীয়া শ্রীশ্রীমার সহিত কোঠার যাইবেন। তাঁরা তোমার দয়া ও ভালবাসার কথা এক মুখে বলে শেষ করতে পারতেন না। শান্তিরামও তাঁদের সঙ্গে গিয়াছে।……

দেবমাতার খবর কি? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। তুমি উদ্বোধনে আর কিছু লিখ নাই কেন? তুমি অবশ্য অবশ্য স্বামীজীর সহিত কালনায় যাত্রার কথা লিখিও। অতি চমৎকার হবে। আর শরৎ ভায়ার অনেক আসান হবে। শরতের লিখা কেমন হচ্ছে? তুমিও যা জান কেন লিখতে থাক না। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ও স্বামীজীর বিষয় ধারাবাহিকরূপে লিখিতে থাক। তোমায় অনুরোধ করছি—লিখিও। লোকের এবার এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে খুব আকর্ষণ পড়েছে। আমায় মূর্খ করেছেন তাই ও রূপে বঞ্চিত। একটু ভক্তি বিশ্বাস হয় এই মাত্র প্রার্থনা। ইতি—　　দাস বাবুরাম

পুনশ্চ: পূর্ণভায়া সিমলা হতে ফিরিবার সময় আমাদের দর্শন দিয়া গিয়াছে। কি চমৎকার স্বভাব! হরি মহারাজ তাঁর সঙ্গে দুই মাস থেকে তাঁর কথা একমুখে শেষ করতে পারে না। এসব শ্রীশ্রীপ্রভুর মহিমা। তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। আর

ওখানকার সকল ভক্তদের আমার ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণাদি জানাইবে। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার কেমন আছে? তাহাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ধন্য, প্রভুর কার্যে এত অনুরাগ! ইতি—

দাস বাবুরাম

আবেদন

[হাসনাবাদ ও বসিরহাটে পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য]

পূর্বপাকিস্তানের খুলনা জেলা হইতে বাস্তু ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন দলে দলে বহু নরনারী হাসনাবাদ ও বসিরহাটে সমবেত হইতেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী লোক আসিয়া অনাহারে নিরাশ্রয় অবস্থায় খোলা জায়গায় পড়িয়া আছেন। গত ১৩ই এপ্রিল, ১৯৭০ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সেখানে সেবাকার্য (relief-work) শুরু করা হইয়াছে; দৈনিক প্রায় ১৫ কুইণ্ট্যাল চাল এবং তৎসহ প্রয়োজন মতো ডাল, সব্জী ও লবণ বিতরণ করা হইতেছে। এইভাবে বাস্তু ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত আরো লোক আসিতে থাকিলে সেখানে মহামারী আকারে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইবার সমূহ সম্ভাবনা। রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবাকার্যে খাদ্যদ্রব্য, দুগ্ধ, ঔষধ এবং অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের জন্য জিনিসপত্রের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য উদ্বাস্তুদিগকে দলবদ্ধভাবে স্থানান্তরিত করিতেছেন, তবু এই সুযোগ পাওয়ার জন্য যাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইতেছে, তাঁহাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

বলা বাহুল্য, পরিস্থিতি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাতে দরিদ্র দুঃস্থ ভ্রাতাদের দুর্গতি লাঘবের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট হইতে অতি সত্বর সাড়া পাওয়া প্রয়োজন।

এই সেবাকার্যের জন্য সমস্ত দান ধন্যবাদের সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় গৃহীত হইবে। "RAMAKRISHNA MISSION"— এই নামে চেক কাটিবেন।

(১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া

(২) অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা-১৪

(৩) উদ্বোধন, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-২৯

(৫) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, টাকী, ২৪-পরগনা।

১৫. ৪. ১৯৭০
বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

নবযুগের নূতন পুণ্যব্রত*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

আজ ভারতবর্ষের প্রধানতম সমস্যা—মানুষ। আজ এদেশে ব্যাপকভাবে মানুষের সার্বিক অধঃপতন চোখে পড়ছে। তার কারণ আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অবহেলা করে এসেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন, মানুষ স্বরূপতঃ দেবতা। তিনি মানুষের এই দেবত্বের পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অন্যান্য ধর্মনেতাদের মুখে আমরা মন্দিরের দেবতা, তীর্থের দেবতার কথা শুনেছি, স্বামীজীর মুখে শুনলাম মানুষের মধ্যে যে দেবতা বাস করেন, সেই পরম দেবতার কথা।

কেবল মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পূজা করা তাঁদের পূজার যথার্থ পদ্ধতি নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হতে তেত্রিশ কোটি দেবতা পূজিত হয়ে আসছেন। সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার সঙ্গে আর একজন-দুজন নূতন দেবতাকে যুক্ত করবার জন্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আবির্ভূত হননি। মানুষের সেবাই তাঁর পূজা। যেদিন মানুষের সব দুঃখ, সব দুর্গতি, সব অকল্যাণ দূর করবার প্রয়াস করা হবে, তখনই ঠিক ঠিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পূজা করা হবে।

খুবই আনন্দের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এরূপ যথার্থ অর্চনা করতে অগ্রণী হয়ে এসেছে নবসৃষ্ট বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, মানুষের দুর্গতি দূর করার মহান ব্রতই যাদের ব্রত।

বহু প্রাচীন কাল হতে আমাদের দেশে নারীগণ নানারূপ ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন। নিবেদিতা এক নূতন ধরনে পুণ্য ব্রত পালন করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—"নিবেদিতা আধুনিক যুগের সতী।" পুরাণের সতী শিবের জন্য দুশ্চর কঠোর তপস্যা করেছিলেন। আধুনিক সতী নিবেদিতাও তাই করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিবকে দেখেছিলেন দুঃখ-তাপিত মানুষদের মধ্যে। পুরাণের সতীর মতোই তিনি তাঁর এই শিবের জন্য অতি উগ্র তপস্যা করেছিলেন, চরম কৃচ্ছ্র বরণ করেছিলেন। তাঁর এই তপোমহিমা পুরাণের সতীর তপোমহিমা হতে কোন অংশে নূতন নয়। কিন্তু তাঁর সকল কৃচ্ছ্রসাধন ছিল নরের মধ্যে নারায়ণের উদ্বোধনের জন্যে। এ বিষয়ে নিবেদিতা আশ্চর্যভাবে কাজ করেছিলেন,—অক্লান্তভাবে প্রচার, অসীম ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে সংগঠনকার্য ও নিরলস সেবানুষ্ঠান করেছেন।

স্মরণ রাখতে হবে নিবেদিতা ভারতের প্রতি কি এক আশ্চর্য শ্রদ্ধা বহন করতেন! সে-শ্রদ্ধা শুধু ভৌগোলিক ভারতের প্রতি উৎসারিত ছিল না, সে-শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়েছিল চিন্ময় আত্মিক ভারতের প্রতি। সেই শ্রদ্ধাই তাঁকে ভারতের অগণিত আর্ত মানুষদের সেবায় আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই শিবরূপে জীবসেবাব্রতে তাঁকে দীক্ষিত করেছিলেন ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ আবার এই ব্রতে

---

* নিবেদিতা ব্রতী সংঘের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ।
অনুলেখন ও অনুবাদ : অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

দীক্ষালাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। গুরুপ্রদত্ত সেই মহান ব্রত অক্লান্তভাবে অনুষ্ঠান করতে করতে অকালে ১৯১১ সালে নিবেদিতার জীবন-অবসান ঘটে। জীবন আহুতি দিয়েই তিনি এই মহান ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন

এই মহান ব্রতে আজ যারা নূতন করে দীক্ষিত হচ্ছেন, তাঁরাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রকৃত ভক্ত। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত কে? যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, সে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় স্থাণু গৃহকোণবাসী হতে পারে না। যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, সে সতত সচেষ্ট হবে সর্বতোভাবে সমাজের সকল অমঙ্গল দূর করতে, সর্বদা সক্রিয় হবে মানুষের দুঃখ-দুর্গতি দূর করতে।

গত সহস্র বৎসর ধরে আমরা কত না পূজা-পার্বণ, ব্রত-অনুষ্ঠান পালন করে আসছি, তাতে কি সমাজের অমঙ্গল দূর হয়েছে? তা হয়নি। কারণ আমাদের পূজাপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কারণ আমরা নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, স্থাণু, গৃহকোণে পলাতক, জড়বৎ ছিলাম। আমরা তখন ভক্ত নামধেয় ছিলাম, প্রকৃত ভক্ত ছিলাম না। জড়তার আবরণে আবৃত তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাই নয়, আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতা মাত্র। তার পরিবর্তে এক সক্রিয় শক্তি-সমন্বিত (dynamic) আধ্যাত্মিকতা আজ আমাদের চাই এবং এরূপ আধ্যাত্মিকতা জগৎকে দিতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব। আজ গৃহকোণে বসে কেউ যদি দিনভোর রাতভোর শ্রীরামকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করেন, দিনরাত পূজা-অর্চনা, ব্রত-উপবাস অনুষ্ঠান করেন, অথচ জড়তা কাটিয়ে উঠতে না পারেন, তাহলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত নন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তের মধ্যে কোন জড়ত্ব থাকবে না, সে হবে সতত সক্রিয়ভাবে মানবসেবায় তৎপর। নরনারায়ণসেবাই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের মুখ্য ধর্মাচরণ।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের নামটি সেজন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, খুবই অর্থবহ। তাঁর নামের মধ্যে নূতন যুগের এই নূতন ধরনের মহাপুণ্য-ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্কেত রয়েছে। অগণন দুঃখী মানুষের অশ্রুজলমোচন, তাদের প্রাণে আনন্দামৃত-পরিবেষণ—এই-ই নূতন যুগের সর্বসিদ্ধিপ্রদ মহাপুণ্যব্রত।

আজও যে-সব ভক্ত এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, নিযুক্ত হতে হবে সক্রিয়ভাবে দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করার মহান কার্যে—শিবের সেবায়, প্রত্যক্ষ শিবের সেবায় অগ্রসর হয়ে আসতে হবে।

আজ সমাজের সর্বত্র মানুষের কী অপরিসীম দুঃখ! হাজার হাজার মানুষ নিদারুণ দুঃখ-পঙ্কে নিমজ্জিত—দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব তাদের নিয়ত পীড়িত করছে। এই যে হাজার হাজার শিশু বস্তীতে বেড়ে উঠছে, তারাও ত মানবশিশু—অথচ তাদের ক্ষুধায় অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, নেই শিক্ষার সুযোগ, মানুষের মতো বেঁচে থাকবার কোন উপায়ই তাদের নেই। তাদের শিক্ষা দেওয়া, তাদের মানুষের মত বাঁচবার সুযোগ করে দেওয়া, তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া—এর চেয়ে বড় ধর্ম আর কি হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে কেবল পূজা-অর্চা, নিয়মপালন ইত্যাদি নিয়ে থাকলেই চলবে না, মানবসেবাতেও ব্রতী হতে হবে।

বেদান্ত সর্বশাস্ত্রসার। বেদান্ত বলেন—সকলের সঙ্গে একত্ব-অনুভবেই প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠান। আর সর্বমানবের সেবানুষ্ঠান এই একত্ব-অনুভবেরই পথে এগিয়ে দেয়। সেজন্য শুধু সন্ন্যাসীকেই নয়, ভক্ত গৃহস্থকেও প্রকৃত ধর্ম লাভ করাবে এই সেবাব্রত-পালন।

পুনরায় বলি, ধর্ম স্থাণুত্ব নয়, জড়ত্ব নয়, আচার-অনুষ্ঠান নয়। ধর্ম হল আত্মবিকাশ, এ হল হওয়া (being and becoming)। গৃহস্থকেও যদি ধার্মিক হতে হয়, তাহলে তারও মধ্যে আত্মবিকাশ ঘটা চাই, তাকেও 'হতে' হবে। জড়ত্বনাশই ধর্ম। মানব-সেবাই সকল মানুষের সঙ্গে একত্ব-উপলব্ধির একটি রাজপথ। গৃহস্থকেও এই পথ দিয়ে ধর্মজীবনে অগ্রসর হয়ে চলতে হবে। এই সেবাব্রতের পথেই আত্মিক বিকাশ ঘটবে, সর্বভূতে একত্ব দর্শন হবে, মায়ার অপসরণ ঘটবে। সেজন্য মানব-সেবাব্রতই প্রকৃত ধর্ম।

স্মরণ রাখতে হবে যে, আধ্যাত্মিকতা একটি প্রচণ্ড শক্তি—শারীরিক শক্তির মতোই এ শক্তি বাস্তব, এর প্রচণ্ডতা আরো বেশী। আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেয় নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, অমিত প্রেম, বীর্য, জ্ঞান, মঙ্গলসাধনের দুর্জয় শক্তি, জীবনদান করবার অমিত শক্তি। এইরূপ আধ্যাত্মিকতায় মানুষের পরম প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের পরম প্রয়োজনীয় ও প্রার্থিত এই বস্তুটি দান করতেই এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা।

স্বামীজী কখনও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি-সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেননি। হিন্দু নারীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতিরই শুভকরী দিকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এক অতি মহান সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করতেই স্বামীজী চেয়েছিলেন। সেজন্যই নিয়ে এসেছিলেন পাশ্চাত্যের মেয়ে নিবেদিতাকে এ দেশের মেয়েদের শিক্ষা দিতে। নিবেদিতার মধ্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। নিবেদিতা নিঃসন্দেহে আধুনিক নারীর সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ।

নিবেদিতার কর্ম, সেবাব্রত স্বামীজী-কথিত বাস্তব-রূপায়িত বেদান্তকে জীবন্ত করে তুলেছিল। তাঁর সে ব্রত আজ যারা উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত, তাদের কর্মধারা শ্লাঘার বস্তু। এখানে পরিমাণগত প্রশ্নের অপেক্ষা গুণগত প্রশ্নের গুরুত্ব অধিক। অপরের কল্যাণ-সাধনের যে-শক্তি আজ নারীসমাজের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছে, সেটি খুব বড় কথা। ছোট ছোট কেন্দ্রে দশ-বার জন করেও এরূপ কল্যাণব্রতী যদি তৈরী হয়, তারা আবার প্রত্যেকে আরও দশ-বার জনকে প্রবুদ্ধ করবে। এমনি করেই তারা ছড়িয়ে পড়বে। ক্রমে সারা দেশে বিপুল শুভ কর্মশক্তি, কল্যাণ-কর্মপ্রবাহ উদ্ভূত হবে।

লক্ষণীয় যে, আধুনিক তরুণী নারীগণ এই কল্যাণ-ব্রতানুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। আজকের তরুণী নারী পুরোনো ধরনের ব্রতনিয়ম উদ্‌যাপনে আকৃষ্ট না-ও হতে পারে। এই নূতন পুণ্যব্রতই তাদের আকৃষ্ট করতে পারে তার প্রমাণ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি এই ধরনের ব্রতে ব্রতী সংগঠনের কর্মধারায়। গৃহস্থ তরুণী, বধূ, জননী, চাকুরিজীবী নারীরা কঠিনসাধ্য কল্যাণকর্ম করছেন। সম্প্রতি বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এই ধরনের ব্রতী দল যে সেবানুষ্ঠানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা দেখে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। এ বড়ই প্রেরণাপ্রদ। এই প্রেরণা-সঞ্চারের মধ্যেই এই সব সংগঠনের সার্থকতা। এই প্রেরণা ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন তাঁকে সকলের মধ্যে পূজা করতে। ভাগবতেও শ্রীভগবান বলেছেন :

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩।২৯।২৭

অর্থাৎ আমি সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; একথা জেনে দান, মান, মৈত্রী ও সমদর্শিতার দ্বারা সকলের অর্চনা করবে—উহা আমারই পূজা।' সুতরাং সর্বজীবের সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ পূজা। সুতরাং দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা দেওয়া, বেকারত্ব দূর করার প্রয়াস, দরিদ্রের দারিদ্র্যদুঃখ ঘোচাবার প্রয়াস শ্রেষ্ঠ পূজাকর্ম। আজ ভারতের মধ্যবিত্তদের সামনে একটি দারুণ পরীক্ষা এসেছে। স্বামীজী বলেছিলেন, বিত্তহীনের বন্ধু হয়েই তারা বেঁচে থাকতে পারে। দেখা যাচ্ছে শিবজ্ঞানে মানব-সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসেবাও। এই শ্রেয়ের পথে আজ যে পথিকেরা চলতে প্রয়াস করছেন তাঁদের সকলকেই জানাই আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রার্থনা করি, তাঁদের মহান কর্মব্রত প্রতিদিন প্রসার লাভ করুক।

সহিষ্ণুতা

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

মহান্ দীক্ষায় তব দীক্ষিত হে আমি
হে সর্বসৃজনকর্তা চরাচরস্বামি !
চঞ্চল হৃদয় মোর ক্ষুব্ধ মুহ্যমান
মিথ্যা শোক তাপে নিত্য, সমুদ্র সমান
ক্ষিপ্ত মৃদু বায়ু স্পর্শে ; শ্রীনাম তোমার
বিস্মৃত ; তাহারে দাও তব আঙিনার
সকল সন্তাপহারী পূর্ণ মহিমায়
একটি আসন প্রভু ; শিখাও তাহায়
তব সহিষ্ণুতা-মন্ত্র, যার পুণ্যবলে
অচঞ্চল রহি' নিত্য অটবীসকলে
পরিহসি' প্রভঞ্জনে প্রশান্ত বদনে
যথাকালে সঁপি' দেয় তোমার চরণে
পত্রপুষ্পে সুশোভিত রচি' মাল্যহার,
আনত শিরেতে আনে অর্ঘ্য উপচার।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

এখন মানুষের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বেদান্তসূত্রের ১।৩।৩৪-এর ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'উপনয়নপূর্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ।' অর্থাৎ 'উপনয়নসংস্কার (যজ্ঞোপবীতধারণ) হইলে বেদ অধ্যয়নের অধিকার হয় এবং ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ ও শিক্ষা করিতে পারে, আর বর্ণত্রয়ের (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের) উপনয়নসংস্কারগ্রহণের অধিকার আছে।'

বেদান্তসূত্রের ১।৩।৩৬ সূত্রে বলা হইয়াছে, 'সংস্কারপরামর্শাৎ' অর্থাৎ 'সর্বত্রই ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়নসংস্কারের কথা আছে।' ইহার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে'। অর্থাৎ 'যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশপ্রসঙ্গ আছে, সেখানেই উপনয়নসংস্কার, বেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ইত্যাদি পূর্বক বিহিত আছে।'

শ্রুতিতেও আছে, "তংহোপনিন্যে (শতপথ ব্রাহ্মণ—১১।৫।৩।১০), "অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ" (ছান্দোগ্য ৭।১।১), "ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ" (প্রশ্নোপনিষৎ ১।১), অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন, 'তাঁহাকে (ব্রহ্মবিদ্যাভিলাষীকে) উপনয়নসংস্কার (আচার্য) দান করিলেন' আরও দুইটি শ্রুতিভাগে আছে—'হে ভগবন! আমায় অধ্যয়ন করান (বলিয়া নারদ আচার্য সনৎকুমারের) উপসদনে (গৃহে গমন করিয়া শিষ্য হইলেন)' এবং ব্রহ্মে (বেদে) পারদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠাসম্পন্ন, পরব্রহ্ম-অন্বেষণকারী (ঋষিগণ)—ইনি (আচার্য পিপ্পলাদ) আমাদিগকে সেই (পরব্রহ্ম) বিষয়ে সমস্ত কথা বলিবেন স্থির করিলেন—অনন্তর তাঁহারা সমিৎ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) হস্তে লইয়া ভগবান পিপ্পলাদের উপসদনে (গৃহে) (উপদেশগ্রহণের জন্য) উপস্থিত হইলেন।' উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রসকল হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যথারীতি আচার্যের গৃহে যাইতে হয়। এই রীতি হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় আচার্যগৃহে যাইবার পর—উপনয়নসংস্কারগ্রহণ, ব্রহ্মচর্যপালন, বেদশ্রবণ ইত্যাদি যথাক্রমে হইয়া থাকে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।৩৪-এর) ভাষ্যে এক স্থানে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'উপনয়নপূর্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ।' অর্থাৎ 'উপনয়ন (আচার্যগৃহবাস, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি) পূর্বক বেদাধ্যয়ন (এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভ) হইয়া থাকে, আর বর্ণত্রয়ের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) উপনয়ন হইয়া থাকে (এবং আচার্যগৃহবাস, ব্রহ্মচর্য, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়)।' মানুষের মধ্যে বর্ণত্রয়ের ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল।

এখন চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারবিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন দেখা যাক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায়, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং

বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।১৩, এই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ 'আমি পরিমাণ-মত গুণ ও কর্ম দিয়া চারিটি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের (চারিটি বর্ণের) (সৃষ্টির) কর্তা আমি। তাহা হইলেও আমাকে অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়া জানিও।' এখানে ভগবান চারিটি বর্ণের কথা একসঙ্গে বলিয়াছেন। শূদ্রের কথা পৃথক্ করিয়া বলেন নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি, তাহাদের পরিমাণমত গুণ ও কর্মের বিধান তিনিই করিয়াছেন বলিতেছেন, সে-সকলের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেছেন। ভগবান জাতিসৃষ্টির কথা বলেন নাই। এখানে বর্ণ বলিতে শ্রেণী, সমধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রেণী—জাতি কিন্তু একটি। এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য যাহা বলিয়াছেন সেভাবে সত্ত্বগুণ প্রধান, রজোগুণ ও তমোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের মধ্যে, তাঁহারা এক শ্রেণীর—নাম দেওয়া হইল ব্রাহ্মণ। রজোগুণ প্রধান, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের, তাঁহারা আর একশ্রেণীর—নাম হইল ক্ষত্রিয়। রজোগুণ প্রধান, কিন্তু ক্ষত্রিয়শ্রেণীর ন্যায় নহে, সত্ত্বগুণও ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা কম, আর তমোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের, তাঁহাদের শ্রেণী হইল বৈশ্য। তমোগুণ প্রধান আর সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ অপ্রধান যাঁহাদের, তাঁহাদের শ্রেণী হইল শূদ্র। ব্রাহ্মণের কর্ম হইল তপস্যা যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন। ক্ষত্রিয়ের কর্ম হইল রাজকার্য-পরিচালনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ। বৈশ্যের কর্ম হইল কৃষিকর্ম, গো-পালন ও বাণিজ্য। শূদ্রের কর্ম হইল দাসত্ব। এই যে শ্রেণীগত শূদ্র তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ গুণ ও কর্মের হীনতাবশতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের কাহারও সাধনার দ্বারা সে হীনতা যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি গুণাধিক্যবশতঃ উচ্চ-শ্রেণী বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ যে-কোন শ্রেণী-ভুক্ত হইবেন। তখন তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যায় আকাঙ্ক্ষা আসিবে এবং তিনি তাহার অধিকারী হইবেন। শূদ্রশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি যেমন অধিক-গুণসম্পন্ন হইলে গুণের তারতম্য অনুযায়ী বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হন, সেইরূপ বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত এবং ক্ষত্রিয়ের—ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্ভব। আবার হীন গুণ ও কর্মসম্পন্ন হইলে তারতম্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণ নামিয়া গিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন, ক্ষত্রিয় নামিয়া গিয়া বৈশ্য বা শূদ্রশ্রেণীভুক্ত এবং বৈশ্য নামিয়া গিয়া শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। শূদ্র-শ্রেণীতে নামিয়া গেলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা চলিয়া যায় এবং স্বতই তাঁহারা সে অধিকার হইতে বিচ্যুত হন।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণের বা শ্রেণীর অধিকার-আলোচনামুখে শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারের কথা বিচার করিয়া দেখিলাম। কিন্তু সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতি বলিয়া সকলে জানে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-জাতির উপনয়ন-সংস্কার হয়, সেইজন্য তাঁহারা দ্বিজাতি। দ্বিজাতির ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মবিদ্যায়, বেদবিদ্যায় অধিকার আছে। শূদ্রের উপনয়ন হয় না, এইজন্য তাহারা দ্বিজাতি নয়, একজাতি—একজাতির ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মবিদ্যায়, বেদ-বিদ্যায় অধিকার নাই, এই কথা বলা হইয়া থাকে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।৩৪) ভাষ্যে এই কথাই বলিয়াছেন।

এবিষয়ে শাস্ত্র কি বলিয়াছেন দেখা যাক। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।২।১) আছে—রাজা

পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি বহুবিধ উপহার লইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী রৈক্কের নিকট গিয়া সেই-সব উপহার তাঁহাকে দিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ ভিক্ষা করিলে, (ছা—৪।২।২) রৈক্ক জানশ্রুতিকে বলিয়াছিলেন "তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্তিতি" (ছা ৪।২।৩) অর্থাৎ 'তাঁহাকে (জানশ্রুতিকে) অন্য (রৈক্ক) উত্তরে বলিয়াছিলেন, রে শূদ্র! এইসকল গাভী সহিত (যাবতীয় উপহার সামগ্রী) তোমারই থাকুক' (ছা—৪।২।৩)। পুনরায় দেখা যায় এই শ্রুতিভাগেই আছে, "আজহারেমাঃ শূদ্র, অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি," (ছা—৪।২।৫) অর্থাৎ '(রৈক্ক রাজা জানশ্রুতিকে) বলিলেন, হে শূদ্র! (তুমি) এই যে (উপহার) সকল আনিয়াছ, এই উপায়েই (আমায়) কথা বলাইবে' (ছা—৪।২।৫)। পরে এই শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে যে, রৈক্ক জানশ্রুতিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। যাহাকে শূদ্র বলিয়া বার বার সম্বোধন করিতেছেন, তাহাকে শূদ্র বলিয়াই রৈক্ক জানেন, জানিয়াও ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। শূদ্রের অধিকার আছে বলিয়াই দিলেন। এই শ্রুতিভাগ শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন।

কেহ কেহ বলেন রাজা জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন—এ বিষয়ে তাঁহারা প্রমাণও দেন, কিন্তু দেখিলেই বোঝা যায়—সে প্রমাণ কষ্ট-কল্পনামাত্র। আবার কেহ মনে করেন যেহেতু জানশ্রুতি রাজা ছিলেন, সেই হেতু ধরিয়া লইতে হইবে তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহাভারতে এবং রামায়ণে অনেক শূদ্র রাজার কথা আছে। উড়িষ্যায় এক সময়ে শবররা রাজা ছিলেন—বর্তমানে সে দেশে যে-সকল মন্দির আছে, তাহার মধ্যে অনেক মন্দির সেই শবর রাজারা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শবররা জাতিতে শূদ্র ছিলেন। এইসকল হইতে দেখা যাইতেছে, শূদ্ররাও রাজা হইতেন এবং লোকেরা তাহা মানিয়া লইতেন। রাজা হইলেই ক্ষত্রিয় হইবেন, এমন কোন কথা শাস্ত্রে কোথাও নাই। সুতরাং জানশ্রুতি রাজা হইলেও জাতিতে শূদ্র ছিলেন, এই জন্যই রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

এখন আমরা সত্যকাম জাবালের প্রসঙ্গে শ্রুতি কি বলিয়াছেন দেখিব। শ্রুতিতে আছে, "সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং-গোত্রো ন্বহমস্মীতি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।৪।১)। অর্থাৎ "জবালার পুত্র সত্যকাম মাতা জবালাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে পূজনীয়ে (আমি) আচার্যগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচর্যবাস (বেদাধ্যয়নাদির নিমিত্ত বাস) করিব, আমি কোন্ গোত্রের (ইহা আমায় বলুন)। উত্তরে "সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি।"—(ছান্দোগ্য, ৪।৪।২)। অর্থাৎ তিনি (জবালা) ইহাকে (পুত্র সত্যকামকে) বলিলেন, বৎস! তুমি যে গোত্রের তাহা আমি জানি না, আমি যৌবনে বহু (গৃহে) বিচরণ করিয়া পরিচারিকার কার্য করিতাম, তখন তোমায় লাভ করিয়াছিলাম, সেই (পরিচারিকা) আমি ইহা জানি না তুমি যে গোত্রের, আমি হইতেছি জবালা নাম্নী (মহিলা), আর তুমি হইতেছ সত্যকাম নামক (আমার পুত্র)। সেই তুমি সত্যকাম জাবাল (এই পরিচয়ই

আচার্যকে) বলিবে।" এখানে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জবালা বলিতেছেন তিনি পরিচারিকা অর্থাৎ ঝি, দাসী বা চাকরানী, অল্প বয়সে যখন সামর্থ্য ছিল সংসার প্রতি-পালনের জন্য অনেক বাড়ীতে চাকরানীর বা ঝি-এর কাজ করিতেন স্বামী হয়ত দূরে কোথাও উপার্জন-উদ্দেশ্যে থাকিতেন, হয়ত ভৃত্য বা চাকরের কাজ করিতেন, ছুটি পাইতেন কম, বহুকাল পরে অল্প সময়ের জন্য আসিতেন, তখন পুত্রের মুখও দেখিতেন, কয়েকদিন পরেই কিন্তু চলিয়া যাইতে হইত। এ অবস্থায় পুত্রের জন্মকাল হইতে মাতাই তাহার লালনপালন এবং সামান্য অবসরকালে সৎশিক্ষাদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য মাতার পরিচয়েই পুত্রের পরিচয় ছিল। মাতা সেই পরিচয়—সত্যকাম জাবাল এই পরিচয় দিতে বলিলেন। পরিচারিকা বা ঝি বা চাকরানীরা শূদ্রাণী, তাঁহারা গোত্রের খবরের কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। স্বামী হয়ত তাহা জানিতেন, কিন্তু প্রয়োজনবোধ না থাকায় এবং অনেক গৃহে কর্ম করিতে হইত বলিয়া জবালা সে খবর জানিবার সময় পাইতেন না। স্বামী আসিলে যেটুকু সময় পাইতেন স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানেই নিয়োগ করিতেন, তাহাতেই ছিল তাঁহার আনন্দ। এখানে জবালার সৎসাহস লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বলিতেছেন, তিনি পরিচারিকা শূদ্রাণী, চাকরানীর কাজ করেন, তাঁহার পুত্র সত্যকাম, এই পরিচয় আচার্যকে দিতে বলিতেছেন।

আলোচ্য শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করা আমাদের সমীচীন মনে হয়। ইহাতে কোন দোষ থাকে না। জবালা যেরূপ নির্দোষ ও নির্ভীক ভাবে নিজের পরিচয় দিতেছেন, তাহা দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই মনে লাগে। আজকালও কোথাও কোথাও এইরূপ দেখা যায়। মাতা সংসারপ্রতিপালনের জন্য অনেক বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করিতেছেন। পিতা দূরে কোথাও উপার্জন উদ্দেশ্যে থাকেন, অল্পই বেতন পান, তাহা হইতে সামান্য ঘরে পাঠান। অল্প দিনের ছুটি পান, অল্প সময়ের জন্য আসেন। ছেলেমেয়েদের মাতার নামেই পরিচয়। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় অভিভাবক বলিয়া মাতার নামই লেখা থাকে। মাতা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়া অনেক বাড়ী কাজ করিয়া যাহা উপার্জন করেন, তাহা দিয়া কষ্টেসৃষ্টে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেন, বিদ্যালয়ে পড়ান।

এখন আচার্যগৃহে কি হইল, আমরা শ্রুতি হইতে দেখিব। সত্যকাম আচার্যগৃহে গেলেন—"স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্ত-মিতি॥" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪।৪।৩)। অর্থাৎ "তখন গৌতমবংশীয় হরিদ্রুমের পুত্র হারিদ্রুমত (নামক) আচার্যের নিকটে গিয়া সেই সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবান! আপনার (গৃহে) ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া বাস করিব; হে ভগবন্! (আপনার নিকটে) শিষ্যরূপে আসিয়াছি।"

তখন "তং হোবাচ, কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি।" (ছান্দোগ্য—৪।৪।৪), অর্থাৎ ("আচার্য) তাহাকে বলিলেন, হে সৌম্য! (তুমি) কোন্ গোত্রসম্ভূত?" "স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্মি অপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি, জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি; সোঽহং সত্যকামো

জাবালোহস্মি ভো ইতি।"—(ছা—৪।৪।৪)। অর্থাৎ, 'সে বলিল, মহাশয়! আমি কোন্ গোত্রসম্ভূত তাহা জানি না, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে উত্তরে বলিয়াছিলেন—আমি বহু (গৃহে গিয়া) পরিচারিকার কর্ম করিতাম, (সেই অবস্থায়) যৌবনে তোমায় লাভ করিয়াছিলাম। সেই (পরিচারিকা) আমি ইহা জানি না, তুমি যে গোত্রভুক্ত, আমি হই জবালা নাম্নী (মহিলা) আর তুমি হও সত্যকাম নামক (পুত্র)। মহাশয়! সেই আমি হইতেছি সত্যকাম জাবাল।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া, "তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি।" (ছা, ৪।৪।৫)—অর্থাৎ 'তিনি (হারিদ্রুমত) বলিলেন, এইরূপে সব কথা খুলিয়া বলা ব্রাহ্মণ না হইলে সম্ভব হয় না, হে সৌম্য! সমিধ্-কাষ্ঠ আনয়ন কর, আমি তোমায় উপনয়ন (সংস্কার) দান করিব, তুমি সত্য হইতে স্খলিত হও নাই।' (তুমি আচার্যগৃহে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ বাস করিতে পারিবে।) এখানে আচার্য হারিদ্রুমত, "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি।" অর্থাৎ 'এইরূপে নিজের কথা এমনভাবে খুলিয়া ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ বলিতে পারে না' বলিয়া সত্যকাম জাবাল যে ব্রাহ্মণগুণ-সম্পন্ন তাহাই বলিতেছেন। সে গুণ কি তাহা আচার্য নিজেই পরে বলিতেছেন, "ন সত্যাদগা ইতি" অর্থাৎ 'সত্য হইতে স্খলিত হও নাই, সত্য গোপন কর নাই।' মাতা শূদ্রাণী, তিনি শূদ্রাণীর কর্মই করেন। সেই শূদ্রাণীর গর্ভসম্ভূত সত্যকাম এই সকল কথাই আচার্যকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। সত্যকাম গোত্রকুলশীল কিছুই জানিতেন না। এইরূপ অজ্ঞাতকুলশীল শূদ্রের আচার্যগৃহে ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ উপনয়ন-সংস্কার হওয়া বা ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বাস করা সাধারণ দৃষ্টিতে সম্ভব না হইবার কথা। কিন্তু সে সকলই হইল, উপনয়ন হইল, ব্রহ্মচর্যবাস হইল, বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভও হইল। কারণ সত্যকাম ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন, ইহা আচার্য হারিদ্রুমত পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সে সকলই সত্যকামকে দিয়াছিলেন।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"—
(গীতা, ৪।১৩)

এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—চাতুর্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যং, ময়া ঈশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতম্। গুণকর্ম-বিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্ব-প্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য। অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণই চাতুর্বর্ণ্য—আমার (ঈশ্বরের) দ্বারা সৃষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। (এই সৃষ্টি) গুণকর্মবিভাগের দ্বারা—গুণ-বিভাগ ও কর্মবিভাগের দ্বারা (হইয়াছে)। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এইসকল হইল গুণ। সত্ত্বগুণ প্রধান, সাত্ত্বিক গুণ ব্রাহ্মণের।' অর্থাৎ এই গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া সেই ব্যক্তি গণ্য হইবেন। আচার্য হারিদ্রুমত একটি বিশেষ গুণ ব্রাহ্মণের থাকিবে বলিয়া নির্দেশ করিলেন—তাহা হইতেছে সত্য হইতে বিচলিত না হওয়া। সত্যকামের সে গুণ ছিল, সেইজন্য সে শূদ্র হইলেও তাহাকে আচার্য ব্রাহ্মণ বলিলেন। আচার্য শঙ্কর আলোচ্য গীতার (৪।১৩) শ্লোকের ভাষ্যে, 'ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি' অর্থাৎ 'শম দম তপস্যা ইত্যাদি'

ব্রাহ্মণের কর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এ সকল কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ। সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানলাভরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেইসকল শমদমাদি কর্ম করিবেন বলিয়া আচার্যগৃহে ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনপূর্বক বাস করিতে চাহিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে সত্যকাম শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণের গুণ তাহার রহিয়াছে, ব্রাহ্মণের কর্ম করিবার ইচ্ছা তাহার আছে এই জন্য সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। অর্থাৎ এইসকল গুণবিশিষ্ট হইলেও এইসব কর্ম করিলে চারিটি বর্ণের যে-কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, আর এইসকল গুণ না থাকিলে ও এইসব কর্ম না করিলে চারি বর্ণের কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয় না।

শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জানশ্রুতি রৈক্ক ও সত্যকাম জাবালের প্রসঙ্গে শ্রুতি নিজেই স্থাপন করিলেন।

মনুষ্যদের মধ্যে পুরুষের যেমন ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও আছে। মধ্বাচার্য তাঁহার পরাশরস্মৃতি-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥"

—Bombay Sanskrit series,
edition of Parashar Smriti
Bhasya by Madhvacharyya, P. 83

অর্থাৎ 'প্রাচীনকালে কুমারীদের মৌঞ্জী মেখলা ধারণ (উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ) করিবার বিধি ছিল। তাঁহারা বেদ (পড়াইতে), অধ্যাপন করাইতে এবং সাবিত্রীবচন বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদ-মন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারিতেন।' ইহা হইতেই পাওয়া যাইতেছে, স্ত্রীলোকদের উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণ, ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক বেদবিদ্যালাভার্থে আচার্যগৃহে বাস, বেদ অধ্যয়ন ও আবৃত্তি এবং বেদ অধ্যাপন ইত্যাদি অধিকার ছিল। সুতরাং তাঁহাদের বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যালাভ ও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভেরও অধিকার ছিল। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য সভায় ব্রহ্মতত্ত্ব-বিষয়ে বেদবিচার করিতেছেন, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৬।১ এবং ৩।৮।১-১২) দেখা যায়, বচক্লু ঋষির কন্যা গার্গী মহারাজ জনকের আয়োজিত প্রকাশ্য সভায় অপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের সহিত বসিয়া, সেই ব্রাহ্মণদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দুই দুইবার বেদবিচার, বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে বিচার করিতেছেন। অপর ব্রাহ্মণেরা একবার বিচার করিয়াই নিরস্ত হইতেছেন, কিন্তু গার্গী দুই দুইবার বিচার করিতেছেন। শেষবার বিচারের পর আর কেহ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন না—ইহা সেই সভায় সমবেত ব্রাহ্মণদের বলিয়া দিতেছেন। আর তাহাই পরে ঘটিল, ইহাও দেখা যাইতেছে। তথায় গার্গী ব্রহ্ম বিষয়ে, বেদ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় ভাল করিয়াই সভাস্থ সকলকে দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় সে নেতৃত্ব গার্গীকে দিয়াছিলেন। এইসকল শাস্ত্র হইতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকদের উপনয়ন-সংস্কারগ্রহণ, ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বনপূর্বক আচার্যগৃহে বাস, যাহা করিলে বেদ অধ্যয়ন, বেদ অধ্যাপন, বেদ আবৃত্তি, ব্রহ্মবিদ্যা বেদ হইতে লাভ করা সম্ভব হইত এবং সে বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় বিচার ও সেই বিচারে অপর বেদজ্ঞদের নেতৃত্ব করা চলিত—এ সবের অধিকার পুরুষদের ন্যায়ই ছিল।

শ্রুতিতে স্ত্রী ঋষির কথাও আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের সময় যে দেবীসূক্ত পাঠ করা হয়, ইহা ঋগ্‌বেদের মন্ত্র। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ এই মন্ত্র কয়টি দর্শন করিয়াছিলেন—তিনিই ইহার ঋষি। অপরে এই মন্ত্র তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যেরা আবার ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, এইভাবে পরম্পরাক্রমে এই মন্ত্র শ্রবণ করা চলিতেছিল—এইজন্য ইহা শ্রুতি, বেদের অন্তর্গত মন্ত্র।

যে স্ত্রীলোকদের কথা আলোচনা করা হইল তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী বা ব্রহ্মজ্ঞানী। অতএব স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—যে-কোন বর্ণের যে-কেহ যথোচিত গুণসমন্বিত হইলে এবং কর্ম করিলে পুরুষদের ন্যায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।

এখন আমরা কোথায় কিভাবে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় তাহা আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি।

শ্রুতিতে আছে:

“যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥”
(কঠোপনিষদ্—২।৩।৫)

অর্থাৎ—‘দর্পণে যেরূপ নিজ অবয়ব স্পষ্ট দর্শন করা যায়, সেইরূপ মনুষ্য নিজ হৃদয়ে স্পষ্ট ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে।

স্বপ্নকালে স্বপ্নের বিষয়গুলি যেরূপ দেখা যায়, পিতৃলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়।

জলে যেরূপ নিজ অবয়ব দেখা যায়, গন্ধর্বলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ হয়।

ছায়ার তুলনায় সূর্যের কিরণ যেরূপ স্পষ্ট, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সেইরূপ স্পষ্ট হয়।’

এই সব জানিয়া মনুষ্য-শরীরেই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা কর্তব্য।

‘শুভ শুক্রবার’ স্মরণে

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

প্রেমের দেবতা তুমি সবাকার প্রিয়,
জনমিলে বেথেলের দীন অশ্বশালে।
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলে বরণীয়
অমর বিভায় জ্বলে চন্দ্রিমাটি ভালে।

বাহিরের অত্যাচার বেত্রাঘাত শত
বিসর্জিয়া পূত তনু সকলের তরে
স’য়েছিলে কৃপাসিন্ধু দুঃখ অবিরত,
তবুও বোঝেনি ওরা বিদায়-বাসরে।

তোমারে হারায়ে আজি অশ্রুবিসর্জন
করে সবে, স্মরে তব প্রেম নিরন্তর।
মহাঋষি, অবতার, আপনার জন
মরণের মাঝে তাই হয়েছ অমর।

আজি শুভ শুক্রবারে জানাই প্রণাম
সবারে ক্ষমিয়া আলো দিলে গুণধাম।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-উপলব্ধির কথা পর্যায়ক্রমে বোঝাতে গিয়ে উপনিষৎ-প্রবক্তা ঋষি বলেছেন, "যুবা স্যাৎ সাধু যুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ।"[১]

"কেউ যদি বয়সে যুবক হয়, শুধু যুবক নয়, যদি সাধুপ্রকৃতি, অধীতবেদ, শ্রেষ্ঠ শাসক, সুদৃঢ়শরীর এবং সবচেয়ে বলবান হয়, যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তার অধিগত হয়, তবে তার যে আনন্দ, তা-ই মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আনন্দ।"

সুদৃঢ় বলবান দেহের প্রয়োজন শুধু স্থূল ইন্দ্রিয়ময় জীবনের জন্য নয়। সূক্ষ্মতর চিন্তাজগতের প্রয়োজনেও দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিশেষ সার্থকতা। আমাদের মনন-প্রধান শিক্ষাদর্শে সাধারণতঃ দেহগত পটুতা উপেক্ষিত। কিন্তু স্বামীজীর সামগ্রিক দৃষ্টিতে 'গীতাপাঠ' এবং 'ফুটবলখেলা'—কোনোটিই অবহেলার বিষয় নয়।

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর দু'-চারটি মন্তব্য লক্ষণীয়। "'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শরীরে মনে বল না থাকলে আত্মাকে লাভ করা যায় না। পুষ্টিকর উত্তম আহারে আগে শরীর গড়তে হবে, তবে তো মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই সূক্ষ্মাংশ। মনে মুখে খুব জোর করবি।"[২]

"এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের যে-সব লোককে এখন সত্ত্বগুণী ব'লে মনে করছিস, তাদের ভেতর পনেরো আনা লোকই ঘোর তমোভাবাপন্ন। এক আনা লোক সত্ত্বগুণী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা। দেশ যে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দেখতে পাচ্ছিস না? এখন দেশের লোককে মাছ মাংস খাইয়ে উদ্যমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্যতৎপর করতে হবে।"[৩]

'উদ্বোধন'-পত্রিকার মাধ্যমে সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে স্বামীজী নবজীবনপ্রবাহ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শিষ্যকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, "শরীরটাকে খুব মজবুত করতে তোকে শিখতে হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ আমি ডামবেল করি। রোজ সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel. (দেহ ও মন সমান ভাবে চলা চাই)। সব বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করলে চলবে কেন? শরীরটা সবল করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারলে নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে যত্ন করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের জন্যই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।"[৪]

এর তিন বছর আগে লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে চিঠি লেখার সময়ে

---

১ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ : ২।৮।১ : স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত উপনিষৎ-গ্রন্থাবলী (১ম) দ্রষ্টব্য

২ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : নবম খণ্ড : ১ম সংস্করণ : পৃঃ-৯৫

৩ তদেব : পৃঃ-১৫২

৪ তদেব : পৃঃ-১৭৭ দ্রষ্টব্য

স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন—'...আমি চাই এমন লোক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!'[৫]

অশৈশব খেলাধূলা ও ব্যায়ামে পরিপুষ্ট-দেহ নরেন্দ্রনাথ আপন স্বভাববশেই দেহ-মন-আত্মার সর্বাঙ্গীণ সমুন্নতি চাইবেন—এ কোনো আশ্চর্য তত্ত্ব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর তরুণ-মানসে যাঁরা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভিন্‌দেশী দর্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারও অন্যতম। স্পেন্সারের Education (শিক্ষা) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টির নাম 'Physical Education'; স্বামীজীর অনুবাদে 'শারীরিক শিক্ষা'।

শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে হার্বার্ট স্পেন্সার স্বভাবতঃই ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে সচেতন করতে প্রয়াসী। পাঠ্যপুস্তকের গুরুভারে অল্পবয়স্ক শিশুদের স্বাস্থ্যহানি সম্বন্ধে আমরা আজও সচেতন হয়েছি কি না সন্দেহের বিষয়। একশো বছরেরও আগে স্পেন্সার ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় শরীরচর্চার প্রতি অবহেলার যে শোচনীয় উদাহরণ দেখেছিলেন, আজকের ভারতবর্ষেও অনেকটা সেইজাতীয় শিক্ষাদর্শই প্রচলিত। ছাত্রদের মধ্যে তবু শারীরিক শিক্ষার কিছুটা প্রচলন আছে, ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা প্রায় অনুপস্থিত।' এমন কি, ছাত্রীদের পক্ষে শরীরচর্চার ততটা প্রয়োজন নেই, এ ধারণাও প্রচলিত। একদা যেমন ইংল্যাণ্ডে উচ্চবংশের মেয়েদের শুধুমাত্র কোমল পেলব বিলাসকলানিপুণা হওয়াই আদর্শ ছিল, এখনও আমাদের উচ্চশিক্ষার ধরন-ধারণ সেই পর্যায়ের। তার উপর বিদেশী কনভেন্ট বা ইংরেজী-মাধ্যম স্কুল-কলেজে পড়াশুনো হলে তো আর কথাই নেই, আলাপ-আলোচনায়, চাল-চলনে তখন তারা এতো কৃত্রিমতা অর্জন করে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রবলতম ইংরেজীয়ানার যুগেও এজাতীয় অনুকরণ-প্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে লজ্জিত হতো। এদিক থেকে স্বামীজী স্পেন্সারের গ্রন্থের অনুবাদকালে মেয়েদের খেলাধূলা ও ব্যায়ামের অংশটি সযত্নে তুলে ধরেছেন এবং পরবর্তীকালে স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শে জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আধুনিক নারীসমাজকে অবহিত করেছেন।

"আমাদের এক প্রকার বিশ্বাস আছে যে, যথেষ্ট শারীরিক বল ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোকের লজ্জার বিষয়। অনেকে বলেন যে, ঐ প্রকার পুরুষদিগের ন্যায় লাফালাফি করিলে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় কঠোরপ্রকৃতি হইবে। যদি বালক ঐ প্রকার করিয়া শিষ্ট-শান্ত ভদ্রলোক হয়, তাহা হইলে বালিকা ঐ প্রকার করিয়া কেন শান্ত ভদ্র স্ত্রীলোক হইবে না?"[৬]

নারীশিক্ষার আদর্শে এই দেহ-মনের সামঞ্জস্যমূলক অনুশীলনের কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে 'প্রফুল্লের' শিক্ষা-প্রসঙ্গেও দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষার নানা দিক দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারে মেয়েদের স্বাস্থ্যচর্চার দিকটি এখনও পূর্ণ মর্যাদা পায়নি।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অতিরিক্ত মস্তিষ্ক-চালনা সম্বন্ধে স্পেন্সারের আপত্তি ছেলেদের

---

৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৭ম খণ্ড: পৃঃ-২৮৭

৬ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ: বসুমতী সংস্করণ: পৃঃ-৯৪

শিক্ষার চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বেশী। এ সম্বন্ধে স্পেন্সার যে বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে সমস্যাটিকে দেখেছেন, স্বামীজীর ভাষায় তার অনুবাদ—"সাধারণতঃ বালকেরা যে প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ভার শমিত করে, বালিকারা তাহা পারে না। এই জন্য সহস্রের মধ্যে দশটির শরীরও সুদৃঢ় নহে। মানসিক সৌন্দর্যের হানি করা কোনমতেই উচিত নহে। কোন্ স্ত্রীলোক বিদ্যাপ্রভাবে স্বামীর একান্ত প্রেম-অধিকারে সমর্থ হইয়াছে? অনেকে হয়ত পুরুষজাতির সৌন্দর্যের দোষ দিবেন; কিন্তু ভগবানের এই সুন্দর নিয়ম কখনও নিরর্থক হয় নাই। যদ্যপি সৌন্দর্যলিপ্সা না থাকিত, তাহা হইলে ঐ প্রকার অসম্পূর্ণ শরীর পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিত এবং অল্পদিনেই মনুজবংশ লোপ পাইত। শরীর থাকিলে তবে বিদ্যা; শরীর যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে বিদ্যা লইয়া কি হইবে?"[৭]

শরীরচর্চার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আহার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের শাস্ত্রীয় সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক খাদ্যরুচির কথা মনে রেখেই বলা যায় যে, কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্যের উপরেই আহারের নির্বাচন অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। স্পেন্সার আহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় দেখিয়েছেন তৃণভোজী জীবজন্তুর চেয়ে মাংসাশী জীবজন্তুরা কত বেশী সতেজ, সবল ও সতর্ক। মানুষের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম যে অনেক পরিমাণেই খাটে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে স্পেন্সার লিখেছেন—"Count up the wild races who are well-grown, strong and active, as the Kaffirs, North American Indians and Pantagonians, and you find them large consumers of flesh. The ill-fed Hindoo goes down before the Englishman fed on more nutritive food; to whom he is as inferior in mental as in physical energy. And generally, we think, the history of the world shows that the well-fed races have been the energetic and dominant races."[৮]

আলোচ্য বিষয়টি আর একটু বিস্তৃতভাবে স্বামীজীর ভাষায় উদ্ধৃত করা যাক—"শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইলেই যে শক্তি থাকে, তাহা নহে। আবার আয়তন ছাড়িয়া যদি তেজের তুলনা করি, দেখিতে পাই নিরামিষাশী অপেক্ষা মাংসাশী শিশু কি শারীরিক কি মানসিক সকল বিষয়েই উন্নত। পশুদিগের মধ্যে গোমেষাদি এবং সিংহ-ব্যাঘ্রাদির তুলনা করিলে দেখিতে পাই যে, নিরামিষাশী অপেক্ষা মাংসাশী কতদূর শক্তিসম্পন্ন! মানুষদিগের মধ্যে বুস্‌ম্যান, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নিরামিষাশী অসভ্যেরা দুর্বল এবং খর্বাকৃতি, অন্যদিকে প্যাণ্টাগোনিয়ান, কাফ্রি প্রভৃতি মাংসাশী অসভ্যেরা কেমন সুগঠিত, কেমন দীর্ঘাকার এবং বলিষ্ঠ। অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকরখাদ্যসেবী হিন্দু অপেক্ষা মাংসাশী ইংরাজ মানসিক এবং শারীরিক বলে বলীয়ান এবং আবহমান কালই পুষ্টিকরখাদ্য-প্রতিপালিত জাতিরাই যে চিরকাল তেজস্বী এবং প্রধান হইয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে জগতের ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে।"[৯]

আমিষ-আহার-সম্বন্ধে স্পেন্সারের এই মতামত সবটাই যে স্বামীজী সমর্থন করতেন, তা মনে করবার কারণ নেই। পরবর্তীকালে

৭ তদেব পৃঃ ৯৭,৯৮

৮ Education: Herbert Spencer: 1st edn: p 158

৯ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ: বসুমতী সং: পৃঃ ৯১

পরিণত অভিজ্ঞতায় স্বামীজী এ সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তার আলোকে এ পর্যন্ত বলা যায় যে, অধ্যাত্মজগতের উচ্চ অধিকারীর ক্ষেত্রে নিরামিষ-ভোজনই প্রশস্ত মনে করলেও কঠোর জীবনসংগ্রামের ক্ষেত্রে আমিষ-আহারই যে বিধেয়, এ বিষয়ে স্বামীজীর দৃঢ়মত। স্পেন্সার মাংসভোজী ইংরেজকে শারীরিক ও মানসিক বলে নিরামিষাশী হিন্দুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলেও মানসিক বলের মাপকাঠি যে কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই বলেননি। যদি অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চ অধিকারীদের কথা ভাবা যায়, তাহলে নিরামিষভোজনের মহত্ত্বের কথা স্বাভাবিক-ভাবেই স্বীকার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অগ্রগামী চিন্তানায়ক বৈজ্ঞানিক অক্ষয়কুমার দত্ত কিন্তু বিদেশী গ্রন্থকারদেরই প্রেরণায় নিরামিষভোজনের পক্ষপাতী হয়েছিলেন। অবশ্য শেষজীবনে নিদারুণ মস্তিষ্করোগে তাঁকেও আমিষের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তবু নিরামিষ-ভোজনকেই একমাত্র ধর্ম মনে না করেও, নিরামিষের নিজস্ব গুণ মানতে হয়।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে এই আমিষ-নিরামিষ-প্রসঙ্গে স্বামীজী যে মন্তব্য করেছেন, একটু লঘু চালে হলেও তার চিন্তার গুরুত্ব লক্ষণীয়—"...প্রাচীন কাল হ'তে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ—আমিষ আর নিরামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি অপকারক ?...আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন। বর্তমানকালে শাস্ত্রও শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে না। পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নীরোগ হয় ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তা হলে হিঁদুরা নীরোগ হ'ত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত লোপাট হয়ে যেত এতদিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধি হওয়ার চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন যে, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই ; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে ; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হ'ত ; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল ; মাংসাহার আরম্ভ ক'রে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে। ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর একপক্ষ বলছেন—সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠ-শুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা ব'লে কি দুনিয়াসুদ্ধকে তাই করতে চাও ? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী

জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধূম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে। এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না।…

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজনই পবিত্রতর। যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারে দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বইকি।"[১০]

বেলুড় মঠে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একদা স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন—স্বামীজী, খাদ্যা-খাদ্যের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি ?

স্বামীজী। অল্পবিস্তর আছে বইকি।

শিষ্য। মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং আবশ্যক কি ?

স্বামীজী। খুব খাবি, বাবা ! তাতে যা পাপ হবে, তা আমার। তোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি—মুখে মলিনতার ছায়া, বুকে সাহস-ও উদ্যম-শূন্যতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, ভীরু কাপুরুষ।…

'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধধর্মের এই মত খুব ভাল, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে বলপূর্বক রাজ-শাসনের দ্বারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে। ফলে হয়েছে এই যে, লোকে পিঁপড়েকে চিনি দিচ্ছে, আর টাকার জন্য ভায়ের সর্বনাশ করছে। …অন্যপক্ষে দেখ্—বৈদিক ও মনূক্ত ধর্মে মৎস্য-মাংস খাবার বিধান রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারিবিশেষে হিংসা ও অধিকারিবিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে।'

প্রসঙ্গতঃ বলিদানের কথা আমাদের মনে জাগতে পারে। আধুনিক কালে শাক্তধর্মের কোনো কোনো সমালোচক বলিদানপ্রথার তীব্র বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের মতে মাংস খাওয়ার সঙ্গে দেবতার উদ্দেশে বলিদানের কোনো সম্পর্ক না রাখাই ভালো। বলিদানের নিষ্ঠুরতার কথাই তাঁরা স্বাভাবিক-ভাবে চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু পৃথিবীর সব প্রাচীন ধর্মেই ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশে যে-সব প্রিয় বস্তু নিবেদন করা হয়, তার মধ্যে মাংস অন্যতম। এ বিষয়ে ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান—এঁরা সকলেই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত মাংস গ্রহণের পক্ষপাতী। যে সমাজে মাংসাহার প্রচলিত, সে সমাজে এজাতীয় নিবেদন কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় স্বামীজীর বলিদানের ইচ্ছা যে ছিল, সেকথা তাঁর জীবনীকারেরা উল্লেখ করে গেছেন।[১১] অবশ্য সঙ্ঘজননী সারদাদেবীর নিষেধে শেষ অবধি আর বলিদান হয়নি। তবু দেবীপূজায় বলিদানে স্বামীজীর যে নিজের কোন-আপত্তি ছিল না, এও লক্ষণীয়। দুর্বল স্নায়ুর জন্য যারা সামান্য রক্তপাতেই কম্পমান তাদের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতায় স্বামীজীর এই ধিক্কার—

রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও,
পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।

দুখ চাও সুখ হবে ব'লে, ভক্তিপূজাছলে
স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা ॥

ছাগকণ্ঠরুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার,
দেখে তোর হিয়া কাঁপে

কাপুরুষ ! দয়ার আধার ! ধন্য ব্যবহার !
মর্মকথা বলি কাকে ?

(ক্রমশঃ

১০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ১৭৪-৭৫

১১ "যদি পারি তো এবার মা'র পুজো ক'রব। রঘুনন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্' —মার ইচ্ছে হয় তো তাও ক'রব।" বাণী ও রচনা : ৯ খণ্ড : স্বামি-শিষ্য-সংবাদ : পৃঃ ২২৬

আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রভাকর মিত্র

আচার্যগণের পথ চেয়ে ভারত প্রতীক্ষা করে, যথাসময়ে তাঁরা আসেন। এভাবেই এসেছেন আচার্য শঙ্কর ও স্বামী বিবেকানন্দ।

সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বললেন, "বৎস, গুরু গৌড়পাদের নিকট শুনেছিলাম তুমি আসবে। তাই সহস্র বৎসর অবস্থান করে আছি সমাধিতে।" এই ঘটনার এগার শত বৎসর পরে পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে অনুরূপভাবে পরম স্নেহে বললেন, "এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপ প্রতীক্ষা করে আছি—তা ভাবতে নাই?…"

আচার্য শঙ্কর এলেন অষ্টম শতকে। ভারতে তখন সনাতন হিন্দুধর্মের ঘোর অমানিশা। বৌদ্ধযুগের শেষের দিকের বিকৃত প্রভাব, প্রকোপ ও সংঘাতের ফলে হিন্দুধর্ম তখন বিপর্যস্ত, ক্ষীণবল ও শতধা বিভক্ত। সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হলেন আচার্য শঙ্কর। তখন সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ, সত্য ও মোক্ষফল-প্রদ বলে বিশ্বাস করতেন, স্পর্ধাও করতেন। অপর ধর্মমতে তারা যে ছিলেন শুধু আস্থাহীন তা নয়, ছিলেন বিরোধী ও বিদ্বেষী। হিন্দু-ধর্ম যে বেদমূলক তার সম্বন্ধে কারো পুরো ধারণা ছিল না। বেদের কর্মকাণ্ড পর্যন্ত কোন রকমে মানুষের প্রতীতি জন্মালেও বেদান্তের অজ নিত্য শাশ্বত আত্মোপলব্ধির ভূমিতে আরোহণ করার বার্তা তখনও তেমন সব মানুষের কানে এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু গুরু গোবিন্দপাদ জানতেন—এই সেই শিবাবতার শঙ্কর, যিনি বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করে জগতে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রচারের জন্য দেহধারণ করেছেন। পরম-হংসদেবও জানতেন, যে-নরঋষি মানব-কল্যাণের জন্য পূর্বে বহু বার নারায়ণের সঙ্গে মানবদেহ ধারণ করেছেন, নরেন্দ্রনাথ সেই নরঋষি। এই হল দু'জনের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ!

কাজেই বৈরাগ্যে রঞ্জিত গৈরিক বস্ত্রই এঁদের হল পরিধেয়। উভয়েই যোগী, নিত্য-সন্ন্যাসী। সপ্তমবর্ষে গুরুগৃহ হতে সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে সমাবর্তন করেন শঙ্কর। তাঁর ছিল অলৌকিক প্রতিভা; তিনি ছিলেন শ্রুতিধর। একদিন মাতা বিশিষ্টাদেবীর সহিত নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিনি কুমীর দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি মনে মনে আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে গৃহে ফিরে মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর অন্তিমকালে প্রত্যাবর্তন ও তাঁকে ইষ্টদর্শন করানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করেন।

"নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ"—একথা বলতেন পরমহংসদেব। নরেন্দ্রনাথেরও স্মৃতি-শক্তি ও প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। পিতৃ-বিয়োগের পর সংসারের নির্মম সংঘাত ও হৃদয়হীনতায় জর্জরিত অবস্থায় এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পর নির্বেদাপন্ন নরেন্দ্রনাথ পিতা-মহের মত সংসারত্যাগের মনস্থ করেন। কিন্তু পরমহংসদেবের নির্দেশ অনুসারে তখন তিনি বিরত হন। পরমহংসদেব বলেন,

"জানি আমি, তুমি মায়ের কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার জন্য থাক।" পরে ২৪ বৎসর বয়সে শাস্ত্রবিধানমত তিনি বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ।

উভয়েরই ঘটেছিল ইষ্টগুরুলাভ। বিদ্যাগুরুর নিকট শঙ্কর শুনেছিলেন যে, পতঞ্জলিদেব গোবিন্দপাদ নামে দেহধারণ করে নর্মদাতীরে ধ্যানস্থ আছেন। তাঁকেই তিনি মনে মনে গুরুপদে বরণ করেন। তাঁরই সন্ধানে তিনি মহর্ষি নারদের ন্যায় গৃহত্যাগ করে একাকী অজানা পথে বহির্গত হন। কত জনপদ, নদনদী, কত বিপদসঙ্কুল অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে নর্মদাতীরে বালক শঙ্কর গুরুগোবিন্দপাদের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রনাথের ন্যায় অকপট তীক্ষ্ণধী সত্যান্বেষী শিষ্যও "যিনি ভগবান প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও তাহাকেও প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন" এইরূপ সত্যদ্রষ্টা যোগ্য গুরু সন্ধান ক'রে লাভ করেন।

উভয়েরই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। তবে সমাধিস্থ হয়ে ভূমানন্দ সম্ভোগ করার জন্য এঁদের জন্ম হয়নি। যদিও প্রথমে দু'জনেই তাই চেয়েছিলেন। যোগশিক্ষা সমাপ্ত করে শঙ্কর চাইলেন গুরুর নিকট চিরনির্বাণ লাভ করার অনুমতি। তেমনি চেয়েছিলেন বিবেকানন্দও। কিন্তু গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করকে বললেন, "তুমি বৈদিকধর্ম স্থাপনের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের অংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করার জন্য গুরুদেবের আদেশে অপেক্ষা করেছি সহস্র বৎসর। তুমি এক্ষণে কাশীধামে যাও। সেখানে ভবানীপতি যা নির্দেশ করবেন তাই করবে।" বীরেশ্বরের প্রসাদে বিবেকানন্দেরও জন্ম। পরমহংসদেবও নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি হতে ব্যুত্থিত হবার পরেই বললেন, "মা তো তোমাকে সব দেখাইয়া দিলেন! এসব তালা বন্ধ রহিল; চাবি রহিল আমার হাতে! এখন কাজ আছে। কাজ শেষ হইলে আবার উহা ফিরিয়া পাইবে।"

উভয়েরই গুরুদেবের তিরোধানের পর আরম্ভ হয় কর্মসাধনা। গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করের শিক্ষা সমাপন হলে শঙ্করকে কাশীধামে গিয়ে ভবানীপতির নির্দেশমত কার্য করার উপদেশ দিয়ে বললেন—"এখন আমার কার্য শেষ হয়েছে। আমি সমাধিযোগে স্ব-স্বরূপে লীন হব।" তিনি তখন শিষ্যদের আশীর্বাদ করে দেহত্যাগ করেন। পরমহংসদেবও দেহত্যাগের দু-চার দিন পূর্বে নিজ শক্তি নরেন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত করে বললেন—"আজ তোমায় আমার সর্বস্ব দিয়ে ফকির হয়ে গেলাম। এই শক্তি দিয়ে তুমি জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করবে। এ কাজ শেষ হবার আগে তোমার ফিরে যাওয়া হবে না।"

উভয়েই কর্মপথে পেয়েছেন দৈব নির্দেশ। বেদান্তের একনিষ্ঠ সেবক আচার্য শঙ্করও সাধকরূপে ভারত পরিভ্রমণ করতে করতে ব্যাসাশ্রমে এসে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। কথিত আছে, ভাষ্যরচনায় পরিতৃপ্ত হয়ে বেদব্যাস তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন—"বৎস, যে দেবকার্যসাধনের জন্য তোমার দেহধারণ, তার পরিসমাপ্তির জন্য তোমার আরো ষোল বৎসর আয়ু বৃদ্ধি হল। তুমি বত্রিশ বৎসর এই দেহে বাস করবে। কুমারিল ভট্টকে পরাস্ত করা তোমার প্রথম কাজ। তারপর ভারত পরিভ্রমণ করে বেদান্তের মহিমা ঘোষণা করে তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে

হবে। এই সব কার্য শেষ হলে তখন তুমি স্ব-স্বরূপে লীন হবে।" এতে ভগবদিচ্ছা যে কতখানি অনুকূল তা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপটে জেগে ওঠে স্বামী বিবেকানন্দেরও অনুরূপ গুরুদেবের নির্দেশলাভ। তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে কন্যাকুমারীর শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে ফিরে আসার পর একদিন অর্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখলেন ভারতের উপকূল হতে নেমে পরমহংসদেব যেন সমুদ্রের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন এবং তাঁকে যাবার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। কি গভীর অর্থবহ এ দেবসঙ্কেত! বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে আমেরিকা যাবার নির্দেশ পেলেন।

কালের কিন্তু ভিন্ন গতি। প্রয়াগে এসে আচার্যদেব দেখলেন ভট্টপাদ তখন তুষানলে দেহত্যাগ করার মানসে তুষের স্তূপে আরোহণ করেছেন। তিনি আচার্যদেবকে দেখে বললেন, —"হে যতিবর, স্বদোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমি তুষানলে প্রবেশ করেছি। আমার দ্বারা আপনার কোন কার্য সিদ্ধ হবে না। তবে আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে জয় করলে আপনার সমস্ত জগৎ জয় করা হবে। তার পরাজয় আর আমার পরাজয় সমান।" মণ্ডন মিশ্রের সহিত কয়েকদিবসব্যাপী কূটতর্ক-যুদ্ধের পর তাঁর স্ত্রী সভানেত্রী উভয়ভারতী আচার্যদেবের অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্মিত হলে মিশ্র পরাভব স্বীকার করেন এবং আচার্য-দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালে মণ্ডনের ন্যায় দুর্ধর্ষ মীমাংসক দার্শনিকের সহিত বিচার-যুদ্ধে জয়লাভ উত্তরকালে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজীর বেদান্ত-বক্তৃতার পর পাশ্চাত্য জগৎ জয় করার, 'জড়বিজ্ঞান-কৌরব-রণে' জয়লাভ করারই মত। ঈদৃশ জয়লাভে উভয় ক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীল সন্ন্যাসী পাইলেন সর্বজনসমাদৃতি। আচার্যদেবের বিজয়-ডিণ্ডিম তখন ধ্বনিত হল দিকে দিকে। শিষ্যদের বিশেষ আগ্রহে তিনি বহির্গত হলেন দিগ্বিজয়ে। শঙ্করের দিগ্বিজয়যাত্রা এক অপরূপ দৃশ্য। বিরাট দিগ্বিজয়বাহিনী-পরিবৃত হয়ে (সহস্রাধিক শিষ্য, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত-প্রবরেরা এমনকি রাজারাও তাঁর অনুগামী, হতেন) মুণ্ডিতমস্তক, গৈরিকবসন-পরিহিত, দণ্ডকমণ্ডলুধারী, সৌম্যদর্শন, তরুণ যতিরাজ শঙ্কর চলেছেন শান্ত ধীর পদক্ষেপে—পথের দুই পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জনতা পুষ্পমাল্য, পূজোপ-করণ নিয়ে নিবেদন করছে তাদের হৃদয়ের ভক্তি, অন্তরের শ্রদ্ধা! এ দৃশ্যের অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপ্লুত হয়ে মন কালের তিমির ভেদ করে বিদ্যুৎগতিতে ফিরে আসে অনুরূপ এক দৃশ্যে—যেখানে স্বামীজী পূর্বোক্ত পাশ্চাত্য জগৎ জয় করে ফিরছেন। দেশে দেশে কী উদ্দাম উদ্দীপনা! কলম্বো হতে আলমোড়া সর্বত্রই কী বিপুল সংবর্ধনা! রামনাদের রাজা ও তাঁর অনুচরবৃন্দ গাড়ীর অশ্ব খুলে দিয়ে টেনে নিয়ে চললেন স্বামীজীর গাড়ী! স্বামীজী "যে আদর অভ্যর্থনা ও সম্মান শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, ভারতের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।...... যথার্থই ভারতবর্ষ জানে কেমন করে একজন আধ্যাত্মগুরুকে সম্মান দিতে হয়।" যে পথে একদিন তাঁরা অজ্ঞাত সন্ন্যাসী ভিখারীর বেশে চলেছিলেন, সেই পথেই ফিরেছেন তাঁরা বীর বিজয়ীর বেশে শতসহস্র লোকের পুরোধা হয়ে! "ভারতের তৎকালীন সর্বমতাবলম্বী যোগী, যতি ও পণ্ডিতগণ তাঁর (আচার্য শঙ্করের) গভীর জ্ঞানবত্তা ও মহামহিম জীবনের কাছে মস্তক অবনত করেছিলেন।" তেমনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—"কি ভারত-

বর্ষে, কি আমেরিকায় কোথাও এমন কেহ তাঁহার পাশে আসে নাই, যিনি তাঁহার নিকট নতশির না হইয়াছেন।......”

কিন্তু এঁদের এ দিগ্বিজয় বড় সুখের ছিল না। পথে দু'জনেরই অনেক ক্ষেত্রে জীবন হয়েছে বিপন্ন। পরহিতে মস্তক দান করতে গিয়ে কাপালিকের খড়্গ হতে নৃসিংহদেব রক্ষা করেন আচার্য শঙ্করের শির। অভিনব গুপ্তের গুপ্ত প্রক্রিয়ার ফল থেকে তাঁকে রক্ষা করেন তাঁর শিষ্য পদ্মপাদ। স্বামীজীও পরিব্রাজক-রূপে ভারত-পরিভ্রমণকালে অনাহারে এবং কাপালিকের কবলে মৃত্যুরও সম্মুখীন হয়েছিলেন; তৎপর বিদেশে, এমনকি ডেট্রয়েটে বিষমিশ্রিত কফি হতে তাঁকে রক্ষা করেন পরম গুরু পরমহংসদেব।

জীবনের ব্রত উভয়েই উদ্‌যাপন করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ বীর সন্ন্যাসী দু'জনেই পথে বেরিয়েছিলেন বেদান্তের পতাকা বহন করে—একক, একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করে—সম্বল অপরাজেয় আত্মশক্তি। তবে যুগের প্রয়োজনে তাঁরা আসেন; লোকসংগ্রহে তাঁদের জীবনের সাধনাও বিকাশ লাভ করে বিভিন্ন রূপে। আচার্য শঙ্কর শিবাবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দেবমানব। শৈশব কাল হতেই ধীর ও শান্তপ্রকৃতি। চিত্তের বিক্ষোভ তাঁর কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই লক্ষিত হয়নি। তিনি থাকতেন নির্বিকার পদ্মপত্রে জলের মত। তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বেদান্তভাষ্য। তাঁর যুগে ভারতে বর্ণাশ্রম প্রচলিত। জীবন ছিল সরল, জীবিকাও ছিল সহজ। লোকের দুঃখকষ্ট থাকলেও তা সমাজে বিকটরূপে প্রকটিত হয়নি। ভারত তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। তীর্থগুলি ছিল বিভিন্ন ধর্মমতের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। সমগ্র ভারত পদব্রজে পর্যটন করে আচার্য শঙ্কর এই সকল প্রাণকেন্দ্রে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে এক বৈদিক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করে অখণ্ড ভারতে আনলেন ধর্মের এক মহান ঐক্য। ধর্মই যে অখণ্ড ভারতের প্রাণস্বরূপ তা উত্তরকালে স্বামীজীও দিব্য আলোকে দর্শনলাভ করেন। তখনকার দিনে কূটতর্কে, বাগ্‌বিতণ্ডায় বা অলৌকিক যৌগিক শক্তির দ্বারা যিনি অপর পক্ষকে পরাভূত করতে পারগ হতেন, তিনিই হতেন জয়ী। এইরূপ ভাবেই বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সূর্যোপাসক, চার্বাক, কাপালিক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আচার্য শঙ্কর বিচারে প্রবৃত্ত হন, সকল ধর্ম-মতকেই বিচারে পরাস্ত করেন। স্বামীজীও শঙ্করের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছিলেন। তাঁরও বক্তৃতা বা রচনাবলীর প্রতিটি বাক্য “যুক্তিনিষ্ঠা, বিচারশীলতা ও আধ্যাত্মিক গভীরতা”র প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। আচার্য শঙ্কর বিভিন্ন ধর্মমতের সংস্কার সাধন করে তাদের করেন বেদানুযায়ী। অদ্বৈতবাদী হলেও তাঁর মধ্যে সংকীর্ণতার লেশ-মাত্র ছিল না। তিনি ছিলেন উদারপন্থী, দূরদর্শী ও ক্রমসমুচ্চয়বাদী; অধিকারিভেদে তিনি জ্ঞান, কর্ম ও দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতির অবিরোধী। গয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে তিনি বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতারজ্ঞানে অর্চনা করেন। ফলে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস হয় এবং কালের প্রভাবে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে ঘটে এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ! যে মধুর সুললিত ছন্দে তিনি স্তব রচনা করে দেবদেবীর বন্দনা করতেন তাহা অনবদ্য, অপূর্ব। তাঁর রচনাভঙ্গী, রসানুভূতি ও অনুপম কবিত্বমাধুর্য সর্বকালেই হৃদয়-গ্রাহী। তেমনি অতুলনীয় যুগোপযোগী সাহিত্য ও কবিতা সৃষ্টি করেন স্বামীজীও। তাঁর চিন্তায়

অনন্যা সৃজনীশক্তি, ভাষায় "অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য।" ভারতীয় শিল্প-জাগরণেও স্বামীজীর অবদান সামান্য নয়। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞও বটে। পরমহংসদেব বলতেন —"নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে সব তাতেই ভাল।" স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বললেন—"যে-ধর্ম পরধর্মের প্রতি ঔদার্য ও সর্ববিধ ধর্ম-মতকে স্বীকৃতি দান করিতে শিখাইয়াছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণায় স্বামীজী এযুগে সর্বধর্মসমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পরম-হংসদেবই দেখাইলেন "যত মত তত পথ"। সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর আচার্য শঙ্কর অখণ্ড ভারতে যে বৈদিক ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তার যথারীতি সংরক্ষণার্থে কুশলী সেনা-নায়কের ন্যায় তিনি ভারতভূমিকে চার ভাগে বিভক্ত করে চার বেদের অনুশাসনে চারদিকে চারটি দুর্গতোরণস্বরূপ বৈদিক মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই হল আচার্য শঙ্করের দেবাদিষ্ট কর্মসাধনা। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিবেণীই ছিল তাঁর জীবনের প্রতিভাস।

এর এগার শত বৎসর পরে এল স্বামীজীর যুগ। তখন জাতীয়তা-উচ্ছল বিরাট পৃথিবী জেগেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-মহাদেশের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে। শিল্পবিপ্লব ঘটে গেছে জগতে। শিল্পাশ্লিষ্ট জটিলতা-সমস্যার জট পাকিয়েছে সমাজে। মানুষের মন অধিকার করেছে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসুলভ দ্বিধা ও যুক্তি। বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে মানুষের জীবনে। ভারতে বর্ণাশ্রম অতীত। ভারতে তখন আর এক রকমের ঘোর দুর্দিন। সে তখন পরাধীন। পাশ্চাত্যের ধাঁচে সমাজের গোড়াপত্তন হতে চলেছে। ধর্ম তখন প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত। দাসত্বের অন্ধকারায় ভারত আত্মবিস্মৃত। তার চোখে ধাঁধা লাগিয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতা —সে তখন মোহাচ্ছন্ন। ভারতের এই রাজ-নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অন্ধকারের যুগে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই সাধক সন্ন্যাসীর অনন্যসাধারণ স্বদেশ-চেতনায় তীব্র কশাঘাত করলে ভারতবাসীর অশিক্ষা ও তার আজন্ম দারিদ্র্য। তিনি ছিলেন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ। বলা যায়, "তাঁকে জানলেই ভারতকে জানা যায়।" "তিনি যখন পরমহংসদেবের নিকট যান তাঁকে দেখেই পরমহংসদেব বুঝলেন —সমস্ত ভারত তাহার নিকট আসিতেছে। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে অতি যত্নে গঠিত করিয়াছিলেন।" স্বামীজী দেখলেন বিশালকায় "অজগর" নিদ্রিত। তাকে জাগাতে হলে চাই বিশাল শক্তি। পরমহংসদেব ছিলেন বিরাট শক্তির আধার। স্বামীজী বলেছেন,—"কয়েক শতাব্দী যাবৎ ভারতে এইরূপ মহাশক্তির বিকাশ আর কখনও হয় নাই।" আরো বলেছেন, "ভারতের পুনরুত্থানের জন্য এই শক্তির বিকাশ যথা-সময়েই হইয়াছে।" এই মহাশক্তির সঙ্কেতেই স্বামীজী পাশ্চাত্যে গমন করেন। তথাকার বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী সভ্যতার বুকে যে দ্বিধা-সংশয়ের ধোঁয়া বাসা বেঁধেছিল তা তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রেখে বেদান্তের আলোকসম্পাতে অপসারিত করে ভারতের জন্য লাভ করলেন উচ্চ আসন। স্বদেশে ফিরে এসে এই সৈনিক সন্ন্যাসী ঝঞ্ঝার মত বেগবান ব্যক্তিত্ব নিয়ে দেশের অবলুপ্ত চেতনার মূলে করলেন অভীঃমন্ত্রের অগ্নি-সংযোগ। দিকে দিকে সেই অগ্নি ঊর্ধ্ব শিখায়

জলে উঠল। তাঁর বেদান্তের বাণী উত্তপ্ত মদিরার মত জাতির শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত করলে জীবন-চেতনা।" "তিনিই হলেন ভারতের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা, তিনিই ইহার প্রধান নেতা।" "বিরাট"রূপে পূজা করলেন দেশমাতৃকার। বললেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসর যেন ভারতমাতা হন আমাদের উপাস্য দেবতা।" একথা তিনি বলেছিলেন ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে। তার ঠিক পঞ্চাশ বৎসর পরেই ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারতমাতার ললাট হতে অপসৃত হল দাসত্ব-কালিমা। স্বামীজীই "ভারতের মুক্তির জনক—কি রাজনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক, কি আধ্যাত্মিক।"

তবে জ্ঞানের আলোর চেয়ে হৃদয়ের আলোই যেন স্বামীজীর জীবনে বিকীর্ণ করেছে বৈদ্যুতিক দ্যুতি। বজ্রের মত কঠোর হলেও কুসুমের মত কোমল ছিল তাঁর হৃদয়। শঙ্করের জ্ঞানের সঙ্গে "বুদ্ধের হৃদয়"-ও ছিল তাঁর। তিনি বললেন, "হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক নহে।" আরো বললেন, "যতদিন পর্যন্ত না তোমার হৃদয় খুলিতেছে, যতদিন পর্যন্ত না ভগবানকে উপলব্ধি করিতেছ, ততদিন সব বৃথা···।" "···হৃদয়ের ভাষা তৃণগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান পর্যন্ত বুঝিতে পারে।" অখণ্ড ভারতের তীর্থে তীর্থে, মন্দিরে মন্দিরে ফিরেছিলেন আচার্য শঙ্কর মহাজ্ঞানী ধর্মসংস্কাররূপে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়ের ভাষা বহন করে ফিরেছিলেন রাজার রাজপ্রাসাদ হতে দীনের পর্ণকুটিরে। তাঁর হৃদয়রসে অভিষিক্ত হয়ে "নব" বেদান্ত দূর দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হল সর্বজনীন মানবতায়। তিনি বললেন, "বেদান্তের এই সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকবে না ; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎসজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হইবে।" আসন্ন শূদ্রযুগের পদধ্বনি তাঁর কর্ণে আসছিল। তিনি সমাজ-সমীক্ষার সুতীক্ষ্ণ আলোকে দেখলেন—শ্রেণীসংঘাত ও শোষণ। বিচলিত হৃদয়ে তিনি দান করলেন "মন-প্রাণ-শরীর" সমাজসেবাব্রতে। তাঁর উপাস্য দেবতা হলেন "পাপী-নারায়ণ", "তাপী-নারায়ণ" ও "সর্বজাতির দরিদ্রনারায়ণ"। ধর্মসংস্কারক ও ধর্মসংস্থাপকরূপে ভগবান্ শঙ্কর ভারতে করেন বৈদিকধর্মের পুনর্জীবনদান, তাকে যুগযুগান্তের স্থিতিশীলতায় করেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যুগাচার্য বিবেকানন্দ স্বদেশপ্রেমে মানবতাবাদী মহামানবরূপে আভির্ভূত হন। সমগ্র মানবজাতির হাতে তিনি দিলেন আত্মজ্ঞান-প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেক-বিজ্ঞান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে ঈশ্বরজ্ঞানে মানবসেবার আদর্শ স্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন ভারত ভিন্ন আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশেও ইহার শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন "সহস্রদল পদ্ম"। বেদান্তই ছিল তাঁর জ্ঞান ও কর্মের উৎসমূল।

জননী ছিলেন উভয়েরই জীবনে পরম-আরাধ্যা। মাতৃসেবা ছিল শঙ্করের অন্তরের জিনিস। প্রবাদ আছে বাল্যকালে মাতার নদীস্নানে দুঃখ দেখে অন্তরের কাতর প্রার্থনায় তিনি নদীর গতিবেগ গৃহের পাশ দিয়ে পরিবর্তন করে জননীর স্নানের ক্লেশ লাঘব করেন। কিন্তু হৃদয়ের আকুল বৈরাগ্য-আকাঙ্ক্ষা তাঁকে জননীর পাশে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তিনি গৃহত্যাগের সময় জননীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিমত তাঁর অন্তিম

শয্যা-পার্শ্বে এসে তিনি দাঁড়ান এবং তাঁকে ইষ্ট দর্শন করান। তেমনি একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন স্বামীজীও। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ২৯শে জানুআরি তিনি চিকাগো থেকে লিখলেন, "এ বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ দৃঢ় বিশ্বাস আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনও করি যে, যদি আমি সংসারত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না।" জগতের বৃহত্তর কল্যাণে উভয়েই মাতৃসেবা অসমাপ্ত রেখে গৃহত্যাগ করেন।

উভয়েই ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। দেহবাস-বর্জন বিষয়ে উভয়েই ছিলেন সচেতন। কাল পূর্ণ হলে আচার্য শঙ্কর হলেন অন্তর্মুখী। অধিকাংশ সময়েই ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। একদিন অপরাহ্নে শিষ্যদের বললেন, "বৎসগণ, এ দেহের কার্য সমাপ্ত হয়েছে। এখন স্ব-স্বরূপে লীন হবার সময় আগত। যে ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান তোমাদের উপদেশ করেছি তা গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত। তোমরা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও।" এইরূপ আশীর্ব'দ করে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে স্ব-স্বরূপে লীন হলেন। তাঁর বয়স তখন ৩২ বৎসর। মতান্তরে দেহত্যাগের সময় তাঁর বয়স ৩৪, ৩৬। পরমহংসদেবও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন: ওর কাজ শেষ হলে যখন দিব্যভাব-বিষয়ে সচেতন হবে তখনই ও ছেড়ে যাবে ওর দেহকে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রতি অক্ষরে ফলে-ছিল। স্বামীজী ১৮৯৭ জুলাই মাসে আলমোড়া হতে লিখলেন, "আমি বুঝতে পারছি আমার কাজ শেষ হয়েছে…।" তখন থেকে তিনিও অন্তর্মুখী। বলতেন, "আহা, আবার তাঁর মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে—যাই, প্রভু, যাই।" ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই বুধবার স্বামীজী বলেন, "আমি এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।" আর ৪ঠা জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি গভীরতম ধ্যানে মগ্ন হন। রাত্রি ৯টায় তিনি ধ্যানযোগে দেহত্যাগ করেন। বয়স তখন সবেমাত্র উনচল্লিশ।

এই দুই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা দিব্যলোক হতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে জগদ্ধিতায় যে মহৎ কর্ম সম্পাদন করে ফিরে গেলেন, তার গভীরতা বা পরিধি পরিমাপ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নয়! তাঁরা নিজেরাই এ সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত রেখে গেছেন তা থেকে লৌকিক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যেতে পারে। আচার্য শঙ্কর ছিলেন জাগ্রত চৈতন্যরূপে শিবাবতার। সমগ্র ভারতে বৈদিক ধর্মের পুন প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন তাঁর দেহধারণ। স্বরচিত অনুশাসনে আচার্য শঙ্কর বলেছেন, "কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়াং ঋষিসত্তমঃ। দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্।" সত্যযুগে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু, ত্রেতা-যুগে মহর্ষি বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস এবং কলিযুগে আমি বিশ্বগুরু।" স্বামীজীও ছিলেন "মূর্তিমান বেদান্ত।" শেষের দিকে একদিন বলেছিলেন, "যা দিয়ে গেলাম দেড় হাজার বৎসর চলবে।" অন্যত্র বললেন, "বিবেকানন্দ কী করেছে, আর একটা বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত।" শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "দেখ! মাতৃভূমির জাগ্রত আত্মায় বিবেকানন্দ এখনও জীবন্ত!…যে মহৎ কার্য দক্ষিণেশ্বরে আরব্ধ হয়েছে, তা সমাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা তাহা এখনও দেশ ভাল-ভাবে বোঝে নাই। বিবেকানন্দ যা পেয়েছিলেন

এবং রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত হয় নাই।"

আজ বিংশ শতাব্দীর আণবিক যুগে বিশ্ব-বিলোপের নিত্য-আশঙ্কার ভিতরেও যে ধর্মা-ধর্মাতীত সংস্কারবর্জিত উদার মানবতা বিশ্ব-রক্ষায় অন্তরে অন্তরে কার্য করে চলেছে, সেই পরিব্যাপ্ত সর্বগত মানবতাবাদের বিশ্ব-ধর্মের দিকে অগ্রগতি। এই বিশ্বধর্মগঠনে ভারতের সুপ্রাচীন প্রাণবাণীই প্রাণ সঞ্চার করবে—তপোবনে ঋষিকণ্ঠে উপনিষদাকারে একদা যা উচ্চারিত হয়েছিল, ধ্বনিত হয়েছিল আচার্য শঙ্করের কণ্ঠে, বিশ্বময় আবার যা ঘোষিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠ-নিঃসৃত হয়ে—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥" "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।"

"বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ দুঃখ, পালাও পালাও। সুখ কি একেবারে নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এ-ও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব? কেহ যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এদিক দিয়া যান না—তিনি বলেন, 'সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি'—আছে অথচ নাই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব, জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ তা তো প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি; আমি কি পশু যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব, জানিবার জন্য জান দিব।...তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে আমি গ্রাহ্য করি না। কি উচ্চভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart অণুমাত্র পান নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অতীত ভারত-ইতিহাসের একপৃষ্ঠা—ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

মানুষ স্মৃতির সাহায্যের জন্য অনন্ত অসীম কালকে বিভাগ করে এক একজন স্মরণীয় পুরুষের জন্ম বা মৃত্যু ধরিয়া। এই জন্মমৃত্যু-ঘটনাই কালকে ছেদ করিয়া অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ফেলে উপলব্ধির সাহায্যের জন্য। পাশ্চাত্যে আজকাল যিশুখৃষ্টের জন্মমৃত্যু ধরিয়াই কালনির্ণয় হইতেছে; যথা, খৃঃ পূর্ব অথবা খৃঃ পর। আমরাও তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি; এখন আর শালিবাহন রাজার দোহাই দিয়া বা উজ্জয়িনীরাজের দোহাই দিয়া পাঁজি না খুলিয়া কাল নির্ণয় করা যায় না। আমরা অনেকটা বুদ্ধ-পূর্ব বা বুদ্ধ-পর ধরিয়াই ইতিহাসের তথ্যকে সময়ের দিক দিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। এই হিসাবে খৃষ্ট এবং বুদ্ধের জন্ম আমাদের জ্ঞানবিভাগের সাহায্য করে। এর পূর্বেকার যা কিছু সব প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়ে। হয়ত কেহ কেহ বলিবেন আমাদের ঋগ্বেদের যুগ তো আছে? সত্য বটে ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম রচনা—তাহার ভাষাই তাহার প্রমাণ। সে-ভাষা যেন প্রথম মানুষের বাক্-এর আরাধনা। ধাতুগত ভাবে তাহা অনেকাংশে মধ্যপ্রাচ্যের ও গ্রীসের প্রাচীন ভাষার সহিত জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার উৎপত্তি এবং বিকাশের কালনির্ণয় অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন খৃঃ পূঃ ৪,০০০ বৎসর। স্বামী বিবেকানন্দের মতে তাহা পাঁচ হইতে দশ হাজার বৎসর হইতে পারে। ইহার সঠিক কাল-নির্ণয় আজ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলার-এর মতে এর মন্ত্র ইত্যাদি মুখে মুখে সুদীর্ঘ কাল চলিতে থাকে, লিখন আবিষ্কারের পর তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ পায়। কাজেই এর উৎপত্তিকাল কুয়াশা-আবৃত থাকিয়াই যাইবে। লেখনী আবিষ্কারের কাল মধ্যপ্রাচ্যের সভ্য জাতির ইতিহাস হইতে কতকটা নির্ণীত হইয়াছে—যেমন এসাই-রিয়ান, সুমেরিয়ান, বেবিলোনিয়ান প্রভৃতি জাতির আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারা। সেটাও জন্ম নিয়াছিল symbol বা প্রতিমূর্তির আকারে। বর্তমান-আকারে অক্ষর-সৃষ্টি তাহার বহু পরে। মানুষের প্রকৃতিতে ইহাই আছে যে, সে শুধু জানিয়াই সন্তুষ্ট নহে, সে আত্মপ্রকাশের জন্য উদ্‌গ্রীব। যাহা মানুষকে অন্য জীবকুল হইতে পৃথক স্থান দিয়াছে এবং মানুষের জ্ঞান নিয়তই ভাগাভাগি হইয়া জগৎ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

এই সকল এসাইরিয়ান, বেবিলোনিয়ান, সুমেরিয়ান, বেকট্রীয়ান জাতির সভ্যতা পাঁচ হাজার বৎসরের কাছাকাছি বৈজ্ঞানিক ভাবেই নিরূপিত হইয়াছে।

ভারতীয় প্রাচীন কাল নির্ণয়ের মহা অসুবিধা এই যে, মহাভারতাদি যাহা কিছু ইতিহাস ভারতের আছে তাহা ঐতিহাসিক সত্য অপেক্ষা পারমার্থিক সত্য প্রকাশেই সমধিক মনোযোগী থাকায় তাহা mythology বা পুরাণের সহিত এভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, তাহা আমাদিগকে কালের সত্যনির্ণয়ে

মোটেই সাহায্য করে না। বহু রাজা-রাজড়ার জন্ম-উল্লেখ তাহাতে দেখা যায় কিন্তু তাহাদের কালনির্ণয়েরও কোন গবেষণা এদেশে আজ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হইয়াছে তাহাও সংশয় বৃদ্ধি করে মাত্র। আবার কতকগুলি নাম এমন অর্থব্যঞ্জক, সেগুলি শুনিলেই সন্দেহ হয় যে, তাহা ইতিহাসের পূর্বের নহে, ইতিহাসকে অর্থযুক্ত করার জন্য তাহা পরে কল্পিত হইয়াছে। অবশ্য তাহাতে নীতি বা ধর্ম-সংক্রান্ত উপদেশের কোন খর্বতা হয় না—খর্বতা হয় ইতিহাস-উপলব্ধির, যাহা ভারতীয়দের কখনই মূল লক্ষ্য ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে পার্থক্য দেখি প্রথমতঃ গ্রীক জাতির ও পরে মুসলমান জাতির। ইঁহারা ইতিহাস-লিখনকে জ্ঞানের একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন, যেমন গ্রীসে হিরোডোটাস এবং মুসলমাদের অলবেরুণী প্রভৃতি।

এই ইতিহাস-রচনা বা ঐতিহাসিক সত্য-উপলব্ধি বিষয়ে বুদ্ধদেবের জন্ম আমাদিগকে খুবই সাহায্য করিতেছে; তাহাও খৃষ্টজন্মের সঙ্গে যোগ করিয়া। বুদ্ধের জন্মকর্ম নিয়া অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে। খৃঃ পূঃ ৬২০ হইতে ৫৪৩ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের স্থিতিকাল। একজন ঐতিহাসিক আবার গবেষণামূলে বলেন ৫৬৩ হইতে ৪৮৩ খৃঃ পূঃ। তবেই দেখুন, আধুনিক কালেও এই বিভ্রান্তি। তবে একমাত্র স্বীকৃত সত্য হইল গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই ভারতের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই। কিন্তু খৃষ্টের জন্ম নিয়াও অনেক গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এ প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হইবে বৌদ্ধদের প্রচারিত ও প্রসারিত ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের কতখানি সাদৃশ্য তাহাই দেখানো এবং উভয় ধর্মের আলোকে ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ। বেদ-উপনিষদই আমাদের হিন্দু-ধর্মের প্রধান মূলগ্রন্থ—তাহা যতদিনে যে ভাবেই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকুক। শাক্যসিংহ গৌতম বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ছিলেন, সুতরাং হিন্দুধর্মের সহিত তিনি সুপরিচিত। অশ্বঘোষ তাঁহার প্রথম জীবনচরিত-লেখক। সেটা অবশ্য তাঁহার তিরোধানের অনেক পরে হইলেও তাহা প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। তাহাতে পাই দেবল ঋষি তাঁহার জন্মকালে লক্ষণাদি দৃষ্টে তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। এই সব ঋষি-পরিবেষ্টিত পিতৃসন্নিধানে তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ খুবই স্বাভাবিক; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত আলোচনারও প্রমাণ আছে। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাও তাঁহার অধিগত হইয়াছিল। এ অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হইয়া মানুষের সর্ববিধ দুঃখ-নিরাকরণের সন্ধানে বাহির হন, যাহা শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহাকে দিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ তপস্যার পর তিনি যে সন্ধান লাভ করিলেন তাহাতে ছিল না কোন কল্পনা বা কৃত্রিমতার স্থান, তাহা ছিল নীতিজ্ঞানমূলক; সত্যকথন, সত্য-আচরণ ইত্যাদি আটটি পন্থা যাহা সমস্ত ধর্মেরই স্বীকৃত মূলভিত্তি। ইহার যে-কোনটি বাদ দিলেই যে-কোন ধর্মের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেবদেবী বা ঈশ্বর তাঁহার প্রচারিত ধর্মের আওতায় আসে না। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি নীরব। যাহা সাধারণের বুদ্ধির বিষয়ীভূত নয়, তাহা তিনি কখনও প্রচার করিতেন না। অবশ্য দেবদেবীর উপাসনায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদিগকে তিনি বাধাও দেন নাই; কাজেই

বুদ্ধসংঘের পার্শ্বে আমরা পাই হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত শাস্ত্র-বিচারেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। কাজেই তিনি কোন সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা হারান নাই।

লক্ষ্য তাঁহার ছিল ত্রিবিধ দুঃখকষ্টের অতীত হইয়া সমগ্র মানুষের শান্তির পথ করা। হিন্দু-ধর্ম তথা বেদান্তধর্মেরও মূল লক্ষ্য তাহা। এই শান্তিলাভের প্রধান উপায় তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন—সর্বদুঃখের মূলে যে বাসনা, তাহার ত্যাগ। ধম্মপদের তহ্ণাবগ্গো অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইহার সহিত আমরা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় তুলনা করিতে পারি। লক্ষ্য ও উপায় যখন একই তখন ভগবৎকৃপা ইত্যাদি বিষয়কে তিনি জড়াইয়া পুরুষকারকে পঙ্গু করিতে চান নাই। তাই তহ্ণাবগ্গোর ২০।২১ শ্লোকে "আপনিই আপনাকে উদ্ধার কর।"—তাঁহার এই পৌরুষ-উক্তি লক্ষ্য করি। গীতায় দেখি "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্" ইত্যাদি (৬ষ্ঠ অধ্যায়)। কাজেই সর্বশাস্ত্রময়ী গীতাকে পাশা-পাশি রাখিয়া ধম্মপদ দেখিলে দেখা যাইবে, লক্ষ্য ও উপায়ে কোন বিরোধিতা নাই।

মানুষকে বুদ্ধদেব মনুষ্যত্বের উপরই দাঁড় করাইতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের বড় কথা জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ, তাহাও বুদ্ধদেব মানিয়া লইয়াছিলেন। তবে মৃত্যুর পর কি থাকে, কি যায়, কোথায় কি ভাবে থাকে, এ সব দার্শনিক তত্ত্বে তাঁহার চেলাদের মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে চলার পথে কোন বাধা জন্মায় না। Eschatology বা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে ধর্মে ধর্মে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন শাখায় মতভেদের চূড়ান্ত; সুতরাং এগুলি নিয়াও সংঘাতের সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বড় কথাই হইল, সব কিছুই পরিবর্তনশীল; এমন কি জীবাত্মা বা soul বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাও। বস্তুতঃ তাহারই পূর্ণ পরিণতি বুদ্ধমতে।

এই সব দার্শনিক মতভেদ লইয়াও বুদ্ধদেব হিন্দুর দশ অবতারের এক। বুদ্ধদেব পূর্ণপ্রজ্ঞ স্বীকৃত না হইলে তিনি এই অবতার-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন না। জ্ঞানের চরম সীমায় মানুষের কোন ভেদাভেদদৃষ্টি থাকিতে পারে না। তখন সবই যা আছে তাই। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত আর কি?

এখন চিন্তনীয় বিষয় এই যে, এমন সোজা সরল প্রাণবন্ত জ্ঞানমূলক সর্বলোকচিত্তজয়ী ধর্ম ভারত হইতে লুপ্ত বা বিতাড়িত হইল কেন? উত্তরে বলা যায় মানবচিত্তের দুর্বলতা। সাধারণ মানুষ চায় একজন সাকার উদ্ধারকর্তা, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সে মনোরাজ্যের ঊর্ধ্বতম অনুভূতিস্তরে উঠিতে পারে। এ যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। নিজেই তিনি শ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ। এই কারণেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধসংঘ বুদ্ধদেব-কেই সাকার ঈশ্বরের স্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। একদল হীনযান, তাঁহারা আদিম বৌদ্ধ দর্শন নীতি ও ও সদাচার ইত্যাদি সম্বন্ধে বুদ্ধবাণী অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ইঁহাদের প্রাধান্য থাকিল দক্ষিণদিকে সিংহল প্রভৃতি জুড়িয়া আর একদল যোগ করিলেন বুদ্ধের পূজার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বোধিসত্ত্ব এবং দেবদেবীর মূর্তিপূজার ব্যবস্থা; ইঁহাদের নাম হল মহাযান। হীন-যানীদের উদ্দেশ্য হইল ধ্যান ধারণা ইত্যাদি উপায়ে নিজ নির্বাণ বা মুক্তিসাধন অর্থাৎ সংসারচক্রে ঘোরাফেরা বন্ধ করা। ইহা ব্যক্তির

মুক্তি। আর মহাযানীদের লক্ষ্য হইল ব্যষ্টির উদ্ধার বোধিসত্ত্বদের আনুকূল্যে ও সাহায্যে। ক্রমে আসিয়া পড়িল তান্ত্রিক সাধনার যত স্থূল সূক্ষ্ম উপায়। খৃষ্টীয় ৫ম শতকে অসঙ্গ যোগ করিলেন তাহাতে যোগশাস্ত্র, এবং তাহার এক শতাব্দী পরেই হিন্দুর যত তান্ত্রিক মত শক্তি-উপাসনা ইত্যাদি এবং তদানুষঙ্গিক যত আচার অনাচার সবই ঢুকিয়া গেল সেই নির্মল স্রোতস্বতীরূপ বৌদ্ধধর্মে। বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুতন্ত্রের সৃষ্টির বহু পরে, ইহা স্বীকার্য। হিন্দুর তন্ত্রসাধনা বেদের প্রায় সমকালীন। তন্ত্রের পূর্ণ আলোচনা পাই কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্বতন বিচারপতি স্যর জন উড্রফ সাহেবের প্রকাশিত গ্রন্থমালায়। বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ দেবদেবীর পূজা-আরাধনাদি অধিকাংশই তন্ত্রমতে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হন। নবদ্বীপধামে বৈষ্ণব সাধনার পাশাপাশিই তান্ত্রিক সাধনা চলিতেছিল। প্রতিযোগিতার রেশারেশিও ছিল ঢের।

বাংলার তন্ত্রসাহিত্যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম চিরস্মরণীয়। আধুনিক কালেও অনেক সাধক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হইয়া বহু শিষ্যমণ্ডলী রাখিয়া গিয়াছেন আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তো প্রথম অবস্থায় তন্ত্রসাধনারই উজ্জ্বলতম মণি। নদী যেমন সমুদ্রেই বিলীন হয় তেমনি তিনি শেষধাপে ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে নূতন ভাবে নূতন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।

এই সুপ্রাচীন প্রত্যক্ষফলপ্রদ তন্ত্রসাধনা সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের নির্বাণের বহু পরে মহাযান বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিল ব্যভিচারদুষ্ট বিকৃত রূপে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থায় এই-জাতীয় তন্ত্রাচার বৌদ্ধধর্মকে কলুষিত করার ফলেই ভারত হইতে কুমারিল ভট্ট ও শ্রীশঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মকে নির্বাসিত করিতে সহজে সক্ষম হইয়াছিলেন। ('স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড, পত্রসংখ্যা ৩৪)। স্বামীজীর ইতিহাস-পর্যালোচনা ও ইতিহাস-চেতনা অপূর্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। কেবল একদেশদর্শী সমালোচকেরাই বলেন ভারতে শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মকে চাপিয়া মারিয়াছেন। শঙ্কর সম্বন্ধে এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না এজন্য যে, তিনি নিজে মায়াবাদের আশ্রয় নিয়া বুদ্ধের শূন্যবাদকেই প্রকারান্তরে গ্রহণ করিয়াছেন; যাহার জন্য তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল পণ্ডিতমহলে—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আর স্বামীজী তাঁহার অপূর্ব বেদান্তজ্ঞান ও ব্রহ্মৈক্যবুদ্ধি সত্ত্বেও বলিয়াছেন যে বুদ্ধের "ঈশ্বরবাদ নাই বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি" (ঐ পত্রসংখ্যা)। কী উদারতা! তিনি ভাবরাজ্যে কত উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তি যে কারণেই হউক, তান্ত্রিকতা-সুপরিপুষ্ট মহাযান বৌদ্ধধর্ম খৃঃ ৭ম শতকে (খৃঃ ৬৪৩) তিব্বতে প্রবেশ লাভ করে, তিব্বতের রাজা সমসেন লাম্পার দুই স্ত্রীর সাহায্যে। তাহার মধ্যে একজন ছিলেন চীনদেশীয়া। তাঁহারা অনেক দেবদেবীমূর্তি এবং হস্তলিপি (manuscript) প্রভৃতি ভারত হইতে তিব্বতে নিয়া যান। অনেক শিক্ষাবিদ্‌ও ভারত হইতে তথায় যান। তিব্বতী অক্ষরমালা (alphabets) তাঁহাদেরই সৃ[illegible] পরে ৭৪৭ খৃঃ অব্দে পদ্মসম্ভব নামক একজন বড় তন্ত্রাচার্যকে ভারত হইতে তিব্বতে লওয়া হয়। তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে তিব্বতে তিব্বতীয়দের প্রাচীন পোঁ-ধর্ম ও

ভারতীয় তন্ত্রধর্মের সংযোগে বিশ্ববিশ্রুত লামা-ধর্মের সৃষ্টি হয়। এই লামা-ধর্ম অত্যন্ত mystic বা রহস্যপূর্ণ। লামা-ধর্মে দীক্ষালাভ হয় শৈশবে, ৫।৭ বৎসর হইতেই গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারিরূপে।

প্রথমতঃ কোন মঠে (monastery) ঢুকিয়া চাকরের কাজে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়া শেষে লামাপদ-প্রাপ্তি হয়। লামা মানে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। সর্বোপরি দালাই লামা, তিনি তুর্কীর খলিফার মতো আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব শক্তির কেন্দ্র (both spiritual and temporal lord)। এই-যে মঠের দীক্ষা এবং শিক্ষা তাহা এত কঠিন নিয়মের ভিতর দিয়া সাধিত হয় যে, এর বিধান-কর্তাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহবাসের ব্রহ্মচর্যের কাঠিন্য ইহার সহিত কতকটা তুলনীয়। ভারতেই প্রায় শতাধিক বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ ছিল। তিব্বতে গিয়া তাহা সংখ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইল। কেবল সংখ্যাগুরুত্বে নয়, বিষয়-গুরুত্বেও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। তন্ত্র-সাধনায় একজন অতি সিদ্ধ ভারতীয় সন্ন্যাসী, যাঁহার নাম সিদ্ধনাগার্জুন, তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন। তাঁহার জীবনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ অভিজ্ঞতাপূর্ণ একখানি তন্ত্রগ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাহার নাম "সিদ্ধ-নাগার্জুন কক্ষপুট"। এই গ্রন্থখানি তন্ত্রশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্যমহিমামণ্ডিত। এই গ্রন্থখানি (manuscript) ভারতে নাই, তিব্বতের কোন বৌদ্ধ মঠে তাহা সংরক্ষিত বলিয়া অনেকেই অনুমান ও বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ চীনের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত ছিল বলিয়া।

তিব্বতে গিয়া তন্ত্রের অলৌকিক শক্তির বিকাশ ও প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা আভাস পাই একজন তিব্বতীয় ডাক্তার লবশং রাম্পার প্রসিদ্ধ পুস্তক (লণ্ডন হইতে প্রকাশিত) 'লাসার ডাক্তার' (Doctor From Lhasa) নামক গ্রন্থে। তিনি ডাক্তার অথচ একজন তিব্বতীয় যোগী। তাঁহার আর এক পুস্তক 'তৃতীয় চক্ষু' (Third Eye)। যাঁহারা যোগশাস্ত্রে এবং তন্ত্রশাস্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁহারা এই গ্রন্থগুলিতে একটা লুপ্ত বিজ্ঞানের সন্ধান পাইবেন। তিনি অনেক সময়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে যোগবলে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তন্ত্র একটা গুপ্ত-বিদ্যা, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা অবৈজ্ঞানিক হইবে এমন কোন কথা নাই। লামাদের প্রধান মঠে ভূমির বহু নিম্নদেশে কত যে গুপ্ত গুহা ও তাহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা! সেগুলির এখন চিহ্ন আছে কিনা জানা নাই। রাম্পার পুস্তকদ্বয় ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে এক আন্দোলন সৃষ্টি করে, কারণ রাম্পাও একজন বৈজ্ঞানিক। মানুষের দস্যুবৃত্তির (vandalism) ফলে অনেক জ্ঞানই ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, আজও হইতেছে—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন কথা আসে না। জার্মানীর মহাকবি গেটের মতে বলিতে হয়: যাহা প্রত্যক্ষ করি নাই তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত (reverentially) এক দিকে রাখিয়া দিয়া আলোকের অপেক্ষা করিব।

তন্ত্রসাধনা যে তিব্বতে গিয়া বহু বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সেখানকার মঠে মঠে অগণিত দেবদেবীর মূর্তি (iconography)। তাহার রূপ এবং প্রকারভেদই বা কত! আমাদের তন্ত্র-উপাসনার যত মূর্তি তাহা অনেকই এবং তাহা ছাড়া আরো বহু মূর্তি মন্দিরের গাত্রে গাত্রে নানা উজ্জ্বল বর্ণরাগে অঙ্কিত এবং কোন কোন স্থলে চমৎকার ভাবপ্রকাশক। প্রস্তর-

মূর্তিও বহু দৃষ্ট হয়। বুদ্ধমূর্তিই বা কত! অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ ইত্যাদি, এবং প্রত্যেক ভাবের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি। তাঁহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। দালাইলামা অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের অবতার (incarnation), তেসিলামা অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বা incarnation। দালাইলামাকে লক্ষণদৃষ্টে তিব্বতের শিশুমহল হইতে বাছিয়া বাহির করিতে হইত, তাঁহার দেহে পূর্বজন্মের মহৎ চিহ্নাদি দৃষ্টে। সেজন্য তিব্বত এবং নিকটবর্তী চীনপ্রদেশে হইত তাঁহাদের বিশেষজ্ঞদের এক বিরাট অভিযান নির্বাচনের পূর্বে। মন্দির-গাত্রে বুদ্ধমূর্তির চারিদিক বেষ্টন করিয়া স্ত্রী-পুরুষ বোধিসত্ত্বদের সঙ্গে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি। তাহাতে বাদ যান নাই আমাদের গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি, এমন কি হয়গ্রীব পর্যন্ত। দেবতাদের এক একটা সভার (assembly) মধ্যদেশে প্রায়ই বুদ্ধদেবের এক এক প্রকার মূর্তি। বোধিসত্ত্বের সংখ্যা অগণিত। সেখানে প্রায়ই symbol বা প্রতীকের সাহায্যে হয় ভাবের উন্মেষ ও প্রকাশ। এককালে মধ্যপ্রাচ্যে যথা বেবিলন, এসাইরিয়াতেও প্রতীকই ছিল ভাষা। এই symbolism বা প্রতীক অবলম্বন আধুনিক কালেও তিব্বতীয়দের বড় প্রচেষ্টা। প্রাচীন গ্রীস ও মিশরেও ছিল তাহাই।

আমাদের যোগসাধনার মুদ্রা ও আসন ইত্যাদিও সেখানে বহুত্বে পরিণত হইয়াছে। হস্তমুদ্রা অনেকগুলিই ফুটন্ত পুষ্পসদৃশ, কারুকার্যের চূড়ান্ত। কোনটা আশীর্বাদ, কোনটা অভয়দান, কোনটা ভীতি প্রদর্শন করে। চক্র ঘণ্টা মালা এগুলি তাহাদের উপাসনার উপচারের মধ্যে। ধূপ ধুনা ঘৃতের প্রদীপমালা আমাদের পূজাগৃহ স্মরণ করাইয়া দেয়। নানাভাব-প্রকাশক দেবীমূর্তিগুলি শক্তি-আরাধনার অপূর্ব নিদর্শন। মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি দেবীগুলি সৌন্দর্য ও কারুকার্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে। অবলোকিতেশ্বরের যেমন বহু আকৃতি, মঞ্জুশ্রীরও তাহাই। ধ্যানী বোধিসত্ত্বদের প্রকারও বিভিন্ন। তাঁহাদের ধর্মচক্রটি (wheel of life) একটি অর্থপূর্ণ প্রতীক। ভাব এবং কবিত্ব দুই-ই ইহার মূলে। চীন ও জাপানের বহু মন্দিরে দেবীমূর্তির বাহুল্য, তিব্বতেরই অনুকরণ হবে। ধ্যানী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দয়ার অবতার, তিব্বতের এক প্রধান সন্ত (patron-saint of wisdom)। আদি বুদ্ধকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা তিনি। চরাচর সকলই তাঁহার প্রকাশ (manifestation); দেবতারা অধিকাংশই ধ্যানী বোধিসত্ত্বের প্রকাশ বা manifestation! ঈশ্বরবাদ বাকী রহিল কই?

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত চিত্র (sketch) হইতে তিব্বতের লামা-ধর্ম, তাহাদের আদি পোঁ-ধর্মের সহিত ভারতীয় মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং তৎসহকারী ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের যোগে এক বিস্তৃত শাখা-প্রশাখাযুক্ত ধর্মবৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্তিই ইহাদের কোন না কোনটির প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে। সকল ধর্মশাস্ত্রের বিকাশই এইপ্রকার সংমিশ্রণের ফল মনে করি। আর্যপূর্ব সভ্যতা, যাহা হারাপ্পা ও মহেঞ্জদারোর সভ্যতা নামে খ্যাত তাহার অন্তর্গত ভূমিতেও মাটি খুঁড়িয়া (archeology) এমন সব দেব-দেবীর পাওয়া গিয়াছে যাহা পরবর্তী আর্যসভ্যতার কালে পূজা পাইয়া আসিতেছে। অন্য প্রাচীন দেশ অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাহা বর্জনের নীতি অপেক্ষা গ্রহণ ও নিজ দেহের অন্তর্ভুক্ত করাকেই ঐক্যের

ও সমন্বয়ের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার ও সকল শ্রেণীর লোককে অগ্রসর করাইবার পন্থাই অধিকারভেদ স্বীকার করিয়া লওয়া। মুসলমান ও খ্রীশ্চানরা প্রতিমাপূজার নামেই শিহরিয়া উঠেন এবং যে-কোন উপায়ে তাহাকে ধ্বংস করাই তাহাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য। অথচ দেখা যায় তাহারা একটিকে বিসর্জন করিতে গিয়া আর একটিকে—প্রতীককে ঈশ্বরভাবে আরাধনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ব্রাহ্ম খ্রীশ্চান প্রভৃতির সংঘাতে এবিষয়ে আমাদের যে-সব সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই প্রতিমাপূজা যে একশ্রেণীর লোকের উন্নতির পথে অপরিহার্য ধাপ—তাহা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এমনভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে সকলেরই চোখ খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা রচনা এবং কবিতা ইত্যাদি সেই সোজা সরল রাজপথেরই সন্ধান দিয়া আমাদের লুপ্ত প্রতিমাপূজার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। গীতায় আছে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।" পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিকদের মনেও আজ এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞান মানুষের চিত্তে পরমার্থ সম্বন্ধে যে শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়া যাইতেছে। অবিচার ব্যভিচার নির্মমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি মানুষ হারাইয়া ফেলিতেছে। এর প্রতিকার তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। আমাদের দেশের স্বামীজী প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ সমগ্রদৃষ্টিতে অর্থাৎ কার্যকারণের বাহিরে গিয়া এই বিশ্ব এবং বিশ্বস্রষ্টাকে দেখিয়া প্রকৃত সমন্বয় ও সত্যের পথ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে ঝগড়ার কোন স্থান নাই। লক্ষ্য যে এক, তাহা স্বীকৃত। যে যাহার ভাবের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া পরম ঐক্যে পঁহুছান, ইহাই হইল এদেশে যুগাবতারের নির্দেশ। নানা পথ। বিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক অণু পরমাণু, যা কিছু এই চরাচরের উপাদান, সব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমাদের মনোরাজ্যও বহিঃপ্রকৃতিরই অনুরূপ। কাজেই সেখানেও বর্জন অপেক্ষা গ্রহণের এবং সামঞ্জস্যকরণেরই প্রয়োজন বেশি। স্বামীজীর এই সামগ্রিক দৃষ্টি যেদিন সমস্ত জগৎ গ্রহণ করিবে, কার্যতঃ সেদিন দেশে-দেশে ধর্মে-ধর্মে মানুষে-মানুষে সকল বিভেদ ঘুচিয়া গিয়া প্রকৃত ধর্মরাজ্যের সৃষ্টি হইবে। ফলে সকল মানুষের সকল চেষ্টা, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে বাধাহীনভাবে প্রসারিত হইয়া কল্পনার অতীত এক উন্নত ভূমিতে মানুষকে স্থাপন করিবে, যেখানে দারিদ্র্য ও দুঃখদৈন্যের থাকিবে না অস্তিত্ব। দেবতারাই তখন পূর্ণ করিবেন মনুষ্যলোক। শুধু প্রতীক্ষা নহে, সেদিনকে আগাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতে বড় চেষ্টা মানুষের আর কি হইতে পারে? ধরার এই মরুভূমে তখন প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তখন "ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু" হইয়া উঠিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মতবাদের সহিত ঐক্য আজ আমরা সকলেই সম্পূর্ণ অনুভব করিতেছি। পরন্তু আমি মনে করি সমস্ত ধর্ম-উপধর্মগুলি যেন এক বৃহৎ ধর্ম-পিরামিডের এক একটি স্তম্ভ বা খিলান। সেই পিরামিডের সর্বোচ্চ চূড়া হইল স্বামীজী-প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তধর্ম, যাহা কোন দেশে কালে বা জাতিতে আবদ্ধ নয় এবং যাহা সর্ব

সভ্যজাতির দার্শনিক-চিন্তানায়কগণ প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিজ নিজ প্রচলিত ধর্মকে পরিত্যাগ না করিয়াও। সেই বেদান্তমতের ভিত্তিতেই সুদূর ভবিষ্যতে গড়িয়া উঠিবে এক বিশ্বব্যাপী ঐক্য ও মানবতা। এই বিরাট ধর্মসৌধ বা পিরামিডকে বিধৃত করিয়া রাখিবে নিষ্ঠা (faith) এবং প্রেম (love), যাহার গীতি স্বামীজী গাহিয়াছেন বহু কবিতায় ভাষণে ও রচনায়। তাহাই হইল "সূত্রে মণিগণা ইব।" সে-ই বেদান্তধর্মমূলক মানবতা অর্থাৎ সর্বজীবে এক অদ্বয় আত্মা, 'জীব শিব'; সকলই একই ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ অর্থাৎ মূলতঃ এক, এই বিশ্বাস হইতে মৈত্রী এবং জীবসেবার প্রেরণালাভ। স্বামীজী-প্রচারিত এই বৈদান্তিক মানবতাই মাত্র বিশ্বমানবকে দ্বন্দ্বাতীত ঐক্যভূমিতে স্থাপন করিতে পারে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়", যতই জোর গলায় আমরা ঐক্য ঐক্য বলিয়া চিৎকার করি না কেন। ধর্মভিত্তিশূন্য মানবতার ঐক্যধ্বনি শূন্যগর্ভ কোলাহল মাত্র। বুদ্ধদেবই জগতে প্রথম মানবতার ভাবুক ও প্রচারক। আজ তাহার মূলে দাঁড়াইবার একটা দৃঢ়ভূমি অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে ধর্মভাব না থাকায় তাহাতে কোন ফলোদয় হইতেছে না, মারণাস্ত্রের নিত্য নূতন আবিষ্কারে ধ্বংস নিশ্চয় জানিয়াও। আমাদের দেশে ধর্মকেই সর্বপ্রথমে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাই সত্যদ্রষ্টা এবং ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী প্রচার করিলেন—প্রথমেই অধ্যাত্মবিদ্যা তারপর অন্যান্য জ্ঞানলাভ ইত্যাদি; শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ চেষ্টা সমান্তরালে না চলিলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য, ইহাই স্বামীজীর শিক্ষার মূলে। কোন কোন সমালোচক বলেন, স্বামীজী নূতন কোন পন্থা নির্দেশ করেন নাই, সবই শাস্ত্রে আছে। ইহা এক ভ্রান্ত ধারণা। সূর্য চিরকালই এক কিন্তু সূর্যকিরণের ব্যবহারের নিত্য নূতন উদ্ভাবনা হইয়া জগতে জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে কত! সত্য চিরকালই এক, দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্য কত! কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বামীজী যাহা ভাবেন নাই, যাহা বলেন নাই এমন একটি দৃষ্টান্ত স্বামীজীর পরবর্তী সমাজ- ও দেশ-নায়কদের মধ্যে কেহ দেখাইতে পারিবেন কি? আমি বলি মানুষকে মানুষ-ভাবে কিংবা আরও উন্নত জীব-ভাবে বাঁচিতে হইলে বর্তমান কালে একমাত্র পথনির্দেশক স্বামীজীই। যত দিন যাইবে, মানুষের সমস্যা যত জটিল হইবে, জীবনসংগ্রাম যত কঠিন হইতে কঠিনতর হইবে ততই আমরা তাকাইব স্বামীজীর দিকে আলোকের জন্য সাগ্রহ দৃষ্টিতে। এই জন্যই তো এইসব পুরুষসিংহের জন্ম হয় এই মরুর দেশে, যাহা গীতার ভাষায় "দুঃখালয়মশাশ্বতম্।" স্বামীজীর নিজের ভাষায় বলিব—স্বামীজীর জন্ম ধর্মস্থাপনার্থে, যাহা তিনি গুরুর প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ—সকলকেই নিজ নিজ অভ্যস্ত ধর্মে দৃঢ় করা এবং সেই ধর্মকেই বেদান্তমতে জ্ঞানে কর্মে মোক্ষলাভে সার্থক করিয়া তোলা। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, তথাকথিত পৌত্তলিক সকলকেই এক আসনে বসাইয়া তিনি অর্ঘ্য দান করিয়াছেন। ইহাই তাহার বেদান্তধর্ম, যাহা সর্বব্যাপী আকাশের ন্যায়। তাঁহার বেদান্ত-ধর্মের ব্যাখ্যা জীবনের প্রতি স্তরকে, প্রতি কর্মকে আলোকিত করে, অর্থ দান করে মহা মনীষী বেদান্তবিদ্ ম্যাকস্-মুলারের মনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া। ধ্যানী বুদ্ধ যেমন আছেন, অভয়-

মুদ্রার বুদ্ধও পাশেই আছেন। স্বামীজীর মধ্যে যে বিপুল ঐশ্বর্য বিকশিত হইয়াছিল তাহাকে তিনি গোপনে রাখিয়াছিলেন এই জন্য যে, তিনি যেমন মানুষ, সকলেই ইচ্ছা করিলে সেরূপ হইতে পারে পুরুষকারের দ্বারা। ইহাই দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের মিলনাত্মক তাঁহার 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বাণীর অর্থ। স্বামীজী তাই বুদ্ধদেবের সেই শেষ বাণী সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ স্বামীজীর সেই অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন আকস্মিকভাবে। কিন্তু নিজ কুসংস্কারপূর্ণ দেশে তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহার পরিচয় দেন নাই শেষে তাহারা আরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইয়া পড়ে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার নিজের মতো এমনকি তাঁহা হইতেও বড় হউক। এ অভিমানশূন্যতার আর একটি দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে মিলে কি? এক মহান সোঽহং ভাবের মূর্ত প্রতীক।

স্বামীজীর বাণী ও প্রচার হইতেও বড় জিনিস হইল স্বামীজীর জীবন। অনেক সংস্কারক এবং নেতাদেরই হইল তাহার বিপরীত অর্থাৎ তাঁহাদের জীবনধারা তাঁহাদের বক্তৃতা ও প্রচারের বিপরীত। এ সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য উক্তি পাই জার্মানীর দার্শনিক ঐতিহাসিক Oswald Spengler-এর 'Decline of The West' গ্রন্থে—It is personality that counts. It was not the Christian Gospel but the Christian martyr that conquered the world. অর্থাৎ বাইবেলের বাণী নয়, কিন্তু যিশুর আত্মত্যাগ যাহা পৃথিবীকে জয় করিয়াছে। গীতায় অর্জুনের সব সন্দেহের, সব প্রশ্নের মীমাংসাই পাই স্বামীজীর জীবনে। আজকার এই বিশ্বব্যাপী সংগ্রামক্ষেত্রে, এই মহাকুরুক্ষেত্রে ধ্বনিত হউক স্বামীজীর পাঞ্চজন্যশঙ্খ, ধ্বনিত হউক বিশ্ব জুড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। ইহাই প্রত্যেক অভিমানশূন্য মানবহিতৈষীর কাম্য। ইহাই হউক দেবভূমি ভারতের মর্মবাণী। যদি আমরা নিজেরা সকল দুর্বলতা ও ভীরুতার ঊর্ধ্বে না উঠিতে পারি, নিজেরা "অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন" না করিতে পারি, তাহা হইলে কিন্তু আমাদের কথা কেহ শুনিবে না।

দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণ

স্বামী দীপ্ত্যানন্দ

তিরুমালাই তথা শেষাচল পর্বতমালাস্থিত ভগবান শ্রীভেঙ্কটেশ্বরের দর্শন লাভ করে, তাঁর প্রসাদ পেয়ে এবং পর্বতোপরি আকাশগঙ্গা, পাপবিনাশনম্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করে শ্রীবিষ্ণুনাম স্মরণ করতে করতে দেবস্থানম্ কর্তৃপক্ষ-পরিচালিত বাসে আঁকা-বাঁকা বার মাইল পার্বত্য রাস্তা অতিক্রম করে পর্বতপাদদেশে অবস্থিত তিরুপতি শহরে পৌঁছান গেল। তথায় বিখ্যাত শ্রীগোবিন্দরাজা স্বামী মন্দির, শ্রীকোতন্দরামা স্বামী মন্দির, শ্রীকপিলতীর্থম্-কপিলেশ্বর স্বামী মন্দির প্রভৃতি দর্শন করে তিরুপতি শহর হ'তে দুই মাইল দূরে অবস্থিত তিরুচানুর নামক স্থানে শ্রীপদ্মাবতী আম্মাবরী মন্দির দর্শন করলাম।

সেখান থেকে ফিরে আসতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত করে গেল। তিরুপতি শহরে একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-আহারাদি সমাপন করে দেবস্থানম্-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি পান্থশালায় বিশ্রাম করলাম। পান্থশালাগুলি বাস স্টেশনের সংলগ্ন। পান্থশালায় এক একটি প্রশস্ত কক্ষ; বিনা ভাড়ায় যাত্রীদের প্রয়োজনানুসারে থাকতে দেওয়া হয়। বার ঘণ্টার মধ্যে পান্থশালার আশ্রয় ছেড়ে যেতে হবে। ওখানে স্নানাদির ব্যবস্থাও আছে। এই বিশ্রামস্থানগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখাশুনা করার জন্য দেবস্থানম্ কর্তৃপক্ষ অনেক লোক নিযুক্ত করেছেন। অপরাহ্ণ চারটা অবধি আরামে বিশ্রাম করে আবার বাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। এবার সরকারী বাস নয়, কিংবা দেবস্থানমের বাসও নয়, পাবলিক বাস সার্ভিসের প্রাইভেট বাস। গন্তব্য স্থল কালাহস্তী। স্থানটি তিরুপতি শহর হতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। সাউথ রেলওয়ের রেণুগুণ্টা স্টেশন হতে পনের মাইল। অপরাহ্ণ চারটায় যাত্রা করে দেড় ঘণ্টায় কালাহস্তী পৌঁছলাম। স্থানটি একটি অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট শহরতলী। তথায় শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবমন্দির বর্তমান। মন্দিরটি বেশ বড়, অতি প্রাচীন ও প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মন্দিরসংলগ্ন দুইটি অতিথিশালা। একটি অন্ধ্র সরকার-কর্তৃক পরিচালিত, অন্যটি তিরুপতি তিরু-মালাই দেবস্থানম্ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। সরকারী পান্থশালাটি নূতন। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে এটির উদ্বোধন হয়। রাজ্যমন্ত্রীর একজন পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে থাকায় ঐ অতিথিশালায় আমরা আশ্রয় পেলাম। আমাদের কক্ষটি প্রশস্ত—আসবাবে সজ্জিত। দুটি চৌকি। স্নানাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা ভাল। একটু বিশ্রামের পর হাত-পা ধুয়ে আমরা মন্দিরদর্শনে যাত্রা করলাম। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধ্ররাজ্যের সব মন্দিরে প্রবেশ করতে হ'লে টিকিট করে যেতে হয়। এখানেও সেই এক ব্যবস্থা। পুলিশ অফিসারটি আমাদের সকলের জন্যই টিকিট করলেন। প্রতি টিকিট চার আনা করে। পূজাদি দিতে গেলে আরও দক্ষিণা দিয়ে টিকিট করতে হয়। কোন্ পূজাতে কত দর্শনী দিতে হবে বাহিরে তার একটা লিস্ট বোর্ডে লাগানো থাকে।

প্রবাদ আছে, দক্ষিণ দেশে যে প্রধান প্রধান শিবমন্দিরগুলি আছে, সেগুলির শিব হলেন এক একটি মহত্তত্ত্বের প্রতীক। কাঞ্চীপুরের একাম্রেশ্বর শিব পৃথ্বী মহত্তত্ত্ব। অপ্ হলেন জম্বুকেশ্বর শিব—ত্রিচিনপল্লীতে। তিরুভান্নামালাইতে অরুণাচলম্ শিব হলেন তেজ। কালাহস্তীতে এই শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ হলেন মরুৎ। আকাশ হলেন চিদাম্বরমস্থিত শ্রীনটরাজ। এই কালাহস্তীশ্বর শিবমন্দিরটি স্বর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত। নদীটি অল্প প্রশস্ত নদীতীরে কুঠিয়াতে কিছুসংখ্যক সাধু বাস করেন। এই শিব-লিঙ্গকে শ্রীকালাহস্তী বলা হয়। প্রবাদ আছে, 'শ্রী' অর্থাৎ মাকড়সা, 'কালা' অর্থাৎ সর্প এবং হস্তী অর্থাৎ হাতি, এই তিনটি প্রাণীই প্রথমতঃ এই স্থানে ভগবান শঙ্করকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করে। এই শিবলিঙ্গে ইহাদের তিনটিরই চিহ্ন এখনও বর্তমান।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ভগবানের সান্ধ্য আরাত্রিক হ'ল। আরাত্রিকের সাথে সাথে 'নাদস্বরম্' ও অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্রাদি সুললিতচ্ছন্দে বাজছিল। একটু দূর

থেকেই আরাত্রিক দর্শন করলাম, আরাত্রিক-দর্শনার্থী যাত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক। তারপর ক্রমশঃ সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়ে গর্ভমন্দিরের দ্বারে উপনীত হলাম। চার-পাঁচ ফুট উঁচু কাল পাথরের শিবলিঙ্গ দর্শন করে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করলাম। রাজমান্দ্রীর পুলিশ অফিসারটি ফুল, ফলমূলাদি, নারিকেল ও কর্পূর দিয়ে ভগবানের পূজা দিলেন। ঐ কর্পূর দিয়ে সামান্য আরাত্রিক হ'ল। আরাত্রিকের পর প্রজ্বালিত ও নিবেদিত অগ্নি স্পর্শ করে একটু স্নানজল পান করলাম। তারপর গর্ভমন্দির হতে বেরিয়ে এসে মন্দির-অভ্যন্তরস্থ 'প্রকরম্'গুলি অর্থাৎ প্রদক্ষিণপথগুলি দেখতে আরম্ভ করলাম। মন্দিরে তিনটি প্রদক্ষিণ-পথ। প্রথমটি ঠিক গর্ভমন্দিরের চতুর্দিকে। দ্বিতীয় প্রদক্ষিণপথটি একটু বাইরের দিকে। এই পথের একপাশে বিভিন্ন প্রকারের ও আকারের বহু শিবলিঙ্গ এবং আলোয়ারদের মূর্তি। ছাদ হতে আরম্ভ করে চতর্দিকের সমগ্র করিডর প্রস্তরের সূক্ষ্মকারুকার্যপূর্ণ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দ্বারা সুসজ্জিত। একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে চারদিকের করিডরগুলি খুবই সুন্দর দেখায়। তখন ডিসেম্বর মাস। উৎসবের সময়। মন্দিরের অভ্যন্তর বিভিন্ন রং-এর আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের চারদিকে চারটি দ্বার এবং দ্বারগুলির উপর এক একটি উচ্চ গোপুরম্। ঘণ্টা খানেক ঘুরে ঘুরে মন্দির দর্শন করে বাইরে এলাম। মন্দিরের অতি নিকটে একটি "মণ্ডপম্" অর্থাৎ ছোট নাট-মন্দির-সদৃশ কক্ষ আছে। তার নাম "মণিকন্যাঘাটম্"। এখানে মণিকন্যা নাম্নী একটি ভক্তিমতী মহিলা বাস করত। কথিত আছে, এই মহিলার মৃত্যুসময়ে ভগবান শঙ্কর তার কর্ণে "তারকব্রহ্মমন্ত্র" উচ্চারণ করেছিলেন। এই বিশ্বাসের বলে আজও অনেক লোক এখানে এসে থাকেন এই আশায় যে, ভগবান শঙ্কর মৃত্যুকালে তাঁদের কর্ণেও "তারকব্রহ্মমন্ত্র" উচ্চারণ করবেন এবং তাঁদের মুক্তি হয়ে যাবে। ঠিক কাশীবাসের মতো। এই কালাহস্তী স্থান সম্বন্ধে আরও একটি প্রবাদ আছে যে, ইহার নিকটবর্তী পাহাড়ে একদা অর্জুন বহু কৃচ্ছ্র-সাধন করে ভগবান শঙ্করকে সন্তুষ্ট করেন এবং তাঁর নিকট হতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। অর্জুন এই স্থানে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে কান্নাপ্পার নামক একটি ভক্ত এই শিবলিঙ্গকে খুব আন্তরিকতা নিয়ে পূজা করত। কান্নাপ্পার তামিলদেশীয় ও জাতিতে ব্যাধ ছিল। জন্তু-জানোয়ার শিকার করে তারই মাংস এই ব্যাধ ভক্তটি ভগবান শঙ্করকে প্রতিদিন অতি শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করত। কথিত আছে একদা ভগবান শঙ্কর কান্নাপ্পার এই ভক্তির গভীরতা পরীক্ষা করতে উদ্যত হন। একদিন কান্নাপ্পার দেখল যে, ভগবান শঙ্করের একটি চক্ষু দিয়ে রক্ত নির্গত হচ্ছে। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে এই রক্ত বন্ধ করতে পারল না। ব্যর্থ হয়ে এবং অনন্যোপায় হয়ে ভক্তির আতিশয্যে ভক্ত কান্নাপ্পার তার একটি চক্ষু উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের রোগগ্রস্ত সেই চক্ষে লাগিয়ে দিল। কিন্তু সে চক্ষুটি ভাল হলেও ভগবানের আর একটি চক্ষু হতে অনুরূপভাবে রক্ত নির্গত হতে আরম্ভ করল। ভক্ত কান্নাপ্পার একটুও ইতস্ততঃ না করে তার অন্য চক্ষুটি উৎপাটন করে ভগবান শঙ্করের চক্ষে স্থাপন করল। এভাবে দুটি চক্ষু দান করে অন্ধ হয়েও কান্নাপ্পার ভগবানের সেবা

করে। ভগবান শঙ্কর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দর্শন দান করেন, চক্ষু ফিরিয়ে দেন এবং আশীর্বাদ করেন। মহাশিবরাত্রিতে এই কালাহস্তীশ্বর মন্দিরে দশদিনব্যাপী উৎসবাদি হয়। তখন বহু দূরদেশ হতেও অনেক যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে। মকর সংক্রান্তির তিন দিন পরে এখানে আরও একটি উৎসব হয়ে থাকে। তখন ভগবান শ্রীকালাহস্তীশ্বরের উৎসব-মূর্তি নিয়ে একটি বড় শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রাটি কালাহস্তী শহর ও তৎসংলগ্ন পাহাড় পরিক্রমা করে।

এইভাবে শ্রীকালাহস্তীশ্বর শিবমন্দির দর্শন শেষ করে আমরা পান্থনিবাসে ফিরে গেলাম। রাত্রি তখন আটটা। সকলেই তখন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। মন্দির হতে বাহিরে এসে কিছু প্রসাদ কিনে খাওয়া গেল। তারপর অতিথি-নিবাসে গিয়ে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমার সঙ্গীটি তখন নিকটবর্তী বাজারে কোন এক হোটেলে খেতে গেলেন এবং সঙ্গে একটি বড় টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পর তিনি ঐ টিফিন-কেরিয়ার ভরতি করে আমাদের জন্য অনেক ভাত, তরকারী, দধি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। পরদিন খুব ভোরে উঠে "সুপ্রভাতম্" দেখতে আবার মন্দিরে গেলাম। নাদস্বরম্ ও অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্রের ঐকতান-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলারতি দর্শন করলাম। আরাত্রিকের প্রজ্বালিত অগ্নি স্পর্শ করে শেষবারের মত ভগবান শ্রীকালা-হস্তীশ্বরকে অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। তারপর কাল-বিলম্ব না করে স্থানীয় বাসস্টেশনে এসে কাঞ্চী-পুরগামী বাসে এসে উঠলাম। সেখান থেকে কাঞ্চীপুর পঞ্চাশ মাইল। নবোদিত সূর্যালোকে শ্রীকালাহস্তীশ্বর মন্দিরের উচ্চ গোপুরম্গুলি দেখতে দেখতে শহরসীমা অতিক্রম করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই গোপুরম্গুলি অদৃশ্য হয়ে গেল। বাস তখন নির্জন নিস্তব্ধ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে।

মধ্যে মধ্যে ভক্ত কান্নাপ্পার শ্রদ্ধা-ভক্তির কথা, ভগবানের সেবার জন্য স্বীয় চক্ষুদান, তাঁর অন্ধ হওয়া, ভগবান শঙ্করের আবির্ভাব ও আশীর্বাদপ্রদান প্রভৃতি কাহিনী স্মৃতিতে ভেসে উঠতে লাগল। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য তদীয় 'শিবানন্দলহরীতে' ভক্তিবিষয়ক যে স্তবটি লিখেছেন তা মনে পড়ল :

'ভক্তিঃ কিং ন করোত্যহো বনচরো
ভক্তাবতংসায়তে ॥'

অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তির দ্বারা কি না করা যায় ? বনচারীও উৎকৃষ্ট ভক্তরূপে পরিণত হয়।

তিন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে বেলা নয়টায় কাঞ্চীপুরম্ পৌঁছলাম। এই স্থানে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। সঙ্গী অফিসারটি একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। আমি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে চলে গেলাম। ভদ্রলোক সারাদিন মন্দিরাদি দর্শন করে অপরাহ্ণে পুনরায় কালাহস্তী যাবেন। আমি আশ্রমে গিয়ে স্নানাদি করে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আশ্রমটি শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত, চতুর্দিকে দোকানপাট, আশ্রমের সীমানা ঘেঁসে বসতবাটী। নিবাসগৃহগুলি অতি পুরাতন ধরনের। তিনজন সাধু থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাপূজা, ভোগরাগাদি নিত্য হয়ে থাকে। একটি লাইব্রেরী, কয়েক সহস্র পুস্তক, বিভিন্ন প্রকার মাসিক পত্রিকা ও দুই-তিন খানি দৈনিক পত্রিকা আছে।

কাঞ্চী অথবা কাঞ্চীভেরাম্ মাদ্রাজ শহর হ'তে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে চিংগলপুট জিলায়

অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের অতি প্রাচীন স্থানগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। পূর্বে এই শহর পল্লব রাজাদের রাজধানী ছিল। উত্তর ভারতে কাশীর মত দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চী অতি পবিত্র স্থান এবং বহুমন্দিরাদি-পরিপূর্ণ। "গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়" —সঙ্গীতেও এর মাহাত্ম্য প্রকট। ভারতের মধ্যে সাতটি স্থান বিশেষ পবিত্র বলে পরিগণিত হয়ে থাকে—অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী ও দ্বারকা। এগুলির মধ্যে তিনটি শিবের, আর তিনটি বিষ্ণুর স্থান। কিন্তু সপ্তম স্থান এই কাঞ্চী—শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই স্থান। শহরটি ছোট, দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগের নাম হল শিবকাঞ্চী অথবা বড় কাঞ্চী। আর একটি ভাগ হল বিষ্ণুকাঞ্চী অথবা ছোট কাঞ্চী। পল্লব রাজাদের রাজধানী এই কাঞ্চীপুরম্ একদা শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং শৈব, বৈষ্ণব, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বহু মন্দিরে পূর্ণ ছিল। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে কাশী ও কাঞ্চী শিবের দুটি চক্ষুস্বরূপ। যদিও এই স্থান প্রধানতঃ বৈষ্ণবদের তীর্থ, শৈবদেরও এখানে সমান অধিকার আছে। বিখ্যাত বৌদ্ধ পর্যটক হুয়েন সাং তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, ছয় মাইল পরিধিবিশিষ্ট এই শহরে বুদ্ধদেব ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, রাজা অশোক এখানে অনেকগুলি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। বিবরণীতে ইহাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এই কাঞ্চী শহর বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক ধর্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান ছিল। পর্যটনকারী হুয়েন সাং আরও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সপ্তম শতাব্দীতে তিনি যখন পল্লব রাজাদের চৌগুাইমণ্ডলম্ নামক শহর পরিভ্রমণ করেন তখন কাঞ্চীতে কয়েকশত সংঘারাম ও প্রায় দশসহস্র বৌদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। কিন্তু কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্য-বৃদ্ধির ফলে বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে বহু কাল শৈব ও বৈষ্ণব আলওয়ারগণ দাক্ষিণাত্যে খুব প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁরা শিব ও বিষ্ণু সম্বন্ধে ধর্মভাবের উদ্দীপনা-মূলক বহু ভজনগান রচনা করেন এবং সর্বত্র মধুর কণ্ঠে এইসব ভগবদ্বিষয়ক ও ভক্তিমূলক গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতেন। ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে গীত আলওয়ারদের গান জনসাধারণের মধ্যে এক অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে এবং সমগ্র দক্ষিণদেশকে হিন্দুধর্মের ভাবধারায় প্লাবিত করে। এইভাবে ক্রমশঃ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব সেইসব অঞ্চল হতে প্রায় বিলুপ্ত হয়। আজও কোন কোন মন্দিরে আলওয়ারদের রচিত ভক্তিমূলক গানগুলি সমবেতভাবে গীত হয়ে থাকে। শৈব আলওয়ার সম্বন্দর, আপ্পার, সুন্দরার, মাণিক্কা-ভাচাকার, তিরুমালার প্রভৃতির রচিত ভক্তিমূলক গানসমূহ তৎকালীন কোন নৃপতি একত্র সংগ্রহ করে এগারখানি গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত করেন। বৈষ্ণব আলওয়ারদের রচিত ভক্তিমূলক গানগুলিও একত্র পুস্তকা-কারে প্রকাশিত হয়।

রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মন পল্লববংশীয় নৃপতিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দ হতে ৬৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কথিত আছে তিনি প্রথমে জৈনধর্ম অবলম্বন করেন। তারপর শৈব আলোয়ার শ্রীআপ্পার-এর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি অনতি-বিলম্বে শৈব ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হন এবং এত উৎসাহী হন যে, এই শৈব ধর্মের উন্নতির

জন্য তিনি পুরাতন জৈন মন্দিরগুলি ভেঙ্গে তার জায়গায় বহু শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করেন। এই রাজা প্রথম মহেন্দ্র বর্মনের পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মন তাঁর রাজত্ব-কালে (৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) কাঞ্চীতে কৈলাসনাথ নামক বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। মাদ্রাজের নিকটবর্তী মহা-বলীপুরমেও তিনি সমুদ্র-উপকূলবর্তী বিষ্ণু-মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

কালাহস্তী হতে পরিশ্রান্ত হয়ে এসে একদিন রামকৃষ্ণ আশ্রমে বিশ্রাম লাভ করার পর কাঞ্চীতে মন্দিরাদি দর্শন করতে বের হলাম। প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন একাম্রনাথ মন্দিরে। সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলওয়ার 'জ্ঞানসম্বন্ধ'-রচিত ভক্তি-মূলক স্তব ও গান প্রভৃতিতে এই একাম্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ পাঁচটি মহত্তত্ত্বের প্রতীক। পূর্বে এই পাঁচটি শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এই একাম্রনাথ হ'ল পৃথ্বী মহত্তত্ত্ব। এই মন্দির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি কথিত আছে। একদা শিব ও গৌরীর মধ্যে এক ঘোরতর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। মনোমালিন্য-জনিত উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে গৌরী শিবকে একটু অবহেলা দেখান। প্রতিবাদে শিব গৌরীকে অভিশাপ দিলেন যে, গৌরীর মুখমণ্ডল সৌন্দর্যহীন হয়ে কুশ্রী আকার ধারণ করবে। যতদিন পর্যন্ত না গৌরী কাঞ্চীতে একটি মাত্র আম্রবৃক্ষের নিম্নে কঠোর তপস্যা করে বিষ্ণুর অনুগ্রহে শিবকে সন্তুষ্ট না করতে পারেন ততদিন পর্যন্ত গৌরীর এই কুশ্রী মুখমণ্ডল পূর্ব সৌন্দর্য ফিরিয়ে পাবে না। তদনুযায়ী গৌরী কাঞ্চীতে একটি আম্র বৃক্ষের নীচে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই বিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করেন। অনতি-বিলম্বে গৌরীর মুখমণ্ডলের পূর্ব রূপ ফিরে আসে। গৌরীর শ্রদ্ধাভক্তির গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য শিব একদিন তাঁর জটা হতে প্রবল বেগে গঙ্গাকে প্রবাহিত করেন। যে স্থানে গৌরী শিবের আরাধনা করছিলেন সেই স্থান দিয়ে গঙ্গা প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। হঠাৎ তীব্রগতিবেগসম্পন্ন এই গঙ্গাপ্রবাহ দেখে গৌরী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার্থ শিবলিঙ্গকে সজোরে জড়িয়ে ধরেন। ভগবান শিব সন্তুষ্ট হলেন। শিব ও গৌরীর পুনর্মিলন হ'ল। গৌরীর বিশেষ প্রার্থনায় শিব ঐ আম্রবৃক্ষের নিম্নে বিরাজ করতে রাজী হলেন। সেই অবধি শিব এখানে বর্তমান আছেন এবং একাম্রনাথ, একাম্রেশ্বর, একাম্বরনাথ বা একম্বান বলে কথিত হয়ে থাকেন।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষকর্তৃক নিয়োজিত গাইডের সমভিব্যাহারে প্রথমে একাম্রনাথ শিবমন্দিরে উপনীত হলাম। গাইড হ'ল স্থানীয় একটি কলেজ ষ্টুডেন্ট,—নাম শ্রীরামানুজম্, আশ্রমের অতি নিকটেই বাড়ী, প্রত্যহ এখানে যাতায়াত করে। মন্দিরের প্রথম প্রবেশদ্বারেই বৃহৎ গোপুরম্। তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করে গর্ভমন্দিরের সম্মুখে এসে উপনীত হলাম। ওখান হতেই ভগবানকে দর্শন করতে হয়। কিছু ফুল, ফল ও কর্পূর দিয়ে পূজা দেওয়া হ'ল। কর্পূর দিয়ে ভগবানের আরাত্রিক হ'ল। তারপর প্রজ্বালিত আরাত্রিক-অগ্নি স্পর্শ করে কিছু প্রসাদ নিয়ে মন্দির হতে বিদায় নিলাম। সমগ্র মন্দিরের সীমানাটি উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণী ও তন্মধ্যে একটি মণ্ডপম্ অর্থাৎ ছোট

একটি মণ্ডপ। মন্দিরের অভ্যন্তরে গর্ভমন্দিরের পিছনেই একটি আম্রবৃক্ষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। একাম্রেশ্বর শিবমন্দিরের নিকটে কামাক্ষীদেবীর মন্দির। এই স্থানেই নাকি গৌরী তপস্যা করেছিলেন। দেবীর নাম কামাক্ষী। অষ্টম শতাব্দীর শ্রীআদিশঙ্করাচার্য এই কামকোটী-অম্বিকার একজন অত্যুৎসাহী পূজক ছিলেন। কথিত আছে, এই দেবী কামাক্ষী উগ্র কালীমূর্তিরূপ ধারণ করে মন্দির হতে বাইরে আসতেন। দেবীর ক্রোধাগ্নির কবলে পড়ে দেশবাসী নানাবিধ দৈব-দুর্ঘটনাদিতে পতিত হতে লাগল। শঙ্করাচার্য আরাধনা করে দেবীকে সন্তুষ্ট করেন। ভিতরে শঙ্করাচার্যের একটি মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবাদির সময় দেবীর উৎসব-মূর্তি নিয়ে মন্দিরের বাইরে শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করে। এক সম্প্রদায়ের লোকের মতে শ্রীশঙ্করাচার্য এই কাঞ্চীতেই দেহত্যাগ করেন। অন্য সম্প্রদায়ের মতে তিনি হিমালয়স্থিত কেদারনাথে দেহত্যাগ করেন। একাম্রেশ্বর শিবের দর্শন ও পূজার পর আমরা দেবী কামাক্ষীর মন্দিরে উপনীত হলাম। এখানেও কিছু ফুল, ফল ও কর্পূর দ্বারা দেবীর পূজা দিলাম। তারপর মন্দির প্রদক্ষিণ করে, দেবীকে অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে সেখান থেকে চলে এলাম এবং কাঞ্চীর আর একটি অতি প্রাচীন মন্দির শ্রীকৈলাসনাথ অথবা শ্রীরাজ-সিংহেশ্বর দর্শন করে বিষ্ণুকাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করলাম।

শিবকাঞ্চী হতে দুই মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী অথবা ছোটকাঞ্চী অবস্থিত। এখানে বহু পুরাতন মন্দিরাদি বর্তমান। তন্মধ্যে শ্রীবরদা-রাজা স্বামী বিষ্ণুমন্দিরটি খুব বিখ্যাত। মন্দিরটি অনুচ্চ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে নানাবিধ প্রাচীন কাহিনী ও বিবরণী খোদিত আছে। মন্দিরের যাবতীয় খরচপত্রাদি, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি পূর্বকালে বিজয়নগরের বৈষ্ণব রাজারাই বহন করতেন। তজ্জন্য রাজারা বহু সম্পদশালী গ্রাম, ধনরত্নাদি ও নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী দান করেন। কথিত আছে, লর্ড ক্লাইভ্ মন্দিরস্থ দেবতাকে তৎকালীন আট হাজার ছয় শত টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণহার প্রদান করেছিলেন। সঙ্গীকে নিয়ে আমি এই মন্দিরে প্রবেশ করলাম। এই মন্দিরটিও অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় উচ্চ প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের সীমানা অতি প্রশস্ত। প্রথম দ্বার হতে অনেক ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দ্বার অতিক্রম করে অবশেষে মূল গর্ভমন্দিরে উপনীত হলাম। শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৃষ্ণপ্রস্তরের বিষ্ণু-মূর্তিটি নানা বেশভূষায় সজ্জিত। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়। এখানেও পূর্ব পূর্ব মন্দিরের মত পূজাদি দিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে বিদায় নিলাম। এখানে আর একটি বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন মন্দির আছে—নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার গাত্রে সূক্ষ্ম-কারুকার্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন অবস্থার শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি খোদিত আছে।

শিবকাঞ্চীতে শঙ্কর-সম্প্রদায় 'কামকোটী পীঠম্' নামে একটি পীঠ স্থাপন করে। প্রথমতঃ ইহা বিষ্ণুকাঞ্চীতে ছিল। পরবর্তী কালে রামানুজাচার্য-সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করসম্প্রদায় ঐ পীঠকে শিবকাঞ্চীতে উঠিয়ে নেয়। এখনও শিবকাঞ্চীতে ঐ 'কামকোটী পীঠম্' বর্তমান। যিনি এর প্রধান তাঁকে কামকোটী পীঠের শঙ্করাচার্য বলা হয়। বর্তমানে যিনি শঙ্করাচার্য তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে

গদীতে বসেন তাঁর পিতামাতা কর্ণাটকের উচ্চ ব্রাহ্মণবংশীয় এবং খুব ভক্তিমান। তিনি নিজে অগাধ পণ্ডিত এবং বহুভাষাবিদ্। তিনি নিত্য পূজাপাঠাদি নিয়ে খুব কঠোর জীবন যাপন করে থাকেন। তিনি ভারতের বহু স্থান পরিদর্শন করেছেন।

শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি দর্শন করে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কয়েক দিন বিশ্রাম নিলাম। তারপর পুনরায় যাত্রার স্থান-কাল-নির্বাচনের জন্য কাঞ্চী ত্যাগ করে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলাম। পূর্ব উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি প্রথমতঃ নির্বাচিত হ'ল। মাদ্রাজ হতে চিদাম্বরমে বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন শ্রীনটরাজ-মন্দির। চিদাম্বরম্ হতে কুম্ভকোণম্। তথায় শ্রীকুম্ভকেশ্বর শিবমন্দির। কুম্ভকোণম্ হতে তাঞ্জোর। তথায় শ্রীবৃহদেশ্বর শিবমন্দির। তাঞ্জোর হতে ত্রিচিনপল্লী। তথায় শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির অতি বিখ্যাত ও অতি প্রাচীন। ত্রিচিনপল্লী হতে মাদুরা। তথায় কারুকার্যপূর্ণ উচ্চগোপুরমযুক্ত শ্রীমীনাক্ষী দেবীর মন্দির। মাদুরা হতে রামেশ্বরম্ দর্শন করে তিনেভেলী হয়ে তিরুচেন্দুর। তথায় সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। তিরুচেন্দুর হতে নাগেরকোয়েল হয়ে কন্যাকুমারী। তথায় শ্রীদেবী কুমারী মন্দির ও সমুদ্রমধ্যবর্তী বিবেকানন্দ শীলা। তথা হতে দশ মাইল দূরে সুচিন্দ্রমে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত শিবমন্দির দর্শন।

তারপর পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ। কন্যাকুমারী হতে ত্রিবান্দ্রম্ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। তথায় অনন্ত শয়নে শায়িত শ্রীবিষ্ণুর মন্দির। ত্রিবান্দ্রম্ হতে কেরালা রাজ্য আরম্ভ। তথা হতে তিরুভাল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। তিরুভাল্লা হতে কালাডী—ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মস্থান। কালাডী হতে এর্ণাকলাম্ ও কোচীন বন্দর আবার কালাডী প্রত্যাবর্তন। এবার কালাডী হতে ত্রিচুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। ত্রিচুর হতে গুরুবায়ুর মন্দির দর্শন ও ত্রিচুর প্রত্যাবর্তন। গুরুবায়ুর বিষ্ণুমন্দির বিখ্যাত। হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ-অধিকার নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এখানে প্রায়োপবেশন করেছিলেন। ত্রিচুর হতে কালিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। কালিকট হতে কোয়েম্বাটুরের নিকটবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ম্—পেরীয়ানাইকেন-পালায়াম্ নামক স্থানে অবস্থিত। তথা হতে উটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠম্। উটী হতে মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। মহীশূর হতে কুর্গ জিলার পোনামপেট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। তথা হতে উডিপি শ্রীমধ্বাচার্যের জন্মস্থান। তথায় শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে তিনি কঠোর তপস্যাদি করেন। মারকারা হয়ে মাঙ্গালোর। মাঙ্গালোর হতে উডিপি তথা হতে মাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন। এই পর্যন্ত পশ্চিম উপকূলবর্তী স্থানসমূহ শেষ হ'ল। এখন মাঙ্গালোর হতে সোমেশ্বর এবং তথা হতে জগ্ জলপ্রপাত দেখে সোমেশ্বর প্রত্যাবর্তন। সোমেশ্বর হতে আগম্বী হয়ে শৃঙ্গেরী। শৃঙ্গেরী হতে চিক্ মাঙ্গালোর হয়ে বেলুড় ও হালেবীরের মন্দির দর্শন। তথা হতে হাসান এবং হাসান হতে চিন্নারায়া পাটনা হয়ে শ্রাবণবেলা গোলাতে শ্রীগোমটেশ্বর মূর্তি দর্শন। সেখান হতে বাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর হতে কোলার স্বর্ণখনি দর্শন। আবার বাঙ্গালোর প্রত্যাবর্তন। সেখান হতে সালেম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। সালেম হতে পালানী। তথায় পাহাড়ের উপরে বিখ্যাত বালসুব্রহ্মণ্যমের মন্দির। পালানী হতে সালেমে প্রত্যাবর্তন। তথা হতে নটরামপল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। নটরামপল্লী হতে তিরুভান্নামালাই। সেখানে অরুণাচলম্ শিবমন্দির দর্শন। তথা হতে বাঙ্গালোর হয়ে হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ হতে শ্রীশৈলম্ পর্বতস্থিত শ্রীমল্লিকার্জুনম্ শিবমন্দির দর্শন। আবার হায়দ্রাবাদ প্রত্যাবর্তন। শ্রীমল্লিকার্জুন দর্শনের কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি

সমালোচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (বিংশ সংস্করণ): স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০; মূল্য দুই টাকা।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছিলেন: 'ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর, দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোনকিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বামীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে···।'

বর্তমান সংস্করণে উল্লেখযোগ্য সংযোজন—পরিবর্ধিত তথ্যপঞ্জী এবং তথ্যপঞ্জীর সুলিখিত ভূমিকা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের স্থান নির্ণয় করিয়া অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 'উদ্বোধন', মাঘ, ১৩৭৬, সংখ্যায় যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, পরিবর্ধিত আকারে তাহাই তথ্যপঞ্জীর ভূমিকারূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণটি সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার, বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের গবেষক ছাত্রছাত্রীগণের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতের সাধক চিত্রাবলী—সম্পাদনা: শঙ্করনাথ রায়, হিমাদ্রি সংসদ। প্রকাশক: এইচ. চৌধুরী, প্রাচী পাবলিকেশনস্, ৩ এবং ৪ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা ১। পৃষ্ঠা ৪৯; মূল্য দশ টাকা।

সুলেখক শঙ্করনাথ রায়ের সুপরিচিত 'ভারতের সাধক' গ্রন্থ রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং এযাবৎ এই গ্রন্থের আট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য চিত্রপুস্তকে ২০ জন সাধক মহাপুরুষের চিত্রাবলী (ফটো) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে কলাশিল্পের প্রয়োগ-নৈপুণ্য আকর্ষণীয়। প্রত্যেকটি চিত্রের নিম্নে মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব খৃষ্টাব্দে নির্দেশিত। সুলিখিত ভূমিকার পর গ্রন্থারম্ভে আচার্য শঙ্কর এবং গ্রন্থশেষে শ্রীঅরবিন্দের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ এক পৃষ্ঠায় প্রদত্ত পরিচিতি—লেখনীমুখে প্রত্যেকটি মহাজীবনের ক্ষুদ্র দর্পণস্বরূপ। আশা করি অনেকেই এই সুদৃশ্য 'অ্যালবাম্' সংগ্রহে যত্নবান হইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণ মহোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৫শে ফাল্গুন (৯.৩.৭০) শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। তদুপলক্ষে পরবর্তী রবিবার ১লা চৈত্র (১৫.৩.৭০) শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব বিবিধ কর্ম-সূচীর মাধ্যমে সারাদিন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত মণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত ছিল। মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হয়। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

বেদপাঠ, ভজন, প্রদর্শনীমণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, মঠপ্রাঙ্গণে কালীকীর্তন,' আবৃত্তি প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যবস্থা ভাল ছিল। সন্ধ্যা-রতির পর আতসবাজি পোড়ানো হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

উত্তরবঙ্গে বন্যার্তসেবা: জলপাইগুড়ি মোহিতনগর কলোনীতে ৫৩টি গৃহ (thatched house) নির্মিত হইয়াছে। কলোনীটিকে দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে—এক অংশের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ নগর এবং অপর অংশের নাম শ্রীসারদা পল্লী। বিদ্যালয়-ভবন-নির্মাণের কাজ ভালভাবেই চলিতেছে।

গুজরাট বন্যার্তসেবা: সমাজমন্দির, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণের কাজ এবং বৈদ্যুতীকরণ প্রায় শেষ করিয়া আনা হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬২তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৮—মার্চ, ১৯৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে।

আর্তনারায়ণের সেবাকল্পে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ তীর্থ বৃন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়; তদবধি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই আশ্রম জাতি-ধর্মনির্বিশেষে জনসাধারণের সেবাকার্যে নিরত রহিয়াছে।

বর্তমানে সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগে অ্যালোপ্যাথিক মতে আধুনিক সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন বিভাগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পরি-চালনা করেন।

ইনডোর হাসপাতাল: অন্তর্বিভাগে ১০৩টি শয্যা আছে; এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য বর্ষে ২,৩৬৪ জন রোগী ভরতি হয়, চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট ১,২৫২টি অস্ত্রোপচার করা হয়। গড়ে দৈনিক শতকরা ৭২টি শয্যায় রোগীরা চিকিৎসার জন্য ছিল।

আউটডোর ডিস্পেন্সারী: আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৪৪,৮৩০ জন রোগী (পুরাতন ১,২০,৬৯৩) চিকিৎসিত হয় এবং চক্ষুরোগী সহ মোট ১,১০৩ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৯৭।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,৩৫৫টি এক্স-রে করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে

২৪,২০৩টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৩৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,২১৩ ও ১৫,৬৫২।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুপরিচালিত চক্ষুবিভাগটিতে সহস্র সহস্র চক্ষু-রোগী সুচিকিৎসা লাভ করিয়া নিরাময় হইতেছে।

রোগীদের জন্য সেবাশ্রম কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী ও পত্রপত্রিকা রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মেডিক্যাল লাইব্রেরী আছে। রোগীদিগের আনন্দ বিধানের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডগুলিতে রেডিও শুনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা

গত ২৩শে মার্চ সোমবার সকাল ৭টায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত প্রার্থনা-গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন ও শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করেন। ১১টি গম্বুজবিশিষ্ট এই ভবনটির মোট উচ্চতা ৬৮′ ফুট। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে শতাধিক সন্ন্যাসী এবং সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী ও ছাত্রবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাধু ও ব্রাহ্মণদের বৈদিকমন্ত্রপাঠ এবং স্বামী পূর্ণানন্দজী-পরিচালিত সুমধুর কীর্তন এসময় একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এদিকে যজ্ঞশালায় কাশীর তিনজন পণ্ডিত সপ্তশতী হোম শুরু করেন।

পূর্বদিন, ২২শে মার্চ, স্বামী হিতানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের অধিবাস সম্পন্ন করেন এবং সুসজ্জিত যজ্ঞশালায় রুদ্রযাগ ও বাস্তুযাগ অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী শিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের পার্টি ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করিয়া সমবেত সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দকে মোহিত করেন। ২২শে হইতে ২৮শে পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী উৎসবে প্রায় ৭০ হাজার লোক যোগদান করিয়াছেন।

২৪শে মধ্যাহ্নে সাধুসেবার আয়োজন ছিল। অপরাহ্ণে পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দের স্বাগত সম্ভাষণ ও সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী-পাঠের পর সভাপতি মহারাজ একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ শানাইবাদক আলি হুসেন খাঁন ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র আলি আসগর খাঁন সুমধুর শানাই বাজাইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। উৎসবের অন্যান্য অঙ্গ ছিল—দুইদিন যাত্রা, দুইদিন শ্রীরথীন ঘোষের কীর্তন, স্বামী পূর্ণানন্দজীর কথকতা, রসরঙ্গ সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাকীর্তন, রহড়ার ছাত্রগণ কর্তৃক মুক্তিযজ্ঞ ও প্রহ্লাদ যাত্রাভিনয়, হাওড়া সমাজ কর্তৃক নদের নিমাই অভিনয়, ভারত-বিখ্যাত শিল্পিগণ কর্তৃক উচ্চাঙ্গের যন্ত্র- ও কণ্ঠসঙ্গীত এবং ভজন, বাজি-পোড়ানো প্রভৃতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত ৯২ জন সাধু এবং প্রায় ৪০০ ভক্ত ও

অভিভাবক সকলেই এই সাতদিনের উৎসব-দর্শনে ও বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও কর্মিগণের আদর-আপ্যায়নে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

উৎসব-সংবাদ

চণ্ডীগড় আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দুইটি সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন পঞ্জাবের রাজ্যপাল ডক্টর ডি সি. পাভাতে এবং হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী।

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৯ই মার্চ হইতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ১৩৫তম জন্মতিথি-উৎসব পালিত হইয়াছে। ১২ই মার্চ ছয় হাজার পথ-যাত্রীর একটি শোভাযাত্রা নগরপরিক্রমা করে। ১৩৫টি মঙ্গলঘট, ১৩৫টি শঙ্খের ধ্বনি এবং বিভিন্ন দলের নামগান শোভাযাত্রাটিকে আকর্ষণীয় করিয়াছিল। শোভাযাত্রাটি আশ্রম-প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিবার পর ছাত্রদের লইয়া একটি বৃহৎ সমাবেশ হয়; এই সভায় ছাত্রগণই সভাপতিত্ব ও বক্তৃতা করেন। ১৩ই মার্চ পূর্বাহ্ণে স্বামী আপ্তকামানন্দ ‘কথামৃত’ পাঠ ও আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে লীলাগীতি পরিবেশনের পর শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিষয়ে শ্রীবনবিহারী ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভার অধিবেশন হয়; অধ্যাপক শ্রীস্নেহাংশুকুমার সরকার ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটক অভিনীত হয়। ১৪ই মার্চ পূর্বাহ্ণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বিকালে শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা করেন। ১৫ই মার্চ সকালে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কঠোপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ৭,০০০ নরনারায়ণ পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পান। পরে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরাখহরি চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি মহারাজ ‘বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত’ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৯ই হইতে ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

৯ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা-হোমাদি হয়; ঐদিন ৪,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় স্থানীয় ব্যায়ামাগারের সদস্যগণ কর্তৃক ব্যায়াম-প্রদর্শন, ১১ই মার্চ শ্রী বি. এন. ঝা-এর সভাপতিত্বে আশ্রমের স্কুলের পুরস্কারবিতরণী সভা এবং ১২ই সন্ধ্যায় স্কুলের ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয় হয়।

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় যথাক্রমে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। প্রতিদিনই সভাপতি মহারাজ, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দুবে বক্তৃতা করেন; ১৩ই তারিখ সভারম্ভে শ্রীসমর রায় চৌধুরী ‘সভ্যতা ও সংস্কৃতি’-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনদিনই সভান্তে রামায়ণগান পরিবেশন করেন সঙ্গীতসুধাকর শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কার্য-নির্বাহক সমিতির ও স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি গত ৯ই মার্চ উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি

সহ আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালা ও ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীগণ ভজনগান গাহিতে গাহিতে শহর পরিক্রমা করেন।

প্রভাতে ভজনাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি সুসম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে সর্বশ্রেণীর তিন হাজার নরনারী খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীকরুণাময় অধিকারী, শ্রীযুক্তা গীতা ভৌমিক, কুমারী উমা ও বিমল কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন অবলম্বনে রচিত জীবন-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব একসপ্তাহব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনই পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ৯ই মার্চ বিশেষ পূজাদির পর মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচশতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে এডভোকেট শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, শ্রীজীবনচন্দ্র সাহা ও অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মণ্ডল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-দর্শন ও বাণী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর টেলিভিশনশিল্পী শ্রীহরলাল রায়ের পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১০ই ও ১১ই মার্চ দুইদিন শ্রীকালশশী চক্রবর্তী ও শ্রীতারিণী সরকার কবিগান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

১২ই মার্চ ও পরদিন পদাবলী কীর্তন করেন শ্রীগোপাল মোহন্ত। সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ শ্রীবারীন মজুমদারের পরিচালনায় স্থানীয় শিল্পিগণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৩ই মার্চ এবং আরও দুইদিন মধ্যাহ্নে নরসিংদির শ্রীখুকুমণি দাস রামায়ণগান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। অপরাহ্ণে ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেনের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের বার্ষিক পুরস্কারবিতরণের পর অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দাস, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য ও কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ রাসমোহন চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের মানবপ্রেম ও শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

১৪ই মার্চ অপরাহ্ণে ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টর জনাব আবুল হাসিমের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, এডভোকেট বীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, এডভোকেট বিমলেন্দুবিকাশ রায়চৌধুরী, কাজী মোতাহের হোসেন, শ্রীসুখদারঞ্জন চৌধুরী, শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ সুধীবৃন্দ উক্ত সভায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধ্যার পর কুমার মনোতোষ দেবের পরিচালনায় স্থানীয় শিল্পিগণ মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৫ই মার্চ মধ্যাহ্নে প্রায় দেড় হাজার নর-নারায়ণের সেবা করা হয়। অপরাহ্ণে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মিশনের সম্পাদক স্বামী কালিকাত্মানন্দ কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় মিশনের সভাপতি ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস. এম. মুর্শেদ। সভায় ডক্টর সুকুমার চক্রবর্তী, শ্রীবিমলচন্দ্র বসু, ডক্টর হরিনাথ দে প্রমুখ সুধীবৃন্দ বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভার পর ওস্তাদ

আলী ইমাম কিছুক্ষণ যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। পরে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সৌজন্যে ধর্মীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এই আনন্দোৎসবে প্রতিদিনই শহরের শত শত নরনারী আশ্রমে উপস্থিত হন।

স্বামী জয়দানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৪ঠা মার্চ, ১৯৭০ বেলা সাড়ে নয়টার সময় স্বামী জয়দানন্দ (যতীশ মহারাজ) ৬৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আন্ত্রিক গোলযোগ, জনডিস ও অন্যান্য উপসর্গে কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

স্বামী জয়দানন্দ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বাঁকুড়া আশ্রমে এবং পরে রামহরিপুর আশ্রমে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্রতী ছিলেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সরলস্বভাব সন্ন্যাসী।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ

গত ১লা ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 'নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘে'র উদ্যোগে সহস্রাধিক মহিলা সকাল নটায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হইতে সিমলাস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর উদ্দেশ্যে পদযাত্রা করেন। পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত স্বামীজীর একটি সুবৃহৎ আলেখ্য সহ সুদীর্ঘ একমাইলব্যাপী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটির পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ। সমগ্র পথটি সহস্র কণ্ঠে পবিত্র বেদমন্ত্রপাঠ এবং স্বামীজীর বন্দনাগীতিতে মুখরিত হইয়া উঠে।

ঐদিন বেলা সাড়ে দশটায় স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাটীর অঙ্গনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ রমা চৌধুরী এবং ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা।

গত ২৪ হইতে ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৯ পাঁচ-দিনব্যাপী একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন হয় রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব কালচারের সহযোগিতায়। ২৪শে তারিখে ইহার উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ। স্বামীজীর চিন্তার বিভিন্ন দিকের আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, স্বামী বুধানন্দ,

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার। আলোচনায় যোগদান করেন প্রায় চল্লিশজন সুধী, সমাজ-সেবী ও ছাত্রছাত্রী।

উৎসব-সংবাদ

হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক হুগলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহানন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৭ই মার্চ শনিবার বৈকালে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের হুগলী-চুঁচুড়া শাখার শিক্ষাশিবিরের উদ্বোধন হয়। রাত্রে আরাত্রিক ভজনাদি ও প্রবন্ধপাঠ হইয়াছিল।

৮ই মার্চ রবিবার সকালে শোভাযাত্রা সহ নগরপরিক্রমা, বৈকালে 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা এবং রাত্রে নামসঙ্কীর্তন হয়। ৯ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-দিবসে বিশেষ পূজার্চনা, প্রসাদবিতরণ, লীলাকথা, কালীকীর্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। ১০ই মার্চ 'বীর সন্ন্যাসী' গীতি-আলেখ্য, ১১ই রামায়ণ-গান, ১২ই লীলাকীর্তন, ১৩ই 'বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

১৪ই মার্চ শনিবার আবৃত্তি ও বিতর্ক-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ করেন স্বামী নিরাময়া-নন্দজী। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয় বিষয়ে ভাষণ দেন অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার ; স্বামী নিরাময়ানন্দজী সময়োপযোগী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন।

১৫ই মার্চ রবিবার বিবেকানন্দ শিশু-শিক্ষা-মন্দিরের বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। বক্তৃতা, পাঠ ও আলো-চনাদিতে বিভিন্ন দিনে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক নলিনীভূষণ দাশ-গুপ্ত, অধ্যাপিকা বাসন্তী চৌধুরী প্রভৃতি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। ৯ই মার্চ বিশেষ পূজাদির পর প্রায় ৫ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা হয়। ১০ই ও ১১ই মার্চ সন্ধ্যায় ডক্টর শ্রীমন্মহানামব্রত ব্রহ্মচারী শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ১৬ই হইতে ১৯শে মার্চ পর্যন্ত রামায়ণগান, অষ্টযাম হরি-নামসংকীর্তন, নর-নারায়ণসেবা ও ধর্ম-সভাধিবেশন সহ উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি স্বামী মিত্রানন্দ মহারাজ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পর্যালোচনা করিয়া শুনান।

আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে গত বৎসর ৩২,১১৩ জন রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। আশ্রম কর্তৃক একটি ছাত্রাবাস ও একটি পুস্তকালয় পরিচালিত হইতেছে।

ডিব্রুগড় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতিতে গত ২০, ২১ ও ২২ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে পূজা-পাঠাদি এবং প্রথম দুইদিন সন্ধ্যায় জনসভা ও তৃতীয় দিবসে লীলাকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০ মার্চের সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ২১ মার্চের সভায় সভাপতিত্ব

করেন অধ্যক্ষ মথুরানাথ ভট্টাচার্য। এই দুই দিন সভায় যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ; তাছাড়া ২১শে ও ২২শে প্রাতে তিনি যথাক্রমে শ্রীশ্রীমা সরদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

২০শে মার্চ প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী শমানন্দজী; লীলা-কীর্তন পরিচালনা করেন শ্রীফণীন্দ্রচন্দ্র দাস। ২২শে মার্চ মহোৎসবে পাঁচ হাজারের অধিক নর-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২০, ২১ ও ২২শে মার্চ স্থানীয় কালী-বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২১শে মার্চ বিশেষ পূজাপাঠাদি হয়, ২,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সকালে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। উৎসবের তিনদিনই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রীরাম-কৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। উৎসবের শেষদিন রবিবার অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হয়; সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। সভান্তে বিবেকানন্দ-লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী প্রণবানন্দ প্রথম দিন ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় দিন সম্বন্ধে ভাষণ দেন। বিভিন্ন দিনে বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। তিনদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শনী খোলা ছিল।

ডিব্রুগড় সিস্টার নিবেদিতা কিণ্ডার-গার্ডেন স্কুলে গত ২২শে মার্চ পূর্বাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভার পূর্বে উপনিষদের মন্ত্র এবং সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত গীত হয়।

ভদ্রেশ্বর সারদা পল্লীতে গত ২৮শে ও ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৮শে মার্চ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত'পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভজনাদি হয়। বৈকালে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। ২৯শে মার্চ সকালে উষাকীর্তন, পল্লীপরিক্রমা প্রভৃতি হইয়াছিল। বৈকালে আয়োজিত সভায় সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী একান্তানন্দ। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক হরিপদ ভারতী। সন্ধ্যায় ভজন ও রাত্রে লীলাগীতি উপভোগ্য হইয়াছিল।

নিউ বনগাইগাঁও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৯ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৫শে মার্চ এই উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে পূজাপাঠাদি ও মধ্যাহ্নে প্রায় ২,০০০ ভক্তকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।



দিব্য বাণী

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ ১।২।৫

অজ্ঞানের মাঝে থাকি তবুও যাহারা
ধীর ও পণ্ডিত বলি ভাবে নিজেদেরে
দুখের কুটিল পথে জন্মে জন্মে ভ্রমে যে তাহারা—
এ যেন দেখায়ে পথ নিয়ে যায় এক অন্ধ অপর অন্ধেরে॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য-প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি অনীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ১।২।৮

—কঠোপনিষদ্

উপলব্ধি নাই যার সেরূপ প্রাকৃতজন আত্মতত্ত্ব কহিলে তাহাতে
সে-তত্ত্বের সুষ্ঠু জ্ঞান কখনো না হয়,—
'আত্মা আছে', 'আত্মা নাই' এইরূপ বহুবিধ বিভিন্ন চিন্তাতে
অনুভূতিহীন তর্ক, শুধু বুদ্ধি নিয়ে যায়; সত্যে কভু নয়।
আত্মা সনে আপনার অভেদত্ব উপলব্ধি হয়েছে যাঁহার
তাঁহারি কথায় শুধু বিতর্কের নাহি অবকাশ,
সেই সত্যদ্রষ্টা কাছে পাওয়া যায় যথাযথ সত্য-সমাচার;
তর্কের অতীত তিনি, তর্কে কভু আত্মতত্ত্ব হয় না প্রকাশ—
চরম সত্যেরে যদি অতি সূক্ষ্ম, অণুসম বলে কোন জন,
সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, কিংবা অন্য কিছু বলি অন্যজন করিবে খণ্ডন॥

কথাপ্রসঙ্গে

ধর্ম

ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান বিভ্রান্তির কারণ

মানুষ তাহার জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ক্রমোন্নতির পথে অনেক কিছু করিয়াছে, যাহাকে আমরা সভ্যতার অগ্রগতি, সভ্যতার অবদান বলিয়া থাকি। বিবিধ প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, সমাজব্যবস্থার উদ্ভব, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, চারুকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির উদ্ভব ও উন্নতি হইয়াছে মানবজীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই। ধর্মেরও উদ্ভব এই জন্যই।

মানবজীবনের প্রয়োজন বলিতে কেবল তাহার দেহেরই প্রয়োজন বুঝায় না, দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি যাহা লইয়া মানুষ, তাহার সব কিছুর প্রয়োজনই বুঝায়। ইহার কোনটিকে বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া যে রাষ্ট্র-বা সমাজপরিকল্পনা, তাহা কখনই মানুষের জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না।

আধুনিক যুগে ধর্মকে মানবজীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া, ধর্ম ও ঈশ্বর অসত্য, স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে একশ্রেণীর মানুষের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া ধর্মের ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে চিন্তাগুলির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সবই বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের লোকের জন্য প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের যে বিভিন্ন প্রয়োগবিধি, এবং স্বার্থান্ধ লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার যে অপব্যবহার সেগুলিকেই ধর্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহারই ভিত্তিতে উদ্ভূত; যে মূল সত্য অবলম্বনে সেইসব প্রয়োগবিধিগুলি সত্যদ্রষ্টাগণ কর্তৃক যুগোপযোগিরূপে প্রযুক্ত হয়, সেই মূল সত্যের ভিত্তিতে নহে। ধর্ম সম্বন্ধে আজ যা-কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলে ইহাই। যে-সব মনীষী এই চিন্তার প্রবর্তক, তাঁহারা ধর্মের এই মূলগত সত্যের সন্ধান পান নাই বা সন্ধানলাভের চেষ্টা করেন নাই, কেবল তাহার বহিরঙ্গকেই বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়াছেন বলিয়া এই বিভ্রান্তির উদ্ভব। এই সত্যকে জানিতে চান এরূপ বহু পাশ্চাত্য দার্শনিকও কেবল বুদ্ধিসহায়ে তাহা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়াই মূল সত্যের সন্ধান তাঁহারাও পান নাই, মানবজাতির বৌদ্ধিক জ্ঞানভাণ্ডারের ক্রমবর্ধমানতার সহিত তাঁহাদের সিদ্ধান্তও পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

ধর্মের মূল সত্য

ধর্ম ও ভগবান কল্পনাপ্রসূত নহে, বিজ্ঞানের মতোই প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের অচেতন বস্তুনিচয় ও আমাদের স্থূল-দেহ লইয়া যে জড়জগৎ, অথবা মন বুদ্ধি প্রভৃতি চেতন বলিয়া প্রতীত যে সূক্ষ্মজগৎ,—যে জগৎ-ই হউক, কতকগুলি সত্যের উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি বিভিন্ন স্তরের সত্য হইতে পারে, কিন্তু সত্য। যে স্তরেরই হউক, কোন সত্যকে জানার, প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এই জ্ঞান কখনও উৎপন্ন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল অনাবৃত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে; যে-কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্কার করেন তাঁহাকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত পুরুষ বলা হয়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁকে 'ঋষি' বা

'অবতার' বলি ; আর যখন সেটা জড়জগতের কোন সত্য হয়, তখন তাঁকে 'বৈজ্ঞানিক' বলি।" আমরা জানি বা না-জানি, এই সত্যগুলি যতদিন জগৎ আছে ততদিনই রহিয়াছে, ভবিষ্যতে থাকিবেও। নিউটনের আবিষ্কারের পূর্বেও চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিত, এ সত্য কোন দিন বিজ্ঞানীরা ভুলিয়া গেলে ভবিষ্যতেও করিবে। মানুষ ঈশ্বরকে ও আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করিবার পূর্বেও ঈশ্বর এবং অধ্যাত্ম সত্যগুলি ছিল, এখন আমরা না জানিতে চাহিলে বা অস্বীকার করিলেও চিরদিন উহা থাকিবে। আমাদের জানা বা বিশ্বাস করার উপর সত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। বিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিলে যেমন তাঁহাদের নির্দেশমত সেগুলির প্রয়োগ করিয়া আমরা জাগতিক সুখসুবিধার অধিকারী হই, তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের নির্দেশমত চলিলে জীবনকে, সমাজকে আরো উন্নত করিতে পারি। বিশ্বাস করা বা না করায় প্রভেদ শুধু এইটুকু।

আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ হইল আত্মসম্বন্ধে, নিজের সম্বন্ধে, দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি যে-সবকে 'আমি' বলিয়া মনে হয় সেই সম্বন্ধে জ্ঞান ; আধ্যাত্মিক সত্য বলিতে এই সব বিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝায়। কিভাবে দেহ-মন-বুদ্ধি-চেতনা-সমন্বিত এই 'আমি' চালিত হয়, ইহার মধ্যে আসল 'আমি'—চেতন সত্তা কোন্‌টি, কিভাবে তাহাকে দেহাদি হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়—ইত্যাদি বিষয়ক সত্যগুলিই আধ্যাত্মিক সত্য, যাহাকে সাধারণতঃ আমরা ধর্মজগতের সত্য বলিয়া থাকি, যে সত্যে বিশ্বাসকে ধর্মবিশ্বাস বলিয়া থাকি। ঋষিরা এ সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দেহ-মন-বুদ্ধি-চেতনা-সমন্বিত যে মানুষ, দেহটি তাহার সর্বস্ব নয়, আসল মানুষ হইল মন-বুদ্ধি-চেতনা-বিশিষ্ট মানুষটি, যে দেহের নাশের পরও থাকে ; তাহার ভিতরও আবার আসল মানুষ হইল ঐ চেতন অংশটিই, যা ঈশ্বর বা ভগবান। এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহারা বলিয়াছেন, 'সব মানুষই স্বরূপতঃ ভগবান','মানুষের সেবাই ভগবানের সেবা'। এই সত্যের ভিত্তিতেই সব মানুষকে এক দেখা, যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, অপরের সেবায় সেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ সম্ভব।

মানবজাতির ইতিহাস বা বিভিন্ন জ্ঞানের পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধি দ্বারা অনুমান সহায়ে ঋষিরা এই সত্যের কথা ঘোষণা করেন নাই, বা অপর কোন ঋষিকর্তৃক প্রত্যক্ষ করা সত্যের উদ্ধৃতি-মাত্ররূপেও বলেন নাই ; উপনিষদের ঋষিগণ, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি পরবর্তী-কালের সত্যদ্রষ্টা বা অবতারগণ প্রত্যেকেই নিজে এই সব সত্য উপলব্ধি করিয়া তবে সে-গুলির কথা ঘোষণা করিয়াছেন ; সব মানুষকে এই সত্য প্রত্যক্ষ করার পথে অগ্রসর করাইবার জন্য বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ধারণাশক্তিবিশিষ্ট মানুষের কাছে যে ভাবে উহার কথা বলিলে তাহারা উহা বুঝিতে এবং জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধিতে উহা প্রয়োগ করিতে পারিবে, সেই ভাবে তাহা বলিয়াছেন ; কারণ, যতটুকুই হউক, কাজে না লাগাইতে পারিলে সে সত্য শুধু বুঝিয়া কোন লাভ নাই। সেই জন্যই, সকলেই চরম সত্যকে একইরূপে প্রত্যক্ষ করিলেও জীবনে উহাকে প্রয়োগের ব্যাপারে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু ভিন্ন হইলেও ঋষি-নির্দিষ্ট বলিয়া সর্বকালে

সেগুলি সত্যাভিমুখই থাকে। মূল সত্যের সন্ধান না রাখিয়া, কেবল যুগে যুগে দেশে দেশে এই প্রয়োগবিধির বিভিন্নতা দেখিয়া যদি ধর্ম ও ঈশ্বরকেই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ হওয়ার জন্য অসত্য বলা হয়, তাহা হইলে সে কথায় কোন যৌক্তিকতা থাকে কি? আর কতকগুলি স্বার্থপর লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার করে বলিয়া আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে মিথ্যা বলিবার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি? একদল মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করিয়াছে বা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে বলিয়া পরমাণুর কেন্দ্রীণের অংশগুলির সংযোজন- ও বিভাজনজনিত বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে কি অসত্য বলিতে বা ঐ সত্যের আবিষ্কারক বিজ্ঞানীকে দোষ দিতে হইবে? না বলিতে হইবে ঐ শক্তি জগতের কোন কল্যাণকর্মে লাগে না?

জীবনে ধর্মের প্রয়োজন আছে কি?

এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা বা সেগুলির অপব্যবহারের জন্য মানুষকে স্থানবিশেষে, কালবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও এগুলির যথাযথ প্রয়োগ মানুষের সত্তাকে ঝিমাইয়া দেয় না, তাহার প্রগতির পথরোধও করে না; বরং মানুষকে সবলতর, উন্নততর করিবার, তাহাকে অধিকতর স্বার্থহীন, ভেদবুদ্ধিহীন, মানবপ্রেমিক, পরহিতৈষী ও সমাজের কল্যাণকামী করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। জড়বাদীই হই বা ঈশ্বরবিশ্বাসী—নিজের অমর সত্তায় বিশ্বাসীই হই, ইহা তো আমরা সকলেই জানি ও মানি যে, চিন্তা ও মনের অনুভূতিই আমাদের জীবনের চালক। জীবনের চলার পথে বুদ্ধিও আমাদের চালিত করিতে পারে না, পথ দেখাইতে পারে মাত্র। আমরা হয়তো বুদ্ধিগত করিলাম, সকলকে বুঝাইলাম যে আমাদের সকলকে সমান অধিকার ভোগ করিতে হইবে, নিজের জন্য অপরের চেয়ে বেশী কিছু চাওয়া চলিবে না, আমরা সবাই সমান, সকল মানুষকে এক বলিয়া দেখিতে হইবে, ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতেই যে মানুষ স্বার্থত্যাগী, সমদৃষ্টিপরায়ণ হয় না, ইহা তো আজ দেখাই যাইতেছে; এভাবে সমাজ-ব্যবস্থা করার জন্য সাম্যবাদী দেশগুলিতেও এখনও কড়া শাসন এবং বলপ্রয়োগ করিতে হইতেছে; সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিও আজ পরস্পরকে 'এক' বলিয়া ভাবিতে পারিতেছে না, নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষও বাধিতেছে। তরবারির দ্বারা, আইনের দ্বারা সুদীর্ঘকাল মানুষকে চালনা করা অতীতে কখনও সম্ভব হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না। হৃদয়ই উহার চালক, জনসাধারণের উন্নত হৃদয়ই সমাজের একমাত্র স্থায়ী নিরাপত্তা। আর একমাত্র ধর্মই মানুষের হৃদয়ের এই উন্নতি- ও বিস্তারসাধনে সক্ষম। একমাত্র ধর্মাচরণই মানুষের স্বার্থপরতার মূল দেহাত্মবুদ্ধি ক্ষীণ করিতে পারে, মানুষকে অন্তর্মুখ করিয়া সংযম- ও একাগ্রতাজনিত বিষয়-ভোগ-নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান দিতে পারে, যাহার আস্বাদ একটু না পাইলে, নিজের দেহাতীত সত্তার আভাষ একটু নিজে না পাইলে শুধু কথায় মানুষ অপরের জন্য কখনও স্বার্থত্যাগ করিবে না, কখনও সব মানুষকে সমান বলিয়া ভাবিতে পারিবে না।

মানুষ ভোগের, ব্যক্তিত্ববিকাশের সমান অধিকার আজ হউক কাল হউক সব দেশেই চাহিবে। তাহার ব্যবস্থাও স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক সব দেশকেই করিতে হইবে

সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহা করার জন্য তাহার সব উচ্চভাব নষ্ট করিয়া মানুষকে প্রায়-পাশব স্তরে নামাইয়া আনিতে হইবে, ইহার কি প্রয়োজন আছে ?

ভারতের ধর্ম ও সমাজ

ভারতের সমাজব্যবস্থা চিরদিন ধর্মভিত্তিক বা আধ্যাত্মিক ছিল বলিয়া হাজার হাজার বছর ধরিয়া বহু বিরোধী ভাবের ঝঞ্ঝা-প্লাবন সহিয়াও এখনো বাঁচিয়া আছে। আজ আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত, আমরা বিদেশাগত জড়বাদভিত্তিক ধর্ম-ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন যে মতবাদ অবলম্বনে অকল্যাণকর কুসংস্কারগুলির সঙ্গে সুদীর্ঘকালের কল্যাণকর ভাবগুলির, শুভসংস্কারগুলির ধ্বংস করিয়া বিদেশের হুবহু অনুকরণে জনগণের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি, সে পথে চলিলে আমরা দেশকে একটি সুদৃঢ় অবলম্বন হইতে সরাইয়া কোন্ ভিত্তির উপর স্থাপন করিব এবং তাহাতে কল্যাণের নামে মহা অকল্যাণই টানিয়া আনিব কি না? বর্তমানে চারিদিকে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, হৃদয়হীনতা ও অসংযমের পরিচয় প্রায় প্রতিদিনই পাওয়া যাইতেছে, এই আদর্শেই কি সারা দেশের মানুষকে গড়িতে চাই আমরা ? পাশ্চাত্যের মতো, স্বামীজীর ভাষায় উদ্গারণ-উন্মুখ আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত দেশগুলির পাশে কি ভারতকেও বসাইতে চাই ?

ভারতের ভবিষ্যৎ

অবশ্য ভারতকে সেরূপ করা কখনো সম্ভব হইবে না ; তবে এ প্রচেষ্টায় তাহাকে বহু দুর্ভোগের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন বিষয়ে ডিমোক্র্যাসি ও সোস্যালিজমের শুভকারী দিকগুলি লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও সমাজনীতিই ভবিষ্যতে মানুষ গ্রহণ করিবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ভারতই তাহার আদর্শ দেখাইবে।

দেশের বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মভিত্তিক করা একান্ত প্রয়োজন, যাহা আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইবার পর এতদিনেও করিতে পারি নাই বা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব ধর্ম-হীনতার প্রভাব হইতে ভারতকে তথা সমগ্র বিশ্বকে বাঁচাইবার জন্যই। আধুনিক জগতের দুইজন প্রখ্যাত মনীষীর একজন, ফ্রয়েড, মানুষের জীবনের সব প্রচেষ্টার মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কামকে ; অপর জন, কার্ল মার্কস, মানুষের রাষ্ট্র-ও সমাজ-ব্যবস্থা-প্রচেষ্টার মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কাঞ্চনকে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই মানুষের উন্নততর অবস্থা লাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কাম-কাঞ্চন-লালসা কমাইবার কথাই বার বার বলিয়াছেন। যেন ভুলিয়া না যাই, সংযম ও ত্যাগের মহিমায় ও শক্তিতে, নিবেদিতার ভাষায় বজ্রের শক্তিতে বিশ্বাসী, ধর্মনিষ্ঠ কয়েকজন প্রখ্যাত দেশ-প্রেমিকই আমাদের দেশকে পরাধীনতাশৃঙ্খলমুক্ত করিতে সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছেন।

যদি কাহারো হৃদয়ে ধর্মাচরণ ছাড়াই সকল মানুষের উপর সমদৃষ্টি, সমান ভালবাসা থাকে, সব মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য নিজের সর্ববিধ স্বার্থকে বলি দিবার প্রেরণা ও শক্তি আসে, তবে তাহা অপেক্ষা শুভকর আর কি হইতে পারে? কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এরূপ মানুষ কখনও কখনও আসে বটে, তবে সংখ্যায় অতি অল্প, প্রায় বিরল। সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলেরই পক্ষে প্রয়োজন ধর্মাচরণ বা আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

The Math, P. O. Belur, Howrah,
The 15th. April, 1905

My Dear Kumud,

তোমার [illegible] ও ১১ তারিখের পত্র পাইয়াছি এবং টেলিগ্রামও পাইয়াছি। শুনিয়া খুব আনন্দবোধ করিতেছি যে, শশী মহারাজের ক্লাশ ও বক্তৃতা ও কাজকর্ম খুব সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে ওখানে সত্বরই একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে; তদুদ্দেশ্যে স্থানীয় গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবারও প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে।

মঠপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সার্থক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমাকে সময়মত জানাইবে। ইহা খুবই ভাল লক্ষণ যে, তুমি বোম্বের অনেক বিশিষ্ট নাগরিককে আমাদের সৎকাজের জন্য প্রভাবান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছ। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অশেষ কৃপায় আমাদের ক্ষুদ্র বাঙ্গালী বন্ধুদলের উদ্যম, শ্রম ও স্বার্থত্যাগ পূর্ণমাত্রায় পুরস্কৃত হইয়াছে। আশা করি আমাদের এই মহৎ ধর্মীয় কার্যের সুযোগটির সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না।

আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। আশা করি তোমাদের কুশল। ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে।

Yours affly
Brahmananda.

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Puri, Sasi Niketan,
July, 1907

My Dear Mohantaji,

তোমার মা শরতের সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন ও দর্শনাদি করিতেছেন। বোধ হয় তোমার মায়ের হাতে এখন খরচ নাই। যদ্যপি শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাইয়া দাও ভাল হয়। আর র মাসিক যাহা তুমি দিয়া থাক তাহাও সামান্য মাত্র আছে। যদি হাতে কিছু থাকে তাহা হইলে শীঘ্র তীর্থ ইত্যাদির জন্য কিছু পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তুমি কেমন আছ লিখিয়া সুখী করিবে, ইতি।

With love + নমস্কার

Affly yours
Brahmananda

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

The Math, Belur,
(Howrah)
28. 3. 08

My Dear Sasi Maharaj,

গতকল্য অভিরাম নামক পাচককে মান্দ্রাজ মেলে তোমার নিকট রওনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশা করি সে নিরাপদে ওখানে পৌঁছিয়াছে। তাহার পৌঁছান সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবে। ছেলেটী খুব ভাল। উহাকে মিষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে ও প্রাণপণে কার্য্য করিবে। তোমাকে লেখা বাহুল্য মাত্র যে উহাকে একটু যত্ন করিবে। এক-আধটী গেঞ্জী দিতে পারিলে ভাল হয়, আর কার্য্যের অবসর সময় রুদ্রচৈতন্যকে দিয়া একটু আধটু বাঙ্গলা পড়াইলে আরও ভাল হয়। তাহার রেলভাড়া বাবদ ১৬৷৵. খরচ হইয়াছে। আশা করি তুমি ভাল আছ। কার্য্যাদিও বেশ চলিতেছে। রুদ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দও আশা করি বেশ আছে ও কাজকর্মাদি ভাল করিয়া করিতেছে। আমি ভাল আছি। এখানকার সব একপ্রকার কুশল। আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং রুদ্রচৈতন্য ও বৈরাগ্যানন্দকেও জানাইবে। এখানকার সকলে তোমায় এবং আর সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ভালবাসাদি জানাইতেছে। ইতি

Yours afftly
Brahmananda

P. S, I have a mind to see you and your hermitage with a band of good company

Yours lovingly + afftly
Brahmananda

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramakrishna Advaita Ashrama,
Luxa, Banaras City, 29. 11. 13.

প্রিয় শঙ্করানন্দ,

বাবুরামদার মুখে শুনিলাম বাগবাজারের নগেন উকীল বড়দিনের মধ্যেই মঠের পশ্চিম দিকের জমিটি permanent lease করিয়া দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তুমি এখানে আসিবার আগে সত্বর তাহার সহিত দেখা করিয়া কিরূপ মনোভাব জানিয়া একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে পার ত ভাল হয়। যদি প্রকৃতই সে দেয় তাহা হইলে তুমি কথাবার্ত্তা কহিয়া মহিমানন্দকে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট পাঠাইয়া যাহাতে কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয় এমত চেষ্টা করিয়া আসিবে।

তোমার কোন্ তারিখ নাগাত এখানে আসা হইবে পত্রোত্তরে লিখিবে। বাবুরামদাদা বলিতেছে—আসিবার সময় মঠের কিছু বেগুন ও গাছের গুড় লইয়া আসিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

ব্রহ্মানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Bhadrak

14. 7. 15

প্রিয় কেদারবাবা,

মনে করিয়াছিলাম বুঝি তপস্যাদি করিয়া আমাদের সব ভুলিয়া গিয়াছ। এখন দেখিতেছি তাহা নয়। আমাদের একটু একটু মনে আছে। যাহা হউক তুমি তপস্যার জন্য ৺কাশী যাইতে চাহিতেছ? তা যাও। কিন্তু আমাকেও একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে আমারও সেখানে যাওয়া হয়। আহা এমন স্থান! কাহার না সাধ হয় সেখানে গিয়া বাস করিতে? আমি যাহাকে দেখি তাহাকেই বলি যে, যাও ৺কাশী গিয়া তপস্যা কর। ৺কাশী সর্বশ্রেষ্ঠ তপস্যার স্থান। আমার যখনই ৺কাশীর কথা মনে পড়ে, ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্তেই সব ছাড়িয়া ছুটিয়া তথায় চলিয়া যাই। কি আর বলিব? তোমার হাতেই সব। তুমি ইচ্ছা করিলেই সব হয়। ৺কাশী যাইয়া আমায় একটু আকর্ষণ করিও যাহাতে আমারও ৺কাশীবাস হয়। তুমি আকর্ষণ করিলেই হইবে। শেষ জীবনটা ৺কাশী বাস করিয়া কাটাইব, ইহাই আমার এখন ইচ্ছা। ৺কাশীর কথা মনে করিলে আর বাজে কোন কথাই ভাল লাগে না। বেশী আর কি বলিব? একান্তে স্থির হইয়া বসিয়া ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়া থাকাই ৺কাশীবাসের চরম ফল।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবে।

Yours afftly

Brahmananda

বিবেকানন্দের যুগবাণী সমন্বয়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পাশ্চাত্যের আধিপত্যের ছায়ায় প্রাচ্য শান্ত হয়ে আছে যেন সর্বংসহা বসুমতী। রোম-সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় গ্যালিলির প্রশান্তির কথা মনে জাগে। সে প্রায় দু'হাজার বছর আগের কথা। গ্যালিলির সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা চলে। কেবল রোম শব্দটির জায়গায় বৃটিশ শব্দটি বসালে আর কোন গোল থাকে না। বাইরে থেকে ভারতকে কতই না শান্ত দেখায়! কিন্তু বাহিরের এই স্থৈর্যের নীচে জাতির মর্মের গভীরে শুরু হ'য়ে গেছে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন। বসুমতীর বুকের পুঞ্জীভূত বেদনা কখন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবে। ভারতবর্ষের অন্তরে যে-বিপর্যয়ের ঝড়ের হাওয়া বইতে শুরু করেছে তার মুকুরে সারা এসিয়ার বিক্ষুব্ধ আত্মার প্রতিফলন।

এতকাল পরে ভারতবর্ষ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। সে নিজেকে নূতন ক'রে যেন আবিষ্কার করেছে। ইতিহাসের নাট্যলীলায় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই কথাটি অকস্মাৎ সে বুঝতে পেরেছে। এতদিন যা ঘটবার তাই ঘটেছে, যা হবার তাই হয়েছে। এখন থেকে পাশ্চাত্যের উদ্ধত সভ্যতার আনুগত্য স্বীকার করতে সে আর রাজী নয়। ভারতবর্ষ তার নিজস্ব আদর্শগুলিকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেবে, তার যুগযুগান্তের গরিমাময় ঐতিহ্যের জয়ধ্বজাকে সে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে সগর্বে বহন করে চলবে। ঐ ঐতিহ্যের মধ্যে তার যে-স্বকীয়তা আছে সেই স্বকীয়তার এক বিন্দু-বিসর্গও ছাড়তে প্রস্তুত নয় সে। তার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য থেকে জগতের কি কিছুই শিখবার নেই? পাশ্চাত্যের পদ-প্রান্তে ব'সে প্রাচ্যের নিশ্চয়ই শিখবার অনেক-কিছুই আছে। বিজ্ঞানকে সহায় ক'রে পাশ্চাত্য বিদ্যা তো কম আহরণ করেনি। হোক সে বিদ্যা অপরা বিদ্যা, তাতেও কি আমাদের প্রয়োজন নেই? কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষ আচার্যের ভূমিকা নেবার যোগ্যতা রাখে, সেখানে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই তাকে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আর পাশ্চাত্য যেখানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর আচার্য হবার অধিকারী, সেখানে নম্রতার সঙ্গেই প্রাচ্য তার পদতলে শিষ্যের আসন গ্রহণ করবে।

কিন্তু যে-প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি এসে পড়লো এবার তাতেই আসা যাক। সমগ্র প্রাচ্যের একটা বিশাল মানব-পরিবারের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আত্মার গভীর আকুতি চাইছিলো নব নব রূপের মধ্যে নিজেকে মূর্ত ক'রে তুলতে। প্রায় দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে রোমের আধিপত্যের ছায়ায় গ্যালিলির অন্তরলোকে যখন একটা আলোড়ন চলেছে সেই বিপর্যয়ের মুখে খ্রীষ্ট এলেন। নব-সৃষ্টির আন্দোলনের ধারা বইতে আরম্ভ করলো ধর্মের পথ ধ'রে। ভারতবর্ষেও বৃটিশ-শাসনের ছায়ায় জাতির ভিতরটায় যে ভূকম্পন শুরু হোলো—সেই আলোড়নও ধর্মকে করলো আশ্রয়।

ভারতবর্ষে এমন তো হবেই—কারণ এখানে ধর্মই তো জাতির প্রাণকেন্দ্র। বিবেকানন্দের ভাষায় ধর্মই তো জাতির মেরুদণ্ড, ধর্মই তো

সেই ভিত্তি যার ওপরে জাতীয় ইমারত উঠেছে গ'ড়ে। স্বামীজীর মাদ্রাজের বক্তৃতায় আছে: "Here in India, it is religion that forms the very core of the national heart. It is the backbone, the bed-rock, the foundation upon which the national edifice has been built." অর্থাৎ এখানে ভারতবর্ষে জাতির মর্মকোষ ধর্ম দিয়ে তৈরী। জাতীয় সৌধ গড়ে উঠেছে ধর্মকে ভিত্তি ক'রে।

এই ধর্ম কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে একটা বিশ্বাসমাত্র? তার বেশী কিছু নয়? হিন্দুদের কাছে ধর্ম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। ঈশ্বর আছেন, এই আস্তিক্যবুদ্ধি ধর্মের শেষ কথা নয়। ঈশ্বর রয়েছেন সমস্ত কিছুকে পূর্ণ ক'রে—এই উপলব্ধির গভীরতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মের আসল তত্ত্ব। একদিন ভারতবর্ষের মানুষগুলি ভুলে গেল ধর্ম কাকে বলে। ধর্ম পর্যবসিত হোলো সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বগুলির বিচার-বিশ্লেষণে যার সঙ্গে অধ্যাত্ম চেতনার যোগ ছিল অল্পই। কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানের পর্যায়ে ধর্মকে নামিয়ে এনে আমরা আধ্যাত্মিকতাকে একটা প্রহসনে পরিণত করবার উপক্রম করছিলাম। পাশ্চাত্যের পদপ্রান্তে আসীন একদল নব্যযুবক ভাবতে শুরু করেছিল গোমাংস-ভক্ষণ আর সুরাপানই সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ। আর রামমোহন রায় এবং ব্রাহ্মসমাজ তো লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর সাকার উপাসনায় বিশ্বাসকে একটা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই বলতে রাজী ছিলেন না

ধর্মের এই গ্লানির মহা দুর্দিনে রামকৃষ্ণ এলেন নব্যভারতের চেতনায় একটা নূতন আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বইয়ে দেবার জন্য। তিনি বললেন, ধর্মের তত্ত্ব বুদ্ধি দিয়ে জানবার বিষয় নয়। ঠাকুর বললেন: "অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়?" এর ভাষ্য ক'রে শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "It is impossible for the limited human reason to judge the way or purpose of the Divine—which is the way of the Infinite dealing with the finite." অর্থাৎ সীমিত মানববুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের গতিবিধি বা উদ্দেশ্যকে জানা অসম্ভব। ব্যাপারটা তো সান্তের সঙ্গে অনন্তের কারবার। ঠাকুর বললেন, ধর্ম জিনিসটা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ জীবন্ত দিব্য উপলব্ধি। উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে: "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥"

—"আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়।"

ঠাকুর জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রকে বললেন, "আমি তাঁকে দেখেছি।" উপনিষদের ঋষির বাক্যেরই স্বীকৃতি রয়েছে এই উত্তরের মধ্যে। ধর্ম তো তর্কের ব্যাপার হ'তেই পারে না। উপলব্ধিতে যে পৌঁছালো সে কোন্ ভাষায় ব্রহ্মের বর্ণনা দেবে? আর সবই উচ্ছিষ্ট হ'তে পারে, শুধু ব্রহ্মই কোনোকালে উচ্ছিষ্ট হন না। কলসি জলে ভরে গেলে আর শব্দ নেই। ভোমরা মধুর আস্বাদন পেলে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

ধর্ম জ্ঞান-বিচারে নয়, তর্কে নয়, বিশ্বাসেরও বিষয়বস্তু নয়; ধর্ম হচ্ছে ঈশ্বরের মধ্যে জীবের যে অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে তারই সরাসরি আস্বাদন। প্রত্যক্ষ আস্বাদন যেখানে মূলকথা সেখানে বুদ্ধি দিয়ে অনন্তকে জানার চেষ্টা শুধু সীমিত মানববুদ্ধির পক্ষে

অসম্ভব নয়, এই চেষ্টার কোনো সার্থকতাও নেই। সুন্দর উপমা দিয়ে ঠাকুর এই সত্যটি বুঝিয়েছেন। "যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে এ জানবার আমার কি দরকার?"

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে ধর্মজগতে আর একটি বিপুল সত্য প্রতিষ্ঠিত হোলো এবং এই সত্যটি হোলো "যত মত তত পথ।" ঠাকুর বললেন শ্রীম-কে: "নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এই সব করছেন—অধিকারভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।" এত যে ধর্মের আয়োজন করেছেন ভগবান—এর প্রত্যেকটিকে অনুসরণ ক'রে ঈশ্বরীয় উপলব্ধিতে আমরা পৌঁছাতে পারি। ঠাকুরের এই বাণীর পশ্চাতে ছিল অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। মুসলমানধর্মের উপদেশগুলি শিরোধার্য ক'রে মুসলমানমতে তিনি রীতি-মতো সাধনা করেছিলেন এবং সিদ্ধ হয়েছিলেন। খৃষ্টধর্মমতেও সিদ্ধিলাভ করে-ছিলেন। ধর্মের বিচিত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ তিনি করেছিলেন। রামকৃষ্ণের পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন ধর্মগুরুর ভূমিকা নিয়ে তাঁদের বাণীর মধ্যে বিচিত্র সুরের এই মহাঐক্যতানটি আমরা শুনিনি। একের সুর যেন অন্যের সুর থেকে স্বতন্ত্র ছিলো—সুরের সঙ্গে সুর মিলে যায়-নি। রামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যেই আমরা প্রথম শুনতে পেলাম ধ্বনির বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরের একটি ঐক্য যাকে ইংরেজীতে বলে symphony. যুগের কর্ণে রামকৃষ্ণ যে মহামন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন তা হচ্ছে একের মন্ত্র।

আর একটি যুগান্তকারী ভাবকে আধ্যাত্মিকতার দিব্যচ্ছটায় মহিমান্বিত ক'রে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যুগের সম্মুখে রাখলেন। "শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" ক্ষুধিত জাতির জন্য প্রথম ব্যবস্থা করা দরকার অন্নের। যার উদরে জ্বলছে ক্ষুধার আগুন তাকে ধর্মের কথা কি শোনাবে? ঠাকুর জীবসেবার কথা বললেন, কিন্তু শিবজ্ঞানে। অনেক তপস্যা ক'রে, অনেক অশ্রু-গঙ্গা পার হ'য়ে রামকৃষ্ণ মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীকে দর্শন করেছিলেন। জগন্মাতার জ্যোতিঃসমুদ্রের তীরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যখন পৌঁছালেন, দেখলেন মা-ই সব হয়েছেন। সর্বত্র তাঁকেই দেখতে লাগলেন। হাজরাকে বললেন, "কারুকে নিন্দা কোরো না। নারায়ণই এই সব রূপ ধ'রে রয়েছেন। দুষ্ট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়।" বললেন, "দেখ, দুষ্ট লোককে পর্যন্ত বাদ দিবার জো নাই! তুলসী শুকনো হোক, ছোট হোক—ঠাকুর-সেবায় লাগবে।" রামকৃষ্ণ যখন শিশুর মতো মাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরলেন মায়ের সঙ্গে সমস্ত জগৎকেও আলিঙ্গন করলেন। ঠাকুর বলছেন; "রামলালের মাকে বকতে গিয়ে বকতে পারলাম না। দেখলাম তাঁরই একটি রূপ!"

এবার গুরু থেকে শিষ্যের প্রসঙ্গে আমরা নামতে পারি। বিবেকানন্দের প্রথম এবং শেষ পরিচয়: তিনি রামকৃষ্ণের দাসানুদাস, তাঁর শিষ্য, তাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাজ করবার জন্য ঠাকুর তাঁকে নিজের হাতে তৈরি ক'রেছিলেন, শিল্পী যেমন ক'রে ধাতব উপাদানে মূর্তি তৈরি করে। বিবেকানন্দের জীবনব্রত ছিল রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদকে পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ ক'রে দেওয়া। রামকৃষ্ণকে বুঝতে পারলে বিবেকানন্দকে বুঝতে পারা একটুও কঠিন হবে না। রামকৃষ্ণের পরম অবদান একটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয়—ঐক্যতান,

symphony. বিচিত্র ধ্বনির একটি মিলিত সুর স্বর্গীয় সুষমায় ব্যক্ত হয়েছে তাঁর যুগবাণী 'যত মত তত পথ'-এর মধ্যে। সমস্ত সুরকে একটি মহান ঐক্য-তানের মধ্যে মিলিয়ে সেই সমন্বয়ের সোনার কংক্রিটের উপরে বিবেকানন্দ গড়তে চেয়েছিলেন তাঁর মহামানবের মিলন-স্বর্গ। রোমাঁ-রলাঁ বিবেকানন্দের জীবনীতে লিখেছেন : "In the two words—equilibrium and synthesis Vivekananda's constructive genius may be summed up." অর্থাৎ বিবেকানন্দের সৃজনী প্রতিভাকে দুটো শব্দে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি ভারসাম্য, অপরটি সমন্বয়। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, যুগান্তরের নাটালীলায় জাগ্রত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক একটি ভূমিকা আছে এবং সেই ভূমিকাটি হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার অমৃতধারায় পৃথিবীর শুষ্ক অধরকে সে সিক্ত করবে। জগৎকে সে নতুন ক'রে শোনাবে তার তপোবনের বাণী।—বেদান্তের মৃত্যুহীন বাণী। স্বামীজী দেখেছিলেন সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির শিখরে ব'সে আছে। সেই জগৎ অচিরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে। কোন আলো, কোনো আশা, কোনো আশ্রয় বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পাননি। মাদ্রাজের যুবকদের সম্বোধন ক'রে স্বামীজী তাই বললেন, "We must go out, we must conquer the world through our spirituality and philosophy." অর্থাৎ আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন দিয়ে জগৎ জয় করবো, বাহির বিশ্বে বেরিয়ে পড়বার ডাক এসেছে আমাদের কাছে। "জাতীয় জীবনে জাগরণ আসতে পারে, প্রাণের জোয়ার আসতে পারে একটিমাত্র সর্তে—আমরা যদি ভারতীয় চিন্তাধারা দিয়ে জগৎকে জয় করতে পারি।' স্বামীজীর চেতনায় এই বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেদীপ্যমান ছিল অম্লান দীপশিখার মতোই। কিন্তু বিবেকানন্দের জিগীষু আধ্যাত্মিকতার মধ্যে রোমাঁ রলাঁ যাকে বলেছেন "Spiritual imperialism" বা "আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদ", তার নামগন্ধও ছিল না। ভারতের বেদান্তের বাণী যাঁরা দেশদেশান্তরে বহন ক'রে নিয়ে যাবেন তাঁরা প্রত্যেকের স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবেন। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতার অভিযানে কোন জাতিকেই বলা হয়নি তার নিজস্ব পথগুলিকে পরিহার করতে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন মানুষের মধ্যে যে-আত্মা ঘুমিয়ে আছে তাকে আবার জাগিয়ে দিতে।

বিবেকানন্দকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাঁর যে পরিচয়গুলি আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে কোনটাই তাঁর সামগ্রিক রূপ নয়। আপাতবিরোধী সুরগুলিকে একের সূত্রে গেঁথে আপন জীবনকে তিনি একটি মহাসঙ্গীতে, এক আশ্চর্য symphonyতে সার্থক ক'রে তুলেছিলেন। তিনি ভক্ত ছিলেন ঠিকই। আমেরিকার সহস্রদ্বীপোদ্যানে যে-বিবেকানন্দ শিষ্যদের নারদীয় ভক্তিসূত্র পড়াতেন তাঁকে চিনতে আমরা নিশ্চয়ই ভুল করবো না। পতঞ্জলির যোগদর্শনের ভাষ্যকার বিবেকানন্দ স্বভাবতঃ জ্ঞানী ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে? আর বিবেকানন্দের পক্ষে কর্মযোগী হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না। রোমাঁ রলাঁ ঠিকই বলেছেন, He had to deal with a nation of "dyspeptics," drunk with their own sentimentality. ভাবের ফেনিল ক্রোড়ে নিলীন পেট-রোগা একটা

জাত নিয়ে তাঁকে কারবার করতে হয়েছিল। একটা অলস ভাবালু মৃতকল্প জাতির কর্ণ-কুহরে কর্মের বাণী ছাড়া কোন্ বাণী তিনি শোনাতে পারতেন? বিবেকানন্দের জীবনীর গোড়াতেই রোমাঁ রলাঁ তাই লিখেছেন, "He was energy personified, and action was his message to men."

বিবেকানন্দ কবিও ছিলেন। একটি কবিতায় আছে: "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।" বিবেকানন্দের নিজের জীবনও তো অন্তহীন একটা সংগ্রামেরই নাট্যলীলা! রোমাঁ রলাঁ ঠিকই লিখেছেন, "Battle and life for him were synonymous." বিবেকানন্দের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ যেন একটা রণভূমি। আধ্যাত্মিক জীবন এবং কর্মজীবন, বৈরাগ্য এবং মানব-সেবা—কোন্‌টাকে তিনি প্রাধান্য দেবেন? বিবেকানন্দকে খুব কাছে থেকে দেখতো যারা তারা প্রায়ই শুনতে পেতো একটা ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে তাঁর মর্মের গভীর থেকে। কর্মজীবনের সমস্ত ঝামেলা এবং কলরবকে পশ্চাতে রেখে তিনি যদি নিরাসক্ত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজকের বন্ধনহীন জীবন যাপন করতে পারতেন! কিন্তু তা তো কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না! রলাঁ লিখেছেন, "প্রত্যেক ব্রতের মধ্যেই এমন কিছু আছে যাকে বলা যেতে পারে নাটকীয়, dramatic. ব্রত যিনি গ্রহণ করেন তাঁকে বলি দিতে হয় স্বভাবের একটি অংশকে, বলি দিতে হয় তাঁর স্বাস্থ্যকে, তাঁর বিশ্বাসকে, তাঁর মর্মের গভীরতম আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে।"

বিবেকানন্দের জীবন-তরীর হাল তাঁর নিজের হাতে থাকলে সেই তরী সর্বদা নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ-সাগরের দিকেই চলতো। কিন্তু রলাঁ ঠিকই লিখেছেন: "But he had not chosen his way of life. His mission had chosen him." গুরুর চিন্তা-ধারাকে কার্যে পরিণত করাই ছিল শিষ্যের জীবনব্রত! সেই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো বিবেকানন্দের বিশ্রাম বলে কিছু থাকতে পারে না! শিবজ্ঞানে জীবসেবার বিরাট কাজ রয়েছে তাঁর সম্মুখে! অজ্ঞতা, দুঃখ, দারিদ্র্য দিক থেকে দিগন্তরে বিস্তীর্ণ! জন-সাধারণের ম্লান মুখচ্ছবি চেতনার ক্ষেত্র থেকে বেমালুম সরিয়ে রেখে তিনি ভক্তির অমৃত-সিন্ধুতে ডুবে থাকবেন কেমন ক'রে? জীবনের একপ্রান্তে অদ্বৈত, আর একপ্রান্তে আর্ত-মানবতা। বিবেকানন্দ অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলেছেন! যখন ভারসাম্য রাখা সম্ভব হয়নি এবং বিবেকা-নন্দকে একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে, বিবেকানন্দ ঝুঁকেছেন দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশের দিকে, করুণার কাছে তিনি সব-কিছুই বলি দিয়েছেন। আর এইজন্যই হয়তো বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের এত বড়ো একটা আবেদন রয়েছে আমাদের কাছে।

বিবেকানন্দ মানে সমন্বয়, synthesis; বিবেকানন্দ মানে ভার-সাম্য, equilibrium; কর্মকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর গুরুদেব কি বলেননি, 'নারায়ণই এইসব রূপ ধরে রয়েছেন?' দরিদ্রনারায়ণের সেবা, মূর্খদেবতার পূজা—ভগবানের উপাসনার এমন মহিমময় রূপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় আছে?

পুণ্যস্মৃতি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের পুণ্য-স্মৃতিতে দুই বৎসর যাবৎ তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগনার গুড়াপ গ্রামে ভক্তসম্মিলন ও আনন্দোৎসব হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। যাঁহারা জীবিতকালে তাঁহাদের জ্ঞানভক্তিময় মহনীয় চরিত্রের প্রভাবে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ করেন, মৃত্যুর পরও তাঁহারা আমাদের নিকট ফুরাইয়া যান না। আমাদের স্মৃতির মধ্যে তাঁহারা একটি জীবন্ত শক্তি হইয়া বাস করেন। তাঁহাদিগের কথা মনে করিয়া আমরা বিগত কালের আনন্দ ও উদ্দীপনা ফিরিয়া পাই, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈরাগ্য, ধ্যানশীলতা, প্রেম ও তত্ত্বদৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করি।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে জিতেন মহারাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হইবার বহু বৎসর পূর্ব হইতে তিনি তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য শত শত সাধু ও ভক্তের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে শ্রীমা সারদাদেবীর যে কৃপা লাভ করিয়াছিলেন উহা তাঁহার সারা জীবনে নানা ভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বকীয় আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছিবার সার্থকতা নিজে তিনি লাভ করিয়াছিলেন, আবার শত শত লোকের আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও চেষ্টা তাঁহার সংস্পর্শে সার্থক হইয়াছিল।

পূজনীয় জিতেন মহারাজের প্রথম সাক্ষাৎ-লাভ করিয়াছিলাম ১৯২৭ সালে, ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। আমি তখন কলিকাতায় কলেজে পড়ি। কয়েক দিনের জন্য পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একদিন সকালে ট্রেনে পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আসিলাম এবং স্টেশন হইতে সোজা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে উপস্থিত হইলাম। পূজনীয় জিতেন মহারাজ তখন ঐ মঠের প্রধান। তিনি সস্নেহে থাকিতে ও প্রসাদ পাইতে বলিলেন। একদিন মাত্র থাকিয়া পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া যাইব শুনিয়া তিনি একটি প্লান করিয়া দিলেন যাহাতে একদিনের মধ্যে ভুবনেশ্বরের যতটা পারা যায় দেখিয়া লইতে পারি। তদনুযায়ী ভুবনেশ্বরের মন্দিরাদি তো আমার দেখা হইলই, উপরন্তু খণ্ডগিরি উদয়গিরিও দেখা হইয়া গেল। বলিলেন, 'ঐ জঙ্গলের পাশে মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা রাস্তা তোমায় বাতলে দিচ্ছি—ঐ মাঠ পার হয়ে চলে গেলেই খণ্ডগিরি উদয়গিরি পৌঁছে যাবে। জঙ্গল ও নিরিবিলি মাঠে ভয় পেয়ো না। তুমি ঠাকুরের ভক্ত, ভয় কি?'

শীতকাল। রাত্রে হলঘরে যেখানে আমার শয্যা ঠিক হইয়াছিল নিজে আসিয়া সেখানে দেখিয়া গেলেন যথেষ্ট কম্বলাদি দেওয়া হইয়াছে কিনা। পরের দিন অতি ভোরে বাহির হইয়া আমাকে ট্রেন ধরিতে হইবে। পূজনীয় জিতেন মহারাজ একটি লণ্ঠন হাতে লইয়া ঠিক আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। আমার ন্যায় একজন কলেজের ছোকরার প্রতি এই পরিণতবয়স্ক সাধুর এমন অমায়িক স্নেহ ও যত্ন দেখিয়া হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল।

১৯৩০ সালে মঠে যোগ দিয়া একটানা

চার বৎসর বেলুড় মঠে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দজী মঠে আসিলে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ যত্ন করিতেন দেখিয়াছিলাম। একবার ৺দুর্গাপূজায় প্রতিমা-বিসর্জনের পর মহাপুরুষজী মঠবাড়ীর দোতলার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়াছেন। সাধু-ভক্তেরা একে একে ৺বিজয়ার প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। মহাপুরুষজী চোখ বুঁজিয়া মায়ের নাম করিতেছেন এবং সকলকে আশীর্বাদ করিতেছেন। মাতোয়ারা ভাব। পূজনীয় জিতেন মহারাজ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মহাপুরুষজী বলিলেন:

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

দেখ, সব সেই পূর্ণ ব্রহ্ম। সেই পূর্ণ ছাড়া আর কিছু নেই।" জিতেন মহারাজ হাত-জোড় করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন আমাদেরও যেন সেই পূর্ণের উপলব্ধি হয়।"

মহাপুরুষজী। নিশ্চয়, নিশ্চয়ই হবে।

১৯৩০ সালে ৺পূজার কিছুদিন আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে। সকালে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে সাধু-ব্রহ্মচারীরা প্রণাম করিতে আসিতেছেন। পূজনীয় জিতেন মহারাজ ঘরে ঢুকিলেন। মহাপুরুষজী সাদরে তাঁহাকে 'এস এস' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। জিতেন মহারাজ মহাপুরুষজীর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, "এসব আছেই—জরা ব্যাধি ইত্যাদি, আগমাপায়ী। আগম (উৎপত্তি) আছে, অপায় (বিনাশ) আছে। তা হোক্। জ্ঞান ভক্তি ঠিক থাক্। আর কেন? এ শরীরের দ্বারা যা হবার তা হয়েছে।"

বিশুদ্ধানন্দজী। মহারাজ, যতদিন আপনাদের শরীর থাকে ততদিনই আমাদের কল্যাণ। একটু কাছে এলে কত শান্তি হয়! আপনারা যেমন ঠাকুরকে যাতে তাঁর শরীর থাকে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আমরাও আপনার কাছে তা করতে পারি না কি?

মহাপুরুষজী। তোমরা বেঁচে থাকো। এ শরীরে আর কেন? তোমাদের দ্বারা ঠাকুরের কত কাজ হবে!

পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ রাঁচি মোরাবাদীতে আশ্রম স্থাপন করিলে ঐ আশ্রমে কিভাবে তিনি ধ্যানজপে তদ্গত হইয়া থাকিতেন তাহার বর্ণনা অনেক সাধু-ব্রহ্মচারীর মুখে শুনিয়াছি। তরুণ সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি জপধ্যানে খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁহার পুণ্যসঙ্গলাভের জন্য প্রাচীন সাধুরাও কখনো কখনো রাঁচিতে কিছু সময় কাটাইয়া আসিতেন। সাধুরা কেহ গেলে তিনি অত্যন্ত আদরযত্ন করিতেন। যদিও তখনও তিনি কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দেন নাই, কিন্তু রাঁচি শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও মহিলা তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার অমায়িক সপ্রেম ব্যবহার ও উদ্দীপনাময় সৎপ্রসঙ্গ ধর্ম-পিপাসুদের হৃদয় জয় করিত।

১৯৪১ সালের ফেব্রুআরি মাসে মঠ ও মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের সহিত মানভূমের তুলিন নামক স্থানে আমাকে যাইতে হইয়াছিল। মহারাজজী দু'সপ্তাহের জন্য ওখানে একান্তে বিশ্রাম লইতে গিয়াছিলেন। যেদিন আমরা বেলুড় মঠে ফিরিব সেই দিন বিকালে পূজনীয় জিতেন মহারাজ একটি ভক্তের গাড়িতে হঠাৎ রাঁচি হইতে তুলিনে আসিয়া উপস্থিত। বিরজানন্দ মহারাজ একান্তে বিশ্রাম লইতে আসিবেন বলিয়া তাঁহার এখানে আসিবার

কথা গোপন রাখা হইয়াছিল। যাহা হউক, পূজনীয় জিতেন মহারাজ কোনওক্রমে সংবাদ পাইয়া মঠাধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করিতে রাঁচি হইতে বরাবর এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দিককার প্রাচীন মন্ত্রশিষ্য। এই অপ্রত্যাশিত মিলনে উভয়ের কী আনন্দ! বিরজানন্দ মহারাজ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজকে কিভাবে সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন করিবেন খুঁজিয়া পান না! বিশুদ্ধানন্দ মহারাজও হৃদয়ের আনন্দ ও শ্রদ্ধা কত প্রকারে প্রকাশ করিবেন বুঝিতে পারেন না! সে দৃশ্য কখনো ভুলিব না। পাশাপাশি বসিয়া দুজনের কত গভীর অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ চলিল!

একবার কাশীতে পূজনীয় জিতেন মহারাজের পুণ্যসঙ্গ কয়েক দিন লাভ হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় ৺বিশ্বনাথ-মন্দিরে গিয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিয়া আসিলেন। পরে বলিয়াছিলেন, "শরীর বুড়ো এবং অপটু হয়েছে, তবুও অতক্ষণ দাঁড়িয়ে আরতি দেখে এসে কিছুমাত্র কষ্টবোধ করছি না। হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। ৺বিশ্বনাথের জীবন্ত সান্নিধ্য যেন অনুভব করলাম।"

কাশী সেবাশ্রমে পূজনীয় কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দজী) ও বিশুদ্ধানন্দজীর পারস্পরিক মিলন এবং কথাপ্রসঙ্গও বড় আনন্দপ্রদ ছিল। কয়েকদিন উহা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ অধ্যক্ষ থাকা কালে প্রতিবৎসর শীতকালে মঠে আসিতেন এবং গরম পড়িলে হিমালয়ে চলিয়া যাইতেন। পূজনীয় জিতেন মহারাজও এই সময়ে রাঁচি হইতে কয়েক মাসের জন্য মঠে আসিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহার দীর্ঘসময়ব্যাপী জপধ্যানের রুটিন দেখিয়া অবাক হইতাম। মঠবাড়ির দোতলায় স্বামীজীর ঘরের উত্তরের ছোট ঘরটিতে থাকিতেন। খাওয়া-দাওয়া অতি সরল—ঠিক যোগীর আহার। ধ্যানতন্ময়তা এবং ভগবদালোচনা—এই দুটিতেই তাঁহার সারা প্রাণ যেন কেন্দ্রীভূত মনে হইত। কখনো কখনো কলিকাতা হইতে আগত কোনও কোনও ভক্তের সহিত দোতলার বারান্দায় বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণমাতানো ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভরতা প্রভৃতি সাধনগুলি তাঁহার কথার মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিত।

তিনি মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ হইয়া ভারতের নানা স্থানে যখন যাইতেছেন এবং আমাদের আশ্রমসমূহে থাকিয়া শত শত ভক্তকে অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকতারণ শক্তি তাঁহার ভিতর অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহারা ঐ শক্তির সংস্পর্শে আসিতেছে তাহারা ধর্মজীবনে একটি নূতন প্রেরণা লাভ করিতেছে। সেই সময়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকের ভার আমার উপর ছিল। নানা স্থানে ভক্তমণ্ডলীর নিকট কথিত তাঁহার ধর্মালোচনাগুলি কেহ কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে পাঠাইতেন। আমাকে পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এই প্রসঙ্গগুলি তুমি উদ্বোধনে ছাপতে চাইলে ছাপতে পার। তবে ভাল করে এডিটিং করে দিও।"

তিনি মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ হইবার আগেই আমাকে আমেরিকায় চলিয়া আসিতে হয়। বেলুড় মঠে তাঁহার নিকট যখন শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিলাম তখন তাঁহার

উৎসাহপূর্ণ বাণী, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ আমাকে বিশেষ শক্তি দিয়াছিল। আমেরিকা হইতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে পত্র দিতাম। তাঁহার বিপুল কার্যধারার মধ্যে সময় করিয়া তিনি নিজ হাতে আমাকে প্রত্যুত্তর লিখিতেন। কত উৎসাহ, অভয় এবং ভালবাসা ঐ সব চিঠির মধ্যে অভিব্যঞ্জিত হইত! ঐ পত্রগুলি আমার মূল্যবান সঞ্চয়।

পূজনীয় বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়কাল এবং বার্ধক্য—প্রতিটি অবস্থায় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন কিভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহা অনুসরণ করিলে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ পাইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য।

দুই বিহঙ্গ

শ্রীজগন্নাথ প্রামাণিক

দুই বিহঙ্গ একই কুলায়ে রয়,
প্রথম সে চাহে নীড়ের নিরালা কোণ,
পক্ষ ছড়ায়ে শক্তি করে না ক্ষয়,
আর আপনারে রাখে সে সংগোপন।

দ্বিতীয় সে খগ বিশ্ব-ক্ষুধিত ঠোঁটে
চক্ষে নিয়ত সুদূরের নেশা নিয়ে
বক্ষে বাসনা উদ্দাম নিয়ে ছোটে,
মত্ত গগন-মহুয়ার মধু পিয়ে।

লঙ্ঘে সে গিরি, কত খাদ কত গড়,
কোথাও শ্যামল নিবিড় সে বনমালা,
কোথাও তুহিন চিরতুষারের ঝড়
কোথাও সে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা।

আঁখি তার পিয়ে নীলের সুষমা যত
ক্লান্তিতে পাখা যত তার ভ'রে ওঠে,
তিয়াসা তাহার তত বাড়ে অবিরত,
ক্লান্ত পাখায় উন্মাদ হয়ে ছোটে।

হেথায় কুলায়-মাঝারে আছে যে পাখী
কী অসীম পাওয়া তাহার চরণে লোটে,
পরমানন্দ-বিলীন মুদিত আঁখি—
উধাও বিহগ এরই সন্ধানে ছোটে।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী বীতশোকানন্দ

১৩৪ বছর পূর্বে ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে পিতা ক্ষুদিরামের ধর্মসদনে যে-শিশুর উদয় হয়েছিল উষার শুভলগ্নে, তাঁরই পুণ্য কীর্তির সৌরভে আজ পৃথিবী উদ্ভাসিত। তাঁকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে এখন শ্রদ্ধাপ্লুতচিত্তে স্মরণ করে। তাঁর অলৌকিক ত্যাগ, সুতীব্র দীর্ঘ তপস্যা, দেব-দুর্লভ পবিত্রতা, অপরিসীম ভূতদয়া, সর্বপ্রসারী সহানুভূতি, বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাঁর জীবনকে অনন্যতায় চিরভাস্বর করে রেখেছে।

সাধারণ মানুষ আমরা বহির্জীবনের ঘটনার প্রাচুর্যের দ্বারা মানবকে মহামানবের আসনে বসাই। এই মাপকাঠিতে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিমাপ করতে যাই তখন আমাদের প্রয়াস অসফল হয়। ধনের আভিজাত্য, বংশের কৌলীন্য অথবা তথাকথিত শব্দঝরী বিদ্যার বৈখর্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু আন্তর সম্পদের মহান্ বিভূতিমণ্ডিত তাঁর জীবন আকৃষ্ট করেছিল ধনী জ্ঞানী বৃদ্ধ যুবা সকলকে। তাদের মন-মধুকর এক নৈসর্গিক আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাসুধা-পানের জন্য সর্বদা লালায়িত থাকত। বাক্য তখনই মহাবাক্যে পরিণত হয়—যখন বাচকের পশ্চাতে থাকে তাঁর অনিন্দিত জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যসন্ধ জীবনের মূল সুরটির উন্মেষ হয় শৈশবেই। গ্রামের মুক্ত প্রাঙ্গণ, প্রকৃতির অবাধ সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি তার মনপ্রাণকে অসীমের অনুসন্ধানে ব্যাকুল করে তুলত। নিবিড় ঘন-কৃষ্ণ মেঘপৃষ্ঠের উপর উড্ডীয়মান শ্বেত বলাকারাজি-দর্শনে তাঁর কবিমন শিশুবয়সেই পরম কবির সত্তার সঙ্গে একীভূত হওয়ায় তাঁর বাহ্য চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। অধ্যয়নে অনাসক্তি তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠল। পার্থিব জীবনে নিরাসক্তির নিরসনের জন্য তাঁর অগ্রজ তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ যৌবনে উপনীত। তাঁর মন জগৎকারণ জগদীশ্বরের অপাবৃত দর্শনের জন্য সতত ব্যাকুল। অদৃশ্যে তাঁর ভাগ্যবিধাতা তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ক্ষেত্র নির্মাণ করলেন রানী রাসমণি-প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের দেবায়তনে। এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ধর্মজগতের সত্যগুলির পরীক্ষা নিজের অনুভূতির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি কালীমন্দিরের পূজারী নিযুক্ত হলেন। তাঁর প্রশ্ন হোল, যে মূর্তির পূজা তিনি করছেন, যে-সব মন্ত্র উচ্চারণ করছেন দেবীর উদ্দেশ্যে, সেগুলি কি প্রাণহীন অর্থহীন অনুষ্ঠানমাত্র, না অতি বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত? দেবী চিন্ময়ী, না মৃন্ময়ী? তিনি যদি জাগ্রতা হন, তবে তাঁর প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ মা কেন শুনবেন না? কেন তাঁর পূজার উপাচার দেবী স্বহস্তে গ্রহণ করবেন না? এই প্রশ্নের উত্তর তাঁকে পেতেই হবে। মাতৃদর্শনের জন্য নিজের জীবনপণ-কল্পে তিনি সাধন-সমরে অবতীর্ণ হলেন তাঁর গন্ধর্ববিনিন্দিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোল

"আয় মা সাধন-সমরে, দেখি মা হারে, কি পুত্র হারে।" জনজল্পকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হৃদয়-মন্থনকারী অবিরল ক্রন্দনধারা নিঃসৃত হ'তে লাগল, "মা, দেখা দে!" সন্তানের সেই আকুল আহ্বানে জগজ্জননী ধরা দিতে বাধ্য হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মাতৃদর্শন হয় সূর্যমণ্ডলের মধ্যে। কিন্তু সে-দর্শনে তো সাধকের মন স্বস্তি পায় না; ইষ্ট যে অনেক দূরে! উপনিষদের ঋষি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।" আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত, হে পূষন্, আমি সত্যাশ্রয়ী, ব্রহ্মের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য তুমি তোমার আচ্ছাদন অপসারণ কর। দেবীর কল্যাণতম শোভনতম রূপানুভব সম্ভব হয় না যতক্ষণ না তিনি অন্তিকে আসেন। অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দিন কাটতে লাগল। অন্তরতমকে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠরূপে পাবার জন্য তাঁর বিপুল প্রচেষ্টা অবশেষে সার্থক হোল। মন্দিরের পাষাণীকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সাক্ষাৎ চিন্ময়ীরূপে, মায়ের ভুবন-ভরা রূপ তাঁর মনপ্রাণকে সম্পূর্ণ অধিকার করল। কিন্তু এখনও তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রার শেষ হোল না। মাকে তিনি বললেন, "মা, আমাকে একঘেয়ে করিসনি।" অপরূপাকে শতরূপে দেখার জন্য তাঁর নিরন্তর সাধন চলতে লাগল। বিবিধ সাকাররূপে দেখলেনও তাঁকে। আর অদ্বৈত সাধনায় প্রত্যক্ষ করলেন, যে-মাকে সূর্যমণ্ডলে দেখেছিলেন, যাঁকে চিন্ময়ীরূপে অতি নিকটে দেখেছেন, সেই মায়ের সঙ্গে তিনি অভিন্ন—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।"—মা-ই ব্রহ্ম। সাধনা শুধু হিন্দুধর্মেই সীমিত রইল না। খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মেও তিনি তাঁর সাধনা দিগন্তবিস্তৃত করলেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তপস্যার অন্তে তাঁর সাধনার শেষ কথা তিনি ঘোষণা করলেন, "যত মত, তত পথ"। "একো নানেয়ত্তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ।" ভগবান এক, কিন্তু তিনি নানাভাবে বিরাজমান হন।

যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদের মূর্তিমান ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের অত্যাশ্চর্য সততবিস্তারী অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সত্তা, এক ভগবান ক্রিয়াশীল, দেখিবেন প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর-ই বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র দুর্বল পতিত নিপীড়িত সকলের জন্য কাঁদিবে অথচ যাঁহার অত্যুত্তম অসামান্য প্রতিভা এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয় সাধন করিবে, এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়সাধনের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর যাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।"

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রশস্তি স্মরণ করি:

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে।
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি।
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।"*

* আকাশবাণীর সৌজন্যে

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-মাধুরী

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া

মহাভক্ত মহাসাধক শ্রীম।

তাঁহারই অনুধ্যানলব্ধ, শ্রীমুখকথিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনকাহিনী-সংবলিত ও দিব্যবাণীমণ্ডিত "শ্রবণমঙ্গল" ভাগবতী কথা: "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"। তৃষিত আত্মার শান্তির জন্য, সাধক অনুরাগী সন্তানের ধারণার নিমিত্ত, লোকশিক্ষার জন্য উর্ধ্বলোক হইতে প্রেরিত দিব্য প্রেরণার বাণী। শ্রীশ্রীমা ঠিকই বলিয়াছেন, "একসময় তিনিই তোমার নিকট এসকল কথা রাখিয়াছিলেন। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।"

সৃষ্টি-সাগরের অপর প্রান্ত হইতে ভূলোকের তটপ্রান্তে ভাসমান অমৃতলোকের দিব্যসঙ্গীত মহাজীবনকাব্য: সুরে সুরে অপরূপ মূর্ছনা, ছন্দে ছন্দে দিব্যপুরুষের অপার্থিব আভাস আর ছত্রে ছত্রে অনন্ত সুন্দরের শান্ত অমৃত স্পর্শ। এইসব দিব্য মনোহর রূপ ধ্যান করিয়া ভক্ত তৃপ্ত। এই সাগরসঙ্গীত-শ্রবণে অশান্ত হৃদয় শান্তি-স্নাত তৃপ্ত ও পবিত্র। এক একটি চিত্র দেখিতে দেখিতে মনপ্রাণ বিভোর হইয়া যায়। অতীত চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়। ভাসিয়া উঠে এক একটি নয়নানন্দকর সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ পট।

"চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন
দেখ শান্ত মনে সে প্রেমনয়নে অপরূপ
প্রিয়দরশন।
...পুলকে শিহরে জীবন।"

নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ঠাকুর সমাধিস্থ।

পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিয়াছে।
জ্যোতিতে পৃথিবী প্লবমান
প্রকৃতি অপ্রাকৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে
মধুরের স্পর্শে সবই মধুময়।
মধুময়; ধরা আনন্দে মগন।

সেই-আনন্দ নিকেতন কালীবাড়ী দক্ষিণেশ্বরের প্রান্ত বাহিয়া ভাগীরথী বহু দূর পর্যন্ত পবিত্রদর্শন। আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুসুমবিশিষ্ট মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহাতে আবার একজন চেতন মানুষ—অহর্নিশ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া আছেন।

মাষ্টার (শ্রীম) বরাহনগরে বড় দিদির বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সিধুর সঙ্গে ২৬শে ফেব্রুআরি রবিবার অবসর থাকায় প্রসন্ন বাড়ুয্যের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। সিধু বলিয়াছিলেন, "গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে—সেখানে একজন পরমহংস আছেন।"

সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন। ঠাকুর তক্তাপোষে বসিয়া পূর্বাস্য হইয়া সহাস্য বদনে হরিকথা কহিতেছেন, ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন—একঘর লোক। সকলেই নিস্তব্ধ।

মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

তাঁহার বোধ হইল যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন আর সর্ব তীর্থের সমাগম হইয়াছে।

দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন—আহা! কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা!

*　　*　　*

ঘরের বাহিরে আসিতে না আসিতে আরতির মধুর শব্দ হইতে লাগিল। কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতালের সহিত নহবতের মধুর শব্দ আসিতে লাগিল। সেই শব্দ ভাগীরথী-বক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে।

মাষ্টারের প্রথম দর্শন। দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইয়াছেন। বসন্তকালে সন্ধ্যাসমাগমে ভাগীরথীতীরে বন্ধু সমভিব্যাহারে উদ্যান-ভ্রমণে আসিয়া তিনি কি দেখিলেন—আশ্চর্য মনোহর স্থান। আশ্চর্য সুন্দর কথামৃত-শ্রবণান্তে ফিরিবার কালে আত্মভোলা মনো-মুগ্ধকর অভিনব আকর্ষণ। মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন—

"এ সৌম্য কে?—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে? বই না পড়িলে কি মহৎ হয়? কি আশ্চর্য! আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন—"আবার এসো!"

পূজনীয় কথক—তথা গ্রন্থকার উপ-ক্রমণিকায় বলিয়াছেন, ঠাকুর ঈশ্বরাবেশে কখনও একাকী, কখনও বা ভক্তসঙ্গে নানাভাবে থাকিতেন। সেই সকল অবস্থা ও ভাবের কয়েকখানি মাত্র চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিত্র দেখিয়া থাকি—নানা বর্ণে, নানা ভঙ্গিমায় ছবি শিল্পীমনের রূপ পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, "শুধু পটে লেখা"।

"কথামৃত" সেই ধরনের চিত্রমালা নহে। অনন্তকালের পরিসরে জ্যোতির্ময় ভাবচ্ছবি ভাবনয়নে "অপরূপ প্রিয়দর্শন" স্বর্গীয় দীপ্তি বিচ্ছুরণ করিতে থাকে। হৃদয় মন পরিপূর্ণ করিয়া যাঁহারা এই চিত্র অনুধ্যান করিবেন তাঁহাদের জনম জীবন সার্থক হইবে।

অপস্রিয়মাণ অতীতের অমর আলেখ্য কালের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া অম্লান ভাস্বর রূপে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। নয়নে আনন্দের ধারা নিঃসৃত হয়। প্রাণলোকের শান্তি-সায়র বিস্ফারিত হইয়া ক্ষুদ্র প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়া দেয়। সুনিভৃত হৃদয়-কানন হইতে স্নিগ্ধ পুষ্পসৌরভ আসিয়া ভুলাইয়া দেয় মায়াময় জগতের তুচ্ছ প্রলোভন অথবা জগতের সত্যকে জাগ্রত করিয়া চৈতন্যের সঞ্চার করে। প্রতি তৃণকণিকা, প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতি তরুপল্লব সজীব হইয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই প্রেমাবতারের মধুর কণ্ঠধ্বনি নম্রনেত্রে নীরবে আকণ্ঠ পান করিতে থাকে। পাঠ করিতে করিতে সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হয়, কত শত বৎসর আগে ক্লিষ্ট মানবের ক্লেশনিরসনার্থে বিগলিত প্রাণের তটভূমিতে, তাঁহারই সেই ভাগবত ভক্ত-হৃদয়ে যে সাড়া প্রথম আসিয়াছিল···

ঠাকুরবাড়ীতে এককালে তিন মন্দিরে—কালীমন্দিরে, বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে আরতি হইতেছে···তৎসঙ্গে ঠাকুরবাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে রসুনচৌকির সুমধুর নিনাদ শ্রুত হইতেছে।

সন্ধ্যাকালীন রাগরাগিণী বাজিতেছে। আনন্দময়ীর নিত্য উৎসব। যেন জীবকে

স্মরণ করাইয়া দিতেছে—

"কেহ নিরানন্দ হইও না। ঐহিকের সুখ দুঃখ আছেই; থাকে থাকুক—জগদম্বা আছেন। আমাদের মা আছেন; আনন্দ কর। দাসীপুত্র ভাল খেতে পায় না, ভাল পরতে পায় না—বাড়ী নাই, ঘর নাই—তবু বুকে যে জোর আছে, তার যে মা আছেন। মার কোলে নির্ভর। পাতানো মা নয়, সত্যকার মা। আমি কে, কোথা থেকে এলাম—আমার কি হবে, আমি কোথায় যাব—সব মা জানেন। কে অত ভাবে? আমার মা জানেন—আমার মা, যিনি দেহ মন প্রাণ আত্মা দিয়ে আমায় গড়েছেন। আমি জানতেও চাই না। যদি জানবার দরকার হয়, তিনি জানিয়ে দিবেন। অত কে ভাবে? মায়ের ছেলেরা আনন্দ কর।"

"সেবক-হৃদয়ে" অন্তর সিংহাসনে নিত্য-পূজিত প্রাণের ঠাকুরের শ্রীচরণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিকাইয়া দিয়া ভক্ত নিঃস্ব হইয়াছেন। আপনহারা আত্মভোলা (শ্রীম) "মণির" মনে ভাবের ফুট উঠিয়াছে:

"ভক্তিসূত্রে সাকারবাদী নিরাকারবাদী এক হয়।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, চারি বর্ণ এক হয়।

ভক্তিরই জয়!

ধন্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! তুমি সনাতন ধর্মের বিশ্বজনীন ভাব আবার মূর্ত করিলে। তাই বুঝি তোমার এত আকর্ষণ! সকলধর্মাবলম্বীদের তুমি পরমাত্মীয়বোধে আলিঙ্গন করিতেছ। তোমার এক কষ্টিপাথর—ভক্তি। মুসলমানের যদি আল্লার উপর ভক্তি থাকে, সেও তোমার পরমাত্মীয়। তুমি বল যে, সব নদীই ভিন্ন দিক দেশ হইতে এক সমুদ্র-মধ্যে পড়িতেছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—সমুদ্র।"

...

"শুনিলাম মহাপুরুষেরা সমাধিস্থ হয়ে সেই নিত্য পরমপুরুষকে দর্শন করেছেন, নিত্য লীলাময় হরিকে সাক্ষাৎকার করেছেন। তবে এ চর্মচক্ষে নহে—বোধহয় দিব্যচক্ষু যাহাকে বলে তাহার দ্বারা। সে চক্ষু কিসে হয়?

"ঠাকুরের মুখে শুনিলাম—ব্যাকুলতার দ্বারা হয়।"

এখন সে ব্যাকুলতা হয় কেমন করে?

"দিন কতক নির্জনে থাকা দরকার: তা এক বছর হোক, ছয় মাস হোক—তিন মাস হোক, এক মাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয়, সর্বদা তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয় আর মনে মনে বলতে হয়:

"আমার সংসারে কেউ নাই।

যাদের আপনার বলি তারা দুদিনের জন্য।

ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক।

তিনিই আমার সর্বস্ব। হায় কেমন করে তাঁকে পাব?"

...

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। এই সূর্য চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করিতেছিলেন। কোথায় গেলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর নাম করিতেছেন। সকলে উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। এমন মিষ্ট নাম তাঁরা কখনও শুনেন নাই—যেন সুধাবর্ষণ হইতেছে! এমন প্রেমমাখা বালকের মা মা বলে ডাকা তাঁরা কখন শুনেন নাই, দেখেন নাই। সকলের অশান্ত মন কিসে শান্তি লাভ করিল? নিরানন্দ ধরা কিসে আনন্দে ভাসিল? এই প্রেমিক সন্ন্যাসী কি সুন্দর-

রূপধারী অনন্ত ঈশ্বর? এইখানেই কি তৃষ্ণাপানে পিপাসুর পিপাসার শান্তি হইবে?

"অবতার হউন আর না হউন—ইঁহার চরণ-প্রান্তে মন বিকাইয়াছে। আর যাইবার জো নাই। ইঁহাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। নামগুণকীর্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবশিক্ষা দিতেছেন কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা, আমি তোমার শরণাগত। দেহসুখ চাহি না; কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। তোমার মায়ার সংসারের কামিনী-কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়। মা, তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন; কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।' তিনিই শিখিয়েছেন - 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—গুরুবাক্যে বিশ্বাস।' হে ভগবান, আমায় ঐ বিশ্বাস দাও। আর মিছামিছি ঘুরাইও না। যা হবার নয় তা খুঁজতে যাওয়াইও না। আর যা শিখিয়েছেন যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। কৃপা করে এই আশীর্বাদ কর।"

গিরিশের কি বিশ্বাস—! দুদিন দর্শনের পরই বলেছিলেন:

"প্রভু! তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেছ আমার পরিত্রাণের জন্য।" গিরিশ ঠিক তো বলেছেন—ঈশ্বর মনুষ্যদেহ ধারণ না করিলে ঘরের লোকের মতো কে শিক্ষা দিবে? কে জানিয়ে দিবে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু? কে ধরায় পতিত দুর্বল সন্তানকে হাত ধরে তুলবে? কে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, পাশবস্বভাবপ্রাপ্ত মানুষকে আবার অমৃতের অধিকারী করবে? আর তিনি মানুষরূপে সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে যারা তাঁকেই অন্তরাত্মা বলে জানে, যাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না—তারা কি করে দিন কাটাবেন?

তাই—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মণি (শ্রীম) সেই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন ও ভাবিতেছেন—"কি ভালবাসা গিরিশকে!" এমনও বলছেন না যে "আমার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়, কর্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।" এর মানে এই—"সময় না হলে হয় না। তীব্র বৈরাগ্য না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে।" ঠাকুর যেমন নিজে বলেন—ঘায়ের মামড়ী, ঘা শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত পড়ে কষ্ট হয়। কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামড়ী আপনি খসে যায়। যাদের অন্তর্দৃষ্টি নাই তারা বলে এখনি সংসার ত্যাগ কর।

"ইনি সদ্‌গুরু, অহেতুক কৃপাসিন্ধু, প্রেমের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হয়, এই চেষ্টা নিশিদিন করিতেছেন।"

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীদেবব্রত মজুমদার

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব, কারণ ব্যক্তি বিশেষে এবং রাষ্ট্র হিসাবেও শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়— শিক্ষা মানুষের দেহ ও মনকে এমনভাবে বিকশিত করবে, যা নিজের কল্যাণের সহিত দেশ ও জাতির কল্যাণে লাগে।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখি—এই শিক্ষাই যেন আমাদের দেহ ও মনকে সবদিক দিয়ে চেপে ধরেছে। অর্থনৈতিক চাপ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শিক্ষার সঙ্গে অবশ্যই অর্থ ও সম্পদের সম্পর্ক থাকবে, তবে শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনের যোগ্যতা-অর্জন মাত্র নয়, আরও কিছু। যেদিন থেকে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্থ-উপার্জনে এসে দাঁড়াল, সেই দিন থেকেই শিক্ষা তার আসল পথ থেকে বিচ্যুত হল। আমরা তখন কোনরকমে কতকগুলি তথ্য মাথায় ঠেসে পুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা আদায়ের জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অনেক দুঃখেই বলেছিলেন 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যে শিখে কি হবে?' এ যেন ধূপধুনার প্রচণ্ড ধোঁয়ায় দেবতাকে আর দেখা গেল না। মানসিক উৎকর্ষ-সাধন, শরীরগঠন—এসব কথা চাপা পড়ে রইল।

তাছাড়া শিক্ষার উপায়েও রয়ে গেল একটা প্রচণ্ড ভুল। শিক্ষা অর্থে স্বামীজীর মতে, 'মানবের মধ্যে পূর্ব হইতেই যে দেবত্ব রহিয়াছে তাহাই প্রকাশ করা।'[১] কিন্তু শিশুকাল হতে যৌবন অবধি বই মুখস্থ করার সময় একটি-বারও মনে হল না আমাদের একটা মস্তিষ্ক আছে যার সাহায্যে পুঁথির বাইরেরও কোন বিষয় চিন্তা ভাবনা করতে পারি। অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে গিয়ে স্বকীয়তা জলাঞ্জলি দিলাম। তাই স্বামীজী বলেছেন, 'শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধবিশ্বাসসম্পন্ন হইতে হইবে, বিশ্বাস করিতে হইবে যে, প্রত্যেক শিশুই ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ আর আমাদিগকে তাহার মধ্যে অবস্থিত নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুদের শিক্ষা দিবার সময়ে আরও একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যাহাতে তাহারাও চিন্তা করিতে শিখে—সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে।'[২] কিন্তু বাস্তবে আমরা ধরে নিই ছাত্রদের মাথাটি একটি শূন্যপাত্র—আমাদের কাজ ঠেসে ঠেসে তাতে বিদ্যে পোরা—মাথার মধ্যে ছাত্রের নিজস্ব যেন কিছু না থাকে। এইভাবে যুব-শক্তির অপচয় করে আমরা বহু অর্থব্যয়ে বহু পরিশ্রমে কতকগুলি তোতাপাখী তৈরি করে গেছি। যারা দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারত তারা আজ হয়েছে দেশের সমস্যা।

স্বামীজী বার বার বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে সেই শিক্ষা চাই—যে-শিক্ষায় থাকবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়।'[৩] অর্থাৎ ভারতের আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও পাশ্চাত্যের জড়

১, ২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২
৩ ঐ ৯ম খণ্ড পৃ ৪০১

বিজ্ঞান উভয়কেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশের নিদারুণ দারিদ্র্য তাঁকে অহরহ পীড়া দিত। তাই দেশের দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের, শিল্পের প্রসারের ওপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন, তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যদি কতকগুলি অবিবাহিত graduate পাই তো জাপানে পাঠাই। সেখানে গিয়ে কারিগরী শিক্ষা পেয়ে আসে।'[৪] শিক্ষা জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল করুক—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি বলতেন, 'Head, hand and heart—তিনটিরই উন্নতি করিতে হইবে।'

মন ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহকেও সমান তালে উন্নীত করতে হবে। নিজের শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ দেহটির প্রতি কোন দিনই তিনি অকৃতজ্ঞ হননি। প্রায়ই তাঁকে উপনিষদের উদ্ধৃতি তুলে বলতে শোনা যেত, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। আমাদের কর্মমুখর জীবনে জ্ঞান ও বুদ্ধির চেয়ে সবল সুস্থ দেহের প্রয়োজন কোন অংশে কম নয়—এটা সকলেই স্বীকার করবেন। পুরুষদের শিক্ষার মত স্ত্রীশিক্ষার উপরেও স্বামীজী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্ত্রীজাতির অবহেলায় জাতিকে তিনি একপক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাখিকে উড়তে গেলে তাকে দুটো ডানারই সাহায্য নিতে হয়, তেমনি জাতির অগ্রগতিতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই যে-যুগে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে প্রচণ্ড বাধা ছিল, সে-যুগে স্বামীজী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, "ভারতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভব হবে না।" "সাধারণের মধ্যে আর মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না হলে কিছুই হবার জো নেই।" তবে বলেছেন, তার জন্য ভারতীয় আদর্শকে যেন কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করা না হয়। "যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায়।" আবার ভারতের নারীজাতির সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে তিনি এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কোন নারীসমস্যা সমাধানের জন্য পুরুষের সর্দারি বরদাস্ত করতেন না। তিনি বলতেন, "নারী-জাতিকে শিক্ষিত করে তোল, ব্যস—তাহলেই তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে।" তাদের মৌলিকত্ব, আত্ম-বিশ্বাসকে স্বামীজী খর্ব করতে চাননি।

স্বামীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা—যে-মানুষ সত্য বলতে, সত্যকে জানতে ভয় করবে না, যে-মানুষ আত্মপ্রত্যয়ে হবে দৃঢ় আবার তেমনি বিনয়ীও। পাশ্চাত্যের প্রবল কর্মপ্রেরণা ও বিজ্ঞানবাদী মনের সঙ্গে থাকবে প্রাচ্যের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্রহ্মচর্য ও সহমর্মিতা। আজ আমরা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু কেবলমাত্র স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষাখাতে মোটা টাকা ব্যয় করলেই দায় খালাস হবে না। শিক্ষার প্রকৃতি নিয়েও চিন্তা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, কাউকে ইঞ্জিনিয়র ডাক্তার শিক্ষক তৈরি• করার আগে তাকে 'মানুষ' করে তুলতে হবে।

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ

অন্নং বহু কুর্বীত

শ্রীঅমরনাথ কুণ্ডু

বাঁকুড়ার বঙ্গবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ থেকে বর্ধমানের বড়শুল পর্যন্ত ঘুরে এলাম কয়েক মাস পূর্বে। আমরা চাই শান্তি, পরস্পর পরস্পরের প্রীতির ডোরে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে আর দুবেলা পেটভরে দুটো খেতে। আমরা চাই জীবনের ব্যর্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতি। চাই এমন খাদ্য যাতে জনজীবনের স্বাস্থ্য হয় উন্নত, অজ্ঞানের স্থানে জ্ঞানের বসতি, আলস্যের পরিবর্তে কর্মকুশলতা, রোগের বিনিময়ে আরোগ্য আর ভগবানের দেওয়া চোখদুটোতে সত্য দেখার জন্য কর্তব্যজ্ঞান।

এই জোরালো ঘোরালো দুর্দিনে 'অন্নং বহু কুর্বীত' অর্থাৎ অন্ন বর্ধন কর, ইহাই যেন হয় আমাদের মূলমন্ত্র। বিশাল ভারতবর্ষে লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি পৃথিবীতে দ্বিতীয়; চিন্তাবিদ্‌দের মতে প্রতি তিন সেকেণ্ডে ভারতে একটি ক'রে শিশু জন্মলাভ করে, কিন্তু তার তুলনায় মৃত্যুহার খুবই কম। কাজেকাজেই এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, মৃত্যুর তুলনায় নবজাতকের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহলে খাদ্যাভাব দেখা দেবেই, অবশ্য আনুপাতিক হিসাবে খাদ্যবৃদ্ধি না পেলে। তাহলে উপায়? উপায় একমাত্র অন্নবর্ধন করা; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুষ্টিকর খাদ্যোৎপাদন। আমাদের ছাড়তে হবে বাবুয়ানা, বাহ্যিক আড়ম্বর ঝেড়ে ফেলতে হবে আর তা না হলে আমাদের বিপদ রাখার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। এক ইঞ্চি পরিমিত জমিও যেন পড়ে না থাকে—তার জন্য আমাদের প্রত্যেককেই সচেষ্ট থাকতে হবে আর সোনা ফলিয়ে নিতে হবে। স্বামীজীর মতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে, কঠোর পরিশ্রমী হতে হবে, কর্মের মধ্যেই আনতে হবে জীবনের পরিপূর্ণতা। খাল কেটে দূরদূরান্ত থেকে জল এনে, ঊষর জমি উর্বর করে, পুষ্ট বীজ রোপণ করে অন্ন বর্ধন করতে হবে—নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টায় এটা একমাত্র সম্ভব। আমরা কাজে না নামার পূর্বে ফলটার বেশী চিন্তা করি—যার পরিণাম এত অধোগতি। কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়াটায় সবচেয়ে বড় সাহসিকতার পরিচয়, ফল আমরা যাই পাই না কেন, আগে কাজে নামতে হবে।

আজ আমাদের দেশের ছোটখাটো মধ্যবিত্ত চাষীদের সবচেয়ে বড় অভাব—মনোবল ও অর্থবল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করার পদ্ধতি শেখাতে হবে গ্রামে গ্রামে কৃষিশিক্ষণ-কেন্দ্র খুলে। দীর্ঘমেয়াদী ও বিনাসুদে অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের নৈরাশ্যভাবাপন্ন মনের ভেতর আশার আলো জ্বালাতে হবে, অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। অর্থের ও জলের অভাবে ছোটখাটো ও মধ্যবিত্ত চাষীরা অত্যন্ত দুর্বল ও ভীত। তাই পুরানো পুকুর সংস্কার করে বা নূতন জলাধার তৈরি করে বা নদীনালা বেঁধে জলসেচের উপযোগী করে দিতে হবে। অনুন্নত ও অনুর্বর মাঠকে ট্রাক্টর দিয়ে তৈরি করে দিতে হবে, গাঁইতি ও কোদাল দিয়ে কতটুকু জমিই বা তৈরি করতে পারা যায়। যন্ত্রদানবের যুগে উপরিউক্ত যন্ত্রের সাহায্য যেন তারা শীঘ্রই পায় জমি তৈরি করার জন্য। যে হারে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা খুবই ভয়াবহ। শুধুমাত্র হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা দিতে হবে এবং

উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে যন্ত্রোৎপাদন করতে হবে।

সরকার জনগণের সৃষ্টি, কিন্তু জনগণ সরকারের সৃষ্টি নয়। তাই জনগণকে নিশ্চয়ই সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে তারা সরকারের নিকট তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করে নিতে পারে; কিন্তু সরকারের ঘাড়ে সবকিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়, কারণ জনগণেরও কিছু করার আছে। "সমবায় এব সাধুঃ।" জনগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে জমির সীমানা নিয়ে যেন ঝগড়া না বাধে, পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্য যেন নষ্ট না হয়। ধনীদের এমনকি সৎ-শিক্ষিতেরও লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এই নিরক্ষর ছোটখাটো ও মধ্যবিত্ত চাষীরা ফসল উৎপাদনে পিছপা না হয়, যে-কোন উপায়ে (সৎ) তাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে, সাহস দিতে হবে।

সব দেশের শিক্ষকদের এখানে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আছে। তাঁরা মানুষ গড়েন, জাতিগঠন ও দেশগঠনের কাজ মূলতঃ তাঁদেরই হাতে। জাতীয় স্বাস্থ্য ও জাতীয় সম্পদ উন্নত করা তাঁদের পক্ষে অতীব সহজ বলে মনে করি যদি তাঁরা দেশ-ও জাতি-গঠনের জন্য অন্ততঃ কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন। দেশগঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটাই শিক্ষকসমাজের কাছে। আপনারা বর্তমানের নৈরাশ্যজনক রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে ছেলেদের নিয়ে যান সেই শান্তির রাজ্যে যেখানে হিংসা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, খাদ্যাভাব নেই, অরাজকতা নেই, নিয়ে যান সেখানে যেখানে আছে ছেলেমেয়েদের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা, আছে সুখ-শান্তি, প্রেম-মৈত্রী ও ভালোবাসা।

স্বামীজীর মতে সাম্য অর্থে সমান অবস্থিতি নয়, সমান অধিকার। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে—এটা প্রকৃতির নিয়ম। কাজেকাজেই সকল মানুষ একই রকম হবে—এটা প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ একজন্ ঝাড়ুদার একটা কলেজের অধ্যক্ষের সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসিদ্ধ সমস্ত অধিকার দু'জনেরই সমান সমান, এখানে সাম্য থাকা চাই।

একজনকে দরিদ্র করে অপর জনকে বড় করার পিছনে কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। শ্রেণী-সংঘর্ষের পিছনে মঙ্গলময় চিন্তা থাকলেও তার দ্বারা সাম্য বজায় থাকে না। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীকে উন্নত করা মানুষের পরিচয়। হিংসাকে দূরে রেখে সকল কাজ হাসিল করে নিতে হবে, আমাদের হতে হবে সত্যাচারী বিপ্লবী। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের চিন্তার সমন্বয় করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে; লক্ষ্য রাখতে হবে মতানৈক্য দ্বারা যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি না হয়, জাতীয় সম্পদের ক্ষতি না হয়, প্রীতির ডোরে যেন ছেদ না পড়ে। পঞ্চাশ বছরেরও পূর্বে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বাঙালীর ধীশক্তি ও চিন্তাশীলতার প্রশংসা করে বলে-ছিলেন, "What Bengal thinks today, India thinks to-morrow." সত্যই সেকালে চিন্তার রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি ছিল বাঙালী, কিন্তু আজ তার এই উক্তি হাস্যাস্পদ বলে মনে হয়। অন্যান্য প্রদেশবাসীদের কায়িক শ্রমের তুলনায় আমরা অনেক পিছনে আছি। অলসতার জন্য আমাদের চিন্তারাজ্যে ভাঁটা পড়েছে।

আমরা এখন এক অদ্ভুত চিন্তারাজ্যে বিচরণ করছি; আমাদের অবস্থাটা যেন তামসিকতায় ডুবে থেকে বলছি, 'বেশ আছি'।

হয়তো বলবো, যেহেতু আমাদের দেশে

মহাপুরুষেরা আসেন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, পাপীকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য, এমনকি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যখন বলে গেছেন "সম্ভবামি যুগে যুগে" কাজে-কাজেই আমরা আর কি করবো ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য, তিনি তো ঠিক সময়ে আসবেনই! সত্যিই এ-ই যদি আমাদের মনোভাব হয় তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর নেই। এক্ষেত্রে আমরা ভগবান কৃষ্ণকে মেনে নিলাম, মহাপুরুষদের মেনে নিলাম। তবুও আমরা কেন ভুলে যাই তাঁদের কথামত চলতে? কেন ভুলে যাই ভগবান কৃষ্ণের সেই মহতী বাণী—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"? কেন ভুলে যাই স্বামীজীর মহতী বাণী—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"? এর প্রধান কারণ আমাদের অলসতা ও জড়তা; হাজার বছরের পরাধীনতা এর একমাত্র কারণ। তাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে তাঁর গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—"মহা রজোগুণের কাজ, আমাদের দেশময় খালি তমস্, আমাদের দেশে রজস্ চাই, তারপর সত্ত্ব—সে ঢের দূরের কথা।" আমাদের এই তামসিকতার ভাব এখনো কেটে যায়নি। তাই আজ এই দুর্দিনে আমাদের সমস্বরে চিৎকার করে বলতে হবে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" ওঠ, জাগ—"কাজ কর, কাজ কর"। পর-মুখাপেক্ষী হয়ে নিজের মাথাটা অপরের কাছে বিকিয়ে দেওয়া উঁচুদরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড় কোদাল হাতে, ফসল ফলাও, সোনা ফলাও, অন্ন বর্ধন কর, খাদ্যাভাব দূর কর, নিজের পায়ে দাঁড়াও। শব্দের প্রতিটি কম্পনে শুধু নয়, জীবন দিয়ে আমরা যদি এই সুর ধ্বনিত করে তুলতে পারি তাহলে হয়তো বা তার প্রতিধ্বনি কিছুটা কাজে আসতে পারে।

আজ স্বাধীনতা পাওয়ার তেইশ বছর পরও আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি; অথচ রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখুন তার সংঘশক্তি, বিদ্যানুশীলন, বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ। আরও চেয়ে দেখুন নূতন ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েলের দিকে। যে ইস্রায়েল দেশকে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি চেয়েছিল আঁতুড়ঘরে সম্পূর্ণ নষ্ট করতে, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা তাদের সফল হয়নি। বীরপদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তারা দেশের গঠনমূলক কাজে তাদের কর্মকুশলতা ও নির্ভীকতার সহায়ে। আত্ম-বিশ্বাসী ও কঠোর পরিশ্রমী বলে আজ এরা স্ব-নির্ভরশীল। অথচ তারা স্বাধীনতা পায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে; সাথে সাথে যেন আমাদেরও স্মরণ থাকে যে, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এরও পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে।

সত্যিই আমরা দেখেও শিখতে পারিনি—না আমরা দেখতে শিখিনি—না আমাদের চোখ নেই? বুদ্ধের কথা মনে পড়ে? তিনি কি করে শিখেছিলেন?—দেখে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানসহায়ে। আর আমরা আলস্যভারে বদ্ধ অন্ধ কোণে কূপ-মণ্ডূক হয়ে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকি মহাপুরুষদের আশায়। তাই স্বামীজী এই তামসিকতাকে উপলব্ধি করে আলাসিঙ্গা মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—"হে ভ্রাতঃ! এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বলছি—তোমরা কি এই মৃত জড়-পিণ্ডটার ভেতর, যাদের ভেতর ভাল হবার

আকাঙ্ক্ষাটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত, এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পারো ? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পারো, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা করছেন,—এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুড়ে লাথি মারছে এবং ঔষধ খাব না বলে চিৎকার করছে ?"

পরিশেষে এটাই বলি,—"এস, আমরা মানুষ হই।" এস, আমরা কাজ করি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রচণ্ড কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, অনাবাদী মাঠকে চাষের উপযোগী করে সোনা ফলিয়ে নিতে হবে—অন্ন বর্ধন করতেই হবে ; কারো আশায় পথ চেয়ে বসে থাকা চলবে না, নিজেই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে কর্মের রাজ্যে সত্যকে খুঁজে বের করার জন্য।

রিক্ততায়

ডঃ মতিলাল দাশ

সবার কাছে চেয়েছি যশ, ভেবেছি মোরে জ্ঞানী,
আমি যে হায় কত যে দীন, নিয়েছি প্রভু জানি
　　তোমার দেওয়া দুখের অভিঘাতে।
তোমার দুখ সোনা হয়ে এল জীবনতটে,
আপন বলি তারে আমি বরণ করি বটে
　　বরণ করি কাতর অশ্রুপাতে।
সবার কাছে চেয়েছি মান, ভেবেছি মোরে মানী
বালুর 'পরে গড়েছি ভিত, কভু না ইহা জানি
　　ভাঙবে ইহা স্রোতের অভিঘাতে।
ভুল করেছি ; আজকে হেরি শূন্য গেহে মম
রিক্ত আমি সবার চেয়ে ভিক্ষু নিরুপম
　　ক্লিন্ন যেন কঠোর হিমবাতে।
সবার কাছে চেয়েছি দান চেয়েছি ভালবাসা
বুঝিনি হায় শূন্য হবে প্রাণের যত আশা
　　অমারাতির অন্ধকারের মত।
আশার পরে আশার রাশি শৈলচূড়ার সম
দিনের পরে দিনে কেবল বেড়েই গেছে মম
　　ভাবিনি হায় এমনি হবে নত।
এবার এলেম সকল ছাড়ি তোমার কাছে রাজা
দাও আমারে আপন হাতে যা কিছু দেবে সাজা
　　লও আমারে তোমার কোলে তুলি !
শুধু তোমায়, আর কিছু নয়, রাখবো আমার চিতে !
সর্বহারা আঁধার পথে তোমায় বরি' নিতে
　　তোমায় ডাকি সকল ব্যথা ভুলি।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

'অহিংসা' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে অনেক সময় কতো অস্পষ্ট হয়ে পড়ে, সে-প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি কৌতুক-কণিকা স্মরণীয়—"এক 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র বাড়ীতে ঢুকেছে—চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া ক'রে বেদম পিটুছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিস-নি ; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায় ?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড়হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া !"[১]

আহারাদির বিষয়ে যাঁরা কেবল 'অহিংসার দিক থেকে নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী তাঁদের পক্ষে তরি-তরকারীজাতীয় জিনিস খাওয়া কতটা সমীচীন তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। কারণ সাধারণ প্রাণিবধের চেয়ে মূক উদ্ভিদ-সংহারে তো আরো বেশী অপরাধের সম্ভাবনা !

সেদিক থেকে স্পেন্সার হিংসা-অহিংসার তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাননি। শারীরিক পুষ্টির দিক থেকেই তিনি মাংসাহার প্রশস্ত মনে করেছেন। এমন কি, তিন বছর বয়স থেকেই শিশুকে মাংসাহারে অভ্যস্ত করানো যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্পেন্সার নিজে একবার মাস ছয়েক নিরামিষ-আহারের পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আমিষ-আহারই শরীরের পক্ষে যথার্থ পুষ্টিকর। তবু, নিরামিষ-আহারের দ্বারাও যে সুগঠিত দেহ হতে পারে, তার প্রমাণ বিভিন্ন প্রাণী ও নানা দেশের মানুষের মধ্যে যথেষ্টই মেলে। স্পেন্সারের মাংস-বা আমিষপ্রীতির উপকারিতা সাধারণ-ভাবেই প্রযোজ্য।

"একটি ঘোড়া ঘাস খাইলে হৃষ্টপুষ্ট হয় বটে, কিন্তু পুষ্টিকর-খাদ্যপালিত ঘোটকের ন্যায় কার্যক্ষম হইতে পারে না। মাংসাশী ইংরাজ শ্রমজীবীরা অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা অধিক ক্লেশসহিষ্ণু এবং কার্যক্ষম। আর অপর-দেশীয়দিগকে মাংসভক্ষণ করাইলে তাহারা ইংরাজের ন্যায় কার্যক্ষম হয়। অতএব ইহাদের প্রভেদ জাতিগত নহে—খাদ্যগত। আমরা ছয়মাস কাল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহার দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক শক্তি কমিয়া যায়।"[২]

একটি শিশুর পক্ষে কতটা আহার প্রয়োজন, এ বিষয়ে স্পেন্সারের চিন্তাধারার মৌলিকতা লক্ষণীয়। অতিভোজন ও অল্পভোজন—এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে স্পেন্সার শিশুদের ইচ্ছানুযায়ী আহার দেওয়ারই পক্ষপাতী। তাঁর মতে, "যদি ক্ষুধার অনুসরণ করা প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, যদি সমস্ত ইতর-প্রাণী এবং অধিকাংশ অসভ্য-জাতির পক্ষে সুদ্ধ ক্ষুধাই একমাত্র আহার বিষয়ে নেতা হয়, তাহা হইলে মানবেরও তাহাই হইবে।"[৩] শিশুর ক্রমবর্ধমান শরীরের সঙ্গে

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পরিব্রাজক : পৃ : ৮৯

২,৩, স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' বা 'শিক্ষা' : বসুমতী সংস্করণ ; পৃ : ৯১-৯২ ; ৮৭

ক্ষুধার যে-সম্পর্ক, একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে তা নয়।

অনেক সময় আমরা শিশুদের অতিরিক্ত খাওয়ার লোভ দমন করার অজুহাতে যতটা প্রয়োজন, ততটা খাদ্যও দিই না। আহারে স্বাধীনতার অভাবের ফলেই হাতে সামান্য পয়সা পেলেই শিশুরা বাজারের যে-কোনো লোভনীয় বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শৈশবের অতিরিক্ত বাধা-নিষেধ, পরিণত বয়সের যথেচ্ছাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণভাবে শিশুদের মিষ্টির প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে স্পেন্সার সেকালে যে-কথা বলেছিলেন, তা একালের বৈজ্ঞানিক মনের কাছেও স্বীকার্য —"অনেকে মনে করিবেন যে, কেবল আস্বাদ-সুখের জন্যই তাহারা মিষ্টান্ন ভালবাসে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অক্ষত উপযোগিতা এবং কারুণিকতা দেখিয়া অনুসন্ধানের দ্বারা জ্ঞাত হন যে, শিশুরা দেহের তাপ রক্ষা করিবার জন্যই ঐ প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করে।"[৪] সেই সঙ্গে আহারের তালিকায় ফলের উপযোগিতা সম্বন্ধেও স্পেন্সারের বিশেষ উচ্চ ধারণা।*

অধিকাংশ গৃহস্থবাড়ীতে এবং বিশেষভাবে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে খাদ্যতালিকার একঘেয়েমি যে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তির একটি বড়ো কারণ সে-সম্বন্ধে আমরা ততটা অবহিত নই। সাধারণতঃ আহারাদি সম্বন্ধে চিন্তা না করাটাই আমাদের কাছে 'সভ্য' হবার লক্ষণ। কিন্তু স্পেন্সারের মতো বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকের কাছে. আহার জীবনগঠনের একটি মৌল সত্য তাই প্রতিদিনের আহার্যতালিকার একঘেয়েমি সম্বন্ধেও তিনি পাঠকদের সচেতন করেছেন। তাঁর মতে—"খাদ্যনির্বাচনের আর একটি অঙ্গ আছে,—খাদ্যদ্রব্য পরিবর্তন করিয়া দেওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন প্রকারের হইলে হৃৎপিণ্ডের এবং স্নায়বীয় কার্য বর্ধিত করে এবং তদ্দ্বারা শীঘ্র পরিপাক হয়।"[৫] এ শুধু মানুষের নয়, পশুদের ক্ষেত্রেও সমান সত্য।

স্বামীজীর জীবনের প্রথম পর্বে এই অনুবাদ-গ্রন্থটির আহারাদি-সম্বন্ধে অভিমতের সঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে আহারাদি-সম্বন্ধে অভিমত একটু তুলনামূলকভাবে পাশাপাশি রাখা যাক

"এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে-খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকি আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?"[৬]

"যার দু'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপেলেগুলোকে নিত্য কচুরি, মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি?"[৭]...

৪, ৫ তদেব : পৃ : ৮৮, ৯২

* তুলনীয় : "এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল, ফলাহারী অনেকদিন পর্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাটা হাড়-গোড়ে জং ধরতে দেয় না।"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ১৭৬

"নানান দেশ দেখছি, নানান রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘন্টের জন্য পুনর্জ্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস। খাবার নকল কি ইংরেজের করতে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পারো।৮···

"দুধ পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমনকি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ—যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে।···মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায় আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে !!৯"

শিশুদের আহার বিষয়ে স্পেন্সার যতো বিশদ আলোচনা করেছেন, স্বামীজী ততটা বিস্তৃতভাবে সে-বিষয়ে আলোচনা না করলেও পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি স্পেন্সারের মতো সদা সজাগ ছিলেন। তবে শীতপ্রধান দেশের মনীষী স্পেন্সার মাংসাহারের উপর জোর দিয়েছেন, স্বামীজী সাধারণভাবে সে ক্ষেত্রে আমিষের কথাই বলেছেন। "ঢাকা বিক্রমপুরও চাঁইমাছ, কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে"—বলে স্বামীজী যে আক্ষেপ করেছেন তার মূলে তেলে-বা ঘিয়ে-ভাজা (আধুনিককালে তো এ দুয়ের বদলে ডালডাই প্রধান) খাদ্যের প্রতি শহুরে বাঙালীর আসক্তির প্রতিবাদ।

আহার ও পরিবেশের দ্বারা দৈহিক পুষ্টির কাজ অনেক পরিমাণে সাধিত হলেও আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে মানুষের জটিল সম্বন্ধও যে এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল, সেকথাও স্পেন্সার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—"On old and young, the pressure of modern life puts a still increasing strain. In all business and professions, intenser competition taxes the energies and abilities of every adult; and to fit the young to hold their places under this intenser competition taxes the energies and abilities of every adult; and to fit the young to hold their places under this intenser competition, subject to severer discipline than heretofore. The damage is thus doubled. Fathers, who find themselves run hard by their multiplying competition, and while labouring under this disadvantage, have to maintain a more expensive style of living, are all the year round obliged to work early and late, taking little exercise and getting but short holidays. The constitutions shaken by this continued overapplication, they bequeath to their children, predisposed to breakdown, ever under ordinary strains on these energies, are required to go through a curriculum much move extended than prescribed for the unfeebled children of past generations."১০

৬, ৭, ৮, ৯ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪
১০ Education: Spencer: 1st. Edn: p. 174

"আধুনিক কালে কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের উপর পূর্বাপেক্ষা সমাজের ভার—সংসারের ভার—অনেক অধিক হইতেছে। সকল ব্যবসায়ে অনেক প্রতিযোগী হওয়াতে পূর্বাপেক্ষা অনেক অধিক উদ্‌যোগ এবং শক্তি ব্যয় হইয়া যায় এবং এই শক্তি সংগ্রামের উপযুক্ত করিবার জন্য সন্তানের উপর পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়াছে। আবার পিতা ঐ প্রকার ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া আপনার শরীর এবং মন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, পুত্র সেই শরীর প্রাপ্ত হইয়া এই প্রকার ক্ষীণতা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কঠোর পরিশ্রম করে, কাজেই অকালে তাহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে।"[১১]

সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষের দিকে আমাদের দৃষ্টি শারীরিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যায়। স্পেন্সারের সমসাময়িক য়ুরোপের তরুণ-সমাজের অপেক্ষাকৃত শারীরিক দুর্বলতা আমাদের এ যুগের এ দেশের তরুণদের চেয়ে নিশ্চয় বেশী ছিল না। তবু স্পেন্সার তাতেই চিন্তিত হয়েছিলেন জীবনের জটিলতা যে শারীরিক সুস্থতাকে উপেক্ষা করে মানুষকে অর্থোপার্জনের যন্ত্রস্বরূপ করে ফেলে এবং তার ফলে পুরুষানুক্রমে স্বাস্থ্যগত অবক্ষয় দেখা দেয়, তার প্রমাণ একালের অনেক তরুণের অকালে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, শারীরিক অপটুতা, অকালে দাঁত পড়া ও টাকের বাহুল্যে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে স্পেন্সার শারীরিক উদ্যমের প্রয়োজনে মানসিক উন্নতির আপেক্ষিক বিলম্বেও রাজী, কারণ দুর্বল দেহের দ্বারা জীবনযাপনই অনেক পরিমাণে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে স্পেন্সার ব্যায়ামের চেয়ে খেলাধূলার বেশী পক্ষপাতী। তাঁর মতে, "ক্রীড়াই মনুষ্যের স্বাভাবিক ব্যায়াম, এই জন্যই ইহা কৃত্রিম ব্যায়ামাদির অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কৃত্রিম ব্যায়ামও (gymnastics) উত্তম।"[১২]

স্বামীজীর জীবনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেদিক থেকে স্পেন্সারের মতের তিনি সম্পূর্ণ পরিপোষক ছিলেন, সন্দেহ নেই। তবে 'ফুটবল' স্পেন্সার মোটে পছন্দ করতেন না, অপর পক্ষে স্বামীজীর অন্যতম প্রিয় খেলা ছিল 'ফুটবল'।

ব্যায়ামের চর্চা যে জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেকথা আজ বিশদভাবে বলাই বাহুল্য। কিন্তু অনেক ব্যায়ামবীরেরা যতটা সুদেহী হওয়ার দিকে জোর দেন, ততটা জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন না, সে-কথাও ঠিক। তাছাড়া যাঁরা প্রধানতঃ শারীর চর্চা নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে মননচর্চায় উপেক্ষার সম্ভাবনাও প্রবল। এ দুয়ের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যস্থাপনই স্বামীজীর আদর্শ।

এদেশে অজীর্ণতাজনিত নানা রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে স্বামীজীর একটি দাওয়াই (prescription) বিশেষভাবে প্রণিধেয়—"ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ; দুচার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকি সব বদহজম। পেট পূরলেই কি খাওয়া হ'ল? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। ...পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন দেখা দিয়েছে বলেই হাঁ করে বসো না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই

১১, ১২ 'শিক্ষা' : স্বামী বিবেকানন্দ : বসুমতী সংস্করণ : পৃঃ ৯৫, ৯৪

এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ হতে না পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও-প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে।...পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা! পারো যদি প্রতিবৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও।...যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো?"[১৩]

(ক্রমশঃ)

---

১৩ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ১৭৭

"মাংসাশী প্রাণী—যেমন সিংহ—এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল 'ইয়াঙ্কি' (মার্কিন) ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা ৯০ ভাগ খরচ হয় আমরা যা নই, অন্যের কাছে নিজেদের সেভাবে তুলে ধরার চেষ্টায়। আমরা যা হতে চাই, তাই হওয়ার চেষ্টায় ঐ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সনাতন ধর্ম

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

জগতের ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পণ্ডিতগণ এই ধর্মের কাল-নিরূপণে অসমর্থ। কেহ বলেন খৃঃ পূর্ব ১০,০০০ বৎসর, কেহ বা ৩০০০ বৎসর প্রাচীন এই ধর্ম। বস্তুতঃপক্ষে মানব-সভ্যতার ঊষাকাল থেকে এই ধর্ম অবস্থিত।

অবশ্যই 'হিন্দু' নামটি অনতিপ্রাচীন। ইরানীরা বা গ্রীকযবনেরা 'সিন্ধু' নদ উচ্চারণ করতে গিয়ে বলতো 'হিন্দু'। প্রাচীন আর্যগণ সিন্ধুনদের অববাহিকায় বাস করতেন। তা থেকে সিন্ধুতীরবাসিগণ হিন্দু নামে অভিহিত হন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মসাহিত্যে কোথায়ও হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই।

পৃথিবীর অপরাপর ধর্মের মতন ভারত-বাসীর ধর্মের কোন বিশেষত্বসূচক নাম ছিল না। তা 'ধর্ম'সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হত। খৃষ্ট, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের মত কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাম ভারতীয় ধর্মের নেই। ঐ ধর্মকে সনাতন ধর্ম অর্থাৎ শাশ্বতকালীন ধর্ম বলা হয়ে থাকে। কারণ এই ধর্মে কোন সম্প্রদায়বিশেষের নীতিকে না বুঝিয়ে জগৎ-জীবনের আন্তর সত্তাকে বুঝিয়ে থাকে। তা সর্বকালে সর্বদেশে সকল মানবের সকল ধর্মের তত্ত্বকে বোঝায়—এজন্যই এর নাম 'সনাতন ধর্ম'।

ইংরেজী religion অর্থে ঈশ্বর-সম্পর্কে যে-কোন ধারণা বা উপাসনাকে বোঝায়। শব্দটি লাতিন 'রেলিগ্রি' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'যা বাঁধে'। সে-জন্য পাশ্চাত্যে রিলিজিওন ওর অনুগামীদের কাছে চায় শুধু কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদে আস্থা স্থাপন করাতে ও ওর বিহিত ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকাতে। কিন্তু ধর্ম শব্দটির অর্থ গভীর ও ব্যাপক। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা। 'কোন বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষা হয় যাহার প্রভাবে তাহাই উহার ধর্ম।' এই অর্থে বস্তুর বা প্রাণীর একটি বিশেষ ধর্ম আছে যা তার অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য—যেমন জলের তারল্য, শীতলতা ও নিম্নগামিতা। এ-ভাবে বিশ্বকে যে সূক্ষ্ম নিয়মাবলী ধারণ করে আছে তা 'বিশ্বধর্ম'—মানুষের ক্ষেত্রে তা মানব-ধর্ম। মহাভারতকার এর অপূর্ব সংজ্ঞা দিয়েছেন: "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ" এই ধর্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। এই তত্ত্ব হচ্ছে উদ্দেশ্য। একে লাভ করার উপায়কেই আমরা সাধারণতঃ ধর্ম বলে থাকি। সে-ধর্মও শাশ্বত। মনু বলেছেন: ইজ্যাধ্যানদানানি তপঃ সত্যং ধৃতিঃ ক্ষমা। অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ এই আটটি গুণ শাশ্বত ধর্ম।

ধর্ম বলতে এইজন্য হিন্দুগণ (১) জগৎ-জীবনের মূলতত্ত্বকে বুঝিয়ে থাকে। আবার (২) যে-সকল নিয়ম সুস্থ পবিত্র জীবনযাপনের জন্য কৃত তা'ও ধর্ম। এই অর্থে আচারমূলক ধর্ম। যেমন গার্হস্থ ধর্ম, সমাজধর্ম, পথধর্ম ইত্যাদি। ধর্মো হি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ সামাজিক আধ্যাত্মিক-শ্চেতি। সামাজিক ধর্ম যুগভেদে পরিবর্তিত হয়। আধ্যাত্মিক ধর্ম শাশ্বত সত্য, তা পরিবর্তিত হয় না। অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার প্রকাশে আমরা মানব-আচরণে দেখতে পাই,

কেবল মানুষ নয়, সকল প্রাণীরই এই একটি স্বভাব দেখা যায় যে, সে স্বাধীনতা চায়, মুক্তি চায় বন্ধন থেকে। সে চায় তার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে, চায় অবাধ অনন্ত আনন্দ। মানুষ চায় পাঁতি পাঁতি করে সবটুকু জানতে, সর্বজ্ঞ হ'তে। এই চাওয়াই তার সত্তা, চেতনা ও আনন্দের অভিব্যক্তি মাত্র। অনন্তের মধ্য দিয়েই সে নিজেকে শান্ত বলে জানে। তার অস্তিত্বের, চেতনা ও আনন্দ-সীমকে সে কেবলি বাড়াতে চায়, একেবারে অসীম করতে চায়। এই চাহিদার মধ্যে তার স্বরূপচেতনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। জগতের সকল বস্তুর যেমন বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ধর্ম রয়েছে, তেমনি রয়েছে এক সামান্য ভূমি, সেখানে সে সকল প্রাণীর সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে এক। এই ঐক্য-চেতনাই মানুষকে প্রতিনিয়ত বন্ধন থেকে, বহু থেকে মুক্তির মধ্যে একতার দিকে পরিচালিত করছে। এই সচ্চিদানন্দই ঈশ্বর। "ঈশ্বর-ধারণাই মানুষের প্রকৃতির মূল উপাদান। বেদান্তের সচ্চিদানন্দই মানব-মনের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় সর্বোচ্চ ধারণা।" "বন্ধনের ধারণা যেমন মনের অচ্ছেদ্য ও মূল অংশ, ঈশ্বর-ধারণাও তদ্রূপ প্রকৃতিগত ও অচ্ছেদ্য।" "মুক্তি বা স্বাধীনতার মূর্ত বিগ্রহ—প্রকৃতির প্রভুকে আমরা 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকি।" প্রকৃতি কেবলই আমাদের বাঁধতে চাচ্ছে, জীবন ও বস্তুর প্রতি প্রেমে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও মনন-প্রচেষ্টায়। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির বন্ধন চেষ্টাকে অস্বীকার করে কেবলই আমরা বিদ্রোহ করছি—একেবারে মুক্ত হতে। "আমরা জন্ম হইতেই বিদ্রোহী এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম সত্য—জীবনীশক্তির চিহ্ন এই যে, আমরা বিদ্রোহ করি এবং বলিয়া উঠি—'কোনরূপ নিয়ম মানিয়া আমরা চলিব না।' 'মানুষ মুক্তি চায়।' "যেখানেই জীবন আছে, সেখানেই এই মুক্তির অনুসন্ধান এবং সেই মুক্তিই ঈশ্বর-স্বরূপ।" এই মুক্তি-প্রচেষ্টাই ধর্মের বিষয়।

সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে (১) তা কোন সম্প্রদায়গত মতবাদ নয়। এ-ধর্ম জগৎ-জীবনসত্তার স্বরূপতত্ত্ব উপদেশ করে; (২) যে-কোন লোক যে-কোন ধর্মপথে এর প্রচারিত তত্ত্ব লাভ করতে পারে; ৩) এ ধর্ম কোন একটি অনুভূতি বা একটি পথকেই একমাত্র সত্য অনুভূতি ও পথ বলে নির্দেশ করে না। এই ধর্ম জগতের সর্বকালে, সর্বদেশে যত প্রকার অধ্যাত্ম অনুভূতি মানবের হয়েছে বা হতে পারে সে-সবকে গ্রহণ করে এই মহান্ ধর্ম এবং 'যত মত তত পথ'রূপ মহান সত্যকে স্বীকার করে। (৪) অধিকারী বিশেষে সাধনবিশেষ এ-ধর্ম স্বীকার করে থাকে। (৫) এতে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত সত্য। (৬) এই ধর্ম বিশেষরূপে ঘোষণা করে থাকে যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিজ স্বরূপকে জানা বা ঈশ্বরলাভ করা। (৭) তত্ত্বগতভাবে এই ধর্ম মানবকে চারি বর্ণে ও জীবনকে চারি আশ্রমে বা পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকে।

আর্যদের ধর্ম হিসাবে একে আর্যধর্মও বলা হয়। তবে বর্তমান হিন্দুধর্ম কেবল আর্যভাব-ধারা নিয়েই নয়, অনেকানেক অনার্য ও অপরাপর ধর্ম-সত্যকেও আপন অঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছে। ব্রাহ্মণ অর্থে তত্ত্ববেত্তা ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ বোঝাত। এই ব্রাহ্মণত্বই মানবের আদর্শ বলে বা ব্রাহ্মণগণ-শাসিত ধর্ম হিসাবে একে ব্রাহ্মণ্য ধর্মও বলা হ'য়ে থাকে। বৈদিক ধর্মও বলা হয়, কারণ বেদই এই ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আর্যদের ভারতে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে তিনটি মতবাদ প্রচলিত: (১) কেহ কেহ বলেন আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়; (২) কেউ বলেন—ভূমধ্যসাগরতীরে; (৩) কেহ বা বলে থাকেন আর্যগণ মোটেই বাহির থেকে ভারতে আসেননি—তাঁদের আদি বাসস্থান ভারতবর্ষ—এখান থেকেই তাঁরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন সে যাই হোক, প্রথমে তাঁদের ধর্ম সাহিত্য প্রভৃতি সিন্ধুনদের অববাহিকাতে অনুশীলিত হতে দেখি।

আমাদের সভ্যতা ও ধর্মের বিশেষত্ব তাঁদের দান। এদেশের অন্য আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁদের ক্রমাগত মিলমিশ হতে থাকে নানা যুদ্ধবিগ্রহ ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের ভাবধারার সংমিশ্রণে একীভূত হতে থাকে। এই একীকরণের মূলে রয়েছে আর্যদের বলিষ্ঠ ভাবপ্রকাশক্ষম ভাষা ও বর্ণ-বিভাগরূপ অপূর্ব সমাজবিভাগতত্ত্ব। এদের সম্মিলিত ধর্মচর্চার রূপই বর্তমানে হিন্দুধর্ম নামে বিকশিত বিরাট ঐতিহ্যমণ্ডিত সুমহান ধর্ম।

পরবর্তীকালেও শক হুন গুর্জর প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম নিয়ে এদেশে এসে মিলেমিশে গেছে। স্বাঙ্গীকরণের এক মহা-প্রচেষ্টা এখানেই সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাবধারার সম্মিলনে এক অনবদ্য শোভন রূপ লাভ করেছে।

বর্তমানে হিন্দুধর্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সকল সম্প্রদায়কে গ্রথিত করে হিন্দুধর্ম নামে লক্ষিত হচ্ছে। সম্প্রদায়গুলি অসংখ্য হ'লেও শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্তই প্রধান। শাস্ত্র, দেবতা, আদর্শ, বিশ্বাস ও আচার বিষয়ে সকল হিন্দুই একমত। এই পাঁচটি বিষয়ে মিল থাকাতে নানা সম্প্রদায় ও মতগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দু এক। (১) শাস্ত্র—হিন্দুর প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ। এ ছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত, ভাগবতপুরাণ, বেদান্তসূত্র সকল হিন্দুর শাস্ত্র। সম্প্রদায়গত মতাদর্শ অনুসারে তাঁরা ঐ সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে থাকেন।

(২) দেবতা—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি": বেদের এই ঘোষণা সকল হিন্দুই মেনে থাকে। কোন বিশেষ দেবতা চরম সত্যের একটি আংশিক আদর্শমাত্র এবং সেই গুণময় দেবতাও স্বরূপতঃ চরম সত্তাই; হিন্দুর এই পরম বিশ্বাস যুগ যুগ ধরে অটুট রয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁদের শক্তি—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও সতী সকল হিন্দুরই পূজ্য। রাম ও কৃষ্ণকে সকল হিন্দুই অবতাররূপে পূজা করে থাকে। হিন্দু অবতারবাদে বিশ্বাসী। হিন্দু দেববাদকে ধর্মের চরম বিকাশ বলে না বা তাকে অপ্রয়োজনীয়বোধে ত্যাগও করে না।

(৩) আদর্শ—একই নৈতিক আদর্শ সকল হিন্দু সাধকের সাধ্য; পবিত্রতা, সংযম, অনাসক্তি, সত্য ও অহিংসা সকলেই বরণ করে থাকে। তা কেবল সাধুর বরণীয় নয়, যে-কোন সৎ জীবনের পক্ষে আচরণীয় আদর্শ বলে হিন্দুর বিশ্বাস।

(৪) বিশ্বাস (ক) সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত ধারণা সকল হিন্দুরইমূলতঃ এক। (খ) সমাজ-ক্ষেত্রে বর্ণবিভাগ, (গ) জীবনের ক্ষেত্রে চারি আশ্রমভাগ এবং (ঘ) মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ—এই বিশ্বাসে সকল হিন্দুই একমত। এ-ছাড়া (ঙ) কর্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস সম্প্রদায়গত বিভাগ সত্ত্বেও হিন্দুকে একসূত্রে বেঁধেছে।

(৫) আচার—কতকগুলি পূজা-অর্চার বিধান রয়েছে, যা সকল হিন্দুই পালন করে

থাকে। একাদশী, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি সকল হিন্দুই পালন করে থাকে। ইষ্টদেব-সম্পর্কিত ধারণা, যোগচতুষ্টয় ও তীর্থ-সম্পর্কে ধারণা সকল হিন্দুরই এক। এইগুলিতে প্রায় একমত পোষণ সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে সম্প্রদায়-সৃষ্টি ও লোপের সীমাসংখ্যা নাই। এমনকি অনীশ্বর বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মও এ ধর্ম হতেই সৃষ্ট। অধুনিক কালের ব্রাহ্মধর্ম, আর্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, সনাতন ধর্ম প্রভৃতি কত কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিই না হয়েছে। এ-সবকে বরণ করে হিন্দু এক।

"মানবজাতির ভাগ্যগঠনের জন্য যতগুলি শক্তি কার্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, ঐ সকলের মধ্যে ধর্মরূপে অভিব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা কোন শক্তি নিশ্চয়ই অধিকতর প্রভাবশালী নয়।" ধর্ম মানবকে সভ্য ও মানব-মনীষাকে তৃপ্ত করেছে। সভ্য মানুষ আমরা তাকেই বলি, যে যত পরিমাণে অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে। কেবল বাইরের উপকরণবাহুল্য সভ্যতা নয়। মানুষ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের তাড়নায় অসভ্য আচরণে রত হয়; ঐ সকল রিপুকে সংযত ও সীমিত যে যত করতে পারে ততই সে সভ্য হয়, সুন্দর হয়—মানুষপদবাচ্য হয়। ধর্ম মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করতে শেখায়।

মানুষের মনীষা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, যুক্তি এমন একটি সীমায় পৌঁছে যার অপর পারে সে যেতে পারে না। অথচ "মানব-মন কোন কোন সময় শুধু ইন্দ্রিয়ের সীমাই অতিক্রম করে না, বিচারশক্তিও অতিক্রম করে।" এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তার পরম পাওয়া, চরম আশ্বাস। নতুবা সীমিত, ব্যর্থ ও খণ্ডিত জ্ঞান মানুষকে ভগ্ন দীন ও ইহসর্বস্ব জড় করত। "বিভিন্ন ধর্ম হইতে এই একটি সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এক সূক্ষ্ম অখণ্ড সত্তা আছে, যাহাকে কখনও আমাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষরূপে, অথবা নীতিবাদরূপে, অথবা নিরাকার সত্তারূপে অথবা সর্বানুস্যূত সারবস্তুরূপে উপস্থাপিত করা হয়।"

ঐ অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই নৈতিক নিয়মাবলীর জনক ও একমাত্র ব্যাখ্যা, কারণ হিতবাদিগণ যতই 'অধিক পরিমাণ সুখলাভ' তত্ত্ব প্রচার করুন তা দিয়ে নীতিবোধের ব্যাখ্যা চলে না। 'স্বার্থ নয়, পরার্থ' নীতির এই মূল মন্ত্রের হিতবাদীর মতানুসারে সার্থক ব্যাখ্যা হয় না! "অহঙ্কারের পূর্ণবিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ।" মানুষ কালে অসীমকে সীমার মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা অসম্ভব অনুভব ক'রে সে চেষ্টা ত্যাগ করতে শেখে; এই ত্যাগই নীতি-শাস্ত্রের মূল নীতিশাস্ত্রের প্রণেতাগণ সকলেই এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করেছেন বলে দাবী করে থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে "অলৌকিক অনুমোদন অথবা অতিচেতন অনুভূতি ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া ওঠে না।" অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না। অতএব হিতবাদীদের মত অযৌক্তিক ও সঙ্কীর্ণ।

যুগ যুগ ধরে ধর্মের বিরুদ্ধে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বর্তমান শতকে ধর্মের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকলের প্রয়োগ করে ধর্মকে অজ্ঞ মানুষের প্রাচীন বন্ধন বা কুসংস্কাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি ধর্মের লোপ হয়নি। বরঞ্চ প্রতি আক্রমণের পর ধর্ম আরো জোরালো যুক্তি সহায়ে আপন মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। ভ্রান্তি সুদীর্ঘকাল টিকে থাকে না, থাকতে পারে না। ধর্মের অভ্রান্ততার এও একটি বড় প্রমাণ।

বর্তমানে পদার্থবিদ্যার উচ্চ গবেষণার যুগেও ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য, মানব-কল্যাণে অপরিহার্য শক্তিরূপে প্রমাণিত হচ্ছে। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির ইতিহাসেই দেখা যায় যে, ধর্মসহায়েই জাতি-বিশেষ উন্নত হয়েছে। ধর্মহীন কোন মানবগোষ্ঠি আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। ধর্ম তাই সভ্যতার অপরিহার্য শক্তি।

মানুষ জ্ঞান-অন্বেষী। সে সত্যকে চায়। অথচ সত্যকে নিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে বড় হতে চায়! সমাজ গঠন করতে আমরা চাই, ব্যর্থতার জন্য বহু কারণ নির্দেশ করি—কিন্তু সত্যকে ছেড়ে, মিথ্যার আশ্রয়ে আপন স্বার্থকে বড় করে দেখার পাপেই যে আমরা ব্যর্থ ভগ্ন, তা জেনেও বলি না। উকিল, ভিষক, বস্তুকারক, সমাজসেবী, রাজনীতিক সকলেই মিথ্যার আশ্রয়ে দেশকে উন্নত, জাতিকে প্রাগ্রসর দেখতে চায়। কিন্তু তা কি হয়? আমরা ব্যর্থ হই এবং দোষ অপরের স্কন্ধে চাপাই!! ধর্ম মানুষকে সত্যসেবী ও সরল হ'তে বলে—নির্লোভ ও প্রেমিক হতে বলে—আমরা ধর্মকে ছেড়ে কি করে দাঁড়াব? লোকধর্ম, সমাজধর্ম, দেশধর্ম সবকে আমাদের যথাযথভাবে বরণ করতে হবে। এখানেই ধর্মের অভ্রান্ত স্বাক্ষর বিদ্যমান যে, তা মানুষকে সুন্দর ও উদার, সভ্য ও সংযত করে। সচ্চিদানন্দই আমাদের চরম সত্তা। এই সত্তার বিকাশেই মানবীয় বিদ্যার বিভিন্নতা। সত্তাকে রক্ষা করতে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসায়নীতি, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার প্রয়োজন। এগুলি সৎ-এর বিকাশ। চিৎজ্ঞানের প্রকাশে আমরা দর্শন, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যার আলোচনা করি। আনন্দের রস সঞ্চার হয় সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, নৃত্যে, ছন্দে। মানব ও জগৎ-সত্তার মর্মকথা দিয়েই আমরা বিদ্যাচর্চা করি অথচ বাদ দিতে চাই অন্তর্নিহিত সার বস্তুটিকে। ইহাই অজ্ঞান। ধর্ম তাই আমাদের স্বরূপের চেতনা এনে দেয়—ধর্ম-স্বরূপই আমাদের বিদ্যার মূল। ধর্ম সভ্য মানবের অপরিহার্য শক্তি। ধর্ম-বিকাশেই মানুষ মানুষ হতে পারে—সভ্যতায় আরূঢ় হ'তে পারে।

নালান্দা

স্বামী সুত্রানন্দ

কেদার-বদ্রী, হরিদ্বার-হৃষীকেশ, পুরী-ভুবনেশ্বর, মথুরা-বৃন্দাবন এই এক এক জোড়া নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। লোকে একডাকে বলে থাকে। একটি দেখতে গিয়ে অন্যটিও না দেখে বড় কেহ ফেরেন না। একটির বিষয় জানতে গেলে অপরটিও জানা হয়ে যায়। এই সংযুক্ত স্থানগুলোর সংস্কৃতি ও সাধনা যেন একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুটি কুসুমের মতো। ঠিক সেইরূপ রাজগৃহ ও নালান্দা। দেশ-বিদেশ থেকে যত জিজ্ঞাসু পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক এ দু'টির একটিতে যান তাঁরা অপরটিতেও না গিয়ে ফেরেন না।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হতেই বড়গাঁও ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। সম্পদশালী ব্যবসায়িগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ দু' পয়সা উপার্জন করে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। এই সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রামে মন্দির, বিহার, পাঠাগার সরোবর কিছুরই অভাব ছিল না। সরোবরে অজস্র কমল ফুটে শোভা বর্ধন করত। এক কথায় গ্রামের বেশ নামডাক। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রাদিতে তার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে কারো কারো সামান্য অভাব থাকলেও অভিযোগ কিছু ছিল না। সকলে আনন্দে সৎপথে থেকে আদর্শ গৃহীর জীবন যাপন করত। সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি-অভ্যাগতের শুভাগমনে গ্রামটি সর্বদাই থাকত আনন্দমুখর হয়ে। এই জনপদের মধ্যবর্তী অপূর্ব মনোরম সরোবরের পদ্মবনে বাস করত একটি বিষধর নাগ। সেই সর্বজনবিদিত সর্পটির নাম ছিল নালান্দা। এই প্রচলিত নালান্দা নাম থেকে বড়গাঁও-এর নামও নালান্দায় পরিবর্তিত হয়। পরে আম্রকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত বিহারের নামও হয় নালান্দা।

আর একটি মত আছে—গ্রামে এত অধিক পদ্মবন ছিল যে, যার জন্যে এর নাম নালান্দা বলে বিখ্যাত হয়। পদ্মবন সেখানে অদ্যাপি দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যতরাগের কমল উল্লেখযোগ্য। নাল--পদ্ম, ষণ্ড--সমূহ। নালষণ্ড নামের অপভ্রংশই হ'ল নালন্দা বা নালান্দা। অন্যমতে বোধিসত্ত্ব পূর্বজন্মে এখানে ছিলেন রাজা। সে রাজা অত্যন্ত দানশীল; যে যখন যেজন্যে তাঁর কাছে আসত, তিনি তখনই তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিয়ে তৃপ্ত করতেন। 'দেব না' একথা তিনি কখন বলেননি। 'ন-অলং-দা।' তাই সে রাজ্যের নাম হয়েছে নলন্দা বা নালান্দা।

ভগবান তথাগত রাজগৃহে যাতায়াতের সময় প্রায়ই এই শ্রীমন্ত ও তুষ্টিমন্ত গ্রামে আসতেন এবং কিছুকাল বিশ্রাম করতেন। স্থানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। তাঁর অহেতুক করুণার পীযূষধারা এখানে অনেকের উপর বর্ষিত হয়েছে—তিনি বহু শিষ্য-সামন্ত করেন। সুবিখ্যাত শিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এখানকারই উচ্চ-ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। ইঁহারা অতি মেধাবী ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। এ দু'জন ছিলেন বৌদ্ধধর্মের দিক্‌পাল। জৈনধর্মের শেষ তীর্থংকর মহাবীরও এখানে যাতায়াত করতেন। সর্বত্যাগী হয়েও দেব-

দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এ হেন শান্ত সুষমামণ্ডিত লোকালয়ের কথা তিনি ভুলে থাকতে পারেননি। চৌদ্দটি চাতুর্মাস্য ব্রত তিনি এখানেই উদ্‌যাপন করেন তাঁরও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন অনেকে।

যাই হোক, এই গণ্ডগ্রাম নালান্দায় চৈত্য, স্তূপ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এককালে এশিয়ার ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হয়ে উঠে। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা. নালান্দা, বিক্রমশিলা, বারাণসী, অজন্তা, জগদ্দল, উদ্দণ্ডপুর, বল্লভি প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; কিন্তু নালান্দার মতো আর একটিও ছিল না। তক্ষশিলার উল্লেখ রামায়ণ-মহাভারতেও পাওয়া যায়। অনুমান খ্রী: পূ: সপ্তম শতাব্দীতে ইহা স্থাপিত হয়; গান্ধার রাজ্যের অধীনে ছিল, বর্তমান রাউল-পিণ্ডির সমীপবর্তী সরাইকোলা নামক স্থানে। ১২ বর্গমাইল জুড়ে ছিল তার সীমা। হুনদের আক্রমণে ইহা ধ্বংস হয়। নালান্দা একদিনে বিশ্বখ্যাত হয়ে উঠেনি; অনুমান খ্রী: পূ: প্রথম শতাব্দী অথবা খ্রী: প্রথম শতাব্দীতে ইহার শুরু। খ্রী: দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকে ইহার আকার ও প্রকার অত বৃহৎ হয়নি, যদিও নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ প্রভৃতি সুদক্ষ পণ্ডিতগণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন। খ্রী: ৫ম শতকে কুমারগুপ্তের রাজত্বে এর বেশ সম্প্রসারণ হয়। পরবর্তী পালরাজগণের সময় নালান্দা সমৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছে। তখন সত্যি ইহা বিশ্বের না হোক অন্ততঃ এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'য়ে নাম সার্থক করেছে। পৃথিবীর বহু দেশ-দেশান্তর থেকে ছাত্র ও অধ্যাপকের সমাগম হ'ত এ শিক্ষাকেন্দ্রে। সে সময় ভিক্ষু শীলভদ্র ছিলেন প্রধান আচার্য। বিদ্যোৎসাহী পালরাজ-গণ যদিও উদ্দণ্ডপুর (বিহার সরিফ), বিক্রমশিলা (ভাগলপুর), সোমপুর, পাহাড়পুর, জগদ্দলে মহাবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, তবুও নালান্দার ব্যয়ভার বহন করতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি, বরং ইন্দ্রশিলায় বৃহৎ দু'টি চৈত্য নির্মাণ করে ইহার গৌরববৃদ্ধি করেছেন। ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার পাল-রাজাদের অধিকারে ছিল নালান্দা।

৭ম শতকে প্রখ্যাত পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিক হিউ-য়েন-সাঙ্ এদেশে আসেন। রাজসম্মানে তাঁকে নালান্দায় অভ্যর্থনা জানানো হয়। তিন বছর তিনি এখানে অবস্থান করেন এবং সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করেন দীর্ঘ ১৪ বছর। নালান্দায় শিক্ষালাভ করেন প্রধান আচার্য ভিক্ষু শীল-ভদ্রের নিকট। পরে আসেন ইৎসিঙ্ অনুমান খ্রী: ৬৭৫-৬৮৫ শতাব্দীর মধ্যে। তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন ১০ বছর। ফা-হিয়েনও এসেছিলেন এবং ১৫ বছর তিনি এদেশে অবস্থান করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক এই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিহারের বিস্তৃত বিবরণ নিপুণ হস্তে লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন—বিশেষতঃ হিউ-য়েন-সাঙ্। এখানে আমরা তাঁদের বর্ণনা থেকে অতি সংক্ষেপে কিছুটা তুলে ধরছি।

নালান্দার সুবর্ণযুগে বিস্তার ছিল ১০ মাইল। ছয়তলা বাড়ীর সমান উঁচু গুম্ফাতে (বিহারে) ভগবান বুদ্ধদেবের ৮০ ফুট উঁচু তাম্রমূর্তি ছিল। ইহা মৌর্যরাজ পূর্ণবর্মন-নির্মিত, ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাট হর্ষবর্ধনও পিতলের পাত-মোড়া বিরাট বিহার নির্মাণ করেন। তা'ছাড়া এই নালান্দা চৈত্য, স্তূপ, মন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, সরোবর সব

মিলে অপূর্ব শোভাময়ী নগরীতে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ হাজার আবাসিক একসাথে অবস্থান ক'রে বিবিধ বিদ্যা অর্জন করতেন। অধ্যাপক ছিলেন দেড় হাজার। এক একটি কোঠা বা কামরা ছিল এক একজন বিদ্যার্থীর জন্যে নির্দিষ্ট। ছাত্রগণ বিদ্যা বিনয়- ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। পরিবেশ ছিল শান্ত ও সমাহিত। দৈনিক কার্যাবলী অতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হ'ত। প্রতিটি কাজের সূচনা হ'ত ঘণ্টাধ্বনি ক'রে। সময়নির্ণয়ের জন্য জলঘড়ির ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রগণ বিনাব্যয়ে অধ্যয়ন করতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত বিদ্যার্থিগণই প্রবেশাধিকার লাভ করতেন। দ্বারপণ্ডিত পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে প্রতি ১০ জনের মধ্যে মাত্র দু'জনকে গ্রহণ করতেন। শতকরা ২৫।৩০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন বিদেশাগত। সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে শারীরবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, রসায়ন, গ্রন্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। আম্রকুঞ্জে ৬টি চারতলা বৃহৎ অট্টালিকায় উদয়াস্ত বিভিন্ন সময়ে শতাধিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চা হ'ত। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে ছিল ভিন্ন ১০টি ঘর—৩০ ফুট উঁচু। তার মধ্যে ৮টি হলঘর। নরসিংহ গুপ্ত (বালাদিত্য) স্বর্ণমণিমুক্তাখচিত অপূর্ব মনোরম একটি শ্বেত বিহার নির্মাণ করেন। সম্রাট হর্ষবর্ধন মুক্ত হস্তে নালান্দার জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। এজন্য শতাধিক গ্রাম নিষ্কর ক'রে দান করেছিলেন; প্রজাগণ পালাক্রমে এখানে চাল, ডাল, দুধ, ঘি প্রভৃতি প্রদান করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য- তালিকায় ছিল প্রতিদিন জম্বীরফল, জামফল, খেজুর, ১ পোয়া চাল, তেল, কর্পূর, কিছু মাখন প্রভৃতি। যথা সময়ে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন মনীষী ভববিবেক, ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভমিত্র, জিনমিত্র, দিবাকরমিত্র, শীঘ্রবুদ্ধ পদ্মসংস্থ বীরদেব, জিনপ্রভ, জ্ঞানচন্দ্র, শীলভদ্র, রাহুল মিশ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি আচার্যগণ। আচার্য পদ্মসম্ভব যখন অধ্যক্ষ, তখন তিব্বতে বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা হয়। তিনিই লামাধর্মের প্রবর্তক। সেখানে লেখাপড়ার প্রচলনও সেই সময়ে হয়। নালান্দায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতে যায়। তিব্বতে সঙ্ঘারাম ও গুম্ফা প্রভৃতি অবশ্য নির্মিত হয় বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে। নালান্দায় যেখানে পুস্তকালয় ছিল, তাকে বলা হ'ত ধর্মগঞ্জ। ৩টি বড় বড় প্রাসাদে ছিল পাঠাগার—রত্নোদধি, রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি ছিল নয় তলা দালান। অনেকে বলেছেন—সুন্দর সুন্দর বিহার, মন্দির, স্তূপ, পাঠাগার, প্রস্ফুটিত কমল সহ সরোবর ভারতে সে সময় হয়তো অনেক ছিল, কিন্তু এমন আর একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। হর্ষবর্ধন যখন কান্যকুব্জে বৌদ্ধধর্ম-মহাসম্মেলন ডেকেছিলেন, তখন এখান থেকে এক হাজার ভিক্ষু সে- মহাসম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্পদসম্ভারে সমৃদ্ধ নগরী, যা এককালে মগধের রাজধানীও ছিল, বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ বা ভূপ্রোথিত ভগ্নাবশেষ ছাড়া তার আর কিছুই নাই। মোগলদের আক্রমণে নালান্দা ও রাজগীর অবক্ষয়িত হ'তে থাকে ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ইতিহাস বলে, বক্তিয়ার খিলিজী ও তাঁর পুত্র মহম্মদ নালান্দা, উদ্দণ্ডপুর, বিক্রমশিলা ও রাজগৃহ ধ্বংস করেন ১১৯৭—১২০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। বিহার স্তূপ ভেঙ্গে কবরখানা তৈরী হ'ল। মূল্যবান দ্রব্য-সমগ্রী, মূর্তি ও আসবাবপত্র সৈন্যগণ যথানিয়মে লুণ্ঠন করল সমুদয় ভিক্ষু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করল নিঃশেষিত শ্মশানপুরীতে

গ্রন্থাগারগুলিই পড়ে থেকে হাহাকার করল। খিলিজী সাহেবের ঔৎসুক্য—এত সব পুস্তকে এমন কি বিষয়-বস্তু থাকতে পারে? কিন্তু হায়, সে-সব বই পড়তে পারে এমন একটি লোকও আর জীবিত পেলেন না। তখন আর কি করেন—সংখ্যাতীত পুস্তক অমূল্য রত্ন অগ্নিতে নিক্ষেপ ক'রে ভস্মসাৎ করলেন।

কিউল জংশনের পরে বক্তিয়ারপুর কিংবা পাটনা স্টেশন থেকে যদি আমরা এগিয়ে যাই, তাহ'লে রাজগীরের ৭ মাইল পূর্বেই পাব নালান্দা। আর কিউলের পর নওদা অথবা গয়া থেকে যদি যাওয়া যায় তাহলে রাজগীরের ৭ মাইল পরে পাওয়া যাবে নালান্দা। বাস ও রেল স্টেশন থেকে ভগ্নাবশেষ ১ মাইল দূরে অবস্থিত। বাস, রিক্সা, ট্যাকসী, টাঙ্গা—যে-কোন যানবাহনে যাতায়াত করা যায়। বিরল-বৃক্ষ, জনপদহীন বিস্তৃতিতে ভূপ্রোথিত স্তূপগুলি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে যেন লুপ্ত গৌরবের করুণ সুর ভেসে বেড়াচ্ছে। ধীর-পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটি মহুয়া গাছের শীতল ছায়ায় ঘেরা বৃহৎ একটি চৌমাথা। চৌমাথার ডানদিকে পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি দর্শনীয় যাদুঘর। সুন্দর ফুলের বাগান ও লন সহ যাদুঘরটি নয়নানন্দকর। সুমুখে ফাঁকা ডাঙ্গায় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুরানো লোকালয় এবং বাঁদিকে আমাদের দ্রষ্টব্য ভগ্নাবশেষের আবিষ্কৃত অংশ। আমরা যখন গেলাম, তখন সকাল বেলা মহুয়ার পাতায় ফুরফুরে বাতাস। ওদিকে একখানা ছোট লন। তারই পশ্চিমে আধুনিক বিরাট গেট। উৎকণ্ঠায় কিছু সময় বিশ্রাম নেবার পর বেলা ১০ টায় গেট খুলল। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। পুরানো প্রবেশদ্বারের এপাশে-ওপাশে বিস্তৃত চোরকুঠরি। এই চোরকুঠরিতে রাখা হ'ত দানে পাওয়া মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী। ভেতরের প্রাঙ্গণটি বৃহৎ। শেষপ্রান্তে উচ্চ প্রতিমাবেদী এবং তারই পাশে অধ্যাপকের উপবেশনস্থল। বিদ্যার্থিগণ বসতেন প্রাঙ্গণে। চারদিকে বাসগৃহ—ভিক্ষুদের আবাস। এ সব নিপুণ হস্তে তৈরী। কোন কোন গৃহে ভেন্টিলেটর ও স্কাই-লাইটের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। তাছাড়া, দরজা-খিলান, নালা-নর্দমা, কূপ সবই বিজ্ঞান-সম্মত। সাধারণতঃ পূর্ব ও দক্ষিণে বিহার ও মন্দির। পশ্চিমদিকে চৈত্য এবং পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে স্তূপ। প্রত্যেকটি বিহারে দু'তিনটি ক'রে স্তর; আবার প্রত্যেক স্তরে ২।৩টি ক'রে তলা আছে। ৯টি স্তর পাওয়া গেছে ১ম বিহারে। ২য়টি হ'ল প্রস্তরনির্মিত মন্দির। এখানে দেবদেবী, মানুষ, পশুপক্ষী প্রভৃতির মূর্তি উৎকীর্ণ। অনুমান ইহা ৬ষ্ঠ কিংবা ৭ম শতাব্দীর নির্মিত। ৩য় স্তূপটিতে ৭টি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে; এবং স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে হয়তো এক এক রাজার আমলে এক একটি নির্মিত। উত্তর দিকে ৩টি সিঁড়ি। যথাক্রমে ইহারা ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তরে মিলিত হয়েছে। এই ৩য় স্তূপটির নির্মাণ-কৌশল ও রক্ষণাবেক্ষণ দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা ভগবান তথাগতের অথবা সারিপুত্রের ধাতুস্তূপ। ৪র্থ ও ৫মটি প্রাচীন বিহার। ৬ষ্ঠ বিহারের উপর তলার প্রাঙ্গণে অনেক উনান। এখানে রসায়নবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তারপর ১১শ ১২শ পর্যন্ত চৈত্য। এ সব চৈত্যের চতুর্দিকে বহু অনাবিষ্কৃত ঢিবি এখনও ছড়িয়ে আছে। ১৩শ চৈত্যের উত্তরেও উনান আছে। এখানে ধাতু গলাবার বা কারি-গরী বিদ্যার ব্যবস্থা ছিল—মূর্তিনির্মাণ হ'ত। নালান্দার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ভাস্কর্য

একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ১৪শটিও একটি চৈত্য। প্রতিমার নীচে অস্পষ্ট অথচ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে।

যাদুঘরের কথা পূর্বেই বলেছি। সেখানে বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বগণ ব্যতীত তান্ত্রিক ও বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি অসংখ্য। অপূর্ব কারুকার্যখচিত সব মূর্তি। নালান্দার মাটি ও প্রস্তরমূর্তির চেয়ে ব্রোঞ্জ, ধাতু-মূর্তির সংখ্যাই অধিক। প্রায় সবই গুপ্ত ও পাল যুগের তৈরী। পাল যুগের মূর্তি পাটনা, নেপাল, তিব্বত এমনকি পূর্ব দ্বীপপুঞ্জের বহু যাদুঘরে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল ক'রে আছে। অবশ্য ইদানীং পাটনাতে 'রাজেন্দ্রপ্রসাদ হল'ই জাঁকজমকে চমকপ্রদ! শিল্পীরা বলেন গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য হ'ল ভেতরের ভাব ফুটিয়ে তোলা আর পালযুগের শিল্পনৈপুণ্য হ'ল বাহ্য সৌকুমার্য। মিউজিয়মে অনেক শীলমোহর আছে। একটিতে লেখা—"শ্রীনালান্দা মহা-বিহারী আর্য ভিক্ষু সঙ্ঘস্য"। মন্ত্রখোদিত ইট এবং প্রাচীন বাসন-পত্রাদিও রক্ষিত আছে। আরো রয়েছে সে যুগের হস্তাক্ষর। এমনকি অ-ভগ্ন মাটির হাঁড়িতে চাল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। যাদুঘরে প্রদর্শিত জিনিসপত্র সবই নালান্দায় প্রাপ্ত নয়—রাজগৃহেরও আছে।

নালান্দার আশেপাশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, তার মধ্যে সারিচক ও দীপনগর বিখ্যাত। সারিচক বুদ্ধদেবের পরিকর সারিপুত্রের জন্মস্থান বলে কথিত। দীপনগর মহাস্থবির দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সম্মানার্থে নামানুকরণ হয়েছে।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে নালান্দার কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রেল স্টেশন হ'তে ভগ্নাবশেষে যাবার মধ্যপথে 'নব নালান্দা মহাবিহার' নামে একটি নিশানা দেখতে পাওয়া যায়। সেখান থেকে বাঁদিকে দু'ফার্লং দূরে একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পালি ইন্‌স্টিটিউট আছে। মহাবিহারটি আধুনিক। সুরুচিসম্মত রাস্তা ঘাট, বাগান-বাড়ী ও গাছ-পালাতে সজ্জিত। দূর হ'তে ইহার সামগ্রিক ঝলমলে ছিমছিমে রূপটি পথিকের মন হরণ করে। সেখানে বিশ্রামগৃহ, সরাইখানা, ধর্মশালা কিছুরই অভাব নেই। পালি ও বৌদ্ধধর্মে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়। রিসার্চের ব্যবস্থাও আছে। আজ পর্যন্ত শতাধিক বিদ্যানুরাগী ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ করেছেন। ক্রমেই ইহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় ছাত্র প্রায় নেই বললেই হয়। শুনেছি বর্তমানে নাকি উপর্যুক্ত দু'টি ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয়েও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'

শিবদাস

ভারতের প্রাচীন তপোবন-তরুশিরে রাশি রাশি আনন্দের হাসি, অমৃত হিল্লোল ছড়ানো ছিল। আনন্দই মানুষ চায়, আর চায় মরণকে এড়িয়ে চলতে। মানুষ কেন, সব প্রাণীরই সর্ববিধ জীবনপ্রচেষ্টার প্রেরণাই হল আনন্দ লাভ করা, আর মরণকে এড়িয়ে চলা। কিন্তু কি করে তা করা যায়, সে-বিষয়ে পথ ভুল করি আমরা। আমরা চাই দেহ-মনের, ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সেই আনন্দলাভ করতে। আর চাই দেহের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে, দেহকে আঁকড়ে ধরে দেহটিকেই অমর করতে। এর কোনটিই কিন্তু আমরা যা চাই তা দিতে পারে না।

তাহলে মানুষের কি চির আনন্দ লাভের, অমৃতত্বলাভের কোন পথই নেই? আছে বৈকি। মানুষকে সেই পথ সর্বাগ্রে দেখিয়েছে ভারত; প্রাচীন ভারতের তপোবন-গুলি, হিমালয়ের গুহাগুলি হাজার হাজার বছর আগেই পূর্ণ হয়েছিল এই আনন্দের হাসিতে, অমৃতের হিল্লোলে। আর তা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের রাজসভায়, ধনীর গৃহে, দরিদ্রের কুটীরে, মন্দিরে, যজ্ঞশালায়, আবার গৃহস্থালীতে, ব্যাধের বিপণীতেও। শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা, যুগে যুগে ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে। পথটি হল, দেহ থেকে তোমাকে সরে যেতে হবে; তুমি যে দেহ নও, দেহাতীত অমর আনন্দময় পুরুষ—এইটুকু শুধু জানতে হবে।

এই জানার এবং অপরকে জানানোর বহু উপায় আছে। যার একটি হল 'শ্রদ্ধা'। এই 'শ্রদ্ধা-'র উপর স্বামীজী খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর কোন প্রতিশব্দ পাওয়া মুস্কিল—মোটামুটিভাবে বলা যায় আত্মবিশ্বাস। কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে এই শ্রদ্ধার কথা আছে। বড় প্রিয় ছিল স্বামীজীর এই উপনিষদ্‌টি। কিশোর নচিকেতাকে তার বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোকে' যমের কাছে দিলাম।' শুনে নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়েছিল। এই শ্রদ্ধার ফলে, নিজের ওপর বিশ্বাসের ফলে সে ভাবল, 'আমি কি একেবারে অপদার্থ যে বাবা আমাকে যমের হাতে সঁপে দিতে চাইলেন!' ভেবে দেখলো, তা নয়; 'বাবার কাছে যারা পড়তে আসে, যাদের সঙ্গে পড়ি, তাদের ভেতর হয়তো সেরা ছেলে আমি নই; কিন্তু অনেকের তুলনায় আমি প্রথম, অনেকের তুলনায় মধ্যম। অধম তো নিশ্চয়ই নই।'

নিজের ওপর এই শ্রদ্ধার উদয়ে মানুষ যেমন ক্রমোন্নত হয়ে শেষে তার দেহাতীত আনন্দময় অমৃত-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনেও তেমনি অপরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে এই স্বরূপ উপলব্ধির জন্য।

রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত সত্যটি অপরূপ ভাষায় ও ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'পতিতা' কবিতায়।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন ব'লে রাজ্যে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হয়। প্রজাদের কষ্টের সীমা থাকে না। একজন মুনি তখন

লোমপাদকে পরামর্শ দেন, 'আপনি ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করুন, নইলে বৃষ্টি হবে না। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজ্যে নিয়ে আসুন—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' লোমপাদ তখন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, কি করে মুনিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা যায়। মন্ত্রীরা স্থির করলেন, কয়েকটি রূপযৌবনবতী পতিতাকে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে মুগ্ধ করে এখানে নিয়ে আসা হোক। সেইভাবেই ঋষ্যশৃঙ্গকে আনাও হয়েছিল, ফলে আবার নিয়মিত বৃষ্টিপাতও শুরু হয়।

এই উপাখ্যানটি মহাভারতে আছে, রামায়ণেও আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল কল্পনা দিয়ে এতে কিছু সংযোজন করে তার ভেতর শ্রদ্ধার অবদান ফুটিয়ে তুলেছেন। হলেই বা পতিতা; ঋষির আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে গিয়ে, ঋষিকুমারের সান্নিধ্যে এসেও তাদের ভেতর একজনেরও চৈতন্য হবে না, একজনও তুচ্ছ দেহসুখের মোহের ঊর্ধ্বে মনকে তুলতে পারবে না, এটা যেন তাঁর মনঃপূত হয়নি। নগরীর নাট্যশালায় তা হওয়া সম্ভব নয় ঠিকই, কিন্তু এ যে তপোবন।

"সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন অদূরে সুনীল
শৈলমালা।
কলগান করে পুণ্য তটিনী, সে কি নগরীর
নাট্যশালা ?"

অতি পবিত্র, তপস্যার জ্যোতির্মণ্ডিত মুনিকুমারকে দেখেই পতিতাদের একজনের মনে পঙ্কিল জীবন থেকে উচ্চতর নবজীবনে উন্নত হবার স্পৃহা তখনি জাগলো—

"মনে হল মোর নব-জনমের উদয়শৈল উজল
করি
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত উদিল নবীন
জীবন ভরি

এই জাগরণের পূর্ণতা ঘটল ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনে। পিতা বিভাণ্ডক ছাড়া মুনিকুমার আর কোন মানুষের সংস্পর্শে আসেননি কখনো; স্ত্রীলোকের তো নয়ই। তবে গায়ত্রী-মন্ত্র পাঠ করেছেন সকাল-সন্ধ্যায়, তাই পতিতাদের দেখে গায়ত্রী দেবীর কথাই মনে জাগলো তাঁর, তাদের স্তব শুরু করলেন। কিন্তু তা অন্তর স্পর্শ করল শুধু একজনেরই, যার মনে হল :

"যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর হয়নি
রচিত নারীর তরে।
সে শুধু শুনেছে নির্মল ঊষা নির্জন গিরি-
শিখর 'পরে
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা নীল নির্বাক
সিন্ধুতলে—
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয় শিশির-শীতল
অশ্রুজলে।"

দেবী ভেবে তিনি বললেন তাকে :

"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা।
তোমার পরশ অমৃতসরস, তোমার নয়নে
দিব্য বিভা।"

"আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

বলা বাহুল্য, পতিতাদের এভাবে দেবীজ্ঞানে স্তব করতে দেখে আর সব পতিতারাই, "পিশাচীর দল উঠিল হেসে।" শুধু পূর্বোক্ত পতিতাটির মনে এই শ্রদ্ধানিবেদনের ফলে বিপুল শ্রদ্ধার সঞ্চার হল, দেবীজ্ঞানে স্তব করার ফলে তার অন্তরের দেবস্বরূপ জাগ্রত হল—নিজের দেহাতীত আনন্দময় অমৃতময় সত্তায় সে সজাগ হয়ে উঠল। মানুষমাত্রেই যে দেব-স্বরূপ, সেও তাই, একথা কেউ কোন দিন শোনায়নি তাকে। ভাবল, দেহের স্তুতিগান

'চাটুকথা' বহু শুনেছি কিন্তু কখনো "শুনিনি এমন সত্য বাণী।" কেউ কোন দিন তার অন্তরের দিকে, তার আসল সত্তার দিকে তাকায়নি, কেবল তার দেহের দিকেই তাকিয়েছে; ঋষিকুমারই প্রথম সে দেব-দেউলের দিকে তাকালেন। তার ফলে তারও দৃষ্টিফিরলো সেদিকে, তার অন্তরের দেবতা জাগ্রত হয়ে উঠলেন :

"সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতেছিলেন
সাগরকূলে,—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে পূজিলা প্রথম
পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল।"

পতিতাটি ফিরে এসে অতীত পঙ্কিল জীবনকে দুহাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল—এই নবজাগ্রত শ্রদ্ধার পথ ধরে বাকী জীবন চলল দেবীত্বে সু-প্রতিষ্ঠিত হতে :

"তোমার পূজার গন্ধ আমার মনোমন্দির
ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার যতদিন বেঁচে
রহিব ভবে।"

অপরের অন্তরস্থ দেবভাবকে জাগরিত করাইবার একটি রাজপথ হল তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন। মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান করা, ঈশ্বর-জ্ঞানে তার পূজা করা তাই যেমন নিজের আনন্দামৃত স্বরূপ উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, তেমনি সহায়তা করে অপরকে সেপথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে।

মানুষের সঙ্গে যখন আমরা ব্যবহার করি, যে বয়সের, যে স্তরের যে মানুষই হোক না, আমরা যেন তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে তা করতে পারি। কখনো কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই, নিরুৎসাহ করতে নেই—সশ্রদ্ধভাবে করতে হয় তাকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ। শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি—অবজ্ঞা নয়, শ্রদ্ধাপ্রদর্শন।

সপ্তর্ষি আমার মন*

শ্রীরাজেন্দ্র শাহ
[অনুবাদিকা—শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

সপ্তর্ষি আমার মন
যা'
অহনিশ
প্রদক্ষিণ করছে তোমাকে
নিশ্চল !
হে সুদূর
হে ধ্রুবজ্যোতি তারকা !

আর,
শব্দরাশির উদ্‌গম
যা' হৃদয়ের ধ্বনি
তা'ই মন্ত্র—
গুঞ্জরণে ভরা এই নিখিল বিশ্ব
তুমি আমি
যেথা
শূন্য
ব্যাপক…

* কবির মূল গুজরাটী কবিতা হইতে অনূদিত।

সমালোচনা

বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারীপ্রগতি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা) : শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ; মূল্য : ছয় টাকা, পৃঃ ১৪৪

বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের অন্যতম শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর জীবন-সায়াহ্নে যে অনলস মননচর্চায় জ্ঞানসাধনার নব নব দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছেন, সুধীসমাজে তেমন দৃষ্টান্ত বিরল। সাধারণতঃ পাণ্ডিত্যের শিখরচূড়ায় আরোহণ করে অনেক পণ্ডিতই অতীতকীর্তির প্রসাদজীবী হয়ে জীবনধারণ করেন। সে-তুলনায় শ্রদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্দ্র নূতন তথ্যসংগ্রহে ও নূতনতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও চিন্তার সমৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রায় প্রতি বৎসরই রচনা ও বক্তৃতার দ্বারা দেশে-বিদেশে ভারত-ইতিহাসের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ আমাদের জাতীয় সৌভাগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থের পাঁচটি বক্তৃতায় আচার্য রমেশচন্দ্র প্রথমে বিদ্যাসাগর অবধি বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় বক্তৃতা থেকে ঋগ্বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে, এবং মধ্যযুগে ভারতের নারী ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নারীসমাজের ক্রমিক ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্রোতা বা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। আলোচনাভঙ্গীর সরসতা ও বিষয়বস্তু-বিন্যাসের নিপুণতায় সমগ্র গ্রন্থটি এত সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে, পাঠকচিত্তকে শেষ অবধি নিবিষ্ট করে রাখে। বিশেষতঃ ভারতীয় নারীসমাজের গৌরবময় যুগ থেকে পরবর্তী-কালের গ্লানিময় অবক্ষয়ের যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের তাৎপর্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে আরো গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, ভারতীয় নারীসমাজের একখানি পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত ইতিহাস-রচনা আজ একান্ত প্রয়োজন। এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আচার্য রমেশচন্দ্রের নির্দেশে এ যুগের তরুণ-তরুণীরা কেউ যদি ব্রতী হ'ন, তাহলে ভারত-ইতিহাসের একটি দিক আলোকিত হয়ে উঠবে—এই আমাদের বিশ্বাস।

রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিওর শিষ্য-বৃন্দ রাজা রাধাকান্তদেব ও তাঁর অনুগামিবৃন্দ থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবধি বাংলার মনীষীদের বেশীর ভাগই নারীজাগরণের উদ্দেশে তাঁদের কর্ম ও সাধনার অনেকখানি নিয়োজিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও সর্বাত্মক আত্ম-নিবেদনে মধ্যমণিস্বরূপ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার নারীসমাজের কল্যাণযজ্ঞে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরের জীবনসাধনার পূর্ণাহুতি। বিদ্যা-সাগরের সার্ধশতাব্দীর জন্মজয়ন্তী প্রত্যাসন্ন। বাংলা তথা ভারতের পৌরুষ ও মমতার বিস্ময়কর সম্মেলনের উদাহরণ এই অনন্য চরিত্রের স্মৃতি আমাদের কর্তব্যসাধনের পথে উদ্বুদ্ধ করুক—এই প্রার্থনা। আদ্যন্ত সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় যে শ্রদ্ধা ও যত্নের নিদর্শন মেলে, সেজন্য প্রকাশক আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন। —প্রণবরঞ্জন ঘোষ

প্রবন্ধাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক: স্বামী প্রকাশানন্দ, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা, গৌহাটী ১০, আসাম। পৃষ্ঠা ২৩৮, মূল্য চার টাকা।

পুস্তকের নাম 'প্রবন্ধাবলী' সাধারণতঃ দেখা যায় না। তাহা হইলেও নামকরণের সার্থকতা আছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীল লেখকের বিষয়বস্তুর গভীর মনন ও অনুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রবন্ধগুলির রচনাকাল উদ্ধৃত হওয়ায় ও ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত থাকায় গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থে ৩১টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: গুরুতত্ত্ব, শিবরাত্রি, গীতাবলী, মদালসা, রাষ্ট্র ও ধর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবপ্রকাশিত-পুস্তক

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ): স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৪৯৬, ৪৮৫ ও ৪৫৮; মূল্য প্রতিখণ্ড আট টাকা।

দুষ্প্রাপ্য, নূতন ও পুরাতন প্রামাণিক উপকরণ অবলম্বনে স্বামীজীর এই বিপুলায়তন জীবনচরিতখানি লিখিত। প্রতি খণ্ডে প্রাগ্‌বাণী ও নির্দেশিকা সংযোজিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ ও উত্তম বাঁধাই। স্বামীজীর কয়েকখানি মনোরম চিত্র-সংবলিত।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে (প্রস্তুতি) শিশুকাল হইতে স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রা পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডে (প্রচার) স্বামীজীর পাশ্চাত্ত্যে প্রচার ও প্রথমবার ভারতে প্রত্যাবর্তন (কলিকাতায় আগমন) পর্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে (প্রবর্তন) স্বামীজীর জীবনের বাকী অংশ বিবৃত।

স্বামীজীর এই প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রথম সংস্করণ অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচালী—শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর। প্রকাশক: শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা ৫০; মূল্য ০.৭৫।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ভারতীয় নারীর আদর্শের পূর্ণ প্রতীক। সুকবি শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যময় অনবদ্য জীবন সহজ সরল ভাষায় পাঁচালি ছন্দে বর্তমান সমাজের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বহু দিন পরে 'শ্রীশ্রীমায়ের পাঁচালি'র সংশোধিত শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। প্রকাশক: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩; পৃষ্ঠা ৩০৮+৬; মূল্য ছয় টাকা।

সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'পাঞ্চজন্য' সঙ্গীত-গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে ৬৪খানি গান স্থান পাইয়াছিল। ঐ গানগুলির অধিকাংশ বর্তমান সংস্করণে 'বিবেক-গীতি'-শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে, কিছু গান অন্যান্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে এতদ্ব্যতীত বর্তমান সংস্করণে নয়টি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে:

(১) মাতৃসঙ্গীত, (২) শিবসঙ্গীত, (৩) গুরুসঙ্গীত, (৪) মহামানবসঙ্গীত, (৫) লীলাগীতি, (৬) রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, (৭) সারদা-লীলাগীতি, (৮) বিবিধ সঙ্গীত, (৯) প্রতিধ্বনি (বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত লেখকের কয়েকটি গান)। গানগুলির বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র সংযোজিত। বর্তমান সংস্করণের ভূমিকাটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী কর্তৃক লিখিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য সেবাকার্য: হাসনাবাদ ও বসিরহাটে ক্যাম্পে সমবেত উদ্বাস্তুগণের জন্য সেবাকার্য শুরু করা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ৫,০০০ দুঃস্থ ব্যক্তিকে চাল, ডাল, আলু, লবণ দেওয়া হইতেছে। ১৩ই হইতে ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ১৩০'৫০ কুইণ্ট্যাল চাল, ২১'৬৬ কুইণ্ট্যাল ডাল, ১৬'৩২ কুইণ্ট্যাল আলু এবং সাড়ে ছয় বস্তা লবণ বিতরণ করা হইয়াছে।

গুজরাটে অন্নকষ্ট ও জলকষ্টের জন্য সেবাকার্য: গত দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে কচ্ছে তীব্র অন্নাভাব ও জলাভাব দেখা দিয়াছে। রাজকোট আশ্রম কর্তৃক কচ্ছে সেবাকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

উত্তর-বঙ্গে বন্যার্তসেবা: জলপাইগুড়ি শহরের সন্নিকট মোহিতনগরে বিদ্যালয়ভবন-নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আসামে বন্যার্তসেবা: শিলচর আশ্রম কর্তৃক ২৮ খানি বস্ত্র এবং ১০০ খানি কম্বল ৪টি গ্রামের ১০০ জনের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

কাঁথি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কাঁথি আশ্রম সুদীর্ঘকাল জনসাধারণের অকুণ্ঠ সেবায় রত থাকিয়া ভগবৎকৃপায় ৫৭তম বৎসরে উপনীত হইয়াছে। এই আশ্রম মঠ মিশনের প্রাচীন কেন্দ্রগুলির অন্যতম।

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি ছাত্রাবাস, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ের কার্যধারা নিম্নরূপ:

ছাত্রাবাস: ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসে ৮টি ছাত্র রাখা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৭টি ছাত্র বিনা ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ৮টি অবৈতনিক ছাত্রকে রাখা হয়। ছাত্রাবাসের পরীক্ষাফল আশানুরূপ।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার: বর্ষদ্বয়ে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা যথাক্রমে ৫,০০০ ও ৫,০৯৬ এবং পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ৪,৪৫৭ ও ৫,৪৮০।

পাঠাগারে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়, ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে মোট ২৪ খানি পত্রিকা রাখা হইয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়: সেবাশ্রম কর্তৃক কাঁথি শহর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে বেলদা গ্রামে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫০, তন্মধ্যে ছাত্রী ৬৫ জন।

দাতব্য চিকিৎসালয়: সেবাশ্রম-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ৯,৯৭১ জন এবং ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১১,৮৯৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

সেবাকার্য: আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে কাঁথি সেবাশ্রম কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বন্যার্তসেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে ১২৭টি গ্রামের ১,২২,০০০ দুঃস্থ নরনারীকে খাদ্যদ্রব্যাদি দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছিল। ২ মাস ২০ দিন ধরিয়া এই সেবাকার্য চালানো হয়। মোট সাহায্যের পরিমাণ চাল ১,২৬২ কুইন্ট্যাল ৯০ কেজি, গম ৪৮৩ কুইন্ট্যাল ২৯ কেজি, ডাল ৩০ কেজি, ১,৩০২ খানি নূতন বস্ত্র, পুরাতন জামাপ্যাণ্ট ৩০০টি ও নগদ ৩,৫০৪ টাকা।

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে বন্যার্তসেবাকার্যে ৩৭টি গ্রামের ২,৩০,৬৫০ জন দুঃস্থ নরনারীকে খাদ্য-দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। ৪ মাস ৭ দিন ধরিয়া রিলিফ চলে। মোট প্রদত্ত সাহায্য: চাল ৭৫১ কুইন্ট্যাল ৫১ কেজি, গম ২,৯৪১ কুইন্ট্যাল ৬০ কেজি, আটা ১০২ কুইন্ট্যাল ৮৯ কেজি, বস্ত্র ১ ৭১৮ খানি ও নগদ ১৩ টাকা।

উৎসবাদি: শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বর্ষদ্বয়ে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ৬।৭ হাজার নর-নারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। ১৯৬৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমে ও অন্যত্র শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা নিয়মিতভাবে করা হইয়া থাকে।

কোয়েম্বাতুর জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭০-র ৩রা ফেব্রুআরি এই বিদ্যালয়ের ৪০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে:

(১) টিচার্স কলেজ—শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১২৩ জন বি. টি., ৮ জন এম. এড, ১ জন পি এইচ. ডি। পরীক্ষার ফল: এম. এড ১০০% এবং বি. টি. ৯৭% উত্তীর্ণ।

টিচার্স কলেজের গবেষণা এবং এক্সটেনশন সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

(২) আবাসিক বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা—১৯৬, তন্মধ্যে ৩১ জন ফ্রি স্কলার। পরীক্ষার ফল: ৯৬% উত্তীর্ণ।

(৩) বেসিক ট্রেনিং স্কুল: শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৯। পরীক্ষার ফল: ১০০% উত্তীর্ণ।

(৪) কলানিলয় (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য)—বেসিক ট্রেনিং স্কুলের আদর্শ বেসিক স্কুল: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—৫৭১, তন্মধ্যে ছাত্রী ২১৪ জন।

(৫) স্বামী শিবানন্দ হাই স্কুল (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য)—টিচার্স কলেজের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়: ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫, তন্মধ্যে ছাত্রী ৪৬ জন। ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৩৩ জনের মধ্যে ২৮ জন উত্তীর্ণ।

(৬) শারীর শিক্ষা কলেজ—১৩ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে ২০৫ জন শিক্ষক হায়ার গ্রেডে এবং ৮৪৯ জন শিক্ষক লোয়ার গ্রেডে শারীর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৭) ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল: তিন বৎসরের কোর্সে মোট ছাত্রসংখ্যা ৮০। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষে ২৩, দ্বিতীয় বর্ষে ২১ এবং তৃতীয় বর্ষে ৩৬। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অটোমোবাইল সেকশনে এ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে ১৫৫ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ৭ম ব্যাচে ২৩ জন ছাত্র ট্রেনিং পাইতেছে।

(৮) কৃষিবিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা ১৩৭। ৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৯ জন উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে

৪ জন ফার্স্ট ক্লাস।

(৯) উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ: ছাত্রসংখ্যা ২৪৩, পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

(১০) প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় আর্টস কলেজ: ছাত্রসংখ্যা ৩৮১, পরীক্ষার ফল ৭৮% উত্তীর্ণ।

(১১) ইনডাস্ট্রিয়্যাল ইনস্টিট্যুট: ছাত্রসংখ্যা ৭৫।

(১২) বিদ্যালয় প্রেস: এই প্রেসে প্রিন্টিং বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

এখানে একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার (Central Library) আছে; পুস্তকসংখ্যা ৩৪,৩৭৮। শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে পড়িবার জন্য ১২,০৬০ খানি গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ শিক্ষায়তনেই স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে।

আলোচ্য বর্ষে ডিসপেন্সারীতে ২৩,৬৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৭,২৮১ জন পুরুষ, ২,২৪৩ জন স্ত্রীলোক এবং ৪,১৬৫টি শিশু।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—গান্ধী শতবার্ষিকী এবং তামিল ভাষার সাধক-কবি তিরুভাল্লুবরের ২,০০০তম জন্মবার্ষিকী মনোজ্ঞভাবে উদ্‌যাপন।

উৎসব-সংবাদ

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে তিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫ তম শুভ জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তমলুকের মহকুমাশাসক শ্রীঅশোক গুপ্ত এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন বেলুড় মঠের স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন কলিকাতা লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। বেতারশিল্পী শ্রীসুকুমার দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলাগীতি এবং গীতিসুধাকর শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণগান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে গত ১০ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম জন্মোৎসব পালিত হয়।

১০ই এপ্রিল বিকালে স্বামী নিরাময়ানন্দজীর সভাপতিত্বে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির (একটি বহুমুখী, একটি বালকদের নিম্ন বুনিয়াদী ও একটি বালিকাদের প্রাথমিক) পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই এপ্রিল সকালে পূজা-ভজনাদি হয় এবং বিকালে শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। পরে স্বামী অমৃতত্বানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভার শেষে প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় দুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

১২ই এপ্রিল সকালে সুমতিনগর রামকৃষ্ণ প্রগতি সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও

বিকালে ধর্মসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী উমানন্দ এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী অমৃতত্বানন্দ এবং শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভান্তে পুরস্কার-বিতরণের পর ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

১৩ই এপ্রিল বিকালে মুড়িগঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে অয়োজিত ধর্মসভায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী উমানন্দ। সভান্তে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রত্যেক স্থানেই সাগরদ্বীপের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও জি প্লট, উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে সেখানকার স্থানীয় লোকদের উদ্যোগে এবং মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে ১৫ই এপ্রিল সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও বিকালে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী সিদ্ধিদানন্দজী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রেরা পাঠ ও আলোচনাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। সভান্তে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বহরমপুর আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহানন্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, পাঠ, ভজন, প্রসাদবিতরণ, জনসভা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন দিনে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

বাগেরহাট (খুলনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৯শে চৈত্র হইতে ২১শে চৈত্র পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রতিদিন পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভজনাদির অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনে সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীবিমলচন্দ্র বসু এবং ভাষণ দেন মহম্মদ রিজাউল হক, শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, প্রতিভারাণী বসু অধ্যাপক পরমানন্দ রায়, ডক্টর কাজী মোতাহের হোসেন, মিঃ মাইকেল, এস. অধিকারী, জনাব ইসমাইল হোসেন, অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য। রামায়ণগান পরিবেশন করেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই আশ্রমের উৎসবান্তে ঢাকা কুমিল্লা ও চাঁদপুর হইতে আগত বিশিষ্ট বক্তাগণকে লইয়া ২৩শে চৈত্র সোমবার খুলনা সদরে এবং ২৪শে চৈত্র মঙ্গলবার দৌলতপুরে দুইটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। এই দুই স্থানের মহতী সভায় বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

ভিত্তিস্থাপন

উদ্যানবাটী: গত ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৭ (৮.৫.৭০) শুক্রবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে সকাল ৭-৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্থায়ী বসতবাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন। এতদুপলক্ষে বৈদিক প্রার্থনা, পূজা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শুভ অনুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমে গত ৩১শে চৈত্র, ১৩৭৬ (১৪.৪.৭০) মঙ্গলবার আনন্দময় ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে বহু সাধু, ভক্ত ও প্রাক্তন ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল। প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তি বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। দেবী অন্নপূর্ণাকে নিবেদন করিয়া ১২০ খানি শাড়ী স্থানীয় অঞ্চলের দুঃস্থ মহিলাদিগকে বিতরণ করা হয়।

স্বামী সিদ্ধান্তানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ২১শে এপ্রিল, ১৯৭০ রাত্রি আটটার সময় স্বামী সিদ্ধান্তানন্দ (মুখ্যপ্রাণ মহারাজ) ৬৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বি-কোলাই, রক্তাল্পতা, আন্ত্রিক গোলযোগ ও অন্যান্য উপসর্গে ভুগিতেছিলেন।

স্বামী সিদ্ধান্তানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

তিনি প্রধানতঃ বারাণসী সেবাশ্রম, দেওঘর বিদ্যাপীঠ এবং রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে ব্রতী ছিলেন, প্রত্যেকটি আশ্রমে প্রায় ১২ বৎসর করিয়া তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ ও কঠোরী এবং সর্বজনপ্রিয়।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

স্বামী বিশ্বেশানন্দের দেহত্যাগ

অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি গত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭০ রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় স্বামী বিশ্বেশানন্দ (শ্রীকণ্ঠ মহারাজ) বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বিকল হওয়ায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়। যদিও তিনি বহু বৎসর যাবৎ ডায়াবিটিস, ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতিতে অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিত-ভাবে তাঁহার শান্তিপূর্ণ শেষ মুহূর্ত আসিয়াছিল।

স্বামী বিশ্বেশানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজেরই নিকট হইতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। বেলুড় মঠ ডিসপেন্সারী ছাড়া তিনি কনখল ও বারাণসী সেবাশ্রমেও কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন।

তিনি ছিলেন সরল, কঠোর পরিশ্রমী ও শান্তস্বভাব সন্ন্যাসী।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বৈকুণ্ঠপুর (ফুলেশ্বর) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-তীর্থে গত ৯ই হইতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনের সভায় ও ঘরোয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী জয়ানন্দ, স্বামী জীবানন্দ, স্বামী নিরূত্যানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মজুমদার প্রভৃতি। ১৪ই মার্চ জনসভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মানন্দ কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর ১২ই মার্চ ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, ১৪ই মার্চ ও ১৫ই মার্চ যাত্রাভিনয় হয়। শেষ দিন প্রায় দশহাজার দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন।

নড়াইল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই ও ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। ১ম দিন শোভা-যাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ ও কীর্তনের পর প্রায় ১০ সহস্র ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২য় দিন প্রসিদ্ধ কবি-গায়ক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার রামায়ণ গান করেন।

৩য় দিন শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা পদাবলী কীর্তন গান করিয়া সমবেত ভক্ত নরনারীকে আনন্দ দান করেন।

যশোহর: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৭শে মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমাগত ৩ সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। বিকালে আলোচনা-সভায় অধ্যাপক পরমানন্দ রায় ও অন্যান্য বক্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে লালন শাহ ফকীরের ভক্ত সুফি কানাই ও তাঁহার সম্প্রদায় উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের গান করিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

বনগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল পূজা, পাঠ ও সভাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল অপরাহ্ণে স্বামী দেবানন্দজী কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, পরে স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক 'শিশু বিলে' নাটকের অভিনয় হয়।

৫ই এপ্রিল শোভাযাত্রাসহ নগর-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার পর প্রায় ৫,০০০ নরনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণে জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পরে অমৃত সঙ্গীত সমাজ সুরে শ্রীশ্রীকথামৃত গীতাভিনয় এবং শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গ গীতাভিনয় করেন।

খুলনা: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ৬ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শুভ ১৩৫তম জন্মোৎসব কয়লাঘাটা শ্রীশ্রীকালীবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। পূজাদিতে যোগদান করেন নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী যোগদানন্দ ও ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের

স্বামী দয়ানন্দ মহারাজ। বেলা ১০॥টা হইতে ১২টা পর্যন্ত সমাগত তিন সহস্র ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী আলোচনা করেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী (সভাপতি), ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন (প্রধান অতিথি), স্বামী যোগদানন্দ, কুমিল্লা বৌদ্ধ মঠের শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু বিনয়সূত্রবিশারদ, অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বিশ্বাস, শ্রীমতী প্রতিভা বসু, অধ্যাপক পরমানন্দ রায় এবং ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য।

নব ব্যারাকপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক গত ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই এপ্রিল শোভাযাত্রা, পূজা, পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য হয়। সন্ধ্যায় জনসভায় স্বামীজীর ভাবধারার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন উপাধ্যক্ষ শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী স্মরণানন্দ। রাত্রে পরিষদের পাঠচক্র বিভাগ কর্তৃক 'মূক দেবতা' নাটিকা অভিনীত হয়।

১৩ই সন্ধ্যায় এক জনসভায় ভাষণ দেন অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, পৌরোহিত্য করেন পরিষদের সভাপতি ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার। রাত্রে পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা কর্তৃক 'তরজা' গান পরিবেশিত হয়।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম: গত ১০ই মে, ১৯৭০ শুভ শঙ্করপঞ্চমী দিবসে বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নবম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে পূজা-হোম-পাঠাদি ও প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছে। এই দিন নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'শিবানন্দ-স্মৃতি-সংগ্রহ'—৩য় খণ্ডের কিয়দংশ পাঠ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ এবং সন্ধ্যায় শঙ্করপঞ্চমী স্মরণে 'আচার্য শঙ্কর ও তাঁহার শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত।

পরলোকে যদুনাথ মজুমদার

গত ১১ই ফেব্রুআরি, ১৯৭০ ভক্ত যদুনাথ মজুমদার মহাশয় ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গের নোয়াখালির অন্তঃপাতী চণ্ডীপুর গ্রাম। এই গ্রামে তিনি নিজ বসতবাটীর সন্নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু ব্যক্তিকে ধর্মভাবে উদ্দীপিত করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। গুরুগতপ্রাণ যদুনাথ বাবু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন এবং স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে অপরের সেবায় দান করিতেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশমত তিনি চিরকুমার থাকিয়া অনাসক্ত ও আদর্শ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।



দিব্য বাণী

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে॥ ২
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ ৪

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত

একত্র হও, (মিলে মিশে সবে
কাজ কর একমতে,)
একই বাক্য ঝঙ্কৃত হোক
সবার কণ্ঠ হতে,
একই অর্থ-বোধের দীপ্তি
জ্বলুক সবার চিতে।
পূর্বে যেমন দেবগণ নিল
এক হয়ে হবি যাগে,
(তোমরা তেমনি একমত হোয়ো
ধন-সম্পদ ভাগে॥)
একই লক্ষ্য অভিমুখী, একই
সংকল্পেতে থির,
এক-মন, এক-হৃদি হও সবে,
(হও সংহত, ধীর)—
যাতে তোমাদের আসে এ একতা,
সুমহান সংহতি;
(তাই হোক, সেই একতা-যজ্ঞে
পড়ুক পূর্ণাহুতি॥)

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতের সংহতি

সম্প্রতি জনৈক নেতা 'ভারতের সংখ্যালঘু'-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সংখ্যা লঘু" কারা? মুসলমানেরা নয়, খৃষ্টানরাও নয়, যারা নিজেদের 'ভারতীয়' ব'লে ভাবে, তারাই আজ সংখ্যালঘু। ভারতের অধিকাংশ লোকই আজ হয় তামিল, নয় তেলুগু, না হয় বাঙালী বা শিখ ইত্যাদি—ভারতীয় নয়।"

কথাটি খুবই মূল্যবান। স্বাধীনতালাভের পর হইতে প্রাদেশিকতা-বোধের গণ্ডীর সংকীর্ণতায় আমরা যেন ক্রমশই জড়াইয়া পড়িতেছি, সংকীর্ণতর গণ্ডীতে আসিয়া প্রদেশগুলির মধ্যেও নিজেদের খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেখিতেছি, সমগ্র ভারতের সঙ্গে নিজের একত্ববোধ জাগ্রত রাখিতে, নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবিতে ক্রমশই ভুলিয়া যাইতেছি। এটি সর্বনাশা ভাব সন্দেহ নাই। ইহার মূল কারণ খুঁজিয়া যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিকার করা প্রয়োজন, নতুবা ভারতের সংহতির বন্ধন শিথিলতর হইয়া ভারত খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইতে পারে।

নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ভাবার অর্থ এই নয় যে, নিজ প্রদেশের প্রতি, নিজ প্রদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিতে হইবে, নিজেকে বাঙালী বা মারাঠী ভাবা চলিবে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে ত্যাগ করিয়া একটি মাত্র ভাষা সারা ভারতে সকলকে শিখিতে হইবে, সংস্কৃতির খুঁটিনাটির ক্ষেত্রেও সকলকে একটি মাত্র ছককাটা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। ইহার অর্থ আমরা বাঙালী থাকিব, পাঞ্জাবী থাকিব, তেলুগু থাকিব, কিন্তু সর্বাগ্রে আমরা হইব ভারতবাসী। 'আমি ভারতবাসী' এই বোধকে অবলম্বন করিয়াই, ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের প্রাদেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতির বোধ জাগিবে।

এই একত্ববোধ কোন বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাতে নাই; এই বোধ কোন বিশেষ প্রদেশের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বা অন্যান্য খুঁটিনাটিতে নাই, অর্থনীতি বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে অবলম্বন করিয়াও নাই; আছে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাব ও সংস্কৃতি যাহার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, সেই ভারতীয় ভাব বা ভারতীয় সংস্কৃতিতে, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বহু আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও, বহু অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় খুঁটিনাটির পরিবর্তন সত্ত্বেও জাতীয় সংহতির সূত্রটিকে কখনো ছিন্ন হইতে দেয় নাই, বহির্বিষয়ে আপাত-বিচ্ছিন্ন জাতির প্রাণকে একই স্পন্দনে স্পন্দিত রাখিয়াছে।

ভারতপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ এই সংহত ভারতের কথাই বলিয়াছেন, এই ভারতকেই রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন। যখন আমরা অনেকে নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া পরিচিত করিতেও লজ্জাবোধ করিতাম, সে-সময় তিনিই কম্বুকণ্ঠে প্রথম বলিয়াছিলেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।...বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ

আমার কল্যাণ।" তাঁহার মন-প্রাণ জুড়িয়া ছিল 'ভারত', বাংলা বা অন্য কোন প্রদেশ মাত্র নয়। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের জাতীয় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ভূমিকা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "প্রতিটি ভারতীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আশা-আদর্শকেই তিনি কেবল শিক্ষা করেননি—তাদের গৌরব-স্মৃতিকেও বরণ করেছিলেন। কলকাতার হিন্দুপল্লীর এই সন্তান কলকাতার গঙ্গাতীরে জীবন সমাপন করার জন্যই ফিরে এসেছিলেন—তবু পঞ্জাব সম্বন্ধে তাঁর উদ্দীপনা দেখে মনে হত, পঞ্জাবই বুঝি তাঁর জন্মস্থান, কিংবা একই কারণে রাজপুতানা বা হিমালয়খণ্ড—এমনই অন্যত্রও। গুরু নানকের, মীরাবাঈ-এর, তানসেনের গানের সুর ক্রমান্বয়ে ঝঙ্কৃত হত তাঁর কণ্ঠে। পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী, দিল্লী বা চিতোরের ইতিহাসকথা, শিব-উমা-রাধা-কৃষ্ণের বা বুদ্ধের জীবনগাথা জড়াজড়ি হয়ে থাকত তাঁর মুখে। বিবেকানন্দ যেখানে অভিনেতা, সেখানে প্রতিটি নাটকই মহানাটক। তাঁর অংশগ্রহণে প্রতিটি দৃশ্যই জীবন্ত। **তাঁর মন-প্রাণ-আত্মা এক অখণ্ড মহাকাব্য, যা 'ভারত' এই নামোচ্চারণে মহারহস্য-ব্যাকুল।"**

ভারতীয় জাতি বলিতে ইহাই—এক লক্ষ্যাভিমুখী, আধ্যাত্মিকতার পথে যুগযুগান্ত ধরিয়া চরম সত্যের পরমতীর্থধাম-যাত্রী একটি জাতি। ভারতের সংহতি এখানেই; তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব উন্নতিই এই সংহতিসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই। ভারতকে দৃঢ়-সংহত করিতে হইলে এই ভাবকেই, ভারতের চিরন্তন ভাবকেই পূর্ণ-বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহা সাবলীল ভাবে আপন ভাবিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিবে বাঙালী, পাঞ্জাবী, তেলুগু, মারাঠী সব প্রদেশের ভারতবাসীকেই। এই ভাবের বিকাশের পথকে প্রশস্ততর না করা বা রোধ করার প্রচেষ্টা আমাদের জাতীয় সংহতি বিধানকে সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করিবে, বিভেদবুদ্ধিকে আরও বাড়াইয়াই তুলিবে। মূল ছাড়িয়া বাহিরে সংহতিসাধনের প্রচেষ্টা বৃথা। "দু'পয়সার ডাকটিকিট, সস্তায় রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এসবের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা তাঁর (স্বামী বিবেকানন্দের) বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল"—পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছেন। সেইরূপ 'অগভীর ও হাস্যকর' প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আজ জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করিতে চাওয়া হইতেছে, জাতীয় প্রাণের গভীরে ফিরিয়াও কেহ চাহিতেছেন না। আরো ভয়াবহ কথা, ভারতের জাতীয় সংহতির মূল এই জাতীয় ভাবকে নষ্ট করিয়া বিদেশ হইতে আনীত ভাবসূত্র দিয়া ভারতকে সংহত করিবার চেষ্টাও করিতেছেন কেহ কেহ।

আমাদের মনে হয় সর্বসাধারণের মধ্যে আমাদের জাতীয় ভাবকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া জাতীয় সংহতিবিধানের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য আশু প্রয়োজন সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার; সংস্কৃত ভাষাই যুগ-যুগ ধরিয়া অবিনশ্বর ভারতীয় ভাবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে এবং সমগ্র ভারতে পরিবেশন করিয়া আসিতেছে। ইহাই আমাদের জাতীয় ভাবের আকর, এখান হইতেই আহরণ করিয়া বিভিন্ন মাতৃভাষা উহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে পরিবেশন করিয়াছে। আর প্রয়োজন, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিধৃত এই একই মূল ভাবের বিভিন্ন রূপগুলিকে মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সব প্রদেশেই কিছু কিছু পরিবেশন করা—যাহাতে ভারতের সামগ্রিক মানস-রূপটিও সকলের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে, বিভিন্নতার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় তাহা স্পষ্ট হয়; কেবল বাহিরের রূপটিই নয়। আর, সর্বাধিক প্রয়োজন, ভারতকে যিনি স্বপ্নেও খণ্ডিতদৃষ্টিতে দেখেন নাই, এবং শুধু ভারতবাসীর কাছেই নয় সমগ্র বিশ্বের কাছেই যিনি ভারতের যথার্থ রূপ আধুনিক চিন্তার আলোকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন—প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা যে-ভারতের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না, সেই স্বামী বিবেকানন্দের উদার, সর্বজনীন অথচ ভারতপ্রেমে ওতপ্রোত ভাবরাশির ব্যাপক প্রচার।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

The Ramakrishna Math,
Belur P. O., Howrah,
Dated, 31. 3. 1916

My Dear Hari Maharaj.

আপনার শরীর আবার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে শুনিয়া আমরা সকলে বড়ই চিন্তিত আছি। আলমোড়া আপনার পক্ষে suit করিবে না বলিয়া আমার বরাবর ধারণা। মহাপুরুষ আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করায় আমরা কোন কথা বলি নাই। এক্ষণে আপনার বিষয় ডাক্তার বিপিনবাবুকে জানাই, তাহাতে তিনি আলমোড়ার ন্যায় উচ্চ স্থানে আপনার একেবারেই থাকা উচিত নহে বলিলেন এবং দেরাদুন বা কন্‌খল প্রভৃতি স্থানে অবিলম্বে আসিতে পরামর্শ দিলেন। আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা আপনি কন্‌খলে আসেন। সেখানে কিছুদিন থাকিলে এবং নিয়মিত ঔষধ-পথ্যাদি সেবন করিলে পুনরায় শরীর ভাল হইবে আশা করা যায়। আপনার পত্র পাইলে সমুদায় ব্যবস্থা ঠিক হইয়া যাইবে। এখানকার সমস্ত কুশল। বাবুরাম মহারাজ ভাল আছেন। মহাপুরুষ মিহিজাম গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। আজকাল কেমন আছেন জানাইবেন। আমাদের প্রণাম ভালবাসাদি জানিবেন। ইতি—

Yours afftly
Brahmananda

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Bull Temple Road.
Bangalore City
Dated 20. 8. 1916.

কেদারবাবা,

তোমার পত্র পেয়েছি, এই সময় ৺কাশী না গিয়ে এখানে আসিলে না কেন? আমাকে যদি লিখিতে তাহা হইলে এখানে আসিতে বলিতাম। আমার বিশ্বাস তুমি এখানে আসিলে তোমার মন ও শরীর উভয়ই ভাল হইতে থাকিত। এ স্থানটি বড় রমণীয়, গ্রীষ্মের কোন রকমই উৎপাত নাই। অথচ শীতের তীব্রতাও নাই। তুলসী মহারাজ এই আশ্রমটিকে ফুলফল ইত্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিয়া বড় শোভাসম্পন্ন করিয়াছে। স্থানও যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছে, প্রায় সর্বশুদ্ধ ৫০ বিঘা জমি। তোমাদের ৺কাশীর আশ্রম অপেক্ষা অনেক বেশী।

আমাদের আশ্রম যেখানে আছে সে স্থানটি অতি নির্জন। আর এখানে ঘিঞ্জি নাই। সবই ভদ্রলোকের বসতি। তাই বলি, কেদার বাবা, কল্লে কি? বোধ হয় এ সময় ৺কাশী গরম। তোমার তত প্রীতিকর বোধ হচ্ছে না।

চারুবাবু, কালীবাবু এবং চন্দ্র প্রভৃতি কেমন আছে? তাহাদিগকে আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদাদি জানাইবে। কালীবাবুকে গাছপালাগুলি যত্ন করিতে বলিবে। একবার যদি তিনি আসতেন তবে এখানকার সরকারী লালবাগ দেখিয়া কত খুশী হইতেন। কত রকমের নূতন নূতন ফুল, তিনি দেখিয়া অবাক্ হইতেন। তিনি আমার নিকট Eucalyptus-এর গাছ চাহিয়াছেন। কলিকাতায় বেশী দাম বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই। এখানকার আশ্রমে একটি নূতন ধরনের Eucalyptus-এর গাছ দেখিলাম। তাহার পাতায় লেবুর মত গন্ধ, গাছটিতে অনেক ফল হইয়াছে। বীজ পাকিলে ইচ্ছা আছে পাঠাইয়া দিব। সেই বীজ হইতে যেন চারা করিয়া লন।

আর একটি কথা তোমার বলিতেছি—শ্রীযুত নিতাইচরণ রায় ছেলেটি এখন ওখানে আছে। তাহার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবে, যাহাতে তাহার কোন কষ্ট না হয়, এবং চন্দ্রকেও বলিয়া দিবে যাহাতে একটু যত্নাদি করে এবং দৃষ্টি রাখে; সে আমার অনেক সেবা করিয়া থাকে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসি।

কালীবাবুকে আরও বলিবে যে, এখানকার সরকারী লালবাগে কতরকমের কত চমৎকার রঙের সব cana আছে। শীঘ্রই তাহার কিছু roots পাঠাইবার চেষ্টায় আছি। সুযোগ হইলে পাঠাইয়া দিব, এবং কালীবাবুকে বলিবে বিশেষ যত্ন লইয়া তাহাদিগকে রোপণ করে।

আরও একটি কথা তুমি চন্দ্রের নিকট জানিয়া লিখিবে। নিয়মিতরূপে প্রতি সোমবার শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের পূজা দেওয়া হইতেছে কি না। যদি টাকা ফুরাইয়া গিয়া থাকে আপাততঃ চারুবাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া যেন সোমবার সোমবার পূজা দেওয়া হয়, ওটি যেন এখন বন্ধ না করে।

আর কি বলবো কেদারবাবা? শ্রীশ্রীবিশ্বনাথকে আমার কথা জানাইবে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদাদি জানিবে এবং যথাযোগ্য সকলকে জানাইবে। ইতি

Yours in the Lord

Dear Kedar Baba

Yours affly

Brahmananda

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

Ramkrishna Advaita Ashrama,
Luxa, Banaras City, 17. 12. 10.

ভাই শশী,

তোমার অসুখ এখনও সারে নাই জেনে দুঃখিত হইলাম। যখন ডাক্তার হেলক্ তোমার কাছে রয়েছে আমার ইচ্ছা তুমি তাহার চিকিৎসায় কিছুদিন থাক। সে অতি সুন্দর ব্যবস্থা করে। রোগের শেষ রাখিতে নাই—শ্রীশ্রীপ্রভুর কথা মনে রেখো। তোমার ইচ্ছায় আমি ও হরি মহারাজ আগামী কল্যই বোধ হয় মঠাভিমুখে যাত্রা করছি। হরি মহারাজের শরীর বেশ সুস্থ হয়েছে। শ্রীযুক্ত গিরীশবাবু ভাল আছেন অনেক। তিনি তোমায় প্রণাম জানাইলেন। তোমরা আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে। Dr. হেলক্, রুদ্রপ্রকাশ নানুকে আমার ভালবাসা জানাইবে। আমরা সকলে ভাল আছি। সুরেন্দ্রবিজয় তার মার সহিত বাড়ী গিয়াছে। তোমার আশীর্বাদপ্রার্থী

দাস বাবুরাম

পুনঃ—হরি মহারাজের ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি দাস বাবুরাম

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীবৃন্দাবন
৮।১১।'০৪

শ্রীমান্ নিকুঞ্জলাল,

তোমার ৫ই তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। কিন্তু সুখী হইতে পারি নাই। এবার যেন তোমাকে কিছু ভয়ভীত দেখিতেছি। কিন্তু তুমি ইহা বেশই জান যে, স্থির চিত্তে সকল বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সেইমত কার্য করিয়া যাওয়াই একমাত্র আমাদের কর্ত্তব্য। ফলাফল শ্রীভগবানের হাতে। ভয় অথবা দুর্বলতা জাগিলেই সকলে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরে সাহায্যের হস্ত প্রসারণ করিতে বড় কাহাকেও মেলে না। এ সংসারে দৃঢ়তার বড়ই আবশ্যক। এ সব কথা আমার তোমাকে বলা অধিকন্তু মাত্র। তুমি সবই জান তবু পরস্পর বলিতে হয় বলিয়াই বলিলাম। একজনের উপর নিশ্চয় করিয়া কিছুদিন অবিচলিত চিত্তে ঔষধ সেবন করিলেই সারিয়া যাইবে। নিতাইবাবু তোমাকে অতি সৎপরামর্শই দিয়াছেন। যাহা হউক তুমি শীঘ্রই আরাম হইয়াছ শুনিলে সুখী হইব। আমার আবার গত একাদশীর দিন জ্বর হইয়াছিল তিন দিনের পর জ্বর ছাড়ে। এখন জ্বর নাই, কিন্তু বড়ই দুর্বল। প্রভুর ইচ্ছা যেমন আছে হইবে। কৃষ্ণলাল একটু ভাল আছে। আমাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি—

শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramkrishna Math
Belur P. O., Howrah
Dated, the···১৬ই আশ্বিন
1924

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী, কয়েকদিন হইল বেলুড় মঠে তোমাদের পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইয়াছি।

আমার এখন জ্বর হয় না, শারীরিক দুর্বলতা আছে। ৺পূজার পর ঢাকা আশ্রম হইতে একজন এখানে আসিবে কথা আছে। তারপর আমার ঢাকাতে যাইতে হইবে। আজকাল এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হয়।

মায়ী, চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইলে পর ভগবান সম্বন্ধে কিছু লইয়া থাকিতে হয়। যেমন ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তক পড়া, তাঁর সম্বন্ধে কথাবার্তা চিন্তা ধ্যান, কত রকম আছে।

শীঘ্রই তো ঢাকায় যাইব, সাক্ষাতে সব কথাবার্তা হইবে।

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে, তোমার বাবা মা সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ
বৃহস্পতিবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ
(1926)

কল্যাণীয়া মায়ী,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। কয়েক দিন পূর্বে আর এক পত্র পাইয়াছিলাম, উত্তর দেবো দেবো মনে করে দেরি হইল। তোমার দিদির পত্র পাইয়াছিলাম, তাকে উত্তর দিয়াছি। আমার খুকী মায়ী এখন কোথায় ও কেমন আছে? আমি আজকাল ভাল আছি, মধ্যে মধ্যে দুর্বলতা বোধ করি, মঠ থেকে ইষ্টিমারে রোজ সকালে

বেড়াই। শীঘ্রই ৺ভুবনেশ্বর মঠে যাইব। সেখানকার জল বাতাস ভাল। সেইখানে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে। যেখানেই থাকিব মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইবে। আজকাল হেঁট হোয়ে বোসে বড় বড় পত্রাদি লিখিতে কষ্ট হয়, শরীর দুর্বল সেইজন্য। আজকাল মিষ্ট জিনিস, আলু খাই না, আর সব খাই; আমার প্রিয় জিনিস ছিল ডাল, ভাত—ডাক্তার তাই বন্ধ করে দিয়েছিল। যাই হোক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ভাল হইয়া উঠিয়াছি—এই মঙ্গল। বিশ্বাস ও ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে আপনার কোরে নিতে হবে। তিনি যদি সহায় থাকেন, হাবিজাবি চিন্তা-ভাবনায় কিছু করিতে পারিবে না। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে। জোর বিশ্বাস চাই।

আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে। সকলকে জানাবে ও কুশল সংবাদে সুখী করিবে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি ৺ভুবনেশ্বর যাবার ইচ্ছা। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramkrishna Math,
Belur P. O., Howrah
সোমবার, ১২ই আশ্বিন
1925

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী,

মায়ী, অনেকদিন তোমাদের পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। এখানে মা দুর্গার প্রতিমাপূজা হইল। অসময়ে খাওয়া, ও সময়ে নিদ্রা নাই, সেইজন্য শরীর ক্লান্ত হইয়া আছে। ৺বিজয়ার ভালবাসা শুভ ইচ্ছা সকল সাধুদের জানাবে, তোমরা সকলে জানিবে। তোমার পত্রের সহিত রেণুর মাকে পত্র দিতেছি, পাঠাইয়া দেবে (যোগেশ ঘোষের বাড়ী)।

তোমার দিদি, খুকী মায়ী এরা এখন কি তোমাদের বাড়ীতেই আছে? তাদেরও পত্র তোমার পত্র-মধ্যেই দিতেছি। তাহাদের দেবে।

মায়ী, তোমার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আর বেশী কি লিখিব। তিনি বলিতেন, এখানকার বিষয় যে যত চিন্তা করিবে, সে ততো জানিতে পারিবে। সুতরাং যাতে তাঁর বিষয় চিন্তা থাকে সেই বিষয় করিবে, তাঁর সম্বন্ধে বই পড়া, তাঁর কথাবার্তা লইয়া থাকা। আমি যে তোমায় বলিয়াছিলাম—শ্রীমদ্‌ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পড়িবে, সেই সব জায়গায় কেমন সুন্দর সুন্দর কথা আছে।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা তুমি জানিবে, ছেলেমেয়ে সকলকে ও তোমার পিতামাতাকে জানাবে। আশা করি সমস্ত কুশল সংবাদ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

বর্তমান সমস্যাসমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্মভূমি ভারত বিশ্বে উপহার দিয়েছিল মানবজাতির অন্যতম কুসুমরত্ন—বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী ছিলেন বহুবিধ ব্যক্তিত্বের আধার—স্বদেশপ্রেমিক ও সন্ন্যাসী, জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী।

স্বামীজীই ভারতের মৃত অস্থিপঞ্জরে নবজীবন সঞ্চার ক'রে দেশবাসীদের নবীন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনিই দেশবাসীদের জাতীয় চেতনায় জাগিয়ে তুলে তাদের শেখালেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্বদেশবাসীদের ভগবানের প্রতীকরূপে সেবা করতে। তিনি বলেছিলেন, 'সেবা ও ত্যাগ ভারতের জাতীয় আদর্শ; ভারতকে সেই ধারায় তীব্রগতিশীল ক'রে তোল; বাকি সব কিছু আপনিই এসে যাবে।' 'আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, আত্মত্যাগই অতি-জাগতিক বিধান।' তিনি বলতেন, 'ধর্ম চরম ত্যাগের সহযাত্রী। নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে ভগবৎসত্তাতে বেঁচে চলো। কোথায় গিয়ে ভগবানকে খুঁজে বেড়াবে? দীন, দুঃস্থ, দুর্বল—এরাই তো ভগবান; এদেরই আগে পুজো করো না কেন? তা না ক'রে গঙ্গাতীরে কূপ-খননের চেষ্টা কেন?'

'দুর্গতদের জন্য ভাবো। সাহায্য?—তা আসবেই। এই ভার হৃদয়ে চাপিয়ে আর এই ভাব মস্তিষ্কে নিয়ে বারো বছর আমি পরিক্রমা করেছি, তথা-কথিত ধনী আর বড়ো লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি। সাহায্য খুঁজতে ব্যথিত চিত্তে অর্ধজগৎ পাড়ি দিয়ে এই অপরিচিত দেশে (আমেরিকায়) পৌঁছেছি। ভগবান মহান্; জানি তাঁর সাহায্য পাবো। শীতে আর ক্ষুধায় এই দেশে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু তরুণসম্প্রদায়! দায়স্বরূপ তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি দীন, অজ্ঞ ও নির্যাতিত জনগণের জন্য এই সহানুভূতি, এই সংগ্রাম।'

'জীবন ক্ষণস্থায়ী; যত পার্থিব অহমিকা সবই ভঙ্গুর। কিন্তু তাঁরাই চিরঞ্জীব যাঁরা অপরের জন্য জীবনধারণ করেন; অন্যেরা জীবন্মৃত।' স্বামীজীর সোচ্চার উক্তি—'আমি সেই ধর্মমতে বা ভগবানে বিশ্বাস করি না, যাতে বিধবার অশ্রুমোচন বা অনাথের মুখে দু'মুঠো অন্ন যোগানো ব্যর্থ হয়।'

নিঃস্বার্থ প্রেম ও একনিষ্ঠ সেবাই জীবনভর স্বামীজী প্রচার করেছিলেন। তাঁর উপদেশাবলীর ভিত্তি ছিল বেদান্তসূত্রের প্রমাণাদি, বিশেষতঃ যেখানে বিশ্বাত্মার সমতা ও সর্বব্যাপিত্ব ঘোষিত হয়েছে। আবেগভরে স্বামীজী বলেছিলেন, 'সহস্রবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বার বার যেন আমার জন্ম হয়, যাতে আমি পূজা করতে পারি একমাত্র সেই ভগবানকে—কেবলমাত্র যাঁর অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, বিশ্বাত্মার সামগ্রিক সমষ্টি যিনি, সর্বোপরি আমার বিশেষ আরাধ্য আমার দুরাচাররূপী ভগবান, দীনতমরূপী ভগবান। মুক্তি বা ভক্তির প্রত্যাশা আমি করি না। বসন্ত ঋতুর মতো অতি সংগোপনে পরোপকার ক'রে সহস্র নরকে যেতেও প্রস্তুত আছি।—এই আমার ধর্ম।' অপর কোন মহত্তর উক্তি সুষ্ঠুতরভাবে স্বামীজীর উদার মনের পরিচয় দিতে পারে ব'লে তো আমাদের জানা নেই।

প্রকৃত দেশপ্রেমের স্বরূপ কি তা স্বামীজী আমাদের কাছে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে ভাবী-দেশপ্রেমিক, অন্তর দিয়ে অনুভব করো। তুমি কি অনুভব করো যে, তোমার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী যুগ যুগ ধরে উপোস ক'রে চলেছে? এতে কি তুমি ব্যাকুল হয়ে উঠ? এ কি তোমার রক্তে প্রবেশ করেছে? এতে কি তুমি উন্মাদ হয়ে তোমার নাম, যশ, পরিবার, সম্পত্তি, এমন কি তোমার দৈহিক সত্তা পর্যন্ত ভুলতে পেরেছ? তা কি তুমি করতে পেরেছ? তাই হবে দেশপ্রেমিক হবার প্রথম—একমাত্র প্রথম—সোপান।'

স্বামীজীর দেশসেবার ডাক সাড়া জাগিয়েছিল বহু দেশপ্রেমিকের অন্তরে। ভারতের আধুনিক আন্তর্জাতিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভুললে চলবে না যে, যখন জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, আর ভারতের জাতীয় জাগরণে হতবুদ্ধি ইংরেজ সরকার এই জাগরণের কারণ নির্ণয়ের জন্য 'রাউলেট কমিশন' নিয়োগ করেন, তখন এই কমিশনই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এর মূলে স্বামী বিবেকানন্দ।

পর্যটক সন্ন্যাসিরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। হিমাদ্রি-শিখর হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সকল তীর্থস্থান তিনি পরিদর্শন করেন, সামান্য কুটির হতে সুরম্য প্রাসাদও তাঁর অদেখা ছিল না। ইহা ভারতের প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টভাবে জানতে নিঃসন্দেহে তাঁকে সাহায্য করেছিল। অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির ভয়াবহ দারিদ্র্য ও হীনাবস্থা, অসীম দুঃখদৈন্য ও তাদের ওপর অবর্ণনীয় সামাজিক নির্যাতন আর এই সবের প্রতি সুবিধাভোগীদের নির্মম অবহেলা—এ সমস্ত দেখে স্বামীজী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। নিরন্নের খাদ্যসংস্থান, প্রায়-নগ্নের বস্ত্রের ব্যবস্থা, পীড়িতের সেবা, তাকে সান্ত্বনাদান—কি-ভাবে এসব করা যায় এই চিন্তাই তাঁকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। ভারতের প্রতি স্বামীজীর গভীর প্রেম ও তাঁর অতুলনীয় স্বাদেশিকতার প্রসার সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি?

বলা যায়, ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিপুল অবদান পথিকৃৎ স্বামীজীর। আধুনিক ভারতের প্রথমসারির জাতীয়তাবাদী নেতাগণ স্বামীজীর কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, স্বামীজীর রচনাবলী ভারত-মাতাকে ভালবাসতে ও বুঝতে তাঁকে অধিকতর প্রবুদ্ধ করেছিল। স্বামীজী কর্তৃক 'ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা' বা 'অস্পৃশ্যতা'-বাদের অসংবৃত ধিক্কার মহাত্মাজীর 'হরিজন-আন্দোলন'-এ মূর্ত প্রতিধ্বনি পেয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মহান পথিকৃৎ তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে যে ভাষায় আহ্বান করেছিলেন তার আবেগ ভারতবাসীর মর্মস্পর্শ না ক'রে পারে না—"হে ভারত, ভুলিওনা—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী

আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' "

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব দেশের সব মানুষকে স্বামী বিবেকানন্দ যে ভালবাসা দেখিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয় ও অননুকরণীয়। তিনি পারতেন নিগ্রোর সঙ্গে করমর্দন করতে, অস্পৃশ্যের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে, চণ্ডালের সঙ্গে একই হুঁকো থেকে তামাক খেতে। জীবনের চরমসঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েও কখনো কারো অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। আমেরিকায় এমন হয়েছে যে, নিগ্রোভ্রমে তাঁকে হোটেলে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি, কিন্তু তিনি নিজেকে সনাক্তকরণের কোনো চেষ্টাই করেননি। সেই বিদেশ-বিভুঁই-এ দারুণ অর্থাভাবে তাঁকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে অবস্থায় সংস্থা-বিশেষের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাতও হতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের উপর নির্ভর ক'রে নির্ভীক ও স্থিরচিত্তে তিনি সংকল্প-সাধনে অটল ছিলেন।

ভারতীয় ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে অদম্য উৎসাহে ও অকুণ্ঠ সাহসে স্বামী বিবেকানন্দ পথের সমস্ত বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে ভারত-প্রেমিকদের পথনির্দেশের জন্যই তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছুতে গতিবেগ ত্বরান্বিত করেছিলেন। কিন্তু হায়! সাম্প্রতিক কালের আত্যন্তিক প্রয়োজনেও আমাদের মধ্যে ক'জন উপযুক্ত নির্দেশের জন্য ফিরে তাকাচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের দিকে, যিনি ছিলেন ভারতের প্রথমসারির জাতীয়তা-বাদীদের মধ্যে অদ্বিতীয় আর এযাবৎ-বিশ্বপ্রসূত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের মধ্যে বরিষ্ঠ?

বিবেকানন্দ ছিলেন পুরোপুরি বৈদান্তিক। তাঁর বৈদান্তিকতার অর্থই ছিল সর্বজনীনতা। সাম্প্রদায়িকতার উপর ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। বেদান্তে তো সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নাই। বেদান্ত এমন একটি ধর্ম যাতে মিলে বহু আদর্শ। প্রবেশেচ্ছু যে-কারো জন্য এর দ্বার অবারিত, আর পছন্দমতো যে-কোন একটি আদর্শ বেছে নিতেও কোনো বাধা নেই কারো পক্ষে। স্বামীজী বলতেন সারা বিশ্বই তাঁর স্বদেশ, আর সত্যই তাঁর ধর্ম। এতেই কি নিঃসংশয়ে তাঁর বিশ্বমানবত্ব প্রমাণিত হয় না? বস্তুতঃ তিনি ছিলেন দুর্লভ শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদী—আর আন্তর্জাতিকতাবাদ পেয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণীর মধ্যে নতুন বর্ণ, নতুন পরিচ্ছদ এবং নতুন ব্যাখ্যা। স্বামীজীর পূর্বে মানবজাতির ইতিহাসে কোনো দেশে এমন কোনো মহামানবের সন্ধান মেলে না যিনি নিজ ধর্মপথ ও বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেও সমগ্র মানব-জাতিকে এক মূলধর্মাবলম্বী ও একজাতিভুক্ত মনে করতেন। এদিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কেবল ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী নন, সমগ্র পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী।

বেঁচে থাকলে স্বামী বিবেকানন্দ আজ আঁতকে উঠে বলতেন, "কোথায় চলেছে ভারত?" তথাকথিত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দলগুলির সঙ্কীর্ণতা দেখে তিনি ব্যথিত হতেন

আমরা কি আজ আমাদের মাতৃভূমিকে তার আদর্শ থেকে ক্রমশঃ দূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি না? দেশের অমর্যাদাকর সমস্ত হীনতার পসরা মাথায় নিয়ে বিদেশের কাছে হাত পাতছি না? তিনি তারস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, ভারতের কোনো সংস্থা গড়ে ও বেড়ে উঠতে পারবে না যদি ভারতের আধ্যাত্মিকতার মাটিতে এর শিকড় প্রবিষ্ট হতে না পারে। দেশের ভাবাদর্শের সঙ্গে অসমঞ্জস কোনো কিছুর এখানে স্থান নেই।

আজ আমাদের অন্যতম দূষিত বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা পরস্পরের কুৎসা না গেয়ে থাকতে পারি না। এতে তো নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। দেশপ্রেমিকদের হৃদয়পটে স্বামীজীর নিম্নোক্ত উদাত্ত বাণীটি অঙ্কিত থাকা উচিত—'হে অমৃতের সন্তান আমার স্বদেশবাসিগণ, আমাদের এই জাতীয় তরণী যুগ যুগ ধরে তার সভ্যতা বহন ক'রে সারা পৃথিবীকে তার অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ করছে; কত শতাব্দী ধরে এ জীবন-সমুদ্র অতিক্রম ক'রে লক্ষ লক্ষ মানবসন্তানকে পরপারে—অমৃতলোকে নিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের নিজেদের দোষেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক—তা আমাদের চিন্তনীয় নয়—যদি এতে কোনো রন্ধ্র দেখা দিয়ে থাকে আর তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তোমরা—এর আরোহীরা—কি করবে? তোমরা কি পরস্পর বিবাদে রত হয়ে একক একে টানতে থাকবে? অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যথাশক্তি ঐ রন্ধ্রগুলি রোধ করবে? আমাদের হৃদয়ের রক্ত দিয়েই তো তা করতে হবে আর যদি আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থই হয়, তবে এসো, আমরা এক সাথে ডুবি, রসনায় অভিশাপ নয়, আশীর্বাণী নিয়ে।'

"শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

"দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা অদ্ভুত বটে; তবুও আত্মিক শক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সুপ্রভাতম্

স্বামী হর্ষানন্দ

ধর্মস্য হানিমভিতঃ পরিদৃশ্য শীঘ্রং
কামারপুকুর ইতি প্রথিতে সমৃদ্ধে।
গ্রামে সুবিপ্রসদনে হ্যভিজাত দেব
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১

চারদিকে ধর্মের গ্লানি দেখে, কামারপুকুর নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে, হে দেব, তুমি শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেছিলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ১

বাল্যে সমাধ্যনুভবঃ সিতপক্ষিপংক্তিং
সন্দৃশ্য মেঘপটলে সমবাপি যেন।
ঈশৈক্যবেদনসুখং শিবরাত্রিকালে
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ২

বাল্যকালে মেঘপটলের মধ্যে উড্ডীয়মান শুভ্রবলাকাদল দেখে তুমি সমাধিস্থ হয়েছিলে; (পুনরায়) শিবরাত্রিতে শিবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দানুভব করেছিলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ২

নানাবিধানয়ি সনাতনধর্মমার্গান্
ক্রৈস্তাদিচিত্রনিয়মান্ পরদেশধর্মান্।
আস্থায় চৈক্যমনয়োরনুভূতবাংস্ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৩

সনাতন ধর্মের বিভিন্ন পথে এবং পরদেশের খৃষ্টানাদি ধর্মসমূহ অনুসরণ ক'রে তুমি নিজ থেকে সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করলে যে এসকল একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৩

হে কালিকাপদসরোরুহকৃষ্ণভৃঙ্গ
মাতুস্সমস্তজগতামপি শারদায়াঃ।
ঐক্যং হ্যদর্শি তরসা পরমং ত্বয়ৈব
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৪

হে কালিকাপাদপদ্মাশ্রিত কৃষ্ণভ্রমর, তুমি অতি সহজেই (নিজপত্নী) সারদাদেবী ও বিশ্বজননীর অভেদত্ব উপলব্ধি করলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৪

রাখালতারকহরীংশ্চ নরেন্দ্রনাথম্
অন্যান্ বিশুদ্ধমনসঃ শশিভূষণাদীন্।
সর্বজ্ঞ আত্মবয়ুনং ত্বমিহানুশাস্সি
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৫

হে সর্বজ্ঞ, এখানেই (অর্থাৎ পাহাড়ে নয়, জনারণ্যের মধ্যেই) তুমি রাখাল, তারক, হরি, নরেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ প্রভৃতি শুদ্ধচিত্ত (যুবকদের) আত্মবিদ্যা শেখালে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৫

নিত্য সমাধিজসুখং নিজবোধরূপম্
আস্বাদয়ন্ তব পদে শরণাগতাংশ্চ।
আনন্দয়ন্ প্রশময়ন্ন্ প্রতিষ্ঠসে ত্বং
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৬

সমাধিজ আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ নিত্য উপলব্ধি ক'রে তুমি নিজপদে শরণাগতদের আনন্দ ও শান্তি দিলে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৬

স্বীকৃত্য পাপমখিলং শরণাগতৈর্যদ্
আজীবনং বহু কৃতং দয়য়া স্বদেহে।
তজ্জাতখেদনিবহং সহসে স্ম নাথ
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৭

হে প্রভু, শরণাগতদের বহু জন্মের নানাপ্রকার পাপ করুণাবশতঃ নিজদেহে গ্রহণ ক'রে তজ্জনিত কষ্ট তুমি নীরবে সহ্য করেছো। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৭

প্রাতঃ প্রণামকরণং তব পাদপদ্মে
সংসারদুঃখহরণং সুলভং করোতি।
মত্বেতি ভক্তিভরিতাঃ প্রতিপালয়ন্তি
শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৮

প্রভাতে তব পাদপদ্মে প্রণাম সংসার-দুঃখনাশের অনুকূল জেনে ভক্তিবিনম্রচিত্তে

(ভক্তেরা) তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ৮

গাতুং স্তুতীস্তব জনা অমৃতায়মানাঃ
　　সম্প্রাপ্য দর্শনমিদং তব পাদয়োশ্চ।
ধন্যা নরেশ ভবিতুং মিলিতাস্বসমীপং
　　শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ৯

তোমার অমৃত-নিঃসারী স্তব গাইতে ও চরণ-দর্শনের দ্বারা ধন্য হতে বহু লোক, হে লোকপ্রভু, এখানে সমবেত হয়েছে। হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত বন্দনা করি। ৯

সন্দায় দর্শনসুখং শরণাগতেভ্যো
　　মোহান্ধকারমখিলং ত্বমপাকুরুষ।
জ্ঞানার্ক ভক্তিজলধে সকলার্তিহস্তঃ
　　শ্রীরামকৃষ্ণভগবন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১০

হে জ্ঞানভাস্কর, দর্শনানন্দ প্রদান করে তুমি শরণাগতদের নিখিল অজ্ঞানান্ধকার দূর করো। হে ভক্তিবারিধি, হে সর্বদুঃখনাশক, হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ১০

আহৈতুকীতি করুণা কিল তে স্বভাবো
　　দুষ্টাঃ কঠোরহৃদয়া অপি তে ভজন্তে।
ত্বামেব সর্বজগতাং জননি প্রপাত্রি
　　শ্রীশারদেশ্বরি রমে তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১১

হে মা সারদেশ্বরী, তুমি কল্যাণীরূপা, অহৈতুকী করুণাই তোমার স্বভাব জেনে কঠোর-হৃদয় দুষ্টেরাও তোমার পূজা করে। তুমি সর্বজগতের রক্ষাকর্ত্রী, হে মা, তোমায় প্রভাত-বন্দনা করি। ১১

সুপ্তাংস্ত ভারতজনান্ স্ববচঃপ্রহারৈ-
　　রুদ্বোধয়ন্ বিবশয়ন্ নিজধর্মমার্গে।
প্রোৎসাহয়ন্ পরমতাং প্রকটীকরোষি
　　বীরেশদত্তমহিমন্ তব সুপ্রভাতম্ ॥ ১২

শিব-প্রসাদিত (মহিমায়) যিনি মহিমময়, যিনি স্বীয় বাগাঙ্কুশের সাহায্যে সুপ্ত

ভারতবাসীদের নিজধর্মপথে জাগ্রত ও উৎসাহিত ক'রে তুলে নিজ মহিমা সর্বদা প্রকাশ করেছেন, সেই তোমাকে (স্বামী বিবেকানন্দকে) প্রভাত-বন্দনা করি। ১২

প্রাতরুত্থায় যো দেবং
রামকৃষ্ণং স্মরন্ স্মরন্।
স্তোত্রমেতৎ পঠেৎ ভক্ত্যা
সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

যে কেউ প্রাতঃকালে উঠে (প্রভু) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করেন এবং ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র আবৃত্তি করেন, তিনি অমৃতত্বলাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন।

"যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্র-সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সেই-ই সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পারো, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্তুত: প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রতিভা।

"পাশ্চাত্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

"পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্তলালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই- তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দের স্মৃতিকথা*

স্বামী নিখিলানন্দ

[অনুবাদক : স্বামী চেতনানন্দ]

১৯১৫-১৬ সালের শীতকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ ঢাকায় যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী মাধবানন্দ, স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। তখন আমি ঢাকা কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র।

এক সন্ধ্যায় আমরা ঢাকা কলেজের হস্টেলের খাওয়ার ঘরে একটা ছাত্রসভার আয়োজন করি। কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করলাম।

আমি অগ্নেস ভিলাতে (Agnes Villa) বক্তাদের আনবার জন্য গেলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাড়ীর ছাদে উঠলেন ; স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সেখানে সান্ধ্য-ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে স্বামী প্রেমানন্দ পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন এবং আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বিব্রত বোধ করে বললেন, 'ভাই বাবুরাম, কর কী ? ঠাকুরের কৃপায় সব হয়ে যাবে।' যদিও তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, তবুও স্বামী প্রেমানন্দ গুরু-ভাইকে প্রণাম করলেন এবং ভাবের সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে আশীর্বাদ চাইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দেখে আমি যার-পর-নাই মুগ্ধ হলাম।

সভাপতি অশ্বিনীবাবুর একটা মুদ্রাদোষ ছিল—সেটা আমরা বক্তাদের বলে দিতে ভুলে গিছলাম। কয়েক মিনিট বাদ বাদ নিজের ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁর একটা অভ্যাস ছিল। এমন কি কলেজে ক্লাস নেওয়ার সময়ও তিনি ঐরূপ করতেন। স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম বক্তা। তিনি সবেমাত্র কয়েক মিনিট বলেছেন, অমনি অশ্বিনীবাবু ঘড়িটা বের করে একবার দেখে নিলেন। স্বভাবতই প্রেমানন্দজী মনে করলেন যে, তাঁকে থামবার জন্য ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ তখন কেবল-মাত্র তাঁর ভাষণে ওজস্বিতা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। বক্তৃতা বন্ধ করে আসন গ্রহণ করবেন কিনা, সভাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। এতে অশ্বিনীবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে বললেন। সভাপতি কয়েক নিট পর আবার ঐরূপ করলেন। এরূপ ঘড়ি দেখা চলল অনেকবার। অবশেষে স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, 'মহাশয়, আমি আপনাদের মত পাশ্চাত্য শিক্ষিত বক্তা নই যে ঘড়ি ধরে সময় মেপে বক্তৃতা দেব। আমি মূর্খ মানুষ। ঠাকুর যেমন বলান তেমনি বলি। আমি আপনাদের ওসব ইংরেজী আদব-কায়দা পালনে অক্ষম। আপনারা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েছেন, সুতরাং আমি আর কিছু বলব না। সভাপতি তাঁকে ঘড়ির ব্যাপার অগ্রাহ্য করে বক্তৃতা বন্ধ না করতে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ চুপ করে রইলেন। তিনি বলছিলেন তীব্র আবেগের সঙ্গে। বক্তৃতা-কালে ক্রমাগত বাধা ভঙ্গ করছিল তাঁর সেই প্রাণ-আলোড়নকারী ভাবোচ্ছ্বাসকে, শক্তি-প্রবাহকে, স্নায়ুতন্ত্রীগুলোকে। ফলে তিনি পড়লেন অসুস্থ হয়ে।

* Swami Premananda : Teachings and Reminiscences গ্রন্থ হ'তে অনূদিত।

অগ্নেস ভিলাতে একদিন সকালে মহারাজদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত সাক্ষাতের পর, প্রেমানন্দজী যখন নীচের তলায় নামছিলেন তখন আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তাঁকে একা পেয়ে বললাম, 'মহারাজ, আমি আপনার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।' ফিরে চাইলেন তিনি আমার দিকে। বললেন দৃপ্তভাবে: 'তুমি একজন বিপ্লবী?' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি করে জানলেন?' তিনি বললেন, 'আমরা সব বুঝতে পারি। দেশকে সেবা করার পথ এ নয়। ভুল পথ ধরেছ তোমরা।' উত্তেজনা তাঁর বেড়ে চলল। তিনি বললেন, 'ওসব করে কিছুই হবে না। তোমার আর সব বিপ্লবী বন্ধুদের নিয়ে কাল সকালে এস। তোমাদের মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কাছে নিয়ে যাব।'

পরদিন সকালে দু-জন বিপ্লবী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভিলাতে হাজির হলাম। স্বামী প্রেমানন্দ আমাদের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে দু'টি তক্তাপোষ ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটিতে বসেছিলেন; স্বামী প্রেমানন্দ অপরটিতে বসলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবককে ঘরের বাইরে যেতে বলা হল; ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করে আমরা মেঝেতে বসলাম।

স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, এই যুবকদের প্রতি একটু তাকান। এরা ভাল ছেলে, কিন্তু ভ্রান্তপথে চালিত। ভারতকে সেবা করবার জন্য এরা হয়েছে বিপ্লবী। আপনি দয়া করে এদের একটু সদুপদেশ দিন।' স্বভাবসুলভ গুরুগম্ভীর স্বামী ব্রহ্মানন্দ অতি দরদের সঙ্গে আমাদের বিদ্বেষের পথ, জিঘাংসার পথ ছেড়ে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে বললেন। তিনি প্রথমেই বললেন আমাদের চরিত্র গঠন করতে, তারপর যেন আমরা দেশসেবায় ব্রতী হই। তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন যে, বিপ্লবীদের মধ্যে কিছু দুষ্ট স্বার্থপর লোক আছে—সেজন্য কোন ফল হচ্ছে না। চরিত্রের অভাবই এই নিষ্ফলতার কারণ। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন, 'ভিজে বারুদে বিস্ফোরণ হয় না। যতই জ্বালাবার চেষ্টা কর না কেন, তাতে কেবল দেশলাই-এর কাঠি নষ্ট হবে। আর বারুদ যদি শুকনো হয় তবে একটা কাঠি মুহূর্তে ঘটাতে পারে বিরাট বিস্ফোরণ।' তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন: 'স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং আমাদের উচিত তাঁর নির্দেশ মেনে চলা।'

আমি বললাম: 'কিন্তু মহাশয়, আপনারা তো স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারেননি। আমরা তাঁর বই-এ পড়েছি—তিনি চাইতেন আমরা যেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্ত-মোক্ষণ করি। আর বিপ্লবীরা তো তাই করছে। আপনারা স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ ধরতে পারেননি।'

এ ধরনের উক্তি স্বামী প্রেমানন্দের পক্ষে সীমাহীন অসহ্যের ব্যাপার। তিনি ফেটে পড়লেন: 'নির্বোধের দল! তোরা জানিস না কার সঙ্গে কথা বলছিস। বিশ বছরেরও অধিক আমরা স্বামীজীকে জানি। আমরা একসঙ্গে খেয়েছি, খেলেছি, কথা বলেছি, আমাদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেছি—আর আমরা তাঁকে বুঝিনি!! আহাম্মকের দল, তাঁর বই-এর দু পাতা পড়ে ভাবছিস তোরা তাঁকে সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছিস?'

তারপর তিনি ব্রহ্মানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহারাজ, শুনলেন আহাম্মকের কথা? এ বলছে কিনা আপনি স্বামীজীকে বোঝেননি! আপনি কি মনে করেন যে, একটা ঘোড়ার চেয়ে এর অধিক বুদ্ধি আছে? দেখি—পিঠে করে এ আমাকে বইতে পারে কিনা।'

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন এবং আমাকে নীচু হয়ে চার-হাত-পায় হামাগুড়ি দিতে বললেন। তারপর আমার পিঠের উপর বসে দু-পাশে দু-পা ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরের চারপাশে তাঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতে আদেশ করলেন। তখন আমি যেন একটা সত্যিকার ঘোড়া। আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করলাম। দু-এক মিনিট পর তিনি আমার পিঠের উপর থেকে নেমে বললেন, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপ্রেমে আপনভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখলেন। তারপর আবার আমাদের চরিত্রগঠনের উপদেশ দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আর সেই থেকে ছিন্ন হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে আমার যোগসূত্র।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সপার্ষদ ঢাকা ছেড়ে কয়েক মাইল দূরবর্তী নারায়ণগঞ্জে চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা এক ভক্ত-বাড়ীতে উঠলেন। এক সন্ধ্যায় আমি দুজন বন্ধুসহ মহারাজদের প্রণাম করতে গেলাম। নৈশ-ভোজের সময় পর্যন্ত আমরা সেখানে বসে ছিলাম। আমাদের অত সময় বসে থাকায়, গৃহস্বামী বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। যেহেতু তাঁর বাড়ীতে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না।

এতে স্বামী প্রেমানন্দ বেশ রেগে গেলেন এবং গৃহস্বামীকে বললেন: 'এরা সব ঠাকুরের ভক্ত। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে আমিও অভুক্ত থাকব।' গৃহস্বামী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আমরা সকলে খেতে বসলাম।

১৯১৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী প্রেমানন্দের অনুমতি নিয়ে উপস্থিত হই বেলুড় মঠে। তাঁকে জানালাম আমার সংঘে যোগদানের ইচ্ছা। কিন্তু তিনি আমাকে প্রথমে বি. এ. পাশ করতে বললেন; এবং জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন কৃপালাভের জন্য।

১৯১৬ সালের অগস্ট মাসে ঢাকাতে আমি বন্দী হই। কারণ বিপ্লবী দলের সঙ্গে পূর্বে আমার সংযোগ ছিল। আমাকে দু বছর অন্তরীণ করে রাখা হয়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বন্দিদশা থেকে ছাড়া পেয়ে বেলুড় মঠে যাই। মঠে গিয়ে শুনলাম স্বামী প্রেমানন্দ গুরুতর অসুস্থ। তার অল্প কিছুদিন পরেই তিনি চলে গেলেন।

জীবনের এক সংকট-মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। এই মহান আত্মার সঙ্গে সেই অল্প মিলন-স্মৃতিগুলি পরবর্তীকালে বহু দুর্যোগের মধ্যে, জীবনের নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমাকে জুগিয়েছে সাহস ও অনুপ্রেরণা, এনে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও সান্ত্বনা।

ভারতীয় সমন্বয়ধারা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। ইহার সংস্কৃতিও খুব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে এখানে বহু মানবগোষ্ঠী ও জাতি বাস করিয়াছে এবং কালক্রমে সে-সকল গোষ্ঠী ও জাতি একত্র মিলিত হইয়া এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মিলনের ফলে তাহাদের বিভিন্ন সংস্কৃতিরও মিলন ঘটিয়াছে এই ভারতভূমিতে। এই মিলন বা সমন্বয়ই ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি মূল সুর।

ভারতের প্রথম অধিবাসী হইল আদিম-জাতি। বর্তমান কোল, ভীল, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি আদিম জাতির বংশধর। তারপর দেখা যায় ভারতে দ্রাবিড় জাতির আবির্ভাব; সিন্ধুসভ্যতা তাহাদেরই কীর্তি। দ্রাবিড়দের পর আর্য জাতির আগমন ঘটে এই ভারতবর্ষে। তাঁহাদের আদি নিবাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে আর্যগণ ভারতের বাহির হইতে আসেন নাই—ভারতই আর্যগণের আদি বাসভূমি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি—পারসীক, গ্রীক, শক, হুন, পারদ, কুষান, তীব্বতীয়, আরব, পাঠান, মুঘল—ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং এখানে একজাতিতে মিশিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
> হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
> শক, হুনদল পাঠান, মোগল
> একদেহে হল লীন।

আধুনিক কালে পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ ভারতে আগমন করে। ফলে, ভারত বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতে দেখা যায়, বহুর মধ্যে ঐক্য; এই ঐক্য সংস্কৃতিগত ও ভাবগত; ইহা ভারত-ইতিহাসের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই কবি গাহিয়াছেন:

> "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
> বিভেদের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

ভারত-সংস্কৃতির এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক। এবং এই ভাবটি ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সঙ্গীতেও পরিস্ফুট। আমাদের সংস্কৃতির মূলে দেখি—এই আধ্যাত্মিক ভাবধারা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং এই ধারার প্রধান কথাই হইল সামঞ্জস্য ও সমন্বয়। এই ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের চরম ঐক্য ও সমন্বয় ঘটিয়াছে আধুনিকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে।

বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতি হইতেছে আদিম সংস্কৃতি, দ্রাবিড় সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়। ভারত কিছুই বর্জন করে নাই—সবই গ্রহণ করিয়াছে, ভারত বাহ্য পার্থক্যকে নষ্ট করিয়া ভিতরের নিগূঢ় যোগ আবিষ্কার করিয়াছে এবং প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া নানা পথকে একই লক্ষ্যে চালনা করার শিক্ষা দিয়াছে ভারতীয় সংস্কৃতি। এই উদারতা ও বিশ্বজনীন গ্রহণ (universal acceptance) আমাদের জাতি ও কৃষ্টির মূল বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় কৃষ্টির আর এক বৈশিষ্ট্য হইল মানবপ্রেম, ত্যাগ ও সেবা। আমাদের

এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীজীর মধ্যে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে এই যুগে পরিপুষ্ট ও দৃঢ় করিয়াছেন। তাঁহার সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হইল—"যত মত তত পথ।" তাঁহার এই মহাসমন্বয়বাণীর তাৎপর্য আমরা এখানে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করিব।

উপনিষদে ধর্ম, দর্শন ও ঈশ্বর সম্পর্কে দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ধারার নাম অদ্বৈতবাদ, অপরটি ভাগবতবাদ। এই দুই ধারা এখনও হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে বর্তমান। অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী ব্রহ্ম নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ ও নৈর্ব্যক্তিক; ব্রহ্মলাভের উপায় জ্ঞান; জগৎ দেশ, কাল ও নিমিত্তের বা নামরূপের সমষ্টি অর্থাৎ ইহার সত্যিকারের সত্তা নাই এবং মুক্তিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, উহার আর নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে না। দ্বিতীয় ধারা মতে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সাকার, সবিশেষ ও গুণময় এবং তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা; জগৎ ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া অস্তিত্বসম্পন্ন; ভগবানকে লাভ করা যায় ভক্তির মাধ্যমে। ভাগবতমতে মুক্তির পরও জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে এবং ঈশ্বরসান্নিধ্যে অপার শান্তি ও আনন্দ অনুভব করে। মধ্যযুগের প্রারম্ভে এই দুই ধারাকে দার্শনিকভিত্তিতে স্থাপন এবং বিশেষভাবে প্রসারিত ও পরিপুষ্ট করেন যথাক্রমে আচার্য শঙ্কর ও আচার্য রামানুজ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে বলিলেন—"ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।"—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ)। ঠাকুর ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবেই সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি একত্র ভক্ত ও জ্ঞানী—তাই তিনি বিজ্ঞানী। উল্লেখযোগ্য যে, ঠাকুর ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার উপলব্ধিতে নিঃশেষ করেন নাই। ঈশ্বর সম্পর্কে ইহা এক মৌলিক ও বৈপ্লবিক কথা এবং চরম সত্যের এই ধারণায় ধর্মের বিভিন্ন মত ও উপলব্ধির সমন্বয় সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়।

জগৎ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যতক্ষণ ঈশ্বর-উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণই জগৎ মিথ্যা মনে হয়, আর ঈশ্বর-উপলব্ধি হইলে জগৎকে সত্য মনে হয়।" পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে,—"যত মত তত পথ।" "কিন্তু তা বলে মতুয়ার বুদ্ধি (dogmatism) ভাল নয়। ছাদ কি জানবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠছ আর বলছ 'নেতি-নেতি'। ছাদে উঠে দেখলে ছাদ হচ্ছে ইট-চুণ-সুরকি। তখন নামতে গিয়ে দেখ সবই ইট-চুণ-সুরকি" (কথামৃত, ২য় ভাগ)। অতি সহজ একটি কথায় অদ্বৈতবাদীর "নেতি নেতি" ও ভাগবত-বাদীর "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই দুই আপাত পরস্পরবিরোধী বাক্যের মধ্যে সমন্বয় হইয়া গেল যাহা লইয়া বিবর্তবাদী আর পরিণামবাদী শত শত বৎসর ধরিয়া তর্কের ধূলা উড়াইয়াছেন।

এইভাবে দেখা যায় ঠাকুর অদ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণববাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। উপনিষদে সব ভাবই আছে। এখন আমরা তাঁহার উপলব্ধির আলোকে উপনিষদের শ্লোক-

গুলির অর্থ আরো ভালভাবে বুঝিতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-জীবন বিশ্বের এক বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি প্রথমে শাক্তমতে সাধনা করেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন। তারপর এক এক করিয়া পুরাণোক্ত পঞ্চভাবের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করেন। ভারতে প্রচলিত প্রধান চৌষট্টিখানি তন্ত্র অনুযায়ী সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অদ্বৈতমতে সাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মানুযায়ীও তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অভূতপূর্ব সাধনার ফল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী এবং ইহা ভারতীয় সমন্বয়ের ধারাই বহন করে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতে সুলতানী আমলে মধ্যযুগের ধর্মসমন্বয়কারী কয়েকজন সাধক ও সংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দাদু, নানক, কবীর, রামানন্দ, চৈতন্য, একনাথ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযেগ্যে। তাঁহারা প্রচার করিলেন—'হিন্দুর ভগবান ও মুসলমানের আল্লা অভেদ; যে-ই রাম, সে-ই রহিম; হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকো পীর; যে-ই সত্যনারায়ণ সে-ই সত্যপীর'। তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করিলে এবং ভক্তি থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তাঁহারা জাতিভেদ মানিতেন না এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে শিষ্য গ্রহণ করিতেন। এইভাবে তাঁহারা মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের প্রচেষ্টা করেন। যুগে যুগে এই মিলন ও সমন্বয়ের বাণীই ভারত প্রচার করিয়া আসিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সুলতানী ও মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলমান-সমন্বয়-প্রচেষ্টার সাথে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পারস্য প্রভৃতি মুসলিম দেশের শিল্পরীতির সমন্বয় ঘটিয়াছিল এবং মুসলিম যুগের এই সংমিশ্রিত শিল্পরীতি ইন্দোমুসলিম বা ইন্দো-সেরাসেনিক শিল্পরীতি নামে খ্যাত, যেমন ঘটিয়াছিল মৌর্যযুগে হিন্দু-গ্রীক শিল্পের সমন্বয় যা 'গান্ধার শিল্প' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতীয় চিত্রে ও সঙ্গীতে ও মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান রীতির সমন্বয় ঘটে এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যে ইউরোপীয় ধারার সমন্বয় ঘটিয়াছে। ভারতে যুগে যুগে বিভিন্ন প্রকারের সমন্বয় দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় মনীষা প্রধানতঃ সমন্বয়ের মনীষা, ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হইল সকলকে আপন করিয়া গ্রহণ করা। ভারতীয় এই সমন্বয়-মনীষার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটে আধুনিককালে ধর্ম-ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে, আর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, দর্শনে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে।

ইংরেজ আমলে ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে এবং অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতকে খৃষ্টধর্মের হাত হইতে রক্ষাকল্পে রামমোহন প্রতিষ্ঠা করিলেন ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসীক প্রভৃতি ধর্মের মূল গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে ভারতে নবজাগরণের (Renaissance) সূত্রপাত হয়, তিনিই ইহার জনক। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল বুদ্ধির স্তরে (intellectual level)। কিন্তু ধর্মের সমন্বয় দৃঢ়তর হয় যদি উহার ভিত্তি হয় আধ্যাত্মিক-তত্ত্বগুলির উপলব্ধি। ধর্মসমন্বয়ের এইরূপ ভিত্তিই

স্থাপন করিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্মই সত্যই নিজজীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন। ভারতের কয়েক হাজার বৎসরের অধ্যাত্মসাধনার পূর্ণ বিকাশ ঘটে তাঁহার মধ্যে। তিনি এক মহাসমন্বয়কারী যুগাবতার এবং তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয় অধুনা বিবদমান ও পরমত-অসহিষ্ণু মানবসমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে এবং জগতে শান্তিস্থাপনে এক সার্থক ও কার্যকর শক্তি।

প্রার্থনা

ডক্টর মতিলাল দাশ

মুছিয়ে দাও, দাও মুছিয়ে আমার যত কালো
পথের মাঝে প্রভু, তোমার প্রেমের আলো জ্বালো,
সকল গ্লানি মুছিয়ে দাও তুমি।
কণ্ঠে আমার জাগাও তোমার চির অভয় বাণী
এবার যেন পথে যেতে ভয় কোন না মানি,
চলি তোমার চরণছায়া চুমি॥

দিনে দিনে ছলনারে নিলেম কেবল টানি
সত্য যাহা তাহার খবর কিছুই নাহি জানি,
বেড়াই শুধু বিপথ পানে ঘুরে।
এবার এস হৃদয়স্বামী লও আমারে টানি
বাঁধিয়া লও বেসুরো এই হৃদয়বীণাখানি,
তোমার সুরে, তোমার আপন সুরে—
আপন হাতে বাঁধিয়া লও তুমি॥

স্বামীজী ও তাঁর গুরুভক্তি

স্বামী জীবানন্দ

(তরুণবয়সে স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে উপস্থিত হতেন, তখন ঠাকুর আনন্দে উল্লসিত হতেন, তাঁর মধুর কণ্ঠের গান শুনে সমাধিস্থ হতেন, তাঁকে 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' বলতেন, তাঁকে নিজের হাতে প্রসাদ খাওয়াতেন, ভাল ভাল জিনিস খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, তাঁকে সকলের থেকে বড় আধার ব'লে ঘোষণা করতেন, যত ভাল ভাল উপমা সব তাঁরই উপর প্রয়োগ করতেন। বলতেন: "নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর,—নিরাকারের ঘর! পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, ওর মতো একটিও নাই।)

"এক একবার ব'সে ব'সে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল; কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল!

"অন্যেরা কলসী, ঘটী, এ সব হ'তে পারে; নরেন্দ্র জালা!

ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি—যেমন হালদার পুকুর।

"মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ,—পোনা, কাঠী-বাটা এই সব।

"খুব আধার—অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ।

"নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়।"—('কথামৃত', ৫ম ভাগ পরিশিষ্ট)।

("...নরেন্দ্রের মতো একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না!—যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না!—আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই...।" —('লীলাপ্রসঙ্গ', দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত প্রশংসা. এত স্নেহের অধিকার লাভ ক'রেও স্বামীজীর অহংকারের লেশও দেখা যেত না। অধিকন্তু তিনি প্রতিবাদ করতেন, কখনো মৃদুভাবে, কখনো কঠোর ভাবে।)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন ব্রাহ্মনেতা জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্রের মধ্যে যেরূপ একটি শক্তির উৎকর্ষ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে ঐরূপ আঠারোটি শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ব'লে ঘোষণা করেছিলেন, তখন স্বামীজী সে-কথা মানতে চাননি। মা ভবতারিণীর যন্ত্র ঠাকুর, জগজ্জননী তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বলতেন, মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসে সে-সব প্রতিব'দের উত্তর দিতেন তিনি, তাঁর কথা যে সত্য তা জানিয়ে দিয়ে ভুল দেখিয়ে দিতেন।

(স্বামীজী ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, দিনরাত্রি তাঁকে দেখেছেন তাঁর মন মুখ এক কি না, চরমতম ত্যাগের ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত কি না; তাঁর বিছানার তলায় টাকা রেখে দেখেছেন সত্যই ধাতুস্পর্শে তাঁর হাত বেঁকে যায়, দেখেছেন তিনি পূর্ণভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কথায় ও কাজে তাঁর একটুও অমিল নেই।)

সাধারণতঃ লোকে স্বামীজীকে মহা-বৈদান্তিক যুক্তিবাদী ব'লে জানে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তর্ক করেছেন, তাঁকে

'যাচিয়ে বাজিয়ে' নিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে স্বামীজীর যুক্তিবাদী তার্কিক মূর্তিটিই বেশি উজ্জ্বল। যুক্তিবিচারপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুগে স্বামীজী যেন অসংখ্য যুক্তিবাদীর সমষ্টি-মন নিয়ে তাদের মুখপাত্র হয়ে ঠাকুরের কাছে নানা প্রশ্ন উপস্থাপিত করেছেন এবং সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়েছেন! (শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন নরেন্দ্রনাথকে সর্বোচ্চ আধার বলতেন, তেমনি স্বামীজীরও ছিল অতুলনীয় গুরুভক্তি)

স্বামীজীর গুরুভক্তির কথা স্মরণ করলে মনে পড়ে প্রাচীন কালের সেই সব গুরুগতজীবন মহাপুরুষের কথা যাঁদের গুরুভক্তির বিষয় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে উপনিষদে,পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে। স্বামীজীর গুরুভক্তির কথায় মনে পড়ে গুরুভক্ত উপমন্যু, আরুণি, সত্যকামের কথা; স্মৃতিতে আসে ঐতিহাসিক যুগের বুদ্ধশিষ্য আনন্দ ও আচার্য শঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদের কথা। এঁদের সকলের গুরুভক্তি যেন স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য দেহরূপ আধারে সম্মিলিত! কিভাবে—তা জানা যাবে? তাঁর জীবন পরিক্রমা করলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সামনে রেখে মহাজীবন অনুধ্যান করলে জানা যাবে মহাকাশের সঙ্গে মহাসাগরের মিলন হ'ল কিভাবে! স্বামীজীর ছিল যেমন অসামান্য গুরুভক্তি, তেমনি ছিল অসীম আত্মবিশ্বাস। এই গুরুভক্তি আর আত্মবিশ্বাসের বলেই তিনি লোকোত্তর মহাপুরুষ—যুগনায়ক।

(স্বামীজী ঠাকুরকে দিনে দেখে রাতে দেখে সব রকমে পরীক্ষা ক'রে যখন বুঝেছেন তাঁর ভালবাসার শেষ নেই, সে ভালবাসা কোন প্রতিদান চায় না, সম্পূর্ণ অহেতুকী সে ভালবাসা, যখন জেনেছেন সবাই পরিত্যাগ করলেও তিনি সুখদুঃখের চিরসাথী, তখনই তাঁকে বলেছেন 'LOVE personified'—প্রেমের মূর্তিমান্ বিগ্রহ! তখনই স্বামীজী তাঁর শ্রীপাদপদ্মে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছেন, সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন। উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এই শরণাগতি :

'দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!'
'তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো!'
'যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।'
'ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ॥')

কাশীপুর উদ্যানবাটীর একটি ঘটনা থেকেই স্বামীজীর অগাধ গুরুভক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাসে কাশীপুর উদ্যান-বাটী বিভিন্ন দিক থেকে চিরস্মরণীয়। এখানে গুরুগতপ্রাণ ত্যাগী সন্তানদের শ্রীগুরুর সেবা, ঈশ্বরের আরাধনা, তপস্যা, সঙ্ঘসৃষ্টির বিভিন্ন প্রচেষ্টার নিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তখন বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার-রূপে স্বীকার করলেও তাঁরা ভাবতেন শুদ্ধসত্ত্ব শরীরে ঠাকুরের ব্যাধি লীলা ছাড়া আর কিছু নয়, এতে সত্যসত্যই তাঁর দৈহিক যন্ত্রণা হয়, এরূপ মনে করার কারণ নেই। অনেকে মনে করতেন জীবদুঃখে কাতর করুণাময় ঠাকুর পাপী-তাপীর পাপ গ্রহণ ক'রে এই গল-রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু যখন রোগবৃদ্ধি পেল, তখন এঁদের অনেকেই এই বিষয় নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন, ভাবভঙ্গীতেও আত্মরক্ষা ক'রে চলার ভাব দেখাতে লাগলেন। অনেকের মনে সন্দেহও জাগল, হয়তো বা অসাবধান হ'লে তরুণ সেবকদের শরীরে দুশ্চিকিৎস্য দারুণ ব্যাধি সংক্রামিত হ'তে পারে। ত্যাগী সেবকবৃন্দ কিন্তু ঠাকুরের প্রত্যক্ষদৃষ্ট কষ্টকে অস্বীকার করতে পারেননি, তাই তাঁরা

বিতর্কে যোগ না দিয়ে মন প্রাণ ঢেলে গুরু-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

স্বামীজী ছিলেন বিশ্বাসের মূর্তবিগ্রহ, যেন জলন্ত পাবক! দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় তাঁর এমন বিশ্বাস ছিল, যাকে শুধু মানব বা দেবতার মাপকাঠিতে দেখা চলে না, বিচার করাও যায় না। তিনি সকলের ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহের অবসান ঘটাতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। একদিন ঠাকুরের পথ্যগ্রহণের পর পুযরক্তমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হাতে নিয়ে অম্লানবদনে নির্বিকারচিত্তে তিনি পথ্যাবশিষ্ট পান করলেন। সকলের সকল সন্দেহ চিরতরে স্তব্ধ হ'ল। একদিকে ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন, অন্য দিকে অত্যাশ্চর্য গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন—সকলে স্তম্ভিত, বিস্ময়বিমুগ্ধ!

কাশীপুর উদ্যানবাটীর আর একটি ঘটনাও স্বামীজীর অসীম গুরুভক্তির পরিচয় বহন করে। অসুস্থ ঠাকুরের সেবাদির জন্য গৃহী ভক্তগণ প্রয়োজনমত অর্থ দিতেন এবং তরুণ সেবকগণ তা খরচ করতেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবাকার্যে এত তন্ময় থাকতেন যে, অনেক সময় খরচপত্রের ঠিক ঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হ'ত না। এর ফলে যাঁরা টাকা দিতেন, তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে। ক্রমে এমন অবস্থা হয় যখন স্বামীজী অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেয়ে ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করতে বাধ্য হন; তখন কৃপাময় ঠাকুর তাঁকে বলেন, 'তুই আমাকে কাঁধে ক'রে যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানে থাকব।'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে ঘটনাটির বিবরণ
'নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমনি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন, স্কন্ধে তোমায় লইয়া,
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া

যিনি গুরুবাক্যের তাৎপর্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম ক'রে জীবনে রূপায়িত করতে পারেন এবং সেই ভাব অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হন তিনি উত্তম শিষ্য, শ্রেষ্ঠ গুরুভক্ত। 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥' দক্ষিণেশ্বরে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে বলেছিলেন, জীবে দয়ার পরিবর্তে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, সেদিন স্বামীজী ঠাকুরের কথায় অদ্ভুত আলোক দেখতে পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে একে অবলম্বন করা যায়। সেদিন তিনি ভেবেছিলেন, ভগবান যদি কখনও দিন দেন তবে এ সত্য সংসারে সর্বত্র প্রাণপণ প্রচার করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তিনি পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-নির্ধন সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাবাণী, কর্মপরিণত বেদান্তের মর্মকথা শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আদর্শরূপে তাকে গ্রহণ করেছেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবায় নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।'

স্বামীজী শুকদেবের মতো সমাধির আনন্দে ডুবে থাকতে ইচ্ছা ক'রে প্রাণের আকুতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে নিবেদন করেছিলেন। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, 'তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস!' স্বামীজী সেদিন ঠাকুরের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন, দরবিগলিত ধারায় তাঁর অশ্রু নির্গত হয়েছিল! বুঝেছিলেন ঠাকুরের হৃদয় কত মহৎ—'মহতো মহীয়ান্'

তিনি! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় স্বামীজী নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ লাভ করেছিলেন, সেখান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ক'রে জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং বিরাট মহীরুহের মতো অগণিত ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের শান্তির নিলয় হয়েছিলেন, তা সকলেরই জানা। যে স্বামীজী ব্যক্তিগত পূর্ণানন্দের প্রার্থী হয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তী কালে আচার্যরূপে বলতেন—যদি নিজের মুক্তি কামনা কর তা হ'লে মুক্তি সুদূরপরাহত, কিন্তু যদি অপরের মুক্তি চাও তবে মুক্তি হবে অচিরেই করতলগত। কী মহাপ্রাণ তিনি! বজ্রবাণীতে ঠিক শ্রীগুরুর বাণীরই প্রতিধ্বনি!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' 'দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী'। ধর্মজীবন যাপন করতে গেলে খাওয়াপরার সচ্ছলতাটুকুও চাই। তাই স্বামীজীও বলেছেন, 'দরিদ্রদেবো ভব'। স্বামীজী আরও বলেছেন, 'মূর্খদেবো ভব'। এ সব কথায় অপূর্ব তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। যারা রিক্ত, অবহেলিত, অশিক্ষিত, অনুন্নত তাদের প্রতি স্বামীজীর অসীম সমবেদনা। যাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে আছেন, যাঁরা শিক্ষায় সম্পদে উন্নত, তাঁদের লক্ষ্য থাকবে অনুন্নতদের সর্ববিষয়ে উন্নত করবার দিকে, নিজেদের সমান স্তরে তোলবার দিকে।

স্বামীজী লোকশিক্ষক হতে চাননি, কিন্তু ঠাকুর তাঁকে এমন লোকশিক্ষক করেছিলেন যে, সারা বিশ্ব তাঁর বাণীতে তড়িৎস্পর্শ অনুভব করেছিল। তিনি বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিলেন আত্মার অমরত্ব, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব, ঈশ্বরের আবির্ভাবতত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সার্বভৌম মহাভাব ও ধর্মসমন্বয়। তিনি পাশ্চাত্যকে উৎকট ভোগবাদ থেকে বাঁচবার পথ নির্দেশ করেছেন—বেদান্তের মহিমা উপলব্ধি ক'রে আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলেছেন। আবার ভারতকে বলেছেন শিল্প-বিজ্ঞানের অনুশীলন করতে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে বর্জন ক'রে নয়, আত্মোন্নতির প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। দেশের প্রতি ভালবাসা, দেশের উন্নতির জন্য বাস্তবানুগ পথ নির্ধারণ করা ও তার রূপায়ণে প্রচেষ্টা করা, সেই পথে শত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া, সবাই যদি ত্যাগ করে তবু একাই নির্ভয়ে অকপট হৃদয়ে অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি কত কথাই বলেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে চেয়েছেন মনুষ্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি তা স্বামীজীর বাণী থেকে বেশ বোঝা যায়, কারণ স্বামীজীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনের মহাভাষ্য-স্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবনটিই ধর্ম—তাঁর জীবনে পরম সত্যের বিভিন্নভাবে উপলব্ধি ও নব নব আলোকমালায় আধ্যাত্মিক ভাবের অপূর্ব বিচ্ছুরণ। আবার তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি স্বামীজীর মধ্যে সঞ্চারিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি: 'যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হ'লে ফিরে যাবি।' সেই কাজ স্বামীজী কী প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে করছেন, সারা দুনিয়াটাকে নাড়া দিয়েছেন, দেখেছেন মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, জানিয়ে দিয়েছেন তাকে সে শক্তি জাগাবার উপায়; ধর্ম শুধু কথায় নয়, তার রূপায়ণ হবে চিন্তায়, অনুভূতিতে, চালচলনে, প্রতিটি কর্মে, জীবনটাকেই ধরে রাখবে ধর্ম—শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবনে স্বামীজী নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে তাঁর উদার মহাভাব, প্রকৃত ধর্মভাব জগতের সামনে তুলে ধরেছেন অভিনবরূপে। এই হ'ল তাঁর গুরুভক্তি।

যিনি শ্রীগুরুর কাজে হৃদয়ের প্রতিটি শোণিতবিন্দু পাত করেছেন, তাঁর গুরুভক্তির পরিমাপ করবে কে?

স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যেতেন। বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয়নি। ধন্য তাঁর গুরুভক্তি! কী জলন্ত বিশ্বাস! বলেছেন—তারকা চর্বণ ক'রব, সবলে ত্রিভুবন উৎপাটন ক'রব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণের দাস।

> 'কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ।
> কিং ভোঃ ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥'

বলেছেন—যদি কিছু সারগর্ভ কল্যাণবাণী তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়ে থাকে, তবে তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং যদি তিনি অসার কিছু ব'লে থাকেন তা তাঁর নিজের। স্বামীজী অসার তো কিছু বলেননি, তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কথা কেন, প্রতিটি নিঃশ্বাসই জগতের কল্যাণের জন্য! বলেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তি হয়েছে জগদ্ব্যাপী, অন্যান্য লোকেও তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হবে, তাঁর কৃপা এ দুনিয়ার সকল নরনারী তো পাবেই, অন্য লোকেও গিয়ে পৌঁছুবে তাঁর কৃপার প্রভাব। ভারতবাসী যদি তাঁর চিন্তা করে তবে সর্ববিষয়ে মহত্ত্ব লাভ করবে নিঃসন্দেহে। স্বামীজী আরও বলেছেন—'যে তাঁর পূজা করবে সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে—মেয়ে বা পুরুষ।' 'Sri Ramakrishna, the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low'—শ্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতির উদ্ধারকর্তা, জনসাধারণের উদ্ধারকর্তা, উচ্চ-নীচ সকলের উদ্ধারকর্তা। 'ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজোয় সকলের অধিকার। যে ঘটস্থাপন বা প্রতিমা ক'রে তাঁর পূজা করবে—মন্ত্র হোক বা না হোক—যেমন ক'রে যে-ভাষায় যার হাত দিয়ে হোক—খালি ভক্তি ক'রে যে পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে।' 'যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের —গরীব-গুরবো, পাপী-তাপী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।'

শ্রীভগবানের নরলীলার সহচর অখণ্ডের ঋষি স্বামীজীর গুরুভক্তির স্মরণে মননে অনুধ্যানে মানুষের শরীর-মনের সর্বপ্রকার বন্ধন-বিমুক্তি আর পরমানন্দ!

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও নবযুগ

শ্রীজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেদিন হইতেই পৃথিবীতে নবযুগ আসিয়াছে। ইহা ঋষিদৃষ্ট অমোঘ সত্য। আমরা সাধারণ মানুষ ইহার মর্মার্থগ্রহণে অসমর্থ। বাহিরের গোলমাল ও অশান্তিতে আমরা ব্যতিব্যস্ত, আবার অন্তরেও শান্তি কিভাবে রাখিতে হয় তাহা জানি না। সেই কারণেই শিবাবতার স্বামীজীর বাণী ধারণা করিতে পারি না।

কিন্তু সামান্য স্থির হইয়া চিন্তা করিলেই আমাদের মনে আর কোন সংশয় থাকে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী এই তিন রূপে একই মহাশক্তির প্রকাশ বাহ্যিকভাবে দক্ষিণেশ্বরে হইলেও ইহা সমগ্র পৃথিবীর জন্যই।

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে জড়বাদ ও তৎসহ জটিলতা প্রাধান্য পাইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার সুবর্ণযুগ আর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে আমাদের চিরন্তন সত্য এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণের পূর্ব হইতেই সে সদম্ভে ঘোষণা করিতেছিল যে, মানবজাতির সব চাহিদা সে মিটাইয়া দিবে। শ্রীরামকৃষ্ণই ইহার উত্তরে বলিলেন, জগতের সমস্ত কিছুই অসম্পূর্ণ, তাহা কখনো মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না, তাহার চাওয়াকে পূর্ণ করিতে পারে না, ঈশ্বরলাভের দ্বারাই মানুষ এই জড়শক্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে এই যে জড়বিকাশ ইহা কি মানুষের অপ্রোজনীয়? ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—না; খালি পেটে ধর্ম হইতে পারে না। শক্তি ও শিবের সমন্বয় আবশ্যক, তাহা দ্বারাই জীবের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে। স্বামীজী আরো স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, পাশ্চাত্যের কার্যোদ্যম বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় চাই। জড়কে চৈতন্যের শক্তিতে জাগাইতে হইবে—চৈতন্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাঁহার অন্তরস্থিত পূর্ণত্বের অমৃতস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে।

সাম্প্রতিক কালের বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় চতুর্দিকেই জড়বাদ-ভিত্তিক এক ধ্বংসাত্মক ভাব জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সত্ত্বেও মানুষ কেন ধ্বংসাত্মক কর্মে ও ভাবে উদ্বুদ্ধ হইল? স্বামীজী তো বলিয়াছেন, ঠাকুরের এই ভাব দেড় হাজার বৎসর চলিবে। দেড় হাজার বৎসরের পটভূমিকায় এই কয়েক বছর অবশ্য কিছুই নয়। ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে স্বামীজীর কথামত ঠিক পঞ্চাশ বছর পরেই। ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়া। স্বাধীনতা আমরা পাইলেও তাহার যোগ্যতা আমরা অর্জন করিতে পারি নাই, উচ্ছৃঙ্খলতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া এখনও ভাবিতেছি। তবে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বাধীনতা আমাদিগকে আর কিছু দিক বা না দিক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিয়াছে—আর দিয়াছে আপন মনোভাব অনুযায়ী কাজ

করিবার স্বাধীনতা, তাহা ভালর দিকেই হউক বা মন্দের দিকেই হউক। ভারত বিনিদ্র হইয়াছে এবং নিদ্রাভঙ্গের পরেই সে তাকাইয়া দেখিল চারিদিকে অন্ধকার। জাতির পৌরুষ যেন নিঃশেষিত হইল স্বাধীনতা-আন্দোলনে, গঠন করিবার কাজে সে-শক্তি যেন নাই; এমনকি, অন্যায়কে বাধা দিবার শক্তিও নাই। সে জন্যই এক পুরুষ ধরিয়া একদল পরম আক্রোশে যেন সব কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিতে চাহিতেছে, আর আমরা নিতান্ত 'বেশ-আছি' থাকার দল ভাবিতেছি, আমাদের দিন শেষ হইয়াছে, এ জাতি আর বাঁচিবে না!

ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। ধ্বংস-লীলায় আমরা যত মাতিয়া উঠিতেছি আমাদের অন্তরে সৃষ্টির বীজও তত তাড়াতাড়ি উপ্ত হইতেছে। 'গেল—গেল' ধ্বনির মধ্যে আমরা আর একটি ধ্বনি স্বাভাবিক ভাবেই তুলিতেছি, 'পথ কোথায়?' পথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, পথ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীতে। ত্রিধা প্রকাশিত এই মহাজীবনে যে পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই পথই নব যুগের পথ—নূতন জীবনের পথ। সব জাতির, সব ধর্মের, সব দেশের মানুষই নিজস্বতা বজায় রাখিয়া চলার পথে নবালোক পাইবে এ জীবন হইতে।

ব্যস্ততার অহমিকায় যাহারা 'গেল—গেল' ধ্বনিতে সরব হইয়াছেন, তাঁদের নিকট এই কথাই বলিতে হইবে,—আপনারা সম্মুখে আলোকিত পথ দেখিয়াও উৎসাহের সহিত সে পথে চলিতে চাহেন নাই। মনে হয় ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে এ পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই।

প্রথম কাজ নিজের জীবনকে আগে এ আদর্শে গঠন করা; সেই সঙ্গে এ যুগের বাণী আপামর সকলকে দিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর নির্দেশমত মানুষকে ভগবানজ্ঞানে সেবা করিতে শেখা ও শেখানো। এই ভাবেই অশুভ চিন্তার বিরুদ্ধে সব শুভ-শক্তিকে সংহত করা সম্ভব।

আপামর-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের কথা কবে বলিয়া গিয়াছেন স্বামীজী পূর্বের তুলনায় এখন বিদ্যালয়—প্রাথমিক মাধ্যমিক, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের অনেক বেশী সংখ্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত শিক্ষায়তনেই শিবহীন জ্ঞানযজ্ঞ চলিতেছে। এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিঃসন্দেহে অতি শীঘ্র শিবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানসমূহে পুস্তক শিক্ষক গৃহ ইত্যাদির সহিত ভারতের জীবনাদর্শকে, ত্যাগ ও সেবার আদর্শকে, সত্য ঈশ্বর-বিশ্বাস ও পবিত্রতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ছাত্রগণের সম্মুখে যুগপুরুষ হিসাবে স্বামীজীকে রাখিতে হইবে—জনসেবা, সমাজসেবা, শিক্ষা, সাম্য, প্রভৃতি সব আদর্শেরই যুগোপযোগী শ্রেষ্ঠ রূপ যাঁর জীবন ও বাণীতে মূর্ত।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও সমাজে এই সব কল্যাণ-ভাব প্রচারের দায়িত্ব আমাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে রাজনীতির প্রশ্ন নাই, জীবনগঠনের প্রশ্ন। 'গেল—গেল' ভাব লইয়া জড়বৎ বসিয়া না থাকিয়া জাতির সেবাকাজে নামিতে হইবে। কাহারো উপর দোষারোপ না করিয়া, কাহারো মুখ চাহিয়া বসিয়া না থাকিয়া ভাবিতে হইবে ইহা আমারই দায়।

অনেকে প্রশ্ন তুলিবেন, ইহা অতি ব্যাপক কর্ম এবং ইহার বাস্তব রূপায়ণে বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। স্বামীজী বলিয়াছেন, জগতের ইতিহাস কয়েকটি সার্থক মানুষের ইতিহাস

কয়েকজন মাত্র সর্বান্তঃকরণে কাজে নামিলেই ঐ ব্রত সুসম্পন্ন হইবে। যদি অন্য কোন সুযোগ না থাকে, নিজের গৃহেই এবং পাড়ায় বা গ্রামে আমরা স্বামীজীর বাণী পাঠ আলোচনা ইত্যাদি চালাইতে পারি। ক্ষেত্র সীমিত হইলেও আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জীবনে উহা ফুটাইয়া তোলা এবং সুযোগের অপেক্ষা করাও তো সাধনা। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকিলে অবশ্যই সুযোগ আসিবে। জগতের দ্বারে দ্বারে স্বামীজী একাই অগ্রসর হইয়াছিলেন; তাঁহার সেই মর্মস্পর্শী বাণী, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে আমি আমার বুকের রক্ত তিল তিল দিচ্ছি—তোরা আমার একটুও সহায় হবি না?" এ বাণী কোন বিশেষ দেশ বা জাতি বা ধর্মের নয়, সর্বজনীন। এ বাণী কেবলমাত্র কোন ব্যক্তিকে বলা নয়, এ বাণী এক চৈতন্য সত্তার আবাহনে অপর চৈতন্য সত্তার জাগরণের বাণী। সহস্রের মধ্যে একজনও এ বাণী শুনিলে চলিবে। ভগবান আমাদের সহায়, বিন্দুমাত্র ভয় নাই। বিশ্বকল্যাণকামী স্বয়ং স্বামীজী আমাদের সহায় হইলে সত্যের জয় হইবেই। স্বামীজী সূক্ষ্ম শরীরে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য কত আশা লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন!

যে মানুষ হইবার জন্য, অপরের সেবার জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়া আত্মত্যাগ ও সেবার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইবে, স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, তাহার বক্ষে মহাশক্তি জাগিবে, তাহার কণ্ঠে মা সরস্বতী বসিবেন। বর্তমান নেতিমূলক ভাবে সন্ত্রস্ত না হইয়া এ সত্যসাধন-যজ্ঞে নিজে ব্রতী হইতে হইবে এবং অপরকে ব্রতী করাইতে হইবে। যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা নবযুগ নবভাব হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ভাব হইতেই আমাদের আশঙ্কার উদ্ভব। অন্তরের সঙ্গে যিনি নবযুগকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিবেন, তিনি অবশ্যই স্বামীজীপ্রদর্শিত পথে জনসেবাযজ্ঞে ব্রতী হইবেন। মুখে ব্যস্ততা দেখাইয়া অন্তরে 'বেশ-আছি' মনোভাব লইয়া বসিয়া থাকা স্বামীজীকে মানা নয়, আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

স্বামীজীর ভাবপ্রচারের কথা বলার উদ্দেশ্য অন্ধভাবে কোন ব্যক্তিত্বের পূজা নয় (যদি হইতও বা, অন্ধভাবে বিদেশের কোন ব্যক্তিত্বের পূজা অপেক্ষা তাহা সহস্রগুণ শ্রেয়); চোখ মেলিয়া চারিদিকে নিজে তাকান, স্বদেশের বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সব জনকল্যাণকামী মহামানবগণের চিন্তা ও জীবন তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন; দেখিবেন, এ যুগে স্বামীজীর চিন্তাই এ বিষয়ে সর্বাধিক উজ্জ্বল, সর্বাধিক কল্যাণবর্ষী জনসেবার পথে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও স্বামীজীর বাণীই নবযুগের বাণী।

লীলা

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

সৃজনের কোন্ সেই প্রথম উষায়
এক যবে বহু হল আনন্দ-লীলায়,
সেই ক্ষণ হতে
যাত্রা যার হল শুরু
অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের স্রোতে,
অবিরাম ভাসিতে ভাসিতে কোন্
অলক্ষ্যের পানে
নিরন্তর চলেছে সে
কী অলঙ্ঘ্য টানে!
জন্ম-মৃত্যু সত্তা তার করে না খণ্ডিত,
নাম-রূপে বন্দী তবু সে যে রূপাতীত।

কিন্তু এ কি!
অপার্থিব আনন্দ অপার,
অনাদি যে, যে অনন্ত,
অগোচর মন আর সীমিত ভাষার,
সে চেতন সত্তা অনির্বাণ
কেন ভাবে শিশুরূপে পাইয়াছি স্থান
ধরার মায়ের কোলে,
জন্মিয়াছি বিনশ্বর এ জীবন লয়ে?
এ জীবনে কেন জাগে তার অভিমান,
কেন জাগে তীব্র আকর্ষণ?
কেন থাকে ভুলিয়া সে
নামরূপাতীত তার সত্তা অনির্বাণ,
অনন্ত, মহান?
চির-দুর্জ্ঞেয় ইহা। শুধু বলা যায়,
ইচ্ছা তাঁর, বহু হন আনন্দ-লীলায়।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

বিগত চৈত্র-সংখ্যা, ১৩৭৬, 'উদ্বোধনে' স্বামীজীর অনুবাদ-গ্রন্থ 'শিক্ষা' প্রসঙ্গে লিখেছিলাম যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে এ বইয়ের ১৯১৭ সালের একটি সংস্করণ দেখেছি। সম্প্রতি শ্রীসুনীলবিহারী ঘোষ ও শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্কলিত অতি মূল্যবান পুস্তিকা "বিবেকানন্দ গ্রন্থপঞ্জী"-তে (বাক্-সাহিত্য প্রকাশিত) আরো আগের একটি সংস্করণের উল্লেখ পেয়েছি। বইটি গ্রন্থপঞ্জীতে এইভাবে তালিকা-ভুক্ত—শিক্ষা : শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯১৫, ০.২৫। অবশ্য বইয়ের মূললেখক হিসাবে স্বামীজীরই নাম আছে।

১৯১৫ সালের এ বইটি জাতীয় গ্রন্থাগারে পাইনি। কিন্তু উক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত যে বইটির কথা আছে, সেটিকে বলা হয়েছে ২য় সংস্করণ, ১৯১৭, ১৪ পৃষ্ঠা (এটি স্পষ্টত: মুদ্রণ-বিভ্রাট, বইটি আসলে ৬৪ পৃষ্ঠা) এর দাম ০.৫০। জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৯১৭ সালের বইটির প্রচ্ছদে লেখা আছে-শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত : বসুমতী ইলেকট্রিক মেসিন যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বাস্তবিক, এই সংস্করণটির ছাপা অতি সুন্দর।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, উক্ত গ্রন্থপঞ্জীর সঙ্কলয়িতাদ্বয় ১৯১৭ সালের বইটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ বলছেন কেন? জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বইটিতে কোথাও একথা নেই। ১৯১৫ সালের বইটি যদি তাঁরা দেখে থাকেন, তাহলে সেটিই যে প্রথম সংস্করণ এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত হলেন কেমন করে? বরং, নানা কারণে এ কথাই মনে হয় যে, বইটি স্বামীজীর জীবৎ-কালে (এমন কি খুব সম্ভব তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের আগে) ছাপা হয়। কিন্তু সে যাই হোক, ১৯১৫ এবং ১৯১৭—এ দুই সংস্করণেরই মুদ্রাকর পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আর বইটি যে খুবই জনপ্রিয় তার প্রমাণ এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটি সংস্করণ এবং ১৯১৭-র সংস্করণটিতে দ্বিগুণ মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে সমান প্রচার।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের যে সংস্করণটি আমরা পেয়েছি তার প্রচ্ছদে লেখা—শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ, বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৬৬ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকরের নাম আখ্যাপত্রের (title page-এর) দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—শ্রীশশিভূষণ দত্ত, এই পৃষ্ঠায়ই দামের উল্লেখ—বারো আনা।

বইটি 'শিক্ষা'-সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক রচনা বলে ধরে নিয়েই প্রকাশক ও পাঠকেরা এতদিন নিশ্চিত ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা নিয়ে যাঁরা এতাবৎকাল আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউই এই বইটির উল্লেখও করেননি। অপরপক্ষে অনুবাদ হলেও বিশ্বসাহিত্যে শিক্ষাচিন্তার একটি অমর গ্রন্থের অনুবাদরূপে এবং স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার বিবর্তনে এ গ্রন্থের বিশিষ্ট ভূমিকার দিক থেকে আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থটি আমাদের অপরিসীম ঔৎসুক্যের কারণ।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের নাম—Education : Intellectual, Moral and

Physical. বসুমতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' গ্রন্থটির[১] সূচনায় একটু পার্থক্য লক্ষণীয়—শিক্ষা: শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। স্পেন্সার যেখানে শারীরিক শিক্ষাকে শেষে স্থান দিয়েছেন, এ অনুবাদ-গ্রন্থের নামে সেখানে 'শারীরিক' শব্দটি আগে স্থান পেয়েছে। কিন্তু অধ্যায়-বিভাগে মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক পর্যায়টি ঠিকই বজায় আছে

বসুমতী-সংস্করণে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক—এই পর্যায়ে 'শিক্ষা'কে দেখবার প্রচেষ্টার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার নিগূঢ় মিল লক্ষণীয়। স্পেন্সার শারীর চর্চাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করলেও তাঁর গ্রন্থে সর্বশেষে আলোচনা করেছেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি চরম ঔদাসীন্যই দেখিয়েছেন। অপর পক্ষে স্বামীজীর চিন্তাধারায় জ্ঞানলাভের যন্ত্ররূপ এই দেহের সুস্থতা ও সবলতার কথা সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। আপন স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজী যথেষ্ট সচেতন হ'লেও স্বল্পজীবনসীমায় বিপুল কর্মভার তাঁর অকাল প্রয়াণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিজের এবং অনুগামী গুরুভাই ও শিষ্যবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে পূজ্যপাদ ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজকে যাঁরা জীবন-সায়াহ্নেও শারীরচর্চার প্রচেষ্টারত অবস্থায় দেখেছেন, তাঁরাই এ বিষয়ে স্বামীজীর আদর্শের কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত: স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবনের একটি অপূর্ব স্বপ্নকথা উল্লেখযোগ্য। "একদিন ভোর রাত্রে অখণ্ডানন্দ স্বপ্নে দেখিলেন, স্বামীজী বহরমপুরের রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের ভাষায়: দেখলুম, স্বামীজীর প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকীরের দেহ—কোমরে লোহার শিকল, পরনে আলখাল্লা, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা, তার মাথায় একটা লোহার বল, সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে সেইটি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন সঙ্গে চারজন শিষ্য। জিজ্ঞেস করলাম, এ রকম বেশ কেন? বললেন, 'এরকম শরীর নইলে কাজ ক'রব কি ক'রে? তোদের বাংলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে; জানলি?—আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদার ভাব ছড়াচ্ছি। তাই এদের ফকীর সেজে এদের সঙ্গে মিশি।' জিজ্ঞেস করলুম—ওরা কারা? এক এক ক'রে চারজনকে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'ইরান, তুরান, খোরাসান, আফগান।' 'ওদের দিয়ে তোমার কি হবে?' উত্তরে বললেন, 'এই রকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।' আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন তুমি কি করতে চাও?' বললেন, 'যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়, তাই দেখতে চাই। বেদ, মহাভারত পড়ে ত্যাখ্, এরা তোদেরই জাতভাই।' ..." (স্বামী অখণ্ডানন্দ: স্বামী অন্নদানন্দ: পৃ ১৮৫)

প্রিয়তম এই গুরুভ্রাতার অন্তরে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের ধ্যানধারণা কতো গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, ওই দিব্যস্বপ্নে তারই প্রমাণ।

'শিক্ষা'-র শারীরিক আদর্শের আলোচনা আপাতত: শেষ করে আমরা এই অনুবাদ-

১ জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত ১৯১৭ সালের সংস্করণ। পরবর্তীকালে প্রকাশিত শশিভূষণ দত্ত সংস্করণে সূচনায় শুধু 'শিক্ষা' আছে। শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক'—কথাগুলি বর্জিত।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে আসি। What Knowledge is of Most Worth ? (সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি ?)—শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে স্পেন্সার তাঁর সমসাময়িক শিক্ষাচিন্তার পটভূমিতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অনুসন্ধানী।

সাধারণভাবে মানুষ যে বসনের চেয়ে ভূষণের প্রতিই বেশী যত্নশীল সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে সে-যুগের বিদ্যালয়গুলিতে যে ব্যবহারিক বিদ্যার চেয়ে আলঙ্কারিক বিদ্যার প্রতিই বেশী জোর দেওয়া হ'ত, সে কথা স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থের গোড়াতেই বলেছেন। সে-যুগে ইংল্যাণ্ডের বিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যচর্চার (বিশেষতঃ লাটিন ও গ্রীক) প্রাধান্যই বেশী ছিল। অথচ পরবর্তী জীবনে খুব কম ছাত্রই তাদের ব্যবহারিক জীবনে ওই অধীত বিদ্যার দ্বারা উপকৃত হ'ত। সে-কথা মনে রেখে স্পেন্সারের মন্তব্য—"It is not the savage chief only, who in formidable warpaint, with scalps at his belt, aims to strike awe into his inferiors ; it is not only the belle, who, by elaborate toilet, polished manners and numerous accomplishments, strives to 'make conquests'; but the scholar, the historian, the philosopher use their acquirements to the same end. We are none of us content with quietly unfolding our own individualities to the full in all directions ; but have a restless craving to impress our individualities on others, and in some way to subordinate them. And this it is which determines the character of our education. Not what knowledge is of most worth, is the consideration ; but what will bring most applause, honour, respect—what will be most imposing. As throughout life, not what we are, but what we shall be thought, is the question ; so in education, the question is, not the intrinsic value of knowledge, so much as its intrinsic effect on others."[২]

স্বামীজীর অনুবাদ—"কেবল যে অসভ্য দলপতি ভীষণ যুদ্ধ-চিত্রণে সর্বাঙ্গ চিত্রিত করিয়া কটিদেশে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করিয়া নিম্নস্থ লোকদিগের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে, তাহা নহে ; কেবল যে রূপগর্বিতা সুন্দরী ভূষার পারিপাট্য, সামাজিকতার নৈপুণ্য এবং অসংখ্য শোভন গুণের দ্বারা মনোদুর্গ অধিকারের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা নহে ;—কিন্তু পণ্ডিত, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সকলেই আপনাপন গুণসমূহকে একই দিকে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা সকলেই আপনাপন ব্যক্তিগত ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত নহি, অবিশ্রান্তভাবে অপর সকলের মনকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি। এই ইচ্ছাই কোন ব্যক্তি কোন বিষয় শিখিবে, তাহা নির্দেশ করে। এই জন্যই আমরা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা, সম্মান এবং ভক্তি আনয়ন করে, যাহা অধিকতর লোককে বশীভূত করে, তাহাই শিক্ষা করি। যে প্রকার আমরা প্রকৃতপক্ষে কি প্রকার স্বভাবের লোক, তাহা না ভাবিয়া, লোকে আমাদিগকে কিরূপ ভাবে তাহাই অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সেই প্রকার শিক্ষাকার্যেও জ্ঞানের আত্মগত গরিমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া পরপরাভব-শক্তিরই সমাদর করি।"[৩]

২ Education : Spencer : p 4-5 [1st. Edn.].

৩ শিক্ষা : অনুবাদ : স্বামী বিবেকানন্দ : পৃ: ১-২ [শশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত সংস্করণ]।

অধিকাংশ বিদ্যাভিমানীদের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে স্পেন্সার যে নৈপুণ্যের পরিচয় উপরি-উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি কয়টিতে দিয়েছেন, তা স্বদেশ ও বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধারণ মনোভাব বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা যায়। বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য যে আত্মবিকাশ (স্পেন্সারের ভাষায়—unfolding our own individualities), তাকেই স্বামীজী বৈদান্তিক দৃষ্টিতে আরো গভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।" সেই সঙ্গে "ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"[৪] সুতরাং শিক্ষা ও ধর্মের পরম উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। এই আত্মবিকাশের সাধনা কখনো বহিরঙ্গ প্রতিযোগিতার দ্বারা সাধ্য নয়। স্পেন্সার এত উচ্চ আধ্যাত্মিক দিক থেকে না দেখলেও শিক্ষাব্রতীর মূল আদর্শটি ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন।

ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার বিবর্তনে উপনিষদের বিভাগ দুট স্মরণীয়—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ' (মুণ্ডক উপনিষদ্)—'পরা ও অপরা'—এই দুই বিদ্যাই মানবজীবনে আবশ্যিক। 'জ্ঞানার্জন'[৫] নিবন্ধে স্বামীজী এই দুই বিদ্যার প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছেন। বাস্তব জীবন ও পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে মহত্তম আধ্যাত্মিক সত্য অবধি প্রসারিত শিক্ষাচিন্তায় স্বামীজীর যে পূর্ণতা, স্পেন্সারের চিন্তাধারায় আমরা সে পূর্ণতা না পেলেও একটি সামগ্রিক জীবনবোধের ভূমিকা পাই। 'শিক্ষা'র এই সর্বাঙ্গীণ আদর্শকে স্বামীজী পরিণত মননের দ্বারা আরো প্রসারিত এবং গভীর করেছেন।

স্পেন্সারের দৃষ্টিতে—'How to live?—that is the essential question for us. Not how to live in the mere material sense only, but in the widest sense. The general problem which comprehends every special problem is—the right ruling of conduct in all directions under all circumstances. In what way to treat the body; in what way to treat the mind; in what way to manage our affairs; in what way to bring up a family; in what way to behave as a citizen; in what way to utilize those sources of happiness which nature supplies—how to use all our faculties to the greatest advantage of ourselves and others—how to live completely? And this being the great thing needful for us to learn, is by consequence, the great thing which education has to teach. To prepare us for complete living is the function which education has to discharge; and the only rational mode of judging of an educational course is to judge in what degree it discharges such function.'[৬]

"কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ইহাই সকল প্রশ্নের সার। শুদ্ধ ইহার দ্বারা শরীর-ধারণের উপায় উক্ত হইতেছে না, শারীরিক এবং মানসিক সকল সম্বন্ধ ইহার অন্তর্নিহিত আছে। কি উপায়ে সকল অবস্থাতেই অবিচলিত হইয়া আমাদের ব্যবহারে সত্যতা এবং সাম্যরক্ষা করিব?

---

৪ স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য 'কিডি' বা সিঙ্গারভেলু মুদালিয়রকে লেখা ৩রা মার্চ, ১৮৯৫ সালের চিঠি। বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ৪০০।

৫ জ্ঞানার্জন: ভাববার কথা: বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৩৮-৪১।

৬ Education: Spencer: p 8

জগতের অন্য সকল প্রশ্ন এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত। কি প্রকারে শরীররক্ষা হইবে? মনের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কি প্রকারে সাংসারিক কার্য সুসম্পন্ন হইবে? কি প্রকারে সন্তানদিগকে লালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত? সমাজের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? কিরূপে প্রাকৃতিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা মনুষ্যব্যবহারোপযোগী হইবে? মানসিক ব্যবহারসমূহকে কি প্রকারে ব্যবহার করিলে আপনার এবং পরের মঙ্গল সাধিত হইবে? ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষা, ইহাই প্রকৃত শিক্ষা। সম্পূর্ণ জীবনের একটি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য; অতএব যে শিক্ষাপ্রণালী যত পরিমাণে সেই দিকে অগ্রসর হইবে, তাহা তত পরিমাণে উৎকৃষ্ট।"[৭]

এ ক্ষেত্রে "সর্বোচ্চ শিক্ষা" বলতে স্পেন্সার যা বুঝিয়েছেন, ভারতীয় শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট। শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলতে ভারতবাসীর কাছে পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ।" উদ্দেশ্য অনুসারেই বিভিন্ন দেশে শিক্ষাদর্শের পার্থক্য ঘটে।

(ক্রমশঃ)

[৭] শিক্ষা পৃঃ ৮-৯।

বহুরূপে

শ্রীঅপূর্বকুমার কুণ্ডু

অত্যাচারীর শাসনে ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে
তুমিই মূর্ত প্রতিবাদ জানি, কৃষ্ণের অবতারে।
দুঃশাসনের রক্তে ভিজেছে কঠিন পৃথ্বীতল,
গীতার বাণীতে জড়তা ঘুচায়ে এনে দিলে মনোবল।
হিংসামুখর পৃথিবীর বুকে তুমি, তুমি তথাগত,—
তোমার প্রেমের করুণাধারায় হিংসা সে অবনত।
দুষ্ট 'মারের' অশুভ বুদ্ধি মেনেছিল পরাজয়,
মানুষের রূপে ভগবান তুমি, নেই কোন সংশয়।
মানুষ যখন আত্মকলহে নিজেই নিজেতে মগ্ন,
তখনি তোমার পৃথিবীর বুকে এসেছে জনম-লগ্ন।
তাই বুঝি তুমি পৃথিবীর বুকে আসিয়া নতুন করে
শ্রীচৈতন্য, প্রেমের জোয়ারে দিয়েছিলে সব ভরে!
মানুষের ডাকে পৃথিবীর বুকে এসেছিলে বার বার,
কঠিন-কঠোর, কখনো বা হয়ে করুণার অবতার।
এবার এসেছো সারা জগতের মানুষের তরে, তাই
সমন্বয়ের কল্যাণরূপ তোমার মাঝারে পাই।

শিবজ্ঞানে জীবসেবা

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্বেতাঙ্গ দার্শনিকের কথা—দর্শনের ইতি আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ। স্বামী বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তি, 'বিদেশে একটু হৈ চৈ হ'লে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়।' সুতরাং পরানুকরণপ্রিয়, আত্মপ্রত্যয়হীন, পরনির্ভরশীল ভারতবাসীর নিকট শ্বেতাঙ্গ পীতাঙ্গ শ্যামাঙ্গ যে-কোনও পরদেশবাসীর উক্তি অসীম মূল্যবান, প্রমাণ-প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই উক্তিটিও তাহাদের নিকট অভ্রান্ত সত্য।

আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ অজ্ঞাত হইতে পারে, কিন্তু ইঙ্গিত ও অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মত। হিন্দুর বেদান্ত আধ্যাত্মিকতার মিলনভূমি—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির ত্রিবেণী সঙ্গম। তপোবনের সাধনার চরম উৎকর্ষ এই বেদান্ত। প্রাচীন ঋষিগণ শাশ্বত সত্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত এক অতীন্দ্রিয় ভূমিতে তাঁহাদের শুদ্ধ চিত্তে যে 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই বেদান্ত বা উপনিষদ্। অদ্যাবধি মানুষ এই জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই, কখনও পারিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ সকল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য পূর্ণ একত্বের বেশি অগ্রসর হইতে পারে না।

বেদান্ত ভারতের নিজস্ব সম্পদ। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'ভারতে বেদান্ত আছে, কিন্তু কার্যে প্রয়োগ করিবার শক্তি নাই।' ভারতে যেমন আদর্শ প্রেমের সাহিত্য আছে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়ণ নাই। যেমন ভারতে সকল মহাপুরুষই বেদান্তোক্ত আদর্শ—'সর্বভূতে ভগবান', 'সব কিছুই এক ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ', 'সব কিছু সেই এক অনির্বচনীয়, অব্যক্ত সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি,' শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'তিনিই সব হয়ে আছেন'—শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মৈত্রী, আত্মীয়তাবোধ নাই—আছে মহাভেদজ্ঞান, ঘৃণা ও স্বার্থবুদ্ধি। মানুষে মানুষে মহা ব্যবধান। বর্জন, সংকীর্ণতা ও অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। অস্পৃশ্যতা, স্বার্থপরতা, কাপুরুষতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আজ সমাজের মজ্জাগত। ঘরে ঘরে মুখে মুখে পৌরুষের আস্ফালন, ত্যাগের উচ্চ নিনাদ এবং নীতিবাক্যের সমারোহ; কিন্তু জীবনে—নিষ্ক্রিয়তা, কর্মবিমুখতা ও ভীরুতা; যেন সোনার পাতে মোড়া পাথরের মূর্তি। ইহা আসক্তি, ত্যাগ নয়।

দুর্বলের তিতিক্ষা কাপুরুষতা। উপায়হীনের ত্যাগ ত্যাগ নয়, স্বার্থপরতা। আকণ্ঠ ভোগে নিমজ্জিত ব্যক্তির ত্যাগের বুলি—ঘোর আসক্তি, ত্যাগ নয়। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ত্যাগই ধর্ম। 'পথিক যদি গন্তব্য ভুলে পথকেই ভালবাসে, সমাজ যদি মানুষকে ভুলে অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে থাকে', তবে পরিণাম—অনিবার্য ধ্বংস।

যে দেশে মৈত্রেয়ীর মুখে ধ্বনিত হইয়াছিল, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।' যে দেশে কিশোর ব্রাহ্মণকুমার নচিকেতা মৃত্যুদেবতার সম্মুখে অবিকম্পিত চিত্তে, দৃঢ়সঙ্কল্পে অমৃতের সন্ধান চাহিয়াছিলেন, সেই দেশে অন্তরে ভোগলিপ্সা, মুখে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বুলি।

'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'—ইহার সহিত ত্যাগের বাণী মিলিত করিতে হইবে। সব কিছুই জুড়িয়া আছেন ঈশ্বর; সব কিছুর ভিতর দিয়া তাঁহার সহিত মিলনই মুক্তিলাভের একমাত্র উদ্দেশ্য। বৈষম্যই বন্ধনের কারণ, মিলনেই শান্তি, প্রেম ও মুক্তি — অবিরাম গতাগতির হাত হইতে উদ্ধার। পন্থা—'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—আসক্তি দ্বারা নয়, ত্যাগের পথে ভোগ। ত্যাগই নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগই বাধাহীন মিলনের পথ। রবীন্দ্রনাথ ত্যাগকেই নিখিলের সঙ্গে, ভূমার সঙ্গে মিলন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ বৃহত্তর স্বার্থ নয়, সুতরাং ধর্ম নয়। ধর্ম যদি চিত্তশুদ্ধির উপায় হয় এবং একমাত্র শুদ্ধ চিত্তেই সত্য প্রতিভাত হয়, তবে স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে সত্যলাভ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং চাই বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগ এবং ত্যাগের দ্বারা নিখিলের সঙ্গে যোগ, তবেই ভূমার সহিত মিলন ঘটা সম্ভব, আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া সম্ভব। এভাবে সর্বভূতে আত্মীয়তা ঘটিবে। আত্মপর-ভেদজ্ঞান কমিয়া ক্রমে দূরীভূত হইবে।

বেদান্তের বাণী অমৃতের বাণী, অভয়ের বাণী। কাপুরুষতা, দুর্বলতা ও স্বার্থপরতার স্থান ইহার মধ্যে নাই। ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা কখনও অমৃতের পুত্রগণকে আশ্রয় করিতে পারে না। তাঁহারা অভী। অমৃতের ভয় কোথায়? তাঁহারা অনন্ত প্রেমের অধিকারী, সুতরাং তাঁহারা বিশালহৃদয়; সেখানে সর্বভূতে আত্মীয়তাবোধ, অবিনাশী অফুরন্ত আনন্দ। নিরানন্দ সেখানে স্থান পায় না।

মানুষ দুঃখ পায় স্বার্থহানি ঘটিলে। যেখানে স্বার্থ সেখানেই দুঃখ। যেখানে সুখ আছে সেখানে দুঃখও থাকিবে। কারণ সুখ দুঃখ একই অবস্থার দুই দিক। যেখানে সুখ নাই সেখানে দুঃখও নাই। অমৃতের পুত্রগণ সুখ-দুঃখের অতীত—চিদানন্দের অধিকারী।

মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে তবেই অমৃতত্ব লাভ হয়, নিখিলের সহিত যোগ ও ভূমার সহিত মিলন ঘটে। সর্বভূতে আত্মীয়তা-বোধ আসে। ক্ষুদ্র 'আমি' ও 'আমার' চিন্তা বিরাট 'আমি'তে লীন হয়। স্বামীজী ছিলেন অভীঃমন্ত্রের ঋত্বিক্, স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত, অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের সুদিন যখন ছিল, তখন নচিকেতা ও মৈত্রেয়ীর জিজ্ঞাসার উত্তর সহজ সরল পথেই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কোনও হেরফের, ভুল-ভ্রান্তি ঘটে নাই বা বাক্‌চাতুর্য বিচার-বিতণ্ডার বাগাড়ম্বরে সেই সত্য চাপা পড়ে নাই।

সর্ব দেশে সর্ব কালে বিবর্তনের পথে মানুষকে অধিকারিভেদে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী অগ্রগামী হইতে হয়। এই অভ্রান্ত সত্য ভুলিলে পতনের পথ প্রশস্ত হইবে মাত্র। এই সত্য ভুলিয়া ভারত এক অশুভ মুহূর্তে সকল মানুষকে একই মাপের জামা পরাইতে চেষ্টিত হইয়া সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল। ঋষিবাক্যের বিকৃত ভাষ্য করিয়া বসিল। ঐহিক অভাব-অভিযোগ ও অসাম্যকে উপেক্ষা করিয়া দুঃখ-দৈন্যকে ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিল। সকলকে ত্যাগের কথাই শুনাইতে থাকিল। সন্দেহ নাই, অহিংসা ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি অতি উচ্চ আদর্শ; কিন্তু সে-অবস্থায় উঠিতে পারে কয় জন? বুভুক্ষুকে এক মুষ্টি অন্ন না দিয়া অজস্র নীতিবাক্য বর্ষণ করিলে তাহার ক্ষুধার জ্বালা তো মিটিবে না। এই সাধারণ সত্য অগ্রাহ্য হইল। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না

অথবা অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্ম বা সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদই হউক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম নাম দিই না।···যে-ধর্মকে নিজের ধর্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত কর।'

আজ থেকে সার্ধদ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে এই ভারতেই বিশালহৃদয়, পরমকরুণাময়, জীবদুঃখকাতর, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া জনকল্যাণসাধনের শিক্ষা ও ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি জীবের জরা মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি হইতে উদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করিয়া প্রচার করেন। ভারতে এক স্বর্ণযুগ আসে। অষ্টশীল অভ্যাসে বহু জনের চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। বুদ্ধদেবের উপদেশ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তার লাভ করিয়া মানবজাতির প্রাণে আশা ও শান্তির প্রলেপদানে সমর্থ হইয়াছিল। শুধু মাত্র মানুষের মধ্যেই তাঁহার করুণা সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতর প্রাণীরাও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত ছিল না। যদিও এই দেবমানবকে সাধারণতঃ বেদ-অমান্যকারী বলা হয়, তথাপি তাঁহার শিক্ষার মাধ্যমেই বেদের সার বেদান্ত বা উপনিষদের পরম সত্য কার্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই তপোবনের সাধনা - ত্যাগের দ্বারা সর্বভূতে একাত্মবোধ, অমৃতত্বলাভ—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ', বহুতে এক উপলব্ধি - কার্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারই প্রবর্তিত কার্যসূচী অহিংসা, সাম্য ও মৈত্রী কার্যক্ষেত্রে সার্থক প্রযুক্তির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।

'কালস্য কুটিলা গতিঃ' কালের বিচিত্র গতিপ্রবাহে, নব নব তরঙ্গভঙ্গে সকলই বিস্মৃতির অতল গর্ভে লীন হইল। সে সময় আচার্য শঙ্কর আসিয়া আবার অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করিলেন। আবার সব ভুল হইল, যেটুকু টিকিয়া রহিল তাহা যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের রেশের মতো—একটা অস্ফুট ভাবমাত্র। অতঃপর ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন, দিশেহারা - ভবিষ্যতের আশা নাই, বর্তমানও তমসাবৃত। অবহেলিত ঘৃণিত ভারত শুধু অতীত গৌরবের একটা বিকৃত কঙ্কাল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল। যেন ভগবদারাধনায় আড়ম্বর অনুষ্ঠানের বাহুল্য, কিন্তু ভক্তি বা হৃদয়ের স্পর্শমাত্র নাই; মুখে জ্ঞানের কথা, কিন্তু উপলব্ধি নাই; ফলে গোঁড়ামি, কূপমণ্ডূকত্ব, বিকৃত প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক নিগড়ে নিষ্পেষিত ভারত এক বীভৎস আকার ধারণ করিল।

এই পরিস্থিতিতে মানবকল্যাণে ধর্মসংস্থাপন-হেতু, বেদান্তের সত্যকে ভাস্বর করিতে অবতীর্ণ হইলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, সঙ্গে আনিলেন নরঋষি স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ভারতে ধর্ম আমদানির প্রয়োজন নাই। ভারতে ধর্মাদর্শের প্রাচুর্য বর্তমান, অভাব অন্নবস্ত্রের। ঐহিক ভোগের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর ইহার জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শিক্ষা। ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, ভারতের মৌলিক চিন্তার উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। পরানুকরণ পরানুবাদ বর্জনীয়। চাই অস্তিমূলক শিক্ষা, নেতিবাচক শিক্ষা নয়। যে শিক্ষায় মানুষ নিজের পায়ে ভর করিয়া জীবন-সংগ্রামের সামর্থ্য অর্জন করিতে সমর্থ হয়, চাই তেমন শিক্ষা। নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেরই শিক্ষা চাই - বিশেষ যাহারা দারিদ্র্যের কঠোরতায় শিক্ষালয়ে গিয়া শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের ঘরে ঘরে গিয়া

শিক্ষাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সঞ্জীবনীমন্ত্রে ভারতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, আর এই নবজীবন পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিবার কঠোর কর্তব্যভার ন্যস্ত করিলেন উপযুক্ত লীলাসহচর যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের উপর। শ্রীরাম-কৃষ্ণ সর্বপ্রথম বলিলেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' স্বামীজী এই জন্য কিছু ঐহিক ভোগের ব্যবস্থার প্রয়োজন সর্বাগ্রে অনুভব করিলেন। অনুভব করিলেন, এই প্রয়োজন মিটাইতে চাই সংঘবদ্ধ কর্ম এবং সঠিকভাবে এই কর্মসাধনে মাত্র তাহারাই সক্ষম, যাহারা নিঃস্বার্থ এবং ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন অর্ধবাহ্যদশায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'জীবে দয়া' প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' অনেকেই ইহা শুনিলেন কিন্তু ইহার সারমর্ম উপলব্ধি করিলেন একমাত্র স্বামীজী। তাঁহার হৃদয় নবালোকে উদ্ভাসিত হইল এবং তাহারই পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ, যার মূলমন্ত্র 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।' 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কর্মে পরিণত বেদান্ত, চিত্তশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা নবীন যুগের এক নবীন বাণী—সহজ সরল অথচ গভীরতাৎপর্যপূর্ণ। পরোপকার নয়, মানবকল্যাণমাত্র নয়, স্বর্গাদিলাভের আকাঙ্ক্ষা নয়, দয়াদাক্ষিণ্য নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা, ভগবদারাধনা, আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি করিবার সাধনা—নিঃস্বার্থ কর্ম।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যাহার বীজ উপ্ত, বরাহনগর মঠবাড়িতে যাহার অঙ্কুরোৎগম, ১৮৯৭ খ্রীঃ মে মাসে তাহারই লোকসমাজে আত্মপ্রকাশ। আরম্ভ হইল এক নূতন সাধনা —শিবজ্ঞানে জীবসেবা। ভারত সংঘবদ্ধ নিঃস্বার্থ কর্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। সংঘবদ্ধ নিঃস্বার্থ কর্ম উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইলে দেশের ও দশের যে অশেষ কল্যাণ সাধন সম্ভব তাহা ভারতবাসী শিখিল। সংঘের প্রধান অবদান—ভারতের সুপ্ত আত্মচেতনা ও লুপ্ত আত্মপ্রত্যয় পুনরুদ্ধার ; ভারতবাসীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা ভুলিয়া অভীঃমন্ত্রে দীক্ষালাভ ; নীচতা ও স্বার্থপরতা পরিহার—বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগ শিক্ষা।

পৃথিবীর সর্বত্র পূর্বাপর নানা প্রকার জন-কল্যাণ সংস্থা বর্তমান। কিন্তু এইরূপ ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজার ভাব লইয়া, যাহার সেবা করিতেছি তাহাকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজেকে তাহার নিম্নে রাখিয়া সেবা করার ভাব আর কোথায় আমরা দেখিয়াছি? রাষ্ট্রের অনুমোদন ও জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত বৃহৎ পরিকল্পনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় ও কার্যের সাবলীল গতি ব্যাহত হয়। সংঘের কার্যদক্ষতা, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, পরহিতচিকীর্ষা, আত্মপরভেদরাহিত্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের লোক-কল্যাণার্থে নিঃস্বার্থ সেবা চিত্তশুদ্ধিরই প্রয়োজনে, ইহা কোন উদ্দেশ্যমূলক নয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'কাজলের ঘরে থাকলে তুমি যত সেয়ানাই হও না কেন, গায়ে ছিটে ফোঁটা কালি লাগবেই।' সৎ ও পবিত্র হইবার যত চেষ্টাই করি না কেন, মানুষ যতক্ষণ সংসারে আছে তাহার কিছু স্বার্থ থাকিবেই।

সুতরাং পরোপকার, জনকল্যাণ সৎকর্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র ত্যাগী কর্মী ব্যতীত শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে সদা উজ্জ্বল করিয়া রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের

সাধারণ মানুষের জন্যও এ আদর্শ। আমাদিগকেও ইহা জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—সমাজসেবা, রাষ্ট্রসেবা প্রভৃতি সর্ববিধ কর্মেই। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-ই যুগধর্ম। স্বামীজী নবযুগের সামনে এই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ সংঘ গড়িয়া গিয়াছেন এ আদর্শের শিখাকে অনির্বাণ রাখিবার জন্য।

স্বামীজী বলিয়াছেন: আমি দিলাম, এখানেই উহা শেষ। আমার মন, আমার শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর কিছু নয়।…যথার্থ উপকারের প্রেরণা সহস্র বৎসর পরেও ফলবতী হয়। বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্রের মতো ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকে সংবাদপত্রের শিরোনামার সমারোহ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ করিলেও উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবেই।

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পুনর্জন্ম ও মুক্তি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ

পুনর্জন্ম-বাদ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এমন একটি সর্বজনসম্মত গভীর বিশ্বাস যে, আজ পর্যন্ত হিন্দুমনে ইহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ। এই মতের সিদ্ধান্তগুলি অন্ধ-বিশ্বাস বা কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক-নীতি (dogmatic faith)-মূলক ভিত্তির উপর গঠিত নয়; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং যুক্তিকেও তুষ্ট করে। ভারতের নিজস্ব সম্পদ থাকিয়াও জগতের দর্শন-সাহিত্য-ভাণ্ডারে ইহাকে একটি অমূল্য দান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুনর্জন্মের ধারা জ্ঞাপন করিতে হইলে তাহার মূল বেদান্ত দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বেদান্ত দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা। এগুলিকে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়।

বেদান্ত দর্শনে সত্যদ্রষ্টাদের উক্তিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ (axiom)-রূপে অঙ্গীকার করিয়া লওয়া হয়। যথা, বিশ্বের কোনও আদি বা অন্ত নাই; পর্যায়ক্রমে "প্রলয়" ও "সৃষ্টির" প্রবাহ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং ইহার নিমিত্ত-কারণ বা মূল অধিষ্ঠান সেই সর্বব্যাপী শুদ্ধ-চৈতন্য পরম-ব্রহ্ম। যোগশাস্ত্রে ইহাকেই পরমাত্মা বলে। তিনি স্বপ্রকাশ "সচ্চিদানন্দ"—সৎ অর্থাৎ নিত্য, তিন কালেই একভাবে স্থিত। তিনি চেতনস্বভাব ও আনন্দস্বরূপ। ইহা ছাড়া তিনি নির্গুণ, অখণ্ড ও একরস (homogeneous), এবং তাঁহার তুল্য না থাকায় "ইতি বাচক" উপমা দিয়া তাঁহাকে বোঝানো যায় না। তাঁহাকে বোঝানো যায় একমাত্র নিষেধোপদেশে—"নেতি নেতি"—এইরূপ নয়, এইরূপ নয় (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৯।২৬) বলিয়া নির্দেশ দেওয়াই সম্ভব। তিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন বলিয়া জগতের মূল কারণ হইয়াও সৃষ্টিতে প্রকৃষ্টভাবে তাঁহার কোনও ক্রিয়া নাই। সমস্তই ব্রহ্মের অব্যক্ত মায়াশক্তির অভিনয়। সে শক্তি অপরিসীম এবং মায়া, প্রকৃতি, মূলাবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এমন কোনও কার্য নাই যাহা এই শক্তির পক্ষে অসম্ভব, তাই ইঁহাকে "অঘটনঘটনপটীয়সী" বলে। তবে ইঁহা ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলিয়া ইঁহার পরমার্থতঃ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ইহাকে "জড়" বলিয়া নির্দেশ করা হয়। জড়ের নিরপেক্ষভাবে কিছু করিবার সাধ্য নাই, চেতনের সংসর্গ পাইবার পরই নিজের কুহক দেখাইতে পারে। তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তমের সংমিশ্রণে ইহা গঠিত, তাই ইহাকে "ত্রিগুণাত্মিকা" বলা হয়। ইহাদের মধ্যে সত্ত্বের কার্য প্রকাশ ও শান্তি; রজের কর্মসম্পাদন ও বিক্ষেপ; এবং তমের আবরণ ও প্রমাদ। এই তিন গুণের তারতম্যেই সৃষ্টির বিকাশ ও বিচিত্রতা। জগতের কোনও বস্তুতেই এই তিনের একটিমাত্র অংশ বিশুদ্ধভাবে থাকে বলিয়া স্বীকৃত হয় না, প্রত্যেকটিতেই ন্যূনাধিক সংমিশ্রণ থাকেই। গীতার ১৮।৪০ শ্লোকে একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে :

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥"

বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়াশক্তির একত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইরূপে বস্তুতঃ একই সত্তা হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত" ও "উপাদান" উভয় কারণ বলিয়াই গৃহীত ব্রহ্মসূত্রের ১।৪।২৩-২৯ সূত্রে ইহার বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়।

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণের নিরূপণ করিয়া এবার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চর্চা করিব। উপরি-উক্ত শুদ্ধ-চৈতন্য ব্রহ্ম যখন নিজের মায়া-শক্তি প্রয়োগ করেন না, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্য (equilibrium) থাকে তখন দৃশ্যমান জগতের সম্পূর্ণ অভাব প্রত্যয় হয়, ইহাকেই "প্রলয়" কাল বলে; এবং যেহেতু ব্রহ্ম স্বভাবতঃ শান্তধর্মী তাই ইহাই প্রকৃত স্থিতি। ইহা সত্ত্বেও "চেতন-স্বরূপ" ব্রহ্মের ঈক্ষণ অর্থাৎ বিচার ও সংকল্পের ক্ষমতা অবশ্য স্বীকার্য। ঈক্ষণ করিয়া তিনি যখন নিজ শক্তি-প্রয়োগের সংকল্প করেন সেই মুহূর্তেই সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের যে সাম্যাবস্থা ছিল তাহা ভঙ্গ হয় ও চেতনের এই ইঙ্গিত পাইয়া প্রকৃতি নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। প্রকৃতির এই ক্রিয়াশীলতাকেই বলা হয় যে, ব্রহ্ম মায়ার উপাধি ধারণ করিয়াছেন। এই স্থিতিতে সেই সম্পূর্ণ নির্গুণ নিরুপাধি ব্রহ্ম সত্ত্বগুণ-প্রধান "মায়োপাধি" ব্রহ্ম, "পরমেশ্বর" নামে অভিহিত হন। মায়া তাঁহার নিজস্ব শক্তি বলিয়া তাঁহার অধীন, এবং মায়ার অধীশ্বর এই সগুণ ব্রহ্ম "মায়াধীশ"। আগেই বলা হইয়াছে যে, মায়ার শক্তি অসীম, তাই মায়াধীশ ঈশ্বরের কার্যকরী ক্ষমতাও নির্গুণ ব্রহ্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই উপাধিতে তাঁহার সর্ব ঐশ্বর্য, সর্বধর্ম, সর্বযশ, সর্বশ্রী, সর্বজ্ঞান ও সর্ববৈরাগ্য থাকে, বস্তুতঃ সর্বপ্রকার গুণের চূড়ান্ত বিকাশ, এবং তিনিই জগতের সৃষ্টি, পালন, নিয়মন ও সংহারের কর্তা। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার ভিতর অনুপ্রবেশ করিয়াছেন ও দৃশ্যমান জগদ্রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ"। (২।৬।১)। অতএব নিরুপাধি অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়-কালে যিনি সম্পূর্ণ অরূপ ও অবর্ণনীয় থাকেন তিনিই মায়োপাধি ধারণ করিলে জগদ্রূপে প্রতীয়মান হন। বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন – "যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্তমেতদ্ জ্ঞানাত্মনস্তব"—অর্থাৎ মূর্তরূপে যাহা কিছু দেখা যায়, হে জ্ঞান-স্বরূপ, সে-সমস্ত আপনারই রূপ (১।৪।৩৯)। বলিতে পারা যায় যে, তত্ত্বতঃ ঈশ্বর কোনও বিশেষ ব্যক্তিরূপধারী পুরুষ নন, তবে সাকার উপাসনার সময় তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রভৃতি রূপে স্মরণ করা হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রলয় বা সৃষ্টিকালে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় সদ্বস্তু নাই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এ সমস্তই ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১)। এই বোধ অনুযায়ী ইহাকে "অদ্বৈতবাদ" বলা যুক্তিযুক্তই হয়।

পুনঃ উপরি-উক্ত সেই নিরুপাধি পরমাত্মাই আবার যখন প্রকৃতির রজ-তম-প্রধান "অবিদ্যা" নামে পরিচিত গুণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ধারণ করেন তখন তাহাকে "জীবাত্মা" বলা হয়। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সমস্তই জীব বলিয়া গণ্য এবং গুণের তারতম্যে ইহারা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা (১) দেব, অবিদ্যার সত্ত্ব-গুণাংশের প্রাবল্যে; (২) মনুষ্য, সত্ত্ব ও রজ-তমের সামঞ্জস্যে; এবং (৩) তির্যক, রজ-তমের প্রাধান্যে।

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নিজ মায়ার কার্যে কোনও-

রূপে লিপ্ত হন না. কিন্তু অল্পজ্ঞ জীব প্রকৃতির ইন্দ্রজাল ভেদ করিতে পারে না এবং অহংকার-বশতঃ নিজেকে স্বাধীন কর্তা মনে করিয়া, বস্তুতঃ যাহা প্রকৃতির ক্রিয়া তাহার ফল ভোগ করে। ভগবান বলিয়াছেন :

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥"

(গীতা, ৩।২৭)

—অর্থাৎ প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কর্মসকল সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ হইলেও অহংকারে বিমোহিত জীব 'আমি কর্তা' এইরূপ মনে করে।

কর্ম বেদান্তশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ, এবং বিশেষতঃ সেই ক্রিয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয় যাহাতে ফলোৎপাদনের শক্তি আছে। ফলের অভিলাষী হইয়া পুরুষকারের প্রেরণায় কার্য করিলে অর্থাৎ অন্যের দ্বারা নিয়োজিত না হইয়া অন্তঃকরণের স্বাধীন নির্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই ফল উৎপন্ন হয়—'আমি করিতেছি' এইরূপ মনোভাবের কার্যই প্রকৃত কর্মশব্দবাচ্য এবং সে কর্মের ফলও অবশ্যম্ভাবী, আর ফল উৎপন্ন হইলে ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয়ও যুক্তিযুক্ত হয় না। বলা হইয়াছে যে,

"মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥"

—কর্মসমূহ যদি অভুক্ত অবস্থায় শতকোটি কল্পও অবস্থান করে, তথাপি সে-সমুদায়ের ক্ষয় হয় না। তাহা হইলে দেখা যায় যে, কর্ম-জনিত ফলই বন্ধনের একমাত্র হেতু এবং কর্মফলভোগ শেষ না হইলে মুক্তি নাই। ভক্তিমার্গের সাধকেরা এই মতের বিপক্ষে বলিয়া থাকেন যে, অন্য উপায়েও ইহা সম্ভব, ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারিলে "ইচ্ছাময়" অব্যাহতি দিয়া থাকেন। অবশ্য আসক্তি-বিহীন হইয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে তাহা কোন বন্ধনেরই হেতু হয় না। গীতায় শ্রীভগবান ইহা বলিয়াছেন।

যাহা হউক, এইরূপ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও ইহা নিশ্চয় যে, ফলভোগ করিতে হইলে তাহার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই নিমিত্ত জীব-দেহকে দুই মুখ্য শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং উভয় শরীরেই ভোগ করিতে হয়। (১) "স্থূল" দেহ—মস্তক, হস্তপদাদি করণবর্গ-যুক্ত এই দৃষ্টিগোচর শরীর, ইহাকেই "অন্নময় কোশ" বলে ; এবং (২) "সূক্ষ্ম" বা "লিঙ্গ" শরীর—ইহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই ১৭টি অবয়বে গঠিত। এই লিঙ্গ শরীরই স্থূল দেহের ভিত্তি, এই কারণে স্থূল দেহের ভোগে সূক্ষ্ম শরীরও লিপ্ত হইতে বাধ্য হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে উল্লিখিত ইন্দ্রিয় এই দৃশ্যমান করণবর্গ নহে, কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্ম শক্তি-বিশেষ, যে শক্তির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়-গোলকের ক্রিয়ার অনুভূতি হয়, বা কর্মেন্দ্রিয় কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত মনের সংযোগকারী বলা যাইতে পারে।

আত্মা এই লিঙ্গ শরীরের উপাধি গ্রহণ করিলে জীবাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, চিদাভাস ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

যেহেতু কর্মফল স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় শ্রেণীর শরীরেই ভোগ্য, ইহাকে দুই প্রধান বিভাগে ভাগ কর হয়, যথা—(১) দৃষ্ট ভোগ ও (২) অদৃষ্ট ভোগ।

(১) দৃষ্ট ভোগ : এক জীবনে যে কর্ম করা হয় তাহার যতটুকু দৈহিক ও মানসিক ফল সেই জীবনেই অর্থাৎ ইহকালেই ভোগ

হয়, তাহাকে দৃষ্ট ফল বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্ম ও তাহার অনুগামী ফলের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ বুঝিতেও পারা যায়। (২) অদৃষ্ট ভোগ: মৃত্যুর পর এই দেহে কর্মফলের যে অংশ অভুক্ত থাকিয়া যায়, দেহপাতের পরে ভোগ হয় তাহাকে অদৃষ্ট ফল বলে। যেহেতু উৎপাদক কর্মের সহিত এই ভোগের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভবপর নয়, তাই শাস্ত্র-বাক্যই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গৃহীত এবং ইহা "আনুশ্রবিক" নামে অভিহিত হয়। অদৃষ্ট ভোগ আবার দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(ক) আমুষ্মিক, পরলোকে ভোগ্য এবং (খ) ঐহিক, মর্ত্য-লোকে ভোগ্য।

২ (ক) আমুষ্মিক: ইহার ভোগ পরলোকে হয় বলিয়া কেবল সূক্ষ্ম শরীরই ইহাতে জড়িত হইয়া থাকে, স্থূলদেহের কোনও অংশ থাকে না; এবং স্থূলদেহের অভাবে সেই ভোগও সর্বতোভাবে মানসিক হওয়াই সম্ভবপর। কৃতদেহপাতের অব্যবহিত পরেই স্বর্গাদি পরলোকে এই ভোগ আরম্ভ হয় এবং সেখানেই নিঃশেষ করিতে হয়। ভগবান বলিয়াছেন:

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"

(গীতা -৯।২১)

—তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

(খ) এইরূপে সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ শেষ করিয়া নূতন স্থূলদেহে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে কর্মচক্র পুনরায় চালিত হয়।

জীবের প্রত্যেক জীবনে স্থূলদেহে ভোগের উপযোগী, উল্লিখিত দৃষ্টফল (১) রূপে যে অংশ অভুক্ত থাকিয়া যায় তাহা সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং বহু জন্মের এই সঞ্চিত কর্মের ক সেই জীবের "কর্মাশয়" বলে। সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এই কর্মাশয় হইতে কিয়দংশ উঠাইয়া লইয়া তাহাকে ইহা ভোগ করিবার বিধান করেন, এবং ঠিক তাহারই উপযোগী সে উক্ত নূতনদেহ প্রাপ্ত হয়। কঠোপনিষদে যমরাজ বলিয়াছেন—

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥"

(২।২।৭)

নিজ নিজ কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কোন দেহী শরীরগ্রহণার্থ মনুষ্য-পশ্বাদি জীবদেহ প্রাপ্ত হয় আবার কোন দেহী স্থাণু অর্থাৎ বৃক্ষ-পাষাণাদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়।

কর্মাশয়ে যাহা সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাহা এখন ফলপ্রসূ হইয়া এই নূতন দেহে ভোগ করায়, ইহাকেই "প্রারব্ধ" বলে। কর্মের বিপাক একবার আরম্ভ হইলে তাহা নিঃশেষ হইয়া না গেলে ক্ষান্ত হয় না। এই কারণে ইহা জীবের আয়ত্তের বহির্গত এবং অগত্যা ভোগ করিতে হয়। যেহেতু কেবল প্রারব্ধ ভোগের নিমিত্তই বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহার শেষ হইলে সেই দেহের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না এবং অবিলম্বে দেহপাত হয়। অবশ্য প্রারব্ধ-ভোগকালে নূতন কর্ম করিলে তাহার অভুক্ত অংশ পুনরায় কর্মাশয়ে সঞ্চিত হয় এই রূপেই কর্মচক্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে।

এই বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, কর্মের গতি অত্যন্ত গহন এবং পুনর্জন্মের মূলে জীবের স্বকৃত কর্মই নিহিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে কর্ম তাহাকেই বলিতে পারা যায়, যাহা জীবদেহ-উৎপাদনের শক্তি ধারণ করে।

ভগবান বলিয়াছেন—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥"

(গীতা, ৮।৩)

কর্মের এই পরিণামেই অনাদি জীব ক্রমাগত জন্ম, বৃদ্ধি, জরা ও মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, এবং সুখের সহিত অশেষ দুঃখ ভোগ করে। এই পুনঃপুনঃ যাতায়াতকেই সংসরণ বা সংসারচক্র বলে।

ঘটনাচক্রের প্রবাহ এইরূপ হওয়ায় স্বভাবতঃ মনে এই প্রশ্নই আসে যে, এই অশেষ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় আছে কি? তাহার নিরূপণ করিবার চেষ্টাই এক্ষণে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, পরমার্থতঃ ব্রহ্মই একমাত্র বিদ্যমান সত্তা, মায়ার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাহার শক্তি এমনই বিচিত্র যে, তাহার এই ভেল্কি নিঃসংশয়রূপে বাস্তব জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানোপহিত জীব সে রহস্য ভেদ করিতে পারে না, এবং মায়ার দ্বারা আরোপিত অহংকারের বশবর্তী হইয়া এমন ভ্রান্তিতে পড়িয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে যাহা মায়ার নিজস্ব কার্য তাঁহাকে সে স্বকৃত কর্ম বলিয়া অভিমান করে ও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় যদি সে কোনও ব্রহ্মবিৎ গুরুর উপদেশ লাভ করিতে পারে এবং নিজের বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে এই অধ্যাস খণ্ডন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহার মুক্তিও ইহার অনুবর্তী হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

"প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥"

(বিবেকচূড়ামণি, ২৭৯)

অর্থাৎ প্রারব্ধই যে শরীর রক্ষা করিবে ইহা নিশ্চিত জানিয়া তুমি (সাধক) ধৈর্যধারণ করিয়া এবং যত্নসহকারে নিজের এই অধ্যাস (ভ্রান্তি) মোচন কর।

কিন্তু এই ভ্রান্তি মোচন করিতে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধনা উপনিষৎ-কথিত "ব্রহ্মজ্ঞান"লাভের চেষ্টা, অখণ্ড পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা। সত্যনিষ্ঠা বা সত্যবচন বলিতে বুঝায় যে, বক্তা যে-বস্তু নিজমনে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাকে ঠিক সেইরূপেই প্রকাশ করা। তাহা যদি পারমার্থিক, এমন কি ব্যবহারিক-রূপে গৃহীত সত্য নাও হয় তথাপি এরূপ বচনে বক্তা সত্যভ্রষ্ট হন না। এই সাধনার সম্বন্ধে কেনোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ
সর্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্ ॥"

—কেনোপনিষদ্ ৪।৮

অর্থাৎ সমস্ত শম, দম, তপস্যা, নিষ্কাম ও নিত্য কর্ম, বেদ বেদাঙ্গ ইত্যাদি তাহার প্রাপ্তির উপায়, কিন্তু সত্যনিষ্ঠাই তাহার আশ্রয়স্থান।

এই সাধনার পথে অতি সাবধানে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। সর্বপ্রথমে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্য কর্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যবায়কে নিরোধ করিতে হইবে, তাহার পর সাধনচতুষ্টয়ের যথারীতি অনুশীলন করিলে সে উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারে। অন্তঃকরণ নির্মল হইলে পর অন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ আচার্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মুখ হইতে নিজের সহিত ব্রহ্মের অভেদত্বজ্ঞাপক 'মহাবাক্য' শ্রবণ করিতে হয়। এ বিষয়ে কঠোপনিষদ্ (১।৩।১৪) বলিয়াছেন: "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" স্বামীজীও এই বাণী আবার

নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যকে নিজমনে বিচার করিয়া, তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া দৃঢ় করিতে হয়। ইহার পর ধ্যানের পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিজে উপলব্ধি করিবার বিশেষ প্রয়াসের আবশ্যক।

সে সময় তিনি আত্যন্তিক আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন—ইহাই "ব্রহ্মানন্দ"। এই অবস্থিতিকেই "ব্রহ্মসাক্ষাৎকার" বলে। তখন দেহমনাদির সহিত নিজের একাত্মতার, স্বাতন্ত্র্যের অভাবে নিজস্ব কোন কর্ম থাকাও সম্ভব নয় ও তাহার ফলের প্রশ্নই উপস্থিত হয় না, তাঁহার কর্মাশয় ভস্ম হইয়া যায়। মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৯ বলিয়াছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

—সেই সর্বোত্তম ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার অবিদ্যাসংস্কার নষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় ও কর্মরাশি ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাকেই "জীবন্মুক্তি" বলে। কর্মাশয় দগ্ধ হওয়াতে "ব্যুত্থান" অবস্থাতেও অর্থাৎ সমাধিভঙ্গকালেও তিনি আর কোনও কর্মে লিপ্ত হন না। সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছায় তিনি বারংবার এই সমাধির অভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং প্রারব্ধ শেষ হইলে দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান, অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে তাঁহার আত্যন্তিক মুক্তিলাভ হয়। ইহাকেই "কৈবল্য" মুক্তি বলে। ইহা জ্ঞানমার্গের

সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভের অন্য পন্থাও আছে। "ভক্তিমার্গ" আর একটি পন্থা। এই মার্গের সাধকেরা ভগবদ্ভক্তিতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দেন, এবং বিষ্ণু বা অন্য কোন রূপে সাকার-ব্রহ্মকে সর্বতোভাবে ভজনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৩

এই উপাসনার দ্বারাই তাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রেয় লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—মনমুখ এক করিয়া যে-কোন পথ ধরিয়া চলিলে মানুষ এই জীবনেই সত্য লাভ করিয়া ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না।

"মৃত্যুর পর মানুষের ভোগবাসনা সূক্ষ্মভাবে থাকে। মৃত্যুকালে স্থূল দেহটারই কেবল নাশ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি—সবই থাকে সূক্ষ্মভাবে। তখন ভোগ আরও তীব্রভাবে হয়ে থাকে। সূক্ষ্মের পর কারণ অবস্থায়ও মন প্রভৃতি বীজাকারে থাকে। তুরীয় অবস্থায় পৌঁছুলেই পূর্ণ জ্ঞান হয়।"

"বাসনা থেকেই পুনর্জন্ম হয়। সমস্ত বাসনাকে যদি একেবারে বিসর্জন দেওয়া যায়, তাহলে আর জন্ম হয় না।"

—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

সমালোচনা

দিব্যরামায়ণ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। জেনারেল বুক্‌স্‌, এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৯৮, মূল্য—ছয় টাকা।

চলতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত সুখপাঠ্য এই রামায়ণকাহিনীটি বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। লেখক প্রধানতঃ মহাকবি বাল্মীকির মূল রামায়ণের উপাখ্যান-ধারা ও ঘটনাসন্নিবেশ অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসের রামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণসমূহ হইতে কিছু কিছু ঘটনা কাহিনীতে সংগ্রথিত হইয়াছে। তাহাতে এই 'দিব্যরামায়ণের' মনোজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিতে হইবে। 'প্রকাশকের নিবেদন' হইতে জানা যায় যে, লেখক এই গ্রন্থের সঙ্কলনে বাল্মীকির মূল রামায়ণ ছাড়া সংস্কৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু ও তিব্বতী ভাষায় প্রকাশিত অন্যূন চল্লিশখানি রামায়ণ এবং বিভিন্ন পুরাণাদির সাহায্য লইয়াছেন। বহু কবি, ভক্ত ও সাধকের চিন্তা ও ভাব-জ্যোতিঃ এই রামায়ণে প্রতিফলিত; অতএব এই গ্রন্থের 'দিব্যরামায়ণ' নাম সমীচীনই হইয়াছে।

গ্রন্থে বহু পাদটীকা সন্নিবিষ্ট। এই টীকাগুলিতে কোথাও কোথাও বাল্মীকি-বর্ণিত ঘটনা হইতে অন্যান্য রামায়ণে লিপিবদ্ধ ঘটনার পার্থক্য দেখানো হইয়াছে, কোথাও বা মহাকবি বাল্মীকির বর্ণনার সমালোচনাও করা হইয়াছে। এই টীকাগুলির কোনও কোনও স্থলে লেখকের স্বাধীন চিন্তা সুপরিস্ফুট। তবে মূল কাহিনীর কোথায় কোথায় তিনি বাল্মীকি রামায়ণ হইতে ভিন্ন অন্য রামায়ণের উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সাধারণ পাঠকের বুঝিবার উপায় নাই। পাদটীকায় ইহার উল্লেখ থাকিলে বোধ করি ভাল হইত।

মূল রামায়ণের গল্প আরম্ভ করিবার পূর্বে গ্রন্থকার ছত্রিশ পৃষ্ঠার একটি 'প্রাগ্‌বাণী' সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলির ভাবালেখ্য অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে এবং রামায়ণের ভিতর দিয়া ভারতের সনাতন ধর্ম সংস্কৃতি যেভাবে অভিব্যক্ত ও পরিপ্রসারিত হইয়াছে তাহারও সুচিন্তিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাগ্‌-বাণীটি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে রামায়ণের দিব্যপ্রেরণা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিবে।

দিব্যরামায়ণের ভাষায় ও কাহিনী-উপস্থাপনায় কোনও জড়তা নাই। পড়িতে বসিলে রামায়ণের চরিত্রসমূহ ও ঘটনাগুলিকে যেন অতি নিকটে পাওয়া যায়। তবে কয়েকটি টীকা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। কয়েক জায়গায় টীকার ভাষা অত্যন্ত হালকা হইয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকির প্রতি কটাক্ষ যেন সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থকার এদিকে অবহিত হইলে পুস্তকের সম্পন্নতা বাড়িবে।

পরিশিষ্টে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নানা রামায়ণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। 'দিব্যরামায়ণ'-প্রণয়নে লেখক যে গবেষণা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাচাতুর্যের পরিচয়

দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়।

—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

বেদান্তসূত্রম্—মূল, অবতরণিকাভাষ্য, শ্রীগোবিন্দভাষ্য এবং এতদুভয়ের সূক্ষ্মা টীকা, সকল ভাষ্যের ও টীকার বঙ্গানুবাদ এবং সিদ্ধান্তকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যা সমেত—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন, ২৯ বি, হাজরা রোড হইতে ৪টি অধ্যায় ৪টি খণ্ডে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৬৩০, ৬০২, ৭৭৮, ৩২০ ; ভূমিকাদি স্বতন্ত্র। মূল্য—প্রথম খণ্ড ২৪৲, দ্বিতীয় খণ্ড ২০৲, তৃতীয় খণ্ড ৩২৲ এবং চতুর্থ খণ্ড ২০৲ ; মোট ১০০৲।

ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, সনাতন ধর্মক্ষেত্রে প্রচলিত শাস্ত্রসমূহের উৎস বেদ। বেদের সারবস্তু উপনিষৎসমূহ বা বেদান্ত। এই বেদান্ত শ্রীব্যাসদেব কর্তৃক সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ। বেদান্তসূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র বা বেদান্তদর্শন।

শ্রীব্যাসদেবের বেদান্তসূত্র অতুলনীয় গ্রন্থ, ইহাকে বেদান্তশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্গত 'ন্যায়প্রস্থান' বলা হয়। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত অথবা ইহাদের অনুরূপ যে-কোন বেদান্তমতের প্রতিষ্ঠা চাহিয়া আচার্যগণ বেদান্তসূত্রের উপর যুক্তিপূর্ণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের ভাষ্য ব্যতীত কোন মতই দার্শনিকগণের নিকট প্রতিষ্ঠা পায় না। বিভিন্ন মতের ভাষ্যমধ্যে স্বীয় মতকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য মতগুলিতে অসামঞ্জস্য দেখাইবার ও তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়—কোন কোন ভাষ্যে এইরূপ প্রচেষ্টা আবার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যিনি যে মতের পোষকতা করেন, তিনি সেই মতেরই প্রাধান্য দিয়া তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে বিভিন্ন মতের সাধকগোষ্ঠী হইয়াছে। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, আচার্যগণ স্বীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেই অন্য মতের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাসূত্র এই বিষয়ে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, তাঁহার মতে- দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি মতগুলি লক্ষ্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন উপায়মাত্র, বিভিন্ন ধাপ মাত্র—'Steps to realisation.' এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বেদান্তভাষ্যগুলি অনুশীলন করিলে আচার্যগণের বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইবে ও গোঁড়ামির ভাব আসিবে না।

আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, আচার্য মধ্ব, আচার্য নিম্বার্ক, আচার্য বলদেব প্রভৃতির বেদান্তসূত্রের ভাষ্য তাঁহাদের মতাবলম্বী সাধকগণের মধ্যে প্রচলিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভাগবদ্ধর্মের কথা আছে, সেই ভাব অবলম্বনে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের বেদান্তদর্শন। শ্রীবলদেব-কৃত বেদান্তভাষ্যের নাম 'গোবিন্দভাষ্য'। 'শ্রীগোবিন্দের স্বপ্নাদেশে ভাষ্য রচিত হয় বলিয়া শ্রীগোবিন্দভাষ্য' নামটি সার্থক। এই ভাষ্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য : প্রতিসূত্রের পূর্বে অবতরণিকাভাষ্য ও তাহার টীকা দ্বারা বিষয়, সংশয় ও পূর্বপক্ষ সংযোজিত এবং পরে সূত্রটির বিশ্লেষণ, সঙ্গতি ও সিদ্ধান্ত মূলভাষ্য ও টীকার মাধ্যমে বিশেষভাবে আলোচিত।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বেদান্তভাষ্য প্রায় বিলুপ্তির পথে যাইতেছিল, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন এই অমূল্য সম্পদ প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইলেন।

সহজ সরল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবৃতি 'সিদ্ধান্তকণা' পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 'সিদ্ধান্তকণা' অনুব্যাখ্যাটিতে গোবিন্দভাষ্যের গভীর অনুধ্যানের পরিচয় বিদ্যমান। ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সাবলীল ও সহজবোধ্য। অবতরণিকা, ভূমিকা ইত্যাদিও সুলিখিত।

বেদান্তদর্শনের অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' হইতে 'শ্রুতত্বাচ্চ' মূল এগারটি সূত্রের আলোকবর্ষী প্রচ্ছদপটটি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। শোভন মুদ্রণ ও উত্তম বাঁধাই বৃহৎ গ্রন্থের উপযোগী। গ্রন্থগুলি গ্রন্থাগারে সংরক্ষণযোগ্য।

(১) **গীতা মাতা কী গোদ মেঁ** (দুসরা ভাগ—দুসরা খণ্ড),—লেখক 'সাকর'। (২) **গীতা মাতা কী অনুকম্পা** (পহলা ভাগ),—'সৌকর'। (৩) **গীতা মাতা প্রদত্ত বৈভব**—প্রকাশক : শ্রীগীতা আশ্রম, ১০ সদর বাজার, দিল্লী ক্যাণ্ট। পৃষ্ঠা যথাক্রমে : ১৩৮ + প্রস্তাবনা ইত্যাদি, ১৩১, ৭২ (মূলগ্রন্থ)। মূল্য যথাক্রমে : ৪৲, ৪৲, ২.৫০।

(১) 'সৌকর' এই ছদ্মনামে লিখিত 'গীতা মাতা কী গোদ মেঁ' অর্থাৎ 'গীতা মায়ের কোলে' গ্রন্থের প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়া হিন্দী পাঠকসমাজের নিকট প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার কারণ ভাষার স্বচ্ছতা এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি।

সম্প্রতি-প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডেও সুধী লেখকের পাণ্ডিত্য ও গীতানুধ্যানের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা আশা করি এই খণ্ডটিও বহুল-প্রচারিত হইবে।

(২) 'গীতা মাতা কী অনুকম্পা' অর্থাৎ 'গীতা মায়ের দয়া' গ্রন্থে গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকের হিন্দীতে অনুবাদ ও অনুচিন্তন সুন্দরভাবে পরিবেশিত। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গীতানুশীলনের আগ্রহ হইবে।

(৩) 'গীতা মাতা প্রদত্ত বৈভব'—গ্রন্থটি প্রধানতঃ 'সৌকর'-লিখিত গীতাগ্রন্থের সমালোচনা ও প্রশংসাপত্রের সঙ্কলন।

কল্যাণ (বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৪)—অগ্নিপুরাণ ও গর্গসংহিতা অঙ্ক। সম্পাদক : শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী শাস্ত্রী। প্রকাশক : গীতা প্রেস, গোরখপুর। পৃষ্ঠা ৭০০, সূচী ইত্যাদি স্বতন্ত্র। মূল্য ৯৲।

হিন্দী ভাষায় হিন্দুধর্মপ্রচারে 'কল্যাণ' পত্রিকার কার্যধারা ভারতবাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কল্যাণের সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অগ্নি-পুরাণের ২০০টি অধ্যায়ের এবং গর্গসংহিতার নয় খণ্ডের বিষয়বস্তু অবলম্বনে এবারের বিশেষ সংখ্যাটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত বিবিধ বিষয় ও ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন সহজ অথচ সরস হিন্দীতে অনূদিত হওয়ায় দুর্বোধ্য বিষয়বস্তুর কঠিনতা দূরীভূত হইয়াছে। গর্গসংহিতা শ্রীভগবানের লীলাকথা, ইহার চমৎকারিত্ব ভক্তজনস্বীকৃত। বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন এই গ্রন্থপ্রকাশ সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা আশা করি এই বিশেষাঙ্ক-খানি মানুষের মনে সদ্ভাব জাগাইতে সহায়তা করিবে। তিন রঙের ও এক রঙের বহু চিত্র দ্বারা গ্রন্থখানি সমলঙ্কৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য : বসিরহাট ও হাসনাবাদ ক্যাম্পে ২৪.৪.৭০ হইতে ২০.৫.৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫১৭.৯১ কুইণ্টাল চাল, ৮৯.২২ কুইণ্টাল ডাল, ৪৭.৭৩ কুইণ্টাল আলু, ২৬ বস্তা পেঁয়াজ, ৪১½ বস্তা লবণ, ৩২ পাউণ্ড বার্লি, ৪৫.৫ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে। গড়ে দৈনিক ৮,৩৪৩ জন দুঃস্থকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। মে মাসের শেষের দিকে সমবেত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ২০,০০০।

গুজরাটে বন্যার্তসেবা : গত ৪ঠা মে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই বন্যা-পীড়িত ৬টি গ্রামে বন্যার্তদের জন্য নির্মিত ৫৬৪টি কুটিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। ২১টি পাকা সমাজমন্দির এবং আদিবাসীদের জন্য ২টি বিদ্যালয়-ভবন নির্মিত হইয়াছে। ১৪টি গ্রামে বৈদ্যুতীকরণ এবং ৫টি গ্রামে জলসরবরাহ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে আরও সেবাকার্য চলিতেছে।

গুজরাটে দুঃস্থসেবা : অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিতরণ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া ভুজের সন্নিকটে অন্নকষ্টে প্রপীড়িত জনগণকে রান্নাকরা খাদ্য দেওয়ার জন্য 'ফ্রি কিচেন' খোলা হইয়াছে।

শিক্ষা অধিবেশন

গত ৮ই মে, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ পেরিয়ানায়েকেনপালয়ম (কোয়েম্বাতুর) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রসমূহের শিক্ষা অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছেন। এই অধিবেশন ৮ই হইতে ১০ই মে দিবসত্রয় চলিয়াছিল।

পরীক্ষায় কৃতিত্ব

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসের জনৈক ছাত্র এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

রহড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৬—মার্চ, '৬৯) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি দুঃস্থ অনাথ বালক লইয়া এই আশ্রমের পত্তন করা হয়। বর্তমানে এখানে নিম্নলিখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে :

		ছাত্রসংখ্যা (৩১।৩।৬৯)	শিক্ষকসংখ্যা
প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়	১টি	৫১	৩
নিম্ন ”	৫টি	৮৮০	২২
উচ্চ ”	৪টি	৫১৩	২৪
নিম্ন ” শিক্ষণায়তন	১টি	১০০	৯
স্নাতকোত্তর বুঃ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	১টি	১০০	১৫
উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়	১টি	৫১১	৪৪
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়	১টি	৫৭৭	২৯
বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়	১টি	৫৫	৫
নিম্ন শিল্প বিদ্যালয়	১টি	২৩২	১৬
গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্র	১টি	২২	৫
সমাজশিক্ষা বিভাগ	১০টি		

মাত্র ৩৭টি বালক লইয়া যে আশ্রমের শুভারম্ভ হইয়াছিল, সেখানে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৩,০৩১। তন্মধ্যে ৫৩৯ জন ছাত্র সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিক্ষালাভ করিতেছে। শিশুদের জন্য নার্সারি বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া শিল্প বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

এখানে আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ৯৪৫ এবং বহিরাগত ছাত্রসংখ্যা ২,০৮৬।

বিপুলায়তন গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১১,৪০০ এবং সদস্যসংখ্যা ১,৫২৩।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সঙ্গে ছাত্রদের স্বাস্থ্যচর্চা এবং চরিত্রগঠনের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। রহড়া বালকাশ্রম পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য উপাসনা-ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উৎসব এবং প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রতিবৎসর মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে এই বালকাশ্রমের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

সরিষা: (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭০ রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ ১৩৫তম আবির্ভাব-উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

পূর্বদিন সন্ধ্যায় নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ভজনসহ শোভাযাত্রা করিয়া গ্রাম পরিক্রমা করে। উৎসবের দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। সারাদিনই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভক্তসমাগম হইতে থাকে। দিনের প্রথম দিকে জয়নগর-মজিলপুর হইতে আগত শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। পরে কলিকাতার সুহৃদ ক্লাব কর্তৃক কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসমেত প্রায় পাঁচ হাজার জন বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং আরও প্রায় দেড় হাজার জনকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে জনসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর সারাদিনব্যাপী উৎসব-অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

দিনাজপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে ১৫ই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, ১৬ই শ্রীশ্রীমায়ের এবং ১৭ই স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা এবং পাঠ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া; প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং দ্বিতীয় দিন স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী কালিকানন্দ, স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাশ প্রভৃতি বক্তাগণ। তৃতীয় দিন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিন প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় ক্লাব ও আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পিবৃন্দ।

স্বামী বেদানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ১৮ই মে, ১৯৭০ রাত্রি একটার সময় স্বামী বেদানন্দ (ভোলানাথ মহারাজ) ৬৫ বৎসর

বয়সে কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দেহ পবিত্র গঙ্গায় সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী বেদানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাসজীবনের প্রায় ৩০ বৎসর তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে ও মহীশূর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর জনহিতকর কর্মে অতিবাহিত করেন। ১৯৫৭ হইতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চণ্ডীগড় আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, এবং ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কানপুর আশ্রমের অধ্যক্ষের পদে ব্রতী ছিলেন।

স্বামী বেদানন্দ ছিলেন মধুরস্বভাব এবং সকলেরই প্রিয়, বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

অনুষ্ঠানসূচী

[আষাঢ় হইতে কার্তিক, ১৩৭৭ ; বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

তিথি-কৃত্য

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণাত্রয়োদশী	১৫ই শ্রাবণ	শুক্রবার	৩১শে জুলাই
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৩২শে শ্রাবণ	সোমবার	১৭ই আগষ্ট
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	৭ই ভাদ্র	সোমবার	২৪শে আগষ্ট
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণাচতুর্দশী	১৩ই ভাদ্র	রবিবার	৩০শে আগষ্ট
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণানবমী	৬ই আশ্বিন	বুধবার	২৩শে সেপ্টেম্বর
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	১৩ই আশ্বিন	বুধবার	৩০শে সেপ্টেম্বর
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লাদ্বাদশী	২৪শে কার্তিক	মঙ্গলবার	১০ই নভেম্বর
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লাচতুর্দশী	২৬শে কার্তিক	বৃহস্পতিবার	১২ই নভেম্বর

পূজা-কৃত্য

স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	৪ঠা আষাঢ়	শুক্রবার	১৯শে জুন
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লাসপ্তমী	২০শে আশ্বিন	বুধবার	৭ই অক্টোবর
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১২ই কার্তিক	বৃহস্পতিবার	২৯শে অক্টোবর

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ—ব্লক এ, ফ্লাট ২, এণ্টালী গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা-১৪)।

সেবাকার্য: বর্তমান বৎসরে মালদহে বন্যাপীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন স্থানীয় নিবেদিতা ব্রতী সংঘের শাখা। সদস্যাবৃন্দ প্রতিদিন আড়াই মন সুজি রান্না করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিবেষণ করেন। জামাকাপড় এবং পুস্তকাদিও বিতরণ করা হইয়াছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্র: দুইটি কেন্দ্রে অতি দুঃস্থ বস্তিবাসী শিশুগণের শিক্ষাদান চলিতেছে। তিনটি রবিবাসরীয় সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, একটি বিদ্যার্থীদের স্বল্পমূল্যে খাদ্যবিতরণ কেন্দ্র, একটি ছাত্রী কল্যাণ ভাণ্ডারও পরিচালিত হইতেছে। নিবেদিতা ব্রতী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ভবানীপুরস্থ রামকৃষ্ণ পাঠচক্র চালাইতেছেন একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, একটি বিনামূল্যে ঔষধবিতরণ কেন্দ্র, একটি সূচীশিল্প কেন্দ্র ও একটি পাঠচক্র।

পাঠচক্র: বিভিন্ন কেন্দ্রে ১২টি পাঠচক্রে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ ও আলোচনা করা হয়।

শিক্ষা ও সমীক্ষার আসর: মাসে একবার প্রধানত: ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনার আসর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান: বিগত ১লা মার্চ রবিবার নিবেদিতা ব্রতী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে পৌরোহিত্য করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং ভাষণ দেন ডঃ রমা চৌধুরী।

উৎসব-সংবাদ

রূপনারায়ণপুর: হিন্দুস্থান কেবল্‌স শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব কমিটির উদ্যোগে গত ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতিবারের মতন এবারও বিশেষ পূজাপাঠাদির পর চার-পাঁচ হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী তদানন্দ মহারাজ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় বিশেষ সঙ্গীত ও ভজন উপভোগ্য হইয়াছিল। ২২শে মার্চ 'বীরেশ্বর' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

বেহালা (কলিকাতা ৬০): শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মন্দিরে গত ২৭ হইতে ২৯ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ জন্মোৎসবসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন স্থানীয় সারদা-সঙ্ঘ কর্তৃক উষাকীর্তন, পরে পূজা ও প্রসাদবিতরণ হয়। বৈকালে ভাগবতপাঠের পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সভাপতি), স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী (প্রধান অতিথি) শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেন।

তৃতীয় দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সারদা সংঘ নগরসংকীর্তন করেন। অপরাহ্ণে কীর্তন এবং সন্ধ্যায় রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

ভাঙ্গামোড়া : (হুগলী) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নরনারায়ণ-সেবায় ২,৫০০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় স্বামী উমানাথানন্দ ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। উৎসবের দুই দিনই সন্ধ্যায় 'নিবেদন' শিল্পিগোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ১৮ই হইতে ২০শে এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব পূজাদিসহ পালিত হয়।

ধর্মসভায় প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য, ডঃ এস, ই, ও এবং শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি মহঃ মোফাজ হোসেন, সম্পাদক, পাঁচগ্রাম উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল এবং প্রঃ রেজাউল করিম।

বাউল গান, কীর্তন মাধ্যমে ভক্তিমূলক যাত্রাগান, ছায়াচিত্র মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হয়। শেষ দিন প্রায় এক হাজার নরনারী বসিয়া অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রানীয়া কুলটুকারী (২৪ পরগনা)—এই দুই গ্রামের মধ্যস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৬শে এপ্রিল এই আশ্রমের শুভ উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন শ্রীঅমিয়কান্তি সেন-গুপ্ত। অন্যতম বক্তা ছিলেন স্বামী পুণ্যাত্মানন্দ। বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

দেলুয়া (পাবনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৪ঠা বৈশাখ হইতে ১৩ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত উৎসবে জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত ভক্ত যোগদান করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ আলোচনা করেন জনাব আবদুল আলীম (সভাপতি), স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, মোঃ আবদুল মজিদ এবং অন্যান্য বক্তাগণ। ৫ই ও ৬ই বৈশাখ শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীকালীপূজা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, ৩২প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ প্রভৃতি এই উৎসবের অঙ্গ ছিল।

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সংঘের উদ্যোগে গত ৮ই বৈশাখ হইতে ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসহ মনোজ্ঞভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পূজা-পাঠাদি, ধর্মসভা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ৮ই বৈশাখ সন্ধ্যায় স্বামী পরশিবানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। ব্রহ্মচারী মুরারিচৈতন্য ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। এই উৎসব উপলক্ষে তপন, গঙ্গারামপুর, নয়াবাজার প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।



দিব্য বাণী

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥ ৫

দৈব স্বভাব মুক্তির হেতু,
আসুর স্বভাব বাঁধন বাড়ায় (বাসনা বাড়িয়ে দিয়ে,)
অর্জুন! তুমি ক'রো নাকো শোক,
জন্মেছ তুমি দৈব স্বভাব নিয়ে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ১৬

দেবতার মতো, অসুরের মতো—
দুই ধরনেরই মানুষ আছে এ লোকে;
দৈব স্বভাব অনেক বলেছি,
আসুর স্বভাব শোন মোর মুখ থেকে।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৬

অসুর-স্বভাব মানুষ যাহারা
নাইকো তাদের ধর্মাধর্ম-জ্ঞান,
তাদের নিকটে আচার, শুচিতা,
সত্য আদির নাইকো কোনই স্থান।
তারা বলে, 'নাই ঈশ্বর, নাই
সত্যও কিছু এই জগতের নিয়ন্ত্রণে বা মূলে।'
বলিয়া বেড়ায়, 'ধর্মাধর্ম-
নিয়মে চলিছে জগৎ, একথা একেবারে যাও ভুলে;
জীবনের হেতু জগতের হেতু
নহে ঈশ্বর, নহে আর কিছু, কামই ইহার হেতু —
স্ত্রী ও পুরুষে মিলন হতেই
উদ্ভূত জীব, (কামই চালক, জগৎ-জীবন-সেতু ')
নষ্টস্বভাব, অল্পবুদ্ধি,
উগ্রকর্মা এসব লোকেরা এরূপ ধারণা নিয়ে
জন্মে কেবল এই পৃথিবীকে
ধ্বংস করিতে, অহিত কর্মে সর্বদা রত হ'য়ে।
জন্মে-জন্মে আসুর স্বভাব
সঙ্গে নিয়েই আসে তারা বারে বারে,
(ঊর্ধ্বগতি তো হয় না তাদের,)
পায় না আমায়, তাই নেমে যায় ক্রমেই নিম্ন স্তরে।

কথাপ্রসঙ্গে

অগ্রগতি না অধোগতি ?

কোন উচ্চস্থানে উঠা, সে আক্ষরিক অর্থেই হউক বা আলঙ্কারিক অর্থেই হউক, কঠিন, কষ্টকর এবং সময়ও তাহাতে বেশী লাগে। নামা সহজ ও কম সময়সাপেক্ষ। নামার পথ যেন আমাদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণে নীচে টানিয়া আনে। উহা গড়ানে পথ, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'কলম-বাড়া' পথ। নামিবার সময় টের পাওয়া যায় না, উপরের দিকে তাকাইলে তখন বোঝা যায় কোথা হইতে কোথায় নামিয়া আসিয়াছি! একথা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয়ভাবেই, এবং আদর্শ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সত্য। ভাঙা-গড়ার ব্যাপারেও একই কথা।

আজ আমরা আমাদের দেশের যুবকগণকে এবং দেশনেতাগণকে একবার উপরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি—কোথা হইতে আমরা কোথায় নামিয়া আসিয়াছি, এবং সমাজকেও নামাইয়া আনিয়াছি আমাদের আদর্শ ও সংস্কৃতি হইতে কত নিম্নে! আমরা কি এইভাবে ক্রমবর্ধমান গতিতে একেবারে নীচে নামিয়া জাতির সমস্ত সংস্কৃতি ও সদ্গুণগুলি ক্রমে ধ্বংস করিয়া সভ্যতার বাল্যাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাই বা নিম্নের কোন খাদে পড়িয়া জাতি হিসাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে চাই? জাতির বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা কি নিজস্বতা ভুলিয়া মেরুদণ্ডহীন বিচার-বিবেক লইয়া অন্ধভাবে পরানুকরণের উন্মত্ততাকেই এখনো প্রগতি বলিয়া ভাবিতে চাই?

বর্তমান যুগে শুধু ভারত নয়, গোটা পৃথিবীই একটি যুগসন্ধিক্ষণের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সভ্যতার উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত মানুষ বাহিরের ও ভিতরের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মানবসভ্যতাকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে। কেবল বহিঃপ্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া বিজ্ঞান-শিল্প-কৃষি প্রভৃতির উন্নতি এবং নিত্য নূতন ভোগোপকরণ-সংগ্রহের ইতিহাসই, কেবল অন্নবস্ত্র ও বাসগৃহের সংস্থান ও উন্নতিই সে সভ্যতার উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি নয়। মানুষের মনের উন্নতি, তাহার হৃদয়ে অপরের প্রতি স্নেহ সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলির উন্নতি, এবং সর্বোপরি তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি যাহা তাহাকে অপরের সেবায় নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে, যাহা তাহার মনে আনন্দ ও শান্তি লাভের পথ দেখায় (যে সুখ ও শান্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তরেরই, অন্তঃপ্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল, ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য সংগ্রামের উপর নহে)—এগুলিও তাহার মাপকাঠি। বরং বলা যায় যথার্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি এইগুলিই। অবশ্য জাগতিক প্রয়োজনকে বাদ দিয়া নিশ্চয়ই নহে।

বর্তমান জগতে দ্বন্দ্ব চলিতেছে এইখানেই—একদল চাহিতেছেন কেবল জাগতিক প্রয়োজনের উপরই সব জোর দিতে, জীবনে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর বোধে সর্ববিধ প্রাচীন সংস্কৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংস করিতে, আর অপর দল চাহিতেছেন সেগুলির ভাল-

মন্দ সব কিছুকে আঁকড়াইয়া থাকিতে।

ভারত কোন্ পথে চলিবে? যে পথে একদল লোক বর্তমানে চলিতে শুরু করিয়াছেন এবং আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির, আমাদের বহু যুগের সাধনালব্ধ সংস্কৃতির সুউচ্চ শিখরের অবস্থান হইতে নামিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং জাতিকে টানিয়া নামাইতে চাহিতেছেন, ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন আমাদের জাগতিক উন্নতিসাধনের জন্য এরূপ করিবার কোন প্রয়োজন আছে কিনা। কালবশে সর্বত্র গলদ কিছু না কিছু না আসেই, উহার সংস্কার নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা কিছু শুভকর, ব্যক্তির পক্ষে জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর, তাহার সব কিছুকে এভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রচেষ্টার কোনই প্রয়োজন নাই। ইহা আত্মঘাতী প্রচেষ্টা, উন্মত্ততা। আমরা কি সকলকে সমানভাবে ভালবাসিতে চাই? সমভাবে সকলের কল্যাণ করিতে চাই? জনসাধারণের সেবায় আত্মদান করিতে চাই? —জীবনে ইহা অপেক্ষা কল্যাণের কথা আর কি থাকিতে পারে? এরূপ করিতে হইলে নিশ্চয়ই ইহার পথের বাধাগুলিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান বা যে আদর্শগুলি মানুষের কল্যাণসাধনেই রত, মানুষকে শিক্ষিত করিবার, অপরের সেবায় আত্মনিবেদন করিবার মতো মানসিক প্রস্তুতিদানে রত, সেগুলি কি পথের বাধা? শিক্ষা, কিছুটা সংযম, কিছুটা আত্মত্যাগ ছাড়া কোন সমাজই টিকিতে পারে না; উহা না থাকিলে স্বার্থপরতাই পরার্থের ছদ্মবেশে আসিয়া সমাজকে ও জাতিকে আত্মসংঘর্ষের মধ্যে টানিয়া আনে ও ধ্বংসের পথে তাহার গতিবেগ ত্বরান্বিত করে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য—পারিবারিক জীবনে, সমাজজীবনে, রাষ্ট্রজীবনে সর্বত্রই। 'দাসসুলভ পরানুকরণস্পৃহা' ত্যাগ করিয়া নিজের বিচার-বিবেক লইয়া পৃথিবীর চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা আজ চোখে না পড়ার কোন কারণ নাই। অথচ অদৃষ্টের কি পরিহাস, মানবপ্রেমের নামে, সাম্যের নামে, সেবার নামে আজ আমরা অম্লানচিত্তে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শকে, যাহা মানুষকে মানবপ্রেমের, সাম্যের, সেবার পথে অধিকতর অগ্রসর করায় তাহার সব কিছুকেই পথের বাধা ভাবিয়াই সাম্যের, মানবপ্রেমের পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি। মানবসেবার নামে আজ মানুষকেই ধ্বংস করিতে চাহিতেছি। সব মানুষকে এক বলিয়া দেখিবার অতি উচ্চ আদর্শের দোহাই দিতেছি, অথচ আমার মতাবলম্বী একদল মানুষ ছাড়া বাকী সকলকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করিতেছি না। ইহার নাম আর যাহাই হউক, জাতিপ্রেম বা মানবপ্রেম নহে।

ভারতকে পরাধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিবার যুদ্ধে যাঁহারা আত্মদান করিয়াছেন তাঁহাদের কি স্বজাতিপ্রেম ছিল না? তাঁহারা কি জনগণের জাগরণের জন্য নিজ নিজ জীবন-যৌবন-আশা-আকাঙ্ক্ষা বলি দেন নাই? তাঁহারা কি বিপ্লবের আগুন বাহিরে ও জাতির অন্তরে জ্বালেন নাই? কিন্তু তাহার জন্য তো তাঁহাদের মানুষের উচ্চতর মনোবৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দিতে হয় নাই, উচ্চ আদর্শকে বলি দিতে হয় নাই। বরং সংযম, ঈশ্বরবিশ্বাস, ত্যাগ প্রভৃতিই ছিল তাঁহাদের প্রেরণার উৎস। 'মানুষ' থাকিয়াই তাঁহারা সব করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহাদের 'অমানুষ' হইতে হয় নাই।

আমরা আজ আচ্ছন্ন-দৃষ্টি হইয়া মনুষ্যত্ব হইতে বহু নিম্নে নমিয়া আসিয়াছি, এবং আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছাড়িয়া জড়বাদী হওয়াকেই প্রগতি, উন্নতি. উধ্বগতি ভাবিতেছি

এখন সকলেরই একবার ফিরিয়া চাহিবার সময় আসিয়াছে। সকলে হয়তো ইহা বুঝিবেন না। কিন্তু যাঁহারা বুঝিবেন তাঁহাদের কেবল বুঝিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। নিজের দোষ যাহা আছে, আত্মবিশ্লেষণ করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহা সংশোধন করিতে হইবে—যথাসাধ্য ত্যাগ ও সেবার ভাব লইয়া জনগণের উন্নতি-সাধনে স্বেচ্ছায় ব্রতী হইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে জাতির কল্যাণকর আদর্শগুলিকে ভাঙিয়া ফেলার প্রচেষ্টায় বাধা দিতে হইবে সমস্ত কল্যাণশক্তিকে একত্র করিয়া। সংঘবদ্ধতাই শক্তি; সক্রিয়তাই সফলতার মূল; নিষ্ক্রিয় সাধুতা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থহীন।

ভারতীয় আদর্শকে বাঁচাইবার এই প্রচেষ্টা কেবল ভারতের পক্ষেই নয় সারা জগতের পক্ষেই প্রয়োজন। বৌদ্ধিক-উন্নতিপ্রসূত শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির, জগতের সব মানুষকেই সমান ভোগ ও সমান অধিকার দানের প্রচেষ্টার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আদর্শের সমন্বয়সাধন শুধু ভারতের নয়, সারা জগতেরই আজ প্রয়োজন—যদি মানবজাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। এই যুগসন্ধিকালে জড়বাদের সহিত সংঘর্ষ হইতে সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাইবার জন্য অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আর্ণল্ড টয়েনবী বলিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যে জগতে জন্মেছিলেন, তাঁর জীবৎকালেই সে জগৎ এই প্রথম সত্যিই এক-পৃথিবী হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা এখন পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগসন্ধির অধ্যায়ে বাস করছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, পাশ্চাত্য-প্রারব্ধ এই অধ্যায়টিকে ভারতীয় পরিসমাপ্তি লাভ করতেই হবে—তা না হলে সে অধ্যায় সমাপ্ত হবে মানবজাতির আত্মধ্বংসে। পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা বস্তুতান্ত্রিক স্তরে আজ পৃথিবীকে এক করেছে ঠিকই…কিন্তু পরস্পরকে জানতে ও ভালবাসতে শেখবার আগেই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে বিশ্বাঘাতী মারণাস্ত্র।" তিনি বলেছেন, "ভারতীয় পন্থাই, মহারাজ অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাণই হল—এই আণবিক যুগে আমাদের আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়।"

মানবসভ্যতাকে নিজ আধ্যাত্মিক সম্পদ-দানে বাঁচাইবার দায়িত্ব ভারতের স্কন্ধেই ন্যস্ত—স্বামী বিবেকানন্দ একথা বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক যুগের বহু মনীষীও তাহা মনে করেন। সে সম্পদ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া দেউলিয়া হইয়া আমরা যদি আজ জড়বাদের স্তরে নামিয়া বর্তমান আদর্শের দ্বন্দ্বে সমস্যার সমাধানলাভের আশায় অপরের মতোই হাত পাতিয়া দাঁড়াই, তাহার মত দুর্ভাগ্য ভারতের আর কি হইতে পারে? মানবকল্যাণের দোহাই দিয়া ভারত ও সমগ্র মানবজাতির অকল্যাণসাধন তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে?

অবশ্য "এ অবস্থা কখনই হইতে পারে না।" তবে সময়ে সজাগ না হইলে দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে প্রচণ্ডভাবে।

আজ আমাদের ফিরিয়া উধ্বদৃষ্টি হইয়া উধ্বাভিমুখী হইতে হইবে, যাহারা নিম্নাভিমুখী তাহাদেরও টানিয়া উপরে তুলিতে হইবে। দেশসেবা. মানবসেবা. আত্মত্যাগ, বীরত্বপ্রকাশ করিবার সুযোগের অভাব নাই, অভাব যথা-যথভাবে, অকপটভাবে তাহা করিবার মানুষের। 'মানুষ' হইবার ও করিবার পথগুলিকে যেন কোনমতেই রুদ্ধ করিতে না দেওয়া হয় আজ।

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramakrishna Math
Belur P. O., Howrah
সোমবার, ১লা আষাঢ়
1925

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী—ঢাকায় তোমাদের সহিত দেখা করিয়া কয়েক দিন ছিলাম, পরে নারায়ণগঞ্জে দুই দিন ছিলাম। বেলুড় মঠে আসিয়া শরীর কিছু ক্লান্তবোধ করিয়াছিলাম। এখন শারীরিক ভাল আছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন।

তোমার পত্রমধ্যে প্রফুল্লমায়ী, খুকী মায়ী ও চারুবালা মায়ী (রেণুর মা, যোগেশ ঘোষের পরিবার) সকলের পত্র; দিয়ে দেবে। তোমার পরীক্ষার গেজেট বাহির হইয়াছে কিনা জানিতে ইচ্ছা করি। আজকাল তোমরা সকলে শারীরিক কেমন আছ? আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম বড় গরম বোধ হইয়াছিল, দুইদিন বৃষ্টি হওয়াতে এখন ঠাণ্ডা আছে। মায়ী, সদাসর্বদা সৎচর্চা লইয়া থাকিবে, যাহাতে মনে শান্তি থাকে এইরূপ পুস্তক পড়িবে। তোমাকে লেখা বেশির ভাগ। নিজে কত পড়িয়াছ ও শুনিয়াছ। যেন জীবনের উদ্দেশ্যহারা হবে না।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছাদি জানিবে, তোমার পিতামাতা ও বাড়ীর সকলকে জানাইবে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি সকলকে সুস্থশরীরে ও মনের শান্তিতে রাখুন।

তোমাদের
শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramakrishna Math,
Belur, Howrah,
শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ
1925

কল্যাণীয়া প্রতিভা মায়ী,

অনেক দিন তোমাদের কোনো সংবাদ পাই নাই। আমি ১০।১২ দিন পূর্বে তোমাকে ও খুকী মায়ীকে লিখেছি, তারও কোনো উত্তর পাই নাই। তোমরা সকলে কেমন আছ জানাবে। এখানে আমি ও মঠের সকলে ভাল আছি।

আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে। কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramakrishna Math,
Belur P O., Howrah
শুক্রবার, ২৯শে শ্রাবণ
1925

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী,—অনেক দিন পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পত্র একসঙ্গে পাইয়া খুব আনন্দিত হইলাম। পত্রের সম্বন্ধে খুকী মায়ীর পত্রে সমস্ত লিখেছি।

মঠের সব সাধুরা ভাল আছেন। তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। আমার শরীর এখনো দুর্বল আছে, ৩।৪ দিন জ্বর বন্ধ হইয়াছে।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ ; ঔষধং জাহ্নবীতোয়ম্, বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ। যখন যাহা হবার হবে, আমি তাতে কিছুমাত্র ভয় খাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে ; যার হেথায় নাই, তার সেথ য় নাই।" ইহলোক ও পরলোকের বিষয় ঠাকুর ঐ রকম বলিতেন, এখানে যে রকম সঙ্গ, সেখানে সেই রকম সঙ্গ।

আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। নামেতে কালপাশ কাটে, সামান্য ২ চিন্তা দূরে পলায়।

মায়ী, আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিবে, সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Sri Ramakrishna Math
Belur, Howrah
সোমবার, ১৯ আশ্বিন
1925

কল্যাণীয়া মায়ী,

সম্প্রতি তোমার পত্র পাইয়া খুব আনন্দিত ও সুখী হইলাম। তোমার পূর্ব পত্রও পাইয়াছি। এখানকার সব ভাল আছেন ও আছি। তোমরা সকলেই সাধুদের শুভাশীর্বাদ

জানিবে। আমাকে ৺কালীপূজার পর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকাতে যাইতে হইবে। কারণ বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযামিনীলাল রায়চৌধুরী তাঁর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁদের ইচ্ছা ঠাকুরের সময়ের লোক কেহ উপস্থিত থাকেন। এখান হইতে এখন আর কেহ যাইতে পারিবেন না। সুতরাং আমাকে যাইতে হবে। ঢাকায় আবার সকলের সহিত দেখা হইবে। আজকাল শারীরিক ভাল আছি। মায়ী, তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর পোঃ
পুরী জিলা, ২১শে জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণীয়া মায়ী,

তোমার পত্র ও সেই সঙ্গে তোমার দিদির পত্র বেলুড় মঠে আমি পাইয়াছিলাম। আজ ৪ দিন এখানে আসিয়াছি ও শারীরিক ভাল আছি। গতকল্য বৈকালে খুব বৃষ্টি ঝড় হইয়াছিল। সেইজন্য আজকে বেশ ঠাণ্ডা আছে। মধ্যে ভয়ানক গরম এখানে বোধ করিয়াছিলাম। ভেবেছিলাম এত গরম সহ্য হবে না। ৺পুরী জগন্নাথ চলিয়া যাইব ও সেইখানে থাকিব। এখন ঠাণ্ডা পড়িয়াছে এইখানেই থাকিব। ভগবান মানুষকে দুঃখ, কষ্ট, মনোমালিন্য দেন, আবার তিনি নিজে সমস্ত ভাল করেন; যেমন ধোপারা আছাড় দিয়া ময়লা কাপড় পরিষ্কার করে, যতক্ষণ না পরিস্কার হয়, আছাড় দিতে ছাড়ে না। সেইজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা—ঠাকুর, সত্ত্বগুণ দাও, সুখে দুঃখে তুমি সহায়, আমি যদি ভুলে যাই, তুমি আমায় ভুলো না। নানারকম সুখদুঃখ নিয়ে সংসার। সকলে আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে। খুকীমায়ীকে ও তোমার দিদিকে জানাইবে। আমার পত্র লিখিতে দেরি হইলে চিন্তিত হবে না।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

আমার আহারাদি এখন সকল রকম হয়। আলু ও মিষ্ট জিনিস কম খাই। আর এখানে বাজারে শাক সবজী তাই ভাল পাওয়া যায় না। কলিকাতা হইতে আনাইতে হয়। গতকল্য বৈকালে দুটো হায়না বাঘ বেরিয়েছিল। মাঝে মাঝে বাঘ বেরোয়। এই স্থানটি বড় মনোরম

S.

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চল্লিশ বৎসর ধরে গৌতমবুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন বোধিলাভের পর থেকে। তাঁর ধর্মের ভিত্তি ছিল চার আর্যসত্য। এই আর্যসত্যগুলির মধ্যে ছিল তপোবনের বাণীরই প্রতিধ্বনি। সমস্ত উপনিষদ্‌গুলির ভিতর দিয়ে একটি মূল সুরের সুরধুনী প্রবাহিত হচ্ছে। এই মূল সুরটি হোলো, "সকলেতে আমি, আমাতে সকল।" বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তিসত্তার এই আনন্দময় বিস্তারের ঔপনিষদিক সত্যকেই গৌতমবুদ্ধ সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সম্পদ ক'রে তুললেন, যদিও তিনি বেদের প্রামাণ্য মানতে বলেন নাই, খোলাখুলিভাবে উপনিষদের নামও করেন নাই। প্রেমধর্মের কথা শাস্ত্রের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকলে কি হবে? সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাক্যে ও কর্মে সেই প্রেমধর্ম আচরিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন আছে। বুদ্ধ তাই যাগ-যজ্ঞ এবং ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলির উপরে জোর দিলেন না; এমনকি, বেদের প্রামাণ্যও অগ্রাহ্য করলেন। জোর দিলেন আমাদের খুঁটিনাটি আচরণগুলির উপর। আমাদের বাক্য এবং কর্ম এমন হওয়া চাই যাতে কেউ মনে দুঃখ না পায়, যাতে পৃথিবীর কারও অনিষ্ট না হয়, সেই বাক্যে ও কর্মে থাকবে না স্বার্থপরতার কালিমা, লোভের গন্ধ, ক্রোধের প্রকাশ। গৌতমবুদ্ধ বস্তুতঃ উপনিষদের ভাবকেই সাধারণের ভাষায় সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিলেন।

বুদ্ধের মহানির্বাণলাভের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরে এই ভারতবর্ষের আর একজন সর্বত্যাগী গৈরিকপরিহিত সন্ন্যাসী বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে পরিণত করার সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দও খোলাখুলিভাবেই উপনিষদ্ প্রচার করলেন জনসাধারণের মধ্যে। উপনিষদের অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি বিবেকানন্দের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল। "সকলেতে আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল!"—স্বামীজীর 'সন্ন্যাসীর গীতি'র এই দুইটি লাইনে উপনিষদের অদ্বৈত ভাবেরই প্রতিফলন। সকলের মধ্যে নিজেকে দেখলে কাউকে হিংসা করা চলে না। স্বামীজী উপনিষদে প্রচারিত এবং গীতায় ব্যাখ্যাত 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি' শ্লোকের ভাষ্য প্রসঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের বক্তৃতায় পাঞ্জাবের যুবকদের সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "Know through Advaita that whomsoever you hurt, you hurt yourself, they are all you." যে-বেদান্তে আত্মকেন্দ্রিকতার মহাপাপকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, যে-বেদান্ত অকুণ্ঠভাষায় ঘোষণা করেছে নিজের সমস্ত সত্তাকে সকলের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে, সর্বজীবের সুখকে নিজের সুখ এবং দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে ভাবতে, সেই বেদান্তের জন্মভূমি ভারতবর্ষে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণে কী অমানুষিক নিষ্ঠুরতার প্রকাশ! জনসাধারণকে প্রতিদিনের আচরণের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে, দাসত্ব করবার জন্যই তাদের জন্ম! দাসত্ব করবার জন্যই তাদের জীবন-ধারণ! তাদের স্পর্শ

করলেও দেহ অশুদ্ধ হয়। জীবনে তাদের কোনো আশা নেই! উচ্চ শ্রেণীর কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার যুগযুগান্ত ধরে পেতে পেতে জনসাধারণ নিজেদের দাস ব'লেই বিশ্বাস করেছে, বিশ্বাস করেছে দাসত্ব করবার জন্যেই তাদের জন্ম এবং প্রাণধারণ! স্বামীজী তাই হৃদয়ের গভীরতম বেদনার অনুভূতি থেকে বললেন লাহোরের ভাষণে: Aye, in this country of ours, the birthplace of Vedanta, our masses have been hypnotised for ages into that state. To touch them is pollution; to sit with them is pollution!

স্বামীজী দলিত, মথিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত জনসাধারণের অপরিমেয় দুঃখকে অনুভব করেছিলেন সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে। এদের দুর্গতির পঙ্ককুণ্ড থেকে টেনে তুলে মানুষের মতো বাঁচতে সাহায্য করাই যে যুগধর্ম, এই কথা স্বামীজী প্রচার করলেন। বললেন শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার ক'রে মানুষ জীবসেবায় প্রবৃত্ত হবে কেন? স্বামীজী বললেন, সব ধর্মেই বলা হয়েছে পরোপকারই নীতির মর্ম, the essence of all morality. কিন্তু কেন আমরা আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে অন্যের ভালো করবো, তার ব্যাখ্যা একমাত্র বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বেই আছে। বেদান্তই শুধু বলেছে, হিংসা করবে কাকে? সকলের মধ্যে যে আমিই। অন্যকে হিংসা করলে নিজেকেই যে হিংসা করা হয়। স্বামীজী তাই বললেন, Here, in Advaita alone, is morality explained. জনসাধারণের অশেষ দুর্গতির জন্য বিবেকানন্দ আর কাউকে দায়ী করলেন না; দায়ী করলেন স্বদেশের শিক্ষিত সমাজকে যারা জনসাধারণের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজেদের কোলে ঝোল টেনেছে, জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বললেন, we are to blame. বললেন, "দাঁড়াও, সাহস অবলম্বন করো, বলো, অপরাধ আমাদেরই।" এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব অভিজাত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মনটাকে জনসাধারণের দিকে ফেরানো যায় কেমন ক'রে? যদি তাদের চেতনায় চিন্তার একটা নূতনতর ধারাকে বইয়ে দেওয়া যায়! কারণ 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'। যার যেমন শ্রদ্ধা, বিশ্বাস অথবা চিন্তা তার জীবনও তদনুরূপ হবে। উপনিষদে ও গীতায় সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে দেখার কথা আছে। বিশ্বের অধমতম জীবের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তার গভীর অনুভূতির মধ্যে যে পরমসত্য রয়েছে সেই ঔপনিষদিক মহাসত্যকে স্বামীজী নব্য ভারতের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করতে কৃতসংকল্প হ'লেন। হাঁ, তুমি এবং আমি কেবলমাত্র পরস্পরের ভাই নই। এই ভ্রাতৃত্বের কথা সকল মহৎ সাহিত্যই প্রচার করেছে। কিন্তু তুমি আর আমি আসলে এক—দুই নই। স্বামীজী বললেন, "এই ঐক্যই ভারতীয় দর্শনের অমোঘ বাণী। এই ঐক্যকে আশ্রয় ক'রেই সমস্ত নীতিশাস্ত্র এবং সমস্ত অধ্যাত্ম-চেতনার যৌক্তিকতা!" তুমি আর আমি এক—এই ঐক্যবোধের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রে স্বামীজী বললেন, "This is the dictate of Indian philosophy. This oneness is the rationale of all ethics and all spirituality."

স্বামীজী বললেন, সমস্ত অশুভের মূলে ভেদবুদ্ধির প্রাবল্য এবং সমস্ত কল্যাণের উৎস সাম্যে বিশ্বাস, সবকিছুই মূলতঃ সমান এবং এক, এই বিশ্বাস। বললেন, এই সাম্যের

এবং ঐক্যের আদর্শই বৈদান্তিক আদর্শ। This is the great Vedantic ideal. স্বামীজী তো আমৃত্যু প্রেমধর্মের কথাই প্রচার ক'রে গেলেন। আর উপনিষদকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন প্রেমের ধর্ম প্রচার করবার জন্য। "It is love and love alone that I preach, and I base my teaching on the great Vedantic truth of oneness and omnipresence of the Soul of the Universe." "ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়। মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।"

কিন্তু শাস্ত্রে একটা আদর্শ লিপিবদ্ধ থাকা এক কথা, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি আচরণে সেই আদর্শের প্রয়োগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। স্বামীজী বললেন, It is very good to point out an ideal but where is the practical way to reach it? পারস্পরিক প্রীতির ও সহযোগিতার আদর্শকে সমাজজীবনে সত্য ক'রে তোলার বিরাট সমস্যার সামনে বিবেকানন্দ এবং বুদ্ধ দু'জনকেই দাঁড়াতে হয়েছিল। সমস্যার সমাধানের একই পথ উভয়েরই কাছে দেখা দিয়েছিল। সাম্যের এবং ঐক্যের মহা-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জনসাধারণের চেতনায়। ঔপনিষদিক অনাসক্তির ও প্রেমের আদর্শকেই সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়াই ছিল গৌতমবুদ্ধের জীবনব্রত। উপনিষদে কীর্তিত প্রেমের আদর্শে সকলকে, বিশেষ ক'রে শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলবার জন্য দেশময় বেদান্তপ্রচারকে বিবেকানন্দও কি তাঁর ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন নি? জীবন-যাপন করতে হবে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ'—এই বাণী দেশময় ঘুরে ঘুরে বুদ্ধ প্রচার করলেন চল্লিশ বৎসর কাল। বিবেকানন্দ ইহলোকে ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বৎসর। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগোর ঐতিহাসিক বক্তৃতা, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমাধি। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর কর্মজীবন সীমিত। কিন্তু তাঁর এক একটি বক্তৃতা যেন এক একটি আণবিক বোমা। সেই বক্তৃতাগুলি ভারতবর্ষের মর্মের গভীরে একটা আলোড়ন নিয়ে এলো। বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রচণ্ড ধাক্কায় মৃতকল্প জাতির মধ্যে দেখা দিল প্রাণের একটা স্পন্দন। স্বামীজীর কণ্ঠেও ধ্বনিত হোলো সেই একই বাণী: "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ।" স্বামীজী বললেন, "Throw away everything, even your own salvation, and go and help others."

আসলে উভয়েরই জীবনব্রত ছিলো জন-সাধারণের মধ্যে পরস্পরের জীবনকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো, সকলেরই জীবনের মূল্য সমান, এই সাম্যবোধের মধ্যে যাতে তারা জাগ্রত হয়, সমস্ত মানুষই মূলত: এক,—সত্যের এই আলোর মধ্যে নতুন দৃষ্টি তাদের খুলে যায়! তুমি আমি এক, জনসাধারণ ও আমরা এক—উপনিষদের এই অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন 'The crest-jewel of all spiritual thought'. কিন্তু এত আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হয়েও আমরা লাখো লাখো মানুষকে সমাজের এক-প্রান্তে অস্পৃশ্যতার মধ্যে নির্বাসিত ক'রে রেখেছি। কোটী কোটী মানুষকে দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে আমরা আধ্যাত্মিকতার বড়াই করছি! স্বামীজী বললেন, "What we want is not so much spirituality as a little of the bringing down of the Advaita into the material world. First

bread and then religion." উপনিষদের অদ্বৈতবাদ নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা ব'লে কি হবে? ওদিকে কোটী কোটী মানুষের জীবন কাটছে অনশনের অসহনীয় যাতনার মধ্যে। উপনিষদের 'যস্তু সর্বাণি ভূতানি' শ্লোক শুনিয়ে মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়? তাই বিবেকানন্দ বললেন, ভূরি ভূরি মতবাদের কথা আওড়াতে পারো, তোমাদের মধ্যে লাখো লাখো সম্প্রদায় গজাতে পারে। কিন্তু সবই ভুয়ো যদি হৃদয়ে তোমাদের করুণা না থাকে। স্বামীজী বললেন, "এদেশ দুটো অভিশাপে অভিশপ্ত। প্রথম অভিশাপ আমাদের দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি আমাদের ঘৃণা, আমাদের শুকিয়ে যাওয়া হৃদয়।" উপনিষদের ঐক্যের দিব্যবাণীকে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে আনার উপরে জোর দিলেন স্বামীজী। জনসাধারণের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে যে অনুভব করা, তার প্রকাশ হোক দৈনন্দিন আচরণে। এত অধ্যাত্মবাদের ছড়াছড়ির পরিবর্তে আমরা বাস্তব জগতে অদ্বৈতের স্বল্প অংশকেও যদি কাজে লাগাতে পারতাম! যারা দীন, দরিদ্র, উৎপীড়িত তাদের জন্য একটু ভাবতাম! কর্মের মধ্যে আমাদের মানব-প্রীতির একটু পরিচয় দিতাম! আমরা একটু কম আত্মকেন্দ্রিক এবং একটু বেশী মানব-প্রেমিক হোতাম! "The unnumbered millions to whom we have talked of Advaita and whom we have hated with all our strength." মুখে ঐক্যের কথা, অন্তরে ঘৃণা—এই কপটতা স্বামীজীর কাছে ছিল ভয়াবহ।

কিন্তু বিবেকানন্দের জীবন-বাঁশিতে প্রেমের সুর ছাড়া আরও একটা সুর বাজছে এবং সেই সুরটি প্রেমের সুরের তুলনায় যেন আরও বেশী জোরালো! বিবেকানন্দ আমাদিগকে জীবন-যুদ্ধে গাণ্ডীবধন্বার ভূমিকা নিতে আহ্বান করেছেন। এই পৃথিবীতে আমরা যারা বাস করছি, আমাদের সকলের কাছেই তো জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পরাজয় ধর্তব্যের মধ্যে নয়, ভয় পেয়ে বাধার কাছে নতি স্বীকারের দুর্বলতাই সর্বনেশে! ছেলেবেলা থেকেই স্বামীজীর অনুরাগ নিঃশঙ্কচিত্তের ক্ষাত্রতেজের গরিমার প্রতি। ভগবদ্গীতার উপরে প্রদত্ত একটি ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে: "পাপ বলতে একটিমাত্রই আছে-সেটি হচ্ছে দুর্বলতা। কিশোরবয়সে আমি কবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস্ লস্ট্' পড়েছিলাম। আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল সাধুব্যক্তি হিসাবে একটিমাত্র চরিত্র এবং সেই চরিত্র হচ্ছে শয়তান। একমাত্র সাধু তিনিই যিনি বিপদে কখনো ভয় পান না, সমস্তকিছুর সম্মুখীন হ'তে যিনি প্রস্তুত, হয় জয়, নয় মৃত্যু—এই সংকল্পে যিনি দৃঢ়। ভয়ে অন্যের ইচ্ছার দ্বারা নিজের আচরণকে যেখানে আমরা নিয়ন্ত্রিত হতে দিই, সংসার-সমুদ্রে জীবন-তরী চালানোর ব্যাপারে স্বাধীন ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেখানে অন্যের ইচ্ছাকে আমরা শিরোধার্য করি রাজভয়ে, লোকভয়ে, মৃত্যুভয়ে—সেখানে মানুষের পর্যায় থেকে আমরা নিঃসংশয়ে নেমে যাই ক্রীতদাসের পর্যায়ে।" অনন্ত সুখের লোভেও শয়তান স্বর্গে দাসত্ব করতে প্রস্তুত নয়। শয়তানের মধ্যে কাপুরুষতার নামগন্ধ নেই। কি পুরুষ, কি নারী সকলের মধ্যেই বিবেকানন্দ দেখতে চেয়েছিলেন নিঃশঙ্ক বলিষ্ঠতার বিকাশ। নিবেদিতা তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সেটি হচ্ছে: "শক্তি, শক্তি, শক্তিই ছিলো একমাত্র গুণ যার

উন্মেষ সাধনে যত্নবান হ'তে নারী-পুরুষ সকলকেই তিনি আহ্বান করেছিলেন।" মহাভারতের ভগবদ্‌গীতার উদ্‌গাতা কৃষ্ণের কণ্ঠে শক্তিরই বাণী। চিত্তদৌর্বল্যের চরণে নতি স্বীকার করে অর্জুন বৈরাগ্যের পথে পা বাড়াতে যখন প্রস্তুত, কৃষ্ণ বললেন: 'নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে'। বিবেকানন্দ এর ভাষ্য করেছেন: Because you are infinite spirit, it does not befit you to be a slave. কৃষ্ণের কণ্ঠে শান্তির ললিত বাণী নয়, তূর্যধ্বনি। গীতাসিংহনাদকারী এই শক্তিময় কৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রিয় ছিলেন। দাসত্বের প্রতি ঘৃণা এবং স্বাধীনতার অনুরাগ তাঁর ছিলো মজ্জাগত। নিবেদিতার লেখায় আছে: স্বামীজীর গৈরিকবসনের আড়ালে ছিলো বর্মপরা একজন যোদ্ধা। আলখাল্লা কতবার খ'সে খ'সে পড়তো আর দেখা দিতো যোদ্ধার বর্ম। How often did the habit of the monk seem to slip away from him and the armour of the warrior stand revealed!

পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে স্বদেশ সম্পর্কে যে গভীর অভিজ্ঞতা স্বামীজী সঞ্চয় করেছিলেন তার আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন জাতির সমস্ত দুর্গতির মূলে আত্ম-অবিশ্বাস ও ভীরুতা। স্বামীজী তাঁর দেশবাসীদের সম্বোধন করে বললেন: "শতাব্দীর পর শতাব্দী, কমসে কম একহাজার বৎসর ধরে উচ্চবর্ণের লোকেরা, রাজা-বাদশারা, বিদেশীরা এবং তোমাদের আপনজনেরা অত্যাচারে অত্যাচারে তোমাদের গুঁড়িয়ে দিয়েছে; হে আমার ভ্রাতৃগণ, নিদারুণ অত্যাচার তোমাদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নিয়েছে। তোমাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গিয়েছে, তোমরা এখন পদদলিত কীটের মতো! কে তোমাদের শক্তি দেবে? আমি বলছি তোমাদিগকে, এখন শক্তিতেই আমাদের প্রয়োজন আর শক্তি অর্জনের প্রথম সোপান উপনিষদ্‌কে আশ্রয় করা এবং বিশ্বাস করা—আমি আত্মা, অনন্ত শক্তির আধার।" বিবেকানন্দ আমৃত্যু উপনিষদ্‌ প্রচার করে গেলেন একটা নির্বীর্য, আশাহত তমোভাবাপন্ন জাতিকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এবং জাগ্রত করবার জন্য। স্বামীজী বললেন, "অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ কোন বাদই প্রচার করতে চাইনে আমি পৃথিবীতে। একটিমাত্র 'ইজ্‌ম্‌'-এ আমাদের এখন প্রয়োজন আছে এবং সেটা হ'চ্ছে -this wonderful idea of the Soul—Its eternal might, Its eternal strength, Its etermal purity, Its perfection." দেহাত্মবুদ্ধির মূঢ়তা থেকেই ভয়ের জন্ম। কাপুরুষতার এবং ক্লৈব্যের রাহুগ্রাস থেকে বিবেকানন্দ জাতিকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই দেশময় প্রচার করে গেলেন উপনিষদের আত্মতত্ত্ব। সমস্ত শক্তি দিয়ে দিক থেকে দিগন্তরে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করে গেলেন: "আমরা আসলে আত্মা, যার বিনাশ নেই দেহের নাশে, যার শক্তি কোন কালেই ফুরোবার নয়, যার শুচিতা এবং পূর্ণতা অন্তহীন।" আজন্মসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বললেন, "যদি আমার একটা ছেলে থাকতো তাকে জন্মমুহূর্ত থেকে শোনাতাম, তুমি চির নির্মল আত্মা।" এইবার, বোধ হয়, আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করতে পারি।

উপসংহারে আবার গৌতমবুদ্ধে ফিরে আসা যাক। 'The Sages of India' বক্তৃতায় বিবেকানন্দ চমৎকার কথা বলেছেন। বলেছেন, "বুদ্ধকে আমরা ভগবানের অবতার বলে পূজা করি। নীতির মর্ম প্রচার করেছেন যাঁরা পৃথিবীতে, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়,

সাহসের দিক থেকে তাঁর জুড়ি নেই ; কর্মযোগী হিসাবেও বুদ্ধ অতুলনীয়। বুদ্ধ অবতারে সেই একই কৃষ্ণ যেন নিজের শিষ্য হয়ে জন্মালেন তাঁর তত্ত্বগুলিকে কেমন করে কাজে পরিণত করা যায় তা দেখাবার জন্য।" কৃষ্ণ-অবতারে ভগবান গীতায় ঘোষণা করলেন, "নারী হোক বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক—সবাই পরম লক্ষ্যে পৌঁছাবে। "আরও ঘোষণা করলেন, "ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত জেনে যোগী নিজে নিজেকে কখনো হিংসা করেননা এবং এইভাবে চরম লক্ষ্যে উপনীত হন।" এই যে সাম্যের এবং ঐক্যের পরম বাণী গীতায় ঘোষিত হোলো মেঘমন্দ্রস্বরে—এই বাণীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই যেন "the preacher himself came in another form and this was Sakyamuni, the preacher to the poor and the miserable, he who rejected even the language of the gods to speak in the language of the people, so that he might reach the hearts of the people ; he who gave up a throne to live with beggars, and the poor, and the downcast ; he who pressed the pariah to his breast like a second Rama." (Vivekananda) অর্থাৎ "গীতার প্রচারক নিজেই এলেন শাক্য মুনির মূর্তিতে ; গরীবগুর্বোদের দ্বারে দ্বারে প্রচার করলেন ধর্ম : জনসাধারণের ভাষায় তাদের মর্মের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেবার জন্য দেবভাষা পর্যন্ত যিনি বর্জন করলেন ; যারা গরীব-দুঃখী, ভিক্ষুক এবং পতিত তাদের সঙ্গে বাস করতে সিংহাসন ছাড়লেন এবং দ্বিতীয় রামের মতো চণ্ডালকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।" এইবার বোধ হয় আমরা অকুণ্ঠ ভাষায় বলতে পারি, বুদ্ধ এবং বিবেকানন্দ কালের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও একই গোত্রের। জনসাধারণের প্রতি উভয়েরই হৃদয়ে কি বিশাল সহানুভূতি! সেই সহানুভূতির বশে গৌতমবুদ্ধ ও বিবেকানন্দ জনসাধারণের মধ্যে সাম্যভাব-প্রচারকে জীবনের ব্রতহিসাবে গ্রহণ করেছিলেন যাতে সে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' আমাদের জীবনকে আমরা নিবেদন করতে পারি, যাতে জনসাধারণের দুঃখে আমাদের শুকিয়ে-যাওয়া হৃদয়গুলি করুণায় অভিভূত হয়, যাতে আত্মকেন্দ্রিকতার মহাপাপ ও আদিম পাপ থেকে আমরা মুক্ত হই। বুদ্ধের ও বিবেকানন্দের জীবনব্রতের পরম তাৎপর্যকে বিবেকানন্দের ভাষাতেই পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন করে এই প্রবন্ধ এইবার শেষ করি : "The time has come when the Advaita is to be worked out practically. Let us bring it down from heaven into the earth ; this is the present dispensation." জীবনে খুঁটিনাটি আচরণে অদ্বৈতভাবের অনুসরণ করতে হবে। অদ্বৈতভাবকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে আনতে হবে আমাদের এই ধূলিমাটির পৃথিবীতে। এই হচ্ছে যুগের বিধান।

বিবেকানন্দের গৈরিকের নীচে সৈনিকের বর্ম। বুদ্ধের গৈরিকের নীচে বর্মের কথা ভাবতে কল্পনায় বাধে। শান্ত তথাগতের জীবনদর্শনে বিবেকানন্দের ব্রহ্মাই বা কই ?

ভাষার বিচার

অধ্যাপক সুজয়গোপাল রায় পোদ্দার

ভাষা কি? ভাষার তাৎপর্যই বা কোথায়? এমন ধারা প্রশ্নের সদুত্তর পাবার প্রয়াস নতুন নয়; বহুযুগ হতে বহু মনীষী নানান দৃষ্টিকোণ থেকে এমন সব প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনা করে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক, বৈয়াকরণ, বা দার্শনিক—এইসব কোন দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রবেশ না করে সহজে অল্পকথায় সর্বজন-বোধগম্য এবং সর্বজনস্বীকার্য ভাবে এইটুকু অন্ততঃ বলা চলে যে, ভাষা হচ্ছে মনের কথা (ভাবনাচিন্তা, সুখদুঃখ কামনাবাসনা) প্রকাশ করার বাহন বা উপায় মাত্র। মনের গহনে ডুবে থাকা অস্ফুট বৃত্তিগুলোকে তার বুকের পরে ভাসিয়ে দিয়ে সর্বজনসমক্ষে তাদের ফুটিয়ে তোলার কৌশল হলো ভাষা।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য কিন্তু নয় ভাষার একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা। ভাষা তার উদ্দেশ্য সাধনে কতটা সিদ্ধিলাভ করেছে—এই মূল্যায়নটুকুই হলো বর্তমান আলোচনার প্রথম এবং প্রধান প্রেরণা।

শেষ থেকে শুরু করে সহজ কথায় বলা চলে যে, ভাষা তার আপন লক্ষ্যলাভে বেশী-দূর এগুতে পারেনি। কিছুটা পথ অতিক্রম করেই তাকে থেমে যেতে হলো। বিজয়ী বীরের বহু আকাঙ্ক্ষিত বরমাল্য তার কণ্ঠের শোভা হতে পারেনি। ভাষা যেন অর্ধপথ-গামী, শ্রান্ত, ক্লান্ত, নিঃশেষিতপ্রাণ কোন এক পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী—দুর্বার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বুঝি বা বিধির কোন অদৃষ্ট বিধানে পথ চলার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে আর এগিয়ে যেতে অক্ষম; দূর থেকে তার ইষ্টকে প্রণাম করেই তাকে তৃপ্ত থাকতে হয়। ভাষা চায় ভাবকে তুলে ধরতে, কিছুটা তুলে বুঝি বা ভাবের ভার সইতে না পেরে সে লজ্জায় পিছু হটে যায়। ভাবের কাছে ভাষার এইখানেই হার।

আমাদের এই সিদ্ধান্তটি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক। 'দুধ হয় সাদা' —এটি একটি ভাষায় প্রকাশিত মানসিক প্রক্রিয়া যার নাম অবধারণ বা বিচার। চোখ মেলে 'দুধ' নামক বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করে মনে মনে 'দুধ হয় সাদা' এমন বিচার করার পর যখন ঐ বিচারটিকে হয় কথায়, না হয় লেখায় রূপদান করি, তখন আসল 'দুধ' এবং তার 'সাদাত্ব' থাকে অনেক দূরে। 'দুধ' এই শব্দটি তো আর সত্যিকারের দুধ নয়। আসল দুধ হলো সেই দুধ যা একটু আগে কোন একটি পাত্রে সংরক্ষিত আছে বলে চোখ দেখতে পেয়েছে। সুতরাং 'দুধ' এই পদটি আসলে মূল দুধের প্রতিনিধি বা ছায়া মাত্র। ছায়া তো আর কায়া হতে পারে না। কায়া আসল, ছায়া নকল। তাই সহজেই অনুমেয় যে, 'দুধ' এবং 'সাদা' এ দুটি শব্দ বা ভাষারূপ দুটি আসল বস্তুসত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা অপ্রত্যক্ষ ধারণা যোগায় মাত্র। 'দুধ' শব্দটি কখনই সেই শ্বেতবর্ণ পুষ্টিকর একটি তরল পদার্থের—সম্পূর্ণ পরিচিতি প্রদান করতে পারে না। ঐ রকম কোন একটি পদার্থ বস্তুত যে আছে এমন

একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা সে দিতে পারে মাত্র। আসল 'দুধ' প্রকাশিত হয় সুস্থ ইন্দ্রিয় এবং সচেতন প্রকৃতিস্থ মনের কাছে। এমনি ভাবে এমনি প্রমাণ করা যেতে পারে যে আমরা কথায় যা বলি, লেখায় যা তুলে ধরি, এককথায় ধ্বনি ও চিত্র, শব্দ এবং রেখার মাধ্যমে যখন আমরা ভাবকে প্রকাশ করি তখন ভাব যথার্থই প্রকাশিত হয় না। আসল বস্তুটি, যাকে কেন্দ্র করে ঐ ভাব, তা নিশ্চয়ই উচ্চারিত বা চিত্রিত কোন শব্দ নয়, কারণ উচ্চারিত এবং চিত্রিত শব্দ আসল বস্তুটির চরিত্র বহন করে না এবং সেই অনুসারে কার্যও করে না। 'দুধ' পান করে স্বাস্থ্যের পুষ্টি-সাধন হয় সত্য, কিন্তু 'দুধ' শব্দটিকে তো আর পান করা যায় না এবং সেজন্য শুধুমাত্র 'দুধ' শব্দটি আমাদের স্বাস্থ্যলাভের কারণও হয় না। সুতরাং বোঝা গেল যে ভাষায় প্রকাশিত বস্তুটি অর্থাৎ শব্দটি আসল বস্তু নয়; আসল বস্তু বা বস্তুসত্তা এমনি ভাবে কখনও প্রকাশযোগ্য নয়। কোন কথার বাঁধনে বা লেখার মায়াজালে বস্তুসত্তাকে বন্দী করা যায় না। এখানে একটি আপত্তি উঠতে পারে যে আমরা দুধ দেখে যখন সঙ্গে সঙ্গে বলি 'দুধ হয় সাদা' তখন আসল দুধ তো সামনেই থাকে—সে তো অপ্রকাশ্য থাকে না। উত্তরে বলি,—এমন অবস্থায় দুধ প্রকাশিত হয়েছে সত্যি, কিন্তু 'দুধ' এই শব্দটির দ্বারা নয়—তা সম্ভব হয়েছে দুধ-এর সঙ্গে আমাদের চক্ষু ও মনের মিলনের ফলে—এটা হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। 'দুধ হয় সাদা'—একথা না বললেও দুধ আমাদের কাছে সাদা বলেই মনে হতো। এই স্থলে সাদা দুধের অস্তিত্ব আমাদের বলার উপর নির্ভর করে না। চোখ বন্ধ করে যখন বলি দুধ হয় সাদা—তখন এই উক্তিটি কিন্তু 'সাদা দুধ' নয়—আসল 'সাদা দুধের' প্রতি একটি ইঙ্গিত মাত্র। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে কোন রকম আপত্তি থাকার কথা নয় যে, সত্য অথবা বস্তুসত্তা কখনই ভাষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ ভাষা তার স্বধর্মপালনে নিতান্তই অক্ষম। এই হিসেবে ভাষা বড় দীন, বড় অসহায়। বিশেষণের অলংকারে ভাষাকে যতই সাজিয়ে তোলা হোক না কেন, সে আসল বস্তুসত্তাকে কখনই পূর্ণভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারে না।

এই সিদ্ধান্ত যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহলে অতীন্দ্রিয় অসীমের বেলায় যে এর যাথার্থ্য আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতীন্দ্রিয় জগতের কথা বলতে গিয়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা নানা ভাবে এই কথাই শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে এ হলো 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার।' ইহা যে শুধু বাক্যের (ভাষার) অতীত তাই নয়, আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে ঋষিরা বলেছেন যে, পরমসত্য মনেরও নাগালের বাইরে (ভারতীয় দর্শনে মনকেও একটি ইন্দ্রিয় বলে অভিহিত করা হয়)। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ বোধির বোধে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণে সেই সত্য উদ্ভাসিত হয়। অসীম নীরবতায় অনন্ত প্রশান্তিতে সেই অতীন্দ্রিয় পরম সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে থাকে, সেখানে সবকিছু মিলে মিশে শুধু এক অদ্বৈত সত্তার অস্তিত্বই শেষ পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

প্রশ্ন হতে পারে—পুঁথিপত্রে, শাস্ত্রগ্রন্থে, গুরুমুখে কত যুগ যুগ ধরে কত যে বিচিত্র বিদগ্ধ আলোচনা হয়েছে এই সত্যকে কেন্দ্র

[শেষাংশ ৩৭৫ পৃষ্ঠায়]

উত্তরাখণ্ড তীর্থ-পরিক্রমা

স্বামী তেজসানন্দ

(১)

তত্ত্বজ্ঞানেপ্সু সাধকের প্রতি শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের নির্দেশ

এই অনিত্য সংসারের বন্ধুর পিচ্ছিল পথে বিচরণকারী মানুষ যখন দিশাহারা হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শান্তির অমিয়ধারায় অবগাহন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন কোলাহল-মুখর এই সংসার হইতে দূরে কোন নির্জন স্থানে প্রকৃত শান্তি ও বিশ্রামের আশায় সে উদগ্র আগ্রহে ছুটিয়া যায়। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে অন্তরের জন্মজন্মান্তরীণ দৃঢ়মূল বাসনাসমূহ সেই অমৃতপথযাত্রীর যাত্রাপথে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া পথিককে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করিয়া তোলে। অঘটনঘটনপটীয়সী এই মায়ার কবল হইতে কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করা সম্ভব, যুগে যুগে তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণ জগতের সম্মুখে স্ব স্ব জীবনের উপলব্ধির মাধ্যমে তাহা মানব কল্যাণে প্রকট করিয়া গিয়াছেন। যোগিরাজ শ্রীভর্তৃহরি তাঁহার অমূল্য 'বৈরাগ্যশতক' গ্রন্থে এই কুহকিনী মায়ার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন পূর্বক শাশ্বত শান্তির পন্থা নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আশানামনদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা,
রাগ-গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা ধৈর্যদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী,
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি
যোগীশ্বরাঃ॥" ১০

—অর্থাৎ সংসারসুখের আশা যেন একটি মহানদী এবং চঞ্চল মনের অজস্র সংকল্প বিকল্প এই নদীর জল; আর বিষয়-তৃষ্ণাই উহার তরঙ্গ। ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তি এই নদীর কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তু। ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিবিষয়ক চিন্তা ও উদ্বেগ যেন সেই নদীবক্ষে সঞ্চরণশীল পক্ষিসমূহ। নদীর প্রবল প্রবাহ যেমন বৃহৎ বৃক্ষসকলকে উন্মূলিত করিয়া ফেলে তদ্রূপ সংসার-আশা চিত্তের নির্বিকারতাকে ধ্বংস করে। দম্ভদর্প প্রভৃতি অজ্ঞানপ্রসূত নানা মোহ এই আশানদীর অসংখ্য আবর্ত এবং সাংসারিক বহুবিধ দুশ্চিন্তা যেন উহার উচ্চতট। এই মহানদী সত্যই দুরতিক্রম্যা। বিশুদ্ধচিত্ত যোগিবরগণই শুধু এই মহানদী উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং এই নদী পার হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

এতাদৃশ তপস্বী যোগিবরের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি আবার বলিয়াছেন—

"ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা,
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিৎ তপস্বী
স্থিতঃ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সংপ্রাপ্তকন্থাসনো,
নির্মানো নিরহংকৃতিঃ শমসুখভোগৈকবদ্ধ-
স্পৃহঃ॥" ৯৫

—অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নে যিনি শরীর ধারণ করেন, জনসঙ্গে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি স্বচ্ছন্দবিচরণশীল এবং ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বুদ্ধিশূন্য, পথে পরিত্যক্ত ছিন্ন ও পুরাতন বস্ত্রখণ্ডই যাঁহার পরিধেয়, দৈবপ্রাপ্ত কন্থাই যাঁহার আসন, নিরভিমান, দেহাধ্যাসরহিত, বৈরাগ্যজনিত নিরতিশয় আনন্দাভিলাষী,—এমন বিরল ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ও তপস্বী।

বলা বাহুল্য, স্মরণাতীত কাল হইতে এই সমুন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ ঋষিমুনিকণ্ঠে ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে উদ্গীত হইয়া আসিতেছে এবং এই শ্রেয়ঃপথের পথিকগণই বিমল শান্তির অধিকারী হইয়া ধন্য হইয়াছেন এবং জগদ্বাসীকেও প্রকৃত শান্তি-পথের সন্ধান দিয়া আসিয়াছেন। কর্মকোলাহল-মুখর জনপদ হইতে দূরে নির্জনে পার্বত্যপ্রদেশে নিরলম্বভাবে শান্তিতে সাধন-ভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা কাহার না প্রাণে জাগিয়া উঠে? আচার্য শঙ্কর ত্যাগ ও তপস্যার মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'কৌপীন-পঞ্চকে' লিখিয়াছেন—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ
চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু
ভাগ্যবন্তঃ॥ ১ ॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং
ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু
ভাগ্যবন্তঃ॥ ২ ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্বেন্দ্রিয়-
বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু
ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩ ॥
দেহাদিভাবং পরিবর্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলো-
কয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ
খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি
বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ
খলু ভাগ্যবন্তঃ॥" ৫

—অর্থাৎ, সর্বদা বেদান্তবাক্যে রত, ভিক্ষান্ন-মাত্রের দ্বারা পরিতৃপ্ত, শোকহীন অন্তঃকরণে বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

কেবল বৃক্ষমূলে আশ্রয়কারী, ভোজনার্থ হস্তদ্বয়ের সাহায্যগ্রহণকারী, লক্ষ্মীকেও কন্থার ন্যায় পরিত্যাগকারী, কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

যাঁহারা স্বীয় আনন্দস্বরূপে বিভোর, যাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সুসংযত, দিবা-রাত্র যাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে রত সেই সকল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিহীন, অন্তঃকরণে স্বীয় স্বরূপ সাক্ষাৎকারী এবং অন্ত, মধ্য ও বহির্বিষয়ে চিন্তাশূন্য কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

পবিত্রওঙ্কার-উচ্চারণশীল, 'আমি ব্রহ্ম'—এই চিন্তায় নিমগ্ন, ভিক্ষান্নভোজী, দিগ্‌দিগন্ত বিচরণশীল কৌপীনধারীই ভাগ্যবান।

বস্তুতঃ কোন মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে হইলে অধৈর্য হইলে চলিবে না। নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ও অসীম ধৈর্যের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পাদাচার্য তাঁহার মাণ্ডুক্যকারিকায় তত্ত্বজ্ঞানেপ্সু তপস্বী সাধক-মাত্রকেই ধৈর্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন—

"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ॥"
১০৮।৪১

—অর্থাৎ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা এক এক বিন্দু জল তুলিয়া সমুদ্রসেচনের প্রয়াস যেরূপ, (যোগানুষ্ঠানে) অনির্বিণ্ণচিত্তে উদ্যমসহকারে নিগ্রহও ঠিক তদ্রূপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুরূপ ধৈর্যের নির্দেশ দিয়াছেন—

"শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"
৬।২৫

অর্থাৎ, ধীরে ধীরে ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে

উপরতি অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করিবে না।

ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, তপস্যাদিকালে অপ্রত্যাশিতভাবে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধকের মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিপথগামী করিয়া তোলে। তজ্জন্য সাধুসজ্জনবিহীন নির্জন স্থানে একাকী তপস্যায় নিযুক্ত থাকা অনেকক্ষেত্রে বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কারণ, অবচেতন মনে স্তরে স্তরে যে-সকল শুভ ও অশুভ সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, ধ্যান-জপাদির সময় সেই সুপ্তসংস্কারসমূহ একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং অবাঞ্ছিত ও বিরুদ্ধ বৃত্তিসকল সাধককে বিভ্রান্ত ও যোগভ্রষ্ট করিয়া তোলে। তাই বৈদিক যুগ হইতে অদ্যাবধি তত্ত্বদর্শীমাত্রেই সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন।

সন্ন্যাসজীবনের বিষয়াসক্তি পরিবর্জন ও ত্যাগাদর্শের মহিমা কীর্তন করিয়া যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Song of the Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) কবিতায় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"Have thou no home. What home can hold thee, friend ?
The sky thy roof, the grass thy bed ; and food,
What chance may bring, well cooked or ill, judge not.
No food or drink can taint that noble Self
Which knows Itself. Like rolling river free
Thou ever be, Sannyasin bold ! Say,
Om Tat Sat Om !"—(11).

—"সুখতরে গৃহ ক'রো না নির্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্ ?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও ;
হউক কুৎসিত, কিংবা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে ?
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মতো,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

এই সমুন্নত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কন্টকাকীর্ণ জীবনপথে বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্বক চলমান-স্রোতস্বতীর ন্যায় চলিতে পারিলে বাঞ্ছিত চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী আবার ইহাও বলিয়াছেন,—পূর্বোক্ত-শাস্ত্রবিহিত সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শ জীবনে সম্যক রূপায়িত করিতে হইলে ভগবদ্বুদ্ধিতে সর্বজীবের সেবারও একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয়,—ব্রহ্ম হইতে কীট-পরামাণু সর্বভূতে পরমপ্রেম এক ঈশ্বর বিদ্যমান। বৈচিত্র্যবহুল বিশ্বচরাচর সেই পরমাত্মারূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহার নাম দয়া,—উহা প্রেম নহে। আর আত্ম-বুদ্ধিতে জীবের যে সেবা করা হয়, তাহাই প্রকৃত প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে আরও বলিয়াছেন—সকল জীবকেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে দেখিতে থাক। তুমি কাহাকেও কৃপা করিতে পার না ; তুমি কেবল

সেবা করিতে পার! তুমি ধন্য যে, তুমি সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছ। উহা তোমার পূজাস্বরূপ। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাহাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করিতে পারি। এইরূপভাবে অপরের সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন।

বলা বাহুল্য, এই ত্যাগ ও সেবাধর্মই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াও সকলে এই মহান সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নিজেদের জীবনে এই সেবাদর্শ জীবন্ত করিরা তুলিয়া যুগ-প্রয়োজনে বনের বেদান্ত ঘরে আনিয়াছেন।

(২)

উত্তরকাশী-তীর্থে

'উত্তরকাশী-মাহাত্ম্যে' বর্ণিত রহিয়াছে যে, মুসলমানগণ যখন পূর্বকাশী (বারাণসী) আক্রমণ করিয়া ৺বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করিয়াছিল, যখন শিবভক্ত পূজারিবৃন্দ শিবলিঙ্গের পবিত্রতারক্ষাকল্পে উক্ত শিবলিঙ্গকে তদানীন্তন-টিহরী-গাড়োয়াল রাজ্যান্তর্গত এই এই নির্জন পার্বত্য প্রদেশে আনয়নপূর্বক যথাবিধি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদবধি এই স্থানটি * 'উত্তরকাশী' নামে জনসমাজে পরিচিত। হিন্দুর ধর্মীয়গ্রন্থোক্ত পঞ্চকাশার অন্যতম এই উত্তরকাশীতেও পূর্বকাশীর (বারাণসীর) অনুকরণে ৺বিশ্বনাথের মন্দির, অন্নপূর্ণা ও কালভৈরবের মন্দির, শক্তিমন্দির এবং মণিকর্ণিকা-শ্মশান ঘাট প্রভৃতি বিদ্যমান। বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়,—যে-ভূমিখণ্ডে এই সকল মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত তাহার কিয়দংশ ঘিরিয়া পূর্বকাশীর ন্যায় গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়াছে এতদ্ব্যতীত নাতিবৃহৎ এই শহরটিতে তপস্যারত সাধুবৃন্দের কুটীর ও আস্তানা (আশ্রম) এবং তাহাদের ভিক্ষার সুবিধার জন্য কালীকমলী-সত্র, জয়পুর-রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একাদশরুদ্রের মন্দির দ্বারা পরিচালিত সত্র এবং পাঞ্জাবী-সত্রও রহিয়াছে। ঐ সকল সত্র হইতে সাধু ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগকে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্তমানে পাঞ্জাবী সত্রের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজনের সৌকর্যার্থে কয়েকটি পাকা কুটীর নির্মিত হওয়ায় উত্তরকাশীর মত দুর্গম স্থানে তাঁহাদের তপস্যাদির সুযোগ সুবিধা হইয়াছে। এই উত্তরকাশীতেই অধুনাবিলুপ্ত কেদারঘাটে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃচ্ছ্রতা, নিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন দর্শনে মুগ্ধ হইয়া উজলীর প্রধান বিদগ্ধ ও উপলব্ধিমান সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী দেবী গিরি মহারাজ পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের তপস্যারত সাধুদের নিকট তুরীয়ানন্দজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন এবং মঠ-মিশনের সাধুদের সম্বন্ধেও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

* গুপ্তকাশী (উত্তরপ্রদেশে কেদার বদ্রীর পথে), উত্তরকাশী (বর্তমান উত্তরপ্রদেশে), পূর্বকাশী (বারাণসী অর্থাৎ কাশীবিশ্বনাথ ধাম), ব্যাসকাশী (পূর্বকাশীর গঙ্গার পূর্বকূলে) এবং কাঞ্চী (কাঞ্চীপুরম্‌,—মাদ্রাজ শহরের ৩৪।৩৫ মাইল দক্ষিণে)।

আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে উত্তরাখণ্ডের হিমাদ্রিক্রোড়শায়ী পুণ্যতীর্থ উত্তরকাশী দর্শন ও সেই তপঃক্ষেত্রে কিছুদিন অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী (শ্রীশ্রীমহাপুরুষ) মহারাজের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া উত্তরাখণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গন্তব্যস্থলে যাইবার পথে কিছু দীর্ঘকাল কাশী-রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে বিশ্রামানন্তর আমাদের মঠকেন্দ্র কিষেণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া উত্তরকাশী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সেই সুদীর্ঘ পথে একে একে মুশুরী, কানাতাল, ভল্ডিয়ানা প্রভৃতি হিমালয়স্থ উচ্চ শাখা-শৃঙ্গসমূহ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া এবং পথিমধ্যে কালীকমলী-ধর্মশালায় রাত্রিযাপন ও আহারাদি করিয়া তৃতীয় দিবস সন্ধ্যায় যখন উত্তরাখণ্ডের সেই জনবিরল প্রসিদ্ধ তীর্থ উত্তরকাশীতে ক্লান্তদেহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও কোথায় কোন্ স্থানে আশ্রয় পাইব তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। যে স্থানে উপস্থিত হইলাম তাহার নাম 'উজলী',—উত্তরকাশী শহর হইতে উহা প্রায় এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গোত্রী যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। উক্ত উজলীতে দশনামী, উদাসী, নাথ সম্প্রদায় প্রভৃতির তিতিক্ষাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণ গঙ্গার তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও আস্তানা নির্মাণ করিয়া সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। কিষেণপুর হইতে আসিবার সময় নাগ নাথ নামক নাথ সম্প্রদায়ের জনৈক প্রবীণ সাধু আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ গঙ্গাতীরে একটি আস্তানায় বাস করিয়া তপস্যাদি করিতেন। তিনি কার্যব্যপদেশে হৃষীকেশে আসিয়াছিলেন এবং কয়েকদিন কিষেণপুর আশ্রমেও বাস করিয়াছিলেন। আমি যখন উজলীতে পৌঁছিলাম, তখন আমাদের মঠমিশনের জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসী নাগ নাথজীর কুটীরসংলগ্ন অপর একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বিরক্ত মহাত্মাদের পন্থা অবলম্বন করিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। আমার নিরুপায় অবস্থাদর্শনে তিনি তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি আমার জন্য ছাড়িয়া দিয়া গঙ্গাতীরস্থ অন্য একটি কুটীরে চলিয়া গেলেন। যাহা হউক এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উক্ত স্বামীজীর সৌজন্যে আশ্রয় পাওয়ায় মনের উদ্বেগ দূরীভূত হইল।

আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময় এই সকল তীর্থদর্শনের জন্য যানবাহনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তীর্থযাত্রী সকলকেই পদব্রজে সেই সুদীর্ঘ দুর্গম পার্বত্যপথ অতিক্রম করিতে হইত। এই বিপদ-সংকুল পথে চলিবার সময় তীর্থযাত্রীদের মধ্যে তীর্থ ও দেব-দেবী দর্শনের জন্য প্রবল আগ্রহ ও আকুতি পরিলক্ষিত হইত! যাত্রাপথে তাহাদের কণ্ঠে সানন্দে ধ্বনিত হইত 'জয় গঙ্গামায়ীকী জয়', 'জয় বাবা বিশ্বনাথজীকা জয়'। বদ্রী ও কেদার তীর্থ-দর্শনার্থীদের কণ্ঠেও শুনিয়াছি—'জয় বদ্রীবিশাল কা জয়', 'জয় বাবা কেদারনাথজীকী জয়!' তৎকালে যাত্রীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে ও তাহাদের কণ্ঠোচ্চারিত ভগবানের নাম-গুণগানে সারা রাস্তা মুখরিত থাকিত। বর্তমানে পরিবহনের সুব্যবস্থার ফলে দুর্গম তীর্থাদি দর্শন সহজসাধ্য হওয়ায় কৌতূহলী পর্যটকের মনোভাব লইয়াও বহুজন সেখানে যাইতেছেন।

এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কর্ম-বিহীন অবস্থায় নির্জন স্থানে সময় কাটাইতে হইলে, দৈনন্দিন জীবনের একটি বাঁধা-ধরা নিয়ম (routine) থাকা প্রয়োজন; নতুবা

সময়ের অপব্যবহার হইবার আশঙ্কা থাকে এবং জীবনও একঘেয়ে হইয়া উঠে। তাই সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠের মাধ্যমে ধ্যানাদিসময়-ব্যতিরিক্ত অন্য-সময়ের সদ্ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক যাহাতে মনকে লক্ষ্যবস্তুলাভে তৎপর ও অন্তর্মুখীন রাখা সম্ভব হয়। পূর্বোক্ত কুটীরের অপ্রশস্ত বারান্দায় উপবেশন করিলে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অগণিত নক্ষত্রখচিত মেঘমুক্ত নীলাকাশ ও তরঙ্গায়িত পর্বতমালার অপূর্ব-শোভা দৃষ্টিগোচর হয়। এখান হইতে তুষারশীর্ষসমুন্নত কেল্‌শু পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক তীর্থযাত্রী এই কেল্‌শু পর্বতকেই 'কৈলাশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অদূরে ভাগীরথীর অপর পারে উন্নতশৃঙ্গ পাহাড়ের ক্রোড়শায়ী বৃক্ষবল্লরীবহুল মানা-গ্রামের অধিবাসিগণের ঘরে ঘরে যখন দীপমালা প্রজ্বালিত হইত, তখন সেই পল্লীতে দীপালির শোভা ফুটিয়া উঠিত। সান্ধ্যমুহূর্তে কুটীরের দক্ষিণভাগে অনতিদূরে পর্বতগাত্রে অবস্থিত কৈলাসাশ্রমে শিব-শঙ্করের আরাত্রিক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্রত্য সাধু-ব্রহ্মচারি-বৃন্দ শিবমহিম্নঃস্তোত্র সমবেত কণ্ঠে তাল-লয়-সহকারে গান করিয়া স্থানটি মুখরিত করিয়া তুলিতেন। মনে হইত যেন ত্রিদিবের দেবতা-বৃন্দ মর্ত্যধামে অবতরণ করিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের স্তব করিতেছেন। আরাত্রিকান্তে এই অঞ্চলটি পুনঃ গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যাইত এবং সাধু-সন্ন্যাসিগণও স্ব স্ব কুটীরে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন।

(৩)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

এই পুণ্যতীর্থে অবস্থানকালে কয়েকটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এস্থলে উহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করিলাম :—

(ক) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য-কাহিনী

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছাপ্পান্ন) মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই শীতপ্রধান স্থানেও সাধু-সন্ন্যাসী তত্রত্য কালকমলী-সত্র হইতে ভিক্ষাদি গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ কুটীরে, কেহ বা গিরিদরীতলে অবস্থানপূর্বক সাধন-ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। এই দুর্গম প্রদেশে তীর্থ দর্শন, সাধু-সঙ্গ ও পুণ্যার্জন অভিলাষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে গ্রীষ্মকালে তীর্থযাত্রিগণও আগমন করিয়া থাকেন। এখানে বর্ষাকালে অত্যধিক বারিবর্ষণের ফলে, পর্বতগাত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডও ভীষণ শব্দে এবং প্রচণ্ড বেগে নীচে নামিয়া আসে; তাহার ফলে সম্মুখে যাহা কিছু থাকে সবই গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। উত্তরকাশীতে থাকাকালে একদিন সংবাদ রটিল যে, জনৈক নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ গঙ্গোত্রী হইতে সদ্যমৃত্যুর হাত হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে দৈবকৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন এবং তিনি আর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। আমিও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার এই আকস্মিক বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—তিনি একদিন গঙ্গাতীরস্থ কালীকমলী ধর্মশালা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অন্য একটি স্থানে যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পার্শ্ববর্তী উচ্চ পর্বতশিখর হইতে প্রচণ্ড বেগে পাথর, কর্দম প্রভৃতির ধস নামিয়া তাঁহার উপর পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে তিনি সেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মনুষ্যজীবনের এই অনিশ্চয়তা স্মরণ করিয়া তাঁহার মনে নির্বেদ

উপস্থিত হওয়ায় তিনি আর গৃহে না ফিরিয়া অবশিষ্ট জীবন এই পবিত্র তপোভূমিতে সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতে স্থিরসংকল্প করিয়াছেন।

জাবালোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বনাদ্বা। যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ॥" ৪

– ইহার তাৎপর্য এই যে, মন্দাধিকারীর পক্ষে ক্রম পর্যায়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রম শেষ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করাই বিধেয়। কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—ইহার যে কোন আশ্রম হইতে তিনি প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিতে পারিবেন। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মানুধ্যানের ফলে কি ভাবে সহসা চিত্তে শুভ-সংস্কার জাগ্রত হইয়া উহা মানুষকে আত্ম-জ্ঞানানুশীলনের পথ নির্দেশ করিয়া দেয়, এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের জীবনও ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(খ) রামকৃষ্ণ-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা

উত্তরকাশীর মত নির্জন স্থানে যে-সকল বাঙ্গালী সাধু তপস্যাদি করিতে আসিতেন, তাঁহাদের ধ্যান-ভজনের সময় ব্যতীত অন্য অবসর-সময় কাটাইবার জন্য শাস্ত্রাদিপাঠের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পার্শ্ববর্তী কৈলাসাশ্রমে যে পুস্তকাগার ছিল, তাহাতে অধিকাংশই হিন্দীভাষাভাষীদের উপযোগী গ্রন্থাদি ছিল। বাংলা বা ইংরাজী পুস্তক সেখানে সংগৃহীত হইত না। যাহাতে বাঙ্গালী সাধুদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার হয় তজ্জন্য একটি পৃথক লাইব্রেরীর প্রয়োজন ছিল। নাগ-নাথজীর নাতিবৃহৎ আস্তানায় আমার অবস্থানকালে একটি লাইব্রেরীর সূত্রপাত হইয়াছিল। অন্যত্র স্থানাভাববশতঃ সাধু নাগ-নাথজীর কুটীরের প্রশস্ত বারান্দায় একটি ছোট আলমারীতে পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা হইল। ধীরে ধীরে অনেক ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত হইল। এই গ্রন্থাগারের নাম দেওয়া হইল—'রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী' এবং নাগ নাথজীর আস্তানার নাম-করণ হইল 'শিবালয়'; কারণ, উক্ত আস্তানার একপ্রান্তে একটি উচ্চ প্রস্তরের বেদীতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। পরবর্তীকালে বেলুড় মঠের স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ মহারাজ যখন উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে আগমন করেন, তখন তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যমে ঐ প্রাঙ্গণেই উক্ত গ্রন্থাগারটির জন্য পৃথকভাবে একটি কুটীর নির্মিত হয় এবং ক্রমশঃ উক্ত গ্রন্থাগার বৃহদাকার ধারণ করে। যাঁহারা এখনও উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে গমন করেন, তাঁহারা এই লাইব্রেরী হইতে প্রয়োজন-মত সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা পুস্তকাদি পাঠ করিবার সুযোগ পান।

(৪)

গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থে

আমি এখন উত্তরকাশীতে অবস্থানের শেষ পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। গঙ্গোত্রী ও গোমুখী তীর্থ-দর্শনেরও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে গোমুখী-যাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী ৫৬ (ছাপ্পান্ন) মাইল এবং গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। তৎকালে শেষোক্ত ১৮ (আঠার) মাইলের মধ্যে কোথাও কোন পান্থশালা ছিল না। যাতায়াতের পথে বিশ্রাম ও রাত্রি যাপনের জন্য উত্তরকাশী হইতে একটি ছোট তাঁবু (tent), ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

সংগৃহীত হইল এবং এই সকল জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ পাহাড়ী কুলীও সংগ্রহ করিলাম। এই অভিযাত্রী দলে আমরা চারজন সন্ন্যাসী ছিলাম—স্বামী পরমানন্দ, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ, স্বামী হিতানন্দ (হিরণ্ময় মঃ) ও আমি। আমরা শেষোক্ত তিনজন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের। স্বামী পরমানন্দ দেওঘরের ব্রহ্মময়ী মায়ের শিষ্য। তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে অনেকদিন কর্মীহিসাবে ছিলেন। যে-সময়ের কথা বলিতেছি সে-সময় তিনি উজলীস্থ পরমশ্রদ্ধাপদ দেবীগিরি স্বামীজীর আশ্রমে থাকিয়া তপস্যাদি করিতেন। তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই একবার করিয়া উত্তরকাশীর প্রসিদ্ধ বিদগ্ধ দক্ষিণদেশীয় সন্ন্যাসী স্বামী তপোবন মহারাজের সঙ্গে গোমুখী-দর্শনে যাইতেন। তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক (guide) হইলেন। এই অভিযাত্রী দলে এতদ্ব্যতীত সঙ্গে ছিল মহীশূর (Mysore) হইতে তপস্যার্থে সদ্য আগত রাঘবেন্দ্র রাও নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক। পূজ্যপাদ দেবীগিরি মহারাজের সাহায্যে আমরা তাঁহার সত্রে ভিক্ষা এবং কুটীরেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া শুভদিনে শুভক্ষণে আমরা উত্তরকাশী হইতে যাত্রা শুরু করিলাম। রাস্তায় কালীকমলী-ধর্মশালায় আহার ও রাত্রিযাপনাদি করিয়া তৃতীয় দিনে গঙ্গোত্রী আসিয়া পৌঁছিলাম। ধর্মশালায় পিশু নামক উকুনসদৃশ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দংশনের কথা আজও ভুলিতে পারি নাই! যাহা হউক, গঙ্গোত্রী পৌঁছিয়া স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী নামধেয় জটাজূটধারী জনৈক প্রবীণ বাঙালী সন্ন্যাসীকে একটি গুহাভ্যন্তরে তপস্যায় নিযুক্ত দেখিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপাদি করিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলাম।

উত্তরকাশী হইতে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাস্তার বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার ধারে বৃক্ষচ্ছায়া-নিবিড় জায়গায় কুটীর বাঁধিয়া অনেক সন্ন্যাসীকেও তপস্যারত দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাঁহারা পার্শ্ববর্তী পল্লী হইতে মাধুকরী-ভিক্ষালব্ধ আহার্যদ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কখনও বা তীর্থযাত্রীরাও ভক্তিভরে ইঁহাদিগকে ভিক্ষাদি প্রদান করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেন।

তখনকার দিনে গঙ্গোত্রী হইতে গোমুখী পর্যন্ত কোন বাঁধা-ধরা রাস্তা বা পান্থশালা ছিল না। সকল তীর্থযাত্রীকেই গোমুখী পর্যন্ত জনমানবহীন বিপদসঙ্কুল এই দুর্গম গিরিপথে অতিকষ্টে খরস্রোতা গঙ্গার তট বাহিয়া গন্তব্য-স্থলে পৌঁছিতে হইত। গঙ্গোত্রী হইতে প্রায় ছয় মাইল অতিক্রম করার পর, দ্বিপ্রহরে আহারাদির ব্যবস্থা হইল। আহার শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে সহসা একটি মেষশাবকের অস্ফুট-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই শাবকটি আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা যে ভুটীয়া ব্যবসায়ীদের গড্ডালিকাযূথভ্রষ্ট একটি মেষ-শিশু, তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কারণ ভুটীয়ারা (ভুটানদেশীয় ব্যবসায়ীরা) মেষের পৃষ্ঠে চাল, ভেলীগুড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ার বস্তা সাজাইয়া ভারতের সমতল ভূমিতে আনয়নপূর্বক উহার দ্বারা ব্যবসায় করিয়া তাহাদের জীবিকার্জন করিয়া থাকে। দৃঢ় বিশ্বাস, সেইরূপ একটি দল হইতে বিচ্যুত হইয়া এই শাবকটি পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সৌম্যদর্শন বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক রাঘবেন্দ্র রাও শাবকটিকে স্কন্ধে করিয়া সুদীর্ঘ

পথ চলিবার সিদ্ধান্ত করিল এবং গঙ্গোত্রী প্রত্যাবর্তনের পর উহাকে মেষদলে মিলাইয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার অদমনীয় অথচ সহৃদয় ভাব-দর্শনে আমরা কোন বাধা প্রদান করিলাম না। শাবকটি তখনও তৃণাদি-ভক্ষণে অসমর্থ; তজ্জন্য তাহাকে প্রয়োজনমত ভাতের মণ্ড (gruel) নানা উপায়ে খাওয়াইয়া শেষপর্যন্ত জীবিত রাখা সম্ভব হইয়াছিল।

আমরা আরও ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ছায়াসমন্বিত একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সে-স্থানটি ভূর্যবৃক্ষবহুল একটি সমতল ভূমি। পূর্বে পূর্বে যে-সকল তীর্থযাত্রী ঐ পথে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের রন্ধনান্তে পরিত্যক্ত অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠাদির চিহ্নও সেখানে কিছু কিছু রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এই ভূর্যবৃক্ষের বল্কলই (bark) প্রাচীনকালে কাগজের পরিবর্তে গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। উক্ত বৃক্ষের স্থূল শাখা হইতে ঐ বল্কল বাহির করিয়া যাত্রীরা কখন কখন উহাই আহারের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, আমরা তাঁবু খাটাইয়া জিনিসপত্র তন্মধ্যে রাখিলাম। চিরতুষারাস্তীর্ণ হিমালয়ের নৈকট্যবশতঃ এই স্থানের শৈত্যের পরিমাণ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা সহজেই অনুমেয়। অত্যধিক শৈত্যবশতঃ আহারান্তে নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হইল না। অগত্যা ধুনি জ্বালিয়া ভগবানের স্মরণ মনন ও ভজনাদি করিয়া সেই বৃক্ষতলেই রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উক্ত তাঁবুতে সেই মেষ-শাবক ও কম্বলাদি অন্যান্য জিনিস রাখিয়া কিছু রুটি ও হালুয়া সঙ্গে লইয়া গোমুখী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। সম্মুখে আর মাত্র ছয় মাইল পথ। কিন্তু উহাও যে কত দুর্গম তাহা বর্ণনাতীত। এই ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে ছয় ঘণ্টার মত সময় লাগিয়া গেল। প্রায় বেলা বারটার সময় শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বহু ঈপ্সিত পুণ্যতীর্থ গোমুখীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনন্তুতুষারাবৃত গোমুখীর সেই নয়নাভিরাম মনোরম দিব্য দৃশ্য আজও মানস-নয়নে উজ্জ্বল বিভায় ভাসিয়া উঠে। হিমগিরির স্তূপীকৃত জমাট-হিমানীর গাত্রমধ্য হইতে ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ অবিশ্রান্ত ধারায় নির্গত হওয়ায় সেই স্থানটি গো-মুখাকৃতি ধারণ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই সেই গহ্বরটিকে গোমুখী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বৃহৎ শিলা-খণ্ডসমূহও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গোমুখী হইতে প্রসৃত এই জলধারাই গঙ্গা নামে অভিহিত। উহা তাহার অগ্রগতি-পথে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। সুরধুনীর উভয় পার্শ্বে ধবলতুষার-মণ্ডিত সমুন্নত পর্বতশ্রেণী যেন পূতসলিলা গঙ্গা-দেবীকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইবার জন্য নীরবে দণ্ডায়মান। যতদূর দৃষ্টি চলে সেই গোমুখী হইতে ধবল জমাট বরফ ছাড়া অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা সেই গোমুখী-তীর্থসলিল শিরে ধারণ করিয়া এবং পথে সংগৃহীত শুভ্র কাশফুল দিয়া গঙ্গাদেবীকে পূজা করিয়া ধন্য হইলাম। অতঃপর সেখানে বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যানজপাদি করিয়া আচার্য শঙ্কররচিত নিম্নোদ্ধৃত গঙ্গাস্তবটি পাঠ করিলাম—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ত্রিভুবন-তারিণি
তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে মম মতিরাস্তাং
তব পদকমলে ॥ ১ ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা
নিগমে খ্যাতঃ।

নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি
মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে হিমবিধুমুক্তা
ধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া
ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে খণ্ডিতগিরিবর-
মণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে পতিতনিবারিণি
ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৪ ॥
রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতি
কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে ত্বমসি গতির্মম
খলু সংসারে ॥ ৫ ॥"

এইবার প্রত্যাবর্তনের পালা। আমাদের সঙ্গে আনীত আহার্যদ্বারা দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাপ্ত করিলাম। ফিরিবার সময় রাস্তায় আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম,—পর্বত-গাত্রস্থ বরফ সূর্যতাপে বিগলিত হওয়ায় স্থানে স্থানে খরস্রোতা ঝরণার সৃষ্টি হইয়াছে। পর্বতারোহণ করিবার উপযোগী যষ্টি প্রত্যেকের হস্তে থাকা সত্ত্বেও উহা অতিক্রম করিতে আমাদের অনেককেই বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই ঝরণা অতিক্রম বিষয়ে অভিজ্ঞ আমাদের পথপ্রদর্শক (guide) স্বামী পরমানন্দজী আমাদের প্রত্যেককে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আমাদের সকৃতজ্ঞ-ধন্যবাদার্হ। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই একটি অনুন্নত পাহাড়ের বাঁকে সহসা একটি মেষী দৃষ্ট হইল। ইহাকেই প্রাগুক্ত মেষ-শাবকের গর্ভধারিণী মনে করিয়া পরমানন্দ স্বামী উহাকে ধরিবার জন্য আমাদের নিষেধসত্ত্বেও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তিনি শুধু বলিয়া গেলেন,—'আমার জন্য ভাববেন না।' কারণ, ঐ সব স্থান তাঁহার বিশেষ পরিচিত। তাঁহার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও তিনি যখন ফিরিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে সময়মত পৌঁছিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই একটি বালুকাপূর্ণ স্থানে মানুষের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম উক্ত পদচিহ্ন পূর্বোল্লিখিত ভূর্যবৃক্ষ-স্থলাভিমুখী। আমাদের ভরসা হইল,—হয়ত পরমানন্দজী সেই অনুন্নত পাহাড়ের অপর দিক দিয়া আসিয়া পূর্বেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়াছেন। সন্ধ্যার ঘনছায়া পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতি গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গিয়াছে। বন-হরিণের দূরাগত কণ্ঠস্বর মধ্যে মধ্যে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। অনিশ্চিত—আশঙ্কাবিদ্ধচিত্তে গন্তব্যস্থলের নিকটবর্তী হইতেই দূর হইতে দেখিতে পাইলাম,—সেই ভূর্য-বৃক্ষতলে আগুন জ্বলিতেছে। আমরা দ্রুতপদে সে-স্থানে পৌঁছিয়া যখন দেখিলাম পরমানন্দজীই আমরা আসিবার পূর্বে সেখানে পৌঁছিয়া আমাদের জন্য জল গরম করিতেছেন, তখন আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—সেই মেষীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও ধরিতে না পারিয়া উক্ত নীচু পাহাড়ের অপর দিক দিয়া তিনি গন্তব্যস্থলে অগ্রেই পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য আমরা শ্রীভগবানকে মনে মনে অসংখ্য প্রণতি জানাইলাম।

আমরা পূর্বের মত সেই বিপদ-সংকুল গঙ্গার তীর দিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গোত্রী আসিয়া

পৌঁছিলাম। রাঘবেন্দ্র সেই মেষ-শাবককে বহন করিয়া আনিয়া ভুটীয়াদের গড্ডালিকা-দলের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাঘবেন্দ্র পরবর্তীকালে অন্যত্র সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'নারায়ণ স্বামী' নামে উত্তরাখণ্ডে সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল। সে কৈলাস-দর্শনের পথে ধারচুলা-নামক স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়া বহুদিন সেখানে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিল এবং কৈলাস-তীর্থ দর্শনার্থীদের অনেককেই পথিমধ্যে তাহার এই আশ্রমে বিশ্রাম করিবার ব্যবস্থা করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিল। অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত পরিক্রমাকালে অনেক ধর্মপিপাসু নরনারী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শুধু ইহাই নহে, নারায়ণ-স্বামী অনেক জনহিতকর কার্যের জন্যও দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিল। অনেক বৎসর পর আলমোড়াতে তাহার সঙ্গে দেখা হইলে, তাহার নিকট হইতে তাহার পরবর্তী জীবনের ঘটনাবহুল বিবরণ জানিয়া খুবই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম।

উত্তরকাশীতে থাকাকালে হঠাৎ সংবাদ পাইলাম—পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ১৯৩৪ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুআরী, মঙ্গলবার দিবস মহাসমাধিযোগে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরতরে মিলিত হইয়াছেন। মদীয় দীক্ষাগুরু পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর তিরোধানের পর যিনি অপার করুণাবশে আমাকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রদান করিয়া চরমলক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত পন্থার সন্ধান দিয়াছিলেন, যাঁহার শক্তিশালী উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া এই সুদূর জনবিরল হিমালয়ক্রোড়ে নিরালম্বভাবে কিছু দীর্ঘকাল থাকিতে সাহসী হইয়াছিলাম, তাঁহার এই আকস্মিক তিরোধানবার্তা যে কত মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

ইং ১৯৩৫ সাল সমাগত। যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী মহাসমারোহে উদ্‌যাপনের জন্য পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে বিরাট প্রস্তুতি চলিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'The Cultural Heritage of India' নামক একটি স্মারকগ্রন্থ (Souvenir) প্রকাশনেরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মঠ-মিশনের তদানীন্তন সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে সহায়তার জন্য আমাকে সত্বর বেলুড় মঠে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমি তাঁহার এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

স্বামী চেতনানন্দ

প্রতিভা ভাবগঙ্গার গোমুখী। সে নিজের ভিতরেই আত্মগোপন করিয়া থাকে। উহাকে বাহির করিবার জন্য হাতুড়ির দরকার হয় না বা কোন সাধ্য-সাধনার দরকার হয় না। সে প্রকাশিত হয় আপনভাবে অনায়াসে অজ্ঞান্তে। সেক্‌সপীয়রকে হ্যামলেট বা টেমপেস্ট লিখিতে দ্বিতীয় নিঃশ্বাসের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু মিলটনকে লেখনী লইয়া বহুত জোর-জবরদস্তী করিতে হইয়াছিল। তাই সেক্‌সপীয়র অধিকতর উজ্জ্বল।

ঐ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস। উভয়েই রামগান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গান এই জগতের সামগ্রী নহে। ঐ গানের সুর ও ভাব আসিয়াছে দূর হইতে—বহুদূর হইতে—কোন জ্যোতিঘন জ্যোৎস্নার দেশ হইতে যেখানে পার্থিব মালিন্যের লেশমাত্র নাই। ঐ মহান সঙ্গীত নিরাশ প্রাণে আনিয়া দেয় আশা, নীরস হৃদয়ে আনিয়া দেয় ভালবাসা, এবং মানুষকে এ জগৎরূপ ডাইনীর কুহক হইতে বাঁচিবার পথ বলিয়া দেয়। কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস—এই দুই ভক্তকবির কাব্য-প্রতিভা ঐ মহান সঙ্গীতের দুইটি লহরী।

বাংলাদেশে সকলে এক ডাকে চিনতে পারে এমন কবি কে আছেন? রবীন্দ্রনাথ? মধুসূদন? কখনই নহে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র—সকলেই চেনে এমন কবি হইতেছেন কৃত্তিবাস। চন্দ্র-সূর্যের মত তিনি বাংলাদেশের সকল কোণের আঁধার দূর করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন: 'যে মহাকবির গানের নূতন সুর যোজনা করিতে যাইয়া কলিদাস পর্যন্ত বামনের চাঁদধরার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করিয়া ভীত হইয়াছেন, যাঁহার কথা মহানাটককার ভবভূতি বিস্ময় ও ভক্তির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কীর্তন করিয়াছেন, যিনি ভারতের আদি কবি, শ্রেষ্ঠ কবি, ঋষি—সেই বাল্মীকি, কৃত্তিবাস না জন্মিলে সম্ভবতঃ বঙ্গের সর্বশ্রেণীর অনায়ত্ত, আকাশ-কুসুম হইয়া থাকিতেন। বাংলায় এ সুরধুনী-ধারা চিরদিনই কৈলাসবাসী কোন দেবতার জটাকলাপে আবদ্ধ হইয়া থাকিত। বাঙ্গালী গৃহস্থের ভাগ্যে সেই মন্দাকিনীর আস্বাদ হয়ত কখনই লাভ হইত না। কৃত্তিবাস স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে খাদ কাটিয়া সেই ধারা আমাদের দেশে আনিয়াছেন, তাই চাষার কুঁড়ে ঘরের পাশ কাটিয়া সেই ধারা যেমন ছুটিয়াছে, রাজ-প্রাসাদের পার্শ্বেও সেইভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। কৃষকবধূ সন্ধ্যার প্রদীপটি জ্বালিয়া সেই রসধারার কুলকুলধ্বনি শুনিতে দাঁড়াইয়াছে, রাজবধূও তাঁহার গবাক্ষের পার্শ্ব হইতে তেমনি আবিষ্ট হইয়া তাহা শুনিতেছেন।'

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট স্টেশনের সাড়ে সাত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামে ১৪৩৩ খ্রীঃ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণে বংশপরিচয় দিয়াছেন: 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ মালিনী

নামেতে মাতা বাপ বনমালী। ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥' অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার পর কৃত্তিবাস সভাপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের নিকট যান এবং পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। গুণী রাজা চমৎকৃত হইয়া তাহাকে উপঢৌকন দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের কাব্য-প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে সরল বাঙ্গালা পদ্যে একখানি রামায়ণ লিখিতে অনুরোধ করেন। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একস্থানে রহিয়াছে: 'শ্রীরামের আগে ষাটি হাজার বৎসর। অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥ বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ। লোকত্রাণহেতু রচিলেন রামায়ণ॥'

হিন্দী ভাষার সমগ্র রস ও মাধুর্য যেন তুলসী রামায়ণের ভিতর দিয়া উপছাইয়া পড়িয়াছে। লোকসাহিত্যের দরবারে তুলসী-রামায়ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্য। হিন্দীভাষী ভারতবাসীকে তুলসীদাস রামভক্ত করিয়া দিয়াছেন আপন ভক্তিরস সিঞ্চন করিয়া। 'বিনু সতসঙ্গ ন হরিকথা, তেহি বিনু মোহ ন ভাগ। মোহ গয়ে বিনু রামপদ, হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥' অর্থাৎ সৎসঙ্গ ছাড়া রামকথা হয় না। রামকথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রামপদে গাঢ় অনুরাগ হয় না। তুলসীদাস গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন 'রাম-চরিতমানস' অর্থাৎ রামচরিত্ররূপ মানস-সরোবর। তাহাতে রামকথারূপ হংস বিচরণ করে। কৃত্তিবাসের ন্যায় তুলসীদাসের নামও রামায়ণ গ্রন্থের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লোকে বলে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'তুলসী রামায়ণ'। উভয়েই নিজেদের নামের সঙ্গে রামের নাম মিশাইয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে হিন্দীভাষী অধিক, সেহেতু তুলসীর জনপ্রিয়তা কৃত্তিবাস হইতে অধিক।

উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার রাজপুর নামক গ্রামে সম্ভবতঃ ১৬৪৬ খ্রীঃ তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তিনি মাতৃহীন হন; এক দাসী তাঁহাকে লালনপালন করে। এই দাসীও পাঁচ বছর পর গত হয়। তখন এক অপরিচিতা রমণী আসিয়া বালককে ভোজনাদি করাইয়া যাইতেন। লোকের বিশ্বাস ইনিই মা অন্নপূর্ণা। এইরূপে আরও দুই বৎসর অতীত হইল। ঐ কালে নরহরিজী নামক এক সাধু বালককে লইয়া অযোধ্যায় যান। সম্ভবতঃ ইনিই তুলসীদাসের গুরু ছিলেন। রামায়ণের গুরুপ্রণামে আছে: 'বন্দউঁ গুরুপদ কঞ্জ কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি'। সে যাহা হউক, তুলসীদাস সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। কথিত আছে তুলসীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। স্ত্রীর দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার চৈতন্য হয় এবং বিরাগী হইয়া তিনি কাশীতে যান। মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন: 'আনন্দকাননে হ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসীতরুঃ। কবিতামঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতা॥' অর্থাৎ বারাণসীর আনন্দ-কাননে তুলসীদাস হইতেছেন একটি চলমান তুলসীতরু, এ তরুর কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকুলে ভূষিত। কাশীতে প্রথমে প্রেতাত্মার নির্দেশে ভক্ত হনুমানের সাক্ষাৎ এবং পরে হনুমানজীর উপদেশানুযায়ী রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন—এ কাহিনী সর্বজনবিদিত। তুলসী-দাসের রামদর্শনের ছবিখানি আবেগে পূর্ণ, আবদারে কলকলিত এবং ভক্তিতে ভাস্বর। প্রথম দিন তো ধনুর্বাণধারী মৃগয়াবেশধারী

অশ্বারোহী রাম-লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিন হনুমানজীর নির্দেশে ব্যাকুল হৃদয়ে নির্নিমেষ নয়নে রামদর্শনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন; ভগবান প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়া তুলসীকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের চন্দন দাও।' 'চিত্রকূটকে ঘাট পর ভই সন্তনকী ভীর। তুলসীদাস চন্দন ঘিঁসে তিলক দেত রঘুবীর॥' তুলসীদাস নয়নযুগল ভরিয়া ভগবানের রূপসুধা পান করিতেছেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার চন্দন চাহিলেন। কিন্তু কে তখন সে কথা শোনে! তখন ভগবান নিজ হস্তে চন্দন লইয়া আপন ললাটে মাখিলেন, এবং তুলসীদাসের কপালেও মাখাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন তুলসীদাস চিত্রকূটে রামলীলারত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার দর্শন পান।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনায় ভক্তির সঙ্গে মনে হয় যশোলিপ্সাও ছিল। আর তুলসীর ছিল ভক্তির সঙ্গে আত্মনিবেদন। তুলসীর কপালে ভগবান স্বয়ং চন্দন লেপন করিয়াছেন; আর কৃত্তিবাস যখন রাজ-আজ্ঞা পাইয়া প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসেন তখন—'চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥' আবার অন্যত্র 'যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে। আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে

কৃত্তিবাসের ভাব কোথাও বা স্বকল্পিত, কোথাও বা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস বা বিভিন্ন পুরাণ হইতে গৃহীত। তাঁহার ভাষা সরল, মধুর ও প্রাঞ্জল। ঐ ভাষা ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন, সেই হেতু আধুনিকদের কাছে উহার কিছু কিছু শব্দ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কৃত্তিবাসের কালে পদ্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল এবং পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী রচয়িতারাই কবি ছিলেন। কৃত্তিবাস- ঐ সকল ছন্দেই রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে উপাখ্যান-ভাগ বেশী। কারণ কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে মূলতঃ অবলম্বন করিলেও তিনি জৈমিনি ভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, পুরাণ, উপপুরাণ, কথকতা ও জনশ্রুতি হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অগ্রে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা উহার উল্লেখ করিব।

উপাখ্যানের দিক হইতে তুলসীদাস কৃত্তিবাস হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার রামায়ণে গল্পাংশ খুব কম। যাহাতে রামপদে ভক্তি হয়, মানুষ নীতির পথ মানিয়া চলে—তুলসীদাস সেই দিকে জোর দিয়াছেন। রামায়ণ দৃষ্টে মনে হয় তুলসীদাস একটু আটপৌরে অর্থাৎ ঘরোয়া কথা দিয়া সাধারণ মানব-মনকে আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত। অযোধ্যার রাজপুত্র-রাজবধূকে তিনি বসনভূষণে সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু এমন বাক্যের সংযোজনা করিয়াছেন যাহাতে মনে হয় উহারা আমাদেরই ঘরের লোক। উদাহরণস্বরূপ দশরথ যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সে সঙ্গীদের ফেলিয়া আসিতে চাহে না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছুটিয়া পালায়। ধূলিমাখা ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান। তারপর 'ভোজন করত চপল চিত, ইত উত অবসর পাই ভাজি চলে কিলকত মুখ, দধিওদন লপটাই॥' অর্থাৎ চঞ্চল মনে খাইতে খাইতে একটু অবসর পাইলেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া সে পলায়, মুখে দইভাত লেপটাইয়া থাকে। এ দৃশ্য দেখিতে রাজবাড়ী যাইবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত দেশ জুড়িয়া ঘরে ঘরে এরূপ রাম আছে। এই জন্য তুলসীর এত আদর। কৃত্তিবাসের ন্যায় তুলসীও চলতি ভাষায় রামায়ণ রচনা

করিয়াছেন। তুলসীর ভাষা সহজ, কথা লৌকিক এবং ছন্দ—চৌপাই, দোহা, সোরঠা ও ছন্দ—এই চারিটি।

সংক্ষেপে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের জীবন-কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। রামচরিত-রচনায় বাল্মীকির ন্যায় তাঁহাদের মৌলিকতা নাই। বাল্মীকি ভাত রান্না করিয়াছেন, আর সেই রাঁধা ভাতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঘি, লবণ, ব্যঞ্জনাদি মিশাইয়া উপভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহাদের যশ অপহরণ করা যায় না। ইঁহারা বাল্মীকির ভাবধারার অনুবাদ বা গতানুগতিক অনুসরণ করেন নাই; বরং নিজেদের প্রতিভাবলে বাল্মীকির রোপিত বৃক্ষে বারিসিঞ্চন করিয়া পত্রে পুষ্পে ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাস ও তুলসী-দাস উভয়েই যদিও লৌকিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন সংস্কৃত ভাষায়।

মূল রামায়ণে প্রবেশের পূর্বে আমরা অপর একটি তুলনা পরিক্রমা করিব। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভটসাগর মহাশয় তাঁহার রামায়ণে দেখাইয়াছেন কি ভাবে আমাদের রামায়ণের ছায়াপাত গ্রীককবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াডে পড়িয়াছে :

রামায়ণে :	ইলিয়াডে :
লঙ্কাযুদ্ধ	ট্রয় যুদ্ধ
অযোধ্যা	স্পার্টা
রামচন্দ্র	মেনিলেয়াস
লক্ষ্মণ	পেট্রোক্লিস
সীতা	হেলেন
রাবণ	প্যারিস
ইন্দ্রজিৎ	হেক্টর
সুগ্রীব	য়্যাগামেম্‌নম্‌

শুধু বিদেশী মহাকাব্যের উপর নয় আমাদের বিখ্যাত মহাভারতের উপরও রামায়ণের রেখাপাত হইয়াছে। অর্জুনের সহিত লক্ষ্মণের অনেকটা মিল আছে। উভয়েরই মধ্যে আছে ভ্রাতৃপ্রেম, বীরত্ব ও বনবাস। রাম-যুধিষ্ঠির, বিভীষণ-বিদুর, রাবণ-দুর্যোধন প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। স্ত্রীচরিত্র-চিত্রণে রামায়ণ তুলনাহীন। সীতার কাছে দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী কেহই দাঁড়াইতে পারে না। আবার ঘটনা দৃষ্টেও উভয় মহাকাব্যে মিল আছে। উভয় মহাকাব্যই বিয়োগান্ত। সীতার জন্য রাবণবংশ ধ্বংস হইল আর দ্রৌপদীর জন্য কুরুকুল ধ্বংস হইল। উভয়ক্ষেত্রে বনবাস, দুই নায়িকাই অযোনিজা, চক্রভেদ ও ধনুর্ভঙ্গ করিয়া বিবাহ, নারীহরণ (রাবণ কর্তৃক সীতা, জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী), মুনিশাপে মৃত্যু (দশরথ ও পাণ্ডু) এইরূপ বহু অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে।

এবার আমরা মূল রামায়ণে প্রবেশ করিব। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সপ্তকাণ্ডে সর্বসমেত শ্লোকসংখ্যা ১৯,০৫০। অতি সংক্ষেপে ঐ বিশাল গ্রন্থের সার বর্ণনা : 'আদিকাণ্ডে রামজন্ম সীতা-পরিণয়। অযোধ্যাকাণ্ডেতে রাম-বনবাস হয়॥ অরণ্যকাণ্ডেতে হয় জানকীহরণ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব-মিলন॥ সুন্দর-কাণ্ডেতে হয় সাগর-বন্ধন। লঙ্কাকাণ্ডে মহারণে রাবণ-নিধন॥ উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ। মনোদুঃখে বৈদেহীর পাতাল-প্রবেশ॥ এই সুধাভাণ্ড সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ। কবিবর কৃত্তিবাস করেন রচন॥'

কৃত্তিবাসের আরম্ভটা বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ। দস্যু রত্নাকরের পাপের ভাগী তাঁহার পরিবারবর্গ হইল না। তখন তিনি

ছদ্মবেশী ব্রহ্মা ও নারদের নিকট হইতে 'মরা' (পাপের ফলে রাম-মন্ত্র-উচ্চারণে অক্ষম তাহেতু) মন্ত্র শ্রবণ করিয়া ষাট হাজার বৎসর উহা জপ করেন। বল্মীকের (উইমাটির ঢিপি) দ্বারা রত্নাকরের আবরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস যেন একটু অতিশয়োক্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ণনা আছে—বল্মীকের কীটগণ রত্নাকরের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলিল ; অবশিষ্ট রহিল কেবল অস্থি। ষাট হাজার বৎসর পরে ব্রহ্মা আসিয়া রত্নাকরকে সেখানে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু রামনাম শুনিতে পাইলেন। তারপর ঢিপির ভিতর মুনি বসিয়া আছেন জানিয়া, ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সাত দিন ক্রমাগত প্রচণ্ড বারিপাত করিতে বলিলেন। তারপর ঐ ঢিপি ধুইয়া গেলে ব্রহ্মা ঐ অস্থি-সম্বল মুনির চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন : আজি হৈতে তব নাম 'বাল্মীকি' হইল। ঘটনাটা আধুনিক মানুষের কাছে আজগুবি বলিয়া ঠেকিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু রাম-নামে অসাধ্য সাধন হয়—একথা ভুলিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া ইহা প্রাচীন ভারতের একখানি তপস্যার অনুপম ছবি।

আদিকবি বাল্মীকির জীবনবৃত্তান্ত গাহিয়া কৃত্তিবাস—রঘুবংশের বিবরণ, সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ, কপিলের অভিশাপে সগরের ষাট হাজার পুত্রের বিনাশ এবং পরে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গার মর্ত্যে আগমন—অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে কৃত্তিবাসের মত বংশপরিচয়ের ঘটা নাই ; কেবলমাত্র বিশ্বামিত্র মিথিলায় যাইবার পথে জাহ্নবীতীরে রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে রঘুবংশের কাহিনী কিছু বলিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে পুরাণ ও কালিদাসের রঘুবংশকে অবলম্বন করিয়া দিলীপ, রঘু, অজ-ইন্দুমতী, দশরথের বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস রাম, সীতা ও বানরগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন অভিনবভাবে। অনেক জায়গায় তিনি অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রামচন্দ্রের দেবভাব দেখাইতে গিয়া তিনি প্রত্যক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারেন নাই। যেমন—'মধু-চৈত্রমাস, শুক্লা শ্রীরামনবমী। শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠ হ'লেন জগৎস্বামী॥ গর্ভব্যথা নাহি তায় নাহিক শোণিত। শুভক্ষণে শ্রীহরি হইলা উপনীত॥' সংস্কৃতে সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলের দ্বারা কৃত খাত। ঐ খাত হইতে সীতার জন্ম বলিয়া নাম হইল সীতা (সীতামুখোদ্ভবাৎ সীতা)। ভগবান সশক্তিক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন—ইহাই রীতি। দেবগণ তেজসঞ্চার করিলেন বিভিন্ন বানরের ভিতর। ইন্দ্র-তেজে বালী, সূর্য-তেজে সুগ্রীব ব্রহ্মা-তেজে জাম্বুবান, পবনের তেজে হনুমান, অগ্নির তেজে নীল, শিবের তেজে কেশরী, কুবেরের তেজে প্রমাথী, ধন্বন্তরির তেজে সুষেণ, চন্দ্র-তেজে দধিমুখ প্রভৃতি।

রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের দ্বারা পুত্রদের নামকরণ করাইলেন। চারিবেদ আগম-পুরাণ বিচার করিয়া কৌশল্যার নন্দনের নাম 'রাম' রাখা হইল। ভূ-ভার বহন করিবেন বলিয়া কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত। রামচন্দ্রের নামকরণের একটি প্রাচীন কাহিনী সুবিদিত আছে। বশিষ্ঠকে রাজা দশরথ এত নাম থাকিতে কেন 'রাম' নাম রাখা হইল উহার সার্থকতা দেখাইতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন যে 'রাম' নাম সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও শৈব মন্ত্রের সার। রা='নমো নারায়ণায়' এই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্ত্র হইতে 'রা' বাদ দিলে

থাকে 'নমো নায়নায়' (ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ণ, ন হইয়া যায়) ইহার অর্থ রূপ-রসাদি বিষয়কে নমস্কার। আবার ম='নমঃ শিবায়' এই প্রসিদ্ধ শৈবমন্ত্র হইতে 'ম' বাদ দিলে থাকে 'ন শিবায়'। ইহার অর্থ কল্যাণের জন্য নহে অর্থাৎ দুঃখের বা অমঙ্গলের জন্য।

তুলসীকৃত রামচরিতমানসের প্রথম কাণ্ডের নাম বালকাণ্ড; কিন্তু বাল্মীকি, কৃত্তিবাস প্রভৃতির রামায়ণে উহা আদিকাণ্ড নামে খ্যাত। তুলসীদাসের এই 'বালকাণ্ড' পদের মধ্যে নিজের আত্মভাব লুকাইয়া রহিয়াছে। তুলসী রাম-সীতার এক বালকপুত্র হইতে চাহিয়াছিলেন, হইয়াও ছিলেন। নিজের মনের কথা অরণ্যকাণ্ডে রঘুনাথের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: যে ভরসা ত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করে, আমি তাহাকে সর্বদা রক্ষা করি; যেমন মা ছেলেকে করে। যখন সন্তান বড় হয় তখন তাহার জন্য মায়ের আর পূর্বকার প্রীতি থাকে না। জ্ঞানী আমার প্রৌঢ় পুত্রের মত, আর অমানী দাস আমার বালক পুত্রের মত।

রঘুবংশের প্রারম্ভে মহাকবি কালিদাস আভিজাত্যপূর্ণ বিনয় দেখাইয়াছেন: 'মন্দকবি-যশঃপ্রার্থী', 'বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চাই' ইত্যাদি বাক্যে। কিন্তু তুলসীর ভক্তি-বিনয় যেন হৃদয় মন্থন করিয়া বাহির হইতেছে: আমি রঘুপতির গুণগান করিতে চাই। আমার বুদ্ধি হালকা, আর রামচরিত্র ত অথই। আমার বুদ্ধি দরিদ্রের মত, আর ইচ্ছাটা রাজার মত। আমি চাই অমৃত, অথচ জগতে আমার ঘোলও জোটে না। তারপর তুলসীদাস আদিকবি বাল্মীকির পাদ বন্দনা করিয়া লিখিয়াছেন: 'বাল্মীকি মুনি প্রথমে হরির কীর্তি গান করিয়াছেন, সেইহেতু আমার পথ সুগম হইয়াছে। অতি অপার যে মহানদী তাহার উপর যদি নৃপ সেতু গড়িয়া দেন, তবে পরম লঘু পিঁপড়াও বিনাশ্রমে পার হইয়া যায়।' পণ্ডিতেরা 'উপমা কালিদাসস্য' বলিয়াছেন; কিন্তু উপমায় তুলসীদাস কম যান না। কালিদাসের উপমাগুলি বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলসানো, কিন্তু তুলসীর উপমা সরলতা ও সজীবতায় ভরপূর। রান্নার ভালমন্দ যথাযথ ফোড়োনের উপর নির্ভর করে। তপ্ত বালুর কড়া হইতে ধবল খৈগুলি যেমন লাফাইয়া বাহিরে পড়ে, তেমন রামকথার মাঝে মাঝে তুলসীর অপূর্ব শুচিশুভ্র ফোড়োনগুলি উপচাইয়া পড়িয়াছে। 'বাল্মীকি রামায়ণে খরের কথা থাকিলেও উহা খর বা কর্কশ নহে, উহা কোমল ও মৃদু। উহাতে দূষণের কথা থাকিলেও উহা দোষরহিত।'

রামচন্দ্রের সংস্পর্শে যাঁহারাই আসিয়াছেন, তুলসীদাস তাঁহাদেরই চরণবন্দনা করিয়াছেন। নিজ জীবনে 'রাম-নাম' কিভাবে বসান যায়, তাহার বিষয়ে অপূর্ব এক দোঁহা রচনা করিয়াছেন তুলসীদাস: রাম নাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরী দ্বার। তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিআর॥ অর্থাৎ তোমার ভিতর বাহির যে দিকে তাকাও যদি উজ্জ্বল করিতে চাও তবে তুলসী, দেহের দেউড়ীস্বরূপ জিহ্বাতে রাম-নাম মণিদীপ ধর। রামনামের প্রভাবের শেষ নাই। রামনাম স্বয়ং রামচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রামচন্দ্র ভালুক-বানরের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিলেন, সেজন্য তাঁহাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কিন্তু রামনাম লইতে সংসারসমুদ্র শুকাইয়া যায়। স্বয়ং রামও নিজের নাম-মাহাত্ম্য গাহিয়া শেষ করিতে পারেন না। এই নামের প্রভাবে অজামিলের মত পাপী, পিঙ্গলার মত গণিকা

এবং কচ্ছপ কর্তৃক ধৃত গজ নিষ্কৃতি পায় এ নাম কল্পতরুর মত কল্যাণবহনকারী। এ নাম স্মরণ করিতে করিতে তুলসীদাস, যে পূর্বে ভাঙের গাছ ছিল, সে তুলসী গাছ হইয়া গিয়াছে।

কথায় বলে 'ধান ভানতে শিবের গীত'; অর্থাৎ গৌরচন্দ্রিকার পরিপাটি। তুলসীদাস রামচন্দ্রের মহিমাকে সু-উচ্চে উঠাইবার জন্য শিব-সতীর আখ্যায়িকা বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন তারপর রাবণের জন্মবৃত্তান্ত এবং মর্ত্যে তাহার অকথ্য অত্যাচার বর্ণনা করিয়া ভগবান বিষ্ণুকে দিয়া জন্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। পবিত্র চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে ভগবান জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগবতের দেবকীর ন্যায় কৌশল্যাও বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপ দেখিলেন। কৌশল্যা ঐ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'হে পুত্র, এই রূপ ত্যাগ কর। অতিশয় প্রিয় সদাচারসম্মত বাললীলা কর, যাহাতে পরম অনুপম সুখ পাওয়া যায়।' ভগবানের চারি অংশে অবতরণের ফলে অযোধ্যায় যে আনন্দোৎসব লাগিয়াছিল—তাহা বর্ণনাতীত। তুলসীদাস মজা করিয়া বলিয়াছেন যে সে সব কৌতুক দেখিবার জন্য সদাচলমান সূর্য চলিবার কথা ভুলিয়া অযোধ্যায় এক মাস রথ সমেত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বশিষ্ঠ চারিপুত্রের নামকরণের সার্থকতা দেখাইয়াছেন: ত্রিলোকের সুখধাম এবং অখিল লোকের বিশ্রামদায়কহেতু রাম, বিশ্বের ভর্তা ও পোষণকর্তাহেতু ভরত; স্মরণ করিলে শত্রুনাশ হয়, সেই হেতু শত্রুঘ্ন; এবং সুলক্ষণের নিবাসস্থান, সকল জগতের আশ্রয়স্থল বলিয়া লক্ষ্মণ।

বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখাইয়াছেন। ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সান্দীপনি মুনির কাছে ৬৪ দিনে ৬৪ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র মাত্র ১৪ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যা লাভ করেন। কৃত্তিবাসের মতে 'সাত-বৎসরের রাম অযোধ্যানগরে। লক্ষ্মী হেথা জন্মিলেন জনকের ঘরে॥' আর রামচন্দ্রের যখন সীতার সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার এবং সীতার পাঁচ। লোকে এবং শাস্ত্রে কথিত আছে ধর্মে বা তেজে উৎকর্ষতা বয়সের দ্বারা নিরূপিত হয় না। বিশ্বামিত্র বালক রাম-লক্ষ্মণকে যজ্ঞরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দশরথ কপটতা করিয়া ভরত-শত্রুঘ্নকে দিলেন। পরে সত্য প্রকাশ পাইলে মুনির অভিশাপভয়ে রাম-লক্ষ্মণকে দিলেন। এখানে কৃত্তিবাস দশরথের বিমাতাসদৃশ আচরণ দেখাইয়াছেন।

সীতার বিবাহ-ব্যাপারে জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। বাল্মীকি লিখিয়াছেন, 'বীর্যশুল্কেতি যে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা' অর্থাৎ আমার এই অযোনিজা কন্যাকে পেতে গেলে বীর্য-শুল্ক দিতে হবে। সীতার তুলনাহীন রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া কত রাজা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কি রাবণ, যিনি কৈলাস পর্বত ধরিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহার বিশ হাতে তিনবার চেষ্টা করিয়াও হরধনু তুলিতে না পারিয়া পলায়ন করেন।

কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস রাম-সীতার বিবাহ ব্যাপারে স্ব স্ব দেশাচার ও লোকাচারের আশ্রয় লইয়াছেন। কৃত্তিবাসের বিবরণ পড়িলে মনে হয় যেন বাঙ্গালী বিবাহ দেখিতেছি এবং তুলসীদাসের বিবরণ দৃষ্টে মনে হয় যেন হিন্দুস্তানী বিবাহ চলিতেছে।

বিবাহের লগ্ন দেখা, গায়-হলুদ, ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাঁশী, টোপর, বরণ, সিঁতেয় সিঁদুর, দূর্বা-ধান, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের পুরোহিতদের বংশাভিজাত্যকথন, ইত্যাদি বাঙ্গলা দেশের বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাম-সীতার বিবাহে কৃত্তিবাস নব-বরকনেদের লইয়া মেয়েদের ফষ্টিনাষ্টিটুকু বাদ দেন নাই। 'পরিহাস করে সবে রামের সহিত। তুমি যে জানকী-পতি এ নহে উচিত॥ এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল। সীতা বড় সুন্দরী তুমি হে বড় কাল॥'

বিবাহ-ব্যাপারে কৃত্তিবাস কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। বশিষ্ঠ জ্যোতিষ-গণনার দ্বারা যে লগ্ন ঠিক করিলেন, সেই লগ্নে বিবাহ হইলে 'স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ না হয় কালান্তরে।' এখন উপায় ? দেবগণ দেখিলেন যে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ছাড়া রাবণবধ সম্ভব নহে ; তাই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঐ লগ্ন ভ্রষ্ট করিলেন। চন্দ্রকে নর্তক সাজাইয়া বিবাহবাসরে পাঠান হইল। চন্দ্রনৃত্য দেবকার্য সিদ্ধ করিল। 'অতীত হইল লগ্ন, সবে বিস্মরণ।' কৃত্তিবাসের বিবরণ হইতে মনে হয় বাংলাদেশে তখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সতীনের ঘর করা নারীর পক্ষে অসহ্য। পরশুরাম যখন রামচন্দ্রকে ধনুকে গুণ দিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেছেন, তখন সীতা ভাবিতেছেন : 'একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ। করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ॥ আরবার ধনুক আনিল ভৃগুমুনি। না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী

বালকাণ্ডে তুলসীদাস উপাখ্যানভাগের উপর এত বেশী জোর দিয়াছেন যে, রামচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয়। যাহা হউক সংক্ষেপে বাললীলা বর্ণনার পর বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রাম-লক্ষ্মণের যজ্ঞরক্ষা ও মিথিলায় গমন দেখানো হইয়াছে। এই যাত্রার পথে তুলসীদাস আমাদের প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রাণকথা, পুরাণকথা, ইতিকথা, শৌর্যবীর্যের কথা, মহাপুরুষদের চরিতকথা, বিভিন্ন অধ্যাত্মবিদ্যার কথা প্রভৃতি বলিয়া চলিয়াছেন ঋষি বিশ্বামিত্র। আর দুইটি তরুণ মন কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও তপোবনে বিশ্রামকালে, কখনও বা রাত্রে ঋষিকুটীরে শয়নকালে গোগ্রাসে গিলিয়া চলিয়াছেন ঐ সব ভারতকথা। আর আজ সেই ঐতিহ্যময় প্রাচীন ভারত দ্রুত বিদায় লইতেছে।

রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বিদেহ নগরে পৌঁছিলেন। বিদেহ সম্বন্ধে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 'জহঁ বসন্তরিতু রহী লোভাঈ' অর্থাৎ সেই অপূর্ব নগরীতে বসন্তঋতু লোভে থাকিয়া যাইত। লক্ষ্মণের নগর দেখিবার বাসনা হইল। রাম চলিলেন সঙ্গে। অযোধ্যার রাজপুত্র নগর দেখিতে আসিয়াছেন, চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। তুলসীদাস যে নিজের ইষ্টদেবকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি ? অপূর্ব ভঙ্গিতে সীতার সখীদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন : 'বিষ্ণুর চারিটি হাত, ব্রহ্মার চারি মাথা, আর শিবের বেশ বিকট এবং মুখও পাঁচটা। অপর এমন কোন দেবতাই নাই যাঁহার সহিত রামচন্দ্রের সৌন্দর্যের তুলনা চলে।' নবদূর্বা-দলশ্যাম রামকে যে দেখিতেছে সেই মজিতেছে। সীতাসখীরা সেই রূপ দেখিয়া বিবশ হইয়া সীতাকে বলিতেছেন : সখি ! সে রূপের কথা আর কি বলিব ? "গিরা অনয়ন নয়ন বিনু বাণী" ; অর্থাৎ বাক্যের ত চোখ নেই, আর

চোখের ত বাকশক্তি নেই। রামের রূপ-বর্ণনায় তুলসীদাসকে এই ভাবে 'নেতি-নেতির' আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

বিবাহের পূর্বে রাজকাননে রাম-সীতার পারস্পরিক সন্দর্শনকে লইয়া তুলসীদাস একটু রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে বিবাহের ব্যাপারে দর্শন, পূর্বাভাস এবং পূর্বরাগ—এই তিন প্রকার ব্যবস্থা ছিল। রামচন্দ্র দেখিয়াছেন সীতার অপরূপ রূপ। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন নিজের মহান রঘু-বংশের কথা, নিজের পবিত্রতার কথা—'মোহি অতিশয় প্রতীতি মন কেরী। জেহি সপনেহু পরনারি ন হেরী॥' অর্থাৎ আমার হৃদয় সম্বন্ধে ত বড় বিশ্বাস যে, আমি স্বপ্নেও পরস্ত্রী দেখি নাই। কালিদাস কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে একটা সমাধান দিয়াছেন: 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং ভাবস্থিরাণি জন্মান্তরসৌহৃদানি।' অর্থাৎ যাহার প্রথম দর্শনে হৃদয়ে একটা গাঢ় ভাবের উদ্রেক হয়—উহা নিশ্চিতই পূর্বজন্মের সম্বন্ধের ফল। সুতরাং রামরূপী নারায়ণ যে সীতারূপী লক্ষ্মীকে চিনতে পারিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? রামচন্দ্র মনে মনে সীতার মুখের সহিত চাঁদের তুলনা করিয়াছেন এবং পরে আবার চাঁদের দোষ দেখাইয়া সীতার রূপের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। বর্ণনাটি খুব সুন্দর: চাঁদ ত সীতার মুখের মত নয়। চাঁদের জন্ম সমুদ্রে, আবার বিষ উহার ভাই। দিনের বেলায় মলিন থাকে, আবার কলঙ্কও রহিয়াছে। চাঁদ বাড়ে কমে ও বিরহিণীকে দুঃখ দেয়। সন্ধি অনুসারে রাহু ইহাকে গ্রাস করে। চাঁদ চখার দুঃখদায়ক ও পদ্মফুলের শত্রু। চাঁদের কত দোষ। সীতার মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা অনুচিত ও হাস্যকর।

তুলসীদাস নিশ্চেষ্ট থাকিবার নন। তিনি ত কবি। আর রূপবর্ণনা ত কবির স্বভাব-সুলভ ব্যাপার। তাঁহার কথায়: সীতাকে বর্ণনা করিয়া, তাঁহার উপমা দিয়া কোন্ কবি কুকবি বলিয়া অপযশ লইবে? সংসারের স্ত্রীর কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি দেবদেবীর কথা ধরা যায়, তাহা হইলে সরস্বতী বাচাল, ভবানী অর্ধাঙ্গী, রতি স্বামিহীনা বলিয়া দুঃখী। আর হলাহল ও মদ হইতেছে লক্ষ্মীর ভাই (সমুদ্র-মন্থনকালে ইহারা লক্ষ্মীর সঙ্গে জাত), তাহার সঙ্গেই বা সীতার তুলনা কি করিয়া চলে? যদি অমৃত-সৌন্দর্য সমুদ্র হয়, পরম রূপময় লাবণ্য কচ্ছপ হয়, শোভা রশি হয়, সাজসজ্জা মন্থনদণ্ড হয়, আর কামদেব যদি নিজ পদ্মহস্তে মন্থন করেন, তাহা হইলে যদি সৌন্দর্য ও সুখের মূল শোভালক্ষ্মী উৎপন্ন হন, তবুও তাঁহার সহিত সীতাকে সমান বলিতে কবির সঙ্কোচ হইবে।

অন্যান্য রামায়ণে দেখা যায় সীতার বিবাহের পর পরশুরামের সঙ্গে রামের দেখা হয়; কিন্তু তুলসীদাস সে পর্ব আগেই সারিয়া লইয়াছেন। অহিংসার কাছে হিংসা কি ভাবে থাকিয়া যায়, তুলসী তাহার এক অপূর্ব চিত্র আঁকিয়াছেন। পরশুরামের সর্বগ্রাসী, সর্ব-বিধ্বংসী ভাবের কাছে রামচন্দ্রের ভালবাসা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সন্তোষ, নিরভিমানিতা, আনুগত্য, মৃদুতা লক্ষণীয়। পরশুরাম বলিতেছেন: 'রাগে বুক পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু হাত উঠিতেছে না। আমার এই নৃপঘাতী কুঠার হত্যা করিতে চাহিতেছে না। বিধি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, আমার স্বভাব বদলাইয়া গেল।'

সীতার বিবাহ হইল। তুলসীদাস উহা বর্ণনা করিতে গিয়া যত ভাব ও ভাষা ছিল সব প্রয়োগ করিয়া বলিলেন: 'কবি উপমা না

পাইয়া হার মানিয়া এই কথা মনে মনে বলিল যে, ইহাই ইহার উপমা।' তোতা, ময়না প্রভৃতি পালিত পক্ষীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সীতা চলিয়াছেন শ্বশুরবাড়ী। 'বিকল মীনগণ জনু লঘু পানী'—অল্প জলে মাছেরা যেমন ছটফট করে বিদেহ নগরে সেই অবস্থা হইল। রানীরা সীতাকে কোলে লইয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন: 'সর্বদা স্বামীর প্রিয় হও। চিরায়ুষ্মতী হও।' সখীরা স্নেহ-ভরে মৃদুবাক্যে নারীধর্মের শিক্ষা স্মরণ করাইয়া দিলেন: 'শ্বশুর-শাশুড়ী ও গুরুর সেবা করিও। স্বামীর মনের ইচ্ছা বুঝিয়াই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিও।' তুলসীদাসের এই ছবিখানি আমাদের শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেখানে বিদায়-কালে শকুন্তলার হরিণশাবকদের প্রতি মিষ্ট আচরণ, লতাগুল্মাদির প্রতি সস্নেহ সম্ভাষণ তুলনাহীন। কণ্ব মুনি ত আবেগভরে বলিয়াই ফেলিয়াছেন: 'আমি বনবাসী তাপস, স্নেহবশে আমারই যখন এরূপ বিকলতা উপস্থিত হইল, যাহারা গৃহী, না জানি তাহারা নূতন তনয়া-বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে!' শকুন্তলা কণ্বের পালিতা কন্যা; সীতাও জনকের পালিতা কন্যা। বিদেহ জনক জ্ঞানী বলিয়া সর্বকালে প্রসিদ্ধি আছে; তথাপি তিনিও জানকীকে বুকে ধরিলেন। জ্ঞানীরা সুখে-দুঃখে বিচলিত হন না; কিন্তু জনক বিচলিত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই বাল্মীকির পথ ধরিয়াছেন। বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই। তবুও অযোধ্যাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃত্তিবাস অপেক্ষা আরও গভীর ও প্রাঞ্জল। কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, কৈকেয়ী-কুব্জার কুমন্ত্রণা, রামের বনবাস ও পরে চিত্রকূটে ভরতমিলন দেখাইয়াছেন সাধারণভাবে। এই কাণ্ডের শেষে কৃত্তিবাস একটা নূতন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংবৎসর পরে রাম-লক্ষ্মণ পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সীতা তখন ফল্গু নদীর তীরে। এমন সময় দশরথ সীতাকে দর্শন দিয়া পিণ্ড ভিক্ষা চাহিলেন। সীতা ব্রাহ্মণ, তুলসী, ফল্গুনদী ও বটবৃক্ষকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর অনুপস্থিতিতে পিণ্ডদান করেন এবং দশরথ তাহাতে তৃপ্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যান। তারপর রামচন্দ্রকে সে বৃত্তান্ত বলায় তিনি উহার প্রমাণ চাহিলেন। সীতা সাক্ষীদের একে একে ডাকিলেন। বট বাদে সবাই সীতার পিণ্ডদানের কথা অস্বীকার করিল। তখন সীতা প্রথম তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণকে বলিলেন: 'লক্ষ-তঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে। ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ-দেশান্তরে॥' তুলসীগাছ যদিও শ্রীহরির আদরের ধন, তবু তাহাকে বলিলেন: 'অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে। শৃগাল কুকুর মূত্র-পুরীষ ত্যজিবে॥' ফল্গুনদীকে শাপ দিলেন: 'অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহ সর্বকাল। তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুক্কুর-শৃগাল॥' তারপর বটকে অক্ষয় অমর বর দিয়া বলিলেন: 'তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল। শীতকালে উষ্ণ হবে, গ্রীষ্মেতে শীতল॥ পুনর্বার সীতা তারে দিলা এই বর। ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর॥ মনোহর সুশীতল রবে অনিবার। নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার॥ সুশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে। সর্বদা আনন্দে রবে নিজ-পত্র-ফলে॥'

প্রবাদ আছে তুলসীদাস প্রথম জীবনে স্ত্রৈণ ছিলেন। সেহেতু তিনি কৈকেয়ী-দশরথের ঘটনাটা একটু দরদের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন : কৈকেয়ী যে ডালে বসিয়াছিল সেই ডাল কাটিল। স্ত্রীস্বভাব অগম্য, গভীর ও গোপন। আরসির উপর নিজের যে ছায়া পড়ে তাহাও যদি ধরা সম্ভব হয়, তথাপি নারীমন জানা সম্ভব নয়। আগুন কি না জ্বালায়? সমুদ্রের ভিতর কি না প্রবেশ করিতে পারে? স্ত্রীলোক প্রবল হইলে কি না করে? জগতে কাল কি না নাশ করে? প্রাণের রঘুনাথকে বনবাসে পাঠাইতেছেন কৈকেয়ী; সেহেতু কোপনস্বভাবা কৈকেয়ীকে তুলসীদাস প্রচণ্ডভাবে ধিক্কার দিয়াছেন। এ ব্যাপারে কৃত্তিবাসও দশরথকে টিপ্পনী করিতে ছাড়েন নাই : 'কৈকেয়ী যুবতী-নারী, দশরথ বুড়া। বুড়ার যুবতী-নারী প্রাণ হৈতে বাড়া॥'

বনবাসকালে সীতা সঙ্গে যাইতে চাহিলে রামের নিষেধ সীতা মানেন নাই। সীতার যুক্তিগুলি অকাট্য, সুন্দর ও বাস্তব : আত্মীয়-স্বজন এবং সকল স্নেহের সম্পর্ক স্বামী না থাকিলে সূর্য অপেক্ষা বেশী তপ্ত লাগে। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য পতিহীনার নিকট শোকের হেতু; ভোগ রোগের মত লাগে, ভূষণ ভার বোধ হয়, সংসার যম-যাতনার মত লাগে।

রামচন্দ্রের নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইবার কালে পাটনীর উপাখ্যানটি মনে হয় তুলসীদাস অধ্যাত্মরামায়ণ হইতে লইয়াছেন। রামচন্দ্র পার হইতে চাহিলে পাটনী করজোড়ে কহিল : 'প্রভু, তোমার মর্ম জানিয়াছি। সকলে বলে তোমার চরণকমলের ধুলায় এমন কিছু আছে যাহাতে মানুষ করিয়া দেয়। তোমার ছোঁয়াতেই পাথর সুন্দরী স্ত্রী (অহল্যা) হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঠ ত পাথর অপেক্ষা শক্ত নয়। সুতরাং নৌকাখানাও মুনিপত্নী হইয়া যাইবে। এই নৌকাই আমার পরিবার পালন করে, অন্য জীবিকা আর আমি জানি না। প্রভু, যদি নিতান্তই পার হইতে চাও, তবে আমাকে তোমাদের পাদপদ্ম ধোয়াইবার আজ্ঞা দাও। পারের কড়ি চাই না।' এমন সরলতাপূর্ণ প্রেমগাথা কঠোর মানুষের প্রাণেও ভক্তির হিল্লোল না বহাইয়া যায় না। প্রাচীন যুগের আশীর্বাদগুলিও কতই না তাৎপর্যপূর্ণ! সতী সীমন্তিনী সীতার বনবাসকালে শাশুড়ীরা আশীর্বাদ করিতেছেন : 'যতদিন গঙ্গা-যমুনার জলস্রোত বহিবে ততদিন যেন তোমার এয়োতি থাকে।' চলার পথে গ্রামের স্ত্রীরা বলিতেছেন : 'যতদিন নাগের মাথার উপর পৃথিবী থাকিবে ততদিন যেন তুমি স্বামি-সোহাগিনী থাক।' (ক্রমশঃ)

[৩৫২ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

করে, তার সবটুকুই কি মিথ্যা ? উত্তর হলো —ভাষা ছাড়া অর্থাৎ বাক্য-বিনা এমনকি মন ব্যতীত বিশুদ্ধ স্বজ্ঞার আলোকে সত্য যখন উদ্ভাসিত হয় তখন ঐ হাজার বছরের হাজার আলোচনা সত্যিই মিথ্যা—কারণ তারা আসলের আসল পরিচায়ক নয়। তবে ঐ পথে সত্যোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ কিনা ব্যবহারিক বা অ-পারমার্থিক স্তরে এত সব ছোট বড় আলাপ আলোচনা, বিচার বিবেচনা সবকিছুরই মূল্য আছে—কারণ সত্যকে সম্পূর্ণভাবে জানাতে না পারলেও তাকে জানার পথে একটুখানি আলো নিয়ে এরা এগিয়ে আসে আমাদের কাছে অন্ততঃ সত্য যে এসবের ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তু এই হুঁশিয়ারীটুকু এরা সত্যসন্ধানীকে দিতে পারে ; এটাই বা কম কি ?

আধুনিক যুগে ভাষার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি যাচাই করে এর নবকলেবর প্রত্যক্ষ করে আমরা যত গর্বই করি না কেন, এই সিদ্ধান্ত কিন্তু অকার্যই থেকে গেল যে কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পার্থিব জগতে, কি অপার্থিব অতীন্দ্রিয় লোকে—ভাষা কোথাও বস্তুসত্তা বা সত্যকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। ভাষার এই অক্ষমতাই তার চারিত্রিক বিশিষ্টতা। এই আবিষ্কার ভাষার পক্ষে লজ্জার কারণ নয় —এটা আমাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক। ভাষার দুর্বল বাহুবন্ধনে বস্তুসত্তাকে বেঁধে রাখতে গিয়ে আমরা বার বার ভুল করে আসছি অনেক দিন থেকে। এই ভুল আমাদের কখনই ভাঙবে না, যদি না কোন এক মঙ্গল মুহূর্তে বোধির বোধ এসে ভাষার আসন গ্রহণ করে।

"যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।"

'যেতে নাহি পারি সেই পরব্রহ্ম পাশে
দূর হতে মন সহ বাক্য ফিরে আসে ;
আনন্দ-স্বরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ করিলে
নাহি ভয় কোন ঠাঁই এ বিশ্ব নিখিলে।'

অনিকেতন

[কন্নড় কবিতা : অনুবাদিকা—শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

ডক্টর কুভেংপু

হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !
রূপ রূপান্তরকে অতিক্রম করে,
নাম-বাসনার সকল উপাধিকে ত্যাগ করে,
তোমার হৃদয়কে স্বচ্ছ চিন্তায় উন্নত করো !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

অসংখ্য মত-মতান্তরকে উপেক্ষা করে,
সকল তত্ত্বের সীমা অতিক্রম করে
সীমাহীন হয়ে উর্ধ্বচেতা হও !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

গতি বন্ধ করো না কোথাও,
ঘর তুমি বেঁধো না কোথাও
তোমার অন্ত যেন না হয় কখনো ;
হে অনন্তমহিম !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

অনন্তও স্বয়ং অন্তকে অতিক্রম করছে
অনন্ত নিত্যযোগী হচ্ছে,
অনন্ত তুমি অনন্ত হও :
হও, হও, হও, হও !
হে মোর চেতন,
তুমি অনিকেতন হও !

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার তুলনামূলক আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর পরিণত মানসে বিশ্বসভ্যতার পটভূমিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শগত পার্থক্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য—"...প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হ'তে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা—এ দুই ভুল।

"...আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

"আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বলো?"[১] ভারতীয় জীবনাদর্শের চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এর শেষ কথা মোক্ষ। সেটি মনে রাখলেই বোঝা যায় কেন প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থীমাত্রই 'ব্রহ্মচারী'। পরে অবশ্য ব্রহ্মচারী শব্দটি 'সাধক' শব্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। কিন্তু এদেশে বিদ্যার্থীর পরমলক্ষ্য যে অধ্যাত্ম-অনুভব, সেকথা মনে রেখেই ব্রহ্মচর্যের প্রতি এ-দেশীয় আচার্যদের এত গুরুত্বদান।

পাশ্চাত্যদেশে যাঁরা নানা উপলক্ষে যাতায়াত করেছেন, তাঁরা জানেন, এ-জাতীয় কোনো মনোভাব পাশ্চাত্যশিক্ষাদর্শের পিছনে নেই। তার কারণ, পাশ্চাত্যজীবনচেতনার মূলে এই জগৎ ও জীবন। মানবিকতাই প্রাচীন গ্রীক থেকে আধুনিক আমেরিকান বা রুশ তরুণের জীবনাদর্শ। দেশ হিসাবে আমেরিকা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নয়। কিন্তু যে-জীবনচেতনায় মানুষের পরম সার্থকতা ভগবানলাভে, সে চেতনা বিচ্ছিন্নভাবে আমেরিকার কিছু লোকের থাকলেও জাতির সামগ্রিক শিক্ষাদর্শনে তার কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় তা ছিল এবং আধুনিক কালের যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যসংযোগে বিশ্বাসী, (রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অন্যতম) তারাও এই ভারতীয় শিক্ষাদর্শনকে মূলতঃ স্বীকার করেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পেন্সার তাঁর Education (শিক্ষা)-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন—'What Knowledge is of most worth?'—স্বামীজীর অনুবাদে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' যদি স্বামীজী নিজে এ প্রশ্ন তুলতেন, তাহলে পরা ও অপরা বিদ্যা দুয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করলেও অধ্যাত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যাই তাঁর দৃষ্টিতে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান'-রূপে নির্দিষ্ট হ'তো। কিন্তু স্পেন্সার ধর্ম বা ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে বিশেষ মাথা ঘামান নি, কারণ তাঁর জীবনচর্যা প্রধানতঃ ইহলোকমুখী। জীবন-যাপনের আদর্শ সম্বন্ধে স্পেন্সার মোটামুটি যে কয়ভাগে তাঁর চিন্তাধারাকে সাজিয়েছিলেন, তার প্রধানসূত্রগুলি এই—Our first step must obviously be to classify, in the

---

১ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : পৃ: ১২৬

order of their importance, the leading kinds of activity which constitute human life. They may be naturally arranged into :—1. Those activities which directly minister to self-preservation ; 2. Those activities which, by securing the necessaries of life, indirectly minister to self-preservation ; 3. Those activities which have for their end the rearing and discipline of offspring ; 4. Those activities which are involved in the maintenace of proper social and political relations ; 5. Those miscellaneous activities which fill up the leisure part of life, devoted to the gratification of the tastes and feelings.[২]

স্বামীজীর অনুবাদ—"মনুষ্যজীবন কার্যময় এবং আমাদের প্রথম কর্তব্য এই সকল কার্যকরী শক্তিকে শ্রেণীবিভক্ত করা

১। যে সকল কার্যের দ্বারা আত্মরক্ষা হয়

২। যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা করে।

৩। যাহা দ্বারা সন্তানপালন সম্পন্ন হয়।

৪। যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।

৫। কতকগুলি মিশ্র কার্য—যাহারা জীবনের অবসরভাগ অধিকার করিয়া আমোদ এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া পর্যবসিত হয়।"[৩]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, স্পেন্সার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার সন্ধানী হয়ে মোটের উপর তাঁর সমকালে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় জীবনযাপনের আদর্শের কথাই ভেবেছেন, মানব-অন্তরের মহত্তম আকাঙ্ক্ষা বা ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে কোনো তত্ত্ব এক্ষেত্রে তাঁকে বিচলিত করে নি। কার্যকরী শক্তিগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করার ক্ষেত্রে সব কাজের আড়ালে যে মানুষের অন্তর্লোকের জিজ্ঞাসা—এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন অনুপস্থিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাচিন্তার এই আদর্শগত পার্থক্যটি আমরা অনেকসময় ভুলে যাই। সন্দেহ নেই, রামমোহনের সমকালে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহেই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা। কিন্তু প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর নির্ভরশীল শিক্ষাচিন্তা মানব-অন্তরের গভীরতম সমস্যার ক্ষেত্রে নিরুত্তর। হৃদযন্ত্রের শারীরবিজ্ঞানগত পরিচয় আমরা যতই জানি না কেন, মানবহৃদয়রহস্যের কূল পাওয়া কোনো বিজ্ঞানীর সাধ্য নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসচেতন মননের অধিকারী এবং ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত জীবনে উপযোগিতাবাদে (utilitarianism) বিশ্বাসী স্পেন্সারের কাছে হয়তো এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সীমা।

কিন্তু উত্তরকালে স্বামীজী যখন শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ-সাধনের (**manifestion of the perfection already in man**) কথা বলেন, তখন বেদান্তের আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের কথাই মনে পড়ে। 'ভাববার কথা'-গ্রন্থের 'জ্ঞানার্জন'-নিবন্ধে বৈদান্তিক শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে স্বল্পকথায় বলেছেন—

২ Education : Spencer : 1st, Edn. p 9

৩ শিক্ষা : 'বসুমতী'-প্রকাশিত শ্রীশশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ : পৃঃ ১০

"...বৈদান্তিকেরা বলেন, জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধন—আত্মার প্রকৃতি; এই মানবাত্মাই অনন্ত জ্ঞানের আধার, তাহাকে আবার কে শিখাইবে? কুকর্মের দ্বারা ঐ জ্ঞানের উপর যে একটা আবরণ পড়িয়াছে—তাহা কাটিয়া যায় মাত্র। অথবা ঐ 'স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান' অনাচারের দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ঈশ্বরের কৃপায় সদাচারের দ্বারা পুনর্বিস্ফারিত হয়।"[৪]

বেদান্তের বীজমন্ত্রস্বরূপ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"[৫] বা "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৬]-জাতীয় আদর্শের কথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। জাতীয় জাগরণের পটভূমিকায় স্বামীজী মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মার অনন্তশক্তিতে বিশ্বাসের অগ্নিমন্ত্র সঞ্চারিত করেছিলেন। প্রাচীন ঋষির এই আত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞানই বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্র। শিক্ষার এ সত্য যেমন ভারতের তেমনি বিশ্ববাসীর। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, স্বামীজীর আশীর্বাদে জাত 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রেরণামন্ত্র "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"[৭]—কঠোপনিষদের মহাবাক্য।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, লোকায়ত শিক্ষাদর্শের সঙ্গে বেদান্তভিত্তিক শিক্ষাদর্শের দুস্তর পার্থক্য কেমন করে দূর হবে? অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে এ পার্থক্য সত্য বলে মনে হ'লেও বেদান্তের গভীরে যাঁরা পৌঁছেছেন, তাঁদের কাছে এ পার্থক্য কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। স্বামীজীর ভাষায়—"অপরা ও পরা বিদ্যায় বিশেষ আছে নিশ্চিত; আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বিশেষ আছে নিশ্চিত; একের রাস্তা অন্যের না হইতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষণ (difference) কেবল উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ, উপায়ের অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনভেদ; বাস্তবিক সেই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত।"[৮]

উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষ বাক্যাংশটি বিশেষভাবে আলোচনাযোগ্য। স্বামীজীর মতে জ্ঞান এক, অখণ্ড। আত্মতত্ত্ব যদি এক ও অখণ্ড হয়, তাহলে আমরা 'জ্ঞানা' বলতে যা বুঝি, তা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক পৃথক মনে হলেও এক পরমজ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার পটভূমিতে বেদান্তের আত্মতত্ত্ব ও কর্মে পরিণত বেদান্তের আদর্শ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞান লাভ করি, তাহারা কোথা হইতে আসে? উহারা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন জ্ঞান কি বাহিরে আছে?—আমাকে এক বিন্দু দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছিল। জ্ঞান কেহ কখনও সৃষ্টি করে নাই; মানুষ উহা আবিষ্কার করে, ভিতর হইতে উহাকে বাহির করে, উহা ভিতরেই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ঐ সর্ষপজীবের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র জীবে ছিল—ঐ মহাশক্তিরাশি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর সকল শক্তি, প্রখর বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া অবস্থান করে; তবে

---

৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ডঃ পৃ : ৩৮

৫ ছান্দোগ্য উপনিষৎ : ৬।৮।৭ "শ্বেতকেতু, তুমিই সেই সৎ (ব্রহ্ম)"। দ্র "এক কথায় বেদান্তের উপদেশ—'তত্ত্বমসি'।" (কর্মজীবনে বেদান্ত—প্রথম প্রস্তাব : বাণী ও রচনা ২য় খণ্ড : পৃঃ ২২৩)

৬ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ : ১।৪।১০ "আমিই ব্রহ্ম"

৭ "ওঠো, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে গিয়ে আত্মতত্ত্ব জানো।" কঠোপনিষৎ ১।৩।১৪

৮ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : 'জ্ঞানার্জন'; পৃঃ ৩৯-৪০

অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, তাহা আছে। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও উহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু শক্তি রহিয়াছে, তাহা ঐ জীবাণুকোষেই কুণ্ডলীভূত হইয়া ছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়! আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল, অব্যক্তভাবে উহা ছিল নিশ্চয়ই; অতএব সিদ্ধান্ত এই—মানুষের আত্মাতেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র।"[৯]

"ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পারো যে, ইচ্ছা সর্বশক্তিমান? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে।"[১০]

"আমাদিগকে দেখিতে হইবে কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, গ্রামীণ জীবনে, জাতীয় জীবনে, প্রত্যেক জাতির পারিবারিক জীবনে কাজে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ, মানুষ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় ধর্ম যদি তাহাকে সাহায্য করিতে না পারে, তবে ধর্মের বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা জনকয়েক ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট মতরূপেই থাকিয়া যাইবে। ধর্মের দ্বারা যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে হয়, তবে ধর্মকে এমন করিতে হইবে যে, মানুষ যেখানে যে-অবস্থায় আছে, সেইখানেই—দাসত্বে বা পূর্ণ স্বাধীনতায়, অধঃপাতের গহ্বরে বা পবিত্রতার তুঙ্গশিখরে—সর্বাবস্থায় সমভাবে ধর্ম মানবজাতিকে সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে পারে।"[১১]

প্রাচীনকালের ইতিহাসে একাধিক সম্রাট রাজর্ষির কথা জানা যায়, জীবনের চরম কর্মব্যস্ততার মধ্যে যাঁরা ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি করেছিলেন এবং সে উপলব্ধি অন্যের হৃদয়েও সঞ্চার করেছেন। কুরুক্ষেত্রের রণকোলাহলের মাঝখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে জগতের মহত্তম ধর্মচিন্তার উদাহরণ স্থাপিত। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব যে বাস্তবজীবনসম্পর্কবিচ্যুত শুধুমাত্র গিরিগুহা বা অরণ্য-আশ্রয়ী এমন কথা ভারতবাসীরা মনে করতেন না। কিন্তু কালক্রমে সে-আদর্শের কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমরা আবার ব্যবহারিক বিদ্যার নিজস্ব সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। তরুণবয়সে নরেন্দ্রনাথ তাই স্পেন্সারের 'এডুকেশন' (শিক্ষা) গ্রন্থের অনুবাদক। (ক্রমশঃ)

৯ বাণী ও রচনা: ২য় খণ্ড: কর্মজীবনে বেদান্ত—৩য় প্রস্তাব: পৃঃ ২৭১-২৭২

১০ তদেব: কর্মজীবনে বেদান্ত—চতুর্থ প্রস্তাব: পৃঃ ২২৮

১১ তদেব কর্মজীবনে বেদান্ত—প্রথম প্রস্তাব: পৃঃ ২২৯

রবীন্দ্রনাথের 'ধ্যান'

শিবদাস

নিত্যই তোমার ধ্যান করি, তোমাকে "চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।" তোমাকে বরণ করি "বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া।" বিশ্ববিহীন বিজন ব'লে কোন স্থান তো আর হয় না—তোমাকে বরণ করি বিশ্বচিন্তাহীন মনে, 'তুমি' ছাড়া আর কোন কিছুর, কোন জাগতিক বস্তু বা বিষয়ের চিন্তাবিহীন মনে। সমগ্র মন একাগ্র করি তোমাতে; এভাবে 'আবৃত্তচক্ষুঃ'[1] হওয়া ছাড়া তোমায় পাবার দ্বিতীয় আর কোন পথ তো নেই।

এ বিজনও অবশ্য ঠিক বিশ্বহীন নয়। এখানে 'তুমি' আছ, 'আমি'ও আছি আমার মনকে নিয়ে, তার চিন্তাকে নিয়ে (অবশ্য সে চিন্তায় তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই) যা বিশ্বেরই অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিহীন বিজন হল, যেখানে তুমি ছাড়া (বা মনবুদ্ধি প্রভৃতি বিশ্বের ভিতরকার বস্তুবিহীন আমি ছাড়া—দুই-ই এক,) দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই। সে বিজন হল, যেখানকার আভাসমাত্র পেলেও চিত্ত চিন্তায় তাকে রূপ দিতে পারে না, 'করে থাকে চুপ, 'ছন্দ যায় থামি।'[2] ছন্দ, কথা, এসব তো হ'ল মনের বেড়ার মধ্যে যতক্ষণ রয়েছি, যতক্ষণ না তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারছি, ততক্ষণকার ব্যাপার। মন যখন একা একা কথা বলে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যবহার না ক'রেই, বা কোন ছবি বা রূপ দেখে দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই, অথবা একসঙ্গে দুই-ই করে, তখন তাকে বলি চিন্তা; আর যখন সেই 'নাম-রূপ'কেই লেখায় বা বাক্যে প্রকাশ করি, তখন তাই-ই হয় কথা বা ছন্দ। নাম-রূপ ছাড়া চিন্তাই হয় না, বিশ্ববোধও জাগে না। নাম-রূপ যতক্ষণ আছে বিশ্ব ততক্ষণ থাকবেই। কাজেই মনে যতক্ষণ তুমি-আমি মাত্রও আছে, মন তোমাকে যে-কোন ভাবেই হোক 'দেখছে', তোমাকে নিয়ে মনে চিন্তার তরঙ্গ উঠছে, মন ছন্দ গাঁথছে, ততক্ষণ আমরা বিশ্ববিহীন বিজনে যেতে পারছি না। ততক্ষণ আমাদের সে ধ্যান সগুণ ব্রহ্মেরই ধ্যান—তাঁর কোন বিশেষ রূপেরই হোক, বিশ্বরূপেরই হোক বা সগুণ নিরাকারেরই হোক। এই সগুণ নিরাকারকে "প্রশান্ত চিরনিশিদিন" রূপেও বোধ হতে পারে, আবার করুণা প্রেম প্রভৃতির তরঙ্গময় ব'লে বোধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই ধ্যান 'তুমি' 'আমি' দুইকে লইয়া। সে দুই—তুমি আর আমি যে "একাকার," এবোধ সেখানে আছে, আবার দুয়ের পৃথক অস্তিত্ববোধও রয়েছে :—

"তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—

১ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।' (কঠোপনিষদ্, ২।১।১) —ভগবান ইন্দ্রিয়গুলিকে হিংসা করেছেন, সেজন্য তারা বহির্বিষয়ই দর্শন করে, ভগবানকে দেখতে পায় না (ভগবান এভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে সৃষ্টি করেছেন যে সেগুলির দ্বারা আমরা বহির্বিষয়ই গ্রহণ করতে পারি, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না)। কোন কোন ধীর ব্যক্তি তাই অমৃতত্বলাভের ইচ্ছায় বিষয় হতে ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে এনে, বিষয় গ্রহণে বিরত হয়ে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

২ রবীন্দ্রনাথ—'মুক্তবাতায়নপ্রান্তে' (আরোগ্য)

যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

তুমি চিন্তাতরঙ্গহীন চৈতন্যস্বরূপ, আমি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছি মনের সঙ্গে—যাতে সর্বদা চিন্তাতরঙ্গ বা ভাবতরঙ্গ উঠছে, চিন্তা ছাড়া যার অস্তিত্বই নেই ; কারণ, কারণ-শরীরে বীজাকারে থাকলেও তোমার প্রতিবিম্বই শুধু স্পষ্ট সেখানে। এ ধ্যানে যে "একাকার" বোধ তা স্পষ্টতই অদ্বৈত নয়, দুটি পৃথক সত্তার মিলন, পরস্পরের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই—কখনও নিজেকে তরঙ্গময় রেখে, কখনো বা তরঙ্গহীন অবস্থায় নিজের সব ঠাঁই জুড়ে তাঁকে প্রতিবিম্বিত রেখে।

এই ধ্যানের রেশই ওতপ্রোত রবীন্দ্রকাব্যে অধ্যাত্মচিন্তার প্রায় সর্বত্রই ; বোধ হয় বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রধান সুর বিশিষ্টাদ্বৈত : 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'[৩] —'যেথা যাই আর যেথায় চাহিরে, তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে',[৪] 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি'[৫] —

'জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির গৌরব,
একথা যদি না শিখিলে
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে ॥'[৬]

রবীন্দ্রকাব্যে উচ্চস্তরের অধ্যাত্মচিন্তায় অধ্যাত্ম-হিমালয়ের এই শিখরটির ওপরই 'আমি' দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় সব সময়েই, যেখানে দাঁড়ালে বিশ্বকেও দেখা যায় ; তবে আমরা সাধারণ অবস্থায় সেখানকার বস্তুগুলিকে যেভাবে পৃথক পৃথক সত্তা রূপে দেখি, 'নানা' রূপে দেখি, সেভাবে নয়, সেগুলির নামরূপের আবরণগুলিকে পৃথক বোধ হলেও দেখা যায় সেগুলির সত্তা একই, 'তুমি' ; কদাচিৎ তা এ শিখর ছেড়ে উর্ধ্বগামী হয়ে সর্বোচ্চ শিখর 'নৈঃশব্দ্য-চূড়া'[৭] স্পর্শ করেছে, কদাচিৎ সে 'আমি'-র ধারা নামরূপে বিহায়'[৮] মিশতে চেয়েছে 'পরিপূর্ণচৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে,'[৯] যা যথার্থই 'বিশ্ববিহীন বিজন',—'নির্বিশেষম্', 'যেথায় পেয়েছে লয় সকল বিশেষ পরিচয়,' —'সদসদ্‌বিহীনম্,' 'নেই আর আছে এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,'—'অদ্বৈতম্'।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—যে ভাব অবলম্বনেই হোক, ধ্যান মানেই হল বহির্বিশ্বে ছড়ানো মনকে সেখানে থেকে ফিরিয়ে এনে ভগবচ্চিন্তায় বা আত্মচিন্তায় (যা মূলতঃ একই কথা) একাগ্র করার চেষ্টা করা, অথবা মনকে একেবারে চিন্তাশূন্য করার, 'চুপ' করিয়ে দেবার চেষ্টা করা। তোমার ধ্যানে আমার প্রাণ স্থির হয়েছে—

৩ জগতে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, সবই ভগবানের দ্বারা আচ্ছাদন করবে (ভগবানই বিশ্বের সব কিছু জুড়ে আছেন, এরূপ জ্ঞান করবে।)

৪, ৬ রবীন্দ্রনাথ—'প্রবাসী' (উৎসর্গ)

৫ কঠোপনিষদ্‌, ২।১।১১। (শুদ্ধ) মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। ব্রহ্মে বিন্দুমাত্র নানাত্ব (ভেদ) নেই। যে এখানে নানাত্ব দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (বারংবার জন্মমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকে।)

৭, ৯ রবীন্দ্রনাথ—'পথের শেষে' (জন্মদিনে)

৮ 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথাবিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষং উপৈতি দিব্যং।' (মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ৩।২।৮)। নদীগুলি যেমন প্রবাহিত হয়ে এসে সাগরে প'ড়ে (নিজেদের পৃথক পৃথক) নাম-রূপ হারিয়ে সাগরে মিশে যায়, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও তেমনি নাম-রূপ হতে মুক্ত হয়ে পরাৎপর স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন (পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করেন)।

"উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন-সম।"

—'যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে।' বায়ু-প্রবাহহীন স্থানে দীপশিখা যেমন স্থির হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি। বাসনাই হল বাতাস, যা মানসদীপকে চঞ্চল করে। আমার মন তো এখন কোন কিছুর জন্য লালায়িত নয়, "উদাস"।

মন যতই একাগ্র হয় ততই তার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুভব করার ক্ষমতা বাড়ে; একাগ্র, স্থির মনেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপলব্ধি করার সামর্থ্য আসে, তার ক্ষমতা হয় অসীম। এখন তোমাতে একাগ্র আমার মনেরও দৃষ্টি তাই শুধু "উদাস" নয়, "অগাধ, অপার।"

কবি 'মন' বলেন নি, 'প্রাণ' বলেছেন। মন ও প্রাণ পৃথক সত্তা; উপলব্ধি মনেই হয়, প্রাণে হয় না। তবে আমরা অবশ্য মন ও প্রাণকে একই সঙ্গে, কখনো কখনো একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি। প্রাণ হ'ল শক্তি যা দেহযন্ত্রকে গঠিত, লালিত ও পরিচালিত করে। প্রাণ স্থির হলেই মন স্থির হয়; প্রাণের নিয়মনও তাই মনকে স্থির করার একটি উপায়। আবার জ্ঞান ভক্তি যে কোন ভাব অবলম্বনে মনকে স্থির করতে পারলে প্রাণও স্থির হয়ে যায়।

মন যত স্থির হয় ততই তা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে আপ্লুত হতে থাকে। আমাদের হৃদয়েই যে প্রেমসিন্ধু বিদ্যমান রয়েছে, ততই তা বোধ হতে থাকে। আর আমরা যে অনন্তের অধিকারী, তার আভাস পেতে থাকি তত বেশী ক'রে। তাই-ই তো আমি অনুভব করছি এখন:

"তোমার পাইনে কূল—
আপনার মাঝে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।"
"তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।"

এই পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোকেই একদিন উদ্ভাসিত হয়ে থাকতো ভারতের তপোবন, ভারতের রাজাসন, ভারতের সর্বসাধারণের গৃহ-প্রাঙ্গণ; স্নিগ্ধ ক'রে রাখতো জাতীয় জীবনকে। জ্ঞানকে তুলনা করা হয় সূর্যালোকের সঙ্গে, ভক্তিকে চন্দ্রিমার সঙ্গে। আনন্দলোকে পৌঁছবার জন্য জ্ঞানপথে চলার অধিকারী অতি অল্প, ভক্তিপথই সর্বসাধারণের উপযোগী। এ 'ধ্যান' ভক্তিপথেরই শান্তভাবের ধ্যান বলে "পূর্ণিমা" কথাটি অধিকতর মাধুরীমাখা হয়েছে। এই পূর্ণিমালোকই ছড়ানো রবীন্দ্রকাব্যে আরও বহু স্থানে।

সত্য

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ দাস

সত্যিকারের পথ যে ওটা
সহজ এবং সরল,
নির্বিবাদে পেরিয়ে চলো
নেই ও পথে গরল।
সতিকারের পুকুর যে ঐ
স্বাদু জলের ঠাঁই,
খুশিমতো পান করে নাও
চিত্ত যতো চায়।
সত্যিকারের বাগান এটা
পুষ্পরাজির মেলা,
অবসরে বেড়াও হেথা,
করতে পারো খেলা।
সত্যিকারের পাগল ও যে
নিজের মনে ঘোরে;
ওর কথাতে রাগ কোরো না
মান-অপমান ধ'রে।
সত্যিকারের মানুষ যে জন
আদর্শ নাও তার,
দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ো
দেশকে করো সার।

মরীচিকার মোহে ভুলে
সত্যি ভেবে তাকে
তাহার পানে ছোট যদি
পড়বে দুর্বিপাকে।
সেয়ান-পাগল যে-জন,
করে স্বার্থত্যাগের ভান
তার কবলে পড়লে হবে
জীবন শতখান।
সত্যিকারের মানুষ কি না
জানার আগে তাই
আদর্শ তার নিলে ভাগ্যে
দুর্দশা যে ভাই '

সমালোচনা

অনুবাদবিবেকানন্দম্ঃ Translation of Swami Vivekananda's Works. By Dr. Sitanath Goswami; —"Kalyani", 63/1A, Selimpur Lane, Calcutta 31 Price: Rs 7·00, P. 120.

স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসার বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি সংস্কৃত স্তোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার কয়েকটি পত্র সংস্কৃতে রচিত। তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিতেন—সংস্কৃতের অমৃতভাণ্ড জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদিগকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। স্বাধিকারপ্রমত্ত দেশবাসীর কর্ণে তিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের মন্ত্রই প্রদান করিয়াছেন।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় স্বামীজীর রচিত গ্রন্থ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', ও 'বর্তমান ভারত' তাঁহার প্রাণপ্রিয় দেবভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁহার নিজস্ব মৌলিক রচনাবলীও তাঁহার অসামান্য মনীষার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করে। 'বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ত্ব', 'ভারতে গোরক্ষা' প্রভৃতি সুচিন্তিত গবেষণাগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠার আসন অর্জন করিয়াছেন। তৎসম্পাদিত আলোচনাবহুল 'ঈশোপনিষৎ ও কেনোপনিষৎ' স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্য নিত্যসঙ্গী। 'স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা'র রচয়িতা বর্তমান লেখক যে স্বামীজীর রচনার সংস্কৃতানুবাদের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন হেতু নাই।

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের প্রতি একটি ভীতি-বিমিশ্র অহেতুক ঔদাসীন্য আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ডক্টর গোস্বামীর আলোচ্যমান অনুবাদের প্রতি দৃক্‌পাত করিলে সেই ভীতি লব্ধাবসর থাকিতে পারিবে মনে হয় না। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র জলদমন্দ্র অনুবাদের ভিতর দিয়াও সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে:

"কোটীনাং ত্রিংশদ্ মানবপ্রায়াঃ খলু জীবাঃ বহুশতাব্দীপর্যন্তং স্বজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাং স্বধর্মিণাং বিধর্মিণাং চ পদভরৈর্নিতরাং নিষ্পীড়িতাঃ, দাসোচিতশ্রমসহাঃ, দাসবন্নিরুদ্যমাঃ, আশাহীনাঃ, অতীতহীনাঃ, ভবিষ্যদ্‌বিহীনাঃ, অধুনা যেন কেন প্রকারেণ প্রাণধারণমাত্রাভিলাষিণঃ দাসবদীর্ষ্যাপরায়ণাঃ, স্বজনোন্নতিমসহমানাঃ, হতাশবদ্ বীতশ্রদ্ধাঃ, বিশ্বাসহীনাঃ, শৃগালবন্নীচচাতুরীপ্রতারণাসহায়াঃ, স্বার্থপরতায়া আধারস্বরূপাঃ, বলবতাং পদলেহকাঃ, স্বাপেক্ষয়া দুর্বলানাং যমস্বরূপাঃ, নির্বলনিরাশোচিতকদর্যভীষণকুসংস্কারপূর্ণাঃ, নৈতিকপৃষ্ঠাস্থিহীনাঃ, পূতিগন্ধিমাংসখণ্ডব্যাপিকীটকুলানিব ভারতশরীরে পরিব্যাপ্তাঃ—ইত্যেব ইংরেজরাজপুরুষাণাং দৃষ্টাবস্মদীয়ং চিত্রম্।"—উদ্ধৃতিতে সযত্ননির্বাচিত অভিধানের দুরূহ একটি শব্দও নাই।

স্বামীজীর প্রজ্ঞালব্ধ ইতিহাস-বোধের আর একটি উদাহরণ—"পুরোহিতপ্রাধান্যেন সভ্যতায়াঃ প্রথমাবির্ভাবঃ, পশুত্বস্যোপরি দেবত্বস্যাদ্যো বিজয়ঃ, জড়স্যোপরি চেতনস্যাদিভূতোঽধিকারবিস্তারঃ, প্রকৃতেঃ ক্রীতদাসস্য জড়পিণ্ডসদৃশস্য মনুষ্যদেহস্যাভ্যন্তরেঽস্ফুটতয়া যদধীশ্বরত্বং নিহিতং তস্য চ প্রাথমিকো বিকাসঃ। পুরোহিতঃ খলু জড়চৈতন্যয়োরাদিমো বিভাজকঃ, ইহপরলোকয়োঃ সংযোগস্য সহায়ঃ, দেবমনুষ্যয়োর্বার্তাবহঃ, নৃপতিপ্রকৃত্যোর্মধ্যবর্তী

সেতুঃ। বহূনাং কল্যাণানাং প্রথমাঙ্কুরস্তস্যৈব তপোবলেন, তস্যৈব বিদ্যানিষ্ঠয়া তস্যৈব ত্যাগমন্ত্রেণ তস্যৈব প্রাণসেকেন সমুদ্ভূতঃ, অতঃ সর্বেষু দেশেষু প্রথমা পূজা তেনৈব লব্ধা, অতএব চ তেষাং পুরোহিতানাং স্মৃতিরপ্যস্মৎসমীপে পবিত্রা।"

মূল গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা বহুস্থানেই সমাসবহুল; অনুবাদে তাহাই অনেকাংশে অনুসৃত হইয়াছে; তাহাতে ভাষায় বেশ একটি দৃপ্ত তেজ প্রকাশিত। 'ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বম্।' আবার সরল আটপৌরে কথাও অনুবাদে প্রতিফলিত: "ভৃষ্টানি দ্রব্যাণি সাক্ষাদ্বিষমেব। মোদকাপণং যমগৃহম্। ঘৃততৈলং গ্রীষ্মে দেশে যাবৎ স্বল্পং ভক্ষ্যতে তাবদেব কল্যাণম্। ঘৃতান্নবনীতং শীঘ্রতরং পচ্যতে। যন্ত্রপিষ্টে গোধূমচূর্ণে ন কিমপ্যস্তি, শ্বেতং তদ্ দৃশ্যত ইত্যেব। গোধূমস্য কৃৎস্নো ভাগো যত্র বিদ্যতে তাদৃশং গোধূমচূর্ণং সুখাদ্যম্।" "মনুষ্যো ভব, রামচন্দ্র! দ্রক্ষ্যসি যচ্ছিষ্টং সর্বং স্বত এব লীলয়াঽগমিষ্যতি। কুক্কুরবন্ মিথঃ সংঘর্ষং তং পরিত্যজ্য সদুদ্দেশ্যং সদুপায়ং সৎসাহসং সদ্বীর্যং চাবলম্বস্ব। জাতশ্চেত্তর্হি কঞ্চনাঙ্কং পাতয়িত্বা গচ্ছ।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃত অনুবাদ-সাহিত্য ক্রমশঃই গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের জাতীয় সংবিধানেরও সংস্কৃত অনুবাদ হইয়াছে। সংস্কৃতে পত্র-পত্রিকার প্রকাশনও বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা-মন্ত্রকের প্রেরণায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত দিবস উদ্‌যাপিত হইতেছে। এই সকল শুভ প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এই অতিসুপাঠ্য গ্রন্থখানি স্বতই অভিনন্দনীয়। বিশেষতঃ শিক্ষার্থিগণ যদি এইরূপ গ্রন্থের ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃতভীতি দূরীভূত হইয়া প্রভূত কল্যাণ হইবে মনে করি। মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপদ-সংবলিত সুমুদ্রিত গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। **—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত**

আশ্রম (রজতজয়ন্তী সংখ্যা) —শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪পরগনা। প্রকাশক: স্বামী পুণ্যানন্দ। পৃষ্ঠা ১৪৪।

রহড়া বালকাশ্রমের ২৫.বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজতজয়ন্তী সংখ্যার আত্মপ্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে আশ্রমের অগ্রগতি অব্যাহত—'আশ্রমিকী' শীর্ষক নিবন্ধটিতে ইহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি রচনা সুলিখিত ও সুখপাঠ্য। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ—রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য: বিবেকানন্দ যুগ, রাজা রামমোহন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ: বাঙালীর মনন-সমীক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণের সামগ্রিক অর্চনা, শাক্তকবি নজরুল ইসলাম, সৌন্দর্যবোধ ও শিক্ষা।

Ashram (Silver Jubilee Number) —Ramakrishna Mission Boys' Home, Rahara, 24 Parganas.

রহড়া বালকাশ্রমের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজী স্মরণিকার সম্পাদনা প্রশংসনীয়। প্রথমে রোঁমা রোলাঁর প্রবন্ধ 'The Pilgrim of India,' তৎপরে সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 'On Education,' ও শ্রীঅরবিন্দের 'Three Principles of True Teaching' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লইয়া মোট ২৩টি মনন-সমৃদ্ধ মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বর্তমান-সময়োপযোগী চিন্তাধারা প্রতিফলিত। পরীক্ষামূলক বিশ্বসাক্ষর পরিকল্পনার বিষয়, বয়স্কশিক্ষাসমস্যা, বুনিয়াদী শিক্ষার কথা গভীরভাবে চিন্তা করা হইয়াছে।

[শেষাংশ ৩৮৭ পৃষ্ঠায়]

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বসিরহাট ও হাসনাবাদ ক্যাম্পে সমবেত পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বর্তমানে চল্লিশ হাজারেরও অধিক। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক তাহাদিগকে চাল, ডাল, পেঁয়াজ লবণ প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে। যাহারা অসুস্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে বার্লি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

১৩.৬.৭০ পর্যন্ত বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ: চাল ২,১৬৪.৮৪ কুইণ্ট্যাল; ডাল ২৭৪'৭৭ কুইণ্ট্যাল, আলু ৭৪'৬১ কুইণ্ট্যাল, লবণ ১৭২¾ বস্তা, পেঁয়াজ ১৩৬½ বস্তা, বার্লি পাউডার ১৭৯ পাউণ্ড।

পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক ৩০. ৫. ৭০ হইতে 'গবর্ণমেণ্ট টেস্ট রিলিফ স্কীম'-এ খরা-ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে; জলকষ্ট দূরীকরণের জন্য হাতোরাতে পুষ্করিণী খনন করা হইতেছে, এইকার্যে ১৪,২২০ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে আরও দুইটি রিলিফ কার্য গ্রহণ করা হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে একটি হাতোরায়, এখানে একটি রাস্তা তৈরি করা হইতেছে, এই কার্যে ১৫০জনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে; অন্যটি মালহোত্রায়, এখানে একটি বড় পুষ্করিণীর পাড় বাঁধিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই কার্যে ১২৫ জনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সাম্প্রতিক পুরুলিয়া পরিভ্রমণকালে মিশনের একটি টেস্ট রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করিয়াছেন।

গুজরাটে গড়ে দৈনিক ১,২০০ জন ক্ষুৎপীড়িতকে ডাল, চাপাটি, ঘোল ইত্যাদি দেওয়া হইতেছে। খাবদা, ধানেতি, রৎনার ও নালাপুরে দুঃস্থদের মধ্যে ৯,০০০ মিটার কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

[৩৮৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাভাগবতম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ) — প্রকাশক: শ্রীনিখিলবন্ধু ভট্টাচার্য, সন্তোষপুর, কলিকাতা ৩২। পৃষ্ঠা ৩২। বিনামূল্যে বিতরিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাভাগবতে সংস্কৃত ৩৮টি শ্লোকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দেবচরিত্র', ২৪টি শ্লোকে শ্রীশ্রীমা সারদার 'দেবীচরিত্র', স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ স্মরণে সংস্কৃত পদ্যাবলী ও ছন্দোবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত। বাংলা কবিতানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় স্তোত্রগুলি সর্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থশেষে বাংলা কবিতায় 'ভক্তবন্দনা'টি সুন্দর। চিত্তাকর্ষক শ্লোকত্রয়ে রচিত 'ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল:

"ছন্দঃ প্রেমো ভাষা ভক্তিঃ ভক্তানাং
করুণাঽঙ্কিতম্।
প্রেমাশ্রুসিক্ত্যাঙ্কেন ইদমর্ঘ্যং নিবেদিতম্॥"

ছাত্রদের কৃতিত্ব

গত (১৯৭০) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত কয়েকটি স্কুলের কয়েকজন কৃতী ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থানলাভ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে :

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় : সাহিত্যে ১ম ; কৃষিতে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এবং টেকনিক্যালে ১০ম স্থান।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম : সাহিত্যে ৮ম স্থান।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ : চারুকলায় ১ম, এবং কৃষিতে ২য় স্থান।

কার্যবিবরণী

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মালদহে মঠকেন্দ্র স্থাপিত হয়, পরে জনহিতকর কর্মের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মিশন-শাখা খোলা হয়।

মঠকেন্দ্র : শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে নিত্য পূজার্চনা, আরাত্রিক, ভজন ও ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। একাদশীতে রামনাম এবং পূর্ণিমাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতনাম কীর্তন হয়। মহাপুরুষগণের জন্মতিথিতে উৎসবাদি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণজন্মোৎসব মনোজ্ঞভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের ত্যাগব্রতী কর্মিবৃন্দ গ্রামে গ্রামে যাইয়া সভা-উৎসবাদির মাধ্যমে ম্যাজিক ল্যানটার্ন সহযোগে ধর্মবিষয়ক ও শিক্ষাসংস্কৃতিমূলক বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিবৎসর প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সব অনুষ্ঠানে শহরের ও গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী যোগদান করেন।

মিশন শাখা : মিশন শাখার কার্যধারা প্রধানতঃ শিক্ষা ও সেবা—এই দুই বিভাগে নিয়ন্ত্রিত হয়।

শিক্ষাবিভাগ : উত্তরবঙ্গ শিক্ষায় অনগ্রসর বলিয়া মিশন শাখায় শিক্ষাপ্রসারের কার্যই প্রধান স্থান পাইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে :

বিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা	স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক	৬৪৪ ছাত্র	আশ্রম-প্রাঙ্গণ
নার্সারী	১০৬ ছাত্র-ছাত্রী	"
নিম্ন বুনিয়াদী	২৬৬ "	"
"	১৪১ "	* মোহনপাড়া (অমৃতি)
প্রাথমিক	১৫০ "	রামকৃষ্ণপল্লী (রিফিউজি কলোনী)
"	৮১ "	* চিৎকোল (গাজোল)
"	৫৬ "	নারায়ণপুর (পুরাতন মালদহ)
নৈশ বিদ্যালয়	৬০ ছাত্র	* মোহনপাড়া (অমৃতি)
" "	৪০ "	* চিৎকোল (গাজোল)
" "	৩০ "	চেংনাডাঙ্গা (বামনগোলা)
সারদা শিল্পনিকেতন	১৫ মহিলা	রামকৃষ্ণপল্লী
গ্রন্থাগার	৩০ পাঠক (দৈনিক গড়)	আশ্রম-প্রাঙ্গণ
বিবেকানন্দ শিশু সংঘ	মোট ২৭০ বালক-বালিকা	আশ্রম-প্রাঙ্গণ
" "	— "	সাহাপুর
" "	— "	মোহনপাড়া
ব্রহ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবন	৩৩ ছাত্র	আশ্রম-প্রাঙ্গণ

* চিহ্নিত স্কুলগুলি আদিবাসী ও অনুন্নতদের জন্য। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ২,৯৯১। ব্রহ্মানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে কয়েকটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে রাখা হয়।

ছায়াচিত্রে শিক্ষামূলক বক্তৃতা প্রদত্ত হয় আশ্রমে ১০টি এবং আশ্রমের বাহিরে ১৫টি।

মিশন শাখার সেবা বিভাগ :

হোমিও ঔষধ বিতরণকেন্দ্র	রোগীর সংখ্যা		
	নূতন	পুরাতন	মোট
রামকৃষ্ণ মিশন রোড (টাউন)	৪,৮৯১	৩৫,৬৬৭	৪০,৫৫৮
সাহাপুর হোম (পূঃ মালদহ)	১,১০৩	২,৩২১	৩,৪১৪
*চিৎকোল (গাজোল)	১,১৪৩	৭,৪৯৯	৮,৬৪২
*দিগলভর (বামনগোলা)	১৯২	৩৫০	৫৪২

* আদিবাসী ও তপশীল জাতির জন্য।

আলোচ্য বর্ষে বন্যাত্রাণকার্যে ইংলিশ-বাজার, মানিকচক ও কালিয়াচক থানার গয়েশবাড়ী, সুজাপুর, মোথাবাড়ী, পঞ্চানন্দপুর, নাজিরপুর, মথুরাপুর, গোপালপুর, মিলকী, উত্তরচণ্ডীপুর, হীরানন্দপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চাল, যব, আটা, ছাতু, শিশুখাদ্য, ঔষধ, কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করা হইয়াছিল। বিতরিত চালের পরিমাণ ৪১০ কুইন্ট্যাল। ১০০ খানি পশমী কম্বল দুঃস্থগণকে দেওয়া হয়। এই বন্যার্তসেবা-কার্যে ৭০,০০০৲ ব্যয়িত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬শে হইতে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'কথামৃত' পাঠ, রামায়ণকীর্তন, ভজন, ভক্ত-সম্মেলন, নগরকীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল : 'মা সারদাদেবী ও নারীর আদর্শ'। বক্তা ছিলেন স্বামী অনুপমানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল : 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ'। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তাদের ভাষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পূর্ব-দিনের বক্তাগণই এই দিন ভাষণ দেন। এই দিনের বিশেষ কার্যসূচী ছিল সকালে ও বিকালে ভক্তসম্মেলন।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ উৎসবের শেষ দিবস। এই দিন পূর্বাহ্ণে পূজা পাঠ ভজনাদি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম' সম্বন্ধে সময়োপযোগী সুন্দর ভাষণ দেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ।

এই উৎসবে মালদহ শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের বহু লোক সমবেত হন। কয়েক দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৯ই মার্চ বাংলা ২৫শে ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৫তম শুভ জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পূজাপাঠ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচশত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে মঠাধ্যক্ষ স্বামী যোগদানন্দ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণপুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে স্বামী যোগদানন্দ ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সাধারণ উৎসব উপলক্ষে ১৬ই মার্চ হইতে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ৫ দিবসব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬ই মার্চ অপরাহ্ণে ডঃ সুকুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রবন্ধ-পাঠ ও আবৃত্তি করেন আশ্রমের ছাত্রগণ। স্বামী

যোগদানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত রায়, অধ্যাপক সতীশ-চন্দ্র দাস, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য এবং প্রধান অতিথি ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী বর্তমান বিশ্বে স্বামীজীর আদর্শ এবং ভাবধারার উপর অলোকপাত করিয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রাত্রে রামায়ণগান হয়।

১৭ই মার্চ সকালে পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ হয়। বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় স্বামী কালিকাত্মানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীবিশ্বজননী সারদাদেবীর জীবনের বিভিন্ন দিক ও নারী-সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী, ব্রঃ বিদেহচৈতন্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু শ্রীশ্রী-মায়ের জীবনী অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী যোগদানন্দ মায়ের জীবনী ও বাণীর দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন রাত্রে রামায়ণগান হয়।

১৮ই মার্চ অপরাহ্ণে ডঃ হরিনাথ দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্বামী যোগদানন্দ। অধ্যাপক করুণাময় গোস্বামী, শ্রীশচীন্দ্রনাথ পোদ্দার, শ্রীহট্টের শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রধান অতিথি ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন এবং সভাপতি মহোদয় অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন।

১৯শে মার্চ অপরাহ্ণে মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব ও তৎসম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে বহুজনসমাবেশে অধ্যক্ষ শ্রীখগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আলোচনা হয়। সভার প্রারম্ভে মঠাধ্যক্ষ মিশনের কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

মিশন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক প্রাণ-কুমার ভট্টাচার্য তাঁহার লিখিত ভাষণের মাধ্যমে মিশনের কর্মপ্রসারে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। বক্তৃতা করেন অধ্যাপক প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীবিমলেন্দু-বিকাশ রায়চৌধুরী (এডভোকেট), স্বামী যোগদানন্দ এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন চাঁদপুরের শ্রীবিমলচন্দ্র বসু।

সভাপতি মহোদয়ও তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রী-ঠাকুরের এবং মিশনের আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রে পালাকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৫তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ মিশন আশ্রমের বিদ্যার্থীদের একান্ত আগ্রহে 'জ্ঞানানুশীলন' সাময়িক পত্রিকাটি বাহির করা হয় উৎসবের শেষের দিন।

২০শে মার্চ সকালে পূজা পাঠ ইত্যাদি এবং ভজনসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর হইতে প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

গড়বেতা (মেদিনীপুর জেলা) শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠের উদ্যোগে গত ১২ই জুন হইতে ১৬ই জুন পঞ্চদিবসব্যাপী এক মনোজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব হওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে।

বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগাদি-সহ উৎসবের সূচনা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী আপ্তকামানন্দ, স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী ভাবাতীতানন্দ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং লেডী ব্রেবোর্ন কলেজের ডঃ বন্দিত ভট্টাচার্যও ভাষণ দেন।

শ্রীসুকুমার দে ও সম্প্রদায় কর্তৃক শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য এবং গীতি সুধাকর বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 'রাম রসায়ণ' সকলকে মুগ্ধ করে। প্রতিদিন বহু লোকসমাগম হয়। প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

স্বামী সুপর্ণানন্দের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, গত ১৯শে জুন রাত্রি ১২-৫৫ মিনিটের সময় স্বামী সুপর্ণানন্দ (সতীনাথ মহারাজ) কলিকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্লাড-প্রেসার ও ডাইবিটিস্-এ তিনি দীর্ঘকাল ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেওয়ায় তাঁহাকে ভুবনেশ্বর হইতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে এবং পরে সেখান হইতে ১৭ই মে পূর্বোক্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

স্বামী সুপর্ণানন্দ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ ও ঢাকা আশ্রমে কয়েক বৎসর কর্মিরূপে এবং পরে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে সংঘের সেবা করিবার পর তিনি ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে স্বামী শঙ্করানন্দজীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত হন এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ পর্যন্ত ঐ কর্মে ব্রতী থাকেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দেই তিনি ভুবনেশ্বর মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন।

স্বামী সুপর্ণানন্দ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সুন্দর গাহিতে পারিতেন। তাঁহার দেহত্যাগে মিশন একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতীকে হারাইল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে মিলিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পরমাণুর ফটো

সম্প্রতি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অ্যালবার্ট ক্রু পরমাণুর ফটো তুলিয়াছেন। ইলেক্ট্রণ-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইয়া তিনি একাজে সফল হইয়াছেন। বিজ্ঞানজগতে এটি একটি বিরাট ঘটনা। পরমাণুর অস্তিত্ব ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে জন ডাল্‌টন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার আগে কোন বৈজ্ঞানিকই পরমাণুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। এই ইলেকট্রণ-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশ্য কিছুদিন পূর্বে খুব বড় আয়তনের অণুর ছবি তোলা সম্ভব হইয়াছে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিতে বস্তুকে পঞ্চাশ লক্ষ গুণ বড় দেখায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের সব জড়পদার্থই শক্তি-বিধৃত কতকগুলি কণার সমষ্টিমাত্র। সবচেয়ে ছোট কণাগুলির নাম ইলেকট্রণ, প্রোটন, এবং নিউট্রণ প্রভৃতি। এক বা একাধিক প্রোটনকণা কেন্দ্রে থাকে (উহার সহিত নিউট্রণ প্রভৃতিও থাকিতে পারে) এবং উহার চারিদিকে প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রণ কণা ঘুরিতে থাকে, এবং সব মিলিয়া একটি মাত্র কণার মতো কাজ করে; ইহারই নাম পরমাণু। কয়েকটি একই-জাতীয় (মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে), অথবা ভিন্নজাতীয় (যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে) পরমাণু মিলিয়া একটি অণু হয়।

এই পরমাণুগুলি এত ছোট যে আলোকের সাহায্যে খালি চোখে বা কোনও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাদের দেখা বা ক্যামেরায় ফটো তোলা সম্ভব নয়; যে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর ছবি তোলা হইয়াছে, ইলেকট্রণের স্রোতের সাহায্য ছাড়া

সে যন্ত্রটি দিয়াও নয়। কারণ, কোন কিছু দেখিতে হইলে বা তাহার ছবি তুলিতে হইলে (বস্তুটি যদি নিজেই আলোক-বিকীরণকারী না হয়) বস্তুটি হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে বা ক্যামেরার লেন্সে আসিয়া পৌঁছানো প্রয়োজন। কিন্তু আলোক-তরঙ্গের ধর্ম হইল, নিজের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশের চেয়েও কম মাপের কোন বস্তুর উপর পড়িলে উহা আর নিয়মমতো প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে না। আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে পরমাণু বহুগুণ ছোট, তাই আলোক কখনও তাহাতে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসে না; সেজন্য আলোকের সাহায্যে পরমাণু দেখা বা তাহার ছবি তোলা অসম্ভব, যত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যই সেই কাজে লওয়া হউক না কেন।

কিন্তু ইলেকট্রণতরঙ্গের মাপ আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কয়েক হাজার ভাগ ছোট, পরমাণুর চেয়ে তো বটেই। আবার ইলেকট্রণ-কণাসমূহ যখন স্রোতের আকারে বিচ্ছুরিত হয়, তখন সেগুলি আলোকের মতোই ব্যবহার করে। কাজেই ইলেকট্রণকণার স্রোতকে পরমাণু হইতে প্রতিফলিত করিয়া এবং সংহত করিয়া বস্তুর প্রতিবিম্ব পাওয়া সম্ভব। ইলেকট্রণ-মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রে তাহাই করা হয়। মাইক্রোস্কোপ শুধু প্রতিবিম্বের আয়তন বাড়াইয়া উহাকে খালি চোখে দেখিবার মত আয়তন দেয়। ডঃ ক্রু এই যন্ত্রের সাহায্যেই পরমাণুর ছবি তুলিয়াছেন।

উৎসব-সংবাদ

সারদা সংসদ—প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে চারদিনব্যাপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৮ বৎসর যাবৎ এরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ৪ঠা এপ্রিল সকালে পূজা চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজনাদি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী নিবৃত্তানন্দ। দুপুরে ১,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরে রামনাম-সংকীর্তন ও বিল্বমঙ্গল যাত্রা হয়। ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল কঠোপনিষদ্ ব্যাখ্যা করেন স্বামী তীর্থানন্দ। বিভিন্ন দিনে স্বামী দেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ও প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ও ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নূতন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও ভজনাদির পর পল্লী-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভজনাদি হয়। সুরে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। প্রায় নয়শত ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল ও অন্যান্য ভক্তগণের ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিবৃত্তানন্দ এবং বক্তা ছিলেন শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল। সভাপতি মহারাজের ভাষণ সময়োচিত হইয়াছিল। সভান্তে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেদের নাটকাভিনয় দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়

পরলোকে নীহারবালা দেবী

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ (৫ই জুন, ১৯৭০) শুক্রবার রাত্রি ১২ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-শিষ্যা নীহারবালা দেবী সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চির শান্তি লাভ করুক।

ভ্রম সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উদ্বোধনের ২৩৮ পৃষ্ঠায় ১ম কলম ৪র্থ লাইনে '২৪ পরগনার' স্থলে 'হুগলী জেলার' এবং আষাঢ় সংখ্যার ২৯৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলম ১৮শ লাইনে 'দ্বিতীয়' স্থলে 'প্রথম' পড়িবেন।



দিব্য বাণী

মেঘশ্যামং পীতকৌষেয়বাসং শ্রীবৎসাঙ্কং কৌস্তুভোদ্ভাসিতাঙ্গম্।
পুণ্যাত্মানং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিষ্ণুং বন্দে সর্বলোকৈকনাথম্॥ ১
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমচ্যুতং বিভুং প্রভুং কারণং ভূতভাবিনম্।
ত্রৈলোক্যবিস্তারবিভাবভাবিনং হরিং প্রপন্নোঽস্মি গতিং মহাত্মনাম্॥ ৩
নিত্যং শ্রীর্বিজয়ো নিত্যং নিত্যং কল্যাণমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥ ২০

— পাণ্ডব গীতা

মেঘের বরণ শ্যামল মোহন, হরিদ্বসনধারী,
রাজীবলোচন, পুণ্য, পাবন, ভববন্ধনহারী,
শ্রীবৎস আর কৌস্তুভ হার দেহশোভাধার যার,
বন্দনা তার, বিশ্বপিতার উচ্চারি বার বার॥

মনের অতীত, প্রকাশ-অতীত, অচ্যুত, প্রভু, হরি,
সৃষ্টির মূল, রয়েছে আকুল বিপুল ত্রিলোক ভরি
বৈভব যার, সে বিশ্বাধার ধাতার শ্রীপদখানি
মহাজীবনেরো যাহা আশ্রয়, আমারো শরণ মানি॥

নিতি কল্যাণ, নিত্য বিজয়, নিতি শুভ হয় তার
সদা ভগবান মঙ্গলালয় হৃদিমাঝে রয় যার॥

কথাপ্রসঙ্গে

গীতা—জাতীয় আদর্শের আলোকবর্তিকা

আদর্শ ও বাস্তব

আদর্শ কি তাহা বুঝিতে পারা সবসময় কঠিন কাজ নয়, কঠিন হইল জীবনে তাহা রূপায়িত করা। আদর্শ কি তাহা আমরা সকলেই বুঝি। তবে নিজ দুর্বলতার জন্য সবসময় উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারি না। কিন্তু আমরা নিজের সেই অসামর্থ্যকে স্বীকার করিতে বা অপরের নিকট প্রকাশ করিতে চাই না; বরং নিজের সেই দুর্বলতাকেই, আমি যাহা করিতেছি তাহাকেই আদর্শ বলিয়া জাহির করিতে চাই। এইটিই সর্বাধিক মারাত্মক জিনিস জীবনে চলার পথে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, আমরা অধিকাংশই চাই 'to idealise the real'—আমরা যাহা করি সেইটিকেই আদর্শ বলিয়া চালাইতে। যাঁহারা চান আদর্শকে জীবন-রূপায়িত করিতে, 'to realise the ideal', তাঁহারা সংখ্যায় কম। কারণ প্রথমটিতে প্রকৃতির স্রোতে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেই চলে; দ্বিতীয়টিতে কিন্তু প্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া স্রোতের বিপরীত মুখে চলিতে হয়। সমাজসেবায়, রাষ্ট্রসেবায়, পারিবারিক জীবনে 'to idealise the real' করার লোকের সংখ্যা তাই অধিক। জনসেবা পরিচালনার বা নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনের দোহাই দিয়া, সুষ্ঠু-ভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনের দোহাই দিয়া যখনই আমরা "হৃদয়-দৌর্বল্যের" বশবর্তী হইয়া ব্যক্তিগত বাসনা পূরণের পথে পা বাড়াই, তখনই আমরা এরূপ করি। পরিবারের সেবার, সমাজসেবার, দেশসেবার দোহাই দিয়া বস্তুতঃ আমরা তখন নিজেরই সেবা করি।

সাধারণ স্তরের লোকের ক্ষেত্রে সে সেবা হয় স্থূলভাবেই; উচ্চ অধিকারীর ক্ষেত্রেও, যাঁহারা স্থূল ভোগ. বা নামযশাদি ভোগের বাসনার বহু উর্ধ্বে তাঁহাদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো উহা আসিতে পারে অতি সূক্ষ্মাকারে—কঠিনতম কর্তব্যসাধনের সময় হৃদয়ের কোমলতা বা মমতা-উদ্ভূত নিজ অনিচ্ছাকে আঁকড়াইয়া থাকিবার আকারে, সেই মমতা-দুর্বল অনিচ্ছুক 'আমির' সেবার জন্য যুক্তি-প্রদর্শনের আকারে। উহা অতি সূক্ষ্ম স্তরের হইলেও, এবং সাধারণের চোখে, আপাত-দৃষ্টিতে উহা উচ্চভাব বলিয়া প্রতীত হইলেও আসলে উহা 'to idealise the real' ছাড়া আর কিছুই নয়।

আদর্শ নির্বাচনে দ্বন্দ্ব

আদর্শের সেবা বা সমাজসেবা বা রাষ্ট্রসেবা প্রভৃতির নামে বস্তুতঃ নিজেরই সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সকলেরই জীবনে কিন্তু দ্বন্দ্ব আসে না। জীবনের উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন ধারণাই নাই, অথবা সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, ভগবদ্‌বিশ্বাস প্রভৃতির কোন মূল্যই নাই যাঁহাদের কাছে, বাস্তবে ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত জীবনে এগুলির কোন উপযোগিতাই দেখেন না যাঁহারা, অথবা এগুলির বা লোক-কল্যাণেচ্ছার মুখোশ পরিয়া যাঁহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য লোক ঠকাইতে, এমনকি অপরের সর্বনাশসাধন করিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না, তাঁহাদের জীবনে কোনদিনই ইহা লইয়া দ্বন্দ্ব আসিবে না। কেহ ভুল দেখাইয়া দিলেও না। একজন হৃদয়হীন

হত্যাকারীর যেমন আটকায় না নির্বিচারে হত্যা করিতে, একজন উচ্চাদর্শহীন হৃদয়হীন দেশনেতার যেমন আটকায় না ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মতের প্রভাববৃদ্ধির জন্য নির্বিচারে অপর দেশের এমনকি স্বদেশেরও বহুজনের সর্বনাশ সাধন করিতে। কিন্তু যাঁহারা উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত, নিজেদের ভোগের জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য এমনকি সম্মানও চান না, এরূপ ব্যক্তিদের কাছে যখন কেবল আদর্শের বা কর্তব্যপালনের জন্যই এই-জাতীয় কাজ করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে,—যাহা অতি গর্হিত কর্ম বলিয়া প্রতীত তাহাই যখন কর্তব্যরূপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন দ্বন্দ্ব জাগে তাঁহাদেরই চিত্তে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তব্য হইলেও তাঁহাদের মন উহা এড়াইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, কতকগুলি মনগড়া যুক্তির সাহায্যে উহাকে অকর্তব্য বলিয়া দেখাইতে চায়।

এই দ্বন্দ্বই গীতার পটভূমি

এই মানসিক দ্বন্দ্বই, অতি অপ্রিয় কর্তব্য সাধনে অনিচ্ছুক মনের দুর্বলতাকে উচ্চ আদর্শ-রূপে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টাই, 'to idealise the real'-এর প্রচেষ্টাই গীতার পটভূমি। তবে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের একজন পূজারীর নিকটই, একজন অমিতবলশালী, নির্ভীক, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর, ভগবানলাভেচ্ছু অভিজাত রাজকুমারের নিকটই যাহা দুর্বলতা, যাহা আদর্শের দ্বন্দ্ব, তাহাই এখানে নির্বাচন করিয়াছেন মহাভারতকার। যে দুর্বলতাকে সাধারণ মানুষ ভুল করিয়া অহিংসা, ক্ষমা, করুণা বলিয়া ভাবিতে, অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারে, তিনি নির্বাচন করিয়াছেন তাহাই। আর, গীতায় বিশ্লেষণ করিয়া উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, লক্ষ্যের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইবার পথের উপর আলোকপাত সহায়ে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ চিত্তকে "গতসন্দেহ" করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন বীরের মতো এ দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে।

গীতার পটভূমিতে কুরুপাণ্ডব-রণের প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যোদ্ধবেশে সজ্জিত অর্জুন রথের উপর বসিয়া আছেন, যে রথের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। অর্জুন অশ্রুসজলনয়ন, কম্পিতদেহ ; তাঁহার হাত অবশ, হাত হইতে ধনু খসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইতেছেন যে তিনি এ যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। শুধু এটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত নন তিনি, শ্রীকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, তিনি যাহা করিতে চাহিয়াছেন তাহাই আদর্শ, এ যুদ্ধ করাটাই মহা অন্যায় কাজ। অর্জুনের মুখে এসময় একথা শুনিয়া, সারথির আসন হইতে পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ রোষকষায়িত নয়নে অর্জুনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, যেন 'হাতের চাবুক উঁচাইয়া' বলিলেন, "অর্জুন, তুমি যা বললে তা কোন নপুংসকের মুখে শোভা পায়, কোন আর্যসংস্কৃতিহীন লোকের মুখে শোভা পায়—তোমার মতো বীর আর্যের মুখে একথা শোভা পায় না।"

অর্জুনের দোষ কি ? তিনি বলিয়াছিলেন, এ যুদ্ধ তো জ্ঞাতি-ভাইদের সঙ্গে, আচার্যের সঙ্গে, পিতামহের সঙ্গে ; যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ইহাদেরই হত্যা করিতে হইবে! এ কখনো ধর্মসম্মত কাজ হইতে পারে ? এ তো মহা অধর্মের কাজ। ভাগ্য ভাল যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বক্ষণেই ইহা বুঝা গেল,

নতুবা কি মহা পাপেই না লিপ্ত হইতে হইত। বলিলেন, এ যুদ্ধ তিনি করিবেন না, এ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভাইদের, আচার্যের ও পিতামহের রক্তমাখা ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করা অপেক্ষা বনে গিয়া ভিক্ষান্নে উদরপূরণও শ্রেয়ঃ।

শুনিলে মনে হয়, কী উদার, কী মহৎ হৃদয়ের কথা! কী বৈরাগ্যের বাণী! শ্রীকৃষ্ণের তো উচিত ছিল এই মনোভাবের জন্য অর্জুনকে বাহবা দেওয়া। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তো জানিতেন, অর্জুন সেকথা স্মরণ করাইয়াও দিয়াছিলেন যে, অর্জুনের জীবনের উদ্দেশ্য রাজ্য মান-সম্ভ্রম ভোগ নয়, এ রাজ্য তো তুচ্ছ, স্বর্গরাজ্যও চান না তিনি; তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য শ্রেয়োলাভ, ভগবানলাভ। অর্জুনের বর্তমান মনোভাব তো তাহার সহায়কই—ভগবানলাভেচ্ছু ব্রাহ্মণগণ, সন্ন্যাসিগণ তো এই পথেই অবলম্বন করেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত রূঢ়ভাবে বকিলেন কেন?

নেতাকে আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে

ইহার কারণ দুইটি—একটি সমষ্টিগত কল্যাণ- ও অপরটি ব্যক্তিগত কল্যাণমূলক ভারতীয় জীবনাদর্শে দুটিকেই অপূর্ব সামঞ্জস্যে গ্রথিত করা হইয়াছে। প্রথম কারণ হইল অর্জুন যাহা করিতে চাহিতেছেন, সর্বসাধারণের কল্যাণকর আদর্শ তাহাতে স্থাপিত হইবে না। (সর্বজনপ্রসংশিত মহারাজ ধর্মাশোক এই ভুলই করিয়াছিলেন সর্বসাধারণের জন্য অহিংসার আদর্শ প্রচার করিয়া। যাহার ফলে 'দশ-বিশ লক্ষ জানোয়ারের' প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্তু জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল—হাজার বছর ধরিয়া ভারতে যে আসিল, সেই-ই আমাদের পদদলিত করিয়া গেল।) আমি যখন জনগণের দৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন, জনগণের নিকট অজ্ঞাত, তখন আমি ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুযায়ী যাহা খুশি তাহাই করিতে পারি তাহাতে ভাল-মন্দ যাহাই হউক আমার একারই হইবে। কিন্তু যখন আমি জনগণের নেতা, যখন আমার আচরণের প্রতি জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তখন সব কাজই আমাকে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া করিতে হইবে। কারণ আমি যাহা করিব অপরে তাহাই অনুসরণ করিবে, তাহাকেই আদর্শ ভাবিবে—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥" আমার পক্ষে যাহা কল্যাণকর, সর্বসাধারণের পক্ষে তাহাই ক্ষতিকর হইতে পারে। অর্জুন মহাবীর, অর্জুন নির্ভীক, অর্জুন নির্লোভ, হৃদয়বান, আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে অবস্থিত; তিনি ক্ষমার অধিকারী নিশ্চয়ই। কিন্তু এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কয়জনই বা পাওয়া যায়? যাহাদের অর্জুনের মতো যোগ্যতা নাই, তাহারা যদি অর্জুনের অনুকরণে অন্যায়কারীকে ক্ষমা করিতে যায়, তাহা তো ক্ষমা না-ও হইতে পারে; তাহা ক্ষমার, উচ্চাদর্শের মুখোশ-পরা কাপুরুষতা, ভীরুতা, দুর্বলতা হইতে পারে যাহা তাহাদের উন্নত না করিয়া অবনতই করিবে। বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাই হয়। তাছাড়া, অর্জুনের এই মনোভাবকে লোকে ভুলও তো বুঝিতে পারে, ভাবিতে পারে রণক্ষেত্রে আসিয়া দুর্যোধনের সমরায়োজন দেখিয়া অর্জুন ভয় পাইয়াছিলেন তাই যুদ্ধ করেন নাই।

ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য—অধিকারী ভেদে আদর্শ নির্ণয়

দ্বিতীয় কারণটি ব্যক্তিগত, অর্জুনের নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া। অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও কথাগুলি সর্বসাধারণের ধর্মজীবনপথে বিপুল আলোক

বিকীরণকারী। কোন্‌টি আদর্শ, কি কর্তব্য তাহা লইয়া অর্জুনের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত। এ দ্বন্দ্ব যে সদ্য জাগিল তাহাও নয়। পাণ্ডবদের বনবাস হইতে ফিরিবার পর দুর্যোধন পূর্বের কথামতো পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে না চাওয়ায় তাহার এই অন্যায় আচরণের প্রতিকারকল্পে যুদ্ধের কথা যেদিন হইতে উঠিয়াছে, সেদিন হইতেই এক সহদেব ছাড়া আর সব পাণ্ডবদের হৃদয়েই এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে—এ যুদ্ধ করার পক্ষে কারণ ও যুক্তি যত প্রবলই থাকুক, ভাইদের সঙ্গে, পিতামহ আচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা, বিশেষ করিয়া যে-যুদ্ধে কুরুকুল তো বটেই সমগ্র ভারতের রাজা ও বীরগণের এবং অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী সে যুদ্ধ করা উচিত কি না ? যুদ্ধের ভয়াবহ লোকক্ষয়কারী পরিণামকে এড়াইবার জন্য তাঁহারা সকলেই দুর্যোধনের এই অধুনাকৃত অন্যায়কে এবং পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর প্রতি পূর্বকৃত অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার অপমানকেও আজীবন সহ্য করিতে রাজী ছিলেন, তাঁহাদের পক্ষের কয়েকজনের অসম্মতি সত্ত্বেও। (এত অন্যায় করা সত্ত্বেও দুর্যোধনদের কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না,—ইহার প্রতিবাদে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ভারতের দুই মহীয়সী বীর নারী—কুন্তী ও দ্রৌপদী, এবং কনিষ্ঠপাণ্ডব সহদেব ও যদুবীর সাত্যকি। শেষ তিনজন নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যাইবার পূর্বের মন্ত্রণাসভায়; আর কুন্তীদেবী করিয়াছিলেন যখন শ্রীকৃষ্ণ শান্তিস্থাপনের শেষ চেষ্টা করিয়া হস্তিনাপুর হইতে ফিরিবার পূর্বে কুন্তী দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, তখন।) নিজেদের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক এই দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য, এই বিষম সঙ্কটে কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণের জন্য সকলেই অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন—তিনি যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া দিবেন, সকলেই তাহাই মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কথা বলিয়াছেন, ইহার পূর্বে অর্জুনকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আরো দুইবার অন্ততঃ সেই একই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—কর্তব্য হইল যুদ্ধ করা। শ্রীকৃষ্ণের সে কথা মানিয়া লওয়া সত্ত্বেও রণাঙ্গনে আসিয়া চোখের সামনে আত্মীয়দের দেখিয়া অর্জুন মমতাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধান্তকেই যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিতে চাহিতেছেন! ইহা "হৃদয়দৌর্বল্য", অর্জুনের মতো অধিকারীর পক্ষে উচ্চতর জীবনলাভের পথে বাধা; এই মমতারূপ হৃদয়ের দুর্বলতাকে, এই মোহকেও কাটাইয়া আরো ঊর্ধ্বে তাঁহাকে উঠিতে হইবে, যদি তিনি শ্রেয়ঃ চান, জীবনের চরমলক্ষ্যে উন্নীত হইতে চান। যে দুর্বলতা অর্জুনকে যুদ্ধ হইতে বিরত করাইতে চাহিতেছে, তাহাই তখন ক্ষমার, নির্বেদের ছদ্মবেশে তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে। স্বজনের প্রতি এই 'পক্ষি-সুলভ' ভালবাসা, বীর রমণী বিদুলার ভাষায় 'গর্দভীর নিজ সন্তানের প্রতি' ভালবাসা সাধারণের কাছে হৃদয়বত্তার, আদর্শের চাকচিক্যে মণ্ডিত হইয়া উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হইলেও অর্জুনের পক্ষে উহাতে বিভ্রান্ত হওয়া শোভা পায় না—"নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥" সমগ্র গীতায় নানাভাবে ভগবান অর্জুনকে বারংবার চরমসত্যের সম্মুখীন করাইতেছেন, অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চ তত্ত্বগুলি বার বার বলিতেছেন, এবং বলিতেছেন, সেই সত্যলাভকেই জীবনের চরম লক্ষ্য জানিয়া নিজ সংস্কার-উদ্ভূত গুণের, নিজ প্রকৃতির

উপযোগী সত্যদ্রষ্টানির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করাই ভারতীয় জীবনাদর্শ। পূর্ব সংস্কারবশে কর্মাসক্তিহীন নির্বেদবান ভগবানলাভেচ্ছুর পক্ষে যে পথ, তাহার যাহা কর্তব্য, কর্মাসক্তি লইয়া জাত অথচ ভগবানলাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সেই পথই কখনই সর্বাধিক উপযোগী হইতে পারে না; তাহার কর্তব্য ভিন্ন। একজন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের যাহা আদর্শ, তাহা কোন ক্ষত্রিয়ের আদর্শ হইতে পারে না। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—ভগবানলাভ - হইলেও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য পথ ভিন্ন ভিন্ন। শাস্ত্রে তাই কর্তব্যকে 'স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ' ভাগ করা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্ম ও লব্ধ অনুভূতির সমষ্টিই আমাদের বর্তমান 'আমি'; আমি যেরূপ চিন্তা করি, আমার যেমন রুচি,—আমার সংস্কার, প্রকৃতি বা ধাত—তাহা আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমারই পূর্ব পূর্ব জন্মের চিন্তা ও কর্মের সম্মিলিত ফল। আমিই যখন ইহা সৃষ্টি করিয়াছি আমিই তখন ইহা ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িতে পারি। এই গড়ার একমাত্র পথ "অভ্যাস", শুভসংস্কার সৃষ্টির পুনঃ পুনঃ প্রয়াস। আর, ইহা বলা বাহুল্য যে আমার স্বভাবের, আমার মানসিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো পথে যদি সে অভ্যাস করার সুযোগ থাকে, তাহাই আমার পক্ষে সর্বাধিক প্রশস্ত পথ। "স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ" কর্মবিভাগের মূল কথা ইহাই।

ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজ কর্তব্য কর্ম করাই আদর্শ

সবচেয়ে বড় কথা, সবচেয়ে আশ্বাসের কথা গীতায় পাই—আমাদের যাহার যাহা নির্দিষ্ট কর্তব্য, তাহা ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার মাধ্যমেই আমরা ভগবানলাভ করিতে পারিব, যদি চেষ্টা করি, যদি শুভসংস্কারসৃষ্টির জন্য অভ্যাস করি। অভ্যাসটি কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তোমার জন্য নির্দিষ্ট কাজ তো করিতেই হইবে, তবে কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ ভগবচ্চিন্তা থাকে যেন—"মামনুস্মর যুধ্য চ।" বলিতেছেন, ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে, পূজা-জ্ঞানে কাজ করিতে পারিলে, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম" করিতে পারিলে তাহাতে কর্মবন্ধন আসে না; তুমি তাহাই, "তদর্থং কর্ম", ঈশ্বরার্থে কর্ম কর। উহা দ্বারাই ভগবানলাভ হইবে—"স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।" ভগবান লাভ করা মানে তো দেশ অতিক্রম করিয়া মন্দিরতীর্থাদিতে যাইয়া বাহিরে কোথাও তাঁহাকে পাওয়া নয়, আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই ভগবান রহিয়াছেন, আমাদের স্বরূপই তিনি, এই সত্য প্রত্যক্ষ করা; একাগ্রতা ও পবিত্রতা সহায়ে দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক করিতে না পারিলে ইহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। কাজেই যাহা কিছু ইহার সহায়ক, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তাহাই "যজ্ঞ", ভগবানের পূজা। শুধু কর্মযোগীদের ভগবানের প্রীত্যর্থে কাজ করাই নয়, জ্ঞানীরা যে আত্মচিন্তা করেন তাহাও যজ্ঞ, ভগবানের পূজা; যোগীদের মনঃসংযমও তাই, ভক্তদের জপও তাই। আসল কথা হইল এই পূজায়, এই যজ্ঞে মন, বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ, কোন কিছুকেই 'আমার' বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকা চলিবে না, সবই আহুতি দিতে হইবে এই যজ্ঞানলে। নিজ অধিকার অনুসারে কৃত এই যজ্ঞশিখার উজ্জ্বল আলোকই গীতা বর্ষণ করিতেছে আমাদের সর্ববিধ জীবনাদর্শের উপর।

পথ না বিপথ?

দেশে শিক্ষাবিস্তারের, সাহিত্যের সমৃদ্ধির, দেশাত্মবোধের জাগরণ ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য যে সব বরেণ্য ভারতবাসী জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, যাঁহারা শুধু দেশপূজ্যই নন জগৎপূজ্যও, আজ এদেশের একদল যুবক তাঁহাদের চিত্র ও মূর্তি বিকৃত করিয়া প্রগতি-পরায়ণতার আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে। তদুপরি চলিয়াছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর তাণ্ডবলীলা।

তাহাদের উদ্দেশ্য কি জানি না। তাহারা কি এইভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করিয়া সেখানে অন্য কোন সংস্কৃতিকে স্থাপন করিতে চায়? তাহারা কি শিক্ষায়তনগুলিকে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়াই উহার 'পবিত্রতা' রক্ষা করিতে চায়? অথবা দেশে যাহারা পরিবর্তন আনিবে, ভবিষ্যৎ ভারতের পরিচালক হইবে, তাহাদের শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভের কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না?

যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের এপথে চলার ফলে দেশের ইতিহাসের এই অধ্যায়টি আমাদের মুখ চিরকলঙ্কিত রাখিয়াই সমাপ্ত হইবে অন্য দেশে হয়তো এভাবে সাংস্কৃতিক রূপান্তর আনা সম্ভব, কিন্তু ভারতে কখনো তাহা সম্ভব হইবে না। সাময়িক একটা বিপর্যয় আসিতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে কোনদিনই তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি হইতে সরাইয়া অন্য কোন ভিত্তির উপর বসানো সম্ভবই নয়। এত দুঃখ দারিদ্র্য নির্যাতন সত্ত্বেও বিদেশী প্রচারকদের এতদিনের প্রচেষ্টায় কয়জন ভারতবাসীর মন হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইয়াছে? বহু দুর্যোগের ঝড় সহ্য করিয়া যে জাতি হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিজ সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে, এভাবে তাহা মুছিয়া ফেলা কি সম্ভব?

তাছাড়া, ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করিবার অপ-প্রচেষ্টা জগতে তো বহুবারই হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমরা কয়জন মহামানবকে ইতিহাস হইতে, মানুষের মন হইতে মুছিয়া দিতে পারিয়াছি? আর, ইহাও যেন স্মরণ রাখি, আজ আমরা যে মাথা তুলিয়া চলিতে বলিতে শিখিয়াছি, তাহা যাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইতেছে তাঁহাদেরই প্রচেষ্টার ফলে।

ভারত, বিশেষ করিয়া বাংলা আজ বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন। এই সঙ্কট হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইলে সর্বাগ্রে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হইতে হইবে, তাহারই মাধ্যমে যাহা কিছু করার করিতে হইবে; ইহারই ফলে জাতির সমগ্র দেহ জুড়িয়া বিপুল শক্তির উন্মেষ সম্ভব। এই আত্মসচেতনতাই জাতির হাজার বছরের ঘুম ভাঙাইয়াছে; আজ আবার ইহার অভাবই আমাদের বর্তমান সঙ্কটের কারণ। এই আত্মসচেতনতার অর্থ উচ্ছ্বাসবশে সাময়িকভাবে দুচারদিন কিছু করা নয়, নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য অপরের উপর বৃথা দোষারোপ করাও নয়; ইহার অর্থ জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আজীবন উহা আঁকড়াইয়া থাকা, ভাবকে স্থায়িভাবে জীবনে রূপায়িত করা। এরূপ যাঁহারা করিতে পারিয়াছেন,

ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে তাঁহারাই যুগে যুগে সমাজে কল্যাণমূলক বিপুল পরিবর্তন আনিতে পারিয়াছেন। জীবনই এই পরিবর্তন আনে, এবং ভারতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, ভারতে সে পরিবর্তন চিরদিন আনিয়াছে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিভিত্তিক জীবন ; এই কিছুদিন পূর্বের স্বাধীনতা-আন্দোলনও তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ভারতের ভাগ্যবিধাতার, ভারতের 'চির সারথি'র নিকট প্রার্থনা, যুবশক্তির যে বিপুল অংশ দেশের কল্যাণেচ্ছু হইয়াও বিপথ-গামিত্বের জন্য অপচিত হইতেছে, তাহা যেন ঠিক পথে চালিত হইয়া দেশের যথার্থ কল্যাণে ব্যয়িত হয়, যাহার ফলে তাহারা দেশকে সর্ববিধ দুঃখদারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা হইতে মুক্ত করিয়া স্বমহিমামণ্ডিত রাখিয়াই সেখানে ভোগ ও অধিকারসাম্য স্থাপনপূর্বক সমগ্র ভারতকে, জগৎকে পথ দেখাইতে পারে ; যে পথ মানুষের বুদ্ধি, হৃদয় ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষে সমভাবে মণ্ডিত সাম্যস্থাপনের পথ, কেবল মানবিক বুদ্ধিদীপ্ত পিপীলিকা- বা মধুমক্ষিকাসমাজের ন্যায় সমাজ গঠনের পথ নহে।

"এখন বুঝতে পারছো তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায় ? – ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়েও এখনো বেঁচে আছে।…যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে ?… যদি এ দশ-হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলে মরে যাবে বই তো নয়।"

"এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম ; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়তো হবে ; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

রামচরিতে কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

কৃত্তিবাস অরণ্যকাণ্ডে গতানুগতিকভাবেই প্রবেশ করিয়াছেন। মায়ামৃগ ধরিতে রামের গমন; পরে মায়াবী মারীচের ডাকে সীতাকে রাখিয়া রামের সাহায্যে গমনকালে লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডী দিয়া রাখিয়া যান। এ গণ্ডী দেওয়ার ব্যাপার বাল্মীকি বা তুলসীদাসে নাই। তুলসীদাস আবার এখানে অধ্যাত্ম-রামায়ণকে অনুসরণ করিয়াছেন। তুলসীদাস চাহেন না তাঁহার ইষ্টদেবী সীতাকে রাবণ স্পর্শ করুক। তাই লক্ষ্মণের অগোচরে সর্বজ্ঞ ভগবান রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখিলেন এবং পরে ছায়াসীতাকে লক্ষ্মণের হেফাজতে রাখিয়া মায়ামৃগ ধরিতে গেলেন। এখানে তুলসীদাস রামচন্দ্রের মানুষভাব দেখান নাই।

সীতাহরণকালে কৃত্তিবাস আর এক নূতন শক্তিশালী পক্ষীর নাম করিয়াছেন। তাহার নাম সুপার্শ্ব। ইনি সম্পাতির পুত্র এবং জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুত্র। রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুকে বধ করিয়া যখন লঙ্কার দিকে দ্রুত যাইতেছিলেন তখন সুপার্শ্ব তাঁহাকে রথ সমেত গিলিয়া ফেলিবার উপক্রম করে। কিন্তু 'রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী। ভাবে নারীহত্যা করি হব কি নারকী॥' তারপর রাবণ কোন মতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ছাড়া পান। কৃত্তিবাস আর একটি নূতন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন, চক্রবাক ও চক্রবাকীর প্রতি রামের অভিশাপ। রাম যখন 'সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী' হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন চক্রবাক রামচন্দ্রকে ধিক্কার দিয়া বলে, 'এক নারী দুই-জনে রাখিতে না পারে। নারীর উদ্দেশে তাই হৈলা দেশান্তরে॥' রামচন্দ্র ক্রোধে দিলেন দারুণ অভিশাপ। 'স্ত্রীর সঙ্গে বসি মোরে কৈলা উপহাস। স্ত্রীর গর্ব রতি-রস আজি হোক নাশ॥ রজনীতে আহার করিবে দুই-জনে। কেহ কারে না চিনিবে আমার বচনে॥' রামচন্দ্রের নিকট হইতে চরমবিচ্ছেদের অভিশাপ পাইয়া পক্ষী ক্ষমা চাহিল। রাম বলিলেন যে দ্বাপর যুগে তোমার এ অভিশাপ খণ্ডন হইবে।

তুলসীদাসের অরণ্যকাণ্ডে আছে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের উপাখ্যান। মূর্খ জয়ন্ত রামের প্রভাব না জানিয়া কাকের রূপ ধরিয়া সীতার অঙ্গ বিদ্ধ করিল। রক্ত বাহির হইলে রাম জানিতে পারিলেন। তিনি ধনুকে খড়ের বাণ লাগাইয়া জয়ন্তের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মন্ত্রপূত বাণ জয়ন্তের পিছনে ছুটিল। জয়ন্ত প্রাণভয়ে পলাইল। দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। তারপর নারদের পরামর্শে জয়ন্ত রামের শরণ লইল। রাম তাহার একটা চোখ নষ্ট করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কালিদাসের রঘুবংশে ইহার উল্লেখ আছে। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনি কাকের এই দৃষ্টান্ত লইয়া ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ অধ্যায়ে এক অপূর্ব দর্শনের আলোচনা করিয়াছেন: বিবেকীর বুদ্ধি অবিরোধিবিষয়সুখে ও স্বরূপানন্দে কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে গমনাগমন করে। কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক

থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইষীকাস্ত্রঘাতের ফলে দৃষ্টি একটি মাত্র রহিয়া গেল। তাহা ক্রমান্বয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে যাতায়াত করে। দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গদ্বারা ইহা অনুমিত হয়।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পম্পা সরোবরের নৈসর্গিক বর্ণনা তুলনাহীন ভাবে আঁকিয়াছেন আদিকবি বাল্মীকি। মনুষ্যমনের উপর নৈসর্গিক শোভা কী বিরাট প্রভাব বিস্তার করে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় কলিদাসের ঋতুসংহারে। বারো মাসের দুই দুই মাস লইয়া সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক সম্পদে সুসম্পন্ন ছয়টি ঋতুর বিকাশ এই ভারতবর্ষে ছাড়া অন্যত্র তেমনটা নাই। অন্যান্য দেশের গ্রন্থাদিতে ঋতুগুলির নাম ও বর্ণনা আছে, কিন্তু প্রকৃতির স্বকীয় চিত্রপটে উহাদিগকে এমন আক্ষরিকভাবে দেখা যায় না।

পম্পার শোভা রামচন্দ্রের সীতাবিরহের সেই তীব্র জ্বলুনির উপর সাময়িকভাবে একটু প্রলেপ দিয়াছে—ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পম্পার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে রামচন্দ্রের কতকগুলি অবিস্মরণীয় কাহিনী। এগুলি লোকমুখে চলিয়া আসিতেছে। আদিকবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা তুলসীদাস সেগুলি পরিবেশন করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র একদিন সরোবরতীরে তীর পুঁতিয়া রাখিবার কালে একটি ভেক বিদ্ধ হয়। রক্ত দেখিয়া রামচন্দ্র তাহাকে শব্দ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ভেক বলিল: 'রাম, যখন অপরে মারে তখন বলি—"হে রাম, তুমি রক্ষা কর।" এখন স্বয়ং রামই মারিতেছেন —কাহার আর সাহায্য চাহিব?' আর একটি কাহিনী: একটি তৃষ্ণার্ত কাককে জলপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে রাম লক্ষ্মণকে পাঠাইলেন। লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে কাক বলিল: 'আমি অহর্নিশ রামনাম জপ করি। যদি জলপান করিতে যাই, তবে ত ঐ সময়টুকু আমার রামনাম হইবে না।' আর একটি চমকপ্রদ কাহিনী: রামচন্দ্র একদিন পম্পা-তীরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, 'লক্ষ্মণ দেখ, ঐ বকটি কি ধার্মিক! চুপ করে বসে আছে।' রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া একটি ছোট মাছ বলিয়া উঠিল, 'হে রাম, তুমি কাহাকে ধার্মিক বলিতেছ? উঃ! তুমি ত জান না, সে আমার সমস্ত বংশ শেষ করিল।' সহবাসের দ্বারাই সহবাসীর চরিত্র জানা যায় (সহবাসে বিজানীয়াৎ চরিত্রং সহবাসিনাম্)।

রামচন্দ্র পম্পা হইতে গেলেন ঋষ্যমুক পর্বতে। সেখানে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা হইল। তারপর বালীবধ। বালীবধের পর বালীপত্নী তারা স্বামীশোকে মুহ্যমানা হইলেন। শাস্ত্রে অহল্যা, দৌপদী, তারা, কুন্তী ও মন্দোদরী—এই পাঁচজন নারীকে খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। স্বামীবিরহে কাতর তারা রামকে দিলেন দারুণ অভিশাপ: 'আমি যদি সতী হই ভারত-ভিতরে। কান্দিবে সীতার তরে চির-দিন ধরে॥ এই শাপ দিনু আমি, না হবে খণ্ডন। সীতার কারণে রাম, হবে জ্বালাতন॥' কৃত্তিবাস এখানে মৃত্যুপথযাত্রী বালীর মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন। বালী তারাকে অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া বলিতেছেন: 'বিধির নির্বন্ধ ছিল রামের কি দোষ।'

রাম সুগ্রীবকে রাজপদে এবং বালীপুত্র অঙ্গদকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বর্ষা ঋতুতে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নয়, তাই রামচন্দ্র মাল্যবান পর্বতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন শরৎ ঋতুর জন্য। বাল্মীকির বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা খুবই সুন্দর ও কাব্যিক। কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষা ও শরতের সঙ্গে উহার বহু

সৌসাদৃশ্য আছে। তবে পার্থক্যের মধ্যে কালিদাসের বর্ণনা ভাল ভাল ভোগসামগ্রীর ফর্দমালা আর বাল্মীকির বর্ণনা সুন্দর সাবলীল। মনে হয় আদি কবি রামচন্দ্রের বিরহযন্ত্রণাকে উপজীব্য করিয়া প্রকৃতিতেও শোক-চিত্র ফুটাইয়াছেন। শরতের আগমনে সুগ্রীবকে সীতা-উদ্ধারে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া মুহ্যমান রামকে লক্ষ্মণ বলিতেছেন, 'আপনার শোক আপনার সমাধি নষ্ট করিতেছে।' আর সমাধিহীন মানুষ তো বাত্যাবিতাড়িত মেঘের ন্যায়।

ইহার পর লক্ষ্মণের তিরস্কারে সুগ্রীবের চৈতন্য হইল। চতুর্দিকে সীতার অন্বেষণে বানরসৈন্য প্রেরিত হইল। এখানে কৃত্তিবাস তদানীন্তন ভারতের ভৌগোলিক সীমার দিগ্‌-দর্শন করিয়াছেন। সুগ্রীব সীতা-অন্বেষণার্থে পূর্ব দিকের বর্ণনা দিয়াছেন: গঙ্গা, সরযূ, গোমতী, সরস্বতী, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী; মলয়, কোকনদ, পাণ্ডব, মগধ, বঙ্গ, মন্দরপর্বতে অবস্থিত কিরাতদেশ, কর্ণাট, শাকদ্বীপ, ক্ষীরোদ-সাগর, শ্বেতগিরি, কালোদক পর্বত, লোহিত পর্বত, উদয়গিরি প্রভৃতি। পশ্চিম দিকের বর্ণনা: সিন্ধুনদ, মলয়দেশ, কাবেরীর তীর, হিঙ্গুলিয়া গিরি, চন্দ্রবান গিরি, বরাহ পর্বত, সুমেরু পর্বত প্রভৃতি। উত্তর দিকের বর্ণনা: হিমালয় গিরি, কৈলাস পর্বত, অলকাপুরী, বিমলানদী, ত্রিশৃঙ্গ পর্বত, জম্বুদ্বীপ, পর্বত, মন্দর পর্বত, কৌশিকী নদী, দ্রোণগিরি, পুণ্যদা নদী, হেম গিরি প্রভৃতি। দক্ষিণদিকের বর্ণনা: কৃষ্ণা, নর্মদা, গোদাবরী, অশ্বমুখ গিরি, বিন্ধ্যপর্বত, মলয় পর্বত, মহেন্দ্র পর্বত, মৈনাক পর্বত, ঋষভ পর্বত, স্বর্ণলঙ্কাপুরী, যমপুরী প্রভৃতি।

প্রান্ত দিকের বর্ণনা অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন সুগ্রীব। ঐ সব গিরি, উপত্যকা ও নদীর মাহাত্ম্য বলিয়াছেন। কোথায় কি পাওয়া পাওয়া যায়, কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানাইয়াছেন এবং শেষে বলিয়াছেন যে একমাসের মধ্যে সীতার খবর না আনিতে পারিলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। লঙ্কা দক্ষিণ দিকে তাই যোগ্য হনুমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান প্রভৃতি পাঁচজনকে দক্ষিণদিকে পাঠান হইল।

হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন এবং সীতান্বেষণে লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করিয়া যখন অকৃতকার্য হইলেন তখন তিনি বিরাট মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাঁহার মনে হইল প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণবিসর্জন দিব কিংবা সাগরকূলে অনশনে দেহত্যাগ করিব অথবা বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক বনে বনে কাটাইব। চিরকুমার কর্তব্যপরায়ণ, বুদ্ধিমান হনুমান আবার ভাবিলেন যে রাজপুত্রদ্বয় ও বানর-বাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে। রামচন্দ্র বলিয়াছেন: 'যিনি প্রভুকর্তৃক দুষ্কর কার্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সহিত তাহা সম্পূর্ণ করেন, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ।' বহুলোকের শান্তি-সুখ আমার উপর নির্ভর করিতেছে—এই বোধ হনুমানকে নৈরাশ্যের ঝটিকা হইতে মুক্ত করিল। যখন বাহুশক্তি বিফল হয় তখন মানুষ শক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। বাল্মীকি-রামায়ণে হনুমানের এ ভাবটি অনুপম। 'এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্বক সংযতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তারপর রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি এবং নিজ প্রভু সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। তাপসবৃত্তি ও আত্মশক্তির বিকাশের ফলে তিনি অশোকবনে সীতাকে দেখিতে পাইলেন। কৃত্তিবাস হনুমানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: 'যদি সিদ্ধ নাহি কর তুমি সেই

কামে। দোষ হবে প্রভু তব কল্পতরু নামে॥' হনুমান যখন লঙ্কা দগ্ধ করেন তখন তাঁহার লাঙ্গুলের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য সাগরের জলে গিয়া পড়িলেন। কিন্তু উহাতে জ্বালা না কমায়— 'সীতা বলে, মুখামৃত দেহ হনুমান। এখনি অগ্নির জ্বালা হইবে নির্বাণ॥ নির্বাণ হইল জ্বালা, পুড়ে গেল মুখ। জ্ঞাতিবর্গ হাসিবেক, সে যে বড় দুখ। সীতা বলে জ্ঞাতি-বর্গ কেহ নহে ছাড়া। মম বাক্যে সকলেই হবে মুখপোড়া॥' বানরজাতির মুখপোড়ার ইতিকথা বিবৃত করিলেন কৃত্তিবাস।

রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনকালে কৃত্তিবাস এক স্বতন্ত্র পথে গিয়াছেন, কারণ বাল্মীকি-মতে সাগর বলিয়াছেন, 'বিশ্বকর্মাপুত্র নল পিতৃবরে সর্ববস্তু নির্মাণের সামর্থ্য পাইয়াছে। পিতার ন্যায় শক্তিশালী এই মহোৎসাহী বানর আমার উপর সেতু নির্মাণ করুক—আমি তাহা ধারণ করিব।' সাগরের পরামর্শে রাম নলকে সাগর-বন্ধনের ভার দিলেন, কারণ তাহার উপর ব্রহ্মার আশীর্বাদ ছিল: 'আমি বর দেব তোরে শোন রে বানর। তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর॥' নল রামকে বলিল: 'এক মাসে বাঁন্ধি দিব শতেক যোজন। গাছ-পাথর আনি দিক যত কপিগণ॥' কাজ করিতে গেলে উৎকৃষ্ট কর্মীর মনেও অজ্ঞাতে একটু অভিমান আসিয়া থাকে। কৃত্তিবাস মানুষের এই মনো-বৃত্তির এক অপূর্ব চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হনুমান বিরাট বিরাট পাথর মাথায় বহন করিয়া নলকে দিতেছিলেন, আর সে বাম হস্তে লইয়া সেতু বাঁধিতেছিল। হনুমানের মনে অভিমান হইল। কী আমাকে তাচ্ছিল্য! সে নলের শক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য গন্ধ-মাদন ভাঙ্গিয়া লোমে লোমে পাথর বাঁধিয়া হুংকার দিয়া দিঙ্‌মণ্ডল অন্ধকার করিয়া নলের উপর পড়িতে উদ্যত হইল। নল রামের শরণ লইল। রাম তখন পথ আটকাইলেন এবং হনুমানের অভিমানকে শান্ত করিয়া দিলেন।

কৃত্তিবাস সেই বিখ্যাত কাঠবিড়ালীর উপাখ্যানটি বাদ দেন নাই। কাঠবিড়ালীর দল আসিল রামকার্য করিবার জন্য। 'লাফ দিয়া পড়ে গিয়া সাগরের নীরে। অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে॥ ফাঁক যত ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে।' বীর হনুমান যাতায়াতের বিঘ্ন দেখিয়া ঐ কাঠবিড়ালগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিলেন। তাহারা গিয়া রামের কাছে নালিশ করিল। 'হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম। কাষ্ঠ-বিড়ালের কেন কর অপমান॥ যেমন সামর্থ্য যার বান্ধুক সাগর। শুনিয়া লজ্জিত হৈল পবন-কোঙর॥' তারপর সহৃদয় রঘুনাথ কাঠবিড়ালের পিঠে হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তাহারা রাম-কর-কমলাঙ্কিত প্রীতির পরশ-রেখা স্মৃতিস্বরূপ বংশানুক্রমে বহন করিয়া চলিল।

কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ডে তুলসীদাস খুবই সংক্ষিপ্তভাবে রামগাথা সারিয়াছেন। কৃত্তিবাস উপাখ্যানের পর উপাখ্যান বলিয়া চলিয়াছেন, আর তুলসীদাস সেখানে বাল্মীকির রামচরিতের উপর দিয়া দাগা বুলাইয়া চলিয়াছেন। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবে নিজের রচনাশৈলীও দেখাইয়া-ছেন। তুলসীদাসের রামায়ণ তো কেবল রাম-রাবণের গল্প নয়, ভক্তের উদ্ধার পাইবার সোপান।

পম্পার তীরে ছোট ভাই লক্ষ্মণকে রঘুনাথ ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিলেন। তুলসীদাসের উপমার শ্রেষ্ঠতা আমরা পূর্বে অনেক বলিয়াছি। পম্পার প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে মানুষের জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন তুলসীদাস। বালীবধের পর রাম শরৎ ঋতুর জন্য পর্বতে অপেক্ষা করিতে-

ছিলেন। বাল্মীকি ও কালিদাসের ঋতুবর্ণনার কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্বেই দিয়া আসিয়াছি। এখন ঋতুবর্ণনায় তুলসীদাসের রচনার একটু উল্লেখ করিতেছি। বর্ষা সম্বন্ধে –'রাম বলিলেন, হে লক্ষ্মণ দেখ, বৈরাগ্যব্রতপালনকারী গৃহীর বিষ্ণুভক্তকে দেখিয়া যেমন অবস্থা হয় ময়ূরগুলিরও মেঘকে দেখিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যা পাইলে যেমন অবনত হয়, মেঘ তেমন মাটিতে নামিয়া আসিতেছে। সাধু যেমন খলের কথা সহ্য করে, পর্বত তেমন বৃষ্টির আঘাত সহ্য করিতেছে। ক্ষুদ্র নদী উপছাইয়া চলিয়াছে, যেমন অল্প ধন হইলে খল উন্মত্ত হইয়া যায়। জীব যেমন মায়ায় জড়াইয়া মলিন হয়, তেমনি জল মাটিতে পড়িয়া ঘোলা হইতেছে। হরিকে পাইলে ভক্ত যেমন নিশ্চল হয়, নদী সমুদ্রে পড়িয়া তেমনি নিশ্চল হইতেছে।' শরৎ সম্বন্ধে –'শরৎকালে রাত্রে চাঁদ রৌদ্রের তাপ দূর করিয়া দেয়, যেমন সাধুদর্শন পাপ দূর করে। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হইলে যেমন হয়, পদ্ম ফোটায় সরোবরের শোভা তেমনি হইয়াছে। জ্ঞানী যেমন ধীরে ধীরে মমতা ত্যাগ করে, নদী, সরোবর তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে শুকাইতেছে।' ঋতুবর্ণনায় তুলসীদাসের এরূপ প্রচুর উপমা রহিয়াছে। লোভে পড়িয়া অনেকগুলি উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকের বিরক্তি ভয়ে সব দিতে পারিলাম না বলিয়া আফসোস রহিয়া গেল। এ তুলনারাশি তুলসীর নিজস্ব।

সুগ্রীব তাঁহার সীতান্বেষণকারী বানরসেনাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন: 'মন, বাক্য ও কর্মদ্বারা যত্ন করিয়া সেই বিচারই করিবে যাহাতে রামচন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়। রোদ পোহাইতে হয় পিঠ দিয়া, এবং আগুন সম্মুখে রাখিয়া পোহাইতে হয়। আর প্রভুর ভজনা করিতে হয় সকল ছল ত্যাগ করিয়া।' সমুদ্রলঙ্ঘনকালে জাম্বুবান হনুমানকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হে প্রিয়, জগতে এমন কি কঠিন কাজ আছে যাহা তোমার দ্বারা হয় না। "রাম কাজ লগি তব অবতারা" অর্থাৎ তোমার জন্ম রামের কাজের জন্যই।' ভগবৎকৃপায় হনুমানের আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি পর্বতপ্রমাণ হইয়া হুংকার দিয়া হেলায় সাগর লঙ্ঘন করিলেন। পথিমধ্যে সাগরোত্থিত মৈনাক পর্বত ক্ষণেকের জন্য সেখানে বিশ্রাম নিতে বলিলে আদর্শ কর্মবীর হনুমান উত্তর দিলেন, 'রামকাজু কীন্‌হে বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম' অর্থাৎ রামের কাজ শেষ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম কোথায়? কী সুন্দর উত্তর! বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, 'প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা ন স্থাতব্যমিহান্তরা।' কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষার জন্য এবং মানীকে মান দিবার জন্য হনুমান মৈনাককে একটু স্পর্শ করিয়া রামকার্য সিদ্ধ করিতে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন।

তুলসীদাস অনেক সময় নিজেকে আড়ালে রাখিতে ব্যস্ত। হনুমানের লঙ্কাদাহ এবং পরে মেঘনাদ কর্তৃক বন্ধন সম্বন্ধে শিব-পার্বতীর কথোপকথন উত্থাপন করিয়াছেন। শিবের উক্তি: 'যাঁহার নাম জপ করিয়া জ্ঞানী মানুষেরা ভববন্ধন কাটে, তাঁহার দূত বাঁধা পড়িল। ইহার মানে, প্রভু নিজের কার্যের জন্য তাহাকে বাঁধাইলেন। আগুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, হনুমান তাঁহারই ভক্ত, সেজন্যই হনুমান পোড়ে নাই।' হনুমান রামের অভিজ্ঞান অঙ্গুরী সীতাকে এবং সীতার অভিজ্ঞান চূড়ামণি রামকে দিলেন। দূত হনুমান বন্দীদশাপ্রাপ্ত সীতার কাহিনী, নানা জ্বালা-যন্ত্রণার কথা রামকে বলিলেন আর নিবেদন করিলেন সীতার আত্মকথা: 'হে নাথ, তোমাকে ছাড়িয়াও যে আমার প্রাণ যাইতেছে না, তাহা আমার চোখ দুইটির দোষ।

তোমার বিরহ হইতেছে আগুন, আমার শরীর হইতেছে তুলা, আর শ্বাস হইতেছে বাতাস। মুহূর্তেই শরীর জ্বলিতে পারে। চোখ তাহার নিজের হিতের (তোমাকে দেখিবার) আশায় জল ঢালিতে থাকে। সেইজন্য বিরহ-আগুনে দেহ জ্বলিতেছে না।' হনুমান যে সীতার বার্তা যথাযথভাবে রামকে নিবেদন করিতে পারিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে তুলসীর কাব্যিক প্রতিভা।

এ পৃথিবীতে অহংশূন্য মানুষেরাই প্রকৃত কর্মযোগী। রামচন্দ্রের প্রশংসার উত্তরে হনুমান বলিলেন : 'প্রভু, বানরের বড় বাহাদুরী এই পর্যন্ত যে, সে ডাল হইতে ডালে যাইতে পারে আমি লাফাইয়া সমুদ্র পার হইয়া স্বর্ণপুরী জ্বালাইয়াছি, রাক্ষস মারিয়া বন উজাড় করিয়া দিয়াছি—এ সব তোমার শক্তিতে। আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। সৎসঙ্গ বর্ণনার ব্যাপারে তুলসীদাস উদার, অকৃপণ। বিভীষণ যখন রাবণের পদাঘাত খাইয়া রামের দলে চলিয়া আসিলেন, তখন শঙ্কর বলিলেন : সাধু অবজ্ঞা তুরত ভবানী। কর কল্যাণ অখিল কৈ জানী॥ অর্থাৎ পার্বতী, সাধুর অবজ্ঞা তাড়াতাড়ি বিশ্বের কল্যাণের হানি করে। ফুলের মালা গাঁথিবার কালে মাঝে মাঝে জরি বা মণি বসাইলে উহা যেমন চিকচিক করিয়া শোভা বর্ধন করে তেমনি তুলসীদাস রাম-সীতার কথা গাঁথিতে গাঁথিতে কখনও হর-পার্বতী, কখনও ভুষণ্ডী (কাক) ও গরুড়ের কথোপকথন তুলিয়া ধরিয়া উহা সুন্দর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

লঙ্কাকাণ্ড সুবিশাল। 'রামবারণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব' অর্থাৎ রাম-রাবণের যুদ্ধ রাম-রাবণের যুদ্ধেরই মত। তাহার অন্য উপমা হইতে পারে না! কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস উভয়েই যুদ্ধবর্ণনা দিতে কোথাও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহাদের অতি উদার ভাবের ফলে কল্পনা লাগাম ছিঁড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বলেন্দ্রঠাকুর মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন : সে কালে জমকালো অসম্ভব বর্ণনা ফ্যাশান ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব-অসম্ভবের প্রতি এখানকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেতাবেরই যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটকবদন, লম্বোদরবর্গের সেকালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিনকাল গিয়াছে

সেতুবন্ধের পরে রামচন্দ্র শিবপূজা করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকে ভালুক ও বানরসৈন্যের সমাবেশ হইল। অঙ্গদ দূতরূপে রাবণসভায় প্রেরিত হইলেন। ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। শুরু হইল যুদ্ধ। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ বন্দী হইলেন। তারপর বিনতানন্দন গরুড় আসিয়া তাঁহাদের মুক্ত করেন। রাম বর দিতে চাহিলে—'গরুড় বলেন বাঞ্ছা আছে এই মনে। দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে॥ শ্রীরাম বলেন হব সেরূপ কেমনে। ধনুর্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে॥' রামের আপত্তি ছিল যে ঐরূপ ধরিলে কপিগণ, বিশেষতঃ ভক্ত হনুমান মনে কষ্ট পাইবে। কারণ যাহাদের ইষ্টনিষ্ঠা থাকে, তাহারা নিজের ইষ্টকে কখনও অন্যরূপে দেখিতে চায় না। তাই বিনতানন্দন পক্ষ বিস্তার করিলে—'ভকত-বৎসল রাম তাহার ভিতরে। দাণ্ডাইলা ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ ধরে॥ ধনুক ত্যজিয়া বাঁশী ধরিলেন করে।' ভক্তের

চোখ এড়ানো অত সহজ নয়। হনুমান সব দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল এই বিখ্যাত শ্লোক: 'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥' অর্থাৎ শ্রীনাথ বা বিষ্ণু ও জানকীনাথ উভয়েই এক, পরমাত্মা। তবুও আমার যথাসর্বস্ব সেই কমললোচন রামচন্দ্র। বাল্মীকি-রামায়ণে গরুড়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই দর্শনের উল্লেখ নাই। ইহা কৃত্তিবাসের নিজস্ব।

প্রথম যুদ্ধের দিন রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিলেন না, কারণ তাহাতে যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। 'আজি তোরে মারিলে বিপদ ঘুচে যাবে। জ্ঞাতি-বন্ধু-আদি তোর অনেক বাঁচিবে॥ একলক্ষ পুত্র তোর সওয়া লক্ষ নাতি। একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি॥' কী বিরাট গোষ্ঠীর বর্ণনা দিলেন কৃত্তিবাস। রাবণ একবার শিবের দ্বারী বানরমুখো নন্দীকে টিটকারি করায়—'নন্দী কহিলেক আমি শিবের কিঙ্কর। মোরে উপহাস কর দুষ্ট নিশাচর॥ কপিমুখ দেখি তুই কৈলি উপহাস। এই মুখে হবে তোর সবংশে বিনাশ॥' সেই অভিশাপ কার্যে ফলিতে চলিল।

রাবণবধের পূর্বে কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ বধ হইল। বিভীষণের পুত্র তরণীসেনের কাহিনী কৃত্তিবাসের নিজস্ব ধার্মিকপুত্র তরণীসেন আসিল যুদ্ধক্ষেত্রে। 'অঙ্গে লেখা রাম নাম রথ চারিপাশে। তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে॥ দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়া জানে। হইয়া ধার্মিক বক আসিয়াছে রণে॥' যুদ্ধক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রতি তরণীর স্তব এবং কোমলহৃদয় রঘুনাথের অশ্রুসিক্ত ছবিখানি অপূর্ব। তরণীর বাসনা ছিল রামচন্দ্রের হাতে মরণ। তাই আবার নিজ মূর্তি ধরিয়া শুরু করিল যুদ্ধ। দুর্ধর্ষ বীর তরণীসেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে শিখাইয়া দিলেন, একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়া উহার মরণ হইবে না। রাম সঙ্গে সঙ্গে সেই বাণ ধনুতে জুড়িয়া তাহাকে বধ করিলেন। 'দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে। তরণীর কাটামুণ্ড রাম রাম বলে॥' পিতা হইয়া ধর্মের জন্য পুত্রকে বধের তৎপরতা – কৃত্তিবাসের এ কাহিনী ধর্মের আদর্শকে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। যেমন করিয়াছিল মহাভারতে গান্ধারীর 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' বাণী।

কৃত্তিবাসের কল্পনার বাহাদুরী আছে। রাবণের শক্তিশেলে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে বাঁচাইতে হনুমান ঔষধ আনিতে গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন। আবার এদিকে দুপুররাত্রে রাবণ সূর্যকে উদয় হইতে আদেশ দিলেন। ঐ শক্তিশেলে এমন নিয়ম ছিল যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের প্রাণ শেষ হইবে। সেই উদয়গামী সূর্যের প্রতি হনুমান ধাওয়া করিয়া তাঁহার রথের ঘোড়া প্রভৃতি নষ্ট করিয়া মিতালি করিলেন। ভানু-হনুর মিতালি ও কোলাকুলি এবং পরে হনুর বগলের নীচে ভানুর অবস্থান —সেই চরম দুর্যোগের মুহূর্তে হাস্যরসের হিল্লোল তুলিয়াছে।

আর একটি ঘটনা মহীরাবণ কর্তৃক মায়াবলে রামলক্ষ্মণহরণ। হনুমান শতযোজন লেজ দিয়া দুর্গ তৈরী করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে রাখিলেন। বিভীষণ রহিলেন ঐ গড়ের প্রহরী। মহীরাবণ মায়াবলে বিভীষণের রূপ ধরিয়া রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া যান। অবশেষে হনুমান সেখানে গিয়া মহীরাবণ এবং

তাহার সদ্যোজাত সন্তান অহিরাবণকে বধ করিয়া রামলক্ষ্মণকে বাঁচাইয়া লইয়া আসেন। তারপর শুরু হইল রাবণবধের পরিকল্পনা। রাবণবধের জন্য দেবীর অকাল-বোধন, ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও পূজা শুরু হইল। একশত আট পদ্ম আনিলেন হনুমান। পুষ্পাঞ্জলি দিবার কালে একটি কম পড়িল। 'নীল কমলাক্ষ মোরে বলে সর্বজনে। এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে॥' ইহার আর প্রয়োজন হইল না। দেবী স্বয়ং দর্শন দিয়া অভীপ্সিত বর দান করিলেন

লঙ্কাকাণ্ডে কৃত্তিবাসের নূতন নূতন উপাখ্যানের শেষ নাই। হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ অন্য কোন রামায়ণে দেখা যায় না। কথিত আছে রাবণের প্রতি শিবের বর ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে—'হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে। শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গে জোড়া দিবে॥' ঘরসন্ধানী বিভীষণ বলিলেন, রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে। একমাত্র মন্দোদরী জানে উহা কোথায়। হনুমান ব্রাহ্মণের বেশে চলিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার ছলনা করিয়া স্ফটিকের স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া সেই মৃত্যুবাণ আনিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণবধ করিয়া ভূভার হরণ করিলেন স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। মন্দোদরীর বিলাপে ব্যথিত রামচন্দ্র তাহাকে 'জন্মায়তী' বর দিয়া ফেলিলেন। স্বামীহীনা নারী কি করিয়া ঐ বর পাইবে? তাই রামচন্দ্র আশীর্বাদ করিলেন, 'শুন মোর বাণী—গৃহে যাও রাণি—দুঃখ না ভাবিও চিতে। রাবণের চিতা—রহিবে সর্বথা—চিরকাল থাক আয়তে।' তাই প্রবাদ আছে যে রাবণের চিতা এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। চিতা নিভিলে তবে ত বৈধব্যের প্রশ্ন। 'নারীরাই অধিক নারীবিদ্বেষী'—এ প্রবাদ রামায়ণেও দেখা যায়। মন্দোদরী আদর্শ সতী নারী হইয়াও শাপ দিয়াছেন সীতাকে: 'তোমা লাগি হইলাম আমি অনাথিনী। পুরী-সহ রাবণে নাশিয়া কোপাগুনে। আনন্দে চলেছ তুমি রাম-সম্ভাষণে॥ এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ। বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥'

সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র চলিলেন অযোধ্যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে অভিশাপোক্তির ছড়াছড়ি। পদ্মানদীর প্রতি গঙ্গার অভিশাপ, দশরথের প্রতি অন্ধকমুনির, বামদেবের প্রতি বশিষ্ঠের, ব্রাহ্মণ, তুলসী ও ফল্গুর প্রতি সীতার, রামের প্রতি তারার, চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রতি রামের, সীতার প্রতি মন্দোদরীর, রাবণের প্রতি নলকুবেরের ও নন্দীর অভিশাপ। তখনকার যুগে মনে হয় ভুল করিলে আর মার্জনা ছিল না। মানুষ ছিল বাক্‌সিদ্ধ। আর অভিশাপই ছিল ভুলের দণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাস কৃত্তিবাসের মত উপাখ্যান বা বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার রামচরিতের উদ্দেশ্য ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তিবারি সিঞ্চন! তাই প্রতি কাণ্ডের পরিসমাপ্তিতে তুলসীদাস লিখিয়াছেন, 'ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকলকলিকলুষ-বিধ্বংসনে বিমলবিজ্ঞানবৈরাগ্যসন্তোষসম্পাদনো নাম তুলসীকৃত' ইত্যাদি।

লঙ্কাকাণ্ডে তুলসীদাসের আরম্ভটা অনেকটা ম্যাজিকের মত। রামচন্দ্র দক্ষিণদিকে মেঘ ও বিদ্যুৎ দেখিলেন এবং মৃদু-মধুর মেঘধ্বনি শুনিলেন। বিভীষণ বলিলেন: প্রভু, মেঘ ও বিদ্যুৎ নয়। লঙ্কার হর্ম্যশীর্ষে মেঘরঙের ছাতার নীচে রাবণের নৃত্যগীতের ঘটা

চলিতেছে। মন্দোদরীর কানের দুল হইতে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইতেছে। দর্পহারী রামের বাণ রাবণের মাথার মুকুট ও মন্দোদরীর কানের দুল কাটিয়া আবার তূণে ফিরিয়া আসিল।

অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের সভায় পাঠান হইল। বহু বাদানুবাদের পরে ত্রিভুবনজয়ী রাবণ সাধারণ মানুষ রামের ভয়ে ভীত নয় বলায় অঙ্গদ বলিল: ওরে চরিত্রহীন মূর্খ, রাম মানুষ কেমন করিয়া হইল? কামদেব কি সাধারণ ধনুকধারী? গঙ্গা কি সাধারণ নদী? কামধেনু কি সাধারণ পশু? কল্পতরু কি সাধারণ গাছ? অন্নদান কি সাধারণ দান? অমৃত কি সাধারণ রস? গরুড় কি সাধারণ পক্ষী? চিন্তামণি কি সাধারণ পাথর? বৈকুণ্ঠ কি সাধারণ লোক? রামভক্তি লাভ কি সাধারণ লাভ? রামচন্দ্র মানুষ নন—একথা বুঝাইতে যত উপমার দরকার তুলসী সব যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। যে হরি ও হরের নিন্দা শোনে, তাহার গোবধের পাপ হয়। রামনিন্দা শুনিতে না পরিয়া দূত অঙ্গদ ক্রোধে রাবণের চারিখানি মুকুট কাড়িয়া লইয়া রামচন্দ্রের নিকট ছুঁড়িয়া মারিল। পরে রাম উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অঙ্গদ বলিল: 'প্রভু, উহা মুকুট নয়, রাজার চারিটি গুণ। বেদে বলে—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারিগুণ রাজার হৃদয়ে থাকে। এই চারিটি হইতেছে নীতিধর্মের পা। মনে মনে ইহাই জানিয়া গুণগুলি ধর্মভ্রষ্ট রাবণকে ত্যাগ করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছে। তুলসীদাসের ব্যাখ্যাগুলির বেশ একটা মৌলিকতা আছে।

শক্তিশেলে মূর্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণের জন্য রামের হাহুতাশ খুবই মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলসী ব্যক্ত করিয়াছেন। রামের উক্তি: 'ভাই, পাখাহীন পাখী, মণিহীন সাপ ও শুঁড়হীন হাতীর যে অবস্থা হয়, মূর্খ বিধাতা যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখে তবে তোমা বিনা আমার অবস্থাও তেমনি হইবে। স্ত্রীর জন্য ভাই হারাইয়া অযোধ্যায় কোন মুখে যাইব?' তুলসীদাস তাঁহার প্রভুকে সাধারণ মানুষের মত দুর্বলভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন না। তাই শিবের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন: 'উমা, রঘুরাজ এক ও অখণ্ড, তবুও ভক্তবৎসল রাম মানুষের অবস্থা দেখাইতেছিলেন।'

নরম থাকের মানুষ তুলসীদাসের যুদ্ধ বর্ণনা খুব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে কৃত্তিবাস তুলসীদাসকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রাবণ যখন রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন তখন বিভীষণ রথহীন রামচন্দ্রকে বলিলেন, 'বিনা রথে তুমি বীর রাবণকে কেমন করিয়া জিতিবে?' প্রত্যুত্তরে রাম বলিলেন; 'সখা শোন, যাহাতে জয় হয় সেই রথ আমি আনিয়াছি। সে রথের চাকা হইতেছে শৌর্য; উহার ধ্বজা ও পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান বিচারশক্তি; ইন্দ্রিয়সংযম ও পরহিত উহার ঘোড়া; ক্ষমা ও কৃপা হইতেছে লাগাম; ঈশ্বর-ভজন চতুর সারথি; বৈরাগ্য ঢাল; সন্তোষ তলোয়ার; দান কুঠার; বুদ্ধি প্রচণ্ড শক্তি বা শেল; শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক; পবিত্র স্থির মন তূণীর; শান্তি, অন্তরিন্দ্রিয়-সংযম ও বহিরিন্দ্রিয়-সংযম নানা বাণ; ব্রাহ্মণ ও গুরুর পূজা অভেদ্য বর্ম। ইহাদের মত জয়ের উপায় আর দ্বিতীয় নাই। সখা, যাহার এইপ্রকার ধর্মময় রথ, তাহাকে জয় করিতে পারে এমন শত্রু কোথাও নেই।' তুলসীদাস এক অপূর্ব রথরূপক উপস্থিত করিলেন। এই-রূপ দৃঢ়রথে আরূঢ় ব্যক্তিই একমাত্র অজেয় সংসাররূপ শত্রুকে জয় করিতে পারে। এ

ধরণের রথ-কল্পনা কঠোপনিষদেও আছে।

যাহা হউক, রামচন্দ্রকে পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সারথি মাতলি সহ নিজের রথ পাঠাইয়া দিলেন। শুরু হইল তুমুল রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের বৃথা আস্ফালন ও দুর্বাক্যের উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন 'বড়াই করিয়া যশ নাশ করিও না। সংসারে তিন রকম লোক আছে—গোলাপ, আম ও কাঁঠালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল দুইই দেয়, আর এক কেবলই ফল দেয়। একজন বলে, একজন বলে ও করে, আর একজন কেবলই করে, বলে না।' যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরণের নীতি-উপদেশ শুনিয়া রাবণ প্রথমে হাসিয়া আবার পরক্ষণেই ভীষণ গর্জন করিয়া বজ্রের মত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। যুদ্ধে মায়াবী রাবণের মায়াজাল মায়ধীশ রামচন্দ্র ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। 'রঘুপতি সর সির কটেহু ন মরঈ' অর্থাৎ রঘুপতির শরে রাবণের মাথা কাটে, কিন্তু রাবণ মরে না। এ কাহিনী শুনিয়া সীতা ত্রিজটাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল: 'রাবণের বুকে বাণ লাগিলে সে মরিত। তাহার হৃদয়ে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া প্রভু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না। আর সীতার হৃদয়ে রামের বাস এবং রামের ভিতরে রহিয়াছে গোটা বিশ্বভুবন। যদি সেখানে বাণ লাগে তবে সকলের নাশ হইবে। তবে মাথা কাটায় রাবণের যখন ধ্যান ভঙ্গ হইবে তখনই বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকে বাণ মারিবেন।' অদ্ভুত কল্পনা তুলসীদাসের। তিনি নিজে আর যুদ্ধ বর্ণনা না দিয়া শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও কবিদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

রাবণের নাভিতে ছিল অমৃতকুম্ভ। বিভীষণ রামকে বাণদ্বারা ঐ অমৃত শুকাইয়া ফেলিতে বলিলেন। ফলে বধ হইল দশগ্রীব রাবণ। অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্র প্রকৃত সীতাকে অগ্নির কাছে গচ্ছিত রাখিয়া মায়ামৃগ ধরিতে যান—ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সীতাকে এখন কলঙ্ক অপনোদনের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে রাম আদেশ করিলেন। পবিত্রতার আগুনে সদাবেষ্টিত সীতাকে প্রভু রামচন্দ্র ভৌতিক আগুনের মধ্য হইতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। লেলিহান অগ্নি অকলঙ্কিনী সীতার সতীত্বকে আরও উজ্জ্বল করিয়া বিদায় লইলেন। তারপর শুরু হইল অযোধ্যায় ফিরিবার পালা।

উত্তরকাণ্ডে কৃত্তিবাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করিলেও কোথাও কোথাও 'জৈমিনি ভারত' হইতেও গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাণ্ডে অগস্ত্য ঋষি পুরাণকথা বলিয়াছেন। অতি সুন্দর সে-সব কথা। কৃত্তিবাসের রামায়ণে নানা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছে; তবুও উহার মূল ভাবটি কোমলতা, মৃদুতা ও মধুরতার দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভারতের মাটি বড়ই নরম ও স্নিগ্ধ। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—এঁদের কথাই তো ভারত-কথা; এঁদের চিত্রই তো ভারত-চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, হৃদয়ে করুণা, সহানুভূতি ও নয়নে ভক্তির অশ্রু—ভারতবাসী তাহাকেই হৃদয়ে বরণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস ভারতের এই মর্মকথা জানিতেন বলিয়া তাঁহার কথা মর্মে প্রবেশ না করিয়া যায় না।

উত্তরকাণ্ডের প্রারম্ভে কৃত্তিবাস অগস্ত্য ঋষির দ্বারা এক অপূর্ব কথা শোনাইলেন। 'চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি যায় যেই জন। চৌদ্দবর্ষ স্ত্রীর মুখ না করে দর্শন॥ চৌদ্দবর্ষ যেই বীর থাকে অনাহারে। ইন্দ্রজিতে বধিবারে সেই

জন পারে॥' অযোধ্যার রাজসভায় সকলে হতবাক্‌ হইয়া গেল। রামচন্দ্র বলিলেন, 'আমি ত লক্ষ্মণকে নিজ হাতে ফল দিয়াছি, সঙ্গে সীতা ছিল; সুতরাং ইহা কি করিয়া সম্ভব?' লক্ষ্মণকে সভায় ডাকা হইল। তিনি রামচন্দ্রকে কহিলেন, 'আপনি "ধর" বলিয়া ফল দিতেন, খাইতে ত বলেন নাই। সীতা-হরণ কালে আপনার হয়ত মনে আছে আমি সীতার পরিত্যক্ত হার চিনিতে পারি নাই, কিন্তু নূপুর চিনিতে পারিয়াছিলাম। আপনি ও সীতা যখন কুটিরে নিদ্রিত থাকিতেন, তখন ধনুর্বাণ হাতে প্রহরীরূপে থাকিতাম। নিদ্রা-দেবী আমার কাছে আসিলে আমি তীর দিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বলিলাম চৌদ্দ বৎসর পরে আসিতে।' এ পৃথিবীতে কোন বিরাট কর্ম করিতে গেলে কী বিরাট আত্মত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন—তাহাই দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। উপবাস বা ব্রত, ব্রহ্মচর্য বা সংযম, নিদ্রাজয় বা তামসপ্রবৃত্তির উচ্ছেদের মধ্যেই রহিয়াছে বিজয়ের সম্ভাবনা।

লক্ষ্মণের ত্যাগের প্রসঙ্গে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ আর একখানি ছবি তুলিয়া ধরিয়াছেন তাঁহার 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে: 'লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে! কিন্তু সীতার জন্য ঊর্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।...পাছে সীতার সহিত ঊর্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বল মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠ-পার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই?'

সীতার বনবাস-বৃত্তান্ত কৃত্তিবাস বেশী করিয়া গাহিয়াছেন। বিচ্ছেদ-বেদনা মানব-মনকে সহজেই অভিভূত করিয়া ফেলে। নির্বাসিতা সীতার হাহুতাশ অত্যন্ত কঠিন হৃদয়েও দোলা না দিয়া যায় না। বাল্মীকির তপোবনে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া লইয়া যে বিস্তৃত যুদ্ধকাহিনী কৃত্তিবাস রচনা করিয়াছেন—অন্য কোন রামায়ণে ঐরূপ দেখা যায় না। একদিকে দুইটি কিশোর বালক—লব-কুশ—অপর দিকে শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যার অজস্র চতুরঙ্গ সেনা। শত্রুঘ্নের পতনের পর যুদ্ধে আসিলেন ভরত ও লক্ষ্মণ এবং তাঁহাদের পতনের পর আসিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। কী অদ্ভুত রোমহর্ষক যুদ্ধ দেখাইয়াছেন কৃত্তিবাস। রাবণবিজয়ী পরাস্ত হইলেন আপন পুত্রদের কাছে। সীতা জানিতেন না লব-কুশ কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে সীতা আশীর্বাদ করিয়া বলিতেছেন: 'কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী। তো-সবার যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি॥' যুদ্ধরহস্য সীতা বুঝিলেন, লবকুশ যখন হনুমান ও জাম্বুবানকে বাঁধিয়া আনিল। সীতা শুনিলেন রামের পতনকথা। ছুটিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জ্বালিলেন আগুন প্রাণাহুতির উদ্দেশ্যে। বাল্মীকি আসিয়া পড়ায় সব বিপদ কাটিয়া গেল। সবাই পুনর্জীবিত হইলেন।

বিচ্ছেদের পর মিলন মধুময় লাগে। কেবল-মিলনের ভিতর সুখ থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে মাধুর্য বা গরিমা নাই। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরেই মিলনসুখ বেশী অনুভূত হয়। রাম-সীতার

ক্রমাগত বিচ্ছেদ ভক্তহৃদয়ে ভগবৎ-বিরহের ভাব জাগাইয়া দেয়। একটির পর একটি পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত। আন্তরিকতার উপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ দারুণ মর্মবেদনার কারণ হয়। অপবাদে লাঞ্ছিতা সীতা স্বামীর কাছে শেষ আক্ষেপ করিলেন: 'জন্মে জন্মে প্রভু, তুমি হয়ো মোর পতি। আর কোন জন্মে মোর করো না দুর্গতি ॥'

সীতার পাতালপ্রবেশ পর্বে কৃত্তিবাসের এই উক্তি আমাদের বেদুইন কবি বেন ইদ্রিশের রচিত কবিতাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি ইদ্রিশ ছিলেন অমৃতলোকে বিশ্বাসী। তাই তাঁহার রচনায় ফুটিয়াছে এক অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেম। ঐ প্রেমের নাম 'বেদুইন প্রেম।' এ জগতে মিলন না হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রেম ত বিফল হইবার নয়। সীতার হৃদয়ের প্রেম তাঁহাকে অমরত্ব দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে পৃথিবী হইতে বৈকুণ্ঠে। শ্রীরামচন্দ্রও নরদেহ ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন। 'সীতাদেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে। লক্ষ্মীরূপা হইলেন সীতা অবশেষে ॥' এই মিলনই চরম মিলন, পরম মিলন।

উত্তরকাণ্ডে তুলসীদাস একদম স্বতন্ত্র। তিনি চিরাচরিত বাল্মীকির উপাখ্যানের দিকেই গেলেন না। রাবণ মরিল। মনোরাজ্যে দুষ্টের মৃত্যু হওয়ায় রামরাজ্য বসিল। আবার এদিকে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিলে সেখানে যে রামরাজ্য বসিল তাহাও হৃদয়ের রামরাজ্যের জুড়ী হইল। তুলসীদাস এই সব কাহিনী নিজে না শোনাইয়া শিব-পার্বতী এবং কাক ভূষণ্ডী ও গরুড়ের মারফত শোনাইয়াছেন। তুলসীদাস সীতার বনবাস দেখান নাই। প্রাণের রঘুবীরকে কষ্ট দিতে তিনি চাহেন না—তাই মনে হয় দেখান নাই। আবার একটি মত আছে—বাল্মীকি-রামায়ণে সীতার বনবাস পর্বটা প্রক্ষিপ্ত; ঐজন্যও হয়ত তুলসীদাস ওদিক দিয়া যান নাই। তিনি রামরাজ্যের অধিবাসী হইতে ব্যস্ত। তাহার মতে একমাত্র ভক্তি হইতেছে ঐ রাজ্যের প্রবেশের পাঞ্জা বা ছাড়পত্র।

রামরাজ্যের অপূর্ব বর্ণনা দিয়া কাকভূষণ্ডী গরুড়কে বলিলেন: 'রামরাজ্যে রাজার হস্তস্থিত দণ্ড গিয়া সন্ন্যাসীর হাতের লাঠি হইল। কারণ সেখান হইতে সমস্ত অপরাধ চিরদিনের জন্য বিদায় লইল। রাজার ভেদনীতি অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের ঝগড়া বাধাইয়া শাসন করার নীতিও উঠিয়া গেল। ভেদ তখন গেল নর্তকদের সমাজে; সুরতালের জন্যই ভেদ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পররাজ্য জয়ের আর প্রয়োজন হইল না। কারণ রামরাজ্যে পরই কেহ রহিল না—জয় করিবে আর কাহাকে? জয় করিবার কাজ রহিল মাত্র নিজের মনকে। এই হইল রামরাজ্য।

তুলসীর উত্তরকাণ্ডের অধিকাংশ কাকভূষণ্ডী ও গরুড়ের কথোপকথনে পূর্ণ। রাম-লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া গরুড়ের মনে সন্দেহ জাগিল—এ কী ব্যাপার! যাঁহার নাম জপ করিয়া মানুষ ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তুচ্ছ রাক্ষস সেই রামকে নাগপাশে বাঁধিল! বিভ্রান্ত গরুড় সন্দেহ নিরসনের জন্য ছুটিল প্রথমে নারদের কাছে, তারপর ব্রহ্মা ও শিবের কাছে। শিব তাহাকে পরম রামভক্ত ভূষণ্ডীকাকের কাছে পাঠাইলেন। স্বয়ং বিষ্ণুবাহন পক্ষিরাজ গরুড় একটা নগণ্য কাকের কাছে সেই রামতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন। ভূষণ্ডী অনেক কিছু বলিয়া শেষে মন্তব্য করিল: হে খগপতি, এখন আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বলিতেছি যে, হরিভজন ছাড়া ক্লেশ যায় না। রামকৃপা ভিন্ন রামের প্রভুত্ব জানা

যায় না। না জানিলে বিশ্বাস হয় না, আর বিশ্বাস না হইলে প্রীতিও হয় না। প্রীতি ছাড়া ভক্তি হয় না, আর হরিভক্তি বিনা কি সুখ হয়? নিজের সুখ উপস্থিত না হইলে কি মন স্থির হয়? হে পক্ষিরাজ, রামের কৃপা ছাড়া স্বপ্নেও মন শান্তি পায় না। অতএব 'অস বিচারি মতি ধীর ত্যজি কুতর্ক সংশয় সকল। ভজহ রাম রঘুবীর করুণা কর সুন্দর সুখদ॥' অর্থাৎ ইহা বুঝিয়া কুতর্ক ও সংশয় সকল ত্যাগ করিয়া হে স্থিরবুদ্ধি, তুমি সুখদায়ক, সুন্দর, করুণাময় রঘুবীর রামচন্দ্রের ভজনা কর। ইহা কেবল ভক্তশ্রেষ্ঠ ভুষণ্ডীকাকের কথা নয়, তুলসীদাসেরও মনের কথা।

লোকে প্রবাদ আছে, যে ঋণ অপরিশোধ্য, উহার উল্লেখ দ্বারা ঋণ-ভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর মহাশয়ের সম্পাদিত কৃত্তিবাস রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াছি। কবিভূষণের গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বহু অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিয়াছেন। তুলসীদাসের রামায়ণে আমার মত স্বল্প হিন্দী জানা লোকের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে ধরিয়া রামচরিত-রূপ মানসসরোবর পার হইয়াছি। অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবান আছেন—এ কথা অল্পবিশ্বাসী মানুষ বুঝিতে পারে না। দাশগুপ্ত মহাশয় স্বদেশী আন্দোলন কালে জেলে না গেলে এ গ্রন্থ রচনা হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার আত্মকথা: 'এবারকার জেলে জেলখানার গোশালার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। গোশালার তিন বেলার কাজ করিয়া যে সময় বাঁচিত, তাহা রামায়ণ-অনুবাদ কাজে লাগাইতাম।' দীর্ঘকাল ব্রত উদ্‌যাপনের পর ব্রত প্রতিষ্ঠার দিন খুব আনন্দ হয়। দুই বিরাট কলেবরযুক্ত গ্রন্থ পরিক্রমার পর সেই কথা মনে হইতেছে।

তুলসীদাস ও কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়া ছুটী পান নাই। কারণ যুগে যুগে তাঁহাদের রামগান করিয়া মানুষকে মুক্তির কথা শোনাইতে আসিতেই হইবে। রামচরিত কীর্তন ছাড়া তাঁহাদের আর কাজ নাই। যুগে যুগে রাবণ দেখা দিতেছে, যুগে যুগে রাম আসিয়া তাহাকে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিতেছেন। দিন দিন মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে অন্যায়-রাবণ দশ মাথায় দশ ইন্দ্রিয় লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। রাম সেই দশ মুণ্ড কাটিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করাইয়া রাবণকে নিজের বশে আনিয়া ভক্তের হৃদয় পবিত্র করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে রাবণ হৃদয়ে বসিয়া সীতা হরণ করিতেছে। সীতাকে তো সে অপবিত্র করিতে পারে না, সত্যকে মলিন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও পারে না, নিজেই মলিন হয়। রাম আসিয়া রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার করেন ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বার বার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সেই ট্রাডিশান সমানেই চলিয়াছে।

রামকথার ইতি নাই। হে সজ্জন পাঠক, কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস দুইজনেই সুর করিয়া রাম-গান শোনাইবার জন্য ডাকিতেছেন। কৃত্তিবাস বলিতেছেন: 'রাম-নাম জপ ভাই, অন্য কর্ম মিছে। সর্ব-ধর্মকর্ম রাম-নাম-বিনা মিছে॥' তুলসীদাস বলিতেছেন: 'রামহিঁ সুমিরিয় গাইয় রামহিঁ। সন্তত সুনিয় রামগুণ গ্রামহিঁ॥' অর্থাৎ রামকেই স্মরণ করিবে, রামকেই গাহিবে, সর্বদা রামের গুণগ্রাম শুনিবে। হে পাঠক, ক্রমাগত শুনিতে থাকুন। যদি মনে করেন রামায়ণের ওসব আষাঢ়ে গল্প শুনিয়া কি হইবে? দোহাই! না শুনিয়া বলিবেন না কি হইবে। যখন ঐ দুই সাধক-কবি শুনিতে ডাকিতেছেন, তখন একবার শুনিয়াই দেখুন।

বর্তমান শিক্ষা ও তাহার প্রভাব

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন দত্ত

প্রকৃত শিক্ষার অর্থ কি? এ বিষয়ে চিন্তা করিলে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথার সত্যতাই উপলব্ধি করি যে, জ্ঞান মানুষের মনের ভিতর সূক্ষ্ম অজ্ঞতার আবরণ দিয়া ঢাকা থাকে, সেই আবরণকে একটু একটু করিয়া ভেদ করিয়া ভিতরের পূর্ণতাকে যখন মানুষ প্রকাশ করে, তখনই সে শিক্ষিত হয়। মানুষের দেহ, মন ও বুদ্ধির সমান বিকাশের প্রয়োজন। সুস্থ শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে ছাত্রদের দেহমনকে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে সদ্‌গ্রন্থপাঠ হইতে খেলাধূলা ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে শরীর গঠন ও মন শক্ত করিতে হয়। মনকে একাগ্র করিতে পারিলেই মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। মনঃসংযোগ অভ্যাসের দ্বারা মনের সব শক্তিকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এখনো বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতিরই ব্যবস্থা আছে, মনের উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নাই।

আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা লইয়া নানা প্রকার আলাপ আলোচনা চলিতেছে, এবং এবং এই বিষয়ে আমরা এখনো কোন সুফলপ্রদ স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি নাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কতখানি ফলপ্রসূ হইয়াছে, বর্তমান ছাত্রসমাজই তাহার পরিচায়ক। অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিলেও একথা নিশ্চিত করিয়াই বলা যায় যে জাতীয় ভাব ও সংস্কৃতি কিছুই তাহারা এই শিক্ষার মাধ্যমে পায় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষাবিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া ছিলেন, এবং বহু পূর্বেই এই বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, বৃটিশরাজের তত্ত্বাবধানে যে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সে শিক্ষার দ্বারা জাতির কোন বিশেষ উন্নতি সম্ভব হইবে না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কেরানি ও অফিসারের সৃষ্টি হইবে, এবং তাহাদের দ্বারা দেশের কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ইহাও বলিয়াছিলেন যে, দেশের ছাত্রসম্প্রদায়কে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারিলে কিংবা এই শিক্ষার ব্যবস্থানীতি পরিবর্তন না করিলে দেশের যথার্থ উন্নতি সুদূরপরাহত। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিতে গিয়া তিনি ছাত্রদের স্বাধীনতা ও আত্মশক্তির বাধাহীন বিকাশের কথা চিন্তা করিয়াছেন। প্রত্যেক শিশুর তথা শিক্ষার্থীর ভিতরে যে প্রতিভা ও কর্মশক্তি এবং তাহাদের সহজাত প্রবণতা আছে, তিনি বলিয়াছেন, তাহার বিকাশ নির্ভর করে একটি উপযুক্ত পরিবেশের উপর। বলিয়াছেন, উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে সেই প্রতিভা ও কর্মশক্তির যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথেই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজী আরও বলিয়াছেন, শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান থাকা চাই-ই। তাহা না থাকিলে শিক্ষা যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব নয়। বলিয়াছেন, শিক্ষায় ধর্ম যেন অন্ন, আর সব যেন ব্যঞ্জন। অর্থাৎ

মানুষটিকে আগে খাঁটি করিয়া গড়িতে হইবে, নতুবা সে লব্ধ বিদ্যার অপব্যবহার করিতে পারে। স্বামীজীর এই কথার তাৎপর্য আজ কারো পক্ষে না বোঝার কারণ নাই। ছাত্রকে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের দায়িত্বও বিরাট; তাঁহাদের কেবল বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র বা বাঁধা ছকে ছাত্রকে পাঠ দেওয়া ও লওয়ার যন্ত্রমাত্র হইলে চলিবে না। তাঁহাদের প্রধান কার্য হইবে প্রত্যেক ছাত্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। যে কথাটির ব্যবহার এখন হাস্যোদ্রেকই করে, সেই 'শিক্ষায়তনের পবিত্রতা'কে আক্ষরিক অর্থে মূর্ত করিয়া তোলা। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যাহাতে চরিত্রবলের এবং তাহাদের অন্তরে জাতীয়তা-বোধের গৌরব জাগ্রত হয়, তাহার জন্য আমাদের জাতির কীর্তিমান পুরুষদের মহৎ জীবনাদর্শের গৌরবময় ইতিহাস ও জাতির সাংস্কৃতিক পটভূমির চিত্র তুলিয়া ধরা। ইহারই ফলে ছাত্রসম্প্রদায়ের মনে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিবে, তাহারা আদর্শ মানুষ হইবার চেষ্টা করিবে, তাহারা নূতন ও পুরাতনের ভাল জিনিসগুলি চিনিয়া সেগুলির সমন্বয়সাধন করিতে পারিবে।

আমাদের দেশ যেজন্য একদিন মহান ছিল, দেশের সভ্যতা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে বিষয়ে যদি শিক্ষার্থিগণ শিক্ষা না পায়, তবে তাহাদের আচরণ কখনো পরিবর্তিত হইবে না, তাহাদের সেরূপ মহান আদর্শ ও চরিত্র গঠনে ইচ্ছাও জাগিবে না। ছাত্রদের আদর্শ শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে আমাদের দেশেরই মহামানবদের কর্ম-জীবনের ও মহান আদর্শের ছবি।

আজ কাল দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুখস্থ করিয়া কোন প্রকারে পরীক্ষায় পাশ করে। অনেকে আবার সেটুকু পরিশ্রমও করিতে চায় না। চরিত্রগঠন ও ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ তাহারা পায় না। বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহাই প্রায় এখনো রহিয়াছে; সেই শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শ মানুষ গড়িয়া উঠা তো দূরের কথা, ছাত্রদের মনে নানা প্রকার জাতীয়আদর্শবিরোধী ভাব গড়িয়া উঠিতেছে, যাহার ফল আজ 'নীতির নবমূল্যায়ন' অর্থে নীতিহীনতা। একদল মানুষ আজ দৃষ্টিহীন, একদল হিংস্রতা ও ভাঙ্গনের নেশায় উন্মত্ত। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও আমরা জাতীয় বিবেককে অতন্দ্র রাখিতে পারি নাই। নানাদিক হইতে উচ্চ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও নানা নীতিহীনতা, দুর্নীতি ও বিবেকহীনতা প্রকট হইতেছে; আবার অন্যদিকে আমাদের সর্বসাধারণের উন্নতিসাধনে অপারগতার জন্য গণচিত্তের বিক্ষোভ। এ অবস্থা আজ গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নৈরাশ্যের মূল কারণ সুশিক্ষাবিস্তারের অভাব। এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গভীর চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা; যতদিন পর্যন্ত দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার না হইবে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা ভালভাবে খাইতে পরিতে না পাইবে, এবং যতদিন পর্যন্ত তাহাদের যত্ন লওয়া না হইবে, ততদিন পর্যন্ত দেশ উন্নত হইবে না। আজ ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি মুষ্টিমেয় লোকের হস্তে ন্যস্ত, এদেশের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকিবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য

সম্বন্ধে শিক্ষার স্থান এবং সেই সঙ্গে থাকিবে বিদ্যার্থীদের মধ্যে ধর্মবোধ জাগ্রত করিবার প্রয়াস। জনসাধারণকে জাতীয় শিক্ষা দিতেই হইবে, কারণ জনসাধারণই সমস্ত শক্তির উৎস। তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে তাহাদের বঞ্চিত করিলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি।

ভারতকে আজ জাগিতে হইবে, তাহার নিজস্ব আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন লইয়া; কেবল নিজের কল্যাণের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য। কারণ, এক-পৃথিবী গঠন আজ একান্ত কাম্য, যাহাতে মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে এবং মানবসভ্যতা যাহাতে আসন্ন ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচিতে পারে, বিশ্বপ্রেমকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। একমাত্র ভারত, একমাত্র ভারতই আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিক উন্নতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়া জগতের সম্মুখে সে উদাহরণ স্থাপন করিতে পারে।

আজ আমাদের জনগণের বস্ত্রাভাব ও অন্নাভাব নিবারণের জন্য নিজেদেরও স্বেচ্ছায় স্বল্প অন্নবস্ত্রে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, অভিজাত শ্রেণীর ঘৃণাস্পদ, অস্পৃশ্য জনগণকে নিজের বুকে টানিয়া লইবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবেই; কিন্তু ইহার জন্য ধর্মকে বাদ দিয়া বা বাদ দিতে শিখাইয়া নয়, ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই 'ভারতের অর্ধনগ্ন ফকির'-এর কথা, যিনি ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত দেখা করিবার সময়ও স্বদেশের নিপীড়িত, অত্যাচারিত, দুঃস্থ, জনগণের একজন বলিয়া নিজেকে গৌরবের সহিত পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যেন 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' হইয়া জগতের সম্মুখে সদর্পে বলিয়াছিলেন, "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর," অথচ যিনি ধর্ম, সত্য, সংযম এবং ঈশ্বরবিশ্বাসকে জীবনের সর্বস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজনীতি পরিবর্তনশীল, কিন্তু খাঁটি মানুষ সর্বযুগে একই। আজ ভারত, তথা সমগ্র মানবসমাজকে এবং মানবসভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে এই ধরণের, আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক অথচ জাগতিক প্রয়োজন সাধনে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল জীবনাদর্শের প্রয়োজন, যাহা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভ স্বরূপ হইবে। প্রকৃত পক্ষে আজ আমরা সভ্যতার এমন একটি যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যখন মানুষ প্রকৃতির এতদিনকার চিহ্নিত সীমারেখা অতিক্রম করিয়া তাহার অলৌকিক বুদ্ধি ও কুশলতার বলে মহাকাশে পাড়ি দিতে পারিতেছে, এবং প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তিকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আবার এই কালেই বিশ্বপ্রেমের বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াসের সঙ্গেই মানুষের প্রতি মানুষের প্রবল অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনা এবং ক্ষুধিতদের হাহাকার গগন স্পর্শ করিতেছে, যাহার কোন তুলনা পাওয়া যাইবে না অতীতের ইতিহাসে। ইহার প্রতিকারকল্পে জগৎ আজ নানা রকম মতের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। আজ বিভিন্ন দেশ ও জাতি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে এক সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সকলের সমস্যা ও তাহার সমাধানের চিন্তা সকলকেই স্পর্শ করিতেছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক আমরা আজ এমন এক কালে আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন নৈরাশ্যে ও হতাশায় আমরা অন্ধ। আজ আমরা পুরাতনের মূল্যবোধে আস্থা হারাইয়াছি এবং নূতন কিছুও ঠিক মতো গড়িতে পারিতেছি না। মানুষে মানুষে সহজ

সম্পর্কটুকু আমরা হারাইয়াছি, প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পর হইতে এমন অসহায়ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যেন মহাসাগরের ব্যবধান। এই সাগরের ব্যবধান আজ কিভাবে ঘুচিবে এবং কিসের মন্ত্রে ঘটিবে আমাদের সেতুবন্ধ, এবং কোন্ মন্ত্রে মানবসমাজ কল্যাণমুখী ও সুখী মানব-সমাজে পরিণত হইবে, এই প্রশ্ন আজ মানব-সভ্যতারই প্রশ্ন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে বহু মানব, বহু-যুগমানব নানা পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হইয়াছেন কল্যাণের বাণী, মৈত্রীর বাণী ও প্রেমের বাণী লইয়া। কিন্তু সর্বকালেই তাঁহাদের বাণী আমরা প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিয়াছি, কিছুকাল গ্রহণ করিয়া পরে ভুলিয়া গিয়াছি। সেই বাণী লইয়াই আজ আবির্ভূত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। সভ্যতার ইতিহাসে মূল ভূমিকা যাহাদের, সেই তরুণসম্প্রদায় আজ সর্বাধিক বিভ্রান্ত এবং এই বিভ্রান্তিকে পুঁজি করিয়াই দেশে দেশে চলিয়াছে উগ্র ক্ষমতার লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থের লোভ, যাহার ফলে এই তরুণ-সম্প্রদায় আজ প্রকৃত শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত। ফলে এই শ্রেণীর তরুণসম্প্রদায়ের ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়াছে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, অপ্রেম, ক্ষোভ ও আক্রোশ। আজ তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈরাশ্যের জন্য রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক সমস্যাগুলি দায়ী নিশ্চয়ই। কিন্তু মূল কারণ আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক শিক্ষা, যাহা মানুষকে অন্তর্মুখী করে, যাহা স্থিরচিত্তে সমস্যাসমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার সামর্থ্য দেয় তাহার অভাব। জনসাধারণের চারিত্রিক উন্নতির উপর নির্ভর করে জাতীয় চরিত্র। আজ যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই, তবে সকলকেই সর্বাগ্রে চরিত্রগঠন করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সাহস, শক্তি ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি লইয়া জাতির আদর্শ—ত্যাগ ও সেবার প্রতি একনিষ্ঠ হইতে হইবে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মি-কতাই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, জাতীয়জীবনের মূল সুর, সুতরাং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম আনিতে হইবে আধ্যাত্মিকতার প্লাবন যাহা স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে দেশের প্রতিটি মানুষ, বিশেষ করিয়া তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে হইবে স্বামী বিবেকানন্দের কালজয়ী বাণী, যে বাণী যুবক ও তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করিবে তাহাদের দেশের কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদনের এক মহান আদর্শে। দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যাহারা দারিদ্র্যের অভিশাপে, অশিক্ষার অন্ধকারে আজও ডুবিয়া আছে, অপর সকলের মতো মানুষ হইয়াও যাহারা নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন নয়, তাহাদের কল্যাণই তো দেশের কল্যাণ, তাহাদের সেবাই তো দেশের সেবা। আজ তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় আদর্শ ও নিঃস্বার্থ সেবার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যুবসমাজের অপচীয়-মান প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাইতে হইবে। আদর্শের অভাবে দিশাহারা ও ভ্রান্ত আদর্শে বিপথগামী যুবসম্প্রদায়ের ভিতরও রহিয়াছে যৌবনের অদম্য প্রাণশক্তি, উৎসাহ। প্রয়োজন শুধু উহাকে যথার্থ কল্যাণপথে পরিচালিত করা। যুবসম্প্রদায় চিরদিনই একটি আদর্শ চায়। তাহাদের সামনে আমরা জাতীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিতে পারি নাই—পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেও নয়, জীবনের মাধ্যমেও নয়। আজ দুইটিই করিতে হইবে আমাদের। আমরা যদি তাহা করিতে পারি, তবেই ইহারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও আধুনিক সব কল্যাণকর ভাবগুলির সংযোগসেতু নির্মাণ করিয়া ভারত ও জগৎকে বাঁচাইতে পারিবে।

প্রাণপুরুষ

'বৈভব'

জন্মহীন !
আজ তব শুভ জন্মদিন !
তোমারি তো জনম লাগিয়া
দুর্যোগের রজনী জাগিয়া
যুগ যুগ ধরে—অত্যাচারী কংসের কারায়
স্তব্ধ রুদ্ধ অন্ধকারে অসহ জ্বালায়
আছিল প্রতীক্ষারত সর্বংসহা ধরণী জননী !
মাঝে মাঝে ওই যেন ওঠে ঝনঝনি
দুঃসহ শিকল-ভার—
বহিতে পারে না আর,
তাই বুঝি কোমলা দেবকী
ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে কণ্টকি !
শৃঙ্খলিত বসুদেব
শান্তরোষে ডাকে ঊর্ধ্বপানে—
'সময় হয়েছে পূর্ণ ?
এসো নামি—পৃথিবীর টানে !'
দিব্য জ্যোতির্ময় !
শিশু ? শিশু এ তো নয়—
এ যে হাসিয়া হাসিয়া
ধ্যানের মূরতি সম আসিছে ভাসিয়া
সাধক-নয়নে,
যেথা পুঞ্জীভূত ব্যথা। যুগ-প্রয়োজনে
কারার সাধনা আজ উঠিল ফলিয়া
শত যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত আঁধার জঞ্জাল
কারাকক্ষে উঠিল জ্বলিয়া !
ধরণীর চক্রবাল রক্তরাগে উঠিল ঝলিয়া !
—আসিয়াছে প্রাণের পুরুষ !
আকাশেতে দিল দেখা আশার প্রত্যূষ !
আনন্দের দিব্য অরুণিমা—
নবীন গরিমা !

জননীর বক্ষ হ'তে
ছিন্ন মুকুলের মতো
ভাসিয়া চলিলে স্রোতে -
কর্মফলে ?
কিম্বা লীলাচ্ছলে—গোকুলের কোলে
শৈশবেই শুরু তব দুঃখময় খেলা :
জন্ম হ'ল রক্ষী-ঘেরা রাজার কারায়
বাড়িতে লাগিল বেলা—
রাজার প্রাসাদ হ'তে বহুদূরে
অতি দীন গোয়ালার পুরে
যেথা সবে আপনা হারায়—
জীবন যৌবন লয়ে করে হেলা ফেলা !
নন্দিত সে নন্দালয়ে হে আনন্দময়—
রাজার তনয় !
খেলিলে রাখাল সাথে রাখাল হইয়া
ধবলী শ্যামলী আর যমুনা লইয়া ;
কভু চরাইয়া ধেনু,
কভু বাজাইয়া বেণু—সখারূপে
মূরলী-সঙ্কেতে—কভু চুপে চুপে
ডাকিলে আপনজনে আপনা বিলাতে—
মিলিতে মিলাতে
তোমার অবোধ্য মহা প্রেম-আকর্ষণে—
বৃন্দাবন-বনে।
সরলা সে মহাভাগা গোপবালাগণ
তেয়াগিয়া কুলমান
নিবেদিল তনু মন প্রাণ
চরণে তোমার।
প্রিয়তম জীবন-আধার,
হৃদয়ের ধন চিনিল তাহারা—

তাই তারা পাগলের পারা
সকল বাঁধনহারা !
তাহাদের শতকোটি জীবনের
সকল সাধনধারা—
ধ্যান জ্ঞান কর্ম প্রেম—
তোমাতেই লভিয়াছে শেষ পরিণাম ;
তুমি পূর্ণ পরিতৃপ্ত চিরপূর্ণকাম !
তারা, সংসারের রুদ্ধদ্বার খুলি,
আপনার পতিপুত্র ভুলি
তোমারি অলংঘ্য টানে
তোমারেই করেছে বরণ,
হে চির-শরণ !

তোমারে ঘিরিয়া তারা
নাচিয়াছে জ্ঞানহারা—
অনুরাগে অভিমানে করিয়াছে সর্বস্ব অর্পণ !
তুমি দেখা দিলে শেষে
অন্তরে অপূর্ববেশে—কি জানি কেমন
সেই তব অতীন্দ্রিয় প্রেম-আস্বাদন !
তোমার সে বিশ্বগ্রাসী প্রেমবহ্নি মাঝে
সকলের সর্বকামনার করিলে হবন !
মুক্ত করি দগ্ধকামে
মুগ্ধ করি জিনিলে তাহায়,
দিলে তারে দিব্যভাবে নূতন জীবন,
মদনমোহন !
তাই আজো—
যত প্রাণে যত প্রেম প্রীতি ভালবাসা—
যত প্রাণে যত কিছু আকাঙ্ক্ষা ও আশা
—প্রিয়তম নয়ন-দীপ্তিতে,
প্রেমময় প্রাণের তৃপ্তিতে
তুমি আসি আগে ধরা দাও—
তবু তুমি রহ অদর্শন ।

এ তোমার অপরূপ লীলার বিস্ময়
বুঝি ইহা বুঝিবার নয় !

তবু তব শুদ্ধপ্রেম-মাধুরী-লীলায়
সংসারের ঘরে ঘরে আনন্দ বিলায়,
ভাই বন্ধু সখা সখী—
স্নেহ প্রেমে মাখামাখি—
শিশু সাথে মায়েরে মিলায়,
তোমারি সে লীলার ছায়ায়
এ সংসার হেসে ভেসে যায় !
—তারি প্রতিধ্বনি
সাধক কবির কণ্ঠে
যুগ হ'তে যুগান্তরে ওঠে রণরণি ।
বৈষ্ণব কবিতা—
তোমারি জীবনরসে ছন্দিতা নন্দিতা—
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে মহাপ্রেমসমুদ্রের পানে,
সংসারের বাসনা কামনা
সমলিন ধূলিকণা
ধুয়ে লয়ে চলে তার টানে ।

শতভাবে দেখা দিলে—
ধরা দিলে তুমি,
সকলের তৃষিত হৃদয় চুমি
মিটাইলে সবার পিপাসা ;
তবু কারো মিটে নাই আশা—
সে বুঝি বা মিটিবার নয়,
হে চির বিস্ময় !

আপনার জননী কাঁদায়ে—
শত শত গোপিকারে মা-ডাকে মোহিলে—
কাহারো বা পিপাসা বাড়ায়ে
বক্ষ হ'তে তুমি কাড়ি নিলে
কোটিজন্ম-সাধনার
সঞ্চিত সুধার ধার—বাৎসল্য রসের—
—সুমধুর পরিণতি দেহের মনের !
অনন্ত সে ধরা দিল সান্ত হয়ে
মা যশোদা বাঁধিল তাহায় !

যার লাগি কত ভক্ত কত দিন রাত—
কত কষ্ট সয়ে—করে প্রাণ পাত,
যার লাগি তারা শুধু কাঁদিয়া কাটায়,
সেই তোরে—
জননী যশোদা দেখি
বাঁধিয়াছে শত স্নেহডোরে !
শুনি তুই চোর—
কারো ননী, কারো মণি,
কারো আঁখিলোর—
কাহারো বা মন বক্ষ চিরে
হরিয়া লয়েছ হরি—দাও নাই ফিরে !

হায়, ফুরাইয়া যায়—
মিটিল না কত সাধ আশা
পূরিল না কত ভালবাসা।
তবু হায়—সব আজ শেষ হয়ে যায় !
এসেছে অক্রূর—
যেতে হবে দূর মধুপুর !
সত্য কি ছাড়িয়া যাবে
এই বৃন্দা লীলা-সুমধুর ?
হে চির নিষ্ঠুর !
ওগো দয়াহীন, মায়াহীন, সর্বস্ববিলীন !
ভুলিয়া চলিলে সব মুহূর্তের মাঝে
বিসর্জিয়া প্রেমমূর্তিখানি মধু যমুনার জলে।
নির্মম পাষাণ তুমি, আসক্তিবিহীন—
প্রতিমূর্তি গীতার তোমার !
যার ধর্মে যার মর্মে
আছে শুধু অনন্ত অপার—
সকলের সম অধিকার—
প্রাণ ঢেলে মন ঢেলে ভালোবাসিবার।
হায় হায় নাই নাই—এতটুকু নাই
প্রাণ ধরে এতটুকু ফিরে চাহিবার !
নীরব নিষ্ঠুর সম গেলে চলে
ফিরে চাহিলে না—দেখিলে না
কে বা পিছে রহিল বাঁধিতে—
শতবর্ষ বিরহের সাধন সাধিতে !
তুমি হে হৃদয়ময়—হে হৃদয়হীন,
কারে বাঁধিলে না,
কর্ণে শুধু বলে গেলে 'ফিরে আসিবে না' ;
মর্মে তার প্রতিধ্বনি :
বৃন্দাবন পরিত্যজি কোথা যাইবে না !
ওপারেতে দেখি তব
কর্মময় মূর্তিখানি রাজে—
চিরশান্ত, অশান্ত সে সংসারের মাঝে !

*

মথুরায় দ্বারকায়
রাজায় রাজায়—
কত না সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব—মহাদর্পী-দলে
নামাইলে সিংহাসন হ'তে ভুজবলে ;
কত কংস জরাসন্ধ ভয়ে টলমলে !
কেহ বা কহিল মন্দ, কেহ বসাইল মনোরথে,
বরমাল্য জয়মাল্য দিল তব গলে !

তুমি কিন্তু চির ধীর স্থির !
অটল অচল কর্মবীর—
আসমুদ্র হিমাচল উত্তর দক্ষিণ
পূর্ব হতে পশ্চিমের পানে—নিদ্রাতন্দ্রাহীন
মথিয়া চলেছ তুমি সারা পুণ্যভূমি—
কর্তব্যের সুকঠোর আমোঘ আহ্বানে
দুরন্তের অন্তের বিধানে !
চূর্ণ শত স্বপ্নমায়া শূন্য বৃন্দাবন ,
কত রাজা কত রাজ্য কত সিংহাসন
ভাঙিল গড়িল তব অঙ্গুলি-হেলায়
এই তব নবতম জীবন খেলায়—
দিনেকের শান্তি নাই, নাই অবসর ;
ওগো বীরবর,
ভারতের হে প্রাণপুরুষ,
বিনাশিতে যুগের কলুষ

আপনার জীবন আগুনে—
পবিত্র করিতে পৃথ্বি
স্থাপন করিতে এক
শান্তিময় ধর্মরাজ্য জগত মাঝারে—
ভিখারীরে রাজা করি,
ভিক্ষুবেশে সাজালে রাজারে !
সারাটি জীবন দেখি,
সিংহাসন লয়ে তব কত ধূলাখেলা
তবু—
সিংহাসনে উঠিলেনা কভু—যেন মাটিঢেলা ;
তুমি যোগী, রাজরাজ,
সর্বত্যাগী, তাই সর্বপ্রভু ।

তারপর ঘনায়ে আসিল মেঘ—
বাড়িতে লাগিল বায়ুবেগ,
ঘন ঘন বিজলী চমকে—
ভারতের আকাশেতে
বহে ঝঞ্ঝা থমকে থমকে !
সেই দিন সে যুগ-সন্ধ্যায়—
ভারতের আকাশেতে
জ্বলে যায় শতসূর্য প্রায়—
শত রাজা শত যোদ্ধা শত অক্ষৌহিণী
ধ্বংস উন্মুখিনী ।
আসন্ন মহাপ্রলয় !
'রক্ষা কর, রক্ষা কর'—হাঁকে জীবচয় !
সারা পৃথ্বী ভয়-কন্টকিত—
কে রোধিতে পারে এই মৃত্যু অবহিত ?
নাই নাই কোন আশা—কোন ভাষা নাই !
যুগান্তে এ প্রলয়ের প্রয়োজন—
আয়োজন তাই ।

শত নিরাশার মাঝে তরী
দুলে দুলে যায় ডুবে বুঝি
সেখানেও দেখি তুমি
হে ধীর কাণ্ডারী বীর চলিয়াছ যুঝি !
একাকী ধরিয়া হাল
শতছিন্ন উড়াইয়া পাল—
ধ্বংস জানি অতি সুনিশ্চিত !

*

তাই দেখি দর্পী রাজা দুর্যোধন
অপমান করিল তোমায়—
অতি দীন দূতবেশে যবে তুমি
উপনীত কৌরব-সভায় !
শান্তির লাগিয়া তব কত চেষ্টা—
যুদ্ধের বিরোধী,
তবু সবে বলে হায়—তোমায় সম্বোধি,
'কুরুক্ষেত্র ঘটাইলে তুমি,
কুলশূন্য বীরশূন্য হ'ল পুণ্যভূমি'—
সেই ঘোর অশান্তির লাগি
তোমারেই করে তারা দায়ী !
রিক্তহস্তে সিক্তপ্রাণে
ফিরে এলে তুমি শান্তি মাগি
হে চিরউপায়ী,
আজ তুমি নিরুপায় শান্তি-স্থাপনায় !

*

যবনিকা উঠিল আবার । শেষ দৃশ্যপট !
ওই যেন আজো দেখা যায়—
দাঁড়ায়েছে দুইধারে কাতারে কাতার !
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
মারণ-মুখিনী !
গভীর বিষাদবায়ু করে থম থম,
গম্ভীর প্রলয়-মেঘ করে জম জম,
শান্ত স্থির নিষ্কম্প নীরব
রথরথী গজ-বাজী সব !
তার মাঝে ধীরে—অতি ধীরে
প্রবেশিলে কুরুক্ষেত্র-রঙ্গমঞ্চ 'পরে
কপিধ্বজরথে, শ্বেত-অশ্ব-বল্গা ধরি করে
অস্ত্রহীন অতিদীন সারথির বেশে
অর্জুনের রথে ।

কিন্তু তার মনোরথে ?
তুমি তার গুরু, তার সখা—
তুমি তার সারথি সুন্দর
চির মনোহর !

ক্লীবতাকে দূর করি তার—
দেখাইতে বিজয়ের পথ,
চালাইতে জীবনের রথ—
দিলে তুমি দেখা—সখা ও সারথিরূপে
অতি চুপে চুপে !
যেই করে যে অধরে একদিন বৃন্দাবন-বনে
বেজেছিল মুরলী মধুর
মিলনের সঙ্কেত-নিঃস্বনে ,
সেই করে সে অধরে
কুরুক্ষেত্র সমর-অঙ্গনে
রুদ্ররোলে ফুকারিয়া উঠিল রে আজ—
ওকি অগ্নিময় বাজ !
উড়াইয়া ধ্বংসের নিশান
ঈশান বিষাণ
—প্রলয়ের পাঞ্চজন্য—
বাজিলরে কার জন্য !
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ মাতাইল বীরের পরাণ।
যুগান্তের প্রলয়-লীলায়
বহ্নি ফুটে বাহিরায় শিলায় শিলায় !

স্তব্ধ করি যুদ্ধোত্থিত
সেই ঘোর প্রলয়-কল্লোল
গীতাসিংহনাদ তুমি করিলে গর্জন !
টুটে যায় মোহনিদ্রা—
সে আঘাত ক্লীবতার বিষম অঙ্কুশ,
হে কালপুরুষ !
ভুলায়ে কি শক্তিবলে মোহিনীমায়ায়
মাতাইলে সবে
সৃজন পালন ভুলি প্রলয়-আহবে ?

সেই ঘোর রণ-উন্মাদনা—
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—তারি মাঝে
অরোধ্য অশ্বের বল্গা
সবিক্রমে এক হাতে টানি
শান্তভাবে অন্য হাতখানি
অর্জুনেরে পরশিয়া রাজে।
চূর্ণ করি তার শত হীন অবসাদ,
দূর করি ক্লীবের বিষাদ—
উৎসাহিত করি কহে :
"মাতো এই মরণের মহা-মহোৎসবে।
ওই দেখ, উন্মুক্ত স্বর্গের দ্বার—
ডাকিতেছে বারংবার !
দাও দাও সাড়া দাও—বলো 'যাই যাই'।
এই এক পথ আছে, অন্য পথ নাই !
যুদ্ধ ছাড়ি যশোহীন মৃত্যুর জীবন—
সে নহে তোমার মতো বীরের কখন !"
দেখাইলে জ্ঞানময় মূরতি তোমার
গুরুরূপী করুণার অনন্ত আধার।
ঘুচাইলে সব অন্ধকার—
শুনাইলে চির সত্য
জ্যোতির্ময় আত্মতত্ত্ব :
'কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি ?
এই দেখ, আমি মারি—আমি সব করি।'
দেখাইলে অপূর্ব সে বিশ্বরূপ দিগন্ত ব্যাপিয়া
অসীম সুন্দর, তবু সীমার লাগিয়া
কাঁপে প্রাণ ভয়ে অনুরাগে ;
অরূপের পারে তাই রূপ ফিরে জাগে !

*

গীতার সে বজ্রধ্বনি মহাসিংহনাদ—
সেই সৈন্য-সিন্ধুবক্ষ তরঙ্গিয়া করিল উন্মাদ !
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সে মহা আহবে
মাতিল বীরেন্দ্রবৃন্দ
মরণের মহামহোৎসবে !
কী কল্লোল কলরোল

প্রলয়ের তীব্র জলোচ্ছ্বাস।
বিষাক্ত করিছে বায়ু
প্রধূমিত নিশ্বাস প্রশ্বাস!
সে উন্মত্ত চাঞ্চল্যের মাঝে
মরুভূর নিস্তব্ধতা রাজে—
দেখি তুমি অতি শান্ত, অতি ধীর স্থির!
অনন্ত প্রশান্তি মাঝে
অবিশ্রান্ত কর্মময়—তুমি কর্মবীর!
আজো যেন কানে বাজে:
কর্ম কর, যুদ্ধ কর, সহ্য কর হে প্রিয় অর্জুন,
অতিক্রমি কর্ম জ্ঞান
লঙ্ঘি চল সত্ত্ব রজোগুণ!
আর, কিছু যদি নাই পারো
সর্বধর্মকর্ম কর আমাতে অর্পণ,
একান্ত এ নির্ভরতা—
এই সাধ্য, এই তো সাধন!!

*

সব শান্ত, সব শেষ,
শুধু হাহাকার—
শুধু কানে আসে—সকরুণ রোল—
বিধবার অভিশাপ—
বিষাক্ত নিশ্বাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়
সমর-বাড়বানলে যাহা অবশেষ!
সেই মহাযুগান্তের যত পাপ তাপ
আপনার পানে তুমি
নিলে টানি—সব অভিশাপ
নবতম শান্তিরাজ্য স্থাপন-কল্পনা—
তাহারি রচনা
এখনও রয়েছে বাকী জীবনের কাজ;
হে নির্লিপ্ত রাজরাজ,
তাই তুমি চলিলে আবার
শেষ তব বিজয়াভিযানে,
সাথী তব চিরসখা—
দক্ষিণ বাহুর মতো অর্জুন সুজন।

ভারতের পূরবে পশ্চিমে
উত্তরে দক্ষিণে
সর্বত্র উড়ায়ে তব বিজয়-নিশান
ফিরে এলে শুভদিনে
করিবারে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান—
শেষ ব্রত তব জীবনের;
যুধিষ্ঠিরে প্রতিষ্ঠিত করি সিংহাসনে
দিলে তারে রাজধর্মজ্ঞান!
মানব-বিধানে তুমি
বেঁধে দিলে ভারতের সীমায় সীমায়
এক শান্তি-ধর্মরাজ্যপাশে
ধ্বংসশেষে স্বীয় মহিমায়
নব গরিমায়।
হে যুগমানব,
তার প্রাণে অভিষিক্ত করি গেলে তব
অফুরন্ত প্রাণবারি হে প্রাণপুরুষ!

*

কত কাল গেছে কাটি সে প্রত্যূষ—
সে এখন অন্ধকারে
বিস্মৃতির পাষাণ-শিলায়—
তোমার সে অপরূপ অমানুষী মানুষী লীলায়
কেহ বলে কবির কল্পনা
অর্ধনগ্ন ঋষিদের বাতুল রচনা!
আমি দেখি ভারতের বুকে
আজো জেগে আছে—
তোমার সে শেষ-দেওয়া প্রাণের স্পন্দন—
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে যুগ হতে যুগান্তর পানে!
যতনে জড়ায়ে বুকে
সেই সুখে, যাহা সে পেয়েছে তব কাছে—
তাই লয়ে চলিয়াছে, তাই লয়ে রচিয়াছে
মাঝে মাঝে এই মর্ত্যে অমর-নন্দন!
আরো জানি,
চলিছে চলিবে চিরকাল—তব পুণ্যটানে—
তব নামে—তব লীলাতানে

তব জয়গানে
ভরিয়া এ ভারত-আকাশ
ছড়ায়ে পড়িবে ধীরে—
সে ভাঙিবে বিশ্বের বন্ধন !
সারা বিশ্বে বাঁধা হবে এক প্রেমপাশ
তারি লাগি তোমারি প্রকাশ !
তোমারি সে সুর
স্পন্দিত নন্দিত আজো, করে ভরপূর
এ শান্ত সুদূর !
তোমার সে উষারাগে
আজো দেখা যায়
যুগান্ত-সন্ধ্যায়
পশ্চিমের সকরুণ প্রমত্ত লীলায়—
উষার সে প্রতিচ্ছায়া অনুরাগ-ফাগে
সন্ধ্যার গগনে—
সৃষ্টির সে শেষমায়া—প্রলয় লগনে
বিদায়ের ক্ষণে !

*

পুনশ্চ প্রভাস তীরে—ধ্বংসের লীলার
মাঝে—দেখি তুমি
চিরশান্ত চির নির্বিকার !
আপনারি সৃষ্টিধ্বংসে আপনিই হাসো—
তুমি কাল ! ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপে আসো !
তুমি কৃষ্ণ, কি সুন্দর ; নবতম সৃজন লাগিয়া
ধ্বংসের প্রলয়-রাত্রি
রহ একা নীরবে জাগিয়া !

*

আরো এক নবতম বিকাশের লাগি,
এ ধরা অধীর—
ধরা দাও ধরা দাও—হে প্রাণপুরুষ
প্রাণময় বীর !
ধরণীর ব্যাকুল আহ্বান—
আর বার কবে পুন
টলাইবে তোমার পরাণ
কবে পুন ধরা দিবে হে প্রিয় নিঠুর—
মাধ্যন্দিন যুগের প্রভায়
প্রমত্ত এ পৃথিবীর কৌরব-সভায়—
কবে সবে চিনিবে তোমায়—
সেই তুমি—তুমি কৃষ্ণ,
তুমি তার প্রাণের ঠাকুর !

*

কালচক্র ঘুরে আসে—
ফিরে আসে কুরুক্ষেত্র—আসন্ন প্রলয় !
পৃথিবী ভরিয়া আজো সেই হাহাকার
অবিচার অত্যাচার-পূর্ণ কারাগার ;
কণ্টকিত সর্ব মন—
হে দর্পী তাপন
কোথা তুমি আজ ?
ওগো রাজরাজ !
সময় হয়েছে পূর্ণ ?
আর বার এস পুন
ওই শুন প্রলয়ের রবে—
আবার মাতিছে বিশ্ব ধ্বংস-মহোৎসবে !

*

সারা বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ—এবার তোমার
বিশ্বসাম্য তরে তব এবার প্রকাশ !
ত্যাগ প্রেম করুণার ধারা
বরষিয়া হউক এবার
বিশ্ব-সাম্যরাজ্য সংস্থাপন—
সুন্দর শোভন
অপূর্ব বিকাশ—স্বপ্নময় সে শুভ উষায়—
সেখানে মানুষ হবে প্রকৃত মানুষ,
হে প্রাণপুরুষ !!

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মানবজীবনকে স্পেন্সার যে পাঁচটি কার্যকরী শক্তির দ্বারা ভাগ করেছেন, তার প্রথমটি 'আত্মরক্ষা'মূলক। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা অর্থে প্রধানতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা বোঝালেও ব্যাপক অর্থে জীবনের সর্বপরিস্থিতির উপযুক্ত হওয়াই উদ্দিষ্ট। এ বিষয়টি নিয়ে স্পেন্সার তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে (শারীরিক শিক্ষা) বিশদ আলোচনা করলেও প্রথম অধ্যায়েই কিছু প্রণিধানযোগ্য কথাও বলেছেন।

স্পেন্সারের মতে আত্মরক্ষার আয়োজন স্বয়ং প্রকৃতিই অনেক পরিমাণে করে থাকেন। "...... সুখের বিষয় যে, শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গ আত্মরক্ষা প্রকৃতি আমাদের হস্তে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করেন নাই।"[১] একটি ছোট্ট শিশুও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মায়ের কোলে মুখ লুকোয় অপরিচিত কোন মানুষ বা প্রাণী থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। "প্রকৃতি এই প্রকারে প্রথম শিক্ষায় আমাদের সহায় হওয়াতে এ বিষয়ে আমাদের যত্নের অল্পই আবশ্যক। আমাদের উচিত কেবল দেখা যে, এই প্রাকৃতিক শিক্ষা কোন প্রকারে ব্যাহত না হয়। অনেক অল্পদর্শী শিক্ষক এবং পিতা-মাতা সন্তানকে সকল প্রকার ক্রীড়া হইতে বিরত রাখিয়া প্রাকৃতিক শিক্ষার ব্যাঘাত করিয়া এমন অবস্থা করিয়া তুলেন যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সেই সকল সন্তান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।"[২]

শীতাতপ, ক্ষুধাতৃষ্ণা—এসবই প্রকৃতি আমাদের নানা সংকেতের মাধ্যমে জানান দিয়ে থাকে। তবু, অনেকসময়ই এদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার ফলে অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ তো প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। তার কারণ শারীরশিক্ষার প্রতি আমাদের শিক্ষা-দাতাদের মনে মনে একটু অবজ্ঞার ভাব রয়ে গেছে। আসলে ব্যাধির প্রতিকার করতে যে উদ্যম দেখা যায়, যাতে ব্যাধি আদৌ না হয়, সে বিষয়ে সে উদ্যমের শতাংশের একাংশও দেখা যায় না। অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়া যত সহজ, অসুস্থতার পরে সেই পূর্বজীবনীশক্তি ফিরে পাওয়া তত সহজ নয়। সুতরাং সব শিক্ষার গোড়ায় রয়েছে দেহগত সমুন্নতি। স্পেন্সার তো স্পষ্ট বলছেন—"যদি প্রচুর স্বাস্থ্য ও তদানুষঙ্গিক উন্নত মানসিক প্রবৃত্তি সুখোৎ-পাদনের প্রধান সহায় হয়, তাহা হইলে যে শিক্ষা উক্ত বিষয় পরিরক্ষণ করে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা। এই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, শরীর, বিদ্যা, স্বাস্থ্য এবং মানব-জীবনের দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা দেয়, তাহা সকল ন্যায্য শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান অঙ্গ।"[৩] "We infer that as vigorous health and its accompanying high spirits are larger elements of happiness than any other things whatever, the teaching how to maintain them is a teaching that yields in moment to no other things whatever. And therefore we

১, ২ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত : 'বসুমতী' প্রকাশিত শ্রীশশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ : পৃ : ১৪-১৫

৩ তদেব : পৃ : ১৮

assert that such a course of physiology is needful for the comprehension of its general truths, and their bearing on daily conduct is an all-essential part of rational education."[৪] স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের এ বক্তব্য সম্বন্ধে আগেই আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।

স্বামীজীর অনুবাদের আর একটু অংশ উদ্ধৃত করে আমরা স্পেন্সারের শিক্ষা-বিষয়ক প্রথম সূত্রের আলোচনা শেষ করি—"পুত্র কি প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে'র লোকদিগের কুসংস্কারের বিষয় শিক্ষা করিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের (অভিভাবকদের) কত যত্ন! অথচ আপনার শরীর কি প্রকারে চালিত, পুষ্ট ও রক্ষিত হইতেছে, তাহা শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করেন!"[৫]

সাধারণভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্য এখানেও প্রয়োগ করা চলে। স্পেন্সার যে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রাধান্য চেয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উপর। বিজ্ঞানের প্রসার আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে কতটা সতর্ক করতে পেরেছে, তা সন্দেহের বিষয়।

স্পেন্সার আমাদের কার্যকরী শক্তিগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করবার সময় দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন—"যে সকল কার্য অপরোক্ষভাবে জীবনোপায়-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা করে।"[৬] সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি-অনুযায়ী স্পেন্সার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আমাদের জীবনধারণের ক্ষেত্রে কীভাবে সহায়তা করে তার আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূতত্ত্ববিদ্যা, 'বিয়লজি' (Biology) বা জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এ সমস্ত বিষয়ের চর্চা তখনকার ইংল্যাণ্ডে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে অতি অল্পই দেখা যেত। অথচ জীবিকা ও জীবনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের জ্ঞানেরই প্রয়োজনের দিক থেকে অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।[৭] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন্সার ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা-চিন্তায় বিজ্ঞানের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, ঠিক সে প্রাধান্য কিন্তু এখনও সে দেশে দেখা দেয়নি। বিজ্ঞানকে জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ জেনেও সকলেই বিজ্ঞানশিক্ষার দিকে ঝুঁকতে পারে না। মানবমানসের প্রকৃতিগত তারতম্য এবং জীবনোপলব্ধির বিভিন্ন স্তরকে কেবল উপযোগিতার মানদণ্ডে বিচার করা চলে না। তবু নবযুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় স্পেন্সারের অনুবাদক স্বামী বিবেকানন্দও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানশিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দিতে চেয়েছিলেন। চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মকে স্বামীজী একই সত্যের বিভিন্ন দিকরূপে নির্দেশ করলেও ভারতবর্ষের বর্তমান প্রয়োজনে বিজ্ঞান-চর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা স্বামীজী নানাভাবেই নানা জনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' ও 'স্বামীজীর কথা' বই দুইটিতে লিপিবদ্ধ মন্তব্য-গুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী শক্তির তৃতীয় সূত্র স্পেন্সারের মতে "যাহার দ্বারা সন্তানপালন নিষ্পন্ন হয়।"[৮] এক্ষেত্রে স্পেন্সার তাঁর সমকালীন শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে একটু

৪ Education : Spencer : 1st. Edn. p 16-17

৫ শিক্ষা : পৃঃ ১৯

৬ তদেব : পৃঃ ১০

৭ তদেব : পৃঃ ১১-১৯

৮ শিক্ষা : পৃঃ ১০

পরিহাসচ্ছলে বলেছেন, "We come now to the third great division of human activities—a division for which no preparation whatever is made. If by some strange chance not a vestige of us descended to the remote future save a pile of our school-books or some college examination-papers, we may imagine how puzzled an antiquary of of the period would be on finding in then no sign that the learners were ever likely to be parents. I perceive here an elaborate preparation of many things ; especially for reading the books of extinct nations and co-existing nations (from which indeed it seems clear that these people had very little worth reading in their own tongue) ; but I find no reference whatever to the bringing up of children. They could not have been so absurd as to omit all training for this gravest possibilities. Evidently, then, this was the school-course of one of their monastic orders."[৯]

স্বামীজীর অনুবাদ—"এক্ষণে মানবীয় কার্যের তৃতীয় বিভাগ দেখা যাউক। মনে করুন, কোন ঘটনাবশতঃ আমাদের আধুনিক অবস্থার সমস্ত চিহ্নই বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল রাশীকৃত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পড়িয়া রহিয়াছে। মনে করুন, সেই সময়ের একজন পুরাতত্ত্ববিৎ ঐ প্রকার কতকগুলি পত্র পাইয়া পত্রের সমসাময়িক লোকদিগের শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রশ্নাবলী দেখিয়া ভাবিবেন যে, "দেখিতেছি, বহুবিধ প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা-শিক্ষার বিবিধ প্রকার আয়োজন রহিয়াছে, কিন্তু সন্তানপালন সম্বন্ধে তো কোন শিক্ষাই দেখিতেছি না—অতএব বোধ হয় যে, এই সকল পত্র ইহাদের কোন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের হইবে।"[১০]

স্পেন্সার পরিহাসচ্ছলে যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে প্রশ্ন আধুনিক কালের শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে Home Science বা Domestic Hygiene-জাতীয় কিছু ব্যবস্থা থাকলেও পুরুষ-ছাত্রদের ক্ষেত্রে সন্তানপালন সম্বন্ধে কোনো স্তরেই কোনো আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। অথচ সন্তান মানুষ করার দায়িত্ব মায়ের চেয়ে বাপের কিছুমাত্র কম নয়।

সন্তানের শারীরিক বা মানসিক কোনো স্তরই অবহেলার যোগ্য নয়। স্পেন্সার প্রশ্ন করেছেন, অঙ্কে অনভিজ্ঞ লোক যদি ব্যবসা শুরু করে, তাহলে লোকসমাজে তার আচরণ হাস্যকররূপে দেখা দেয় কি না। অথচ সংসার-সমাজে সন্তানপালন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাই সন্তানদের লালন-পালনের ভার নিতে বাধ্য হন। ফলে পিতামাতার ভূমিকায় অধিকাংশ অপটু গৃহস্থ সন্তানদের জীবনে অশেষ দুর্গতির কারণ হয়ে থাকেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) পিতা বিশ্বনাথ ও মাতা ভুবনেশ্বরীর কাছে তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা-বিষয়ে নানাভাবে ঋণী। দেহাবসানের আগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব লিখে

৯ Education : Spencer : p 25

১০ শিক্ষা : পৃ : ২৭-২৮

জানিয়েছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দেবে।' অবশ্য সে শিক্ষা সাধারণ অর্থে সন্তানপালনের শিক্ষা নয়। তবু, শিশুকে যে আশৈশব শ্রেষ্ঠ ভাবের দ্বারা ইতিমূলক (positive) শিক্ষা দিতে হবে—একথা স্বামীজী রাণী মদালসার গল্পের দ্বারা বুঝিয়েছেন। আপন শিশুসন্তানদের দোল দেবার সময় রাণী মদালসা শোনাতেন, তুমি সেই পরম সত্য—'ত্বমসি নিরঞ্জন।'[১১] এই ভাবাদর্শগত শিক্ষার বাইরে প্রতিদিনের জীবনচর্যায় শিশুপালন সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তৃতভাবে কিছু লিখে যেতে পারেননি।

সন্তানের শিক্ষা-সম্বন্ধে অসচেতন জনক-জননীর উদ্দেশে স্পেন্সারের ভর্ৎসনার অনুবাদে স্বামীজীর নৈপুণ্য হয়তো অনেকটাই এ বিষয়ে তাঁর ও স্পেন্সারের মতৈক্যের দরুন—"হায়! হায়! জগতে যত দুর্বলতা, যত ভীরুতা, যত দারিদ্র্য, যত পাপ বর্তমান, প্রায় সেই সমস্তেরই কারণ তোমরা মূর্খ পিতামাতা! কি গুরুতর ভার তোমাদের উপর বিন্যস্ত, তাহা দেখিয়াও দেখিতেছ না! তোমরাই তো সন্তানের ভাবী জীবন! তোমরাই তো তাহার জীবনের নেতা! চিন্তাবিহীন মূর্খ পশুর ন্যায় বিলাস চরিতার্থ, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে সকল মনুষ্য সন্তানোৎপাদন করিতেছে, তাহারা ভবিষ্যৎ কি একবারও ভাবিবে না? আপনাদিগের অজ্ঞতায় মনুষ্যবংশে পুরুষানুক্রমে কত শত শারীরিক, কত শত মানসিক ব্যাধি প্রবিষ্ট করাইতেছে, একবারও কি তাহা দেখিবে না?"[১২]

বর্তমানে যখন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র ও শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে দেশবাসী চিন্তিত তখন ছাত্রদের অভিবাবক—বিশেষতঃ পিতামাতার ভূমিকা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা প্রয়োজন। পিতামাতার যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র শিক্ষকদের উপরে নির্ভরতা আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টির অপূর্ণতার ফল। আদর্শ জনক-জননীর সন্তানেরাই বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা আশুতোষ হয়েছেন। (ক্রমশঃ)

১১ ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা: ভারতে বিবেকানন্দ: বাণী ও রচনা: ৫ম খণ্ড: পৃ: ১৩৪-১৩৫

১২ শিক্ষা: পৃ: ৩০

স্বয়ম্ভু শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা হইয়া উঠিল না। খোড়ো চালাঘরে পাঠশালার পাঠ শেষ করিতে না করিতেই তাঁহার মনে এমন সব প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল যাহার উত্তর না ছিল কোনো পাঠ্যপুস্তকে, না কোনো পণ্ডিতের বুদ্ধিতে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁহার শিশুমনই সেসব প্রশ্নের উত্তর দিল। কেন লেখাপড়া শিখিব ?—খাইয়া-পরিয়া বাঁচিবার একটা উপায় হইবে বলিয়া। কিন্তু উহাই কি জীবনের উদ্দেশ্য ? শুধু খাইয়া-পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জীবন ? জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি এপথে সিদ্ধ হইবে ? না। এই সিদ্ধান্তে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ লেখাপড়া শিখিবার জন্য কোনো উৎসাহ-ই বোধ করিলেন না। এ সব প্রশ্ন যে পৃথিবীর আর কোনো ছাত্রের মনে এ বয়সে কখনো উদিত হইতে পারে না, তা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আর সকল পড়ুয়ার পার্থক্য এই যে, অন্য সকলেই বেকায়দা প্রশ্নকে এড়াইয়া জিজ্ঞাসু মনের সঙ্গে কাজ চালাইবার মত একটা আপস রফা করিয়া জীবনের অসঙ্গতিকে গোঁজামিলে ঢাকিয়া ঢুকিয়া কোনোমতে আপনার কাজ গুছাইতে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাহা করিতে চাহিলেন না। এই ধরনের শিক্ষার পথে তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে চাহিলেন না। শৈশবেই তিনি জীবনের শেষ উদ্দেশ্যকে খুঁজিতে লাগিলেন।

সংখ্যার উপর সংখ্যা রাখিয়া নামতা কষিয়া হিসাবের অঙ্ক সাজাইতে তাঁহার মনে ধাঁধাঁ লাগিয়া যাইত। জীবনের প্রত্যূষকাল হইতেই তাঁহার সুকোমল অন্তর সকল হিসাবের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত হিসাব-বহির্ভূত জগতের প্রান্তে গিয়া উপনীত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে স্কুল, পাঠ্যপুস্তক পণ্ডিতমশায় এবং পড়ুয়াদল তাঁহার জীবন হইতে চিরতরে সরিয়া গেল—তিনি প্রায়-নিরক্ষর রহিয়া গেলেন। আঠারো শো ছাপান্ন খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে পূজকের কাজ গ্রহণ করেন তখন তিনি তরুণ যুবক, উদ্ভিন্নযৌবন, বয়স বিংশতি বৎসর। তাঁহার দেহ সুগঠিত, বাহু আজানুলম্বিত, মুখমণ্ডল সরলতার স্নিগ্ধ লালিত্যে ঢলঢল—অথচ বিদ্যাশিক্ষার পুঁজি ঐ পাঠশালার গণ্ডী অতিক্রম না-করা পর্যন্ত। জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকুমার এই বিদ্যাহীন বালকের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেন। ক্রূর কুটিল ঘাতপ্রতিঘাতের গ্লানিভরা এই পৃথিবীতে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে, কঠোর প্রতিযোগিতার হানাহানিতে রক্তাক্ত আমাদের এই সমাজে কোথায় তাহার স্থান, কোথায় সে দাঁড়াইবে, কি করিয়া খাইবে—পিতৃসম জ্যেষ্ঠ সহোদরের পক্ষে এ চিন্তা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো উদ্বেগ ছিল না।

নানা দায়ে পড়িয়া জগতের মানুষকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানলাভ করিয়া মনের নানা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার দায়, নামযশ-প্রতিষ্ঠা-লাভের দায়, গাড়ী ঘোড়া করিবার দায় বা নিছক পেটের দায়—যে সব দায় ঘাড়ে লইয়া মানুষ স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বা টোল তোলপাড় করিবার

কাজে লাগিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো ইহার কোনোটির কাছেই ঘাড় পাতিলেন না। ফলে, আমাদের বিদ্যার জগৎ তার প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি অভিমান ও গর্ব লইয়া যতই মাতামাতি করুক, শ্রীরামকৃষ্ণের উপর তার কোনোই জোর খাটিল না। সহোদর রামকুমার চিন্তিত হইলেন। পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয়েরাও হয়ত দুঃখ করিয়াছিলেন। কিন্তু এমন হৃদয়বান তীক্ষ্ণধী বালক কেন যে লেখাপড়ায় পরাঙ্মুখ হইয়া নিজের ভবিষ্যতের প্রতি এমন উদাসীন হইয়া রহিলেন তাহার কারণ সকলের কাছেই অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাশিক্ষা তো হইল-ই না—দশজনের মধ্যে থাকিয়া দশজনের সঙ্গে কাজকর্ম করিয়া যে বিষয়বুদ্ধি হয় তাহাও হইল না। বড়ো মানুষ, কৃতী মানুষ—বিষয়-সম্পদ নাম-যশের চূড়ায় বসিয়া যাঁহারা সমাজের দিক নির্ণয় করেন এবং যাঁহাদের সঙ্গ পাইলে আমরা নিজেদিগকে ধন্য মনে করি তেমনি সব মানুষ দেখিলে তিনি ভয়ে লুকাইতে চাহিতেন। এ হেন মানুষকে সমাজ কোন দৃষ্টিতে দেখিবে? কোনো সমর্থ তরুণ যুবক লেখাপড়া বিসর্জন দিয়া সমাজসংসারের মানুষের সঙ্গ পরিহার করিয়া পূজক ব্রাহ্মণের কাজ করিতেছে দেখিলে আজ সমাজে তাহার যে মূল্যায়ন হইবে, একশতাধিক বৎসর পূর্বের সমাজে কি তাহার মূল্যায়ন খুব বেশী ছিল? কিন্তু লোকের কোন কথা, তাহাদের দৃষ্টির কোন গ্লানি শ্রীরামকৃষ্ণের মনকে স্পর্শও করিতে পারিল না। তিনি ধীরে ধীরে আপনার ভাবের অতলে তলাইয়া গেলেন।

অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা—কোনোটিই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কোনো কাজে আসিল না। প্রচলিত সকল বিদ্যা ও সকল সংস্কার বর্জন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে সেদিন আমাদের চোখে অশিক্ষিত, অসামাজিক রহিয়া গেলেন, সমগ্র মানবজাতির সৌভাগ্যের পক্ষে ইহার যে কি প্রয়োজন ছিল, কত দুরবগাহ, কত গভীর ছিল ইহার তাৎপর্য—আজ ধীরে ধীরে তাহা জগতের মানুষের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার জগৎ আলোড়িত করিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় চলিতেছিল। নূতন বিজ্ঞানচেতনা এবং বুদ্ধিশীলতা নিরঙ্কুশ আনুগত্যের দাবী উত্থাপন করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিকতার সহিত প্রবল দ্বন্দ্বে মত্ত হইয়া উঠে। ঝটিকাপ্রবাহে কত কুসংস্কার কোথায় উড়িয়া গেল। অগ্নিদাহে কত দুর্বল বিশ্বাসের স্তম্ভ ধ্বসিয়া গেল। নানা সংশয়, নানা সন্দেহ, নানা যুক্তি তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিল। প্রশ্ন উঠিল, ক্ষীণকলেবর জটাচীরধারী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ, যে অস্থিচর্মসার হইয়াও আপনার উপলব্ধ সত্যকে অবিনাশী ঘোষণা করিয়া আনন্দের আবেশে জগৎ-প্রান্তে নিঃসঙ্গ একাকী বসিয়া, সে কি এখনো জীবিত? ধর্ম এবং নব্যবিজ্ঞানের প্রবল দ্বন্দ্বে দিশাহারা হইয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কেহ বা পাশ্চাত্য-প্রথাবলম্বনে জাতীয় প্রাণশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কেহ বা বিপদ না বুঝিয়া নির্বিকার ছিলেন, কেহ বা ভয়-চকিত হৃদয়ে দিন যাপন করিতে ছিলেন। তখন কেহই জানিতেন না যে দক্ষিণেশ্বরে ভাগরথীতীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক নূতন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারের কোনো রঙে রঞ্জিত হয় নাই, এমন

একটি নিরপেক্ষ মুক্ত মন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে। সেজন্য মা কালীর এক তরুণ পূজারী আপনার সর্ব-প্রভাবমুক্ত নিষ্কলুষ হৃদয় পাতিয়া দিয়াছেন। সত্যকে যাচাই করিবার এক অতি প্রাচীন অথচ অতি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেন শুরু হইয়াছে। এক নূতন শক্তি সকলের অগোচরে আপনা হইতে গড়িয়া উঠিতেছে—অকর্ষিত মৃত্তিকায় যার জন্ম, মুক্ত আকাশের আলোতে যার পরিপুষ্টি, যা কারো হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নয়, কারো অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত নয়, কারো মতবাদে প্রভাবিত নয়।

সেদিনকার দার্শনিক পণ্ডিতের বাদবিসংবাদ-মুখরিত তর্কের জগৎ এবং বৈজ্ঞানিকের নানা-সূত্রবিজড়িত বস্তুপুঞ্জময় 'যন্ত্রবৎ' পদার্থজগৎ উভয়ের প্রতিই দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যলাভের জন্য হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া অন্তর্জগতের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। সেখানে কত কি ঘটিতে থাকিল—তাহার খবর কতটুকু আর আমাদের জানা আছে? এইকালে দীর্ঘ বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার অন্তর্জগতে যে সব ক্রিয়াকলাপ চলিয়াছিল, তাহারই কিছু প্রতিচ্ছবি বস্তুজগতে অভিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। তখন যাঁহারা তাঁহার চারিপাশে ছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ এই সব প্রতিচ্ছবি দেখিয়া হতাশ হইয়াছেন, কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছেন, আবার কেহ বা অমৃতলোকের আভাস পাইয়া রোমাঞ্চিতও হইয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন দিনের পর দিন কিসের অন্বেষণে তাঁহার অন্তর যেন দ্বিধায় কম্পমান, গভীর গোপন হৃদয়-বেদনা-ভার বুকে লইয়া তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্ত, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কখনো কম্পিত, কখনো স্ফীত, বক্ষস্থল আরক্তিম, শরীর উত্তপ্ত, বদনমণ্ডল জ্যোতির্ময়। তিনি কখনো পিশাচবৎ, কখনো বা বালকবৎ। কখনো বসিয়া আছেন যেন নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা, কখনো আনন্দের ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে যেন বর্ষার দুকূলপ্লাবী গঙ্গাপ্রবাহের মতো। কখনো তাঁহার দিব্য অঙ্গ হইতে বস্ত্রখণ্ড স্খলিত, কখনো তিনি উন্মাদ বলিয়া উপহসিত, কখনো বা জীবনমরণের মিলন-রেখার উপর দাঁড়াইয়া। সত্যলাভের জন্য জীবনের কৈশোরকালেই এই পৃথিবীর ভোগসুখ, নামযশ, প্রতিষ্ঠার দুর্দমনীয় আকর্ষণ যিনি নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছিলেন, এইবার তিনি একদিন ইহজীবনের শেষ আশ্রয় প্রাণটুকু পর্যন্ত পণ রাখিয়া পরম অভিমানভরে ভব-তারিণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। যে সত্য না থাকিলে বস্তুজগৎ অর্থহীন, জীবন উদ্দেশ্যহীন, এই বিশ্বপ্রকৃতি প্রলাপের ফেনপুঞ্জমাত্র, সেই সত্য আপন স্বরূপে যদি উদ্‌ঘাটিত না-ই হইল, তবে এ জীবন রাখিয়া লাভ কি? ইহার এখনই অবসান হউক! সর্ববন্ধনছিন্ন সর্বকলুষ-মুক্ত অকপট হৃদয়ের স্থিরসংকল্পের নিকট সহসা মনবুদ্ধির, স্থানকালের বেড়া ভাঙ্গিয়া গেল, প্রবহমান স্থূল জগৎ যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, নিমেষে লুপ্ত হইয়া গেল—শ্রীরামকৃষ্ণ "এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের ঊর্মিমালা"-র দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেন, সে চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রে মিলিয়া গেলেন।

কিন্তু এ সকলি অক্ষরের পর অক্ষর সাজাইয়া আমাদের ভাষায় আমাদের বুঝিবার মতো একটি বর্ণনামাত্র। আসলে কি ঘটিয়া-ছিল, সেই চেতনাসাগরের তলদেশে যাঁহারা নামিয়াছেন, তাঁহারাই শুধু তাহা অনুভব করেন। অনুভব করেন, কিন্তু ভাষায় আমাদের বুঝাইতে পারেন না। আভাসে যেটুকু বোঝানো

সম্ভব, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখেই তাহা বলিয়াছেন। সে বাণী হইতে আমাদের বোঝা, সে যেন কোন আবৃত স্থানের ঘটনার বাহিরে দাঁড়াইয়া বাহিরে উহার ফলাফলের যেটুকু প্রকাশমান সেটুকু দেখিয়াই ভিতরের ঘটনাসম্বন্ধে অনুমান করা।

ফলাফল খতাইলে দেখা যায় অন্তর্জগৎ হইতে রামকৃষ্ণ যখন আমাদের স্থূল জগতে নামিয়া আসিলেন তখন তাঁহার দিব্যজীবন হইতে আনন্দলোকের সুধা ঝরিয়া পড়িতেছে। অনাবিল আনন্দের শিহরণে মানুষের দগ্ধ প্রাণ আবার মঞ্জুরিত হইয়া উঠিল। বেদবেদান্তের দুরূহ তত্ত্ব নূতন আলোকে প্রকাশিত হইতে লাগিল। শাস্ত্রের যে উক্তি মানুষের বুদ্ধিতে এতদিন খাপ খায় নাই, তাহা এখন মিলিয়া যাইতে লাগিল। যে জড়বাদ প্রবলহস্তে ধর্মের ভিত্তি টলাইয়া দিতেছিল, তাহার হস্ত শিথিল হইয়া আসিল। নানা তত্ত্বের বিরোধ মীমাংসিত হইল—নানা মত, নানা পথ, যেগুলিকে এতদিন বিভিন্ন লক্ষ্যাভিমুখী বলিয়া মনে হইতেছিল, সেগুলিকে একই লক্ষ্যাভিমুখী বলিয়া বোঝা গেল। জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তর্কের যে ধূম্রজাল উঠাইয়াছিলেন তাহা ছিন্ন করিয়া নূতন জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতেছে ততই সেই আলো উজ্জ্বলতর, এবং অধিকতর পরিব্যাপ্ত হইতেছে।

আজিকার এই জগৎ বিজ্ঞানচেতনাসমৃদ্ধ যুক্তিবাদীর জগৎ—বিচারশীল বুদ্ধির জগৎ। তাই যুক্তি বুদ্ধি বিচারশীলতার নানা মাপকাঠি দিয়া আধুনিক জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। নানা পরীক্ষকের মূর্তিতে সে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিয়াছে, যাহার মধ্যে সর্বপ্রধান, সর্বাধিক কঠোর পরীক্ষক নরেন্দ্রনাথ। সকল পরীক্ষার শেষে আধুনিক জগৎকে অকপটে স্বীকার করিতেই হইয়াছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য—একটি অলৌকিক ঘটনা যাহা আমাদের যুক্তি বুদ্ধির সঙ্গে মিলিয়া গেলেও, বাস্তব বিচারের গণ্ডীর সীমা পর্যন্ত উহার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিলেও সে সীমা ছাড়াইয়া বহু বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। এ যেন বোঝা যায় না অথচ মনপ্রাণ বিগলিত হয়,—ধরা যায় না অথচ মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

আমরা শুনিয়াছি বেদ অলৌকিক—অপৌরুষেয়, অর্থাৎ অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, কোন মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, অথবা মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত (invented) নয়। তবে কোথা হইতে সেই জ্ঞানের উদ্ভব? সত্যদ্রষ্টাগণ বলেন, ভগবানই সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারী। ভগবানের সঙ্গে যাঁহারা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই এ জ্ঞান আমাদের দ্বারে আনিয়া দিয়াছেন। তাই এই জ্ঞানরাশি সর্বকালে সর্বধর্মের সার্বজনিক ভিত্তিভূমি। কোন্ অনাদি অতীতে সেই জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশে উৎসারিত হইয়াছিল এবং সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণকর্তৃক বিধৃত হইয়া শিষ্যপরম্পরায় মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। দীর্ঘদিন মানুষ এই অনাদি অপৌরুষেয় জ্ঞানের কথা শুনিয়া আসিয়াছে কিন্তু জ্ঞান কেমন করিয়া অপৌরুষেয় হইতে পারে এবং তাহার প্রমাণ-ই বা কি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বুঝি সকল সংশয় মোচন করিয়া সেই প্রমাণকে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্যই দীর্ঘ দিবস অন্তে পবিত্র জাহ্নবীর পূর্বউপকূলে আবার সেই অনাদি বেদজ্ঞান অন্যনিরপেক্ষ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আপনা আপনি

উৎসারিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মানুষ যখনই ভুলিয়া যায়, তখনই এরূপ ঘটনা ঘটে। এই প্রায়-নিরক্ষর ভবতারিণীর পূজারী ব্রাহ্মণ কারো শিষ্য নয়, কারো ছাত্র নয়, কারো হাতে-গড়া মানুষ নয়—জগজ্জননী হইতে উৎসারিত জ্ঞানের সংহত মূর্তি—স্বয়ম্ভূ শ্রীরামকৃষ্ণ। এই জ্ঞান বিতরণের সময় নিজ ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানের রাশ ঠেলিয়া দিতেন মা স্বয়ং।

সার্থক বাণী*

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

যত না সুন্দর হোক সেই বাণী
ব্যর্থ হবে সব
যদি নাই অনুরূপ ক্রিয়া,
ব্যর্থ যেন
গন্ধহীন পুষ্প মুকুলিত !

সুন্দর বাণী
সর্বথা সফল আর সার্থক হয়
যদি থাকে
অনুকূল কর্মেতে সংযুত,
সফল হয় যেন
সুন্দর পুষ্প সুরভিত !

* 'ধম্মপদ' অবলম্বনে

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ
২৬ আশ্বিন, সোমবার
(1925)

কল্যাণীয়া মায়ী,

আজ তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তোমার দিদির পত্র পাইয়াছি। ঠিকানা দেয় নাই সেইজন্য তাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। খুকীমায়ীর পত্র পাইয়াছি, ঠিকানা দিয়াছিল, আমি তাকে উত্তর দিয়াছি। এখানকার সকলে ভাল আছেন। আমিও ভাল আছি। আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাবে। খুব সম্ভাবনা ২রা কার্ত্তিক সোমবার এখান হইতে রওনা হইব, ৩রা কার্ত্তিক নারায়ণগঞ্জ। আজ সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

২

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

ঢাকা মিশন
মঙ্গলবার, ৭ই পৌষ
(1925)

কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী,

মায়ী, আমি তোমার পত্র ঢাকাতে আসিয়া পাইয়াছি ও তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী হইয়াছি। বালিয়াটীতে মাসখানেক ছিলাম। এখানে গত শুক্রবার রাত্রে আসিয়াছি। সময় সময় সর্দ্দি লাগে, জলের উপর যাওয়া আসা—সেইজন্য।

গত রবিবার তোমার বাবা এইখানে বৈকালবেলা আসিয়াছিলেন। তোমাদের বাড়ীর ও খুকীরা সব ভাল আছে জানিবে।

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জন্মোৎসব ২৬শে পৌষ। সেই অবধি ঢাকাতে থাকিব। তার পর নারায়ণগঞ্জ ও সোনার গাঁ আশ্রম হইয়া বেলুড় মঠে চলিয়া যাইব। ইচ্ছা মাঘ মাসেতে কলিকাতা যাইব।

মায়ী, আশা করি শারীরিক ভাল আছ। যদি সুবিধা হয় তো কারো সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ দেখে আসবে। আহিরীটোলা থেকে যাতায়াতের একখানা নৌকা হইলে ভাল হইবে। বেশি হাঁটতে হইবে না। নৌকার ভাড়া দক্ষিণেশ্বর অবধি, সম্ভাবনা ১৷০ কি ২৲ টাকার মধ্যে হইবে।

আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবে। সকলকে জানাবে। কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

The Ramkrishna Mission Sebashram
Narayanganj
২২শে মাঘ (1926)

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভাদেবী,

মায়ী, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম। সোনার গাঁ তোমার দিদির পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাকে আমি উত্তর দিয়াছি। কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছি। আমার শরীর বড় অসুস্থ। ঢাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের দিন সকালে তথায় যাইব এবং বৈকালে চলিয়া আসিব এরূপ ইচ্ছা। মায়ী, তুমি ভুলে যাও কেন? পূর্ব পূর্ব পত্রে তোমায় কত লিখিয়াছি তোমার উপকারের জন্য। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্। মায়ী জানিয়া রাখিবে নামেতে কালপাশ কাটে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য আর এক জনকে দিয়া লিখাইলাম। আমার অসুখের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিব।

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা সকলকে জানাবে এবং জানিবে। সাক্ষাৎ মত সকল বলিব।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

৪

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

অদ্বৈতাশ্রম
১৮২/A, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মঙ্গলবার, ১০ই ফাল্গুন
(1926)

কল্যাণীয়া মায়ী,

আমি আজকাল পূর্বাপেক্ষা ভাল আছি। এখন কয়েকদিন এইখানেই থাকিব, পরে বেলুড় মঠে যাইব। ডাক্তার বলিয়াছেন শীঘ্রই সমস্ত সারিয়া যাইবে। চিন্তার বিষয় কিছু নাই। গত রবিবার বেলুড় মঠে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। এক লক্ষর উপর লোক হইয়াছিল। গান, বাজনা, কালীকীর্তন হইয়াছিল। একএক বারে লোক খাইতে বসিয়াছিল ৪।৫ হাজার। ইষ্টিমার বড়বাজার হইতে বেলুড় মঠে সমস্ত দিন, রাত্র ৮।৯ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। আনন্দের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গেল। আমাকে এখন খাইতে দেয় রুটি ও দুগ্ধ; ভাত, ডাল, মিষ্ট জিনিষ নয়। সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

অবতারবাদ ও নরেন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তন

শ্রীরাধাশ্যাম দাস

নরেন্দ্রনাথ দত্ত তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের. যারা তখন হেনরি ডিরোজিও এবং পাদ্রী আলেকজেণ্ডার ডাফের নেতৃত্বে Young Bengal নামে খ্যাত তাদের, এবং পাশ্চাত্য জগতের বিখ্যাত দার্শনিকদের লেখার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেও সত্যের সন্ধান পাননি। অশান্ত মন, সত্যলাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো তাঁকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধকদের সঙ্গে পরিচয়লাভের পরও আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান না পেয়ে, ব্যাকুলতা ও অশান্তি আরও বেড়ে গেল।

এমন সময় একদিন প্রফেসর উইলিয়ম হেস্টির কাছে কবি Wordsworth-এর mysticism ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে শুনলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা - সমাধিমান পুরুষ তিনি। তারপর পরিচয় ঘটলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর একটা অজানা বস্তুপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে পরিণতির দিকে ক্রমে টেনে নিয়ে গেল। তবু একটা সিদ্ধান্তে কিন্তু তাঁর মন ছিল সন্দেহের দোলায় দোলায়িত। মানুষের মধ্যে ভগবান জন্মলাভ করেন, একথা বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সম্মত হয়নি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বটে—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"; তবু তৎকালে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক নরেন্দ্রনাথ যুক্তি দিয়ে সেকথা গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ভগবান মানুষরূপ ধরে আসেন, একথা বিশ্বাস করা কি করে সম্ভব? তিনি তো নিরাকার, অদ্বিতীয়, অবাঙ্‌মনসোগোচর, কাজেই—

"সাকার সম্বন্ধে প্রভু কন নিরবধি।
নরেন্দ্র তাহাতে হন ততই বিরোধী॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অখিল-ঈশ্বর।
অতি তুচ্ছ পঞ্চভূত খাঁচার ভিতর॥
কখন সম্ভবপর হইতে না পারে।
মানুষে ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞানহীনে করে॥"[১]

বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ, পাশ্চাত্য মনীষীদের মতামত প্রভৃতিও আসল বস্তুর কোন সন্ধান দিতে সক্ষম হোল না।

এমনিভাবে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া ক্রমে বৃদ্ধি পেলো। পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হয়ে, কেবলমাত্র তাঁরই উপাসনা ও ধ্যান করবেন, এ মর্মে ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার-পত্রে তিনি সই করেও দেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ দেখলেন, সহপাঠী ও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাখালচন্দ্র (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেবীবিগ্রহকে প্রণাম করছেন। সত্যপরায়ণ নরেন্দ্রনাথ উহাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে রাখালচন্দ্রকে তীব্র অনুযোগ করে বললেন—"ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়া পুনরায় মন্দিরে যাইয়া প্রণাম করায় তোমাকে মিথ্যাচারে দূষিত হইতে হইয়াছে।"[২] দক্ষিণেশ্বরে এলেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থ পাঠ করতে দিতেন। নরেনের চোখে ঐ গ্রন্থাদি নাস্তিক্যদোষে দুষ্ট বলে মনে হোত।

১ কথামৃত পুঁথি—পৃঃ ৩২৮
২ নরেন্দ্রনাথ ও দিব্যভাব—পৃঃ ১৩৪

তিনি স্পষ্টই বলতেন—"ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা আর অধিক পাপ কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় পদার্থ সবই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি হইবে? গ্রন্থকর্তা ঋষি-মুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কেন?"[৩] নরেন্দ্রনাথ এ তত্ত্বও মানেন না, আবার মানে না যে ঈশ্বর মনুষ্যদেহ লইয়া অবতীর্ণ হন। ঠাকুরের ভারী ইচ্ছা যে শেষোক্তটি সম্বন্ধে গিরিশের সঙ্গে নরেনের বিচার হয়, কারণ গিরিশের পূর্ণ বিশ্বাস ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন। গিরিশের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের এ প্রসঙ্গে অনেক কথা হোল। নরেন্দ্রনাথ বললেন "ঈশ্বর অনন্ত, তিনি সকলের ভিতরেই আছেন—শুধু একজনের ভিতরে এসেছেন এমন নয়। তিনি আবাঙ্-মনসোগোচর ইত্যাদি।"[৪] তারপর ঘোরতর তর্ক; Infinity তার কি অংশ হয়? আবার Hamilton, Herbert Spencer, Tyndal, Huxley কে কি বলে গেছেন ইত্যাদি প্রসঙ্গও হোল। নরেন্দ্রনাথের অবতারবাদে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। তবু দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অদ্বৈততত্ত্ব মানেন না, অবতার মানেন না, মা কালীকেও মানেন না। তবু ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসার বিরামও নেই। একদিন ঠাকুর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'মাকেই যখন মানো না, তখন কেন এখানে এস?'—নরেন বললেন, 'এখানে আসতে হলে মাকে মানতেই হবে নাকি?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ, কিছুদিনের মধ্যে মাকে শুধু মানা নয়, মায়ের নাম শুনলেই চোখে জল আসবে।' —"Why do you come here, if you do not want to acknowledge my Mother?" Ramkrishna asked him, "Must I acknowledge Her, if I come?" replied Naren. "Well," said the Master, "several days hence you will not only accept Her, but you will weep at the mention of Her name."[৫]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়লাভের পর নরেন্দ্রনাথ শুনলেন "বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, Science সব খড়কুটো বোধ হয়।"[৬] আরও শুনলেন—"যতক্ষণ না হাটে পৌঁছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পৌঁছলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে, 'আলু নাও, পয়সা দাও।"[৭] আবার "হালদারপুকুরে বড় মাছ আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছের খানিকটা একবার দেখা গেলো। মাছটা ধপাং করে উঠলো। যখন দেখা গেল, তখন আরও আনন্দ।"[৮] "সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই কি নেশা হয়? গায়ে মাখলেও নেশা হয় না,

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, নরেন্দ্রনাথ ও দিব্যভাব—পৃ: ১৩৭

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১।২৬২

৫ The Life of Ramakrishna—Romain Rolland.

৬ 'কথামৃত'—১।২২২

৭ ঐ —১।২২৩

৮ ঐ —৪।৩২৮

কুলকুচো করলেও কিছু হবে না। সিদ্ধি এনে বেঁটে খেলে তবে নেশা হয়।"[৯] শুনলেন, ডুব দাও; ওপর ওপর ভাসলে বস্তুলাভ হয় না; ভগবান লীলা করার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেন ক্ষুদ্র জীব তা বুঝতে পারে না, ইত্যাদি। ঠাকুর একদিন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সেই অনন্তের আভাস দেবার জন্য বললেন—"সেখানে যেতে পথের দু'ধারে থোলো থোলো রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ ঝুলছেন। এক এক কৃষ্ণের থোলোতে এত কৃষ্ণ আছেন, এক এক রামের থোলোতে এত রাম আছেন যে গণনাতে অনন্ত। একটি থোলোর একটি কৃষ্ণ এসে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। একটি থোলোর একটি রাম এসে অযোধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।…ভগবান একাধারেও যেমন অনন্ত, অনন্তাধারেও তেমনি অনন্ত।"[১০]…"হতভাগ্য জীব এমন দিশেহারা, এমন কানা, এমন বধির যে, সে গিলটীর কামকাঞ্চন ছাড়া সাক্ষাৎ কাঁচা সোনা ভগবানের দিক দিয়েই যাবে না, সে রূপই দেখবে না, তাঁর কথাই শুনবে না। জীব একান্ত বেবাগ হলে দয়ার সাগর স্বয়ং মূর্তি ধরে মানুষের মত হয়ে বাগ মানাতে আসেন; তবু কি চোখ দিয়ে দেখে? ভগবান দয়ার ভরে অস্থির; সুতরাং তাঁকে নিজের দায়ে জীবের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বাগ মানাতে যেতে হয়, তখন জীব ভগবানকে পাগল জ্ঞানে উড়িয়ে দেয়।"[১১] সে সময় ঠাকুর যা কিছু দর্শন করেন, প্রত্যক্ষ করেন, নরেন্দ্রনাথের হিসাবে তা সবই অবাস্তব, কল্পনামাত্র। শুধু ঠাকুরের মাথার খেয়াল।

এর পরই পুঁথির রাজ্য ছেড়ে অনুভূতির রাজ্যে হোল নরেন্দ্রনাথের ক্রমপদক্ষেপ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে যোগিরাজ নরেন্দ্রনাথের আমূল পরিবর্তন সংসাধিত হোল মনোরাজ্যে ও জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

এ কথা ক্রমে বাস্তবরূপে প্রতিভাত হতে লাগল নরেন্দ্রনাথের মাঝে। "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" এবং "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" আর শাস্ত্রবাক্যরূপে পুঁথিতে সীমাবদ্ধ না থেকে আত্মপ্রকাশে "মধুক্ষরণ" করতে শুরু করলো—যদিও নরেন্দ্রনাথের 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বং চ ময়ি পশ্যতি' ভাবে ভাবিত হতে সময় লেগেছে প্রায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের শেষ পর্যন্ত। মাকালীর দর্শন লাভ এবং নির্বিকল্প সমাধিরও পর তাঁর এসেছে অবতারবাদে পূর্ণ বিশ্বাস।

১৮৮৫ খৃঃ ৭ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের মধ্যে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন--"এখানে অপর লোক নাই, তোমাদের একটা গুহ্য কথা বলছি। সে দিন দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল, এসে বললে "আমিই যুগে যুগে অবতার।"[১২] দেখলাম "পূর্ণ আবির্ভাব—তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।" এর পরও পূর্ণ বিশ্বাস হতে প্রায় বৎসরাধিককাল লেগেছে। তখনও সন্দেহের পূর্ণ অবসান হয়নি। কোথায় যেন তখনও একটু সন্দেহ বাসা বেঁধে রয়েছে। সত্যি কি শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার? ভগবান কি মনুষ্যদেহ

---

৯ 'কথামৃত'—৪।২৫১, ১।১৯৪

১০ শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১০৬

১১ শ্রীরামকৃষ্ণমহিমা—অক্ষয়কুমার সেন পৃঃ ১০০-১০১

১২ 'কথামৃত'—৩।১৭৫

ধারণ করে ঠিক মানুষের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করেন? রোগ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণায় আমাদেরই মত কাতর হন? এ সন্দেহেরও অবসান হোল শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পূর্বে।

১৮৮৬খৃঃ ১৫ই মার্চ কাশীপুর বাগানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে চিকিৎসার্থ আছেন। কথা বলতে কষ্ট হওয়াতে কখনও আস্তে আস্তে কখনও বা ইসারায় কথা কইছেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, মাষ্টার, লাটু, সিঁথির গোপাল ও ডাঃ মহেন্দ্র সরকার উপস্থিত আছেন। পূর্ব-রাত্রে দেহের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ভক্তবৃন্দ বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করে আছেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পরে বললেন—"তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।" আবার বললেন—"বাউলের দল হঠাৎ এলো—নাচলে গান গাইলে আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো-গেলো কেউ চিনলে না।"[১৩] নরেনকে লক্ষ্য করে বললেন, "আচ্ছা আমার কি ভাব?" "দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।" "কি বুঝলি?" নরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—"যা কিছু অর্থাৎ যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে।"[১৪]

অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ডাঃ সরকারকে লক্ষ্য করে সস্নেহে বললেন—

"বিশেষিয়া কন প্রভু ডাক্তারের প্রতি।
সপ্রেম সম্ভাষ ভাষে বিনয় সংহতি॥
এতকাল সম্ভোগিলে বহু পরিমাণ।
টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান॥
এইবার দাও মন ঈশ্বরচরণে।
উদ্দীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে॥"[১৫]

ভক্ত-ভগবানে এমনি কথাবার্তা চলছে। কিয়ৎক্ষণ পর ডাঃ সরকার চলে যাবার উদ্যোগ করতেই গিরিশবাবু প্রবেশ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের পদধূলি মাথায় নিলেন। তখন ডাঃ সরকার গিরিশবাবুকে ঈশ্বরের পূজা মানুষের মধ্যে করার প্রতিবাদ করায় উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি চলতে থাকে। তখন নরেন্দ্রনাথ আর চুপ করে থাকতে পারেননি। ভগবানের অবতারতত্ত্বে তিনি তখনো বিশ্বাস করেন না। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কি চক্ষে দেখেন তা প্রকাশ করলেন—ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের মতো :—

"বিস্ময় আহ্লাদ কুতূহল সমন্বিত।
ইঁহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত॥
সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে।
উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে হেন বস্তু আছে॥
যেই বস্তু দরশনে বুঝা নাহি যায়।
উদ্ভিদ বলি কি আমি প্রাণী বলি তায়॥
তেন নরলোক দেবলোকের মাঝারে।
হেন বস্তু আছে মোরা পাই দেখিবারে॥
যাঁর গুণ ধর্ম দৃষ্টে বুঝা বড় ভার।
নর কি ঈশ্বর নাম কিবা দিব তাঁর॥"[১৬]

নরেন্দ্রনাথ বহুদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছেন যে, যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ হয়ে এসে-ছিলেন, তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণরূপে এসেছেন। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। কাশীপুর উদ্যানে রোগের যন্ত্রণায় ঠাকুর অস্থির, ভাতের তরল মণ্ডও গলাধঃকরণ হচ্ছে না, তখন একদিন

১৩ 'কথামৃত'—৩।৩৫৯
১৪ ঐ ৩।৩৬২
১৫ 'পুঁথি' পৃঃ ৫৮৯
১৬ 'পুঁথি'- পৃঃ ৫৯০

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট বসে আছেন, আর ভাবছেন এ যন্ত্রণার মধ্যে যদি তিনি বলতে পারেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, তাহলে বিশ্বাস হয়। চকিতের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে বিস্ময়ে অভিভূত করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন —"এখনো অবিশ্বাস! যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"[১৭] নরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হলেন। পরবর্তীকালে এই নরেন্দ্রনাথই (তখন স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে শুধু অবতার নয়, "অবতারবরিষ্ঠ" বলে ঘোষণা করেছেন।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ হয়েছেন বিবেকানন্দে রূপান্তরিত। তাঁর আমেরিকায় অবস্থান-কালে ইংরেজীতে তাঁর ভক্তিযোগ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি অবতার সম্বন্ধে বলেছেন, "...... These teachers of all teachers represent God himself in the form of man. They are much higher; they can transmit spirituality with a touch, with a wish, which makes even the lowest and most degraded characters saints in one second,"......"They are the teachers of all teachers; the highest manifestation of God to man; we cannot see God except through them. We can not help worshipping them; and they are the only beings we are bound to worship."[১৮] ঈশ্বরই অবতাররূপে আমাদের কাছে আসেন। যদি ঈশ্বরদর্শন করতে আমরা চাই তাহলে অবতার-পুরুষের মধ্যেই তাঁকে দর্শন করব। যতক্ষণ আমাদের মনুষ্যদেহ ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের যদি পূজা করি, তবে একমাত্র অবতার-পুরুষেরই করতে হবে। হাজার লম্বা কথা কও ঈশ্বরের মনুষ্যরূপ ব্যতীত চিন্তাই হয় না। তাই চিকাগোতে স্বামীজী Lecture on Hinduism-এ বললেন—"My brethren, we can no more think about anything without a meterial image than we can live without breathing." ঈশ্বরই অবতার-রূপে আমাদের কাছে আসেন। ঈশ্বর আমাদের মধ্যেও আছেন কিন্তু অবতার-পুরুষের মধ্যেই তাঁর বেশী প্রকাশ। যেমন আলোর স্পন্দন সর্বত্রই আছে তবুও বড় বড় দীপ জ্বেলেই অন্ধকার দূর করতে হয়। ১৯৮০ খৃঃ Californiaতে Los Angeles নামক স্থানে স্বামীজী "Chr'st the Messenger" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি সেখানে ভগবানকে দর্শন করতে হলে যে মানুষের মধ্যেই দর্শন করতে হবে সে সম্বন্ধে বলেন—"The vibration of light is everywhere, omnipresent; but we have to strike the light of the lamp before we can see the light. The Omnipresent God of the Universe cannot be seen until He is reflected by these giant lamps of the earth,—the Prophets, the man-gods, the Incarnations, the Embodiment of God."[১৯]

ঠাকুর বলতেন, "ভগবানকে মানুষের মধ্যে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এসেই ধর্মস্থাপন করতে হয়।" আমেরিকা গিয়ে কামকাঞ্চনে আকণ্ঠনিমগ্ন আমেরিকাবাসীদের স্বামীজী শোনালেন যীশুর বাণী "He that hath seen me hath seen the Father; believest

১৭ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু. পৃঃ ১।১৪৭
১৮ C. W. Swami Vivekananda—4|27

১৯ C. W. Swami Vivekananda—4|135

thou not that I am in the Father, and the Father in me ? The words that I speak unto you I speak not myself ; but the Father that dwelleth in me, he doeth the works."[২০] পূর্ববর্তী অবতারপুরুষগণের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে স্বামীজী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করলেন অবতারবরিষ্ঠ বলে। তিনি তাই বললেন "Such a man was born and I had the good fortune to sit at his feet for years···. He was a strange man—this Ramakrishna Paramhansa···Let me now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfilment of Indian sages, the sage for the time, one whose teaching is just now, in the present time, most beneficial...The son of a poor priest···today is worshipped literally by thousands in Europe and America and tomorrow will be worshipped by thousands more."[২১]

বেদান্তবাদী নরেন্দ্রনাথ অবতারবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ দিব্য সাহচর্যে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" আর শুধু গীতার কথাই ছিল না, জীবন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে—Who was the embodiment of Kali the Mother. স্বামীজী প্রথম দিকে শুধু এই মা কালীর মন্দিরে প্রণাম করাই নয়, মন্দিরে যাওয়াটাকেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। এদিকে আবার ঠাকুর—

"যখন যে ভাগ্যবান প্রভু দেখিবারে।
আসিতেন ভক্তিসহ দক্ষিণ সহরে ॥
প্রায় অধিকাংশে বলিতেন ভগবান।
শ্রীমন্দিরে কর অগ্রে মায়েরে প্রণাম ॥"[২২]

তা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ প্রতিমায় বিশ্বাস করতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি মা কালীর প্রতি বরং অশ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করতেন। 'মা কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই' বলতেন। তাই ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—"তুই আর এখানে আসিস না।"[২৩] কিন্তু সে পটপরিবর্তন কবে হয়ে গেছে ! এখন ঠাকুরই মা কালী !

২০ New Testament, St. John
২১ C. W. of Swami Vivekananda—3|267-68
২২ 'পুঁথি'—পৃ: ২৩৬
২৩ 'কথামৃত'—৪,৬৬

সমালোচনা

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ : জীবন ও বাণী : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ; পৃ: ৭৮+৮ ; মূল্য দুই টাকা।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী প্রকাশনের অন্যতম অঙ্গরূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জ আশ্রম সরল সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ এই মহাপুরুষের বহিঃপ্রকাশের চেষ্টামাত্রশূন্য নির্জন তপস্যার কিছু পরিচয় বহন করছে ; আবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের রূপকল্পে বিজ্ঞানানন্দ-জীবনসাধনার আর এক পরিচয়। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের (Science) প্রত্যক্ষ চর্চায় স্বামী বিজ্ঞানানন্দই সবচেয়ে অগ্রণী, আবার পরমসত্যস্বরূপ যে বিজ্ঞান, শ্রীরামকৃষ্ণ-আশীর্বাদপূত জীবনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহৎ অধিকারী। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষবাদ তাঁর জীবনে ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধির পথে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। প্রাচীন ও আধুনিকের এক অপূর্ব সমন্বয়মূর্তি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এই ছোট্ট জীবনী-গ্রন্থখানিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার নির্মল পটভূমিকায় স্থাপন করে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর কল্লোল সঞ্চার করেছেন—সাহিত্যকৃতির দিক থেকে এ সত্যিকার বিস্ময় ও আনন্দের কথা। আমরা আশা করব, অদূর ভবিষ্যতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে শ্রদ্ধেয় লেখক বাংলাসাহিত্যের জীবনীশাখাটি আরো সমৃদ্ধ করে তুলবেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরে বিজ্ঞানানন্দজীর বাণী-সংকলন—এ দুয়ের বিন্যাসে গ্রন্থপরিকল্পনা সার্থক। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সত্ত্বেও একান্ত বহিরঙ্গ প্রকৃতিকে জয় করাই যে মানব-জীবনের সার্থকতা নয়, যথার্থ প্রকৃতি-জয় যে ভারতের অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্লোকেই নিহিত, সেকথাটি পূর্বজীবনে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের ছাত্র, পরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জীনিয়ার এবং সর্বশেষে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—এই বিচিত্র জীবনধারায় প্রবাহিত শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদের জীবনে সুপ্রমাণিত। যাঁরা তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখার সৌভাগ্য পেয়েছেন, তাঁরাই জানেন তাঁর শালপ্রাংশু মহাভুজ বিরাট দেহে কী বিপুল ও গভীর অধ্যাত্মশক্তি ও প্রশান্তি নিহিত ছিল। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর জীবনী সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে সমভাবে আকর্ষণীয়।

প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স তাঁদের সুরুচি-সম্মত প্রকাশনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করেছেন। নয়নাভিরাম প্রচ্ছদটি শিল্পী শ্রীবিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তীর শিল্পপ্রতিভার যোগ্য প্রতিনিধি। প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা—স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর অনূদিত সূর্যসিদ্ধান্ত, (যেটি একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল), রামায়ণের অনুবাদ বা অন্যান্য রচনাবলী একত্রে 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ-গ্রন্থাবলী' রূপে প্রকাশের পরিকল্পনা কি তাঁরা করেছেন ? মনে হয়, এ বিষয়ে অবিলম্বে মনো-যোগী হওয়া প্রয়োজন। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

।৩। (তিন খণ্ডে) —স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ-বাসুদেবানন্দ সঙ্ঘ, ৬৪এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ তিন খণ্ডের পৃষ্ঠা যথাক্রমে: ৬৮৮, ৬০১, ৫৩৪ এবং সমবেত মূল্য ত্রিশ টাকা।

অত্যন্ত জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, গীতা—এই ত্রয়ীকে বলা হয় প্রস্থানত্রয়; ইহাই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা 'স্মৃতিপ্রস্থান'-নামে প্রখ্যাত।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের আলোকে গীতার অনুপম ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের গীতাভাষ্যই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুসঙ্গত বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অধিকাংশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বহুকাল পূর্বে রচিত এই ভাষ্যে দেখা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকও প্রতিফলিত। সত্যদ্রষ্টা আচার্য সূক্ষ্মদূরদৃষ্টিবলে ও প্রজ্ঞাসহায়ে যে-সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেগুলি অতি-আধুনিক প্রজ্ঞাবানেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

স্বামী বাসুদেবানন্দ আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে ভিত্তি করিয়া এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য: গীতার মূল শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ, মূল শাঙ্কর ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষ্য-বিভাগ, বিস্তৃত তাৎপর্য-নির্ণয়, শাস্ত্রদৃষ্টি তথা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা শঙ্কর-বিরোধী ভাষ্যসমূহের খণ্ডন এবং শাঙ্কর ভাষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন।

এই গ্রন্থে ভগবদ্‌গীতার শাঙ্কর ভাষ্যের ােবে যেরূপ বিভাগ করা হইয়াছে, সেরূপ অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এই ভাষ্যবিভাগে এবং ভাষ্যের উদ্দেশ্য- ও তাৎপর্য-প্রদর্শনে লেখক অসাধারণ মননশীলতা ও অনুধ্যানের পরিচয় দিয়াছেন। শাঙ্কর ভাষ্যের সুদীর্ঘ এবং যুক্তি-সমৃদ্ধ জটিল দুর্বোধ্য স্থানগুলি প্রজ্ঞার আলোকে যেভাবে সহজবোধ্য হইয়া উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণকে চমৎকৃত করিবে। স্থানে স্থানে লেখকের নিজস্ব যুক্তিগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে; শাস্ত্রীয় রূপক-বিশ্লেষণের অভিনব প্রণালী দার্শনিক চিন্তাজগতে আলোক সম্পাত করিতে সমর্থ। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মহান্ ভাবের আলোকে লেখকের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সমুদ্ভাসিত।

এই বৃহৎ গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে নবম অধ্যায় পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে দশম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সংযোজিত। তৃতীয় খণ্ডে স্থান পাইয়াছে চারিটি পরিশিষ্ট। প্রথম পরিশিষ্টে 'বিষয় ও বিবৃতি সূচী' – আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে যে-সব বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন এবং গীতাব্যাখ্যাকালে লেখক যে-সব বিষয়ের বিবৃতি দিয়াছেন, সেগুলির সূচী। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে 'পদসূচী'—মূল গীতার প্রত্যেকটি শব্দ কোন্ অধ্যায়ের কোন্ শ্লোকে পাওয়া যাইবে তাহার বর্ণানুক্রমিক সূচী। তৃতীয় পরিশিষ্টে গীতার অন্তর্গত শ্লোক-গুলির বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে ষড়্‌দর্শনের এবং বৌদ্ধমত প্রভৃতির জ্ঞাতব্য বিষয় ও পারিভাষিক শব্দ-গুলি দেওয়া হইয়াছে। আচার্য শঙ্করের ভাষ্য বুঝিতে হইলে অন্যান্য মতবাদ সম্বন্ধেও উপযুক্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ শাঙ্কর ভাষ্যে পূর্বপক্ষে অন্যান্য মতবাদের উল্লেখ প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চতুর্থ পরিশিষ্টের শেষে মূল ও বঙ্গানুবাদ সহ দুইখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রদত্ত

হইয়াছে : (১) ভগবান শঙ্করাচার্য-বিরচিত 'পঞ্চীকরণসূত্রম্', (২) শ্রীকৃষ্ণযজ্বকোবিদবিরচিত 'মীমাংসাপরিভাষা'। চতুর্থ পরিশিষ্টটি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের মর্যাদা পাইবার যোগ্য।

মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ গ্রন্থের উপযোগী। বঙ্গভাষায় শাঙ্কর ভাষ্যের এই গ্রন্থ মূল্যবান সংযোজনরূপে গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত্যপূর্ণ সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি গ্রন্থাগারের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবে।

ঋগ্বেদ : (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—পরিতোষ ঠাকুর ও শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ২৯, সদানন্দ রোড, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০ + ৪৪ ; মূল্য প্রতি খণ্ড ৩৲।

ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ্ বেদ। বেদ-সম্বন্ধে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : "শাস্ত্র-শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিপদবাচ্য ; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যাহা মানবসাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য ; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে-পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তি-দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম বেদ।"

ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব—এই চারি বেদের মধ্যে ঋক্ বেদের নাম প্রথম উল্লিখিত। আমরা জানিয়া আনন্দিত বেদগ্রন্থমালা সিরিজে প্রথমে ঋগ্বেদ প্রকাশিত হইতেছে। ভারতীয় চিরন্তন ভাবধারার সহিত সম্যক্ পরিচিত হইতে হইলে ঋগ্বেদের অনুশীলন অপরিহার্য। সুধী সম্পাদকদ্বয় 'বেদার্থমঞ্জুষা' নাম দিয়া ঋগ্বেদ-সংহিতার অনুবাদকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের অষ্টম মন্ত্র পর্যন্ত আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত। প্রথমে ঋক্-মন্ত্র, পরে মন্ত্রের পদবিভাগ, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। শব্দার্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায় বিষয়বস্তু সাধারণ পাঠকগণেরও অনেকাংশে সহজবোধ্য হইবে বলা যায়। মূলগ্রন্থের সঙ্গে বৈদিক শব্দকোষ সংযোজিত হওয়ায় পাঠের অনেক সুবিধা হইয়াছে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। বাংলা ভাষায় বেদের সূক্তগুলির সুন্দর অনুবাদ দুর্লভ বলিলেই হয় ; এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে সে অভাব দূর হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

এই বৎসরের প্রথম হইতেই যে উদ্বাস্তুদের আগমন শুরু হইয়াছে, এবং এখনও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে, তাঁহাদের সেবায়। হাসনাবাদ ও বসিরহাটে রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাকার্য চালাইতেছেন। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে হাজারের উপর শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত এপ্রিল মাস হইতে জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই বিপন্ন নর-নারায়ণদের সেবাকার্যে ৫,৩০৮ কুইণ্ট্যাল ৩০ কেজি চাল, ৬:৮ কু: ডাল, ৭৪ কু: ৬১ কেজি আলু, ১৫৯ কু: পেঁয়াজ, ৩৭ কু: লবণ, ৩২৫ পা: বার্লি, ৪৫ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে।

সরকারের পক্ষ হইতে অন্যত্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে ও অস্থায়ী শিবিরে লোক-অপসারণের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। বর্তমানে (১৫ই জুলাই) হাসনাবাদ ও বসিরহাটে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০ জন।

কার্যবিবরণী

বোম্বাই খার-এ (Khar, Bombay-52 AS) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী (মার্চ হইতে এপ্রিল) প্রকাশিত হইয়াছে।

এই কেন্দ্রের কার্যধারা প্রধানত: চার ভাগে বিভক্ত: (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক, (২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩) চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়, (৪) জনহিতকর ও সেবামূলক।

মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমে দৈনিক পূজা, উপাসনা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আশ্রমের ত্যাগব্রতী সাধুগণই আশ্রমে ও বিভিন্ন স্থানে ধর্মালোচনা করেন। একাদশী তিথিতে নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন হয়।

১৯৬৭ ও ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব মহানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই কেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রথম আরম্ভ করা হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে নানা অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আশ্রমে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রাবাসে ৮০ জন করিয়া ছাত্র রাখা হইয়াছিল। গুজরাট, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের ছাত্র ভরতি করা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৫,৯৯৬। পাঠাগারে ১৩৯ খানি পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। পাঠকগণ পুস্তকাবলী ও পত্র পত্রিকার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেন। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৩,৬২৬ খানি পুস্তক গ্রাহকগণ পড়িতে লইয়া যান।

গত ৪ঠা মে হইতে ১৮ই মে, ১৯৬৮ পর্যন্ত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য অল্পকালস্থায়ী এক গ্রীষ্ম-নিবাসের (Summer Retreat) ব্যবস্থা

করা হয় ; ইহাতে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, দিল্লী ও গুজরাট হইতে কলেজের ছাত্রেরা যোগদান করে। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে 'মানুষ তৈরী', 'চরিত্রগঠন' প্রভৃতি বিষয়ে ৩৯ জন ছাত্র ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। ডক্টর পি. বি. গজেন্দ্রগদকর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি-দিবসে ভাষণ দেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়টি আশ্রমেই অবস্থিত। এখানে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে সুযোগ্য চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে। অ্যালোপ্যাথিক সেকশনে সার্জিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত প্রভৃতি বিভাগ অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ২,১১,২০৯ ও ১,৭৭,৬৩৫ জন রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বোম্বাই কেন্দ্র সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর ধরিয়া বোম্বাই নগরীতে এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবায় অকুণ্ঠভাবে নিরত রহিয়াছে। এই কেন্দ্র কর্তৃক এযাবৎ ২৬টি সেবাকার্য (Relief) বিস্তৃতভাবে অনু- হইয়াছে। দেশে যখনই কোন দৈবদুর্বিপাক যথা—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব ঘটে তখনই এই কেন্দ্র হইতে যথোপযুক্ত সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রতি কচ্ছে ও সুরাটে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইহাতে দশলক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই হইতে ১৭ই মে পর্যন্ত যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৫তম জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১৫ই মে তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন শ্রীনিরঞ্জনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর জেলার সাবজজ শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ঢাকা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র পাণ্ডে। স্বামী কালিকাত্মানন্দ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্বামী যোগদানন্দ, ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য, পণ্ডিত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়, শ্রীকান্তিনারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শ্রীমতী তরুলতা সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন। আরাত্রিকের পর শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষের পরিচালনায় ভক্তি-মূলক সংগীতানুষ্ঠান হয়। ১৬ই মে তারিখে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৫টায় শ্রীশীলব্রত বড়ুয়া মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পূর্বদিনের বক্তাগণ এবং অধ্যক্ষ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস বিশ্বসমস্যা-সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। আরাত্রিকের পর বেতারশিল্পী শ্রীব্রজগোপাল দাসের পরিচালনায় ভক্তি-মূলক সংগীত অনুষ্ঠি হয়। ১৭ই মে তারিখে সংগীত, পাঠ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পণ্ডিত শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। ঐদিন প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ

করেন। বিকাল ৪টায় পদাবলী-কীর্তন পরিবেশন করা হয়। আরাত্রিকের পর স্থানীয় বডি বিল্‌ডিং ক্লাবের যুবকগণ ও আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যায়ামকৌশল ও যোগাসন প্রদর্শিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। পরে সংগীত-শিল্পী শ্রীসতীশ সরকারের পরিচালনায় শহরের বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সংগীত অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

ডিব্রুগড়: বিগত ২৮শে জুন স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের প্রতিবেদনে প্রকাশ, সেবাসমিতি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর তিথিপূজা ছাড়া স্বামী সোমানন্দের তত্ত্বাবধানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করিতেছেন। বিগত বৎসরে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৬,৯৬৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৭ই হইতে ২৩শে জুন ১৯৭০ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব বিশেষ ভাবগাম্ভীর্য ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

১৭ই জুন স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দের উপনিষদ্‌-পাঠ উৎসবের উদ্বোধন করে। স্থানীয় ইন্‌ডিয়া ক্লাবে উক্ত ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শ্রীএইচ. কে. বরঠাকুর, আশ্রমপ্রাঙ্গণে ডিগবয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভুঁঞা এবং দুলিয়াজান অয়েল অডিটরিয়ামে অয়েল ইণ্ডিয়ার টেকনি-ক্যাল ম্যানেজার শ্রী সি. আর. জগন্নাথনের সভাপতিত্বে তিনটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভাত্রয়ে ক্রমান্বয়ে 'বহুত্বে একত্ব', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষা' এবং 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী অজ্জানন্দ ও স্বামী প্রণবাত্মা-নন্দ। উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সৌম্যানন্দ।

কলিকাতা শ্রীসারদা মঠের ডিব্রুগড় শাখার পরিচালিকা প্রব্রাজিকা শুদ্ধপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা বরদাপ্রাণা আশ্রমপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একটি মহিলাসভায় ভাষণ দেন।

তদুপরি উৎসবের অন্য আকর্ষণ ছিল রেডিও-শিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গাঙ্গুলী গীতিসুধাকরের রামায়ণ-গান এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা।

২১শে জুন রবিবার সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ ছিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ভজন-সঙ্গীত। নামসঙ্গীতে যোগদান করেন স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ এবং বামন গাঁও (দুলিয়াজান)-এর কীর্তনীয়া দল। ঐ দিন প্রায় চার হাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রতিদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র ধর্ম-পিপাসু ভক্তের আগমন ও আনন্দোৎসবে

যোগদান উক্ত অনুষ্ঠানকে বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে

শ্যামপুকুর (কলিকাতা ৪) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপে গত ১৯শে হইতে ২১শে জুন বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন-কীর্তন, ধর্মসভা, কথকতা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতিষ্ঠার ৪র্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন অপরাহ্ণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্বামী ক্ষমানন্দ, স্বামী অমলানন্দ এবং স্বামী জীবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথকতা করেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও উদ্বোধক শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী-প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। তৃতীয় দিন শ্রীমতী ক্ষান্তিলতা দেবী শ্রীশ্রীসারদাদেবী সম্বন্ধে কথকতা এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘটক ও সম্প্রদায় দশমহাবিদ্যা গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। মণ্ডপের সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাল তৃতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫শে ফাল্গুন সোমবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথিপূজা ও উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঊষাকীর্তন, মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগাদি, ধর্মসভা, কীর্তন প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। প্রায় এক হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ-দানে পরিতৃপ্ত করা হয়

শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ২২শে মার্চ কসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ ও অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত সুচিন্তিত ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর অবদান ব্যাখ্যা করেন।

উৎসবে প্রায় ৫০০জন ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব গত ১লা জুন পূজা-পাঠ, প্রসাদবিতরণ ও ভক্তসম্মেলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিন বিকাল ৫টায় শ্রীমনোরঞ্জন আচার্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি' পরিবেশন করিবার পর স্বামী আপ্তকামানন্দ ও স্বামী বিশোকাত্মানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী আলোচনা করেন।

পরলোকে সুশীলকুমার রায়

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত, ভাটপাড়ার 'বড় ললিত' নামে পরিচিত ৺ললিতমোহন রায়ের পুত্র বারাসত আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকীল সুশীলকুমার রায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৬ বৎসর বয়সে গত ২৫শে জুন সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। পিতার নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি যৌবনে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গলাভের এবং তদানীন্তন প্রবীণ সাধুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।



দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২১



দিব্য বাণী

জপো জল্পশ্ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনা
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমশনাদ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামস্সংবেশস্সুখমখিলমাত্মার্পণদৃশা
সপর্যাপর্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৭

—সৌন্দর্যলহরী

আমি যদৃচ্ছাতে যা কিছু কই তোমারি জপ হয় যেন তাই,
আমি যখনি হাত ঘুরাই যেন মুদ্রা হয় তা তোমার পূজায় ॥

আমি যেথায় ফিরি সবই যেন প্রদক্ষিণ হয় তোমায় ঘিরে,
যেন 'আহার করি মনে করি আহুতি দিই' জননীরে।
(যেন এ দেহে মোর সকল কাজই অঞ্জলি হয় তোমার পূজায় ॥)

যেন 'শয়নে মোর প্রণাম জ্ঞান' হয় মা তোমার শ্রীচরণে।
রূপাদি সব বিষয় পেয়ে যে সুখ জাগে আমার মনে
আমি ভাবি যেন সে সব কিছুই আহুতি দিই তোমার তরে
আমার আমি সে তো তুমিই—এ জ্ঞান-যাগে উজাড় ক'রে।
(যেন নিঃশেষে এ চিত্তখানি ফুরিয়ে যায় ও রাঙা পায় ॥)

কথাপ্রসঙ্গে

মহাশক্তি শ্রীশ্রীদুর্গা

শক্তি

মানুষের মনে যেদিন প্রথম জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল এ জগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের জীবনের ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, এবং তাহার মনে এ প্রশ্নের যে প্রথম উত্তর প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই উত্তরই তাহার সুদীর্ঘকালের সত্যান্বেষণের পর শেষ উত্তর—শক্তি।

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিতে যুগে যুগে অন্তর্জগতের গহন হইতে গহনতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন বহু সাধক ও সত্যদ্রষ্টা। এই পথ ধরিয়াই তাঁহারা সৃষ্টিরহস্যের মূলে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসিবার পর এই উত্তরই দিয়াছেন; তখন শুধু স্রষ্ট্রী বা নিয়ন্ত্রীরূপে নয়, বাহ্য ও অন্তর্জগতে, সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে তাঁহারা ওতপ্রোতও দেখিয়াছেন এই শক্তিকে। আবার, এই প্রত্যক্ষ-করা সত্যঘোষণার বহু হাজার বছর পরে জড়বিজ্ঞানীরা অন্যপথ ধরিয়া, স্থূলপদার্থের বিশ্লেষণসহায়ে বিশ্ব ও জীবনের উপাদান- ও নিমিত্তকারণ খুঁজিতে বাহির হইয়া এখন পর্যন্ত যতখানি দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদেরও উত্তর একই —শক্তি।

এই শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অবশ্য এই সব সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু উহা অচেতন স্থূল 'এনারজি'-ই হউক, বা মনবুদ্ধি অপেক্ষাও বহু সূক্ষ্ম কোন সত্তা হউক, অচেতন হউক বা চেতনার প্রতিভাসযুক্ত বা চেতনারই আর এক রূপ হউক, ব্যক্ত হউক বা অব্যক্ত হউক, চরম সত্যের সঙ্গে উহা ভিন্ন বা অভিন্ন বা অনির্বচনীয় যাহাই হউক, যতক্ষণ সৃষ্ট জগৎ রহিয়াছে এবং যতক্ষণ যত সূক্ষ্মরূপেই হউক আমি তাহার দর্শকরূপে রহিয়াছি, ততক্ষণ সে শক্তির অস্তিত্ব যে আছেই, এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই শক্তিকেই আমরা আমাদের ধারণাগম্য বিভিন্ন নামের বা নাম-রূপের আধারে রাখিয়া মায়া, প্রকৃতি, সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগজ্জননী প্রভৃতি বলিয়া থাকি।

বেদের ব্রহ্মই তন্ত্রে জগন্মাতা

এই শক্তি ও তাহার সৃষ্টিই কি চরম সত্য, না তাহা এসবেরও পারে? বেদের মতো তন্ত্রও বলেন চরম সত্য সৃষ্টির অতীত। বেদান্তে উহার নাম ব্রহ্ম; তন্ত্র বলেন উহা শক্তিরই স্বরূপ। বলেন, শক্তি 'সাকারাপি নিরাকারা' (মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৩৪)—'সাকারও, নিরাকারও'। তন্ত্র এই নিরাকার শক্তিকেই, বেদান্তে যাহাকে ব্রহ্ম বলা হয় তাহাকেই সাকারা 'মা' বলিয়া আরাধনা করিতে শিখাইয়াছেন, চরমে মায়ের নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্যই। নিরাকারকে তো আর চিন্তা করা যায় না, সাধক প্রথমে তাঁহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাইবে কিরূপে? অরূপা মা তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেই রূপধারণ করেন—'সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী'। এই 'রূপধারিণী' মাকে সাধক ভালবাসিতে পারে, পূজা করিতে, ধ্যান করিতে পারে। এই আরাধনার ফলে ক্রমে মনবুদ্ধিকে শুদ্ধ হইতে শুদ্ধতর করিয়া সৃষ্টির সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তরে প্রবেশ করিতে করিতে

শেষে এমন একজাগায় আসিয়া উপনীত হয়, যেখানে সে নিজে ও মা ছাড়া আর কিছুই থাকে না; থাকিলেও দেখে মা-ই সে-সব হইয়া রহিয়াছেন। সেখান হইতে মা তাঁহাকে 'অরূপের ঘরে' লইয়া যান, যেখানে মন-বুদ্ধিও থাকে না, মা ও ছেলের পৃথক অস্তিত্বও আর থাকে না, সবই এক অরূপ সত্তা হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা বেদমূলা

তন্ত্রে জগজ্জননী মহাশক্তিকে যে-সব বিভিন্ন মূর্তিতে আরাধনা করা হয়, শ্রীশ্রীদুর্গা তাহার অন্যতম। জগৎকারণকে তন্ত্রোক্ত মাতৃরূপে কল্পনার, এমনকি দুর্গামূর্তিরও মূল পাওয়া যায় আমাদের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার প্রাচীনতম বিবরণ যাহাতে বিধৃত, সেই বেদের মধ্যেই।

বেদের মধ্যে আবার প্রাচীনতম ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে দেখা যায় বিশ্বের নিয়ন্তার সন্ধানে মানুষ প্রথমে শক্তির কথাই ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, যে-শক্তি তাপরূপে বিকশিত হইতেছে, যে-শক্তির প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুৎ হইতেছে, যে-শক্তিপ্রভাবে সমুদ্র শান্ত থাকে বা উত্তালতরঙ্গময় হয়, যে-শক্তি অগ্নিরূপে প্রকাশিত, যে শক্তি দিবারাত্রিরূপে পরিবর্তন ঘটাইতেছে ইত্যাদি—সেই শক্তিগুলিই নিজ নিজ পৃথক অধিকার লইয়া বিশ্বনিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ঐ শক্তিগুলিকে অবশ্য শক্তিমান মিত্র, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ঊষা, রাত্রি প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিকই—শক্তি বিমূর্ত হইলেও কোন নামরূপবিশিষ্ট দেবদেবী-রূপ আধারে উহাকে ভাবিবার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই; বরং বলা যায়, ভাবিতে হইলে যে-আকারেই হউক এরূপ করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায়ও নাই—আকর্ষণ-বিকর্ষণশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি কোন্ বিমূর্ত শক্তিকে আমরা বাস্তব বা কল্পিত কোন আধার ছাড়া ধারণা করিতে পারি? জগন্নিয়ামক শক্তিকে প্রথমে বহু ও বিভিন্ন শক্তিমান দেবদেবীরূপে কল্পনা করিলেও একটি মূল শক্তিই যে বিভিন্ন শক্তিরূপে বিকশিত হইয়া জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে, এ ধারণা ক্রমে ঋগ্বেদে রূপ লইয়াছিল—'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিরাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥' (১।১৬৪।৪৬)—ইহাকেই (অগ্নিকে বা সূর্যকে) বলা হয় ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, ইনিই সেই গরুড়পক্ষী; সত্তা একই, বিপ্রগণ তাহাকেই বহুভাবে বলেন। এ ধারণার আরও স্পষ্ট রূপ—'এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ। একৈবোষা সর্বমিদং বি ভাতি একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্॥' (৮।৫৮।২) —এক অগ্নি বহুভাবে প্রদীপ্ত, এক সূর্য বিশ্বে প্রভূত (বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট), এক ঊষা এই সব কিছুকে প্রকাশিত করিতেছেন; সেইরূপ একই এই সব কিছু হইয়াছেন। এই 'এক'কে ঋগ্বেদে দেবী অদিতি-রূপেও কল্পনা করা হইয়াছে। বলা যায়, পরবর্তীকালে তন্ত্রের যে মহাশক্তি জগন্মাতা, যিনি 'জগন্মূর্তিঃ', 'দেবজননী', 'জগদ্ধাত্রী', 'সাকারাপি নিরাকারা' দুর্গা, তাঁহারও মূল নিহিত ঋগ্বেদের এই 'অদিতি'র মধ্যেই: 'যাহা কিছু জন্মিয়াছে, যাহা কিছু জন্মাইবে, সবই অদিতি। স্বর্গ অদিতি, অন্তরীক্ষ অদিতি; মাতা, পিতা, পুত্র অদিতি;' 'সমস্ত দেবতা অদিতি' (১।৮৯।১০)। 'অদিতি জ্যোতির্ময়ী, জগদ্ধাত্রী' (১।১৩৬।৩)। অদিতি শব্দের অর্থ (সায়ণভাষ্যে) অখণ্ডনীয়া—যাহার খণ্ড হয় না; এখানে ব্রহ্মের সঙ্গে শক্তির অভেদত্বেরও আভাষ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে একথা

স্পষ্টাক্ষরেই বলা হইয়াছে : চরমসত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঋষি অম্ভৃণের কন্যা 'বাক্' ঘোষণা করিতেছেন, 'আমি সর্বজগতের অধীশ্বরী। আমি জানিয়াছি, আমি ব্রহ্মস্বরূপা'। 'আমিই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল, আমিই বিশ্বরূপে বর্তমান' (১০।১২৫।৩,৮)। আবার, অনেকে মনে করেন, সিংহবাহনা অসুরদলনী দুর্গার মূলও রহিয়াছে ঋগ্বেদে, একদা সিংহরূপধারিণী 'বাক্' দেবী ও রণপ্রিয়া 'সরস্বতী' দেবীর মধ্যে।

বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ অংশে 'দুর্গা' এবং 'উমা' নামও পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, 'আমি তপস্যা-প্রদীপ্তা অগ্নিবর্ণা দুর্গাদেবীর শরণ লইলাম' (১০।১।৬৫), 'অম্বিকাপতি, পশুপতি, উমাপতিকে নমস্কার (১০।১৮।১), (দুর্গাগায়ত্রী) 'তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭) প্রভৃতি। কোনোপনিষদে আছে, দেবতাদের হিতকল্পে ইন্দ্রের জ্ঞানগোচর হইবার জন্য অরূপ ব্রহ্ম প্রথমে জ্যোতির, পরে 'হিমালয়দুহিতা উমা'র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন (৩।১২)।

দুর্গাপূজা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, মেধা ঋষি সুরথ ও সমাধির নিকট দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, 'তিনি অরোধিতা হইলে মানুষকে ইহলোকের ভোগ, স্বর্গ, মোক্ষ, সবই প্রদান করেন।' ঋষির কথা শুনিয়া সুরথ ও সমাধি মাটির প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গার আরাধনা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট বর লাভ করেন। সে আরাধনা 'পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নিজগাত্রের রক্ত দিয়া বলি' নিবেদন করিয়া পূজামাত্র নয়—'তিন বৎসরকাল কখনো উপবাসী, কখনো স্বল্পাহারী, তাঁহার চিন্তায় একাগ্রমনা ও সংযতচিত্ত থাকিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন।' এই সংযম ও একাগ্রতার সাধনাই, তপস্যাই শক্তিপূজার, আমাদের অন্তরস্থ মহাশক্তিকে প্রসন্ন করিয়া জাগাইবার একমাত্র উপায়, শক্তি আরাধনার মূল কথা। শক্তির উদ্বোধন ছাড়া জাগতিক বা আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই সম্ভব নয়। আমরা শক্তি-আরাধনার এই মূল কথা ভুলিয়াছি বলিয়াই প্রতি বৎসর শত শত প্রতিমায় দুর্গাপূজা করা সত্ত্বেও শক্তির প্রসন্নতা-লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। অসংযম ও চিত্তের অস্থিরতাকে কমাইবার চেষ্টা না করিয়া পূজায় কেবল বাহিরের ঘটা করিলে, তাহার নাম আমরা যাহাই দিই, তাহা দুর্গাপূজা হয় না। আজ শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে দুর্গামাতার চরণে প্রার্থনা করি : মা! যে মন্দিরে একদিন শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতির তপস্যাপূত বীর হৃদয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্য তোমার আরাধনা করিয়াছিল, তোমার সেই ভারত-মন্দিরে আবার সেরূপ আরাধনার ভাব সন্তানদের হৃদয়ে জাগাইয়া দাও! তুমিই তো বুদ্ধিরূপে সকলের অন্তরে রহিয়াছ, তোমার ইচ্ছাই তো বাস্তবরূপ ধারণ করে—'মুহূর্তে যা হতে পারে দুর্নিবার ঘটনাপ্রবাহ।'

"মানুষ সর্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত যে-কোনও শক্তির যে পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে।"

—'ভারতে শক্তিপূজা'—স্বামী সারদানন্দ

ভারতের যুবসম্প্রদায়ের প্রতি

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

স্বাধীনতালাভের সময় থেকে সারা দেশে যুবকদের মধ্যে আমাদের জাতিকে পুনর্গঠিত করার জন্য প্রবল উৎসাহ জেগেছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কাজে নামার আগে ভবিষ্য ভারত কি রকম হবে সে সম্বন্ধে ধারণা খুব পরিষ্কার থাকা চাই-ই। যেমন, কোন চিত্রকর ছবি আঁকার ইচ্ছা হওয়া মাত্র ক্যাম্বিশে রং মাখাতে আরম্ভ করে না। এ পদ্ধতিতে ভাল ছবি আঁকা যায় না। চিত্রকর যা আঁকতে চাচ্ছে সে-সম্বন্ধে আগে তাকে ভালভাবে চিন্তা করতে হবে, সে-বিষয়ে মনে একটা স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে। তারপর মানসপটে যা অঙ্কিত হয়েছে তাই-ই ফুটিয়ে তুলতে হবে ক্যাম্বিশের ওপর। কোন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী তৈরি করার ব্যাপারেও একই কথা। সে প্রথম বুঝতে চায় বাড়ীটি কি ধরনের হবে—স্কুল, বা হাসপাতাল, বা আফিস হবে সেখানে, না বসবাস করা হবে? সেটি জেনে নিয়ে তারপর সে প্রয়োজনানুরূপ নক্সা আঁকতে বসে, নক্সায় বাড়ীর সব খুঁটিনাটি আঁকে। নির্মাণের কাজে হাত দেয় তার পর। তোমাদেরও তেমনি আগে ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে হবে, তারপর জাতিগঠনের কাজে নামবে।

ভারতকে কি একটা প্রবল সামরিকশক্তি-সম্পন্ন জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও? আমার বিশ্বাস তোমরা তা চাও না; কারণ কোন সামরিকশক্তি-সর্বস্ব জাতি দীর্ঘজীবী হয় নাই। হিটলার ও মুসোলিনীর ভাগ্যই দেখ না। তাহলে কি ভারতকে আমেরিকার মতো সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত এবং কৃষিতে অতি-অগ্রসর জাতিরূপে গড়ে তুলতে চাও?

আমাদের জাতি দরিদ্র, জনসাধারণকে ভরণ-পোষণ করার জন্য আমাদের সম্পদ চাই। কিন্তু কেবল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করলেই কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে? ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা বা অন্যান্য উন্নত জাতিগুলির মানসিক শান্তি ও আনন্দ আছে কি? না, তা নেই। সেখানকার যুবজীবনের দিকে তাকাও না—প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত হয়েও একদল ছেলে-মেয়ের মন ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে ভরে গেছে, তারা ভাবছে জীবনে কিছুই পাওয়ার নেই; ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। তাদের অনেকে খুবই ধনী, কিন্তু জীবনের কোন লক্ষ্য খুঁজে না পেয়ে তাদের অনুভূতিতে এক ধরনের ভয়াবহ উদ্দেশ্যহীনতা বাসা বেঁধেছে।

আমাদের সামরিক শক্তি চাই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য, প্রতিবেশী জাতিকে লুণ্ঠন করার জন্য নয়। আমাদের সম্পদ চাই আমাদের দরিদ্র জনগণের ভরণ-পোষণের জন্য, কিন্তু অতি-সমৃদ্ধিশালী হওয়টাই আমাদের জাতির আদর্শ হতে পারে না। এ-দুটি ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন আছে—শক্তি ও সম্পদের সঙ্গে যা আমাদের শান্তিও দেবে; সেটি কি?

আমি তোমাদের বলব, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়; পড়ে দেখ অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, কণিষ্ক এবং অন্যান্যদের যুগে ভারত শক্তিতে, সম্পদে, সুখে কত উন্নত ছিল! স্পষ্টই বোঝা

যায়, বৈদিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে আমাদের কতকগুলি মহান আদর্শ ছিল, আর সেগুলিই অতীতে ভারতকে এত মহান করতে পেরে-ছিল। কিন্তু পরে এই অধঃপতন ঘটল কি ভাবে? এই অধঃপতনের কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই যে আদর্শ-গুলি আমাদের জাতিকে উন্নত করেছিল, ভবিষ্য ভারত-গঠনের কাজে সেগুলিকে গ্রহণ করতে হবে; যা আমাদের অধঃপতনের কারণ সেগুলিকে ত্যাগ করতে হবে; আর তার সঙ্গে নিতে হবে শিল্প ও বিজ্ঞান—যা নতুন, যা আগে ছিল না।

আজকাল বিজ্ঞানের কথায় আমাদের অগাধ বিশ্বাস; আমরা বলে থাকি, 'এটা বিজ্ঞান-সম্মত নয়, কুসংস্কার।' কিন্তু অতীত ভারতে ভাল জিনিস কিছু ছিল কি না—যা গত তিন হাজার বছর ধরে আমাদের জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে—তা জানার জন্য চেষ্টামাত্র না করে, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাশ্চাত্য আদর্শ-গুলির পিছনে ছোটাটাই কি বিজ্ঞানসম্মত, যে আদর্শগুলি এখনো কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হয় নাই, যেগুলির বয়স বড়জোর দু'শো বছর, কোন কোনটি তো এই সেদিনের? এ সব আদর্শ পাশ্চাত্য জাতিগুলির সমস্যার সমাধান করেছে কি? দেখে তো তা মনে হয় না। তাহলে এ-আদর্শের পিছনে ছোটা কেন?

যুব বন্ধুগণ! আমরা মানুষ। ভগবান আমাদের বিচারশক্তি দিয়েছেন তা ব্যবহার করার জন্য। অতএব যে-কেউ এসে জোর দিয়ে কিছু বলা মাত্রই বিচার না করে আমরা পশুপালের মতো চালিত হব কেন? কাজেই আমার পরামর্শ হল, আমাদের অতীতের, এবং বর্তমান যুগেরও সব তথ্য, সব সংবাদই তোমরা সংগ্রহ কর, সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর, তারপর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কর। উচ্ছ্বাসের দ্বারা চালিত হোয়ো না।

সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রয়োজন হল চরিত্রের। চরিত্রবল ছাড়া কোন মহান লক্ষ্য-লাভ হয় না। মহাত্মাজীর দিকে তাকাও; দেখ, কিভাবে নিজ চরিত্রবলে তিনি জাতিকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং ইংরেজদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। কামান, পারমাণবিক বোমা, এসব কিছুই তিনি ব্যবহার করেননি। কাজেই ভারতকে উন্নত করতে হলে আগে নিজেদের চরিত্র গঠন কর, তারপর তোমাদের বিচারশক্তি ব্যবহার করে স্থির কর কি রকম ভারত তোমরা গড়তে চাও; তার-পর স্থিরসংকল্প হয়ে, এমনকি জীবন পণ করেও কাজে নাম।

পূর্বোক্ত তথ্যসংগ্রহের কাজে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি তোমাদের দিঙ্-নির্দেশ করবে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও মহিমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটাবে।*

* 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ (এপ্রিল, ১৯৭০) প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ 'Exhortations to the Youth of India' হইতে অনূদিত।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী

আর্ণল্ড টয়েনবী

আচরণে প্রকাশিত ব'লে—যা বলেছেন তা ক'রে দেখিয়েছেন ব'লে—শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনন্য। সে বাণী হল হিন্দুধর্মেরই চিরন্তন বাণী। হিন্দুধর্ম বা অন্য কোন ধর্মই যে সত্যের একমাত্র প্রতিরূপ বা মুক্তির একমাত্র পথ নয়—এ মত একমাত্র হিন্দুধর্মই পোষণ করে ব'লে ঐতিহাসিক পর্যায়ের ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দুধর্ম তুলনারহিত। স্বামী ঘনানন্দ এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হিন্দু দৃষ্টিতে উচ্চতর পর্যায়ের সব ধর্মমতই সত্য, সবই ভগবানলাভের যথার্থ পথ, এবং সবগুলিই মানবজাতির কাছে সমভাবে অপরিহার্য; কারণ সেগুলির প্রত্যেকটিই বিভিন্নভাবে একই সত্যের সন্ধান দেয়, এবং প্রত্যেকটিই বিভিন্ন পথে মানবসাধনার একই লক্ষ্যে নিয়ে যায়। কাজেই প্রত্যেকটিরই একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, যা অপর কোনটির ভেতর পাওয়া যাবে না।

একথা জানা ভাল, কিন্তু জানাটুকুই যথেষ্ট নয়। ধর্ম শুধু বৌদ্ধিক চর্চার বিষয় নয়। ধর্ম এমন একটা বিষয় যা উপলব্ধি করতে হয়, জীবনে রূপায়িত করতে হয়;—আর এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্যতাকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। তিনি পর পর প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন ও ধর্মমতে, আবার ইসলাম এবং খৃষ্টমতেও সাধন করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর ধর্মসাধনা ও উপলব্ধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছিল যে, ততটা বোধ হয় এর আগে ভারত বা অন্য কোন দেশে আর কখনো ধর্মজগতের আর কোন মহাপুরুষের বেলা হয়নি। জগন্মাতারূপী সাকার ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যে ভক্তি, তা তাঁর 'নিরাকার চৈতন্যের' উপলব্ধির পথে—আধ্যাত্মিক চরম সত্যের সঙ্গে নিজের পূর্ণ একত্বানুভূতির পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে এবং যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন, সেখানে সে সময় তাঁর ও তাঁর বাণীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হিন্দু ধর্ম-ঐতিহ্যের পরিবেশে লালিত নন এমন কারো পক্ষে এ বাণী প্রচার করা অসম্ভবপ্রায় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি যে-জগতে জন্মেছিলেন তা তাঁর জীবৎকালেই এই সর্বপ্রথম আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বজোড়া একত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'তে শুরু করেছিল। আজও আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এই যুগসন্ধির অধ্যায়েই বাস করছি; কিন্তু ইতিমধ্যেই এটা পরিষ্কার হ'য়ে আসছে যে, প্রাশ্চাত্য-প্রারব্ধ এই অধ্যায়টিকে ভারতীয় পরিসমাপ্তি লাভ করতেই হবে, যদি মানবজাতির আত্মধ্বংসে সে অধ্যায়টির সমাপ্তিকে রুখতে হয়। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা বস্তুতান্ত্রিক স্তরে পৃথিবীকে এক করেছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য নৈপুণ্য শুধু তো দূরত্বকে লুপ্ত করে নাই; দূরত্ব কমিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে যখন পরস্পরের ওপর সরাসরি আঘাত হানার মতো অবস্থায় এনে ফেলা হয়েছে, অথচ যখন পর্যন্ত তারা পরস্পরকে বুঝতে ও ভালবাসতে শেখে নাই, এমন এক সময়েই তাদের হাতে বিপুল-বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহও সে তুলে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের এই চরম

বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পন্থাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ। মহারাজ অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আচরিত ধর্মসমন্বয়ের প্রমাণ—এসবের ভেতর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব আছে, তাই-ই একপ্রাণতার বিকাশের মাধ্যমে মানবজাতিকে একপরিবারভুক্ত করা সম্ভব করে তুলতে পারে; এই পারমাণবিক যুগে আমাদের আত্মঘাতী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার এইটাই একমাত্র পথ।

বর্তমান পারমাণবিক যুগে এই ভারতীয় পন্থা অনুসরণের জন্য সমগ্র মানবজাতির নিকট একটা উপযোগবাদী প্রেরণা আছে। আর কোন উপযোগবাদী প্রেরণা এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী, বেশী সম্মানার্হ হতে পারে না। মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষাই এখন সঙ্কটাপন্ন। তথাপি, সর্বাধিক শক্তিশালী ও সর্বাধিক সম্মানার্হ উপযোগবাদী প্রেরণা বলেই রামকৃষ্ণ, গান্ধী ও অশোকের উপদেশে গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'তে ও তদনুসারে চলতে হবে,—তাঁদের উপদেশ-গ্রহণের কারণরূপে এটা গৌণ। এর মুখ্য কারণ হল—এ উপদেশ যথাযথ; যথাযথ, কারণ তা আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থ-উপলব্ধি-প্রসূত।*…

[৩০ অগস্ট, ১৯৬৯]

* স্বামী ঘনানন্দ-লিখিত 'Sri Ramakrishna and His Unique Message' গ্রন্থের প্রাক্কথন হইতে অনূদিত।—সঃ

শ্রীদুর্গা-করাবলম্বস্তোত্রম্

স্বামী হর্ষানন্দ

দুষ্টৈর্নিহত্য মহিষাদি-সুরারি-বর্গৈ-
র্গাঢ়ং নিপীড়িততনুং সুরসৈন্যবৃন্দম্।
যৈরষ্টহস্তকমলৈঃ পরিপাসি তৈঃ স্ম
দুর্গেঽম্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১

নক্তংদিবং হৃতবিবেকমহাধনস্য
মোষৈঃ শিবে বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
স্তুত্যাঙ্ঘ্রিপদ্মযুগলে সুরসৈন্যপালে
দুর্গেঽম্ব দেবি মম দেহি করাবলম্বম্॥ ২

হে মাতঃ দেবি দুর্গে! মহিষাসুরাদি দুষ্ট শত্রুগণ কর্তৃক দলিত সাতিশয় জর্জরিতদেহ দেবসৈন্যদলকে তোমার কমলনিভ যে অষ্টহস্তে তুমি রক্ষা করিয়াছিলে, তোমার সেই হস্তের আশ্রয় আমাকে দাও। ১॥

হে শিবে, দেবসৈন্যপালিকে! স্তুতিযোগ্য তোমার পাদপদ্মযুগল। ইন্দ্রিয়নামা বলবান দস্যুগণ রাত্রিদিন আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিতেছে। হে মাতঃ দেবি দুর্গে! তোমার হস্তের আশ্রয় আমাকে দাও। ২॥

'এবংপ্রভাবা সা দেবী'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শেষ অধ্যায়। শ্রোতৃদ্বয়—রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধিকে ঋষি বলিতেছেন, এই তো এতক্ষণ ধরিয়া মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম তোমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। বস্তুতঃ মহামায়ার শক্তি বুঝিবার জন্য রোমাঞ্চকর বর্ণনার প্রয়োজন হয় না, যদি শ্রোতার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। ধারণার ক্ষমতা যাহার সূক্ষ্ম সে দেখিতে পায় জগৎ-সংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে একটি দুজ্ঞে'য় প্রহেলিকা রহিয়াছে এবং এই প্রহেলিকার নায়িকা হইলেন এক সর্বব্যাপিনী চৈতন্যশক্তি। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা হাসি-কান্না রোগ-স্বাস্থ্য জীবন-মৃত্যু আপদ-বিপদ জ্ঞান-অজ্ঞান ভালবাসা-ঘৃণা জোড়ে জোড়ে এই ধরনের অভিব্যক্তি দিয়া তিনি সৃষ্টি চালাইতেছেন। ইহাই সংসারের নিয়ম। কেন এই নিয়ম সে প্রশ্ন করিবার অধিকার মানুষের নাই। যদি এই নিয়ম ভাল না লাগে তো সৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাও। উহার নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়। আর যদি এই দ্বন্দ্বময় প্রহেলিকার সহিত প্রেমবদ্ধ হইয়া সৃষ্টিরই মধ্যে থাকিতে চাও তো থাকো, আমার কিছু বলিবার নাই। ঐ অবস্থার নাম বন্ধন। যে মহাশক্তির কথা বলিতেছিলাম তিনি বন্ধন ও মুক্তি দুইটিরই বিধাত্রী। ঋষি বলিতেছেন—

জগৎসংসারের প্রত্যেকটি ব্যাপারের মধ্যে মহামায়ার শক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনা তোমাদের নাই। সেই জন্য তাঁহার শক্তির বাহ্য বিকাশ কতকগুলি কাহিনীর মাধ্যমে তোমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছি—যুগে যুগে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার বিশেষ আবির্ভাবের কাহিনী। তোমরা শুনিলে কি করিয়া এক যুগে তিনি মধুকৈটভ নামক অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন, আর একযুগে মহাদুর্গার রূপ লইয়া মহিষাসুরের ত্রিলোক-সন্তাপকর দম্ভকে নিবারণ করিয়াছিলেন, আবার অপর এক সময়ে কাম, মোহ, বিদ্বেষ ও মোহের প্রতীক শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় কিভাবে দেবী মহামায়ার বিচিত্র প্রভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 'এবংপ্রভাবা সা দেবী'। সেই দেবী মহামায়ার এইরূপই প্রভাব। অঘটনঘটন-পটীয়সী তিনি। এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার শক্তির এলাকার মধ্যে নয়।

চণ্ডীগ্রন্থের প্রারম্ভ মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কারণ কি এই প্রশ্ন লইয়া। সুরথ ও সমাধি উভয়েই অন্তর্দ্বন্দ্বে জরজর। ঋষির নিকট তাঁহারা এই দ্বন্দ্বের সমাধান চাহিয়াছিলেন। কেন যাহা চাই তাহা পাই না, যাহা পাই তাহা রাখিতে পারি না? কেন সুচিরপোষিত ভালবাসা নিমেষে বিষ হইয়া উঠে, বিশ্বাস ও সততা ছলনা ও নিষ্ঠুরতা দ্বারা প্রতিহত হয়? সকালের ফুল কেন সাঁঝে ঝরিয়া যায়, পরিষ্কার আকাশকে কেন হঠাৎ কালো মেঘ ছাইয়া ফেলে?

সুরথ ও সমাধির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ঋষিকে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে হইয়াছিল। উপায়ান্তর ছিল না। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাইতে হয়। সংসারনিয়ন্ত্রী

মহামায়ার প্রভাব বাহিরে বুঝিতে পারিলে পরে সেই প্রভাবকে অন্তর্জগতে ধরা যায়। অতএব ঋষিরুবাচ :—বিষ্ণু ঘুমাইয়া আছেন। ব্রহ্মা বিপদে পড়িয়াছেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে দুই কৃতান্তসদৃশ দৈত্যের আবির্ভাব। শক্তিশালী দুই অসুরের ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রহ্মা কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। বিষ্ণুর ঘুম ভাঙানো তাঁহার কর্ম নয়। অতএব বিপদে পড়িলে শিশু যাহা করে অতিবৃদ্ধ প্রজাপতি ব্রহ্মা লজ্জার মাথা খাইয়া তাহাই করিলেন। মা মা—মা বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন। রক্ষা কর, মা। রক্ষা কর, মা। বিষ্ণু ঘুমাইতে পারেন কিন্তু জগদ্বিধাত্রী মহাজননীর ঘুমের অবসর কোথায়? ব্রহ্মার ডাক শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন। যে সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া তিনি বিষ্ণুকে ঘুম পাড়াইয়াছিলেন উহারই উলটা স্পর্শে তাঁহাকে জাগাইয়া দিয়া বলিলেন, যাও লড়াই কর। অসুর দুটি বড় উৎপাত করিতেছে, উহাদিগকে বিনষ্ট কর। হাড়ের মালা যাঁহার গলার ভূষণ, 'মারো কাটো' বলিতে তাঁহার মুখে আটকায় না। আটকাইবেই বা কেন? জন্ম ও মৃত্যু দুই-ই যে তাঁহার চোখে সমান।

বিষ্ণু লড়িতেছেন; মধুকৈটভ হাঁপাইতেছে। দেবী কিন্তু হাসিতেছেন। বিষ্ণু যখন আর পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন চির-বালিকা মায়ের মনে একটু খেলা জাগিয়া উঠিল। তিনিই মনবুদ্ধিরূপিণী। মধুকৈটভের মনের মধ্যে ঢুকিয়া উহাদের মন গুলাইয়া দিলেন। উহারা প্রতিদ্বন্দ্বী নারায়ণকে বলিয়া উঠিল, 'বর চাও।' কি বর চাহিতে হইবে তাহা দেবী বিষ্ণুর কানে কানে বলিয়া দিলেন—'আমার হাতে তোমাদের মৃত্যু।' মধুকৈটভদমনের বিচিত্র কাহিনী! এমনই মহিষাসুরবধের, শুম্ভনিশুম্ভধ্বংসের রোমাঞ্চকর সংবাদ। এই সব শুনিলে দেবী মহামায়ার সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী সর্বতো-ব্যাপ্তা শক্তিকে বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় কি?

ঋষি কিন্তু দেবীর বিশেষ লীলাত্রয় বর্ণনা করিবার আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ,' জগৎসংসারে তাঁহার প্রভাব অবিচ্ছিন্নভাবে সর্বদাই সক্রিয়। যাহার চোখ খুলিয়াছে সে দেখিতে পায় যে এমন বস্তু নাই যাহা মায়ের সত্তায় অস্তিত্ববান নয়, এমন ঘটনা নাই যাহা মহামায়ার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না; এমন কাল নাই, এমন নিয়ম নাই যাহা কালাতীতা সর্বনিয়মাতীতার হাতছানিতে অনাবর্তিত।

"জলে স্থলে আকাশেতে যে দিকেতে চাই
সেইখানে মা দাঁড়িয়ে আছেন,
দেখতে আমি পাই
(আবার) মনের মধ্যে দয়া মায়া
চিন্তারূপে মা আমার।
আমার কেমন মা তা কেমন করে
বলতে গো পারি।"

বিস্ময়, বিস্ময়, বিস্ময়। অনন্ত আকাশে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের মেলা—সাগরমেখলা পৃথিবী—পৃথিবীপৃষ্ঠে অসংখ্য আকার-প্রকারের জীব-দেহে বিচিত্র প্রাণ-প্রবাহ—মানুষ—মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উল্লাস-বেদনা জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য দর্শন ধর্ম—আমাদের পৃথিবীর মতো সম্ভবতঃ আরও অসংখ্য পৃথিবী—এরই মতো হয়তো আরও অনেক বিশ্ব—অণু-পরমাণুর জগৎ—অকল্পনীয় সূক্ষ্মতা। কোথায় মা দাঁড়াইয়া নাই? কোথায় মহামায়ার নিত্যলীলার পরিনির্বাহ হইতেছে না? বিবেক বৈরাগ্য উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে 'এবংপ্রভাবা সা দেবী'—ঋষির এই উক্তির

ভূয়িষ্ঠ সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। বাংলার সাধক গাহিয়াছেন—

শ্যামা মা কি কল করেছে,
কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতর
কত রঙ্গ দেখাতেছে।
আপনি থাকি কলের ভিতরি,
ঘুরায় ধরে কলডুরি
কল বলে আপনি ঘুরি,
জানে না কে ঘুরাতেছে।
যে কলে জেনেছে তারে,
কল হতে আর হবে না তারে
কোনও কলের ভক্তিডোরে
আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।

সাধক দেখিতেছেন মহামায়ার অত্যদ্ভুত বিভূতি আমাদের দেহের মধ্যেই সমধিক প্রকাশিত। দেহযন্ত্রের প্রত্যেকটি স্পন্দন যন্ত্রী চৈতন্যময়ীর সত্তার দরুন ঘটিলেও যন্ত্র আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যন্ত্র আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ক্ষুদ্র আমিই কর্তা। ইহারই নাম অজ্ঞান। সাধনার দ্বারা এবং জগজ্জননীর কৃপায় এই ভ্রম যদি কাটিয়া যায় তখন আমরা আমাদের দেহের মধ্যে চৈতন্যময়ীকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার পশ্চাতে, প্রত্যেকটি চিন্তা-আবেগের মধ্যে আমরা তখন চৈতন্যের স্ফূর্তি ধরিতে পারি। তখন মা আর লুকাইয়া থাকিতে পারেন না। নিজের শুদ্ধ বুদ্ধ মায়াতীত স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকট করিয়া আমাদের 'ভক্তিডোরে' বাঁধা থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে এইভাবে প্রার্থনা করিতে শিখাইতেন—মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; যেমন চালাও তেমনি চলি। নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। আমরা যখন মহামায়াকে কেনোপনিষদের ভাষায় আমাদের চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলিয়া ধারণা করিতে পারি তখন আমরা মায়ের নিত্যসান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। রূপ এবং অরূপ, সসীম এবং অসীম, মায়িক এবং নির্মায়িক ইহাদের হেঁয়ালি তখন আমাদের নিকট কাটিয়া গিয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষদ্ প্রথমে এক অধ্যায়ে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির বর্ণনা করিলেন। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চের সবকিছু উদ্ভূত হয়। সাগর, নদী, অরণ্যানী, পর্বত, ভূলোক, দ্যুলোক, জীবের প্রাণ মন ইন্দ্রিয়নিচয়, অসংখ্য জীব, কর্মবিধান, নীতি, সমাজশৃঙ্খলা—সবই সর্বকারণ ব্রহ্মের অভিব্যঞ্জনা। পরবর্তী অধ্যায়ে উপনিষদ্ সাধককে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দেহ-প্রাণমন-সংঘাতের মধ্যে ধারণা করিবার উপদেশ দিতেছেন—

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম।
মহৎপদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্।

(মুণ্ডক উঃ ২।২।১)

"আমাদেরই হৃদয়গুহায় সেই মহত্তম সর্বাশ্রয় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচৈতন্য বিরাজ করিতেছেন।"

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্ বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

(মুণ্ডক উঃ ২।২।৮)

"তিনি মনের মধ্যে ঢুকিয়া আছেন, প্রাণ ও সূক্ষ্ম দেহকে চালাইতেছেন, আবার অন্নময় স্থূলদেহের পরিপুষ্টি তাঁহা হইতেই। আনন্দস্বরূপ অমৃতত্বস্বরূপ তাঁহাকে বিবেকিগণ

তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি করেন।"

মুণ্ডক উপনিষদ্ যাঁহাকে এই অধ্যায়ে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই চণ্ডীগ্রন্থে চৈতন্যময়ী মহামায়া।

'এবংপ্রভাবা সা দেবী'। প্রথমে বাহিরে, পরে অন্তরে তাঁহার প্রকাশকে ধারণা করিতে হইবে। এই ধারণা যত পরিপক্ক হয় ততই আমাদের অলীক ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আমাদের 'কাঁচা আমি' ক্ষীণ হইতে থাকে। আমরা বলিতে শিখি—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের শেষে ঋষি শ্রোতৃদ্বয়কে সেই উপদেশই দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিলেন—'তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।' হে মহারাজ, সেই ভোগমোক্ষদায়িনী সংসার-চালিকা পরমেশ্বরীর শরণ লও। তিনি প্রসন্ন না হইলে উপায় নাই। ভোগে আসিবে শত বাধা, অপবর্গের পথও কণ্টকিত থাকিবে। তিনি যদি তুষ্ট হন তো পর্বতপ্রমাণ বাধা সহজেই ধূলিসাৎ হয়, ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন এক নিমেষে পরিণত হয় প্রাণজুড়ানো সুস্বপ্নে, নিবিড় মেঘ ফাঁড়িয়া চকিতে দেখা দেয় সূর্যালোক, কূলহীন দরিয়ায় দিশাহারা নৌকা হঠাৎ ডাঙ্গা খুঁজিয়া পায়।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

সকল ভূতের মধ্যে বিষ্ণুমায়া-রূপে যিনি সংস্থিত থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।

এই শরতে

শ্রীঅপূর্বকুমার কুণ্ডু

আজ শরতের কমলবনে কার ও পায়ের চিহ্ন আঁকা,
মিষ্টি রোদের আলোতে আজ কার সে মধুর পরশ মাখা।
কার খুশিতে শিউলি বনে
ঘুরছে ভ্রমর আপন মনে,
কে আসে আজ বাংলা দেশে কাশের চামর দুলিয়ে দিয়ে।
ফুটছে শালুক রং ঝরানো কোন সে খুশির আবেশ নিয়ে।

কার ছোঁয়াতে রঙীন হল সবার হৃদয় এক নিমেষে,
অনেক পাবার আনন্দে আজ সবার হৃদয় উঠছে হেসে।
উদাস বাউল একতারাতে
তুলছে যে সুর নিজের হাতে,
সেই সুরেরই ঝরনাধারায় আগমনীর উদ্বোধনে।
নতুন করে শংখ বাজুক একসাথে আজ সবার মনে।

পূণ্যগন্ধা পৃথিবী

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কবে একদিন ১৫।১৬ বছর আগে কথকতা শুনতে গিয়েছিলাম এক জায়গায়—সেদিন সেখানে গীতার বিভূতি-যোগের ব্যাখ্যা হচ্ছিল।

হঠাৎ কানে এলো, পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাম্। বক্তা ব্যাখ্যা করছেন। সহসা যেন মন ইন্দ্রিয় চোখ কান একসঙ্গে কি একটা আশ্চর্য রূপবোধ করলো. সর্বেন্দ্রিয়ময় রূপজগৎ চোখের সামনে ভেসে এলো। অকারণ আনন্দের, অবোধ্য অর্থবোধের একটা আলোর ঝলক দৃষ্টি-স্পর্শ-অনুভবের জগতের ছায়ায় হঠাৎ যেন কে ছড়িয়ে দিল চোখের সামনে। পূজা-আহ্নিকের সময় ধর্মগ্রন্থহিসেবে পড়বার সময় তো কত বারই পড়েছি। কিন্তু সেদিনকার সেই শোনায় যে আশ্চর্য অনুভূতি ও পৃথিবীর মহিমাবোধ তা পড়ার সময়তো অনুভব করিনি। (তাই কি শাস্ত্র বলেন আবৃত্তির মহিমা আলাদা; বুদ্ধির জগতের দুয়ার অতিক্রম করে সে মহিমা।)

মনের চোখের সামনে ভেসে এলো ফেরার পথে রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে আবৃত জানা ও অজানা গাছ লতা পাতা,—যা শহরের পথে নেই! মনের পথে তার অনুভূতি! পায়ের নীচের পথে, শহরের বালি কাঁকর ধুলো খোয়ার নিচে পুণ্যময়ী পৃথিবীর স্পর্শ গন্ধ? না, সেও মনে মনেই জাগল। ভেসে এলো কবে কোন্ গ্রামের বাড়ীর প্রাঙ্গণের ভোরের শিশিরে ভেজা মাটিতে পাওয়া শিউলী কামিনী ভুঁইচাপা দোপাটী কৃষ্ণকলি ছড়ানো সিক্ত মাটির পুণ্যগন্ধ। কতকাল আমার দেখা সেই পুণ্যগন্ধময়ী, পুণ্যস্পর্শময়ী পৃথিবীকে এবারে নতুন করে আশ্চর্য হয়ে মনে মনেই দেখতে পেলাম যেন।

মনে হ'ল আমি তো দেখেছিলাম সবই তাদের—ছোট থেকে বড় হয়ে খেলার দিনে, সুখের দুঃখের হাসিকান্নার দিনেও; দেখেছিলাম পাহাড়ে পথে চলতে, নদী-সাগরের জলে স্নান করতে; পায়ে পায়ে পায়ের তলায় প্রাঙ্গণে প্রান্তরে, দুপুরের স্তব্ধতায় সন্ধ্যার শান্তিতে—সেই পুণ্যভূমির সিক্ত ভেজা ভেজা গন্ধ, হয়ত রুক্ষস্পর্শ গন্ধও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল! কিন্তু এই পুণ্যগন্ধা ধরিত্রী যে এত সুরভিত এত মনোহর স্পর্শে গন্ধে রূপে, তা তো ঐ শ্লোকটি শোনার আগে কখনো ভাবতে জানতাম না। এত রূপও দেখতে পেতাম না! কত কবির কত কাব্য তো পড়েছি। পড়েছি,

> 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
> কেউ তা জানে না।'

কিন্তু আধ লাইনের এই শ্লোকে পৃথিবীর এত ঘনসন্নিবিষ্ট রূপ স্পর্শ গন্ধের মহিমা উপলব্ধি হয়, তা জানা ছিল না।

* *

জীবনযাত্রায় এর অনেক আগেই পথে নেমেছিলাম। পথ আর ঘর প্রায় সমানই হয়ে গিয়েছিল তখন থেকে। কত না তীর্থে তীর্থে পথের আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছিলাম, এই কথকতা শোনার পর তার আগে-না-জানা মনোহর রূপ চোখের সামনে জেগে উঠল। মনে হ'ল তাই বুঝি পৃথিবী মানুষকে বার বার পথে পথে এত ডাক দেন। তাই বুঝি এত তীর্থ আমাদের দেশে দেশে—

তার স্পর্শ গন্ধ নিয়ে, তার অব্যক্ত আহ্বান নিয়ে, তার রূপ নিয়ে। যে রূপ চোখেও দেখা যায়, আবার মনেও দেখা যায়। মনই তো আস্বাদ করে। চোখ আদি তো ইন্দ্রিয়ের বাতায়নমাত্র। এই শোনার পর থেকে চোখ দেখে মনের চোখে। মাটির গন্ধ ছোট শিশুদের মত হাতের ছোঁয়ায় ছুঁই। পায়ের তলায় সোঁদা সোঁদা গন্ধের আনন্দ জাগে। বাতাসে প্রসন্নতা। ফুল ফল গাছ পাতায় চেতন অবচেতন জীবনে, এই দেহ-ধারণের দুঃখসুখময়, কখনো বিরাগবিতৃষ্ণাময় জীবনেও ঐ আশ্চর্য পুণ্যময়ী পুণ্যগন্ধার দেহ-সৌরভ যেন দুর্গাপূজার ধূপ ধুনা পুষ্প পত্রের সৌরভের মত মনকে অভিভূত করে, এক মহা-মহিমময় অনুভূতিতে উপলব্ধিতে নিয়ে যায়।

* *

একসময়ে বদরিকাশ্রমের পথে গিয়েছিলাম। পায়ে চলার পথেই। যানবাহনে নয়। একদিকে ভীমশৃঙ্গময় উত্তুঙ্গ পাহাড়ের শ্রেণী—দেবদারু আর নানা রকমের গাছ গুল্ম লতা ফুলে ফলে ভরা ; অন্য দিকে কখনো নীচে কখনো কাছে পাশেই অলকানন্দা মন্দাকিনী নানা নামে নানা ভঙ্গীতে কখনো উচ্ছল উদ্দাম কখনো শান্ত স্রোতে বয়ে চলেছেন।

মন থমকে চেয়েছে চলার পথেই, যেন ঐ গন্ধ স্পর্শ রূপ কুড়িয়ে নেবে। মেখে নেবে গায়ে। যদিও তখনো ঐ শ্লোকটির টুকরোটিকে রূপে গন্ধে রসে অনুভব করিনি এ অনুভূতি পরে এসেছে স্মৃতির পথে। যেন পৃথিবীশ্বর তাঁর পুণ্যগন্ধা পৃথিবীর সুরভিকে মানুষের অঙ্গে গায়ে মেখে মিশিয়ে নিতে বলছেন। তারপর আসবে তাঁর মনভোলানো মনোহর রূপ দেখার পালা। 'আগে শোনো শাস্ত্রবাণী'। 'শোনো শোনো'র আহ্বান।

আরো পথ আরো তীর্থ—গঙ্গা যমুনা কাবেরী গোদাবরীপথের, সাগর-সমুদ্রের, সাগরসঙ্গমের—ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে দেহমন ; পৃথিবীর স্পর্শ সত্য, না মানুষের অনুভবই সত্য ?—দুইকে পৃথক করতে পারিনি। মনে হয়েছে সেই কবিতাই—

হে পুণ্যগন্ধময় পৃথিবীশ্বর—
'তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না।'

আর মনে হয়েছে কাকে চায় মন, কাকে চেয়েছি, তাও তো জানি না। সেই তিনি কোথায় আছেন—কোথায় থাকেন তাও জানি না। সে কি আমাদের বাসনা বেদনা আশা হতাশায় মলিন পৃথিবীতে উপলব্ধ হয় ?

তারপর মনে পড়ে সেই পরম বাক্য, তিনি স্বমহিমায় বিরাজিত। তাঁর অনেক রূপময় সেই মহিমার আর এক মহারূপ পুণ্যগন্ধা পৃথিবী। যে পৃথিবী মনুষকে কোলে ধরে আছেন, তাঁকে ও নিজেকে জানার জন্য। সেইখানেই তাঁকে পাওয়া যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিপঞ্চকম্

পণ্ডিত শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

সর্বাবতারবর্যায় সারদাবল্লভায় চ।
শ্রী রামকৃষ্ণদেবায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১
সর্বার্থসাধিকে দেবি শ্রীরামকৃষ্ণবল্লভে।
শ্রীসারদে জগন্মাতর্নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২
ঠাকুরস্যৈবান্যমূর্তেঃ সকাশাৎ শ্রীনরেন্দ্রতঃ।
ঠাকুরস্যোত্তমাভক্তিং শিক্ষেরন্ সর্বমানবাঃ ॥ ৩
ভজনং রামকৃষ্ণস্য জানন্তি তস্য পার্ষদাঃ।
নিত্যসিদ্ধগণা এব নান্যভক্তা মনাগপি ॥ ৪
যতস্তদতিদুর্বোধ্যমতিগুহ্যং ভবাপহম্।
বিশুদ্ধং দুর্লভং দীপ্তং যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ৫

পৃথিবীতে যে-সকল অবতার হইয়াছেন তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। ইনি সাক্ষাৎ ভগবতী সারদাদেবীর পতি, ষড়ৈশ্বর্য-বিভূষিত স্বয়ং ভগবান। সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি। ১

ধর্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গফলদায়িনী শ্রীরামকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গিনী জগন্মাতা সারদাদেবীকে অসংখ্য প্রণাম করি। ২

ঠাকুরেরই অন্যরূপে প্রকাশস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত নরনারীই ঠাকুরের বিশুদ্ধা বা সর্বোত্তমা ভক্তি শিক্ষা করিবেন। ৩

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধন-ভজন তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণই জানেন। তাঁহাদের ভাবানুগ না হইলে ভক্তমানসে শ্রীরামকৃষ্ণভাবের যথাযথ ধারণা সম্ভব নয়; ৪

কারণ, সেই ভজনতত্ত্বটি অতি গুহ্য, অতি দুর্বোধ্য, জন্মমরণাদি সংসার-তাপনাশক, বিশুদ্ধ, দুর্লভ ও ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ; সেই তত্ত্বটি জানিলেই অমৃতত্বলাভের অধিকারী হওয়া যায়। ৫

লেখকের বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও তাঁহার আশীর্বাদলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৯৪ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি কিছুদিন পূর্বে সংস্কৃত ছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্" গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—স:

রাজা মহারাজ — স্মৃতিকথা

স্বামী পুণ্যানন্দ

সে ১৯২১ সালের কথা। তখনও মঠে যোগদান করিনি, পাঠ্যাবস্থা। সুদূর মফস্বল শহর থেকে কলকাতা এসেছি। আসবার পূর্বে পূজ্যপাদ স্বামী আত্মানন্দজী (শুকুল মহারাজ) সস্নেহ নির্দেশ দিয়েছেন মঠে রাজা মহারাজকে দেখে আসতে। সেই নির্দেশ আমার নিকট আদেশের মতো। সুতরাং সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও বেলুড় মঠের দিকে রওনা হলাম। মধ্যাহ্নকাল। কুঠিঘাটে নেমেছি, ওপারে বেলুড় মঠ। কি আগ্রহ, কি ঔৎসুক্য নিয়েই না সেদিন মঠের দিকে অনিমেষনয়নে তাকিয়ে ছিলাম। কত শ্রদ্ধা, কত ভালবাসা, কত কল্পনা! যথাসময়ে অপর পার থেকে খেয়া নৌকা এসে গেল। নৌকাতে বসে বারবার মনে হতে লাগল, এই সেই মঠ যেখানে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা বিদ্যমান। ঠাকুর বলেছিলেন স্বামীজীকে, 'তুই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেখানে রাখবি, আমি সেখানেই থাকবো।' আর স্বামীজীও 'আত্মারামে'র কৌটা কাঁধে করে এনে এখানে বসিয়েছেন। মনে হ'ল অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচর ও আদরের মানসপুত্র রাখাল, স্বামীজীর 'রাজা', ভক্তের 'মহারাজ' পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দর্শন করবো। সেই বিখ্যাত কথাটি মনে পড়লো, "যে আমার পুত্রকে দেখেছে, সে আমাকেই দেখেছে।"

পুরাতন ঠাকুরঘরে প্রণামাদি সেরে স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দজীর (তখন ব্রঃ ত্যাগচৈতন্য) সাহায্যে মঠবাড়ীর দ্বিতলে উঠে এলাম। গঙ্গার দিকে বারান্দায় দক্ষিণাস্য হয়ে মহারাজ একখানি আরামকেদারায় বসেছেন, দুইদিকে সুদর্শন সেবকদ্বয়; গায়ে গলাকাটা পাঞ্জাবী। অতি মৃদুস্বরে কথা বলছেন। অনিমেষনয়নে চেয়ে আছি, এই শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র! স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়নি। শুনেছি, সেই সিংহগ্রীব পুরুষসিংহ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে পারতেন। রাজা মহারাজকে দর্শন করেও মনে হয়েছিল কি বিরাট ব্যক্তিত্ব! যেন হিমালয়ের তুঙ্গতা এবং বিশালত্ব তাঁর মধ্যে বিধৃত। স্বামীজী বলেছিলেন,—"রাজা একটা দেশ শাসন করতে পারে।" মহারাজকে দেখে স্বামীজীর উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম।

বারান্দায় অনেক ভক্ত বসেছিলেন। মহারাজের সান্নিধ্যে সকলেই পুলকিত, পরিতৃপ্ত। দেবদর্শনের আনন্দ অনুভব করছেন সবাই। অনেক রকম কথাই হচ্ছিল। মহারাজও মাঝে মাঝে কথায় যোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁর মন যেন কথার মধ্যে নেই, এই জাগতিক পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হয়ে যেন কোন্ অসীম অনন্ত আনন্দলোকে বিচরণ করছে। মধ্যে মধ্যে গড়গড়ায় তামাক টানছেন, কিন্তু প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এক দিব্যজ্যোতি। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠিকই বলেছিলেন: সন্ন্যাসী দেখবি তো স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখে আয়।

প্রতীক্ষা শেষ হল। সময় হয়েছে। ধীর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লাম। অতি সুমধুর কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোত্থেকে আসছ?" উত্তর দিলাম। বললেন, "কোন বাড়ীতে গেলে বাড়ীর যিনি বড় তাঁর সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে হয়। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের দাদা, তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ?" ত্রুটির কথা স্বীকার করলাম। বললেন :—"যাও দেখা কর।" এমনভাবে কথা কয়টি বললেন যে আজ জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েও সেই মধুর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাচ্ছি। সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি, সে কমনীয় কান্তি আজও যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। উত্তর কালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণই এ ক্ষুদ্র জীবনের সম্বল হবে—একি তারই ইঙ্গিত?

অতিথি-ভবনের নিম্নতল, যেখানে বর্তমান মঠাধ্যক্ষ বাস করেন, সেখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন। গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা মহারাজকে প্রণাম করেছি কি না। আমার উত্তর শুনে বললেন : "তবেই হয়েছে, আর কাউকে প্রণাম করতে হবে না।" গুরুভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি ভালবাসা! শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানেরা শ্রীশ্রীমহারাজকে এই দৃষ্টিতেই দেখতেন। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আধ্যাত্মিকতায় রাখাল আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

আবার ফিরে এসেছি গঙ্গার দিকের দ্বিতলের বারান্দায়। এবার মহারাজ যেন একটু সাধারণ ভূমিতে নেমে এসেছেন। একজন ভক্তকে বলছেন :—'আজ চচ্চড়ি বেড়ে হয়েছিল, খাবে একটু?' সামনে উপস্থিত পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজকে বললেন ভক্তটিকে একটু চচ্চড়ি দিতে। তিনি উত্তরে বললেন,—'ভাত নেই।' মহারাজ আনন্দের সঙ্গে বললেন,—'হলোই বা।' শেষ কথাটি 'হলোই বা' আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও কানে বাজছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ কি একটা কাগজ নিয়ে সেখানে এলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বহুদিন পূর্ব হতেই শুনে আসছি; কোথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা জানি না, অন্ততঃ দেখিনি। বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব হচ্ছে। নবমীপূজা। সঙ্ঘজননী পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা মঠে আসবেন পূজা দর্শন করবার জন্য। ভোর হতেই মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমহারাজ একেবারে বালকভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। কত আশার তপস্যা, কত প্রতীক্ষার সাধনা আজ সার্থক হতে চলেছে। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে একদিন যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বালকভাবে রাখালরাজ লীলা করেছেন, অনেকটা সেই ভাব। মহারাজ ছিলেন গুরু-গম্ভীর, অত্যন্ত রাশভারী লোক। কিন্তু আজ আর সে ভাব নেই—একেবারে বালক। তাড়াতাড়ি ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান সেরে একখানি মাদ্রাজী কাপড় পরেছেন। কোমরে জড়িয়েছেন একখানি সুন্দর মাদ্রাজী চাদর। নিজে সব তদারকি করছেন—কোথায় মঙ্গলঘট বসানো হবে, কোথায় মাঙ্গলিক চিহ্ন দেওয়া হবে। আর মধ্যে মধ্যে 'মা' 'মা' বলছেন। একবার মঠের দক্ষিণের ফটকে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন—ভাবে বিভোর, মুখে শুধু 'মা' 'মা' ধ্বনি। এদিকে মা আহিরিটোলার ঘাট থেকে স্টীমারে গঙ্গা পেরিয়ে সালকিয়ার ঘাটে এসেছেন এবং সদলবলে ঘোড়ার গাড়ীতে বেলুড় মঠাভিমুখে রওনা হয়েছেন। শ্রীশ্রীমহারাজের নির্দেশে সাইকেলের ডাক

বসানো হয়েছে—একজন করে সংবাদ নিয়ে আসছে গাড়ী কতদূর এলো। সবাই ব্যস্ত সন্ত্রস্ত—দেবী-অভ্যর্থনার আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি না থেকে যায়। অবশেষে গাড়ী এসে দাঁড়ালো মঠের দক্ষিণ ফটকে। শ্রীশ্রীমহারাজ নিজে অগ্রগামী হয়ে গাড়ী নিয়ে এসে মঠপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রতিমা দর্শন করবার পর, প্রথমে মহারাজ, পরে অন্যান্য সকলে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। মা কিছুক্ষণ পূজাদি দর্শন করে মহাপুরুষ মহারাজের পুরাতন ঘরে এসে উপবেশন করলেন। আরম্ভ হ'ল কালীকীর্তন। জমজমাট ভাব। ভাবে বিভোর শ্রীশ্রীমহারাজ গুরুভাই- এবং শিষ্যগণপরিবৃত হয়ে সেই কীর্তনানন্দে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। শুধু মধ্যে মধ্যে পুলক শিহরণ হচ্ছে। কীর্তনের শেষভাগে গান আরম্ভ হ'ল—'যাই চলো সে নগরে, যেথায় দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।' চারদিকে ভাবের বন্যা বয়ে চলেছে। শ্রীশ্রীমহারাজ হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁকে নৃত্য করতে দেখে ভাবে বিভোর অন্যান্যরা তাঁকে ঘিরে নাচতে শুরু করলেন। সম্মুখে শ্রীশ্রীভগবতীর প্রতিমা, পার্শ্বে গঙ্গা, আর উপরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে শ্রীশ্রীমা, মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখালরাজ—ব্রজের রাখাল—ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন, ঠিক যেমন ভাবে নৃত্য করতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর। স্বর্গসুধানির্ঝ'র যেন ধরায় অবতরণ করেছে। সে অপূর্ব নৃত্য দর্শন করতে যে যেখানে ছিল সব ছুটে এসেছে, যে পারে নৃত্যে যোগদান করছে, যে পারে না দূরে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে। বহুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হবার পর একজন গুরুভাই মহারাজকে ধরে ফেললেন। তিনি জানতেন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, রাখাল যদি ভাবমুখে জানতে পারে সে কে, তবে এ শরীর সে ত্যাগ করবে। তাই এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভাববিহ্বল হলেই অন্যান্য গুরুভাইরা তাঁকে সাধারণ জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করতেন। মহারাজকে নিয়ে আসা হ'লো মঠবাড়ীর সিঁড়ির বামদিকে ছোট ঘরটিতে। তাঁর প্রিয় তামাক দেওয়া হ'লো, পুড়ে ছাই হ'লো, মহারাজ নল মুখেও দিলেন না। শিহরণ, কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকার শরীরে সব বর্তমান। চারদিকে লেকের ভীড়। মুখে কথা নেই, শুধু মধ্যে মধ্যে কাতরকণ্ঠে 'মা' 'মা' রব। ঐ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর শ্রীশ্রীমাকে পাশের বাড়ীতে সংবাদ দেওয়া হ'লো। মা কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতে একটি ছোট রেকাবিতে কয়েকটি সন্দেশ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং আদর করে সন্তানকে বললেন—"রাখাল, খাও বাবা।" মাকে দেখে মহারাজ বালকের মতো হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। মায়ের চোখেও জল। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! মা নিজে একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে আদরের সন্তানকে প্রসাদ দিলেন এবং উপস্থিত সেবকদের সত্বর মহারাজকে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। অদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হ'লো।

কিছুদিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল —মহারাজ তো ভাব চেপে রাখতে পারেন, কখনও বহিঃপ্রকাশ হতে দেন না, তবে সেদিন কেন এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। স্নেহময়ী জননী অশ্রুনয়নে বললেন, 'আমি যখন উপরে বসেছিলুম, দেখলুম ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে যেমন রাখালের হাত ধরে কীর্তনে নাচতেন তেমনি করে একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে চেয়ে

নৃত্য কচ্ছেন। তখনই বুঝেছিলুম রাখাল বহুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে এই ভাবে নৃত্য করে তাঁর অদর্শনের বিরহ সহ্য করতে পারবে না। এই বিরহ-যন্ত্রণা তার পক্ষে অসহ্য হবে। তাই হয়েছিল। তাই তাকে রজোগুণ-প্রধান কলকাতায় নিয়ে যেতে বলেছিলুম।'

কীর্তনগানের একটি লাইন মনে পড়লো—'যাকে দেখলে পরাণ নেচে ওঠে, হরিনাম আপনি ফোটে, এমন মনের মানুষ মিলে কই।' সেই মনের মানুষই সেই শুভ সন্ধ্যায় মিলেছিল। সত্যই মনে হয়েছিল, 'পাই যদি সেই মনের মানুষ আদর করে বুকে লই।' রাজা মহারাজ সে তো অন্তরের অন্তঃস্থলে রাখবার জিনিস। একটি দিন মাত্র তাঁকে দেখেছি, তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনেছি। আজ প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত হবার পর সেই দিনটি আজও আমার জীবনে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়। মনে হয়, আবার যদি সেই দিনটি ফিরে আসে!

তোমার প্রসন্ন আলো

শ্রীশান্তশীল দাশ

সব আলো একে একে যদি নিভে যায়,
তুমি থাক' দীপ্যমান আমার অন্তরে;
সেইখানে তুমি শুধু, সেই নিরালায়
একান্ত আপন হয়ে সে-আসন 'পরে।

তুমি তো আলোকময় চির অনির্বাণ:
বাহিরের আলো সে তো বড় ক্ষণিকের;
জ্বলে নেভে—সে-আলোকে তৃপ্ত নহে প্রাণ,
তোমার প্রসন্ন আলো সে চিরদিনের।

সে-আলোয় স্নাত হয়ে তোমার চরণে
দেব আমি অশ্রু অর্ঘ্য নিঃশব্দে নীরবে;
সর্বকোলাহলমুক্ত সে-হৃদি গহনে
তোমার আরতি-মন্ত্র উচ্চারিত হবে
মনে মনে; বাহিরে সে চির অপ্রকাশ—
তোমার প্রসাদদীপ্ত সে দিব্য আকাশ।

'তপো ব্রহ্মেতি'

ডক্টর রমা চৌধুরী

"তপস্যা"! এই একটিমাত্র সুন্দর সুমিষ্ট কথার মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে যুগযুগান্ত-ব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সাধনা ও আরাধনা, ধর্ম ও দর্শনের মূলমন্ত্র। সেজন্য পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তপস্যাকেই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে চিরকাল গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে, ভারতদর্শনপ্রাণ উপনিষদ্-সমূহে তপস্যাকেই বরণীয়তম মোক্ষসাধনরূপে বন্দিত করা হয়েছে :—

"পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার।
অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।
তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।
তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা— ॥"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ॥ তৃতীয়বল্লী ॥)

বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন 'ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।' বরুণ বললেন, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে চেষ্টা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।' ভৃগু তপস্যা করলেন। তপস্যা করে তিনি—

অন্নং বহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।—

—জানলেন ক্রমান্বয়ে যে অন্নই ব্রহ্ম, প্রাণই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম, আনন্দই ব্রহ্ম।

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।২২)

"ব্রাহ্মণগণ তাঁকে বেদবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশনব্রত দ্বারা জানতে ইচ্ছা করেন। তাঁকে জেনেই মানব মুনি হন।"

"এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি
সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১।১৬)

"দুগ্ধে নিহিত ঘৃতবৎ যিনি
সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত—
আত্মবিদ্যা-তপোমূল যিনি
শ্রেষ্ঠরূপে বেদে ব্যক্ত,
সত্য-তপস্যা মাধ্যমে তিনি
আত্মায় হন প্রাপ্ত,
আত্মবিদ্যা-তপোমূল যিনি
শ্রেষ্ঠরূপে বেদে ব্যক্ত ॥"

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা"

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।৫)

"এই আত্মাকে সত্য ও তপস্যা দ্বারা লাভ করা যায়।"

কিন্তু কেন এইভাবে "তপস্যা"কেই শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে? তার কারণ হল এই যে, এরূপ "তপস্যার" মধ্যেই নিহিত ও মিলিত হয়ে রয়েছে অন্যান্য সকল সাধন—জ্ঞান—ভক্তি—কর্ম একত্র। বস্তুত:, "তপস্যার" মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞান; শ্রেষ্ঠভক্তি, অথবা ব্রহ্মভক্তি; শ্রেষ্ঠধর্ম অথবা ব্রহ্মসেবা।

এবং এরূপ "তপস্যার" অঙ্গাঙ্গী সাধন হল

"সন্ন্যাস", অথবা, সাংসারিকভোগবিমুখতা, যা না থাকলে "তপস্যাই" হয়ে পড়ে অসম্ভব।

এরূপ শ্রেষ্ঠ সাধনদ্বয় "তপস্যা" ও "সন্ন্যাসের" সম্বন্ধে সর্বজনবরেণ্যা ভগিনী নিবেদিতা কি বলেছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। বিদেশিনী হয়েও তিনি কিভাবে ভারতবর্ষের এই দুটি নিগূঢ়-কঠিন সাধন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে, সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তা ভাবলে সত্যই পরমাশ্চর্য বলে বোধ হয়। অবশ্য, এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, প্রকৃত সাধকের ক্ষেত্রে দেশকাল-ভেদ নেই— তিনি দেশাতীত, কালাতীত, সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বজনের নিরন্তর। তা সত্ত্বেও, মার্গারেট নোব্‌ল্ যখন এদেশে এসেছিলেন তখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা ও উচ্চশিক্ষিতা এবং অপরপক্ষে, ভারতবর্ষ তখনও গভীর-অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন। সেজন্য, তিনি যে কি করে এক নিমেষেই সেরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, সকলের অবহেলিত দেশকেও আত্মার আত্মীয়, প্রাণের বান্ধব, মনের শান্তিরূপে গ্রহণ করে নিলেন—তা নিশ্চয়ই সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে তুলেছিল।

সার্থকনাম্নী "নিবেদিতা" এইভাবে তাঁর "Aggressive Hinduism" নামক সুবিখ্যাত, অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধসংগ্রহসমূহে "তপস্যা" ও "সন্ন্যাস" সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে প্রপঞ্চনা করেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঋজু ও দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। ভারতীয় সাধনক্ষেত্রে সেই দিক থেকে তাঁর দান অল্প নয়। "শিখাময়ী" নিবেদিতার সুবর্ণ জীবন-শিখা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও দীপ্যমানা সগৌরবে। প্রথমতঃ, "তপস্যা" কি? "তপস্যা" হল প্রচেষ্টা। কি বিষয়ে প্রচেষ্টা? আত্মধারণ বিষয়ে প্রচেষ্টা, আত্মোপলব্ধি করে, আত্মধারণ করে, আত্মস্থিতি—এই তো হল মহাজীবন-লক্ষ্য। বস্তুতঃ, "উপলব্ধি" "ধারণ" ও "স্থিতি" সমার্থক। যে উপলব্ধি ধৃত হয়ে থাকে না, যে ধৃত হয়ে স্থিতি করে না—তার মূল্য কতটুকু? এই কারণে, ভারতীয় দর্শন-মতে প্রকৃত "উপলব্ধি" শাশ্বত, এবং "উপলব্ধি", "ধৃতি" ও "স্থিতি" এই কারণেই সমার্থক। যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সে জন্য তাপস, অথবা স্বীয় মহিমায় চির-ভাস্বর। এবং যিনি মুমুক্ষু, তিনি এই মহোপলব্ধিলাভের সঙ্গে তার শাশ্বত ধারণ ও স্থিতির জন্য সচেষ্ট হন। মুমুক্ষুর এরূপ তপস্যার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দান করে নিবেদিতা বলছেন—"In the life of Tapasya is constant renewal of energy and light". (P. 28)

আমরা কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি আত্মার অন্তরস্থ শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, আলোক, আনন্দ, অমৃত। সাধক-স্তরে, এই সব বারংবার ধরে নিতে হয়, এই সব দিয়ে জীবনকে বারংবার পূর্ণ করে নিতে হয়, এই সবের গরিমায় বারংবার নিজেকে ভাস্বর করে নিতে হয়।

এই অর্থেই, নিবেদিতা এস্থলে "renewal" অথবা "নবীনীকরণের" কথা বলেছেন। প্রকৃতকল্পে, আত্মার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও আলোক, তার "নবীনীকরণের" কোনো প্রয়োজন, অথবা সম্ভাবনামাত্রই নেই, যেহেতু, যা নিত্য, তা পুনরায় নবীনীকৃত হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, সাধকের পক্ষে, মোক্ষের পন্থা স্বভাবতই অতি কঠিন পন্থা, যাকে কঠোপনিষদ্ অতি যোগ্য ভাবে বলেছেন—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" (কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪) শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি দুর্গম, অতি দুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই মোক্ষ-

মার্গ। অতএব, সেই পথে প্রয়োজন নিরন্তর তপস্যার, নিরন্তর সাধনার, নিরন্তর আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার।

এই ভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত, উভয়ের জীবনই ওতপ্রোতভাবে তপস্যা-বিমণ্ডিত—অবশ্য কিছু বিভিন্ন অর্থে।

সুবিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষদে, মানুষের,—সাধারণ মানুষ, মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষ, সকলেরই—জীবন যে তপস্যাময়, এই তত্ত্বটি অনুপম ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে "পুরুষ-বিদ্যা" অথবা পুরুষযজ্ঞ প্রকরণে (৩-৭)। এ স্থলে, পুরুষকে তুলনা করা হয়েছে একটি যজ্ঞের সঙ্গে।

"অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩-১৭-৪)

অর্থাৎ, "তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা এবং সত্যবচন—এই সমুদয় এই পুরুষরূপী যজ্ঞের দক্ষিণা।"

যাঁরা এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপস্যা-দান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনরূপ প্রকৃষ্ট পঞ্চগুণ বিশিষ্টরূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই—

"আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি।"

(ছাঃ ৩-১৭-৭, ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০)

"যে জ্যোতি পরব্রহ্মে দীপ্তি পাচ্ছে, জগতের বীজস্বরূপ, দিবালোকের ন্যায় সর্ব-ব্যাপী, সেই শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন করেন।"

তাঁহারাই সানন্দে, সগৌরবে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্থিরবিশ্বাসভরে বারংবার বলেন—

"উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩-১৭-৭)

"অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, সেই জ্যোতিকে স্বীয় অন্তরস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিরূপে দর্শন করে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে লাভ করেছি—আমি সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকেই লাভ করেছি!" জ্যোতির্ময়ী নিবেদিতা এই অমল জ্যোতিরই আভাস দিয়েছেন তাঁর সুধন্য জীবনের প্রতি পদে।

দ্বিতীয়তঃ "সন্ন্যাস"। এস্থলেও নিবেদিতা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদেরই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—"It is not his Gerua cloth but his selflessness that makes a monk". (P. 29)

"সন্ন্যাসের অর্থ কেবল গেরুয়া বস্ত্র পরিধান নয়, কিন্তু স্বার্থপরতা বিসর্জন।"

"সন্ন্যাস" কি? "সন্ন্যাস শব্দটির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হল—"সম্যক্ ভাবে ন্যাস" অথবা সুষ্ঠুভাবে অর্পণ, স্থাপন, ত্যাগ। এরূপে, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী যিনি স্বীয় আত্মাকে নিঃশেষে অর্পণ করতে পারেন বিশ্বাত্মার মধ্যে, স্বীয় আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করতে পারেন আত্মার ভিত্তিতে, স্বীয় আত্মাকে অকাতরে ত্যাগ বা দান করতে পারেন জনগণের সেবার্থে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার অতি সুন্দর ভাবে বলেছিলেন—

"The ordinary sannyasi gives up the world, goes out and thinks of God. The real sannyasi lives in the world, but is not of it.……Live in the midst of the battle of life. Any one can keep calm in a cave, or when asleep. Stand in the whirl and madness of action, and reach the centre. If you

have found the centre, you cannot be moved."

"সাধারণ সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করেন, বাইরে চলে গিয়ে ঈশ্বরচিন্তা করেন। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী সংসারেই বাস করেন, অথচ সংসারে আবদ্ধ হন না।……জীবন-সংগ্রামের মধ্যেই বাস কর। নির্জন গুহায় অথবা নিদ্রাকালে যে কোনো ব্যক্তিই শান্ত হয়ে থাকতে পারেন। কর্মের ঘূর্ণাবর্ত ও উন্মত্ততার মধ্যেই দণ্ডায়মান হও, এবং কেন্দ্রে উপনীত হও। একবার কেন্দ্রটিকে লাভ করলে, তোমাকে কেহই সরাতে পারবে না।"

এই ত হল সন্ন্যাসের প্রকৃত কথা—একবার কেন্দ্রটিকে লাভ—এই তো হল "সম্যক্ ন্যাস" অর্থাৎ, আত্মাতে আত্মাকে ন্যস্ত করা, আত্মার কেন্দ্রে আত্মাকে স্থাপন করা, আত্মার ভিত্তিতে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করে, নিবেদিতাও একই সুরে বলছেন—

"Great is the impulse of renunciation ; great is the sustained self-sacrifice of a heroic life" (P. 29)

"ত্যাগের প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই মহৎ; কিন্তু মহত্তর হল বীরের নিত্য আত্মত্যাগ।"

অর্থাৎ, একদিন সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়া বরং সহজ। কিন্তু, প্রতিদিন, পলে পলে, পদে পদে, নিরন্তর আত্মত্যাগ করে যাওয়া; জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও নিঃস্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া; সংসারে বাস করেও সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত না হওয়া—অল্পশক্তি, অল্প সাহস, অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। সে জন্য প্রকৃত সন্ন্যাসী জীবন-যুদ্ধ-বিমুখ নন, সংসার-রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নির্জন কাননের শান্তিলাভে ব্যাকুল নন। উপরন্তু, সংসারে বাস করে, সাসারকে জয় করাতেই তাঁর শৌর্যবীর্য। সেজন্য সন্ন্যাসীর জীবন ওতপ্রোতভাবে বীরের জীবন, ভীরুর জীবন নয়।

অনুপমভাবে নিবেদিতা পুনরায় বলছেন—

"In the soul of the Mahapurusha it is difficult sometimes to tell whether soldier or sannyasi is predominant. He combines the daring of one with the freedom of the other." (P. 29)

"মহাপুরুষের আত্মায়, যোদ্ধা অথবা সন্ন্যাসীর মধ্যে কোন্ জন প্রধানতর, তা বলা মাঝে মাঝে সত্যই কঠিন হয়ে পড়ে। প্রকৃত-পক্ষে, তিনি একের সাহস এবং অপরের স্বাধীনতার একটি সুন্দর সমাবেশই মাত্র।"

এই ভাবে, যে "Aggressiveness" অথবা সাহস-সক্রিয়তা-শৌর্যবীর্যাদি নিবেদিতার জীবনদর্শনের মূল মন্ত্র ছিল, তাই তিনি বিশেষ-ভাবে সন্ন্যাসেরও মূলমন্ত্ররূপে ঘোষণা করেছেন। বিশেষভাবে, এই জন্য যে, তিনি স্বয়ং ছিলেন সন্ন্যাসিনী, এবং তাঁর গুরুর সম্প্রদায়ও তাই। সেজন্য বারংবার তিনি বলছেন—সুন্দর উপমার সাহায্যে—

"Years have no mark on the aggressive life. It is as ready to cast itself down from the palm-tree's height in old age as it was in youth. Or, more. For, the spiritual will has grown stronger with time." (P 29-30)

অর্থাৎ, এরূপ সতেজ সক্রিয় শৌর্যবীর্য-শীল জীবনে কাল তার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারে না। সেজন্য এরূপ জীবন উচ্চ খর্জুর-বৃক্ষ

থেকে ঝাঁপ খেতে যৌবন ও বার্ধক্যে সমান প্রস্তুত ; বরং, বার্ধক্যে প্রস্তুত আরো অধিক, যেহেতু আধ্যাত্মিক ইচ্ছা-শক্তি কালের সঙ্গে বরং বর্ধিতই হয়।

এরূপে, সন্ন্যাসী বীর, সন্ন্যাসী কর্মী, সন্ন্যাসী সংসারাবাসী। তা সত্ত্বেও, সন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপে নিরাসক্ত পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, তিনি সংসারে বসবাস করেও, সংসারে লিপ্ত হন না। নিবেদিতা বলছেন যে, সন্ন্যাসীর নিকট আত্ম-সুখ তুচ্ছ—

"The self ceases to be a possible motive."

"স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি কিছুই করেন না।"

এরূপে, সন্ন্যাসী গীতায় বর্ণিত "স্থিত-প্রজ্ঞ" অথবা "স্থিতধী" "মুনি" (২।৫৪-৭২)।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।"
(২।৫৬)

"দুঃখে অনুদ্বিগ্ন যিনি, সুখে স্পৃহাহীন।
তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি, কামাদিবিহীন॥"

তিনি সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী, ভোগের পরিবেশের মধ্যে থেকেও ত্যাগী, চঞ্চলতার সংস্পর্শেও স্থির। গীতার বাণী পুনরায় শুনুন—

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।"
(২।৭০)

"পরিপূর্ণ নির্বিকার সমুদ্র যেমন
নদীজলধারে কভু হয় না প্লাবিত,
সেই মত কাম্য মাঝে রাজেন যে জন
তিনি শান্তিলাভকারী, নয় কামস্ফীত।"
(গীতা ২।৭০)

এইভাবে, "তপস্যা" ও "সন্ন্যাসের" মাধ্যমে আমাদের অন্তরের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়ে গেলে, মেঘাপসরণে সূর্য যেমন তার অনির্বাণ সুবর্ণবিভায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি এই শ্রেষ্ঠ সাধনদ্বয়ের সহায়তায় আমাদের অন্তরের অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে গেলে আমাদের অন্তরস্থ আত্মার স্বীয় স্বরূপটি প্রকাশিত হয় পরিপূর্ণ গরিমায়, মহিমায়, মধুরিমায়। এরূপ "তাপস", অথবা "সন্ন্যাসীই" তো হলেন যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় জীবন-ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতীক :—

"Strong as the thunderbolt, austere as Brahmacharya, great-hearted and self-less, such should be that Sannyasin who has taken the service of others as his Sannyas ; and, not less than this should be the son of a militant Hinduism." (P 32)

"বজ্রের মত কঠোর; ব্রহ্মচর্যের মত সংযমী, উদারহৃদয় ও নিঃস্বার্থপর, পরসেবাকেই স্বীয় সন্ন্যাসরূপে গ্রহণকারী সন্ন্যাসীর এই তো লক্ষণ।"

এরূপ সন্ন্যাসীর স্বপ্নই দেখেছিলেন আজীবন স্বামী বিবেকানন্দ ; এবং এরূপ মাত্র বিশ জনকে পেলেই যে ভারতোদ্ধার হতে পারে, সে কথাও তিনি স্থির-বিশ্বাসভরে, আনন্দসহকারে, শক্তি-সঞ্চারে, উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে গিয়েছেন।

যোগ্য গুরুর যোগ্যা শিষ্যা তপস্যা ও সন্ন্যাসের এই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য অতি মনোরমভাবে প্রকাশিত করে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

স্বামী আদিনাথানন্দ

ভূমিকা

শিবাবতার ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য ও যতিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণাবতার শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য উভয়েই শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে[১] ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উভয় আচার্যই দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক ও সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা। সর্বোপরি উভয়েই বেদান্তদর্শনের অভিনব ভাষ্যপ্রণেতারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দিব্যজীবন ও প্রতিভা-দীপ্ত দার্শনিক চিন্তাসম্ভার ভারতের বেদান্ত-দর্শন-সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

শ্রীশঙ্করাচার্যের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিজ্ঞান ও বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিবিদিষাসন্ন্যাস, জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয় প্রভৃতি অদ্বৈতভাব-মূলক মতবাদ কোন ঐতিহাসিক কারণে দক্ষিণ ভারতে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। উত্তর ভরতে অবশ্য তৎপ্রতিষ্ঠিত দশনামীসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী পণ্ডিতপ্রবর প্রচারকগণ উক্ত মতবাদকে একটি স্থায়ী রূপ দানে সমর্থ হইয়াছেন। স্বয়ং আচার্য জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে অবস্থান করিয়া স্বীয় মতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আবার অন্যদিকে বাংলাদেশে ও উত্তর ভারতে শ্রীরামানুজ-প্রচারিত অদ্বৈতভাবমূলক অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক মতবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মণ্ডলী ব্যতীত অন্য কোন মহলে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অথচ ভগবান শঙ্করাচার্যের শারীরক-ভাষ্যের সমতুল্য প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্য জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়মূলক অধ্যাত্মসাধনার অপূর্ব প্রেরণার উৎস। দক্ষিণ ভারতে অষ্টশত বৎসরব্যাপী এই যতিরাজের মতবাদের বহুল প্রচার ও ব্যাপ্তি, শ্রীসম্প্রদায়ের অনুগামী অগণিত ভক্তসমাকুল বৈষ্ণবসমাজ, এবং তাঁহার পদানুগ প্রতিভাসম্পন্ন ঋষিতুল্য বহু দার্শনিক আচার্যের আবির্ভাব শ্রীরামানুজদর্শন ও মতবাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ায় আর্য-সংস্কৃতি যে বৈদিক সংবিৎ পুনরায় লাভ করিয়াছিল, শ্রীরামানুজের অপূর্ব অবদান তাহার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের অভাববশতঃ এই মতবাদের কোন আলোচনা বা প্রসার নাই বলিলেই চলে। বিদ্বন্মণ্ডলীতে এই মতবাদটি অবশ্য শঙ্করাচার্যের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অল্পবিস্তর স্থানে আলোচিত হইয়া থাকে; সর্বসাধারণের মধ্যে এই পরম ভক্তিমূলক অদ্বৈতবাদের প্রচার হয় না বলিলেই চলে।

সেই জন্য মনে হয় নব যুগধর্মপ্রবর্তনে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সহজসাধ্য ধর্মমত সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। যুগনায়ক স্বামীজী তাঁহার সারগর্ভ বহু বক্তৃতায় এই মতবাদের সম্যক অলোচনা করিয়া মূল্য নির্ণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তায় এই মতবাদকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশিষ্ট স্তররূপে নির্দেশিত করিয়াছেন। বিভিন্ন অবস্থানকেন্দ্র হইতে তোলা সূর্যের

১ রামানুজের জন্ম চৈত্র মাসে, শঙ্করের বৈশাখে।

বিভিন্ন আলোকচিত্রের (Photograph) প্রত্যেকটিই সেই সূর্যেরই প্রতিচ্ছবি—কোন চিত্রই মিথ্যা নহে—অথচ প্রত্যেক চিত্র বিভিন্নাকারবিশিষ্ট। তেমনই মানবমন চরম সত্যের অনুভূতির পথে 'একই সত্যকে' বিভিন্নাকারে নিজের মনের ছাঁচে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই কারণে জগতে এত মতবাদ ও সত্যের এত রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভূতি আসিয়া থাকে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটি বিশেষ স্তর।

২

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মতবাদ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য :

১১ই মার্চ ১৮৮৫ খৃঃ ভক্তপ্রবর গিরীশ ও যুবক নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শাস্ত্র-বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিষয়বস্তু ছিল, ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিতে পারেন কি না। কারণ তিনি যদি বাক্যমনাতীত সত্তা হন, যদি অনাদি, অনন্ত ও নির্গুণস্বরূপ হন, তবে তাঁহার সাকার-রূপ ধারণ কি প্রকারে সম্ভব ?—ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই আলোচনা শুনিয়া 'শ্রীম'কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : 'আমার এই সব তর্কবিচার ভাল লাগে না। আমি দেখি সবই ঈশ্বর। তিনি জগতের অতীত, আবার জগতের সব তিনিই। আমি কখনও এমন স্তরে যাই যখন সব তাঁর সত্তাতে লীন হয়ে যায়। আমার আমিটুকুও। আবার নীচের ধাপে এসে দেখি তিনিই সব হয়েছেন। শঙ্করের নির্গুণ অদ্বৈত ভাব সত্য। আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবও সত্য।'

অন্য সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, বেলের সবটাই লইতে হয়—খোসা, শাঁস, বীচি, সব ; তাহা না হইলে ওজনে কম পড়িয়া যায়। ইত্যাদি। ইহা শ্রীরামানুজ-প্রচারিত অদ্বৈতবাদের আসল কথা। শ্রীগীতায় আছে :

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥

পূজ্যপাদ স্বামীজী তাঁহার স্বরচিত 'সৃষ্টি' কবিতায় উক্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :

"সেই সূর্য তারি কিরণ ;
যেই সূর্য, সেই কিরণ

অন্য এক প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন,

"যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ॥"

৩

বহুধাবিভক্ত বৌদ্ধধর্মসম্প্রদায়গুলির নৈতিক অবনতির পর হিন্দুসংস্কৃতির যে নবজাগরণ হয়, সেই সম্বন্ধে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বরচিত প্রবন্ধে দক্ষিণ ভারতের দুইটি ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

'এই প্রতিক্রিয়া আন্দোলন উত্তরে কুমারিল এবং দক্ষিণে আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া হিন্দুধর্ম তাহার শেষ রূপ পরিগ্রহ করিল। এই প্রতিক্রিয়া প্রথমতঃ বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রবর্তনে চেষ্টা করিয়াছিল। পরে ব্যর্থ হইয়া বেদের দার্শনিক ভাগ বা উপনিষদ্‌সমূহকেই ভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়াছিল।

'শঙ্করাচার্যের আন্দোলন অতি উচ্চ জ্ঞানমার্গেই চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতিভেদে অতি নিষ্ঠা, সহজভাবাবেগ সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শুধু সংস্কৃতচর্চার মাধ্যমে প্রচার—এই ত্রিবিধ কারণে জনসাধারণের মধ্যে এই আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অন্যদিকে রামানুজ একটি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব মতবাদের ভিত্তিতে এবং ভাব ও ভক্তির

বিরাট আবেদন লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধর্মোপাসনাদির ক্ষেত্রে জন্মগত জাতিবিভাগ তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলেন; সর্বসাধারণের কথ্য ভাষাই ছিল তাঁহার প্রচারের ভাষা। ফলে জনসাধারণকে বৈদিক ধর্মের আবেষ্টনীতে ফিরাইয়া আনিতে রামানুজ সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিলেন।'

শ্রীরামানুজদর্শনের বিশদ আলোচনা পরবর্তী সংখ্যায় করা হইবে। তাহাতে শ্রীরামানুজদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত, তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইবে; এবং তৎপূর্বে উক্ত মতের প্রচার হইয়াছিল কিনা, তাঁহার প্রবর্তিত পন্থাবলম্বনকারীদিগকে 'শ্রীসম্প্রদায়' বলা হয় কেন, ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈত মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কিনা, বেদান্তসূত্রের 'শ্রীভাষ্যে' আচার্য শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে কিভাবে খণ্ডন করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং একটি সরস ভক্তিমূলক অদ্বৈতবাদের প্রবর্তন করিয়া ভারতীয় দর্শনচিন্তাকে একটি নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন—ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

মায়ের আগমনে

স্বামী জীবানন্দ

স্নিগ্ধ অমল শারদ প্রভাতে
এলে মা মোদের ঘরে,
কণ্ঠ আজিকে হয়েছে মুখর
তব আবাহন তরে।
মঙ্গলঘট সাজাব আমরা,
মঙ্গলশাঁখ বাজাব।
বনফুল তুলে মায়ের পূজায়
পুণ্য অর্ঘ্য সাজাব।
মায়ের নামেতে মিলিব সবাই
ভেদাভেদ ঘুচে যাবে।
অযুত কণ্ঠে উঠিবে যে তান
দুর্গা মায়ের ভাবে!

মহা সমারোহ জাগিছে ভুবনে
আনন্দধারা বহিছে জীবনে
মধুর ছন্দে পুলকিত মনে
গাহিব মায়ের গান।
জননী মোদের এসেছে দুয়ারে
হবে দুখ অবসান।
অসুরনাশিনী এসেছে মোদের
দূরে যাবে সব ভয় দানবের
বিদূরিত হবে দীনতা মনের
পুলকে ভরিবে প্রাণ
পরান ভরিয়া পূজিব মায়েরে
লভিব আর্তিত্রাণ।

জয় মা জয় মা শক্তিদায়িনী,
জয় মা শান্তিদায়িনী।
জয় মা জয় মা অসুরনাশিনী,
জয় মা মুক্তিদায়িনী।

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

অধ্যাপক রেজাউল করীম

আমাদের দেশের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল স্বামীজীর আবির্ভাবের কিছু পূর্বে। স্বামীজীর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি জাতীয়তাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উত্তোলন ক'রে একটি মহৎ আদর্শে উন্নীত করেছিলেন। জাতীয়তার তিনি যে সংজ্ঞা দিলেন, তা আর ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকল না। তাঁর জাতীয়তার ধারণা ও আদর্শ শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-প্রেম ও বিশ্বমানবতার পর্যায়ে উন্নীত হ'ল। বস্তুতঃ তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে "জাতীয়তা" বলতে ঠিক কি বোঝায় তার সম্যক ধারণা আমাদের বহু নেতার ছিল না।

পাশ্চাত্য দেশের আদর্শ অনুসারেই কি আমাদের জাতীয়তা গ্রহণ করতে হবে? তা যদি করি তবে ভারতের শাশ্বত আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য দেশের জড়বাদী আদর্শের পার্থক্য থাকল কোথায়? পশ্চিম দেশে জাতীয়তা বলতে বোঝায় একধর্মাবলম্বী ও একভাষাভাষী লোকসমষ্টি নিয়ে একজাতি গঠিত হবে। তারা বসবাস করবে একটা নির্দিষ্ট দেশে। সে-দেশে অন্য ধর্মাবলম্বী ও অন্য ভাষাভাষী লোকের কোনো রাজনৈতিক অধিকার থাকবে না। ফরাসী বিপ্লবের বহু পূর্বে ত্রিশবর্ষীয় যুদ্ধের পর এই ধরনের জাতীয়তা ইউরোপে গড়ে উঠেছিল, তার ফলে ক্যাথলিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকল। আর প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশে প্রটেস্ট্যাণ্ট প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকল। এর শেষ পরিণতি এই হল যে, প্রটেস্ট্যাণ্ট দেশে ক্যাথলিকগণ আর ক্যাথলিক দেশে প্রটেস্ট্যাণ্ট-গণ নিজেদের নিরাপদ মনে করত না। এরা পার্শ্ববর্তী স্বধর্মাবলম্বীদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগল। তারপর ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হ'ল। এই বিপ্লবও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তন করতে পারল না। এর কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ধর্ম ও এক ভাষা নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হতে লাগল। এবং এক দেশ অন্য দেশকে শত্রু মনে করতে লাগল। পাশাপাশি দুটি ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত জাতীয়তার প্রশ্নের শেষ মীমাংসা হয়নি। পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তা অপর দেশের মানুষের প্রতি একটা অহেতুকী ঘৃণার ভাব জাগ্রত করতে সাহায্য করে। নিজের রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করে অপর রাজ্যের উপর অধিকার বিস্তার করার প্রতি সবসময় সে-দেশে একটা প্রবণতা দেখা দেয়। তাই ইউরোপে বিগত দু-তিনশ বছর ধরে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। তবুও পররাজ্য-জয়ের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়নি। অতি উগ্র জাতীয়তার শেষ পরিণতি যুদ্ধ, রক্তারক্তি ইত্যাদি। নিজের দেশের মঙ্গলের নামে সেখানে কোনো অন্যায় কাজ করতে কেহই পশ্চাৎপদ নয়। দেশের মঙ্গলের জন্য যদি অপর দেশ দখল করা দরকার মনে করে, তবে তা করতে কেহই দ্বিধা বোধ করে না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এ ধরনের জাতীয়তাবোধের সহিত ন্যায়নীতি বিশ্বপ্রেম ও মানবতার কোনো সংস্রব নাই। পরমহংসদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রকার বিদ্বেষ-সৃষ্টিকারী

উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শকে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মতে জাতীয়তার আদর্শ আরও উন্নত, মহৎ ও ব্যাপক হওয়া দরকার।

স্বামীজীর পূর্বে সত্যই এদেশে কোনো উন্নততর জাতীয়তার আদর্শ দানা বাঁধেনি। তিনি প্রকৃত জাতীয়তার আদর্শের নূতন সংজ্ঞা দিলেন। তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, পাশ্চাত্য দেশ যে জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করেছে তার হুবহু নকল করলে ভারতের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হবে বেশী। তিনি বললেন, বেদান্ত যে-দেশের মর্মকথাকে অমর ভাষায় ঘোষণা করেছে, সে-দেশ পাশ্চাত্য দেশের জাতীয়তাকে গ্রহণ করতে পারে না। বৈদান্তিক আদর্শ যে দেশের চরিত্র, মানবিকতা ও চিন্তাকে গঠন করতে উৎসাহ দেয় সে-দেশ কখনো মানব-প্রেম-বর্জিত পাশ্চাত্যের জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। তিনি নানাপ্রকার উদাহরণ উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিলেন যে, ভারতবর্ষ যদি পাশ্চাত্যের জাতীয়তার আদর্শ গ্রহণ করে তবে নৈতিক, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তার সমূহ ক্ষতি হবে। তাতে ভারতের অখণ্ডতা থাকবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়বে। এই হিংসা-বিদ্বেষ গোটা ভারতকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। তাই তিনি জাতীয়তার নূতন সংজ্ঞা দিলেন। জাতীয়তার গোটা প্রশ্নকেই নূতনভাবে চিন্তা করলেন। আজ সমগ্র জগৎ বুঝেছে যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইউরোপে যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ অহরহ লেগে আছে, তার মূল কারণ এই ভ্রান্ত জাতীয়তা। এই যে দু-দুটো বিশ্ব-সমর হয়ে গেল তা তার ভ্রান্ত জাতীয়তাকে প্রারম্ভিক প্রেরণা দিয়েছে। "সবার উপর জার্মানি সত্য"—এই ধারণাই হিটলারকে দাম্ভিক, অহঙ্কারী ও পরদেশ-লোলুপ করে তুলেছিল। স্বামীজী আমাদের বার বার সাবধান করে দিয়েছেন যেন আমরা এ-ধরনের কোনো মতবাদকে প্রশ্রয় না দিই। তা যদি দি, তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মতই আমাদেরও ধ্বংস হবে। যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ বিশ্ব-শান্তির পরিপন্থী, সে-আদর্শ বেদান্ত ও উপনিষদের দেশ ভারতবর্ষ কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারে না।

স্বাধীনতা-লাভের বহু পূর্বেই স্বামীজী দেশ-প্রেম ও জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে যে-সব মূল্যবান কথা বলেছিলেন ও যে-উপদেশ দিয়েছিলেন তা যদি আমরা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতাম ও তদনুসারে দেশের রাজনৈতিক আদর্শকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হতাম, তবে স্বাধীনতালাভের পর দেশের অবস্থা অন্যরূপ হত। আজ দেশের চতুর্দিকে যে-সব বিচ্ছিন্ন ও বিভেদকারী মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে এবং দেশের সংহতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, তা হয়তো সম্ভব হত না। আজ দেশের চারদিকে যে-অবস্থা দেখছি তাতে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অতীতের মহান সাধকদের ঐক্যসাধনা বুঝি ব্যর্থ হতে চলেছে আজ দেশের তরুণসমাজের এক বিরাট অংশ. স্বামীজীর রচনাবলী ভক্তির সহিত পাঠ করে না; বিদেশের নেতাদের তারা আদর্শ বলে গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করে না। আজ যদি তারা স্বামীজীর রচনাবলী পাঠ করত তবে দেখত যে, এ-যুগের উপযোগী রাজনীতি ও অর্থনীতির বহু কথা তিনি পূর্বে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের জাতীয়তা বা স্বদেশপ্রেম হয় না। টাকা-পয়সা ও আর্থিক সম্পদ চাই নিশ্চয়ই কিন্তু কেবল এইগুলিই কোন জাতির একমাত্র কাম্যবস্তু হওয়া উচিত নয়। আর্থিক সম্পদ

ও পার্থিব সুখ-সম্ভোগের সহিত চাই ধর্মনিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক সাধনা, চাই মনের গভীরতা, চিন্তার ঔদার্য, মনের প্রীতি। চাই ভারতের অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান। এ-সবের অভাবে নিছক রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধার দ্বারা দেশের মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হবে না। ইউরোপ জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে বাদ দিয়ে কেবলই জাতীয়তা ও দেশ-প্রেমের উপর সমস্ত শক্তি নিবদ্ধ করেছে। ইউরোপ যন্ত্রদানবের পূজা করতে করতে গোটা মানুষকেই ভুলতে বসেছে। এইভাবে সে এমন একটা ফ্রাঙ্কেনস্টিন সৃষ্টি করেছে, যে গোটা পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন ভারতবর্ষকে কি এইভাবে পশ্চিম দেশের হুবহু নকল করতে হবে? এরূপ করলে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ কি ইউরোপের মত ঐরূপ একটা জাতীয়তার সৃষ্টি করবে যা দেশের ধর্মনৈতিক জীবনকে শুষ্ক করে দেবে, যা ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনাকে স্তিমিত করে দেবে? স্বামীজী কিছুতেই তা চাননি। কত আকুলভাবে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করে সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতার মত বহু সার সত্য বলেছেন। আজ আমরা তাঁর সে-সব কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি। তিনি কখনও কোন অর্থহীন তাৎপর্যবিহীন ফাঁকা বুলি আওড়াননি। তিনি যা বলতেন তা আত্মা ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তবেই বলতেন। তাঁর ছিল একটা গভীর প্রত্যয়বোধ, আন্তরিকতা, দেশের মানুষের প্রতি হৃদয়-ভরা দরদ; এই সব মহৎ গুণের জন্যই তিনি দেশ-বিদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও গভীর জ্ঞানের জন্য সকলকে প্রভাবিত করেছিলেন। আজ গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে স্বামীজীর রচনা সকলের পাঠ করা দরকার। তাঁর দেশপ্রেম- ও জাতীয়তা-ভাবোদ্দীপক রচনাবলী পড়লে মনে হবে যে, তাঁর বাণী ও উপদেশ চিরনূতন। তা কোনো দিন পুরাতন হবে না। আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর পূর্বে তিনি যা বলেছেন, তার মূল্য এতটুকু হ্রাস পায়নি। কারণ, তাঁর বাণীর মধ্যে ছিল একটা অসাধারণ মৌলিকতা। দেশের তথা জগতের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন; আজ গভীরভাবে চিন্তা করে তার সদুত্তর অনুসন্ধান করতে হবে।

স্বামীজীর জাতীয়তার মধ্যে হিন্দু ব্যতীত খ্রীষ্টান, মুসলিম, পার্শী, য়িহুদী, শিখ, বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তিনি মনে করতেন এরা সকলেই ভারতীয় জাতীয়জীবনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, ভারতের জন্য চাই বৈদান্তিক মন ও ঐস্লামিক দেহ। অপরাপর সম্প্রদায়কেও তিনি আপন-জন বলে মনে করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, দেশ বলতে দেশের মাটিকে বুঝায় না। দেশের মানুষকে নিয়ে দেশ। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়: "বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" দেশ মানে দেশের অগণিত নরনারী; ক্ষুধিত, দরিদ্র, আশ্রয়হীন, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ—এদের সকলকে নিয়েই দেশ। এদের কল্যাণই দেশের কল্যাণ। বিশেষ করে তিনি দেশের অগণিত দীনদরিদ্র, ক্ষুধার্ত, পীড়িত, আর্ত মানুষের জয়গান গেয়েছেন। এদেশের

রাজনৈতিক নেতারা এদের কথা চিন্তা করেননি যখন, স্বামীজী উদাত্তকণ্ঠে এদের আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে বীর,···সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই,···ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা,···আমায় মানুষ কর।'—এই মহাবাণী যিনি উদাত্তস্বরে বলেছেন, তাঁর চেয়ে আদর্শ দেশ-প্রেমিক আর কে হতে পারে? তাঁর উপদেশের মর্মকথা হল, দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে হবে, প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার করতে হবে, চরিত্র-গঠন করতে হবে; ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে প্রাণহীন আচার-বিচারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সজীব করে তুলতে হবে।

আমাদের দেশের নেতারা যখন বক্তৃতা করে দেশ সেবার কাজ শেষ করতেন, তখন স্বামীজী বাস্তব কাজের কথা বলেছেন। তিনি বললেন, কেবল বক্তৃতা করলেই দেশ-প্রেম হয় না। দেশের জনগণের সহিত একাত্ম না হলে প্রকৃত দেশ-সেবা হয় না, তাতে প্রকৃত দেশ-প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন এই কেমন করে দেশের লোকের সহিত একাত্ম হওয়া যায়? যে-ব্যক্তি দিনরাত অর্থচিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, জড়বাদী চিন্তায় বিভোর, খাওয়া-পরা ব্যতীত অন্য কথা ভাবে না, ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পদ ছাড়া অন্য চিন্তা যার মনে আসে না, সে যদি দেশ-প্রেমের কথা বলে, তবে তার চেয়ে হাস্যাস্পদ জিনিস আর কী হতে পারে। সে কেমন করে দেশের সহিত একাত্ম হবে? ইউরোপ আমেরিকাও এই অর্থে দেশ প্রেমের কথা বলে। সেখানে দিনরাত যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথাই উচ্চারিত হয়ে থাকে। জীবিকার লড়াই, রাজ্যবিস্তার ও প্রভাব-বিস্তারের লড়াই—এই সবই তো ইউরোপের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেখানে মানুষ কি মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে? সেখানে pleasure আছে, কিন্তু happiness নাই। নিত্য-নূতন মারণাস্ত্র তৈয়ার হচ্ছে সেখানে। কিন্তু সে-দেশের মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শূন্য। ভারত যদি সেই আদর্শ গ্রহণ করে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। দেশের সহিত একাত্ম হতে গেলে চাই ধর্মনিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ, নৈতিক জীবন গঠন, প্রত্যেক রাজনৈতিক আদর্শের পশ্চাতে থাকা চাই বিশ্ব-প্রেম, সর্ব-ব্যাপী প্রীতি ও ভালবাসা - সেই ভালবাসা যা পরদেশ-বিজয়ে উল্লাসবোধ করে না। সকল মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চারিত করে দিতে হবে। 'শিবজ্ঞানে জীবসবা'—ঠাকুরের এই মহতী বাণী হল সেই আদর্শের পূর্ণ পরিণতি। জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের মধ্যে থাকবে না কোনো ভেজাল। এই প্রকার জাতীয়তা ও দেশপ্রেম মানুষকে বাঙালী বিহারী ইত্যাদি ভাবে দেখবে না, কাউকে প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক করবে না—করবে মানুষ। এই মহান জাতীয়তাই ছিল স্বামীজীর জাতীয়তা। এই উদার দেশ-প্রেম তথা জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই ছিল স্বামীজীর আদর্শ। ব্যাপকভাবে সমস্ত মানুষের মনে যখন এই ভাব জাগ্রত হবে তখন তার জাতীয় চেতনাও সার্থক হয়ে ওঠবে। তখন তার দেশ প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হবে। স্বামীজীর দেশ-প্রেমের লক্ষ্য ছিল সর্বব্যাপী বিশ্বপ্রেম।

দেশকে ভালভাবে জানবার জন্য স্বামীজী সারা ভারত পর্যটন করেন। বিশ্ব-প্রেমিক রামকৃষ্ণদেবের তিনি মানস-সন্তান। তাঁর আদর্শকেই তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণদেবের আদর্শের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না; কোনো প্রাদেশিকতা অথবা সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তাতে ছিল না। তাঁর স্বদেশ-প্রেমের আদর্শ ছিল সকল শ্রেণীর মানুষের সর্ববিধ মঙ্গলসাধন; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকল শ্রেণীর মানুষ ছিল তাঁর স্নেহ-ভালবাসার পাত্র। ভারতের জাতীয়তার পরিমণ্ডলের মধ্যে তিনি এদের সকলকেই স্থান দিয়েছিলেন। তাদের সকলের মধ্যে সমন্বয় ঘটানই হল তাঁর কাজ। "দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না ফিরে—এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।" এ শুধু কবির কথা নয়—স্বামীজীরও ছিল জাতীয়তার এই আদর্শ। বস্তুতঃ ভারতাত্মার মর্মবাণীকে তিনি ঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। এ-কথা সকলেই জানেন যে, একবার স্বামীজী পরমহংসদেবের নিকট নির্বিকল্পসমাধিতে মগ্ন থাকার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ঠাকুর তাতে সম্মত হলেন না। তিনি তাঁকে বললেন: না, তোমার ব্রত আরও মহৎ। তোমার নিজের মুক্তির আগে দেশের মানুষের মুক্তি-সাধন করাই হল তোমার প্রধান কাজ। তুমি হবে বিশাল বটবৃক্ষ—তাতে কত মানুষ তোমার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবে। তা না করে তুমি তোমার নিজের মুক্তির জন্য অধীর হয়ে উঠলে! এ কি তোমাকে শোভা পায়? ঠাকুরের সেই উপদেশকে মাথায় করে নিয়ে স্বামীজী ভারতের বন্ধনমুক্তির জন্য সর্বত্র পাগলের মত ঘুরে বেড়ালেন। দেশ-প্রেম বল, আর জাতীয়তা বল, সবই তো এই অগণিত মূক মূঢ় ম্লান জনগণের জন্যই। সেইটাই আসল কাজ। ভারতের দীনতম ব্যক্তির যুগযুগব্যাপী দুঃখ-দুর্দশা তিনি যেমনভাবে উপলব্ধি করলেন, সে-যুগে তেমন আর কেউ করেনি। তাই তিনি ঘোষণা করলেন: 'নিজের মুক্তি চাই না। তার চেয়ে মানুষের মুক্তির জন্য সাধনা করে যাব।' মানুষের সেবাই হল দেশপ্রেমের আসল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে তিনি বাস্তব রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর যুগে এদেশের রাজনৈতিক নেতাদের একটা ধারণা ছিল যে, ইংরাজের সহায়তায় আইন-সভায় প্রবেশ করে কিছু ভাল আইন পাশ করিয়ে নিলেই দেশের বহু উপকার করা হবে। তাঁদের আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল এই আইনসভায় প্রবেশ করা ও তার ক্ষমতা ও অধিকার সম্প্রসারিত করা। কিন্তু স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে এই পোশাকী ও একপেশে সংস্কার-পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করলেন। তিনি স্বদেশ-প্রেমের নূতনতর ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, মানুষের ভিতর যে ঈশ্বর আছেন সর্বপ্রথম তাঁকেই জাগ্রত করতে হবে। ভিতরের শক্তিকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। সে কাজ আইনসভায় গিয়ে হবে না। তিনি এইভাবে জাতীয়তার ভিত্তিকেই সবল করে তুলতে চাইলেন। জাতীয়তার আদর্শের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মচেতনার ভাব প্রবেশ করাতে হবে। কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করলেই সব কিছু হবে না। বস্তুতঃ সমগ্র রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। তিনি বললেন, 'ত্যাগ কর। সাহসী হও এবং মনে কর যে দেশের জনগণের সেবাই হচ্ছে সত্যকার ঈশ্বর-পূজা।' স্বামীজীর নিকট দেশপ্রেম ছিল একটা ধর্ম। কিন্তু চলতি কথায় যাকে আমরা ধর্ম বলি স্বামীজীর ধর্মবোধ তা নয়। তাঁর নিকট দেশপ্রেম ও মানব-প্রীতি একই বস্তু। আজ দেখছি জাতীয়তা, প্রাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের নামে গোটা দেশ ছিন্ন-ভিন্ন

হয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালী-বিহারী, উত্তরভারত-দক্ষিণভারত এই সবই কোথাও কোথাও প্রবল আকার ধারণ করছে। অখণ্ড ভারত যেন শুধু কবির কল্পনা। বিভিন্ন পার্টি'র কোন্দল দেশের সম্মুখে একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। এ-সবের কারণ কি? কারণ এই যে, জীবনের মর্মকেন্দ্র থেকে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা উড়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাকে দূর করার উদ্দেশ্যেই স্বামীজী দেশবাসীকে আকুলভাবে আহ্বান করেছেন। ধর্মহীন জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের অনিষ্টকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বহু পূর্বে ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাশ্চাত্যের জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের আদর্শ আমাদের জন্য নয়। তিনি বলেছেন সব কাজেই পশ্চিম দেশের অনুকরণ ও অনুসরণ করলে চলবে না। তাতে কিছুতেই দেশের সত্যিকারের কল্যাণ হবে না। ইউরোপ, রাশিয়া বা চীন আমাদের আদর্শ হতে পারে না। দেশপ্রেমের যে আদর্শ তিনি দিয়েছেন, তাই হোক আমাদের আদর্শ। প্রার্থনা করি, দেশের মানুষ যেন তাঁর আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সাধনা করে। এই পথেই দেশের মুক্তি—অন্য পথে নেই।

'তত্র কো মোহঃ'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নামুক অলকানন্দা দিব্যপ্রেরণার
ঊর্ধ্ব হ'তে। এ জড়তা শক্তির বন্যার
তরঙ্গ-আঘাতে দাও অবলুপ্ত করি!
চেতনার প্রতি অণু-পরমাণু ভরি'
বিরাজ করো মা তুমি চিত্তে সর্বক্ষণ!
জ্বলন্ত পাবককুণ্ডে ইস্পাত যেমন
হারায় মালিন্য তার, রক্তবর্ণ হয়—
তেমনি তোমাতে যার হৃদয় তন্ময়
সমস্ত জড়তা হ'তে মুক্ত হয়ে যায়!
নূতন বসন্ত আসে নব মহিমায়
জীবন-অঙ্গনে তার! জেনেছি জননী,
একমাত্র তুমি মোর পারের তরণী।
অনুক্ষণ ভাবনায় তুমি আছ যার—
কোথা ভয়? কোথা মোহ? কোথা শোক তার?

বর্তমান সমস্যা

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে, প্রধানতঃ বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রভেদের ফলে যে সংঘাত, হিংসা, বিদ্বেষ, জিঘাংসা এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান চলেছে তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ভোগ করছেন। এবিষয়ে রাজ্যসরকারের দায়িত্ব কতটুকু, কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বহু ঘরোয়া আলোচনা চলেছে। প্রকাশ্যে যে গণ-আন্দোলনের কথা সংবাদপত্রে পড়ি, মুখ্যতঃ এবং প্রকৃতপক্ষে তা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার আন্দোলন। দেশের প্রকৃত সমস্যা ও সংকটের সমাধান গৌণ ও উপলক্ষ্য মাত্র।

সম্প্রতি এই দেশব্যাপী অরাজকতা এবং আইন ও শৃঙ্খলার অভাব এক নতুন আকারে দেখা দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের শ্বেত মর্মরমূর্তি আলকাতরা মাখিয়ে বীভৎস করা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি পাদপীঠ থেকে টেনে ফেলে দিয়ে ভগ্ন করা প্রভৃতি তার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-রকম যে ঘটতে পারে, এরূপ সম্ভাবনাও একমাস আগে কেউ ভাবতে পারেনি। আজ সমগ্র দেশ বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হয়ে ভাবছে, আমরা কত দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে চলেছি।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যা অনেক সময় ঘোরতর অশুভ মনে হয়—হয়ত তার মধ্য দিয়েও কোন শুভ পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে এই ভাবটা আমার মনে যে আকারে রেখাপাত করেছে তারই কিছু আভাস দেব।

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন যে, স্বাধীনতা পেলেও আমাদের কোন লাভ বা উপকার হবে না যদি আমরা মানুষ না হতে পারি। আর এই মানুষ হবার প্রধান উপায় শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানুষ তৈয়ারী করা (man-making)—এ কথা তিনি নানাভাবে বলেছেন ও নানাগ্রন্থে লিখেছেন। কিন্তু আমরা তাঁর এই উপদেশ ও আদর্শের মর্যাদা কতদূর পালন ও রক্ষা করেছি—তা ভাববার সময় এসেছে। ২২ বছর আগে আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম তখন সকলেই মনে করতেন এবং অনেক বড় বড় নেতারাও প্রকাশ্যে বলেছেন যে, এতদিন ইংরেজের দাসত্বের ফলে আমরা দাসসুলভ শিক্ষা ও মনোবৃত্তিই অর্জন করেছি, এবার জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত নতুন শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা আমরা আবার প্রকৃত মানুষ হব। কিন্তু ২২ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা শিক্ষার কি এবং কতটুকু উন্নতি করেছি—প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে কতটা অগ্রসর হয়েছি? আজ যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী—তথা প্রত্যেক ভারতবাসী—নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজেকে এই প্রশ্ন করি—তবে তার একমাত্র উত্তর হবে, উন্নতি তো দূরের কথা আমাদের শিক্ষার মান ক্রমশই নীচের দিকে যাচ্ছে; শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ—সকলেই প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনেই তৎপর। শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষালাভ করা এবং শিক্ষার

উপযুক্ত ব্যবস্থা করা—এই তিনটি মহৎ কর্তব্য ও আদর্শ আজ আমরা প্রায় ভুলে গেছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হয়েছে রাজনীতিক দলাদলির কেন্দ্র। শিক্ষক ও ছাত্রের অধিকাংশই রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ রাজনীতিক মতবাদ, দলাদলি ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত। প্রকৃত শিক্ষার কথা ভাববার অবসর বা ইচ্ছা কারও নেই।

আমরা মনুষ্যত্বের পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি, দেশের বর্তমান অবস্থাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাজ্যশাসন, স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাকেন্দ্র, ব্যবসায় বাণিজ্য, যে দিকেই তাকাই, দেখি একেবারে উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত সর্বত্রই দুর্নীতি, কলুষতা, অযোগ্যতা, কর্তব্যে অবহেলা আমাদের জাতীয় জীবনের মূর্ত প্রতীকরূপে বিরাজ করছে। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের অনেক ন্যায্য অভিযোগ ছিল—কিন্তু তারা শতাধিক বৎসরের চেষ্টায় শাসনযন্ত্রের যে সুদৃঢ় কাঠামো তৈয়ারি করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তারা দশ বছরের মধ্যেই তা চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ করেছেন। ইংরেজরা যখন ভারত ছেড়ে যায় তখন নগদ দুই হাজার তিনশত কোটির বেশী টাকা আমাদের (sterling reserve হিসাবে) মজুত ছিল। সেসব তো গেছেই, তাছাড়া ভারতের ঋণের পরিমাণ ১৯৫০ সনে ছিল তিন হাজার কোটি, আর আজ তার পরিমাণ চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে, তার থেকে আশানুরূপ লাভ ও দেশের গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের যে স্বপ্ন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল তা শূন্যে মিলিয়ে গেছে—এবং সরকার-পরিচালিত কলকারখানার প্রায় সবগুলিতেই প্রতি বছর প্রচুর লোকসান হচ্ছে। আজ বাংলাদেশে নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কথা প্রতি বাঙালীই বুঝতে পারেন। এর মূলে আছে প্রধানতঃ আমাদের দুর্নীতি, কলুষতা ও অযোগ্যতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান ও জার্মানির যে আর্থিক দুরবস্থা হয়েছিল, তা আমাদের কল্পনারও অতীত। কিন্তু আজ এই দুই দেশই মাথা তুলে নিজেদের পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে, বহু সঞ্চিত ধন লাভ করেও আর্থিক দুরবস্থার চরমে পৌঁছেছে এবং পৃথিবীর ছোট বড় সকল দেশের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রকৃত মানুষ কি উন্নতি করতে পারে আর মনুষ্যত্বের অভাবে দেশের কি দুরবস্থা হয়, জার্মানি ও জাপানের কথা ভেবে আমাদের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা তা বুঝতে পারি। আমাদের সামাজিক ও জাতীয় ঐক্যসাধনের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা চরম অবনতিই হয়েছে। দেশের বেকারসমস্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে।

আজ যারা বিবেকানন্দের মূর্তিতে আলকাতরা মাখিয়েছে, তারা সর্বথা নিন্দার পাত্র। কিন্তু তারা স্থূল-হস্তাবলেপে যা করেছে আমরা কি মনে মনে তা করিনি? আমরা কি আমাদের প্রতিদিনের আচরণ ও অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দের মুখে কালিমালেপন করিনি এবং এখনও করছি না? আশুতোষ শিক্ষার যে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন তা ধ্বংস করে কি আমরা প্রতিদিন তার মূর্তি ধুলায় লুণ্ঠিত করিনি? আমাদের এই স্বেচ্ছাকৃত মহাপাপের কথা দুষ্কৃতকারীরা বিবেকানন্দ, আশুতোষ প্রভৃতির মূর্তির অমর্যাদা করে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। আজ সে কথা ভাববার সময়

এসেছে। হয়ত এই ভাবনাই আমাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কর্ম সাধিত হয় না।" আমাদের বর্তমান বিষম সঙ্কট থেকে মুক্তিলাভের জন্য রাজভবনে বৈঠক হচ্ছে, নানা সভায় এবিষয়ে আলোচনার জন্য অনেক চেষ্টা ও ব্যবস্থা হচ্ছে—কিন্তু গোড়ায় যে গলদ তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে না। সমস্ত শৃঙ্খলাহীনতা ও দুরবস্থার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই মূলতঃ দায়ী করা হয়েছে। কিন্তু এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুব্যবস্থার জন্য দায়ী কে, রাজভবনের সভায় তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ যে মনুষ্যত্বের অভাব উপলব্ধি করেছিলেন—সেই অভাব না ঘোচাতে পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই। এই অভাব ঘোচাতে হলে প্রথমেই আমাদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কিন্তু এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক। আমার বক্তব্য কেবল এই যে, আমরা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি—আমরা যে প্রতিদিন স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছি তার ফলেই আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থা। এই কথাটি মনে রেখেই এর প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার অন্য সরাসরি বা সোজা কোন রাজপথ নাই।

মা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পায় যে বহুভাগ্যে তোমার অকূল-বাঁশি শুনতে কানে,
ঝঙ্কারে তার পথে অভয়—রাজো বলি' তুমি প্রাণে :
জানে সে—লয় বেসুরাদের হবেই তোমার সুরের কৃপায়,
যাবেই স'রে গহন বাধার আড়াল তোমার নয়নবিভায়।
চাই শুধু মা—তোমার মুখের হাসির মন্ত্র যেন ফোটে
যখন বেসুরাদের বিষাণ চারিদিকেই গ'র্জে ওঠে।
অনুযোগ না করি যেন পার হব মা মরু যখন,
মরুর পারে মন্দাকিনীর দেখিনি কি অমর স্বপন?
এই প্রত্যয় জপি যেন—স্বপ্নে আভাষ পেয়েছি যার
মূর্ত হবে জাগরণে, প্রেমব্রতী মানে না হার।
জানি—কঠিন প্রেমের দিশায় চলা স'য়ে মরুর দাহন,
আরো জানি—তোমার চরণ সেই পায় যে চায় মা শরণ।
জানি—তোমার দুরভিযান করবে বরণ যে সে হবেই
মায়াজয়ী সফলসাধন, তুফানেও তার ভয় নেই।
বিদ্যুতেও যে দেখেছে সোনার আলোর কেতন তোমার,
রক্তকাঁটাও কমলিনীর গান শোনাবে অন্তরে তার।

বাজিকরের মেয়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভক্তেরা সব বলে তোমায়
বাজিকরের মেয়ে,
সত্য তাহাই বুঝছি এখন
দেখছি যত চেয়ে।
এই যে সোনার বঙ্গভূমি,
ছারখারই কি করবে তুমি?
মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে
অশ্রু আসে ছেয়ে।

কোথায় গেল আশ্রম সব
শান্তরসাম্পদ?
খুনখারাপি রঙের শুধু
বাড়ছে যে গৌরব!
বীভৎসতার এ ভোজবাজি
দেখতে আমি নই মা রাজি
দেখাও তোমার রাঙা চরণ
পরম সম্পদ।

যিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা
ত্রিভুবনেশ্বরী,
'ধূমাবতী' দেখে তাঁরে
আতঙ্কে শিহরি।
কোথায় সে সব মহামানব?
প্রতিভার কই সে মহোৎসব?
চারিদিকে 'গরিলা'দের
দল যে কেবল হেরি।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেশ যে এটা
রামপ্রসাদের দেশ,
আবর্জনায় পূর্ণ হবে!
নাই কি দয়ার লেশ?
অসম্ভব তোর কি মা আছে?
কাতর প্রাণে এ দীন যাচে
তুমিই কর হেথায় দিব্য
জীবনের উন্মেষ।

রাখালের তীর্থ

শ্রীকালিদাস রায়

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জল-ঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে।
লেহন পরশে পুলকাঞ্চিত কপোলে অশ্রু গলে,
বাৎসল্যের গোমুখী-তীর্থ জাগিল কুটীর-তলে।
জ্যৈষ্ঠের দিনে গোষ্ঠের দাহে ক্লান্ত, তপ্ত কায়ে,
রাখাল যখন শ্রান্তি হরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
গাছের গুঁড়িটি আঁকড়িয়া কয় 'বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি!"
বটতল হয় প্রেম-মৈত্রীর বোধি তরু-তলভূমি॥

বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সবার আগে ত্যাগ করা চাই
তোমার মনের অহমিকা,
কর্তা তুমি ভুলতে হবেই
নইলে দেখবে মরীচিকা।
মালিক তুমি নও তো কিছুর
জাগবে এ বোধ যবে মনে,
হয়তো তুমি খুঁজচো যে ধন
ঘুরচো সুদূর গিরি বনে ;
দেখবে সে তো বক্ষে তোমার
সততই যে করে বাস,
খুঁজতে তাঁরে হয় না অধিক
যখন আসে সে বিশ্বাস।
আছেন তিনি তোমার মাঝেই
করান নিতি সব কাজ,
আদেশ যদি না মানো তাঁর
শাস্তি দেবেন মহারাজ।
চরণে তাঁর সরল প্রাণে
করিলে সব নিবেদন,
রবে না আর আত্মশ্লাঘা,
শুদ্ধ হবে দেহ মন।
হয়তো পাবে সেদিন তোমার
ধ্যানের ধনের দরশন,
মুক্ত হবে সকল বাঁধন
লভি দুর্লভ পরশন।

আর্তের প্রার্থনা

বনফুল

মূর্খ আমি বারংবার প্রতারিত হই
সুধা ভেবে পান করি তীব্র হলাহল
নিজেরে বন্ধনে বাঁধি', বলি মুক্তি কই,
শান্তি খুঁজি যেখানেতে খালি কোলাহল
দেখাও আমারে তুমি পথ।

এ প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা যে নাই
তা-ও জানি, তবু আমি বড় অসহায়,
দু' হাত বাড়ায়ে কিছু খুঁজিয়া না পাই,
ভয় হয় শেষে মোর কি হবে উপায়
তুমি এস তুমি এস প্রভু।

ভগবান দেখা দেন যে বিশ্বাসবলে
সে বিশ্বাস নাই মোর; দ্বিধা-ভরা মন,
উত্তাল-তরঙ্গ-নদী, জীর্ণ তরী টলে
আকাশে বিদ্যুৎ হানে তুমুল শ্রাবণ
এস তুমি হে চির-কাণ্ডারী।

দীন হীন অতি তুচ্ছ, পঙ্ক-লিপ্ত দেহ,
অহঙ্কারে স্ফীত-শির, চিত্ত তমোময়
তুমি শুদ্ধ না করিলে পারিবে না কেহ
তাই তব শরণার্থী ওগো দয়াময়
ত্রাণকর্তা এস এস তুমি।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

Chilkapita House, Almora,

P. O. Kumaon, U. P.

4.12.13

প্রিয় অ—,

মহিমবাবু পাঁচটি টাকা আমাকে পাঠাইয়াছেন, তুমি নাকি আমায় পাঠাবার জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলে। তুমি যে একা গ্রামে এই দুঃসময়ে একটি সেবাশ্রম খুলিয়া দুঃস্থ পীড়িতদের সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, ইহা শুনিয়া যে আমি কি আনন্দ পাইয়াছি তাহা পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাস্তবিক গরীব দুঃখীর সেবা [যদি] না হইল তবে অর্থ উপায় করিয়া নিজ উদর প্রতিপালন করিয়া দিন কাটান তো সাধারণ লোকে সকলেই করিয়া থাকে। তুমি যে অবিবাহিত থাকিয়া দেশের দুঃস্থ পীড়িতদের সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, ইহাই শ্রীস্বামীজী মহারাজের প্রাণের প্রিয় কার্য বলিয়া আমরা জানি এবং শ্রীগুরুদেব তোমার উপর পরম প্রীত জানিবে। প্রভু তোমায় খুব বল দিন যাহাতে তোমার এই প্রতিষ্ঠিত কার্য পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রার্থনা, এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে তাহাই হইবে। ও দেশে এইরূপ সেবাশ্রম এখন বিশেষ প্রয়োজন। তুমি আমার হৃদয়ের আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় খুব শক্তি দিন, তুমি কৃতকার্য হও।

এখানে খুব শীত। পল্টুবাবুরা এখান হইতে ২৫শে নভেম্বর চলিয়া গিয়াছেন, তাঁদের সিমুলতলায় নিজের বাড়ী আছে, এখন সেখানে গেলেন। এখন তোমাদের ওদেশে ব্যারামাদি কেমন? এবং যাহাদের ঘরদ্বার পড়িয়া গিয়াছিল এবং শস্যাদি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল তাহারা এখন কিছু ভাল আছে ত?

ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

'মোহরাত্রিশ্চ দারুণা'

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগন্মাতা মহামায়াকে স্তুতি করে বলা হয়েছে :

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥

"(ত্রিগুণের তারতম্যেই সব কিছুই সৃষ্ট) তুমি গুণত্রয়ের তারতম্য-বিধায়িনী প্রকৃতি। তুমি মহাপ্রলয়রূপ রাত্রি, মরণরূপরাত্রি এবং মানুষী মোহরাত্রি।" শুভ ও অশুভ—এ উভয়ই জগন্মাতা মহামায়ার পাদপীঠ। তিনি অঙ্গলরূপিণী, আবার তিনিই সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপা—"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।" নিবেদিতা এই পরমতত্ত্বটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন : "মহামায়া একাধারে এই সকল বিপরীতভাবের সমন্বয়-স্থল। তিনি ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সকল পথের গন্তব্যস্থল তিনিই।"[১] এই প্রসঙ্গে নিবেদিতা আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা।
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥"

যিনি সুকৃতিগণের ভবনে স্বয়ং লক্ষ্মী, আবার পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মী, যিনি নির্মল-চিত্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি, যিনি সাধুগণের শ্রদ্ধা এবং সৎকুলজাত ব্যক্তির লজ্জাস্বরূপ, সেই তোমাকে প্রণাম করিতেছি।"

এই পরমতত্ত্বের মধ্যে নিপুণ সমাজবিজ্ঞানী নিবেদিতা লক্ষ্য করেছেন ইতিহাসের পরম-সত্যকে। ইতিহাসের গতিপথ সরলরেখায় বিস্তীর্ণ নয়, সে পথ "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা," শুভ ও অশুভের মধ্য দিয়ে সম্মুখে প্রসারিত। নিবেদিতা এ প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করে বলেছেন : "স্বামীজী যখনই (উপরোক্ত) মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতেন, তখনই আমরা একটিমাত্র কণ্ঠস্বরের পশ্চাতে বহুস্বরগ্রথিত মৃদুধ্বনির ন্যায় ইতিহাস-রূপ নাটকের মহাসংগীত শুনিতে পাইতাম।"[২] সুরাসুরের যে দ্বন্দ্বকাহিনী শ্রীশ্রীচণ্ডীর আখ্যান-ভাগে বর্ণিত, তাকেই ইতিহাস প্রকট করেছে বারে বারে নানাভাবে।

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন দেশ। তার ইতিহাস দীর্ঘ। তার দীর্ঘকালে এর প্রমাণ মিলেছে বারবার। পৌরাণিক কাহিনীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর বা বৃত্রাসুরের প্রবল প্রতিপত্তির কথা পাওয়া যায়। দেবগণ মধ্যে মধ্যে অসুরগণের হস্তে শ্রী-সম্পদ রাজ্য-আশ্রয় সব হারিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছেন দেখা যায়। ভারতের মহান ইতিবৃত্ত মহাভারতে দেখা যায়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করে দ্বারকায় নূতন রাজ্য স্থাপন করেছেন। কুরুপঞ্চালের যুদ্ধকাহিনী ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃত। কথিত আছে, এই মহাসমরে সুবিশাল ভারতভূমির একতৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয়েছিল, ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছিল। ঐতিহাসিক কালেও দেখা যায় চেংগিসখান দিল্লী নগরীতে মৃত-

১ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—"নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণী" শীর্ষক অধ্যায়।

২ Ibid

দেহের প্রাকার নির্মাণ করেছিলেন, ঔরংজীব হিন্দুমন্দিরসমূহকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিলেন, হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচারে একদা দক্ষিণবঙ্গের বহু সমৃদ্ধ জনপদ শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে পরিণত হয়েছিল। এ সকল ইতিবৃত্তই আমাদের জাতীয় জীবনের ঘোর কালরাত্রির ইতিবৃত্ত।

এইসকল ঘোর কালরাত্রি আবার দারুণ মোহরাত্রিও ছিল। মূল্যবোধে বিকৃতি, মনুষ্যত্বের অধঃপতন এইসকল যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাভারতে দেখা যায় যে, সভাপর্বের শেষে মহারাজ যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় মহিষী দ্রৌপদীকে পণ রেখে পরাজিত হলে দুঃশাসন তাঁকে বলপূর্বক কৌরবরাজসভায় নিয়ে আসে। তেজস্বিনী দ্রৌপদী তখন ওজস্বিনী ভাষায় ধিক্কার দিয়ে এইকথা বলেছিলেন, "ধিক! ভরতবংশের চরিত্র আর ধর্ম নষ্ট হয়েছে, এ সভায় কৌরবগণ কুলধর্মের মর্যাদা-লঙ্ঘন নীরবে দেখছেন।" সভাস্থ সকলে ব্যথিত হলেন, কিন্তু দুর্যোধনাদির ভয়ে কিছু বলতে সাহস করলেন না। একমাত্র ভীষ্ম বলেছিলেন, "ভাগ্যবতি, ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না।" সভাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন সেদিন একমাত্র দুর্যোধন-ভ্রাতা বিকর্ণ যাঁর মধ্যে তখনও বিবেক নিঃসংশয় ছিল। কিন্তু কেউ সেদিন তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তারই ফলে ঘটেছিল পূর্বোক্ত বিপুল লোকক্ষয়কারী মহাসমর।

চারিত্রিক অধঃপতনের কারণেই একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের সম্মুখেই যদুবংশের ধ্বংস হয়েছিল। মহাভারতের মৌষলপর্বে আছে নানারূপ দুর্লক্ষণ দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে ডেকে বললেন: "ভারতযুদ্ধকালে এই প্রকার দুর্নিমিত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে। তোমরা সমুদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে যাও।" সেখানে গিয়েও এবং নিজেদের আসন্ন বিনাশ জেনেও তাঁরা নিজেদের সংযত রাখতে পারলেন না। মহাভারতকার বলছেন, "সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে নিরন্তর পানভোজন করতে লাগলেন।" পরিণামে সুরাপানে উন্মত্ত যাদবগণ কলহ করতে করতে পরস্পরকে ধ্বংস করলেন।

পরবর্তী ঐতিহাসিক কালের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। হার্মাদ জলদস্যুগণ প্রকাশ্য দিবালোকে যখন গৃহস্থকন্যা অপহরণ করেছে তখন বাধা দেবার জন্য একজনকেও দেখা যেত না। কিন্তু মর্মান্তিকশোক-পীড়িত অপহৃতা কন্যার পিতাকে সমাজচ্যুত করবার জন্য বহু জনকে পৈশাচিক উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা যেত। নির্বীর্য কাপুরুষদের কখনও মঙ্গল হয় না। সেজন্য অত্যাচারিত নিরপরাধ নারীর অশ্রুজলের সঙ্গে মিশে প্রবাহিত হয়েছিল বিপুল রক্তস্রোত। এইরূপ মোহ ও চারিত্রিক অধঃপতনকে দেখা গিয়েছে সর্বকালে জাতীয় বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে। বস্তুতঃ প্রতিটি ঐতিহাসিক কালেই জাতীয় সংকটের প্রধানতম কারণ ছিল এইরূপ অধঃপতন।

মনে রাখতে হবে একটি জাতির উন্নতির মাপকাঠি শুধুমাত্র তার ধনসম্পদ নয়, তার চারিত্রিক সম্পদও। এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণন শিক্ষা কমিশনের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "একটি দেশের শ্রেষ্ঠত্ব তার সীমানার পরিধির উপর নির্ভর করে না, তার যোগাযোগব্যবস্থার দৈর্ঘ্যের উপরও নির্ভর করে না, তার ধনসম্পদের উপরও নির্ভর করে না। যদিও এগুলির প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা

দেশে কেবল বর্বর উন্নতি কামনা করি, যা হবে (রামায়ণ-বর্ণিত) রাক্ষস-রাজত্বের অনুরূপ, তাহলে কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক বা প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাব্যবস্থা করলেই চলবে। কিন্তু তাতে মানুষের আত্মা থাকবে উপেক্ষিত। তখন আমরা পাবো একদল বিবেকহীন বৈজ্ঞানিক, একদল রুচিহীন কলাকুশলী যারা দেখবে তাদের অন্তরে বিরাজ করছে বিরাট শূন্যতা। নীতির ক্ষেত্রেও শূন্যতাই থাকবে। তখন তাদের নষ্ট প্রয়াস ও ভ্রষ্ট লক্ষ্যের জন্য অন্তরের শূন্যতা ও বিক্ষোভ তাদের তাড়না করে নিয়ে যাবে যে-কোন পরিবর্তের দিকে, সে যাই হোক না কেন। যদি আমরা সভ্যতার দিক থেকে প্রকৃত উন্নত হতে চাই, তাহলে দরিদ্র ও দুঃখীদের জন্য চিন্তিত হবার শিক্ষা চাই। জাতিবর্ণনির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস চাই, শান্তি ও স্বাধীনতায় আস্থা চাই। হিংসার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ ঘৃণা চাই।"[৩] অর্থাৎ মনুষ্যত্বই একটি জাতির উন্নতিবিধায়ক, মনুষ্যত্ব ব্যতীত কোন উন্নতি স্থায়ী হতে পারে না। এ জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "মনুষ্যত্ব জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মূল্যবান।" সুতরাং তাঁর মতে "আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই, যাহা আমাদের মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক যেগুলি আমাদের মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয়, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষার প্রয়োজন।"

কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক থেকেই আমরা আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় সর্বহারা হতে বসেছি। আমাদের মূল্যবোধ আজ তুলনাহীনভাবে বিকৃত। আবার ঘনিয়ে এসেছে আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর তমিস্রাময় মোহরাত্রি, পরিণামে তা হয়ত এক ভয়াল কালরাত্রির রূপ ধারণ করবে। চারদিকে দুর্লক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে। মানুষ আজ অসাধু অধর্মাচারী বিবেকহীন হয়েছে তাই শুধু নয়, পশুর চেয়েও নির্মম নিষ্ঠুর হয়েছে। অপরদিক দিয়ে তাদের ভীরুতার অন্ত নেই। সমস্ত জাত বিনা প্রতিবাদে দাসত্ব-শৃঙ্খলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সন্দেহ নাই, আমরা আজ তুলনাহীনভাবে মোহগ্রস্ত। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, আমাদের কাম্য লক্ষ্য যতই শ্লাঘার বস্তু হোক, মানুষকে পশু করে তার কোন ভাল করা যায় না। হিংসার প্রতিক্রিয়া প্রবলতর হিংসা—পরিণামে আসে ধ্বংস। শ্রেয়-প্রেয় বোধ, ন্যায়-অন্যায় বিচার, যুক্তিপরতা, প্রেম, সহানুভূতি—এগুলিই মনুষ্যত্বের লক্ষণ। আজ এর কোনটাই মনুষ্য-চরিত্রে দেখা যাচ্ছে না। বিচারপূর্বক প্রেয়ের উপর শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠাই কল্যাণের পথ। অন্য পথ নেই।

যাদের মূল্যবোধ আজও বিকারগ্রস্ত নয়, তারাও তামসিকতা, নিষ্ক্রিয়তা ও ভীরুতার কবলগ্রস্ত। এ গুলি আরও বড় পাপ। মনে রাখা প্রয়োজন যে, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে" তারা উভয়েই সম-অপরাধী। যে আদর্শবাদ হৃদয়ে অগ্নিসঞ্চার করে না, "অগ্নিময় বিশ্বাস" উদ্বুদ্ধ করে না, শিরায় শিরায় ত্যাগের প্রেরণা জাগায় না, সে আদর্শবাদের কোন মূল্য নেই। এসকল তথাকথিত আদর্শবাদী কি একবার ভেবে দেখেছেন যে, একমাত্র অবিচলিত শুভবুদ্ধি ও কল্যাণকর্মের সাহসিক অনুষ্ঠান ছাড়া এই অমঙ্গলের সাম্রাজ্য-বিস্তার-রোধের আর কোন উপায় নেই, এড়িয়ে গিয়ে

৩ University Commission—Vol I, P. 67—অনুবাদ: লেখিকা

আত্মরক্ষার কোন পথ নেই নির্ভীকতা দিয়ে ভীরুতাকে জয় করতে হবে, প্রেম দিয়ে অপ্রেমকে, ত্যাগ দিয়ে স্বার্থবুদ্ধিকে, অহিংসা দিয়ে হিংসাকে।

স্বাধীনতালাভের পর থেকে আমরা ধন-সম্পদবৃদ্ধির বহু প্রয়াস করেছি। কলকারখানা, ক্ষেত-খামার, উৎপাদন, বিনিয়োগ, মূলধন-গঠন, কর্মে নিয়োগবৃদ্ধির বহু পরিকল্পনা হয়েছে, সেই পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার জন্য বহুতর প্রয়াসও হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যা বড় সম্পদ—মানুষ, তাকে গঠন করবার কোন প্রয়াস হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের আত্মাকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে অবিবেকী বিজ্ঞানী কলাকুশলী শুধু কেন, অবিবেকী শিক্ষকসমাজ, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক কর্মচারী—আজ প্রতিটি ব্যক্তিই। তাদের অন্তরের দুঃসহ শূন্যতা ও নীতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আজ তাদের নষ্টপ্রয়াস ভ্রষ্টলক্ষ্য করেছে। সেজন্য বিক্ষোভে তারা প্রতিনিয়ত ফেটে পড়তে চাইছে। আদর্শের ক্ষেত্রে শূন্যতা মানুষের কাছে সবচেয়ে দুঃসহ। সেজন্য সম্মুখে তারা যা পেয়েছে তাই গ্রহণ করেছে—তা নিরঙ্কুশ ধ্বংসবাদই হোক না কেন। আজ নিজেদের সৃষ্ট সম্পদ,—শ্রেষ্ঠ সম্পদ সবই তারা ধ্বংস করতে চাইছে। বস্তুতঃ অন্তরের শূন্যতার অসহ্য যন্ত্রণায় তারা আজ-আত্মহনন করতে চাইছে।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতীয় ঐতিহ্যকে কোন স্থান দেওয়া হয়নি। সেজন্য সুপ্রাচীন এই দেশের মহামূল্যবান সংস্কৃতি যা যুগ যুগ ধরে বহু মানুষকে যুগিয়েছে প্রাণের রসদ, তা আজ তারা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে দ্বিধাহীন চিত্তে। যে ঐতিহ্যের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই, যে সম্পদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও তারা অবহিত নয়, তার প্রতি তাদের মমত্ব থাকবে—এ আশা করা অনুচিত। কিন্তু ঐতিহ্যকে ফেলে দিয়ে অগ্রগতি তো সম্ভব নয়। অতীতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা ফেলে দিলে বারবার তো একই জায়গা থেকে আরম্ভ করতে হবে। তাহলে অগ্রগতি আর কি করে সম্ভব হবে? মানুষেরই অতীত আছে, ঐতিহ্য আছে, তাই মানুষের অগ্রগতি আছে। পশুর সমাজের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই, তাই অগ্রগতিও নেই।

আজকের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে একটি ন্যায্য লক্ষ্যকে–শূদ্র বা শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার-অর্জন। এ দেশে এ যুগসাধনাকে যাঁরা প্রথম রূপ দিয়েছেন তাঁরা জাতির মহাপুরুষ আচার্যগণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এর প্রথম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"ভারতের উচ্চবর্ণেরা, তোমরা শূন্যে বিলীন হও, বেরুক নূতন ভারত। বেরুক মুদীর দোকান হতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ হতে। বেরুক হাট থেকে, বাজার থেকে।" শ্রীঅরবিন্দও ঐসময়ে লিখেছিলেন, "আমাদের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী অজ্ঞানতার গভীরে নিমজ্জিত, নিদারুণ দুর্গতির পীড়নে পর্যুদস্ত। কিন্তু সেই দুঃখনিমজ্জিত জ্ঞানহীন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই আমাদের একমাত্র আশা, ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা বিরাজ করছে।" কিন্তু এঁরা এ সংগ্রামের যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন তা ভিন্নতর। তাঁরা এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুক্তিকে স্বোপার্জিত হতে হয়, অপরের হাত হতে কখনও মুক্তি পাওয়া যায় না, অন্যের হাত দিয়ে যা আসে তা শৃঙ্খল হয়ে পায়ে ওঠে। এজন্য তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বাগ্রে দিতে চেয়েছিলেন

শিক্ষা ও সংস্কৃতি যা তাদের দৃষ্টির বাধা অপসারিত করবে। তখন নিজেদের লক্ষ্য তারা নিজেরা সাধন করবে। সেজন্য অন্ধ অজ্ঞ জনসাধারণকে কোন লক্ষ্যের দিকে তাড়িত করে নিয়ে যেতে তাঁরা চাননি।

একই কারণে বিবেকানন্দ স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ। অন্নহীন ব্যক্তির কাছে স্বাধীনতা ধর্ম ও নীতি যেমন অর্থহীন, তেমনি দাসের নিকট স্বাধীনতাবিহীন অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা; ধর্মহীন নীতিহীন ব্যবস্থা উন্নত মানুষের কাছে তেমনি অর্থহীন। বিবেকানন্দ সেজন্য জোরের সঙ্গে বলেছেন, "চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে আমার মতে স্বাধীন ও চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও ভাল।" এ বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি মূল্যবান কথাও স্মরণীয়— "উত্তম শাসন স্ব-শাসনের কোন পরিবর্ত নয়" (A good government is no substitute for self-government[৪])। সে জন্য সমাজের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তির বলিদান যে ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী, তা কখনও শুভকর নয়। বিবেকানন্দ সেজন্য বেদান্তের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের লক্ষ্যরূপে রাখতে চেয়েছেন।

এই সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শই অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মুখে বারবার সঞ্জীবিত হয়েছে। সেজন্য আমাদের মহান ধর্মনায়কেরা সকলেই সাম্য ও স্বাধীনতা-মন্ত্রের প্রচারক। তাঁরা সকলেই সমাজে বিশেষ সুবিধা, কায়েমী স্বার্থের উপর আঘাত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। নিবেদিতার একটি সমীক্ষা এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে: "যে যুগে উপনিষদের জ্ঞান শুধু আর্যদিগের বিশেষ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত, ভগবান তথাগত সেই যুগে আবির্ভূত হইয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণকে ত্যাগের দ্বারা নির্বাণলাভরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গের উপদেশ করিলেন। যে যুগে এবং দেশে সিদ্ধ সাধকের প্রদত্ত মন্ত্র কেবল অত্যল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেই সযত্নে রক্ষিত হইত, আচার্য রামানুজ কাঞ্চীনগরীর গোপুরমে আরোহণ করিয়া সেই মহামন্ত্র পারিয়া চণ্ডালের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন।"[৫] এই কারণে সাম্যসাধক অধ্যাত্মনায়কেরাই যুগে যুগে আমাদের সমাজেরও নায়ক হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি ধর্মাচার্যেরা তাঁদের পূর্বসুরীদেরই অনুসরণ করে যুগোপযোগী সাম্য-প্রয়াস করেছেন। সেজন্য বিবেকানন্দ মানবতা ও সাম্যভিত্তিক ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার উপর জোর দিয়েছেন। বলেছেন: "আমাদের কার্যের এই মূল কথাটি স্মরণ রাখিবে—ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করিয়া জন-সাধারণের উন্নতিবিধান।...তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে পারো?" ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, দয়া প্রেম সহানুভূতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেয়, যা পরস্পরের কল্যাণ আনয়নে সহায়ক। সেজন্য ধর্ম মানুষকে উন্নত করে। মানুষকে উন্নত করেই প্রকৃত সাম্য বা মুক্তি আনা সম্ভব, অন্যথায় নয়। সাম্যকে সেজন্য ধর্মভিত্তিক করতেই হয়। নতুবা সাম্য

৪ J. S. Mill—Representative Government —P. 82

৫ নিবেদিতা: স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ

নামেই সাম্য হয়, কার্যতঃ হয় না। যে বলশালী, সেই প্রাধান্য লাভ করে, অন্যরা বঞ্চিত হয়।

আমরা যে নিদারুণ বিভ্রান্ত তার প্রমাণ এই যে, এই শ্রেয়োপথ আমাদের আজ আকর্ষণ করছে না। সম্মুখে সেজন্য হয়তো অনেক দুঃখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই দুঃখের তপস্যাই হয়তো আমাদের মোহমুক্তি ঘটাবে, কল্যাণের পথ চেনাবে। এইরূপ যে ঘটতে পারে সে সম্ভাবনার ইঙ্গিতও আমাদের জাতীয় নায়কেরা দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন: "আমাদের শূদ্র-জাতির সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু কি ভয়ানক সংক্ষোভ ও আলোড়নের মধ্য দিয়া তাহা সংঘটিত হইবে!" শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন: "অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই শ্রমিকের মধ্য হইতে এক ভয়ঙ্কর বিপ্লব প্রধূমিত হইয়া উঠিবে।...সমুদ্রের গভীর তলদেশে আলোড়ন উঠিয়াছে, আদিম মানুষের যে প্রচণ্ড ধ্বংসপ্রেরণা সহজাত, সভ্যতা যাহার উপরের একটি ক্ষীণ প্রলেপমাত্র, তাহা আজ গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ।" এই হিংস্রতাকে জয় করেই সভ্যতার বিস্তার, এর কাছে পরাজয় ঘটলে সভ্যতার পরাজয়। ভারতে আজ যে সংকট ঘনিয়ে এসেছে তা শুধু জাতীয় সংকট নয়, তা সভ্যতার সংকট।

সেজন্য আজ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না। বিবেকানন্দ এ জন্য আমাদের সমস্ত ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা ও তামসিকতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। বলেছিলেন, "এমনকি আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে ওঠো. ওঠো কাজ কর।...দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা। আগুনে ঝাঁপ দাও, মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।" বস্তুতঃ আত্মশক্তির জাগরণ ছাড়া ইতিহাসের কালরাত্রি মোহরাত্রি কখনও অতিক্রম করা যায় না। অতীতেও যায়নি, আজও যাবে না। বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন আজ তাই চাই: "হাজার হাজার পুরুষ চাই, নারী চাই—যারা আগুনের মতো হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু ছড়িয়ে পড়বে।" আজ তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিতে হবে: "লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।"

এজন্য আজ সকলকে শক্তিসাধনায় ব্রতী হতে হবে। ভগিনী নিবেদিতার এক প্রজ্ঞাবাণী এখানে স্মরণীয়: "আমার বরাবর বিশ্বাস যে, এইরূপ একটি বিপর্যয় ও ভয়ের যুগে জনসাধারণকে পরিচালিত করিবার ও প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্যই আমাদের আচার্যদেব (বিবেকানন্দ) ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শক্তিপূজার এক মহান উদ্বোধন ধ্বনিত হয়েছে।"[৬] শুভ ও অশুভ যাঁর পাদপীঠ, সকল বিভ্রান্তি একদিন যাঁর চরণে বিলীন হয়, সকল পথের অন্তেই এক যিনি বিরাজমান, যিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপা আজ সেই পরমাজননীর চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে—"মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" ইতিহাসের যে মহাসন্ধিক্ষণ আজ সমাসন্ন, তাই তো বীরসাধকের মাতৃপূজার পরমলগ্ন। আর স্মরণ রাখতে হবে আমরা বারবার ইতিহাসের এই মরণরূপ কালরাত্রি ও দারুণ মোহরাত্রি পার হয়ে এসেছি। ভারতবর্ষে মানুষের আত্মা চির-অপরাহত, বারবার সে এখানে মোহ ও মৃত্যুকে জয় করে অশোক ও অমৃতময় জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতের এ চিরন্তন ইতিহাস। আজও তা অব্যাহত থাকবে। আজ দুর্গতিনাশিনী দুর্গার মহাপূজার প্রাক্কালে তাই প্রার্থনা: তিনি আমাদের মোহ বিভ্রান্তি দূর করুন, আমাদের দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করুন, আমাদের নির্ভীকতা-বর দান করুন, আমাদের অভয়মন্ত্রে সঞ্জীবিত করুন।

৬ স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীসমূহ

লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

আমরা মহাশূন্যে ভাসা এই-যে পৃথিবী নামে জগতে বসবাস করছি—এ পৃথিবী কত বৈচিত্র্যময়। এর বুকে রয়েছে সমুদ্র নদী জ্যোৎস্না দিনরাত্রি শীতগ্রীষ্ম। আমরা থাকি বা না-থাকি এসব রয়েইছে যেদিন থেকে মানুষ টেলিসকোপ আবিষ্কার করেছে, সেদিন থেকে সে রাতের পর রাত আকাশের দিকে টেলিসকোপ নিয়ে ওত পেতে রয়েছে মহাশূন্যে ভাসা আর কোন, আর কী রকম জগৎ দেখা যেতে পারে এ আশায়। মহাকাশের রাতের গায়ে যে অগণিত আলোর ফোঁটা দেখা যায় তাদের মধ্যে লালচে-একটিকে দিগন্তের দক্ষিণ কানার ওপর নজর পড়ে। লাল রঙের জন্য ওকে অন্যদের থেকে বেশ পৃথক করা যায়। প্রাচীন মানুষদের ঐ লাল রঙ যুদ্ধে রক্তপাতের কথা মনে করিয়ে দিত। আশ্চর্য নয় যে তারা যুদ্ধদেবতার নামে ওর নাম রেখেছিল। গ্রীকদের যুদ্ধদেবতার নাম অ্যারেস, রোমানদের মারস্। মারস্ নামের চলই রয়ে গেছে। ভারতীয়দেরও কাছে সে দেবতার মতো—'লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।' তবে যুদ্ধের নিশানা বলে নয়, মঙ্গলের জন্য। ওর ভারতীয় নাম মঙ্গল।

ঐ মঙ্গল-জগতের গড়পড়তা ব্যাস প্রায় ৪,২০০ মাইল। এ-পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি। মোট জায়গার পরিমাণ পৃথিবীর ¼ ভাগের একটু বাড়তি। সূর্য থেকে মঙ্গলের গড়পড়তা দূরত্ব প্রায় ১৪১,৭০০,০০০ মাইল আর পৃথিবীর ৯৩,০০০,০০০ মাইল। পৃথিবীর পরেই এর ঠাঁই। পৃথিবীর দিনের মাপে ৬৮৭ দিনে সে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসে যেমন পৃথিবী ঘুরে আসে ৩৬৫ দিনে। অর্থাৎ পৃথিবীর ৬৮৭ দিনে মঙ্গল-জগতে এক বছর হয়, যেমন আমাদের জগতে হয় ৩৬৫ দিনে। মঙ্গল নিজে নিজেই একবার ঘোরে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে। এ-সময়ে মঙ্গল-জগতে হয় একদিন!

আমরা সব গ্রহের চাইতে মঙ্গলের খবর বেশি জানি। শুক্রের মতো সে আমাদের এত নিকটে না এলেও ওর পুরো একটা আলোকিত দিক দেখতে পাই। মঙ্গলের অনেক ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর মতো উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, বিষুবরেখা, দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ ঠিক করাও হয়েছে। টেলিসকোপ দিয়ে উজ্জ্বল গায়ে কালো কালো নানা আকার দেখা যায়। ঐ অন্ধকার অংশকে পূর্বে জলভাগ বলে ধারণা করা হতো। আর আলোকিত অংশকে ভাবা হতো মহাদেশ। যেমন পৃথিবীর জলভাগ আর স্থলভাগ। বিভিন্ন অন্ধকার জায়গাকে আকার অনুযায়ী সমুদ্র লেক ক্যানাল ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছিল। ইদানীং ম্যারাইনার নামক ব্যোমযান দ্বারা তোলা ছবি থেকে জানা গেছে যে, ওসব জলাশয় নয়। তবু এরকম নাম এখনো রয়ে গেছে। মহাদেশের বিভিন্ন জায়গারও নাম দেওয়া হয়েছে পৌরাণিক বা পৃথিবীর কোনো কোনো ভৌগোলিক নাম থেকে।

পৃথিবীর মতো মঙ্গলকেও ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। পূর্বে ভাবা হতো বায়ুমণ্ডলে অল্প অকসিজেন রয়েছে। অধিকাংশই নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ কারবন-ডাই-অকসাইড।

কিন্তু হালে ম্যারাইনার দিয়ে ধরা গেছে যে শতকরা ৯৮ ভাগ কারবন-ডাই-অকসাইড। অকসিজেন ও নাইট্রোজেন লেশমাত্রাতেও নাই। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর চেয়ে খুব পাতলা ও অশান্ত। প্রায়ই ধুলোর ঝড় ওঠে। অনেকখানা জায়গা জুড়ে বালির ঘূর্ণি তৈরী হয় বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর শতকরা একভাগ

যে মেরুদণ্ডকে খাড়া রেখে মঙ্গল নিজে নিজেই ঘোরে, তা সিধা দিক হতে ২৫ ডিগ্রী কোণে বাঁকানো, যেমন পৃথিবীর মেরুদণ্ড হেলানো ২৩½ ডিগ্রীতে। সুতরাং এ বাঁক প্রায় পৃথিবীর বাঁকের সমান। ঋতুপরিবর্তন নির্ভর করে এ-বাঁকের উপর। তাই মঙ্গল-জগতে পৃথিবীর মতো বিভিন্ন ঋতু রয়েছে। মঙ্গলের উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুর সঙ্গে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের ঋতুর তুলনা করা যায়। একমাত্র পার্থক্য যে, সেখানে ঋতুর স্থিতিকাল পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ পৃথিবীতে তিন মাস করে লম্বা চার ঋতু ধরলে মঙ্গল-জগতে এক এক ঋতু প্রায় ছমাস করে লম্বা। কারণ মঙ্গলের বছর পৃথিবীর বছরের প্রায় দ্বিগুণ। যখন মঙ্গলের কোনো গোলার্ধে শীতকাল, তখন সে-গোলার্ধের মেরুদেশে সাদা ঝকঝকে—মাথার টুপির মতো—এক আচ্ছাদন তৈরী হয়। আর অন্য গোলার্ধের মেরু-আচ্ছাদন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়। সাদা মেরু-আবরণকে পূর্বে বরফ বলে অনুমান করা হতো, যেমন পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিন মেরুর আবরণ সাদা বরফ। ইদানীং ম্যারাইনার দ্বারা পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, দক্ষিণ মেরুর 'আইস ক্যাপ' প্রধানতঃ জমানো কারবন-ডাই-অকসাইড, যাকে ড্রাই আইস বলে। যদি মঙ্গলে বরফ থেকে থাকে তাহলে গ্রীষ্মকালে মেরু-আচ্ছাদন গ'লে জল তৈরী হতে পারে। কিন্তু ম্যারাইনার দ্বারা জানা গেছে যে, মঙ্গল-জগতে জল নেই। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মেঘ হয়। এ মেঘ পৃথিবীর মতো জলীয় বাষ্পের নয় মেঘ তিন রঙের। সাদা নীল আর হলদে। সাদা মেঘ কুয়াশা বলে মনে হয়। নীল মেঘ আইস-কণার রাশ। আর হলদে সম্ভবতঃ ঝড়ে উঠা ধুলো। পৃথিবীতে যেমন জল বর্ষিত হয় তেমনি মঙ্গল-জগতের আকাশ হতে কোনো তরল পদার্থ পড়ে কি না—খুবই কৌতূহলের বিষয়।

মঙ্গল সূর্য হতে অনেক দূরে। ফলে সূর্য হতে পৃথিবী যে-পরিমাণ তাপ আর আলো পায় মঙ্গল পায় তার অর্ধেকেরও কম। তাই মঙ্গল-জগৎ পৃথিবীর চেয়ে বেশ ঠাণ্ডা। মেরুদেশের তাপ শীতকালে মোটামুটি −৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং গ্রীষ্মে ৫ থেকে ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বিষুবরেখার কাছাকাছি যত যাওয়া যায় তত তাপ বাড়ে। বিষুবরেখায় প্রায় ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

পৃথিবীর যেমন এক চাঁদ রয়েছে, মঙ্গলের সে রকম রয়েছে দুই চাঁদ। নাম কোবোস ও ডাইমোস। নাম দুটি গ্রীক পৌরাণিক চরিত্রের। এ দুজন গ্রীক যুদ্ধদেবতা, অ্যারেস-এর (রোমক ভাষায় মারস্) দুই চর। উপগ্রহ দুটি এত ছোটো যে, এদের চাঁদের মতো এক একটি জগৎ বলা চলে না। যেন দু-দুটি পর্বত।

কোবোস ব্যাসে দশ মাইলের বেশি নয়। মঙ্গলের সব চেয়ে নিকটে। প্রায় ৩,৭০০ মাইলের মধ্যে। মঙ্গলের আকাশে সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে উজ্জ্বল জগৎ বলে মনে হয়, অবশ্য সূর্য বাদে—যেমন পৃথিবীর আকাশে চাঁদকে মনে হয়। কোবোস প্রায়ই মঙ্গলের ছায়ার মধ্যে পড়ে এবং কোবোসগ্রহণ হয় যেমন হয় চন্দ্রগ্রহণ, তবে

হয় প্রায়ই। মঙ্গলের খুব নিকট হওয়ায় কোবোসের উপর মঙ্গলের আকর্ষণ খুব বেশি। তাই কোবোস খুব বেগে মঙ্গলের চারদিকে ঘোরে। প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার। এ মঙ্গলের দিনের প্রায় তিন ভাগের ভাগ।

ডাইমোস মঙ্গল হতে প্রায় ১২,৫০০ মাইল দূরে। এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। কোবোসের চাইতে ছোট। সম্ভবতঃ ছ'মাইলের বেশি ব্যাসের নয়। মঙ্গল থেকে একে আর-সব নক্ষত্রের মতো দেখায়। মঙ্গলের চারদিকে প্রায় তিরিশ ঘণ্টায় একবার চক্কর দেয়।

প্রথম প্রথম টেলিসকোপ দিয়ে দেখে মনে হতো মঙ্গল-জগৎ পৃথিবীর মতো বৈচিত্র্যময়। বুঝি-বা ওখানেও প্রাণ রয়েছে। এমনকি এক সময় এমন ভাবা হতো যে, পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নতধরনের মানুষ সেখানে বসবাস করে। জলের অভাবের জন্য তারা মঙ্গলের মেরুদেশ হতে খাল কেটে সারা দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করছে। মঙ্গলের অলোকিত অংশে এদিকে সেদিকে কালো কালো লাইন দেখে এরকম চিন্তা করা হতো। ক্রমে জানা গেছে যে, এ-মত ঠিক নয়। ম্যারাইনারে তোলা ছবি দেখে স্থির হয়েছে—সেখানে জলের খাল নেই। যেখানে মেরুদেশ জলশূন্য সেখানে জলের খাল তৈরির সম্ভাবনা নেই। আর প্রাণও বাঁচতে পারে না। পৃথিবীতে যত শ্রেণীর প্রাণী রয়েছে—সকলেরই প্রয়োজন জলের। শুধু তাই নয়, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এহেন অকসিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে একদম নেই। আছে দম বন্ধ করা কারবন-ডাই-অকসাইড। এরকম অবস্থায় মঙ্গলে এমনকি অতি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ও বাঁচতে পারে না বলে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। মঙ্গলে শুকনো খাঁ খাঁ করা মরুভূমি—বালি আর গর্ত। হাজার হাজার মাইল জায়গার এরকম এক জগৎ গভীর শূন্যে ভেসে চলেছে। আর আমাদের কাছে হয়ে রয়েছে শুধু রাতের আকাশে এক ফোঁটা লাল আলো।

শ্রীশ্রীমা

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র

সারদার অভয় পদ কর মন সার
এ ভীষণ ভবার্ণবে যদি হবে পার।
সন্তান-নয়নজল আর কে মুছাবে বল,
তাই ও চরণতল ছেড়ো নাকো আর ॥

ক্ষমায় ধরণীসমা জননী গো কর ক্ষমা,
আর কিছু জানি না মা শুধু কর নিস্তার।
হৃদয় মমতাভরা, ভয়াকুল-ভয়হরা,
দাও মাগো ভক্তি ত্বরা হয়ে যাই উদ্ধার ॥

মা তোমার ভক্তকুল মা-নামেতে প্রেমাকুল
ভব-জলধি অকূল অনায়াসে হয় পার ॥

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

চিকাগোয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়—সেই ধর্মমহাসভা ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, এই তথ্য বিস্ময়কর হলেও সত্য। সুতরাং ধর্মমহাসভা-সংক্রান্ত সংবাদ কিভাবে ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল তা সন্ধানের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতির সংবাদ প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার ঠিক উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভবত: ঐ সংবাদ বেরিয়েছে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের কোনো সময়ে বা তারও পূর্বে। স্বামীজী যদি পরিব্রাজক অবস্থায় জুনাগড়ে থাকাকালে ধর্মমহাসভার সংবাদ পেয়ে থাকেন তাহলে বোঝা যায়, ১৮৯২ সালের গোড়ার দিকেই পশ্চিমভারতে খবরটি প্রচারিত হয়ে গেছে। আমরা পুরাতন সংবাদপত্রের সন্ধানকার্য সাধারণভাবে করেছি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে, তাই ঐ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে আমাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া সকল কাগজ আমরা পাইনি বা পরীক্ষাও করতে পারিনি। তবে সুখের বিষয়, এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সাময়িকপত্র দেখতে পেরেছি, যাদের কর্তৃপক্ষ ধর্মমহাসভার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত এবং সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিলেন—একটির নাম 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার'—বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সম্প্রদায়ের মুখপত্র এটি, অন্যটি হল 'মহাবোধি সোসাইটি জার্নাল'—ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ধর্মমহাসভার সংগঠনে নববিধান সম্প্রদায়ের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ উৎসাহ ছিল, তিনি উপদেষ্টা সমিতির (Advisory Council) সদস্যও ছিলেন—'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' প্রতাপচন্দ্রের প্রভাবাধীন। অনাগারিক ধর্মপাল ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রাখতেন—তিনি মহাবোধি সোসাইটি জার্নালের পরিচালক ছিলেন।

চিকাগোর ধর্মমহাসভা কলম্বিয়া এগজিবিশনের অংশবিশেষ ছিল। ঐ এগজিবিশন ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে যথেষ্ট স্থান নিয়েছিল। আমেরিকায় পৌঁছে স্বামীজী এই বিশ্বমেলার (World's Fair) বিরাটত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হয়ে ভারতের চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' কাগজে ১৮৯৩ সালের ২৯ জানুআরি সংখ্যায় বিশ্বমেলা সম্বন্ধে লেখা হয়:[১]

---

১ Great preparations are being made in America and elsewhere to make the coming Chicago Exhibition to be held on 1st May, 1893, the grandest spectacle of its kind that ever was witnessed on earth. Chicago is about 15 times as large as Calcutta and is about twice as populations. It has made a wonderful progress in the course of a few years. The exhibition ground covers an area far larger than that of any other international exhibition up-to-date. The first international exhibition in London took up 21½ acres or about 65 bighas of land but the Chicago exhibition ground will comprise no less than 1037 acres or upwards of 3000

"১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে যে চিকাগো প্রদর্শনী খুলবে তার জন্য আমেরিকায় ও অন্যত্র বিপুল আয়োজন চলছে, যাতে এটিকে পৃথিবীতে এ-যাবৎ অনুষ্ঠিত এই-জাতীয় প্রদর্শনী-গুলির মধ্যে সর্বাধিক জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলা যায়। চিকগো শহর আয়তনে কলকাতার পনেরো গুণ, লোকসংখ্যায় দ্বিগুণ। গত কয়েক বছরে চিকাগোর উন্নতিও হয়েছে বিপুল পরিমাণে। এর আগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলির জন্য যতখানি করে জমির দরকার হয়েছে, এই প্রদর্শনীটি তার বহুগুণ বেশী জায়গা জুড়ে বসবে। লণ্ডনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য জমি লেগেছিল ২১.৫ একর বা প্রায় ৬৫ বিঘা; চিকাগো প্রদর্শনী বসছে ১,০৩৭ একর বা ৩,০০০ বিঘারও বেশী জমি জুড়ে। কতকগুলি বাড়ীর উচ্চতা ও পরিসর মনে হর্ষ আর বিস্ময় জাগাবে। ছয় বিঘা জমি জোড়া এবং বিশতলা বাড়ীই তো কয়েকটি রয়েছে; 'প্যারিসের ইফেল টাওয়ার-এর চেয়েও ১৫০' ফুট বেশী উঁচু' একটা তোরণের খবরও আমরা পেয়েছি। খবর পেয়েছি, রাস্তার নীচ দিয়ে অনেক সুরঙ্গ হচ্ছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থপতিবিদ্যার আরো কত আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে সেখানে।"

পুণা থেকে প্রকাশিত 'মারহাট্টা' নামক ইংরাজী সাপ্তাহিকে (বালগঙ্গাধর তিলকের পত্রিকা এটি) ১৪ মে, ২১ মে ও ২৮ মে—এই তিন সংখ্যায় চিকাগো এগজিবিশনের দীর্ঘ বর্ণনা সংকলন করে প্রকাশিত হয়। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:[২]

"চিকাগো প্রদর্শনী
বিশ্বমেলার উদ্বোধন

আজ খুব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিক-ভাবে 'কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন' অর্থাৎ

---

bighas. Some of the buildings are so lofty and so specious as to present a most sublime spectacle. We are told of houses 20 stories high and of buildings covering over 6 bighas of land, of "a tower 150 ft. higher than the Eiffel Tower in Paris"; of tunnels passing under the streets, and other wonders of modern engineering and architecture". *(The Orthodox Hindu's Voyage to Chicago).*

২ THE CHICAGO EXHIBITION
Opening of the World's Fair
To-day the President of the Republic of the United States formally opens the Columbian Exposition, or the Great World's Show at Chicago with much pomp and ceremony.....

The History of the Exhibition: Chicago had a hard fight to obtain the privilege of holding a grand International Exhibition. The Americans were determined to hold a World's Fair on a gigantic scale, and which should put the late Paris Exposition completely in the shade, and commemorate the 400th anniversary of the discovery of America by Columbus; but they were divided as to the *locale*. Chicago boldly advanced its claim to the honour and was heartily disliked by other towns for so doing.

The first ground was broken on 27th January, 1891.....The exposition buildings were dedicated on October 12th of last year that being the 400th anniversary of the discovery of America by Columbus—with imposing ceremonies, in the presence of 125,000 people. It was baptised the World's Columbian Exposition, taking its name from Columbus. The work of placing exhibits commenced in November last.

পৃথিবীর বৃহত্তম প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন।…

"প্রদর্শনীর ইতিহাস : একটি মহতী আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী করার গৌরবের অধিকারী হতে চিকাগোকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চতুঃশতবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে এমন বিরাটভাবে একটি বিশ্বপ্রদর্শনী খুলতে আমেরিকাবাসিগণ কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, যা প্যারিসে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীকে একেবারে কানা করে দিতে পারে। কিন্তু প্রদর্শনীটি কোথায় হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ হতে লাগল। এই সম্মানলাভের দাবী সবার আগে পেশ করল চিকাগো ; ফল হল, তাকে আর সব শহরের অপ্রীতিভাজন হতে হল।… [শেষ পর্যন্ত অবশ্য চিকাগোবাসীরাই বিজয়ী হলেন, কংগ্রেসের সহায়তায়। গভর্ণমেণ্টও সাহায্যার্থে হস্তপ্রসারণ করেন, জনগণেরও অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া যায়।]…জমিতে প্রথম কাজ শুরু হয় ১৮৯১-এর ২৭ জানুআরি।… ১,২৫,০০০ লোকের সামনে ঘটা ক'রে বাড়ীগুলি উৎসর্গ করা হয় গত বছর ১২ অক্টোবর—কলম্বাসের আমেরিকা-আবিষ্কারের ঠিক ৪০০ বছর পূর্তির দিনে। কলম্বাসের নামেই নাম দেওয়া হল—'দি ওয়াল'ড্‌স কলম্বিয়ান এক্‌সপোজিশন।' দর্শনীয় জিনিস-পত্র রাখা শুরু হল গত নভেম্বর থেকে।"

উক্ত রচনার মধ্যে প্রদর্শনীর খরচের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা সে যুগের দুঃস্থসর্বস্ব ভারতের কাছে কল্পনাতীত এক সংখ্যাসমষ্টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারপরে নানা শিরোনামায় প্রদর্শনীর নানা অংশের ও বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছিল—শিরোনামাগুলিরই শুধু উল্লেখ করছি :[৩]

" 'আর্থিক ব্যবস্থা', 'প্রদর্শনীর স্থান', 'কারিগর-ভবন', 'খনি', 'বিদ্যুৎ-ভবন', 'যন্ত্রগৃহ', 'মৎস্যপালন-ভবন', 'উদ্যান ও কৃষি বিভাগ', 'পরিবহন-ভবন', 'স্ত্রী-ভবন', 'যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিদ্যা প্রদর্শনী', 'কলম্বাসের স্মারকদ্রব্য', 'অষ্ট্রেলিয়া-বিভাগ', 'ভারতীয় শিবির', 'বোম্বাই-এর মৃৎশিল্প প্রদর্শনী', 'কানাডা-বিভাগ', 'বিবিধ-বিষয়ক বিভাগ'।"

চিকাগো প্রদর্শনীর এই বিবরণ ভারতের সাময়িক পত্র থেকে কিছুটা উদ্ধার করে আনবার উদ্দেশ্য আমেরিকার ঐশ্বর্য তখন ভারতের কাছে কী কল্পনাতীত আকার নিয়ে প্রতিভাত তা দেখিয়ে দেওয়া। চিকাগো প্রদর্শনী ভারতীয় কল্পনাকে আকর্ষণ করে উদ্দীপিত করেছিল, মনে হয়েছিল—সে এক আশ্চর্য রোমাণ্টিক জগৎ। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে ভারতীয় মনে যে-ঔৎসুক্য জেগেছিল, তা স্বতঃই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত চিকাগো ধর্মসভা লাভ করেছিল। ভারতের শিক্ষিত মানুষেরা চিকাগোয় একটা বিরাট কিছু যে ঘটছে সে সম্বন্ধে সচেতন ও উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

৩ "The Financial Arrangements", "The Sight of the Exhibition", "The Manufacturer's Building", "The Mines", "The Electricity Building", "The Machinery Hall", "The Fisheries Building", "The Fine Arts Building", "The Horticulture Building", "The Transportation Building", "The Women's Building", "The United States Navy Exhibit", "Relics of Columbus", "The Australian Section", "The Indian Pavilion", "Exhibits of Bombay Art Pottery", "The Canadian Section", "Miscellaneous Items",

তার ফলে প্রদর্শনী-সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের অসামান্য সাফল্যের সংবাদ যখন ভারতে প্রচারিত হল, তখন সমাজদেহের মধ্যে তীব্র শিহরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

যাই হোক প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশের যে-বিবরণ মারহাট্টায় বেরিয়েছিল তা ভারতীয় পাঠকদের কাছে কৌতূহলজনক মনে হতে পারে বলে উদ্ধৃত করছি :[৪]

"ভারতীয় শিবির

চিকাগো থেকে রয়টার ৩রা এপ্রিল বিশেষ টেলিগ্রামে 'ডেলি ক্রনিকল'-কে বিশ্বমেলায় ভারতীয় শিবিরের বিবরণ জানিয়েছেন। শিবিরটির গঠনভঙ্গিমায় খুঁটিনাটি বিষয়েও প্রাচ্য স্থাপত্যের নিদর্শন সুপরিস্ফুট, ভবনটি আকারে প্রায় চতুষ্কোণ. একটি সু-উচ্চ তোরণশোভিত;... পার্কের উত্তর দিকে চোখে পড়ার মতো বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য-নমুনার ভেতর এর বাইরের চেহারা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।... [এরপর বলা হয়েছে যে, প্রদর্শনীর প্রধান জিনিস হল চা, যার উৎপাদনে ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ঢেলেছেন, আর দেড়লক্ষেরও অধিক ভারতবাসী নিযুক্ত রয়েছে। এখানে এলে যে ভারতীয়দের স্বহস্তচিত্রিত কারুকার্যমণ্ডিত পাত্রে ভারতীয়দের দ্বারা পরিবেশিত চা খেতে পাওয়া যাবে, সেকথারও উল্লেখ করা হয়েছে।]...শিবিরটি পুরোপুরি ভারতীয় প্রথায় সাজানো হবে। মেলার এই অনন্য শিবিরটিতে এই সব দর্শনীয় জিনিস সাজিয়ে রাখা হবে : ভারতীয় কার্পেট, পিতল ও তামার বাসন, স্বর্ণ- ও রৌপ্যপাত্র, মূল্যবান ধাতুর ওপর জালতি ও পাথর বসানো সূক্ষ্মকারুকার্য-মণ্ডিত প্রাচীন ভারতের অস্ত্রশস্ত্র। এছাড়া সবচেয়ে জমকালো সংগ্রহ হল সব রকম ডিজাইনের হাতির দাঁতের জিনিস। সংগ্রহগুলির মোট মূল্যের অঙ্কটি বিশাল—কয়েক শো হাজার ডলারের কাছাকাছি।"

কেবল ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দেশীয় পত্রিকাগুলিও যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে চিকাগো-প্রদর্শনীর উপর সংবাদ-প্রবন্ধ ছেপেছিল। ঐ কালের বাংলা পত্রিকার অনেকগুলিরই মধ্যে চিকাগো প্রদর্শনীর বিবরণ আছে। 'সখা' পত্রিকার জুন সংখ্যায় 'চিকাগো মহামেলা' নামে একটি বিবরণবহুল রচনা প্রকাশিত হয়, তার শেষ দিকে পাই : "আমাদের ভারতবর্ষ হইতে অনেক জিনিসপত্র গভর্নমেণ্টের সাহায্যে টেলারী কোম্পানী তথায় পাঠাইয়াছেন। শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া চিকাগো মহামেলায় প্রদর্শনার্থ কতকগুলি জিনিস নিজের সঙ্গে লইয়া

৪ The Indian Pavilion
A special Reuter telegram from Chicago to the Daily Chronicle of April 3 describes the Indian pavilion at the World's Fair. The style of architecture is Oriental in its minutest detail. The building is almost square in form with a lofty gateway,....and the general effect of the exterior renders the structure a striking object among the curiously varied specimens of architecture to be found at the north end of the park.....The pavilion will be furnished throughout in the Indian fashion. Indian carpets, brass and copper utensils, gold and silver vessels, antique Indian arms, curiously inlaid with filigree and mosaic work in precious metals, besides perhaps the most magnificent collection of ivory goods in all designs to be seen at the Fair, will be exhibited for the inspection of visitors in this unique pavilion. The total value of the collection will be something enormous, reaching hundreds of thousands of dollars.....

গিয়াছেন। তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে। ঐ জিনিস-গুলি মহারানীর জনৈক পুত্রী সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

চিকাগো বিশ্বমেলা যে ভারতবর্ষে প্রবল আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ, জনৈক ভারতীয় ব্যবসায়ীর তত্ত্বাবধানে একটি 'হিন্দু জাহাজ' আমেরিকায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ জাহাজে আহা-রাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ হিন্দু আচার বজায় থাকবে। সমুদ্রযাত্রা ও আহারাদি বিষয়ে তৎকালীন হিন্দুমনের সংস্কারাচ্ছন্নতার পট-ভূমিকায় 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টার' কাগজের ২৯শে জানুআরি ১৮৯৩ সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য এখন ইতিহাসের অংশ :[৫]

[৫] Messrs Cursetji Sorabji and Co. of Bombay have published a prospectus of a proposed Hindu expedition to Chicago, a copy of which has been kindly sent to us. "We have made arrangements", says the Prospectus, "to charter a first class steamer, which will start to Chicago, via London and New York, on 15th March, 1893, returning in July, 1893. Hindus only will be taken as passengers, whose religious feelings will be fully respected, both during their voyages to and on their arrival at Chicago, so far as their bathing, dining, sleeping and other daily avocations of life are concerned. Due care will be taken to superintend properly all the arrangements and carry them out to the satisfaction of those who will undertake the journey for the above Exhibition. There will also be a competent Hindu Doctor, conversant with Hindu medicine as used by orthodox Hindus, in addition to one who will be a Graduate of Medicine to dispense the same according to English style. Provision will be made to enlist the services of competent Hindu managers, first class Brahmin cooks, professional Hindu confectioners, and other Hindu servants, and the entire stock of provisions will be taken from Bombay on a scale which will suffice for the requirements of the passengers during the entire trip. New extra water tanks will be placed in the steamer for the use of the Hindu passengers. No animal will be killed on board the steamer, nor fishing even will be allowed, in fact every possible precaution will be taken to respect their religious prejudices, so that no complaint may arise". Among the patrons of the project we find the names of Mahamahopadhyaya Pandit Mohesh Ch. Nyayaratna, C. I. E., Maharaj Kumar Binoy Krishna Deb Bahadur, The Hon'ble P. Chentsalrao Puntulu, C I. E., Dewan K. Sheshadri Iyar, C. S.I. Dewan Ram Das, C. S. I., The Hon'ble Ranchordlal Chotalal, C. I. E., Dewan Mathuradass Bahadur of Kapurthala, Raj Tej Narayan Singh Bahadur, Rao Bahadur Koylash Chandar Mukerjee. The first class passengers will have to pay Rs. 3000 each, the second class passengers Rs. 2500 each, while the fare for attendants will be Rs. 1500 each. The above sums will include return passage with meals, railway charges and everything. Applications for passage should be made on or before the 1st February, 1893. Now that the sea-voyage has found so many orthodox supporters in Bengal and in other parts of India, we hope the projects of Messrs Cursetji Sorabji and Co. will meet with a large measure of success. There are many well-to-do people among the educated classes, not to mention the rich Zemindars, merchants and others, who can well afford to spend a few thousands of rupees for such a worthy object. Those who will avail themselves of this grand opportunity will not only enrich their own minds with a vast supply of new ideas, but will be the means of shaping to a great

"বোম্বাই-এর মেসার্স কারসেটজী সোরাবজী এ্যাণ্ড কোম্পানী হিন্দুদের চিকাগোযাত্রার জন্য একটি প্রস্‌পেকটাস ছেপেছেন এবং অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে তার একখানা পাঠিয়েছেন। তাতে আছে, 'আমরা একখানা প্রথমশ্রেণীর ষ্টীমার ভাড়া করছি; সেটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হয়ে চিকাগো যাবে, আর ফিরবে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। কেবলমাত্র হিন্দু যাত্রী নেওয়া হবে—যাওয়ার পথে এবং পৌঁছবার পর চিকাগোতেও স্নান, আহার, নিদ্রা এবং অন্যান্য সব দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাঁদের ধর্মসংস্কারকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে। সব ব্যবস্থা ঠিকমত করার জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হচ্ছে—পূর্বোক্ত মেলায় যাত্রীদের যাতে পরিতুষ্ট করা যায়। তাঁদের চিকিৎসার জন্য গোঁড়া হিন্দুদের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ একজন হিন্দু কবরেজ সঙ্গে যাচ্ছেন; তাছাড়া যাচ্ছেন ইংরেজী মতে চিকিৎসা করতে পারেন এমন একজন পাশকরা ডাক্তারও। হিন্দু ম্যানেজার, উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ রাঁধুনী, পেশাদারী হিন্দু মোদক, এবং অন্যান্য হিন্দু পরিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। যাত্রা করা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত প্রয়োজন মেটাবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-সম্ভার বোম্বাই থেকেই জাহাজের ভাণ্ডারজাত করে নেওয়া হবে। কেবল হিন্দু যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ষ্টীমারে কতকগুলি নতুন জলের ট্যাঙ্ক বসানো হবে। ষ্টীমারের ওপর কোন পশুবধ করা হবে না, এমনকি ষ্টীমার থেকে মাছ ধরতেও দেওয়া হবে না। এককথায়, যাত্রীদের ধর্মসংস্কার যাতে পূর্ণ মর্যাদা পায়, এ নিয়ে কোন অভিযোগ যাতে না ওঠে, তার জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।' দেখছি এই পরিকল্পনায় পেট্রোনদের মধ্যে রয়েছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই, মহারাজকুমার বিনয়-কৃষ্ণ দেব বহাদুর, মাননীয় পি. চেন্টসালরাও পান্টুলু সি. আই. ই, দেওয়ান কে. শেষাদ্রি আয়ার সি. এস. আই, দেওয়ান রামদাস সি. এস. আই, মাননীয় রণছোদ'লাল ছোটলাল সি. আই. ই, কাপুরথালার দেওয়ান মথুরাদাস বাহাদুর, রাজা তেজনারায়ণ সিং বাহাদুর, রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র মুখার্জী। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের প্রত্যেকের জন্য দিতে হবে ৩,০০০৲ টাকা করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২,৫০০৲ টাকা করে; পরিচারকদের জন্য দিতে হবে মাথাপিছু ১,৫০০৲ টাকা। ঐ ভাড়ার মধ্যে তাঁদের যাওয়া-আসা, খোরাক, রেলভ্রমণের খরচ ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। যাত্রী হবার জন্য দরখাস্ত করতে হবে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি বা তার আগে। এই সমুদ্রযাত্রায় বাংলার ও ভারতের অন্যান্য অংশের বহু-সংখ্যক গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থন দেখে আমরা আশা করছি মেসার্স কারশেটজী সোরাবজী

---

extent the future of their country. *The Chicago Exhibition will mark an epoch in the history of India as will doubtless mark an epoch in the history of the world at large.....*One thousand respected Hindus crossing the *Kalapani* and sojourning for a month in a country where no Hindu of the orthodox type had ever set his foot, will be an event in our national history, the beneficial results of which, educational and social, we can hardly over-estimate. Nor would India alone be a gainer by such a close contact.....Europeans and Americans also would benefit immensely by a closer view of the Aryan Civilization as exemplified in the lives of high-born and respectable Hindus.

এ্যাণ্ড কোম্পানীর পরিকল্পনা বহুল পরিমাণে সফলতা লাভ করবে। শিক্ষিতদের মধ্যে এমন ধনী লোক অনেক আছেন,—ধনী জমিদারদের তো কথাই নাই,—ব্যবসায়ীরা এবং আরও অনেকে আছেন, যাঁরা এরকম একটি সমুদ্রযাত্রার মতো যোগ্য বিষয়ে কয়েক হাজার টাকা স্বচ্ছন্দে খরচ করতে পারেন। এ সুবর্ণসুযোগের সদ্ব্যবহার যাঁরা করবেন, তাঁরা যে শুধু প্রচুর নতুন ভাব পেয়ে নিজেদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন তাই নয়, স্বদেশের ভবিষ্যৎ-গঠনের কাজেও অনেকখানি সহায়তা তাঁরা করতে পারবেন। **শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের ইতিহাসে চিকাগো প্রদর্শনী একটি যুগান্তকারী ঘটনা হবে।**… একহাজার সম্মানার্হ হিন্দু **কালাপানি** পাড়ি দিয়ে এমন এক দেশে একমাসের জন্য প্রবাসী হবেন, যে দেশে কোন গোঁড়া হিন্দু কখনো পদার্পণ করেন-নি,—আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজে এর ফল যে কতখানি শুভকারী হবে, তা আমাদের ব'লে শেষ করার নয়। এই ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে ভারত একাই লাভবান হবে না,… উচ্চবংশজাত সম্মানার্হ হিন্দুদের জীবনে পরিস্ফুট আর্যসভ্যতাকে নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পাবার ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকাও উপকৃত হবে প্রভূত পরিমাণে। [ক্রমশঃ]

* প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'ভারতীয় পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ' হইতে—সঃ

"অন্যেরা যে-যাই ভুল করুক, তাঁর কাছে এ দেশ নবীন। ভারতের ভাষাসমূহ অকর্ষিত, সম্ভাবনায় নমনীয়। ভারতের প্রাণশক্তি অব্যবহৃত। তাঁর স্বপ্নের ভারত ভবিষ্যতের গর্ভে। যন্ত্রণা ও সহনের মধ্য দিয়ে আজ যে-নবচেতনার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভাবী পরিবর্তনের তা প্রথম স্তর মাত্র। তাঁর মতে, ভারতের আশার উৎস তার নিজের মধ্যে, বিদেশে নয় কদাপি। একথা সত্য, তাঁর বিশাল হৃদয় বিদেশীর প্রয়োজন উপলব্ধি করে সর্ব মানুষের পক্ষেই আশার বাণী উচ্চারণ করেছে। কিন্তু তিনি অপরপক্ষে অন্যের সাহায্যভিখারী ছিলেন না। দানের ক্ষেত্রে সৌভাগ্য দাতারই, গ্রহীতার নয়। বাহির থেকে তিনি আশাও করতেন না, আশঙ্কাও নয়। ভারতের আত্মিক স্বরূপের পুনর্ঘোষণা, সমুদ্রলক্ষ্যে জাতির প্রাণগঙ্গাকে নব-প্রবাহে সঞ্জীবিত ও উচ্ছ্বসিত করে তোলাই তাঁর সন্ন্যাসের তাৎপর্য।"

—ভগিনী নিবেদিতা

যারা আমাদের জাগালো

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

যারা আমাদের জাগায়ে তুলিল নূতন জীবন-গানে
প্রথম উষায় নবসূর্যের গেয়ে বন্দনা-গীতি।
পশুশক্তিরে নাশিল যাহারা আত্মিক শক্তিতে
ভুলিব কি মোরা সত্যসন্ধ তাদের পুণ্য স্মৃতি॥

যুগে যুগে যারা মিথ্যারে দলি আপনার পদতলে
করি প্রতিষ্ঠা মানুষের মনে চিরসত্যের বাণী,
যাহারা জ্বালিল আঁধারের পথে আলোকের বর্তিকা
তাদের স্মরিয়া পাঠাই আমার প্রাণের প্রণামখানি॥

জীবনযুদ্ধে পরাজিত আর নিপীড়িত নরনারী
যাদের বাণীতে ফিরিয়া পেয়েছে অমিত শক্তি প্রাণে।
যাহারা দানিল জীবনে নূতন সরণির সন্ধান
নবজাগরণী মন্ত্র যাহারা শুনায়েছে কানে কানে॥

যাহারা প্রথম জানালো আমরা অমৃতের সন্ততি,
মৃত্যুসাগর মন্থন করি আনিল অমৃত-বারি।
সত্য যাদের হলো ধ্রুবতারা ধর্মের পথমাঝে
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিপদপাথার অনায়াসে দিল পাড়ি॥

মোহবন্ধন করি খণ্ডন জ্বালিল জ্ঞানের শিখা,
মূঢ় অন্ধেরো জ্ঞানের পিপাসা যাহারা জাগালো মনে।
শত বরষের বিপ্লব ঠেলি ভারত দাঁড়ায়ে আছে
যাদের কৃপায় জড়ায়ে রয়েছে ধর্মের বন্ধনে॥

সেই সব মহাপুরুষ প্রধান ভারত-সাধক পদে
নিবেদন করি আমার প্রাণের ভক্তি অশ্রুজল।
দুর্গত আজ ভারতবাসীরা, হইয়াছে পথহারা
তাদের হৃদয়সরসে ফুটুক জ্ঞানের পদ্মদল॥

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

স্পেন্সারের শিক্ষাসূত্রের চতুর্থ সূত্র—'যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।'[১] স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায়—"...এক্ষণে মনুষ্যের সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করা যাউক। কি প্রকার শিক্ষা এবং জ্ঞান মনুষ্যকে সামাজিক ব্যবহারে পটু করিতে পারে? বলা যায় না যে, ঐ প্রকার শিক্ষা বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, অন্ততঃ কতকগুলি বিষয় অভাবতঃ (?) সামাজিক শিক্ষা প্রদান করে। ইতিহাস ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু পূর্বে যে প্রকার বলা হইয়াছে, এই শিক্ষা সামাজিক বিষয়ে প্রকৃত নেতা হইতে পারে না। বিদ্যালয়ে অধীত ইতিহাসই কোন প্রকার সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা দেয় না। ভূপতিদিগের জীবন, পারিষদ্‌দিগের ষড়যন্ত্র, বলপূর্বক সিংহাসনাধিকার প্রভৃতি বিষয়সমস্ত সমগ্র জাতীয় জীবনের অল্পই চিত্রিত করে। অমুক অমুক রাজ্যের মধ্যে অমুক অমুক বিষয়ের জন্য বিবাদ উপস্থিত হয়, প্রত্যেক পক্ষে এত সৈন্যসংগ্রহ এবং কামান ছিল, অমুক সেনাপতি এইপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিলেন। বলুন দেখি, ইহা শিক্ষা করিয়া আপনার সামাজিক জীবনের কি উপকার হইবে? বলিবেন, ইহা সত্য, কিন্তু সত্যের অনুরোধে পাঠ করি। সত্য হইলেই কি তাহা মূল্যবান হইল?"[২]

১, ২ শিক্ষা: স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত: 'বসুমতী'-প্রকাশিত শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ: পৃ: ১০-পৃ: ৩০-৩১

স্পেন্সারের মূল গ্রন্থ Education-এর ভাষা—"... Let us pass now to the function of the citizen. We have to enquire what knowledge fits a man for the discharge of these functions. It cannot be alleged that the need for knowledge fitting him for these functions is wholly overlooked; for our school-courses contain certain studies which, nominally at least, bear upon political and social duties. Of these only one that occupies prominent place is History.

But as already hinted, the information commonly given under this head, is almost valueless for purposes of guidance. Scarcely any of the facts set down in our school-histories, and very few of those contained in the more elaborate works written for adults, illustrate the right principles of political action. The biographies of monarch (and our children learn little else) throw scarcely any light upon the science of society. Familiarity with court intrigues, plots, usurpations, or the like and with all personalities accompanying them aids very little in elucidating the causes of

national progress. We read of some squabble for power, that it led to a pitched battle; that such and such were the names of the generals and their leading subordinates, that they had each so many thousand infantry and cavalry, and so many cannon,······. And now, out of the accummulated details making up the narrative, say which it is that helps you in deciding on your conduct as a citizen······. "But these are facts interesting facts," you say. Without doubts they are facts (such, at least, as are not wholly or partially fictions); and to many they may be interesting facts. But this by no means implies that they are valuable."

স্পেন্সার ইতিহাসের সাধারণ তথ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তা আধুনিক ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত। প্রাচীনযুগের পুরাণে ও ইতিহাসে মহাপুরুষ, অবতার, রাজা ও বীরের দলের প্রাধান্য। পুরাণ জাতীয় ইতিহাসের কল্পনাসমৃদ্ধ রূপ। তাই ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পুরাণেরও নিজস্ব ভূমিকা আছে। তবু এ সব কিছুই সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর বৃত্তান্ত। সমাজের মূল প্রাণশক্তি যে সাধারণমানুষ, তাদের সম্বন্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ ইতিহাসই নীরব। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই সাধারণমানুষই ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র।

'পরিব্রাজক'-গ্রন্থে য়ুরোপের সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য—"···গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য-দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরীব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়, এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড! বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না, এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্চে প্রাণ।"[৪]

স্বামীজীর এ মন্তব্য যেমন 'নীচজাতি অজ্ঞ দরিদ্র পতিতের' সঙ্গে তাঁর একাত্মতার পরিচায়ক তেমনি তাঁর সমাজসচেতন মননে ইতিহাসের মূল সত্য অন্বেষণের দৃষ্টান্ত। স্পেন্সার যেমন সমাজবিজ্ঞানের পটভূমিকায় ইতিহাসকে স্থাপন করতে চেয়েছেন, পরবর্তী কালে স্বামীজী 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসকে তেমনি ভারতের প্রজাশক্তির ধারাবাহিক অভ্যুদয়রূপে বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। আবার সেইসঙ্গে ভারত-ইতিহাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধর্মচেতনা ও ধর্মবীরদের নিজস্ব ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন।

রাজনীতি-প্রধান য়ুরোপীয় সভ্যতা ও ধর্ম-নীতি-প্রধান ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে স্বামীজী লিখছেন—"গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান' বই তো নয়। ও তোমার 'পার্লামেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান্ পুরুষ কে? না—ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি।

৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ১১৭-১১৮

তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামাগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই।"[৫]

উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষাংশটুকু আর এ যুগের ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব ধরনটি বিশ্লেষণে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত সত্য। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সম্বন্ধের মাঝখানে ভারতে একটি প্রধান মধ্যস্থ শক্তি সমাজ। তাই প্রত্যক্ষভাবে রাজপ্রাসাদ থেকে জনজীবন ততটা নিয়ন্ত্রিত করা এদেশে সম্ভব হয়নি। মূলতঃ গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা ভারতীয় জীবনধারাকে যুগে যুগে লালন পালন করে এসেছে। কিন্তু এ ব্যবস্থাও নিশ্ছিদ্র বা নিষ্কলঙ্ক কিছু নয়। লোকাচার, দেশাচার, ছুঁৎমার্গ—এ সবের ভারে জীর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেও যুগে যুগে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছে। সে প্রতিবাদের ভাষা ধর্ম।

'বর্তমান ভারতে' ভারতীয় ইতিহাসের সেই বৈশিষ্ট্য স্বামীজীর গাঢ়বদ্ধ সাধু ভাষায়—"ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।"[৬]

সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের সমাজবিজ্ঞান-সম্মত রূপায়ণ প্রচেষ্টায় প্রথম জীবনে স্পেন্সারের অনুবাদক বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের শেষ কয় বছরে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। 'বর্তমান ভারত' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ দুটি এ দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের কোনোটিতেই ইতিহাসের সাধারণ ঘটনা-কৌতূহল চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা নেই। ইতিহাসের মর্মে প্রবেশ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ই এ দুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের তথ্যরাশি থেকে কেমন করে প্রাণের সত্য নিষ্কাশিত হবে, সে সম্বন্ধে স্পেন্সার লিখেছেন—"We want all facts which help us to understand how a nation has grown and organised itself. Among these, let us of course have an account of its government; with as little as may be of gossip about the men who officered it, and as much possible about the structure, principles, methods, prejudices, corruption etc. which it exhibited; and let this account include not only the nature and actions of the central government, but also those of local governments, down to their minutest ramifications······. Let us know, too, that what were all the other customs, which regulated the popular life out of doors and indoors···. The only history that is of practical value, is what may be called Descriptive Sociology. And the highest office which the historian can discharge, is

৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ১৬১-১৬২

৬ বাণী ও রচনা ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ২৩৭

that so narrating the lives of nations, as to furnish materials for a Comparative Sociology and for the subsequent determination of the ultimate laws to which social phenomenon conforms."[৭]

স্বামীজীর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ—"কি প্রকারে সমাজবিশেষ গঠিত হইল, কি প্রকারে জাতি-বিশেষের অভ্যুদয় হইল, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন। শাসকদিগের ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব? কেবল যে সর্বোচ্চ শাসন-সমিতির আবশ্যক, তাহা নহে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ-পরিচালক শক্তিসমষ্টিরও বিবরণ আবশ্যক। কি প্রকারে বিবিধ সামাজিক সম্প্রদায় নিম্ন-শ্রেণীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, কি প্রকারে বিবিধ নিম্নশ্রেণীর দ্বারা সম্মানিত হইতেছে, এই সমস্ত বিবরণের প্রয়োজন। গৃহে এবং বাহিরে সেই সমাজের লোকেরা কি প্রকার ব্যবহার করিত, তাহাও আবশ্যক। স্ত্রীপুরুষ, পিতামাতা, এবং সন্তান পরস্পরের উপর কিরূপ ব্যবহার করিত, কি কি কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাণিজ্যের অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহাদের শিল্পবিবরণ, তাহাদের মানসিক অবস্থা প্রকৃত ইতিহাসে সমুদয় বিবৃত থাকা উচিত; এই সকল বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বিবৃত হওয়া উচিত যে, পাঠ করিলে সমস্ত সমাজের ছবি মানসপটে উদিত হইবে। বিবিধ সময়ে সেই সমাজের বিবিধ পরিবর্তনও কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের যথার্থ সহচর।"[৮]

৩, ৭ Education : Spencer : 1st Edn. p 32-36 মূল ইংরেজী থেকে স্থানাভাবের জন্য কিছু অংশ এখানে বর্জিত। অনুবাদ সবটাই দেওয়া হয়েছে।

৮ শিক্ষা: পৃ: ৩২-৩৩

"স্বার্থসুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না, এবং ঐ ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি ও হোমের একমাত্র লক্ষ্য।"

"যে উপায়েই হউক বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয়লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে; অন্তর্নিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয়-লাভের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল; পূজা ও স্বার্থত্যাগে সেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনীভূত ও মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এবং পরিশেষে সেই নবশক্তি-নিয়োগে অভীষ্টফল করতলগত হইল। সর্বদেশে সর্ব-কালে সর্বফলসিদ্ধির জন্য এই নিয়মই প্রবর্তিত—শক্তিক্ষয়-নিবারণ, অন্তর্নিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান।"

—স্বামী সারদানন্দ

প্রাচীন বাঙালীর আহার ও পানীয়

শ্রীসুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বাঙালী চিরদিনই খুব ভোজনপ্রিয় জাত বলে গণ্য। যদিও ষোড়শ শতাব্দীর কিছু কিছু কাব্য ছাড়া তার আগে আর কোথাও বাঙালীর ভোজনপ্রিয়তার তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তথাপি সামান্য নিদর্শন যা' পাওয়া গেছে তার থেকে এধারণা করা কষ্টকর নয় যে, ভোজনের ব্যাপারে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য অনেককাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

ভেতো বাঙালী,—এমন একটা বদনাম কি সুনাম অনেক দিন থেকেই বাঙালীর আছে। এর কারণ কি? ইতিহাসের ঊষাকাল থেকেই ধান ছিল বাঙলাদেশের প্রথম ও প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তাই ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। ভাত খাওয়ার এ অভ্যাসটি বাঙালী রপ্ত করেছে আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে এসে। ছোট বড়, ধনী নির্ধন সকলের কাছেই এদেশে ভাত অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য বলে বিবেচিত। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের একটি পদে আছে 'হাড়িত ভাত নাহি নিতি নিতি আবেশী'—। ভাতরান্নার সুন্দর উল্লেখ রয়েছে নৈষধচরিতে দয়মন্তীর বিবাহের বর্ণনাতে। ঘি দিয়ে গরম ভাত খাবার রীতি বাঙালী সমাজে চলে আসছে অনেক দিন থেকেই।

প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে (চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি?) প্রাকৃত বাঙালীর কলাপাতায় আহারের এক বিস্তৃত না হলেও সুদুর্লভ বর্ণনা রয়েছে: 'ওগ্‌ গরা ভাগ গাইক ঘিতা', গোঘৃত-সহকারে সফেন গরমভাত। নৈষধচরিতের বর্ণনা বিস্তৃততর। পরিবেশিত অন্ন থেকে ধোঁয়া উঠছে, তার প্রত্যেকটি কণা অভগ্ন, একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন (ঝরঝরে ভাত), সে অন্ন সুসিদ্ধ সুস্বাদু ও শুভ্রবর্ণ, সরু এবং সৌরভময় (১৬।৬৮) দুগ্ধ ও অন্নপক্ক পায়সও উচ্চকোটির লোকের এবং সামাজিক ভোজে অন্যতম প্রিয় ভক্ষ্য ছিল। (১৮।৭০)

ভাত সাধারণতঃ খাওয়া হোত শাক ও অন্যান্য ব্যঞ্জন সহযোগে। দরিদ্র এবং গ্রাম-বাসীদের ভোজ্য ছিল শাকসবজি। নানা-প্রকারের শাকের মধ্যে নালিতা (পাট) শাকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় প্রাকৃতপৈঙ্গলে। এতে বাঙালীর একটি সনাতন প্রিয়ভোজের এরূপ সুন্দর বর্ণনা আছে—

> ওগ গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা গাইক ঘিত্তা
> দুগ্ধ সযুক্তা
> মোইলি মচ্ছা নালিত গচ্ছা দিজ্জই কান্তা
> খা(ই) পুনবন্তা।

কলাপাতায় গরমভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল এবং নালিতা শাক যে স্ত্রী নিত্য পরিবেশন করতে পারেন তাঁর স্বামী পুণ্যবান।

গৃহস্থরা প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকাতে শাকান্ন যুক্ত করলেও সামাজিক ভোজে—বিশেষতঃ বিবাহভোজে বরযাত্রীরা শাকান্ন পছন্দ করতেন না।

দময়ন্তীর বিবাহভোজে সবুজরঙের পাত্রে ভাত-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। বরযাত্রীরা মনে করেছিলেন বুঝিবা শাক-তরকারি পরিবেশন করা হয়েছে; একটু বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করলেন দেখে কন্যা-পক্ষীয়েরা বললেন, আপনাদের শাক পরিবেশন

করা হয়নি, পাত্রটির বর্ণ সবুজ বলেই অন্ন ব্যঞ্জন সবুজ দেখাছে।

বিবাহভোজে হরিণ ছাগ এবং পক্ষীমাংসের নানারকমের ব্যঞ্জন, মাছের ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য আরো নানাপ্রকারের সুগন্ধি এবং প্রচুর মসলা-যুক্ত ব্যঞ্জন পরিবেশিত হওয়াই ছিল বাঙালী সমাজের রীতি। তারপর এসবের শেষে নানাপ্রকারের সুমিষ্ট পিষ্টক এবং দই ইত্যাদিও পরিবেশিত হত। পানীয়রূপে পরিবেশিত হত কর্পূরমিশ্রিত সুগন্ধি জল। ভোজের পরে দেওয়া হতো নানামসলাযুক্ত পানের খিলি।

দই পায়স ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত নানা-প্রকারের খাদ্যের উল্লেখ প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থের নানাস্থানে পাওয়া যায়। এগুলি চিরদিনই বাঙালীর প্রিয়খাদ্য। ভবদেবভট্টের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকারের দুগ্ধপান সম্বন্ধে নানাপ্রকারের বিধিনিষেধ রয়েছে।

মাংসের মধ্যে হরিণের মাংস খুবই প্রিয় ছিল। বিশেষতঃ শবর পুলিন্দ প্রভৃতি শিকারজীবী লোকেদের মধ্যে এবং সমাজের অভিজাত স্তরে হরিণের মাংস খাওয়া হতো। ছাগমাংস খাবার রীতি ছিল সমাজের সকল-স্তরেই। কোন কোন প্রান্তে ও লোকস্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী কৌমে বোধহয় শুকনো মাংস খাওয়াও প্রচলিত ছিল কিন্তু ভবদেবভট্ট কোনকারণেই শুকনো মাংস খাওয়া অনুমোদন করেননি বরং নিষেধই করেছেন। কিন্তু মাছই হোক আর মাংসই হোক, অথবা নিরামিষই হোক, বাঙালীর রান্নার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ছিল।

মাংসের প্রতি বাঙালীর বিরাগ কোন-কালেই ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতক থেকেই খাদ্যের জন্য প্রাণিহত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল এবং আর্যব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশঃ নিরামিষ আহার্যের প্রতিই পক্ষপাতী হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশেও এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, সন্দেহ নেই ; কিন্তু চিরাচরিত এবং বহু অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে তা' যথেষ্ট কার্যকরী হতে পারেনি। বাংলার প্রথম ও অন্যতম প্রধান স্মৃতিকার ভট্টদেব সুদীর্ঘ যুক্তিতর্ক উপস্থিত করে বাঙালীর এই অভ্যাস সমর্থন করেছেন।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে রোহিত, শফর (পুঁটি বা শফরী মাছ), সকুল (সোল) এবং শ্বেতবর্ণের অন্যান্য মৎস্য ব্রাহ্মণদের আহার্য ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল বা চর্বির তালিকা দিতে গিয়ে জিমূতবাহন ইল্লিস (ইলিস বা ইলসা) মাছের তেলের উল্লেখ ও বহুল ব্যবহারের কথা বলেছেন। আজকের দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিসমাছ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় খাদ্য ছিল। সব মাছ কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণরা খেতেন না ; যেসব মাছ গর্তে কাদায় বাস করতো, যাদের আঁশ নেই, সে সব মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচা ও শুকনো মাছও খাওয়া হতো না। শামুক, কাঁকড়া, মোরগ প্রভৃতির মাংস, নানাপ্রকারের আঁশছাড়া মাছ, সর্পাকৃতি বানমাছ, গর্তকাদাবাসী নানাপ্রকারের অকুলীন মাছ, নানাপ্রকারের পাখীর মাংস—সবই খাওয়া হতো। শশক, সজারু ও কচ্ছপ খাওয়ার কোন বাধা ছিল না।

তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, কাঁকরুল, কচু (কন্দ) প্রভৃতি আদি-অস্ট্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর দান। এসব তরকারি বাঙালী খুব প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করে আসছে, ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এই অনুমান

অনৈতিহাসিক নয়। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে পর্তুগীজদের চেষ্টাতে এবং অন্যান্য নানা সূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু আমাদের খাদ্যের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আদিপর্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল না।

ফলের মধ্যে কলা তাল আম কাঁঠাল নারিকেল ও ইক্ষুরই উল্লেখ পাওয়া যায় বারবার। আম-কাঁঠালের উল্লেখ লিপিমালায় সুপ্রচুর। পূজা বিবাহ স্নানযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের উল্লেখ দেখা যায়। আখের রস আজকের মতন তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল। রস থেকে গুড় ও একপ্রকারের দানাওয়ালা খণ্ড চিনিও প্রস্তুত হতো। তেঁতুলের ব্যবহার দই চিড়া মুড়ি ও খইখাওয়ার কথাও লেখা আছে নানান প্রাচীন গ্রন্থে।

দুধ, নারিকেলের জল, আখের রস, তালরস ছাড়া মদ্যজাতীয় নানাপ্রকারের পানীয় প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। গুড় থেকে প্রস্তুত সবরকমের গৌড়ীয় মদের খ্যাতি ছিল সারা-ভারত জুড়ে। ভাত গম গুড় মধু আখ তালরস প্রভৃতি গেঁজিয়ে নানাপ্রকারের মদ তৈরী হতো। ভবদেবভট্ট তাঁর প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ গ্রন্থে নানাপ্রকার মদ্যপানীয়ের উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজ ও দ্বিজেতর সকলের পক্ষেই মদ্যপান নিষিদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে নিষেধাজ্ঞা ক'জন শুনতো বলা কঠিন।

প্রাচীন বাঙালীর খাদ্যতালিকায় কোথাও ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর কারণ বাংলাদেশে ডাল উৎপন্ন হত না। আর তাছাড়া সুলভ মৎস্যভোজীর পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল কম। বস্তুতঃ ডালের চাষ ও ডালখাওয়ার রীতিটা বোধহয় আর্য ভারতের দান এবং তা' মধ্যযুগে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই মৎস্যভোজী বাঙালীর আহার্য অবাঙালীদের রুচি ও রসনায় খুব শ্রদ্ধেয় ও প্রীতিকর ছিল না। আজও নেই।

তা না থাক। একথা বলতেই হয় যে, বাঙালী অতি প্রাচীন কাল থেকেই অতি ভোজনপ্রিয় জাত। নিজে খেয়ে এবং অন্যকে খাইয়েই ছিল তার সুখ। কিন্তু সেদিন গেছে যখন বাঙালীর গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু আর পুকুরভরা মাছ তার সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

আজ ঈশ্বরী পাটনীরা মনের দুঃখই কেবল শোনাবে,—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে", কিন্তু কোন অন্নপূর্ণার হাত সানন্দে তাদের হাতে দুধভাতের বাটি তুলে দিয়ে লক্ষ্যে কী অলক্ষ্যে প্রার্থনা মঞ্জুর করবে কবে?

একবেলা ভাত, একবেলা রুটি এবং পাত থেকে মৎস্যখণ্ড এবং মাংস প্রায় অবলুপ্ত আজ বাঙালীর খাদ্যতালিকাতে। দুধও প্রায় নিশ্চিহ্ন।

এমন খাদ্যাভাব বাঙালীর আর কোনদিন হয়নি।

একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেব

ইংরেজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে, ষোল বৎসর বয়সে, আমি প্রথম 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং শিশু 'উদ্বোধনে'র সাথে পরিচিত হই। আমার বাবা তখন নোয়াখালীতে কাজ করিতেন এবং আমি সেখানকার গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান Class IX) পড়িতাম। সে বছর কুখ্যাত লর্ড কার্জনের বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা দেশটা আলোড়িত তো ছিলই, তা ছাড়া "গোদের উপরে বিষ-ফোড়া"র মতন বাংলার কয়েকটি জেলাতে দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়াছিল; চাউলের দাম মন প্রতি সাত-আট টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নোয়াখালী জেলাও এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জেলাগুলির অন্যতম ছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে বেলুড় মঠ হইতে পূজনীয় আশু মহারাজ (স্বামী সত্যকাম) এবং ব্রহ্মচারী অমূল্যচরণ (পরবর্তী কালে স্বামী শঙ্করানন্দ) নোয়াখালীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তৎকালীন খ্যাতনামা উকীল রাধাকান্ত আইচ মহাশয়ের গৃহে তাঁহাদের থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল রাধাকান্ত বাবুর দ্বিতীয় পুত্র রমেশ ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী, সেই সূত্রে তাঁহার বাড়ীতে আমার প্রায়ই যাতায়াত ছিল; সুতরাং স্বামীজীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া 'উদ্বোধন' ও স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাদি আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করি, যাহার ফলে তখন হইতেই মঠ-মিশনের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯০৭-১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় General Assembly's Institution-এ (বর্তমান Scottish Church College) I.A. পড়িবার সময় একাধিকবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণদর্শন, মঠস্থ মহারাজদিগের,—বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন হইবার, এবং কথামৃত-প্রণেতা 'মাষ্টার মহাশয়ের' পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু নানাকারণে B.A. পড়িবার জন্য আমাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বহরমপুরে যাইতে হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদিগের পবিত্র সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি; ইহাতে চিত্ত যে দারুণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। এই ক্ষোভনিবারণকল্পে সারগাছি অনাথ আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের নিকটে যাতায়াত আরম্ভ করি, এবং ছুটি হইলেই মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ঠাকুর-স্বামীজীর কথা ও হিমালয়-তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী শ্রবণ করা আমার এক প্রকার রুটিনে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটি এই সারগাছিতেই সংঘটিত হইয়াছিল।

সন ১৩১৭ সালের ফাল্গুন মাস (ইং১৯১১খৃঃ); শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজাদি সারগাছি আশ্রমে যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী রবিবারে সাধারণ মহোৎসব। ইহার

দুই দিন পূর্বে শুক্রবারে স্বামী অখণ্ডানন্দ বহরমপুরে গিয়া নিমন্ত্রণপত্রাদি বিলির বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, এবং মহোৎসবের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সারগাছি রওনা করিয়া দিবার পরে, বৈকালে আমাদের মেন হোষ্টেলে (Main Hostel) আসিয়া আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, আমরা ছয় সাত জন কর্মী যেন শনিবারে বিকালে, এবং আরও পনেরো-ষোল জন কর্মী পরদিন প্রাতে সারগাছিতে চলিয়া যাই। তদনুযায়ী শনিবারে বিকালের ট্রেনে আমরা সাতজন সারগাছি গেলাম। অনাথআশ্রমে স্থানাভাববশতঃ আশ্রম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে প্রান্তরমধ্যে তখনকার দিনে উক্ত বার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। এই স্থানে খুব উঁচু পাড় দিয়া ঘেরা একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল; ঐ পাড়ের উপরে এক পার্শ্বে একটি শাখা-প্রশাখা-বিস্তীর্ণ পুরাতন বটবৃক্ষ ছিল। এই বট-বৃক্ষের নীচে শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদী এবং রন্ধনাদির আয়োজন করা হইত, আর পাড়ের নীচে, এক পার্শ্বে, উন্মুক্ত প্রান্তরে দরিদ্রনারায়ণসেবা ও সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রসাদবিতরণ করা হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে সুদূরবিস্তৃত নানাজাতীয় বৃক্ষের জঙ্গল, সম্মুখে পুষ্করিণী, এবং পুষ্করিণীর পাড়ের নীচে অন্য তিনদিকে সুদূরপ্রসারী শস্যক্ষেত্র ছিল।

আমরা সেখানে পৌঁছিলে পর স্বামীজী আমাদিগকে চা দিলেন; চা-পানের পর তরকারি কুটিতে লাগাইয়া দিলেন। তিন চারি জন পাচক নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা রান্নার কাজ করিতেছিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাজ করিতে হইবে বলিয়া আমরা বিশেষ কিছু খাইলাম না, সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম, এবং স্বামীজী আমাদের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাদিগকে চা তৈরী করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন ও নানা প্রসঙ্গের আলাপ-অলোচনায় আমাদের শ্রম লাঘব করিতে লাগিলেন। এইভাবে রজনী আতিবাহিত হইল।

পরদিন যথাবিধি মহোৎসব পালিত হইল এবং সূর্যাস্তের অল্প পূর্বেই খাওয়াদাওয়ার কাজ মিটিয়া গেল। তখন বহিরাগত কর্মীদিগের মধ্যে আমাদের সঙ্গের পাঁচজন এবং সেইদিন প্রাতে আগত ষোলজন সুযোগ বুঝিয়া বহরম-পুরের একটি দলের সাথে মিশিয়া কর্মব্যস্ত স্বামীজীর নিকট হইতে এক ফাঁকে বিদায় গ্রহণ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে, আমি এবং হীরালালদাদা (হীরালাল চক্রবর্তী) যখন স্বামীজীর চরণে প্রণামান্তে বিদায় প্রার্থনা করিতে গেলাম, তখন তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা সকলেই চলে গিয়ে কি আমাকে ঠাকুরের কাছে অপরাধী করে রাখবার সঙ্কল্প করেছ? কাল থেকে সারা-দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ঠাকুরের কাজ করলে, কি খেলে না খেলে দেখতে পেলাম না; আজ এখুনি তোমরা চলে গেলে আমি মনে যে কতখানি কষ্ট পাব, তা কি বুঝতে পার না? আজ তোমাদের যাওয়া হ'তে পারে না; কাল আমি নিজহাতে রেঁধে তোমাদের খাওয়াব। কাল বিকালে তোমরা যেও।" এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রতি বছর উৎসবের পরদিন নিজহাতে রাঁধিয়া কর্মী-দিগকে না খাওয়াইতে পারিলে স্বামীজী শান্তি পাইতেন না। সুতরাং সেরাত্রে আমা-দের দুইজনের আর যাওয়া হইল না।

সন্ধ্যার পরেই স্বামীজী 'ঘেঁটু যাত্রা'র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একজন বাদক, একজন বংশীবাদক এবং একটি ১২।১৩ বৎসর

বয়স্ক বালক এই তিনজনকে লইয়া সেই গ্রাম্য যাত্রাপার্টি গঠিত। বালকটি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া বৃন্দাবনলীলা গাহিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনাইল, আর শুনিলাম আমরা এবং সারগাছিনিবাসী কতিপয় শ্রোতৃবৃন্দ। রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ যাত্রা শেষ হইয়া গেল, এবং গ্রামবাসী শ্রোতারা যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলেন। সেই মাঠের মধ্যে রহিলাম আমরা চারিটি প্রাণী,—স্বামীজী, স্থানীয় মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়, আমি ও হীরালাল দাদা। অমরা দুইজন একবস্ত্রে গিয়াছিলাম বলা চলে, সঙ্গে বিছানাদি কিছুই ছিল না; সুতরাং বিছানা ছিল মাত্র দুইটি, একটি স্বামীজীর, এবং অপরটি হেডমাষ্টার মহাশয়ের। স্বামীজীর বিছানা ঠাকুরের বেদীর সামনে, বেদী থেকে ৮।১০ হাত দূরে এবং অপরটি স্বামীজীর বিছানার ৮।১০ হাত বামে পাতা হইল। বেদীর দুই পাশে দুইটি টিনের কারবাইড ল্যাম্প সারারাত্রির মতো জ্বালিয়া রাখা হইল, বাকী হ্যাজাক আলো কয়টি নিভাইয়া দেওয়া হইল। স্বামীজীর শয্যাটিতে তিনি একা শুইলেন; অপরটিতে আমরা তিনজন একত্র একই লেপের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া শুইলাম, স্থূলকায় তথা স্ফীতোদর হেডমাষ্টার মহাশয় এবং হীরালালদাদা যথাক্রমে আমার ডাইনে ও বামে এবং ছিপছিপে পাতলা দেহ লইয়া আমি তাঁহাদের মাঝখানে লুক্কায়িতপ্রায় অবস্থায় শুধু মুখটি বাহিরে রাখিয়া। শয়নানন্তর একথা-সেকথার মধ্যে হীরালালদা বলিলেন, "আচ্ছা, জীবন! রাত্রে আমরা ঘুমুলে যদি একটা বাঘ এসে আমাদের কারুকে তুলে নিয়ে যায়"—তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে না দিয়াই স্বামীজী ভৎ'সনার সুরে বলিয়া উঠিলেন, "ও কি কথা তোমাদের! তোমরা ঠাকুরের কাজে এসে সারাক্ষণ তাঁর কাজ ক'রে এখন বিশ্রাম করছ, আর তাঁরই সামনে থেকে তোমাদের বাঘে নিয়ে যাবে! ঠাকুরের উপরে এতটুকু বিশ্বাস তোমাদের নেই কি?" স্বামীজীর কথা শেষ না হইতেই হেডমাষ্টার মহাশয়ের শঙ্কাপূর্ণ সতর্কবাণী শোনা গেল, "ওই, বলতে না বলতে এসে গেছে!" আমরা জঙ্গলের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম যে, সেদিক হইতে রাজকীয় চালে দুলিতে দুলিতে একটি পূর্ণকায় চিতাবাঘ আমাদের দিকে আসিতেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদিগকে আতঙ্কবিহ্বল হইতে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, "কোন ভয় নাই; একদম চুপ ক'রে থাকো; নোড়ো না, কোন শব্দ কোরো না।" তাঁহার কথামত আমরা নীরবে বাঘটির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

বাঘটি ধীরেধীরে ঠাকুরের বেদী ও স্বামীজীর বিছানার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বেশ খানিটা সময় আমাদের তিনজনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, পরে মাথা উঁচু করিয়া ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনবার হুঙ্কার দিয়া যে-পথে আসিয়াছিল ঠিক সেই পথে ফিরিয়া গিয়া জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "দেখলে? তোমাদের কারুকে কি খেয়ে গেল? আজ সারাদিন মানুষের ভিড়ের মধ্যে ও ঠাকুরকে দর্শন-প্রণাম করতে আসতে পারেনি, এখন তাই নিরিবিলিতে এসে দর্শন-প্রণাম ক'রে গেল, আর তিনটি জোকার (জয়ধ্বনি) দিয়ে গেল। ও তোমাদের খেতেও আসেনি বা নিয়ে যেতেও আসেনি।"

ইহার পরে নিরাপদে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন স্বামীজী ঐ পুকুরপাড়ের বটতলাতেই

স্বহস্তে খিচুড়ি ও মাংস রাঁধিয়া আমাদিগকে এবং স্থানীয় কয়েকজন কর্মীকে খাওয়াইলেন, তৎপর বিকালে আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

উক্ত ঘটনার পরে সুদীর্ঘ ৫৯ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, তথাপি উহার স্মৃতি আজও আমার মনে একইভাবে অম্লান রহিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি আমি একথার কোন সুনিশ্চিত মীমাংসা করিতে সমর্থ হই নাই যে, ব্যাঘ্রটির আগমনের কারণ সম্বন্ধে মহারাজ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা তখন তাঁহার যাহা মনে হইয়াছিল তাহাই বলিয়াছিলেন, না ও কথাগুলি তিনি অক্ষরে অক্ষরে সত্য জানিয়া বলিয়াছিলেন? আবার সময় সময় একথাও ভাবি যে, আমাদের অবিশ্বাসী মনের পর্দায় গভীরভাবে বিশ্বাসের ছাপ আঁকিয়া দিবার জন্যই উক্ত ঘটনাটি ঘটে নাই তো!

আনন্দময়ী

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আকাশের বুকে মেঘ যেন কাশ—মরালপাখার মতো,
বিস্তৃত ক্ষেতে তোলা আউশের সুগন্ধি মর্মর!
শান্তিবটের ছায়ায় শালিক ছাতারে দোয়েল কতো,
দূরান্ত থেকে আশ্রয় চায় শামকুট যাযাবর।

বিকেলের হাওয়া বনমরমের কী জানায় পরিচিতি,
নলখাগড়া ও উলুখড় ঝোপে গলছে রোদের সোনা,
ধুঁধুল ফুলের আলোয় চকিত অপরাজিতার স্মৃতি,
বাবলার বনে কত বসন্ত-বৌলির আনাগোনা!

নদীর ওপারে বেতবন জুড়ে ছায়া-আলোকের খেলা,
দুলছে এপারে চাঁদাঘাস—তার বেগুনী ফুলের সাজ,
সন্ধ্যামালতী বক আর ঘেঁটু বন্যেবুড়োর মেলা,
বৈঁচিবনের আড়ালে ফুল্ল কাকজঙ্ঘাও আজ!

শরতের বুকে পরমাপ্রকৃতি—এ কার পদাশ্রয়ী?
শুনেছে কী তান—আগমনী গান আনে আনন্দময়ী?

'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে'

শিবদাস

'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে সেথা দৃশ্য জগন্নাথ।'

—কবি একথা বলিয়াছেন পুরীধামের জগন্নাথদেব সম্বন্ধে। কন্যাকুমারীতেও এই আকাশ-সিন্ধু-ধরণীর হাতধরাধরির অপূর্ব দৃশ্য। এখানে একটি নয়, দুটি সাগর ও একটি মহাসাগর পরস্পর-মিলিত। এখানে দাঁড়াইয়া সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুই-ই দেখা যায়। তিন দিকে শুধু জল। কিন্তু বিশাল সমুদ্রবক্ষের কতটুকুই বা একসঙ্গে চোখে পড়ে? পৃথিবীর বর্তুলাকার পৃষ্ঠ দৃষ্টিকে তো সীমিত করিয়া দেয়। এখান হইতে সোজা দক্ষিণে ভারত-মহাসাগরের বুকে যদি ভাসিয়া যাওয়া যায় মাঝপথে কোন স্থলভাগ পথরোধ করিবেনা, সোজা ৫,০০০ মাইল জলরাশির বিস্তৃতির পর পাওয়া যাইবে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের তটভূমি। এই সুবিশাল জলরাশির সম্মুখে, এখানেও, দেবী কন্যাকুমারীর মন্দিরে সমগ্র ভারতের লোক মিলিত হইয়া আসিতেছে যুগযুগান্ত ধরিয়া। সম্প্রতি এখানে আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বজনকে মিলাইবার জন্য, একার্য সাধনার্থে যে ভাবধারার নবযুগে উন্মেষ তাহারই ধারক ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করা হইল ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে সাগরমধ্যস্থ 'ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের' উপর নবনির্মিত স্মৃতিমন্দির বিবেকানন্দ-মণ্ডপে। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির সঙ্গে এই 'বিবেকানন্দ-শিলা' ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। আবার, প্রাচীন উপাখ্যান অনুযায়ী দেবী কন্যাকুমারীর সঙ্গেও। দেবী কুমারীরূপে এই শিলাখণ্ডের উপর সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য। দেবীর সেই তপস্যারত মূর্তিই স্থাপিত কন্যাকুমারী-মন্দিরে। সেখানে মায়ের হস্তধৃত জপমালা দেখিয়া মনে হয় মা যেন এখনো তপস্যা করিতেছেন—ভারতের প্রাণ-শক্তি যেন চিরতপস্যারত, পরমসত্তার সঙ্গে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে।

২

বিবেকানন্দ-শিলার সহিত শুধু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়, ভারতের নবজাগরণও, সমগ্র মানবজাতির নবযুগের উদ্বোধনও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব লীলাসংবরণ করেন। তাহার পূর্বেই যে-কার্যের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ধর্মস্থাপনের মাধ্যমে জগৎকল্যাণসাধনের গুরু-ভার দিয়া যান তাঁহার প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের উপর। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান ও শিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে ব্যাপক যোগাযোগের মাধ্যমে গোটা পৃথিবী তখনই কতকগুলি জাগতিক বিষয়ের দিক দিয়া এক হইতে শুরু করিয়াছে। কাজেই এবারের ধর্মস্থাপনের কাজ শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্যই। কিন্তু ইহার জন্য সর্বাগ্রে 'সর্বধর্মের জননী' ভারতের সনাতন ধর্মকে ভারতবাসীর জীবনে মূর্ত করিয়া তোলা প্রয়োজন; কারণ ভারতই ভবিষ্যতে শুধু বাহিরের দিক দিয়া নয়, হৃদয়ের দিক দিয়াও

এক হওয়ার আদর্শ সমগ্র জগৎকে দেখাইবে। কিন্তু ভারতের অবস্থা তখন কি? —পরাধীন, শিক্ষাহীন, অন্নহীন, আত্মগৌরববিস্মৃত, পরানুকরণে এমনকি পরধর্মগ্রহণেও সমুৎসুক একটি জাতি। এই অবস্থায় ভারতে ধর্মের নবজাগরণের জন্য সর্বাগ্রে চাই জাগতিক উন্নতি, কিন্তু উহা করিতে যাইয়া ভারত আবার ধর্মকে না ভুলিয়া যায়, ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই উহা করিতে পারে, সেদিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে ভবিষ্যতে জগৎকে কোন্ আদর্শ সে দেখাইবে? জগতের অপরাপর উন্নত জাতিগুলির সহিত তাহার পার্থক্য থাকিবে কী? তাছাড়া ভারতবাসীর জীবনে যথার্থ ধর্মের বিকাশের মাধ্যমেই তাহার সর্ববিধ উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে; ভারতের বর্তমান অবনতির কারণ ধর্ম নয়, যথার্থ ধর্মজীবনের অভাব। এই মহাকার্যের গুরুভারই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিভাবে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার বিস্তারিত সব কিছু বলেন নাই, বলিয়াছিলেন যে যথাকালে মা সব জানাইয়া দিবেন।

কিভাবে একার্য সমাধা করা যায় তাহার চিন্তায় তিনি বহু বিনিদ্র রজনী কাটাইয়াছেন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমগ্র ভারত পরিব্রাজকরূপে ঘুরিয়া ভারতের জনগণের তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ অবস্থার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া সর্ববিষয়েই জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশায় চোখের জলে ভাসিয়াছেন এবং ইহার প্রতিকারকল্পে কোন্ পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই।

অবশেষে সমবেদনাদীর্ণ ও চিন্তাকুল হৃদয় লইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি কন্যাকুমারীর মন্দিরে উপনীত হন। মাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার পর তটভূমি হইতে প্রায় দুই ফার্লং দূরে সমুদ্র-বক্ষে অবস্থিত দেবী কন্যাকুমারীর পদরেণুপূত শিলা বলিয়া আখ্যাত, অধুনা 'বিবেকানন্দ-শিলা' নামে পরিচিত, চতুর্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত এই শিলাখণ্ডে তিনি সাঁতরাইয়া উপস্থিত হন। সমুদ্রে সাঁতার দিয়াই যাইতে হইয়াছিল, কারণ নৌকাভাড়া করিয়া যাইবার পয়সা সঙ্গে ছিল না। সেখানে পৌঁছিয়া, ভারতের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ভারতের বর্তমান অবনত অবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে এবং অঝোরে সমবেদনার অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তিনি গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যান। আর তখনই ভারতের অতীত গৌরবের, তাহার বর্তমান দুরবস্থার এবং তাহার ভবিষ্যৎ মহিমারও উজ্জ্বল চিত্র তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে। আর সেই সঙ্গে পান ভারতের ও জগতের কল্যাণ সাধন করিবার জন্য কোন্ পথে প্রথম পদক্ষেপ করিবেন তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এখানেই, ধ্যানাসনে বসিয়াই তিনি স্থির করিয়া ফেলেন যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগো শহরে যে ধর্মমহাসভা বসিবে তাহাতে তিনি যোগদান করিবেন। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত মনীষিমণ্ডলীর কাছে ভারতের যুগযুগান্তের প্রাণবাণী, মানবজাতির সর্বোচ্চ চিন্তা, বেদান্তের সর্বজনীন প্রাণপ্রদ উদার অভয় ভাবরাশি প্রচার করিবেন। ইহাতে দুই কাজ একসঙ্গে হইবে—রাজসিকতায় চঞ্চল পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করাও হইবে, এবং ভারতবাসীকে জাগাইবার জন্য সর্বপ্রথম যাহা প্রয়োজন সেই আত্মবিশ্বাসের,

নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের উদ্বোধনও করা হইবে পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির জয়গান ধ্বনিত করিয়া। বস্তুতঃ হইয়াছিলও তাহাই। তাছাড়া ভারতের নিপীড়িত জনগণের উন্নয়নের জন্য কার্য আরম্ভ করিবার মতো কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিবার ইচ্ছাও তাঁহার মনে ছিল।

নবযুগে সমগ্র মানবজাতির পরম কল্যাণ সাধনের জন্য যে রামকৃষ্ণভাবসলিল উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই ভাবগঙ্গাকে তাঁহার নিজের ও শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যালব্ধ বিপুল শক্তিতে মণ্ডিত করিয়া মহাদেবের মতো শিবাবতার বিবেকানন্দ এতদিন শিরে ধারণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। এই বিবেকানন্দ-শিলারূপ গোমুখীতীর্থে সে ভাবসুরধুনী যেন প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিবার জন্য বিপুল আবেগে উন্মুখ হইয়া উঠিল, যেন বলিয়া উঠিল, 'আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া চলিব ছুটিয়া আকুল পাগল পারা'।

কাজেই ভারতের নবজাগরণের এবং সমগ্র জগতে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের সঙ্গে এই বিবেকানন্দ-শিলার স্মৃতিও চির-বিজড়িত।

এই বিবেকানন্দ-শিলাটি ভারতের সর্বদক্ষিণ তটভূমি হইতে প্রায় ১,৫০০ ফুট দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে শিলাটির সর্বোচ্চ সীমার উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট। এই শিলাটির পাশেই আর একটি ছোট শিলাও রহিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষপূর্তি-উৎসব পালনের এবং তাহার অঙ্গরূপে এই শিলার সহিত বিজড়িত তাঁহার স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ দিবার সদিচ্ছায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজে 'স্বামী বিবেকানন্দ সেণ্টিনারী সেলিব্রেশন এ্যাণ্ড বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি' গড়িয়া উঠে। পুস্তক-পত্রিকাদি প্রকাশের মাধ্যমে স্বামীজীর ভাবধারাপ্রচার এবং ভারতের 'অশিক্ষিত, দরিদ্র, নিষ্পেষিত' জনগণের সেবার মাধ্যমে উহার বাস্তব রূপায়ণ, স্বামীজীর ইচ্ছানুগ পথে জাতিগঠন ও মানুষ তৈয়ারীর কাজে ব্রতী হওয়া প্রভৃতির সহিত এই কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিবেকানন্দ-শিলার উপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া সেখানে বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা।

এই স্মৃতিমন্দির-নির্মাণের অনুমোদনের জন্য কমিটি ১৯৬২ খৃস্টাব্দের শেষভাগে মাদ্রাজ সরকারের (বর্তমান তামিলনাড়ু) নিকট আবেদন জানান। দুই বৎসর কথাবার্তার পর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে বাঞ্ছিত অনু-মোদন পাওয়া যায় এবং মাদ্রাজ সরকারের সহিত আলোচনা করিয়াই মন্দিরের নক্সাটি তৈয়ারী করা হয়।

সমগ্র পরিকল্পনাটির মোটামুটি তিনটি অংশ ছিল—'বিবেকানন্দ-মণ্ডপম্' ও 'শ্রীপাদমণ্ডপম্' নির্মাণ, এবং তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে গমনা-গমনের জন্য পারাপারের ব্যবস্থা করা। 'শ্রীপাদমণ্ডপম্' নির্মাণের অনুমোদন অবশ্য পাওয়া যায় পরে, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর। যেখানে দেবী কন্যাকুমারী তপস্যা করিতেন, সেখানে শিলাখণ্ডের উপর একটি চিহ্ন তাঁহারই শ্রীপদের চিহ্ন বলিয়া আখ্যাত; তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই বিবেকানন্দ মণ্ডপের সম্মুখে এই মণ্ডপটির পরিকল্পনা।

সমগ্র পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য এক কোটিরও অধিক টাকার প্রয়োজন ছিল; অবশ্য ইহার মধ্যে স্মৃতি-মন্দিরের সংরক্ষণ এবং পারাপার-ব্যবস্থাটিকে স্থায়িভাবে চালু রাখা প্রভৃতি আরো কয়েকটি কাজ অন্তর্ভুক্ত।

রাজ্যসরকারের অনুমোদনলাভের পরই কমিটি অর্থসংগ্রহের জন্য সমগ্র ভারতের জনগণের নিকট আবেদন জানান এবং রাজ্যসরকারগুলির প্রত্যেককে কমপক্ষে একলক্ষ করিয়া টাকা দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই সাড়া পাওয়া যায়, চারিদিক হইতে টাকা আসিতে থাকে, এবং ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দেই পাথর কাটিয়া সাইজ করা, উহাতে নকসা তোলা প্রভৃতি প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়া যায় (মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈয়ারী)। সমুদ্রতটে একটি সুবিধামতো স্থানে পরিচালনা-ব্যবস্থার এবং কর্মের ও কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহাদির ব্যবস্থা করিয়া এই কাজ আরম্ভ করা হয়।

ইহার পর হাত দেওয়া হয় মন্দির গাঁথার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায়। পাথরগুলি গাঁথনির জন্য প্রস্তুত হইলে সেগুলিকে তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে লইয়া যাইতে এবং সেখানে পৌঁছিলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫ ফুট উপরে তুলিতে হইবে। নির্মাণকার্যের জন্য ও কর্মীদের পানের জন্য শিলাখণ্ডে স্বাদুজল-সরবরাহের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আরও খুঁটিনাটি অনেক কিছু করিবার ছিল।

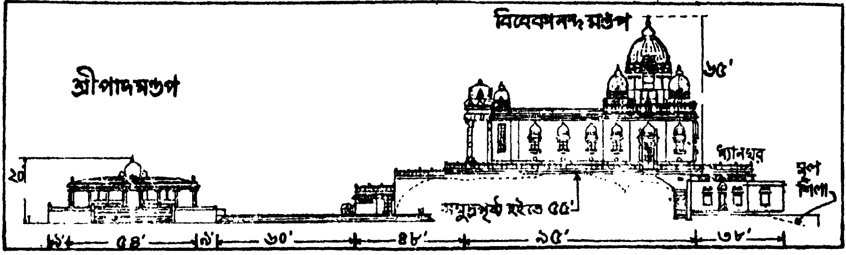
তটভূমিতে ও শিলাখণ্ডে দুটি জেটি নির্মাণ করিয়া মোটরবোটে টানা ছোট ছোট গাধা-বোট জাতীয় নৌকা করিয়া পাথরগুলিকে শিলামূলে লইয়া যাওয়া হইত। সেখান হইতে উপরে তোলা হইত ঢালু পথে টানিয়া। মন্দিরের নির্মাণকার্যে প্রয়োজনীয় জলের জন্য শিলার দুইপার্শ্বে নীচে বাঁধ দিয়া দুইটি বৃহৎ জলাধার তৈয়ারী করা হইয়াছিল—শিলাখণ্ডের উপর সারা বছর ধরিয়া বর্ষিত বৃষ্টির জল উহাতে জমিত। কর্মীদের পানীয় জল অবশ্য লইয়া যাইতে হইত তটভূমি হইতেই, নৌকা করিয়া। সমুদ্রের জলের নীচ দিয়া এপার হইতে লইয়া যাওয়া হইল প্রায় ১,৬০০ ফুট লম্বা কেব্‌ল, নির্মাণকার্যে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-সরবরাহের জন্য। টেলিফোনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইয়া উভয় তীরে বেতারযন্ত্র স্থাপন করিয়া যোগাযোগরক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। এই সব আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর শুভ বিজয়াদশমী তিথিতে শিলাখণ্ডে প্রস্তর লইয়া যাওয়া ও মন্দির গাঁথার কাজ আরম্ভ হয়।

উদ্যোক্তাদের দীর্ঘ আট বৎসরের তপস্যা, শত শত কর্মীর দীর্ঘ ছয় বৎসরের অনলস শ্রম আজ সফল হইয়াছে। বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মণ্ডপ এবং শ্রীপাদমণ্ডপ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। গত ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে মন্দিরে।

স্থায়ী জেটী নির্মাণের ভার তালিমনাড়ু সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাও সমাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের নীচ দিয়া পাইপ-লাইন বসাইয়া শিলাখণ্ডে স্থায়িভাবে স্বাদু জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, সে বিষয়েও চিন্তা করা হইতেছে।

৪

শিলাখণ্ডের সর্বোচ্চ দেশে বিবেকানন্দ-স্মৃতি মন্দির (বিবেকানন্দ-মণ্ডপম্) স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মন্দিরের তলদেশের উচ্চতা ৫৫ ফুট। বিবেকানন্দ-মণ্ডপ লম্বায় ১৩০ ফুট, চওড়ায় ৪০ ফুট। ইহার দুটি অংশ—গর্ভমন্দির (সভামণ্ডপম্) এবং নাটমন্দির (ধ্যানমণ্ডপম্)। গর্ভমন্দিরের চূড়াটি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরের চূড়ার অনুরূপ; ইহার শীর্ষদেশের উচ্চতা মন্দিরের



বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দির

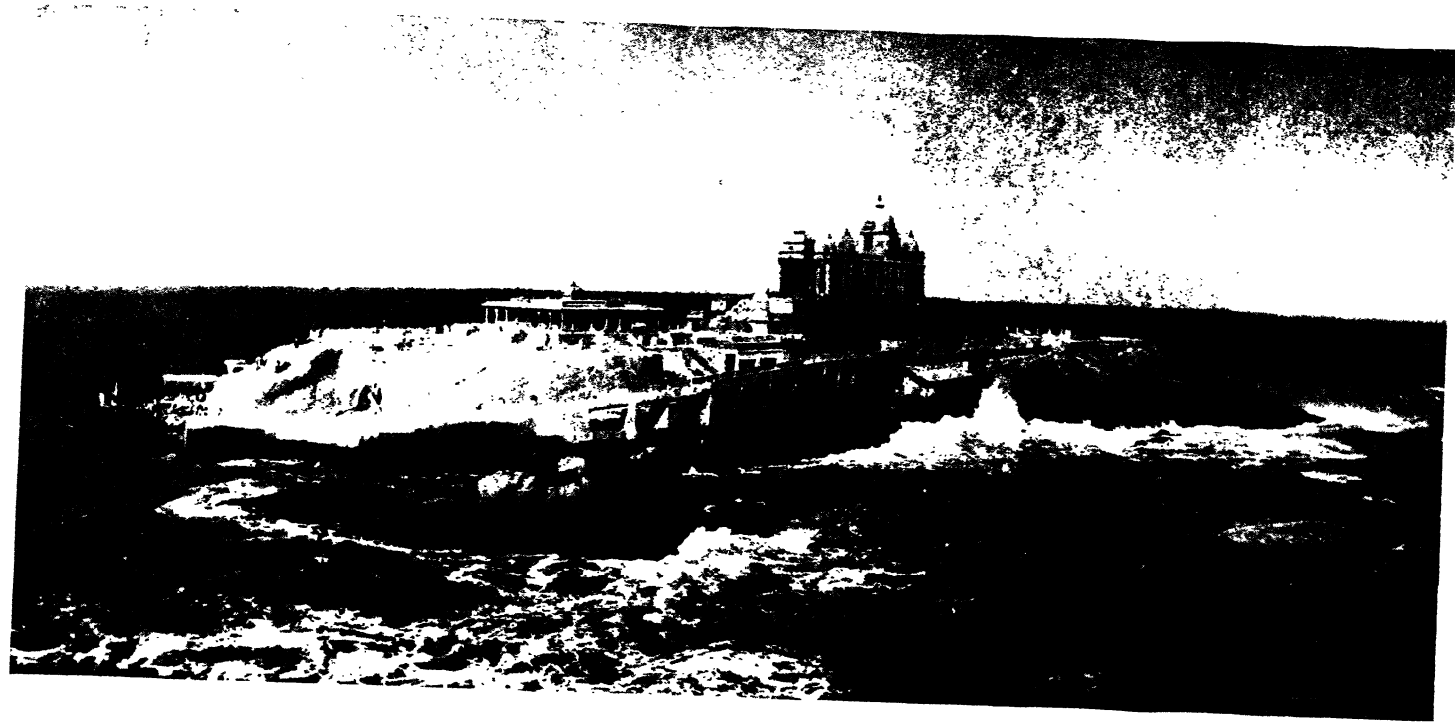
তলদেশ হইতে ৬৫ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০ ফুট। গর্ভমন্দিরে ৪ ফুট উচ্চ বেদীতে স্বামী বিবেকানন্দের ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ ব্রোঞ্জ-নির্মিত পরিব্রাজক মূর্তি স্থাপিত। মূর্তিটি পশ্চিম-উত্তর দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান। নাটমন্দিরটির ভিতরের দেওয়ালে স্বামীজীর জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র রিলিফ করা। মন্দিরটির চারিদিকেই রোয়াক। গর্ভমন্দিরের পিছনে, মন্দিরতলের নীচের লেভেলে কয়েকটি কক্ষ সংলগ্ন। তাহারও পিছনে গৃহতলসংলগ্ন একটি চত্বর। এই চত্বরেরও নীচে মন্দির ও শ্রীপাদমণ্ডপ বেড়িয়া একটি সমতল রাস্তা। শিলাতল হইতে গড়ানে রাস্তা আসিয়া মিশিয়াছে এই সমতল রাস্তাটিতে। এখান হইতে অনেকগুলি ধাপ ভাঙিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়।

'শ্রীপাদমণ্ডপম্' বিবেকানন্দমণ্ডপের ঠিক সম্মুখে নির্মিত। মন্দিরস্থ বিবেকানন্দের মূর্তি হইতে শ্রীপাদমণ্ডপের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত শ্রীপাদচিহ্নের দূরত্ব ২১৯ ফুট।

মন্দির হইতে নাটমন্দিরের সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, ২৫-২৬টি ধাপ ভাঙিয়া নীচে নামিয়া আসিলে একটি চত্বর; নাট-মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে ইহার সরলরৈখিক দূরত্ব ৪৮ ফুট। চত্বরে নামিয়া উহার উপর দিয়া ৬০ ফুট আগাইয়া গেলে শ্রীপাদমণ্ডপে উঠিবার ধাপ। শ্রীপাদমণ্ডপটি চতুষ্কোণ, ৫৪ ফুট লম্বা, ৫৪ ফুট চওড়া।

৫

এই বিবেকানন্দমন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইলে দেখা যায় সিন্ধু একহাতে ধরিয়াছে সন্নিকটস্থ পুণ্যভূমি ভারতের মূল ভূভাগকে, অপর হস্তে সুদূর দিকচক্রবালে অনন্ত আকাশকে—'আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত।' এই মিলনতীর্থে মন্দিরাভ্যন্তরে সমুন্নত শিরে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ। মনে হয়, ধরা যেন আমাদের জাগতিক জীবনের প্রতীক; আকাশ আমাদের স্বরূপের, অসীম পরমসত্তার প্রতীক; আর সেতুটির সংযোগ-সেতুরূপে প্রচণ্ড নিষ্কামকর্মের প্রতীক উত্তালতরঙ্গময় সিন্ধু, যাহার মাঝখানে স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দ—প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার মধ্যে চিরপ্রশান্ত মূর্তিতে। সমগ্র দৃশ্যটি যেন বিবেকানন্দের নবযুগের জাগরণ-মন্ত্রের প্রতীক—শিবজ্ঞানে জীবসেবা-রূপ কার্যের মাধ্যমে নিজের দেবস্বরূপতার উপলব্ধিলাভ, আত্মজ্ঞানলাভ। এখানে দাঁড়াইয়া তিনি যেন ব্যাকুলভাবে বিশ্বজনকে আহ্বান জানাইতেছেন এই ভারতবর্ষে মিলিত হইতে, এখান হইতে সে মন্ত্র শিখিয়া লইতে।



বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দির [বামদিকে শ্রীপাদমণ্ডপ]



বিবেকানন্দ-শিলায় বিবেকানন্দ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি

কারণ, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' আর, তাঁহারা এখানে আসিয়া যেন রিক্তহস্তে ফিরিয়া না যান, তাই সে মন্ত্রকে ভারতবাসীর জীবনে মূর্ত করিবার জন্য জগন্মাতা উমারই অন্য রূপ তপস্যারতা দেবী কন্যাকুমারীর শ্রীপদ-চিহ্নের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া যেন আমাদের সকলের হইয়া তাঁহার চরণে অবিরাম প্রার্থনা জানাইতেছেন: মা, আমাদের কাপুরুষতা, দুর্বলতা দূর কর! মা, আমাদের মানুষ কর!

মন্দির নির্মাণ করিয়া স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে নিঃসন্দেহ; এবং বিবেকানন্দ-শিলায় এই বিবেকানন্দ-মণ্ডপটি যে আমাদের জাতীয় গৌরবের, বিবেকানন্দের প্রতি সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার নিদর্শন, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে আমরা যেন না ভুলি, এ স্মৃতি-মন্দির প্রতীকমাত্র; বিবেকানন্দের আসল স্মৃতিমন্দির গড়িতে হইবে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে। 'বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি' সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করিয়াছেন—বিবেকানন্দের আদর্শে জাতীয় জীবন গঠনই যাহার মূল লক্ষ্য। আজ এই বিবেকানন্দ-মণ্ডপে বিবেকানন্দচরণে প্রণত হইয়া এই প্রার্থনাই জানাই—ভারতের বর্তমান বিভ্রান্তির অমানিশার অবসান ঘটাইয়া সে শুভদিনের উজ্জ্বল প্রভাত অবিলম্বে আসুক, যেদিন, ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, 'জাতীয় মনের হর্ম্যমন্দিরে তাঁর বিশ্বাস রূপ নেবে। সর্ব মত ও জাতির ত্রিশকোটি নরনারীর জীবনের উপরই তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হবে। সেই সঙ্গে হয়তো পৃথিবীর বিশ্বাসের জগতে নতুন যুগের অভ্যুদয়।' আর নিবেদিতার ভাষাতেই প্রাণের আকূতি জানাই, আমি 'সেই মন্দির-নির্মাণে যেন একটি ইটও বহনের যোগ্য হই!'

মায়ের পূজা

সেখ সদর উদ্দীন

মায়ের পূজা করবি যদি এক হয়ে আয় সকল ভাই,
রক্ত নয়, আজকে তাজা হৃদয়খানাই অর্ঘ্য চাই!
ফেলরে ছুঁড়ে হিংসা-দ্বেষ আর মারমুখী ভাব হৃদয়জোড়া,
ফুলের মত চিত্ত নিয়ে আয়রে ভাই, আয়রে তোরা।
অনেক রক্ত ঝরে গেছে, ভিজে গেছে ধূসর মাটি,
চোখের জল ফেলছে দেখ, তোমার আমার সবার 'মা'টি।
ভায়ের বুকে আঘাত হেনে কাঁদাবে আর ক'দিন মাকে?
মায়ের পূজায় ভায়ের সেবায় বিলাও এবার আপনাকে।
রক্তে রাঙা মায়ের চরণ আঁখির নীরে ধুইয়ে দাও
ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে মিলনেরই গানটি গাও।

বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন

গত ২রা সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ-শিলার উপর নবনির্মিত বিবেকানন্দস্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে।

ঐ দিন ভোর ৪টা হইতে মন্দিরে বেদাদিশাস্ত্র পাঠ ও ঘটস্থাপন করিয়া তাহাতে জগন্মাতার পূজা আরম্ভ হয়। পূজান্তে হোম হয়। পাঁচশতাধিক ভক্ত এবং বিশ-বাইশ জন সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ৬টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মন্দিরে উপনীত হন। হোমে পূর্ণাহুতি দিবার পর তিনি পূর্ণকুম্ভের জলে স্বামীজীর মূর্তি অভিসিঞ্চিত করেন এবং স্বামীজীকে মাল্যভূষিত করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ৭টায় শুভকার্য সমাপ্ত হইবার পর সকলে তটভূমিতে ফিরিয়া আসেন।

পরে সকাল ৯টার সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি আসিয়া মন্দিরটির দ্বারোদ্‌ঘাটন ও স্বামী বিবেকানন্দের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মন্দিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সেখান হইতে ৯½ টার সময় তটভূমিতে ফিরিয়া তিনি মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. করুণানিধি। সভার প্রারম্ভে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতির সভাপতি শ্রী ডি. এম. সিংহ সকলকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইবার পর সমিতির কর্মসচিব শ্রীএকনাথ রানাডে বিবৃতি পাঠ করেন। পরে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বচন-ভাষণান্তে শ্রীকরুণানিধির ভাষণের পর শ্রী ভি. ভি, গিরি ভাষণ দেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ভাষণ

এই পবিত্র পরিবেশে, জগন্মাতা কন্যাকুমারীর পাদমূলে তাঁহারই একজন বিশেষ সন্তানকে, যাঁহাকে তিনি কৃপা করিয়া এদেশের ও জগতের কল্যাণের জন্য আমাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার সুযোগ পাওয়া আমি মহা সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি। যাঁহারা এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, দূর ও নিকটে চতুর্দিক হইতে যাঁহারা আমাদের লক্ষ্য করিতেছেন, যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শিরে জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

অদূরের ঐ শিলাখণ্ডে বসিয়া ধ্যানকালে স্বামীজীর মানসপটে যে অমূল্য চিন্তাগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, আমার মনে হয় সেগুলির স্মৃতিচারণই অদ্যকার এই অনুষ্ঠানের উপযোগী হইবে। এখানে, কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া মন্দিরে জগন্মাতাকে পূজা করিবার পর ঐ নির্জন শিলাখণ্ডে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের মনে তীব্র ইচ্ছা জাগে। সমুদ্রে সাঁতার দিয়া তিনি ঐ শিলাখণ্ডে উপনীত হন—যেখানে আজ ভারতমাতার সেই মহান সন্তানের স্মৃতিতে এই বৃহৎ সুরম্য মন্দিরটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। শিলার উপর বসিয়া

তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। এই সময়ে, পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে রাজা মহারাজা হইতে শুরু করিয়া কৃষক পর্যন্ত ভারতের সর্বস্তরের লোকের জীবন ও মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিপুল তথ্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সেগুলি, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ভারতীয় জাতির জীবনধারা, লক্ষ্য ও কৃতিত্ব—সবই তিনি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, ধর্মই হইল ভারতীয় জাতির প্রাণ, তাহার উৎসাহের উৎস ; ভারতের ভবিষ্য সামগ্রিক নবজাগরণও ঘটিবে ধর্মের মাধ্যমে। দেখিলেন, বহুধাবিভক্ত জাতি, ভাষা, আচরণপ্রথা প্রভৃতির ভিতরেও ভারতের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি সুনিশ্চিত একত্ববোধ রহিয়াছে, যাহা সাধারণ সংহতিরূপে জাতিকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

আধ্যাত্মিক আদর্শের গুরুত্ব এবং জাতির উপর তাহার প্রভাব উপলব্ধি করিলেও স্বামীজী জনগণের দুর্গতির কথা, তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। নিজ ধর্মের নামেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণকর্তৃক তাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া নির্যাতিত ও পদদলিত হইয়া আসিতেছে। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজনগণকে ধর্মের সুফললাভে বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে ; যাহার ফল জাতীয় অধঃপতন।

তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতকে যদি আবার উন্নত হইতে হয় তাহা হইলে সর্বসাধারণের জাগতিক উন্নতিবিধান এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হইবে।

ভারতের অন্যতম অবনতির কারণ হইল, সে নিজেকে বাকী জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, অন্য জাতিগুলির সঙ্গে সে মিশিতে চায় নাই, সে নিজে যে প্রাণপদ সত্যগুলির অধিকারী তাহার ভাগ তাহাদের দিতে চায় নাই। প্রাচীন কালে ভারত যখন তাহা করিত, তখন সে উন্নত ছিল। যেদিন হইতে সে দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে শুরু করিয়াছে, সেইদিন হইতেই ভারতের এই অধঃপতনের সূত্রপাত। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বেদান্তের ভাবপ্রচারের ফলে ভারত এবং বহির্জগৎ উভয়ই প্রভূতপরিমাণে লাভবান হইবে। মানসনেত্রে তিনি দেখিয়াছিলেন, ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে ; সমগ্র মানবজাতি সেই সভ্যতারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। এই ভাবানুপ্রাণিত হইয়াই তিনি পাশ্চাত্যে যাইবার কথা চিন্তা করেন।

ইহাই শিলাখণ্ডে সমাসীন স্বামীজীর ধ্যানের বিষয়। ধ্যানভঙ্গের পর তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে তাঁহার জীবনের উদ্দিষ্ট কর্ম—যাহা হইল ভারতে জাতির নব-জাগরণের জন্য এবং পাশ্চাত্যে সমগ্র মানবজাতির পুনর্গঠনের জন্য বাণী প্রচার। আমাদের জাতির কাছে তাই এই শিলাখণ্ডটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে ; আর সেজন্য ইহার উপর এই মহান ভারতসন্তানের স্মৃতিমন্দির থাকা যথোপযুক্ত।

শ্রীএকনাথ রাণাডের প্রতি এবং এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে তাঁহার সহায়ক ও বন্ধুদের প্রতি এজন্য সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ। জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহাদের সকলেরই শিরে তাঁহার আশীর্বাদ যেন বর্ষিত হয়, এবং স্বামী বিবেকানন্দ জগতের কাছে যে বাণী গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, এটি যেন সে বাণী প্রচারের একটি সক্রিয় কেন্দ্র হইয়া হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি. ভি. গিরির ভাষণের সারাংশ

শ্রী ভি. ভি. গিরি তাঁহার ভাষণে বিবেকানন্দের আদর্শে ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনের উপর জোর দিয়া বলেন, ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনই জাতীয় চরিত্রগঠন। তিনি বলেন: কর্ম-ও চিন্তাধারা-পরিচালনায় মৌলিক নীতিগুলিকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণই শোষণ-ও অভাবমুক্ত সমাজ গড়িয়া তুলিবে। একাধারে দার্শনিক, সন্ন্যাসী, স্বদেশপ্রেমিক, নবচিন্তার উদ্ভাবক ও সংস্কারক স্বামীজীর অবদান কেবল আমাদের জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনেই সীমিত নয়, মানুষের দুর্গতি দূর করা ও সাম্যস্থাপনের কাজেও তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন—ভারতের নিপীড়িত ও পদদলিত জনসাধারণের দুর্গতি-মোচনকল্পে ভারতীয় জাতিকে জাগাইয়া তোলার জন্য তাঁহার অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষের বুভুক্ষা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য সর্বাগ্রে দূর করিবার কথা তিনি বারবার আমাদের বলিয়া গিয়াছেন, আর সেই সঙ্গে ধর্মকে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও জীবনে রূপায়িত করাইবার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের সেবার মাধ্যমেই চিত্ত শুদ্ধ হয়, অপরের সহিত একাত্মতা-বোধও আসে। বলিয়াছেন, সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন করা সম্ভব। আজ জাতির ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনে স্বামীজীর শিক্ষা—সত্য, মানবতাবোধ, ধর্মের বিশ্বজনীনতা ও নিস্বার্থসেবাই আমাদের পথের দিশারী। শ্রী গিরি বলেন, সমাজ ও জাতির সেবাপর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ভারত ও বিশ্বের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের একটি মহত্তম দান।

শ্রী এম. করুণানিধির ভাষণের সারাংশ :

শ্রী এম. করুণানিধি সভাপতির ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমগ্র মানব-সমাজের; তাই তাঁহার স্মারক শিলার উপর মন্দিরটি বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এটি আমাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রহরী। তিনি বলেন, স্বামীজীর চিকাগো যাত্রাকালে মহান সেতুপতির নেতৃত্বে তামিল নাড়ু তখন স্বামীজীর বাণীবহনে এগিয়ে এসেছিল; এজন্য তামিল নাড়ু গর্ববোধ করে। তিনি বলেন, স্বামীজী কর্তৃক প্রজ্বালিত অগ্নি এখনো উজ্জ্বল শিখা বিস্তার করিতেছে; তাঁহার শিক্ষা ভারতের বিবেককে জাগ্রত করিয়াছে, ঐক্যের প্রতি তাহার আস্থা বর্ধিত করিয়াছে, মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তিনি বলেন, জনসাধারণের প্রতি স্বামীজীর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। মুক্তি, জনসাধারণের উন্নয়ন ও সাম্যই ছিল তাঁহার বাণীর মর্মার্থ; আমি এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে সানন্দে ঘোষণা করিতেছি, তামিল নাড়ু সরকার বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী—দরিদ্রের হাসিতে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই, দরিদ্রের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

মন্দিরটির পরিকল্পনা- ও নির্মাণ-স্থপতি শ্রী এস. কে. আচারী। জে. জে. স্কুল অব আর্টস-এর ভাস্কর্য-শাখার অধ্যাপক শ্রী এন. এল. সোনাবেকর স্বামীজীর মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি খুবই মর্মস্পর্শী হইয়াছিল।

ভারতে ভাবগত সংহতিসাধনে সংস্কৃত

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

১

জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতে সার্বিক উন্নতির পথে এক জটিল সমস্যা এবং বিরাট বাধা। অনন্ত বৈচিত্র্যের লীলাভূমি এই বিশাল উপমহাদেশ বহু প্রদেশে বিভক্ত এবং জনগণও বহুভাষাভাষী। চিরকাল ধরিয়াই ভৌগোলিক এবং সামাজিক, আহার এবং বেশভূষার বহুবিধ পার্থক্য এই দেশের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রহিয়াছে। তদুপরি বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে বিভিন্ন অংশ এই দেশে শাসিত হইত। ফলে বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে এইখানে ছিল বহুবিধ পার্থক্য। মধ্যে মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, প্রিয়দর্শী অশোক, হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য, মহামতি আকবর প্রভৃতি সম্রাটবৃন্দ বাহুবলের দ্বারা বহুধাবিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে জয় করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংহতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৃটিশ শাসনকালেও রাজনৈতিক দিক হইতে সংহতিসাধনের সেই প্রয়াস কিছুটা সার্থকতালাভ করিয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাই, ভারতে সংহতিস্থাপনের প্রথম প্রবর্তকরূপে বৃটিশকে বন্দনা করিতে অনেক সুশিক্ষিত ভারতীয় বর্তমানে কুণ্ঠিত নহেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক V.A. Smith-এর মতে এক সম্রাট অশোকের শাসনেই ভারতসাম্রাজ্য বৃটিশ ভারত হইতেও বৃহত্তর ছিল—"far more extensive than British India of today, including Burma" (Asoke, P. 81). সমদুঃখভাগিতা এবং সমনির্যাতনভোগের মাধ্যমে বৃটিশ ভারতে যে সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু ছিল কৃত্রিম। তাই, স্বাধীনতালাভের পর সেই কৃত্রিম সংহতিবন্ধন অচিরেই ছিন্ন হইল। চতুর্দিকে প্রধানতঃ ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই রাজ্যপ্রতিষ্ঠার বহ্ন্যুৎসবে ভারতের বাঞ্ছিত সংহতি ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। স্বাধীনভারতের প্রশাসকমণ্ডলী নিত্য নূতন বিধিবিধানের দ্বারা সংহতিপ্রতিষ্ঠার নামে সংহতিসংহারই সম্পাদন করিয়া চলিতেছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ অতীতে বহুধা বিভক্ত থাকিলেও, জনসাধারণের বহিরঙ্গজীবনে বেশভূষা, আহার-বিহার এবং লোকাচার-সদাচারে লক্ষণীয় পার্থক্য থাকিলেও এক মহাভারতীয় চেতনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় সকলের অন্তরলোকে ছিল প্রবাহিত। সেইকালে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধে এই বহুধাবিভক্ত জনগণ সর্বদাই উদ্বুদ্ধ থাকিতেন। এই মৌলিক ঐক্যসাধনা যদিও বিচিত্র লীলায় বিলসিত হইয়াছিল, তবুও মূলতঃ সংস্কৃতভাষাই ছিল এই ঐক্যসাধনার একমাত্র আশ্রয়। ভারতে যদিও পাঁচশতাধিক ভাষা কথ্যরূপে প্রচলিত, তথাপি একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই ছিল সকলের সংযোগসূত্র তথা ঐক্যবিধায়িনী শক্তি। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্ত্য মনীষী Sir Monier Williams এই বিষয়েই সাক্ষ্যদান করিয়া বলিয়াছেন—

"India, though it has, as we have seen, more than 500 spoken dialects,

has only one sacred language and only one sacred literature, accepted and revered by all, however diverse in race, dialects, rank and creed. That language is Sanskrit, and that literature is Sanskrit literature, the only quarry whence the requisite materials may be obtained for improving the vernaculars or for expressing important religious and scientific ideals."

(Hinduism, P. 13)

সংস্কৃতাশ্রিত ভারতীয় সামগ্রিক সংস্কৃতির সহিত পূর্ণ পরিচয়ের অভাবে কেহ কেহ বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির অতি সামান্য অংশ জানিয়া খণ্ডিত জ্ঞানের দ্বারা অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়া অনৈক্যের আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং বৃটিশ শাসনকেই ভারতে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা অনুসন্ধান করিলে অনায়াসেই অনুভব করা যায় যে, বৃটিশ শাসনের বহু পূর্ব হইতেই সমগ্র ভারতের এক গভীর ঐক্যভাবনার ধারা নিয়তই প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল। এই জন্যই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'The Fundamental Unity of India' গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে উল্লেখ করিয়াছেন—

"Superficial observers are therefore liable to be bewildered by this astonishing variety in Indian life and geography. They lack that power of perception which dives beneath appearances and externals and sees into the life of things. They thus fail to discover the One in the many, the Individual in the Aggregate, the Simple in the Composite.···A keen penetrating insight can hardly fail to recognise that beneath all this manifold variety there is a fundamental unity.···As Sir Herbert Risby has truly observed: 'Beneath the manifold diversity of physical and social type, language, custom and religion which strikes the observer in India there can still be discerned as Mr. Yusuf Ali has pointed out, a certain underlying uniformity of life from the Himalayas to Cape Comorin." (P. 29)

ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে যেমন বহু দেবতার অন্তরালে একই পরমদেবতার অস্তিত্ব-স্বীকার—"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"—তেমনি লৌকিক জীবনেরও সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে অনুভূত হয় একই মহতী ঐক্যচেতনা। আর এই ঐক্যচেতনার ধাত্রী হইল প্রাচীনা হইয়াও চিরসঞ্জীবিতা অমৃতময়ী সংস্কৃতভাষা।

ভারতের সকল প্রান্তের নদনদীগুলিকে পুণ্যসলিলারূপে চিহ্নিত করিয়া সকল ভারতীয়ের নিকটই নিখিল ভারতের নদীধারাকে সমবেতভাবেই বন্দনা করিতে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষগণ। ধর্মানুষ্ঠানকালে এই নদীগুলিকে একসঙ্গে আহ্বানের দ্বারা অখণ্ড ভারতের ভাবমূর্তিটি আমাদের চিত্তে অঙ্কিত করা হইয়া থাকে। যেমন বৈদিক সংস্কৃতে শুনি—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং
সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্না মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা

সুষোময়া ॥"

তেমনি পৌরাণিক সংস্কৃতেও শুনি—

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পর্বতসমূহ প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট সমভাবেই পবিত্র। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে তাই দেখি—

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥"

তীর্থযাত্রা আমাদের অবশ্যকরণীয় পুণ্যকর্ম। বহু রাজ্যে বিভক্ত ভারতের অধিবাসীরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তীর্থদর্শনে সর্বদাই ছিলেন উৎসুক। পরিব্রজন পুণ্যকর্ম বলিয়া এইখানে বিবেচিত হয়। এই মোক্ষদায়িকা তীর্থগুলির দ্বারা পবিত্রীকৃত অখণ্ড ভারতভূমি পুণ্যভূমি বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিল।—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ ॥"

তারপর সতীর একান্ন পীঠ তো সারা ভারতের সকল প্রান্তে অবস্থিত। শৈব এবং বৈষ্ণব তীর্থগুলিও এই প্রকারে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিরাজ করিতেছে। সেইজন্য সকল প্রান্তই সকল প্রান্তের ভারতীয়ের নিকটে পবিত্র।

অখণ্ড ভারতেরই প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জনগণের চিত্তে সংস্কৃতভাষা চিরকাল জাগ্রত রাখিয়াছে। তাই মনীষী ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

"This intense passion for fatherland indeed, utters itself throughout Sanskrit literature." (The Fundamental Unity of India)

অথর্ববেদে নানাভাবে মহিমান্বিতা অখণ্ড ভারতের অনবদ্য বন্দনা পাঠককে মুগ্ধ করে। ঋষি বলিতেছেন —

"নানাবীর্যা ওষধীর্যা বিভর্তি…" (অ-বে- ১২-২)

"যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয়ঃ সম্বভূব"—(ঐ ১২-৩)

"যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে যস্যাং দেবা অসুরানভ্যবর্তয়ন্" (ঐ ১২-৫)

"গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তোঽরণ্যং তে পৃথিবিস্যো নমস্ত" (ঐ ১২-১১)

"ভূম্যাং দেবেভ্যো দদতি যজ্ঞং হব্যমরংকৃতম্" (…১২-১-২২)

"যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যাব্যেলবাঃ।
যুদ্ধান্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ ॥"
(১২-১-৪১)

"বিষ্ণুপুরাণে" ভারতভূমিকে দেবতাদেরও বাঞ্ছিত ভূমি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্ত তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥"
(২-৩-২৪)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীহরির জন্মপূত এই ভারতভূমির কতই প্রশংসা পাঠককে ভারত-প্রেমে উৎসাহিত করে।—

"অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনম্
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবোপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥"
(৫-১৯-২০)

"যদ্যত্র নঃ স্বর্গসুখাবশেষিতং
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য কৃতস্য শোভনম্।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্ম নঃ স্যাদ্-
বর্ষে হরির্যদ্ ভজতাং শং তনোতি ॥"
(৫-১৯-২৮)

মহাভারতের বনপর্বে, তন্ত্রচূড়ামণিতে, দেবীভাগবতে এবং আরো বহু গ্রন্থে এই সমগ্র দেশকে চিন্ময়ী মাতৃরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই তো সংস্কৃতেই শুনি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" সংস্কৃত তন্ত্রশাস্ত্র তাই বলেছেন যে, জন্মভূমি, গর্ভধারিণী জননী এবং পয়স্বিনী গোমাতা মহাশক্তিস্বরূপিণী মহামাতারই প্রতিরূপ—

"সর্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গৌ পয়স্বিনী
মহামাতুঃ স্বরূপেণ প্রতিরূপা সুশোভনা।"

ইহারই পরিণতিতে বর্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করেন বাংলার সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "বন্দেমাতরম্"।

সমগ্রারূপিণী দেশমাতৃকার প্রতি এই ভক্তিই ভারতে জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করিয়াছিল। সকল রাজ্যের অধিবাসীই নিজেদের প্রথমে ভারতীয় বলিয়াই চিন্তা করিতেন এবং একই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া নিজেদের গৌরবিত বোধ করিতেন। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বদা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া বহুধাবিভক্ত জনগণকে ঐক্যের স্বর্ণসূত্রে বাঁধিয়া রাখিত। কেরলের কানাড়ীভাষী মনীষী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতে ধর্মাভিযানে বহির্গত হইয়া হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা যখন ভারতের চারিটি প্রান্তে উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবলম্বন ছিল শুধুমাত্র সংস্কৃতভাষা। গৌড়বঙ্গের প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাপথে সংস্কৃতেই করিয়াছিলেন তাঁহার প্রেমধর্মপ্রচার। সংস্কৃতভাষাতেই রহিয়াছে সর্বভারতীয়, সর্বকালিক, সর্বজনীন আবেদন। আন্তঃরাজ্য সংযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সংস্কৃতেই সেইদিন নিষ্পন্ন হইয়া জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করিত। তখন অধিকাংশ রাজ্যেরই, এমন কি পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বলি, জাভা, বোর্নিয়ো, সুমাত্রা, শ্যাম, কাম্বোজাদি রাজ্যের পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। অধিকাংশ শিলালিপি তাই সংস্কৃতেই লিখিত হইয়াছিল। এই বাংলাদেশেও পাঠানশাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল অবধি রাজকার্য সংস্কৃতেই সম্পাদিত হইত। বাংলাভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের' টীকা সংস্কৃতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্বভারতীয় ভাষা বলিয়াই এই সকল টীকাকার সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বর্তমানে উত্তর ভারতের সকল প্রচলিত ভাষাই সংস্কৃত হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন। সংস্কৃতজ্ঞান বিনা সেই সকল ভাষায় পরিণত জ্ঞান অসম্ভব। আর, দক্ষিণভারতীয় ভাষাসমূহও সংস্কৃতের দ্বারাই সমধিক সম্পুষ্ট। দক্ষিণের প্রবীণ নেতা ডঃ পট্টাভি সীতারামাইয়া সেইজন্য বলিয়াছিলেন—

"Sanskrit can no longer be regarded as a dead language. It is up to us to make it a living language. Sanskrit remains dead today because it is neglected. To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can understand Sanskrit better than Hindi and other derivatives of Sanskrit. In Telegu there is 60 p. c. Sanskrit admixture and in the Malayalam whole Samasas of Sanskrit are incorporated."

আজিও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের মন্দিরে মন্দিরে বহুভাষাভাষী জনগণ সংস্কৃতমন্ত্রই পাঠ করিয়া থাকেন। জাতকর্ম হইতে মৃত্যুর পরে ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম পর্যন্ত সকল ভারতীয়ই এক

সংস্কৃতমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন। সংস্কৃতে রচিত বেদ, উপনিষদ্‌, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ-স্মৃতি, কালিদাস-ভবভূতির কাব্য সকল ভারতীয়েরই গৌরবময় উত্তরাধিকার। তাই উজ্জয়িনীর কালিদাস বাঙ্গালীরও আত্মজন। বাংলার জয়দেব বৃন্দাবনের প্রাণধন। ইংরেজী শিক্ষিত জনগণের কেহ কেহ মনে করেন ইংরেজীও সকলের বোধগম্য সর্বভারতীয় ভাষা। সমগ্র ভারতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির হার যথেষ্ট কম। আর ইংরেজীতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আনুমানিক শতকরা পাঁচজন। সুতরাং, ইংরেজীকে সর্বজনবোধগম্য সর্বজনীন ভাষারূপে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। তদুপরি, ইহা বিজাতীয় ভাষা, স্বদেশীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং মাতৃভূমির প্রতি মমতা এই ভাষার দ্বারা সম্ভব নহে। Cultural Slavery তথা সাংস্কৃতিক দাসমনোভাব এই বিজাতীয় ভাষার ফলশ্রুতি, যাহার ফলে কবিগুরুর ভাষায় আমরা "দেশদেখা চোখ" হারাইয়া ফেলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব; তাকে অন্তরে গ্রহণ করব। সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে। সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে। তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।"

বহুভাষাভাষী এই দেশের একমাত্র স্বদেশীয় সংহতিসূত্র এই সংস্কৃতভাষা। এখনো কাশ্মীর হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতের সকল প্রান্তে জনগণের কাছে সংস্কৃতভাষায় ভাষণদান করিয়া দেখিয়াছি সংস্কৃত বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হয় না। প্রত্যেকটি ভারতীয়ের মাতৃভাষায় এই সংস্কৃত শব্দরাজিরই প্রাচুর্য থাকায় সকলেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত বুঝিতে পারেন। অনভ্যাসবশতঃ বলিতে পারেন না মাত্র। অর্থোপলব্ধিতে কাহারো তেমন অসুবিধা হয় না। কিন্তু, নিতান্ত বিজাতীয় ইংরেজী ভাষা ইংরেজীতে অজ্ঞ অধিকাংশ ভারতীয় মোটেই বুঝিতে পারেন না। এই কারণে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"I believe in the great power which Vivekananda used to ascribe to Sanskrit. We are unnecessarily frightened by the difficulty of learning Sanskrit. And that it must not be forgotten that such a knowledge of Sanskrit gives one a master-key to the knowledge of the majority of Indian languages not exceeding the Southern group···I quite agree that the study of Sanskrit is sadly negleted. I belong to a generation which believed in the study of the ancient languages. I do not believe that such a study is a waste of time and effort. I believe it is an aid to the study of modern languages. This is more true of Sanskrit···and every nationalist should study Sanskrit." (Harijan, 23rd March, 1940)

সংস্কৃতকে ত্যাগ করিয়া হিন্দী কিংবা ইংরেজীর দ্বারা ভারতে কখনো জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইবে না স্বাধীন ভারতের

নাগরিকদের চিত্তে একান্ত প্রয়োজনীয় এই ঐক্যবোধের বীজ একমাত্র সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই উপ্ত হইতে পারে। আত্মকলহে নিমগ্ন, প্রাদেশিকতার বিষে বিষণ্ণ, ভ্রাতৃবিদ্বেষে বিক্ষুব্ধ স্বাধীনোত্তর ভারতের গণজীবনে ভাবগত সংহতিসাধনের জন্য সংস্কৃতের অপরিহার্যতা অনস্বীকরণীয়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ্, দক্ষিণ ভারতের সুপুত্র ডঃ সর্দার কে. এম্. পাণিক্করের বাণীগুলি স্মরণ করি—

"When we talk of our national genius being unity in diversity, the fundamental oneness of the Indian mind, what we are really meaning is the dominance of Sanskrit which over-rides the regional differences and linguistic peculiarities and achieves a true national character in our thought and emotion and even gives form and shape to the languages.

"The study of Sanskrit is not a luxury, it is a necessity. Sanskrit being our greatest single national inheritance, the roots of our national behaviour, pattern of our thought and the source of all our ideas being embedded in Sanskrit a familiarity with it is necessary for any one who claims to be a true Indian.'

"Sanskrit alone has the pre-eminence which Hindi could never claim over the great regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India, the supreme claim of Indian Unity." (Indian Inheritance, —P.1)

তাই ক্রান্তদর্শী মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করিয়া বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন ভারতে পুনরায় ভাবগত সংহতি প্রমূর্ত হইয়া উঠুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। তাই কামনা জানাই এবং বন্দনা করি বর্তমান ভারতের বরেণ্য সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কণ্ঠে—

"কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনতু নিতরাং ভারতে দেবভাষা
রাষ্ট্রে চাস্মিন্ বিলসতু হি সা রাজরাজেশ্বরীব।
যজ্ঞে পুণ্যে স্বজন-মিলনে রাষ্ট্রকার্যে বিষাদে
দীব্যাদ্ রম্যা মহিমবিভবৈঃ সা হি সৌখ্য-
প্রদাত্রী॥

বন্দে ত্বাং সুরভারতীং সুরপতেঃ
পুণ্য-প্রভাস্পর্ধিনীং
সাক্ষাৎ শ্রীকমলালয়াং চ পরমাং
স্বাহাস্বধোদীরিতাম্।
মূর্তাং ভারতসংহতিং চ সুখদাং
প্রাণৈকগ্রন্থিং পরাং
ধর্মপ্রেমসুখাত্মমেলনকরীং বিশ্বেশ্বরীমাশ্রয়ে॥"

সমালোচনা

তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (প্রথম খণ্ড): মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি. লিট, পদ্মবিভূষণ। প্রকাশক—কর্মসচিব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা—৩২৫+৮। মূল্য - দশ টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন সাধক ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধ লইয়া প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সাধারণের নিকট তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক রহস্যময় বিষয়কে সহজবোধ্য করিয়াছে। গ্রন্থকার বিভিন্ন বিষয়গুলি আলোচনা করিবার সময় সর্বদা মূল তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, উপনিষদ্, গীতা, সাংখ্যদর্শন, এমনকি কোথাও বা সুফী শাস্ত্রের ঐ বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলিও দেখাইয়াছেন।

তান্ত্রিক সাধনা বলিতে গ্রন্থকার "শাক্ত সাধনা ও আনুষঙ্গিকরূপে শৈবসাধনা" লক্ষ্য করিয়াছেন, যদিও তাঁহার মতে "বৈষ্ণব ও সৌরাদি সাধনপ্রণালীও বস্তুত: তান্ত্রিক পরম্পরার প্রকারভেদ মাত্র।" যেমন, চরমসত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঐ সত্যে মন স্থির করিয়া মনবুদ্ধিরও উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। উচ্চ অধিকারীরা প্রথম হইতেই ধ্যানাদি সহায়ে উহাতে ব্রতী হইতে পারেন, কিন্তু সকলে নয়। সাধারণের জন্য তন্ত্রমতে অন্যতম প্রশস্ত সাধনা জপ; গ্রন্থকারের মতে বৈষ্ণব সাধনার নামসংকীর্তন উহারই রূপান্তর মাত্র।

গ্রন্থটিতে 'তন্ত্রের স্বরূপ, আবির্ভাব ও ভেদ', 'তান্ত্রিক সংস্কৃতি', 'গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য', 'দীক্ষারহস্য', 'কুণ্ডলিনীতত্ত্ব' প্রভৃতি দ্বাদশটি বিষয় পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত।

প্রথম দুটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে "বৈদিক সাধনারই মুখ্য স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই", কিন্তু অন্যান্য বহু সাধনার ধারাও তাহাতে মিশিয়াছে এবং "এই সব ধারার মধ্যে তন্ত্রের ধারাই প্রধান।" শুধু তাহাই নহে, "বৈদিক ধারার উপাসনাক্রম অনেকাংশে তত্ত্বতঃ তান্ত্রিক ধারার সহিত একসূত্রে গ্রথিত," "বেদ ও তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই," "বেদ ও তন্ত্রের নিগূঢ় রূপ একই প্রকার।"

বেদ বা তন্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, তাহা জ্ঞানের 'বৈখরী' অবস্থা মাত্র, অর্থাৎ বাক্-এর মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ। ইহার সূক্ষ্মতর রূপ 'মধ্যমা' অবস্থা, যখন জ্ঞান চিন্তাকার ধারণ করিতে উন্মুখ। সূক্ষ্মতম অবস্থাই হইল আসল জ্ঞান—যাহার প্রকাশক স্বয়ং 'পরমেশ্বর' বা 'পরমশিব'। যাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন তাঁহারাই ঋষি; তাঁহারাই গুরু। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াই বেদকে অপৌরুষেয়, এবং তন্ত্রকে শিব- বা শক্তিকথিত বলা হয়।

গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রায় সব অধ্যায়েই তন্ত্রশাস্ত্রের মূল তত্ত্বটির আংশিক বা পূর্ণ উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে পুনরুক্তি হইলেও বিষয়বস্তু সহজবোধ্য হইয়াছে। তথাপি, গ্রন্থে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলির অর্থ একটি পৃথক পৃষ্ঠায় একত্র দিলে বোধ হয় আরো ভাল হইত।

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ ও তন্ত্র একই কথা বলেন, ভিন্ন ভাষায়। (অদ্বৈত তন্ত্র ও অদ্বৈত বেদান্তই গ্রন্থকারের লক্ষ্য। বিভিন্ন তন্ত্রে দ্বৈত, ভেদাভেদ, অদ্বৈত সব ভাবই আছে। শাক্ত তন্ত্র প্রধানতঃ

অদ্বৈত। চরম তত্ত্ব কোথাও শিব, কোথাও শক্তি।) পার্থক্য যা আছে, সামান্য। যেমন, তন্ত্রমতে অদ্বয় অবস্থাতেও শক্তি থাকেন, সচ্চিদানন্দের সহিত মিশিয়া এক হইয়া। শাঙ্কর বেদান্তমতে ব্রহ্মে মায়াশক্তির কোন স্থান নাই। বেদের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের পরমশিবে পার্থক্য শুধু এইটুকু। আবার তন্ত্রমতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-বিধায়িনী শক্তি বিকশিতশক্তিযুক্ত পরমশিবই—সদাশিব-নিবাসিনী মহামায়া। সর্বভাবের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সহজ সরল ভাষায় তন্ত্রের এই তত্ত্বটি আমাদের নিকট আরো স্পষ্ট : সাপ যেন স্থির ছিল, চলিতে শুরু করিয়াছে ; একই সাপ, দুটি পৃথক সাপ নহে ; একথাও বলা যায় না যে, যখন স্থির ছিল তখন সাপের মধ্যে চলার শক্তি ছিল না। অথবা : যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি ; যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করিতেছেন বলিয়া ভাবি, তখন তাঁহাকেই কালী বলি। তত্ত্ববিষয়ে তন্ত্রের সহিত বেদের আর একটি পার্থক্য গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন —তন্ত্রমতে সচ্চিদানন্দই চরম কথা নয়, চরম সত্য উহারও পারে, তাহা কেবল 'সৎ'-রূপ।

গ্রন্থটিতে সৃষ্টির তন্ত্রোক্ত একটি ক্রম বর্ণনায় দেখানো হইয়াছে, এই সৎ হইতে চিদ্‌ ও আনন্দ বিকশিত হয়। পরে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সহিত একীভূতা যে শক্তি, তাহার প্রথম বিকাশ ঘটে ইচ্ছারূপে ; ইহা শক্তির সৃষ্টি-উন্মুখ অবস্থা—'কলা'। ইহার পরবর্তী বিকাশ সদাশিবের সহিত সদাসমন্বিতা মহামায়া ; ইনিই আমাদের 'ঈশ্বর', 'জগন্মাতা', 'সগুণব্রহ্ম' ইত্যাদি। ইনি সৃষ্টির জন্য সক্রিয় হইলেই 'নাদ' ও 'জ্যোতিঃ' বা জ্যোতির্ময় নাদ প্রকাশিত হয় ; "শক্তির ক্রিয়াবস্থাই নাদ এবং নিষ্ক্রিয়াবস্থা কলা।" নাদকে চিন্তা ও বাক্যের সূক্ষ্ম অবস্থা, বীজাবস্থা বলা যাইতে পারে। "নাদ স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'বিন্দু'র আকার ধারণ করে।" বিন্দু বিভক্ত হইয়া বিন্দু ও 'বীজ' (সৃষ্ট পদার্থের কারণ) রূপ ধারণ করে। এই বিন্দু, বীজ ও নাদ যেন একটি ত্রিকোণের বাহুগুলির সংযোগবিন্দু, যে ত্রিকোণের মধ্য-বিন্দুতে, 'মহাবিন্দু'রূপে শিব ও শক্তি অভিন্ন হইয়া অবস্থিত। এই ত্রিকোণ হইতেই বিশ্বের সব কিছুর উদ্ভব, উহাই আমাদের 'কারণ দেহ', উহাই কুণ্ডলিনী শক্তি।

দীক্ষা, গুরু ও সাধনা বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে বলা হইয়াছে, তন্ত্রের প্রথম কথা হইল, 'জাগো', সর্বদা সজাগ থাক—"প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ।" আমরা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, যাহা শিব অথবা শক্তিরও স্বরূপ। 'মল' (নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং দেহাদি অনাত্মাতে অহংবোধ), 'কর্ম' ও 'মায়া'—এই তিনটি পাশে আমরা নিজেদের দেহমনসীমিত বদ্ধজীব বা 'পশু' বলিয়া মনে করিতেছি। ইহাই 'পাশবদ্ধ', নিদ্রিত অবস্থা। আমাদের জাগ্রত হইয়া, 'পাশমুক্ত' হইয়া নিজ শিবস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহার প্রচেষ্টাই সাধনা। নিজ শিবস্বরূপতা উপলব্ধির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তো অনন্ত শক্তি 'কুণ্ডলিনী'রূপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাগাইবার প্রচেষ্টাই, শক্তির উদ্বোধনই সাধকের প্রথম লক্ষ্য। অধিকারি-ভেদে সাধনাও ভিন্ন। সাধনার জন্য তন্ত্রমতে গুরুকরণ চাই-ই ; কারণ পরমেশ্বরই গুরুর মাধ্যমে 'শক্তিপাত' অর্থাৎ কৃপা করেন ; ভগবৎকৃপা ছাড়া পাশমুক্ত, বিশেষ করিয়া 'মল' বা আণব-পাশ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

বসিরহাট ও হাসনাবাদে পূর্বপাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সেবায় ১৪. ৬. ৭০ হইতে ১০. ৭. ৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক দৈনিক গড়ে ৩,১৪২ কুইণ্ট্যাল চাল, ৩৪৩ কুইণ্ট্যাল ডাল, ১১৯ কুইণ্ট্যাল পেঁয়াজ, ২০৩ বস্তা লবণ, ১৩২ পাউণ্ড বার্লি এবং ২০ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরণ করা হইয়াছে; উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৩৯,৭২০ জন করিয়া।

১১. ৭. ৭০ হইতে ১০. ৮. ৭০ পর্যন্ত দৈনিক ৩,৬৩১ কু: চাল, ৩৪৬ কু: ডাল, ২৬৭ বস্তা পেঁয়াজ, ২৫০ বস্তা লবণ, ৭৮ পাউণ্ড বার্লি এবং ৪৫ কেজি গুঁড়া দুধ বিতরিত হইয়াছে। কেন্দ্রদুটিতে বিপন্ন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০। গত ছয় মাস ধরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবায় রত।

গত ২২শে অগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী হাসনাবাদ, সৈনিকবাগান এবং বসিরহাটের সেবাকেন্দ্র (relief camp) পরিদর্শন করিয়াছেন। হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ সৈনিক-বাগানের সেবাকেন্দ্রটি নূতন খোলা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণসেবা

গত ২রা হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চারদিন অবিশ্রাম বারিবর্ষণের ফলে পশ্চিম-বঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সেবায় রত হইয়াছেন।

হুগলী জেলার আরামবাগ, গোঘাট ও খানাকুল থানা অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ) সেবাকেন্দ্র খুলিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

টাকী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানীয় বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলি হইতে বহু বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও আশ্রয়দান করিয়াছেন এবং সেবাকার্য চালাইয়া যাইতেছেন।

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বহু অঞ্চলও এই বারিবর্ষণের ফলে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে বিপন্ন প্রায় ৩১,২০০ ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণ মিশন নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে আশ্রয়, আহার শিশুখাদ্য, ঔষধ দান করিয়া সেবা করিতেছেন :

কেন্দ্র	সেবিত অঞ্চল	লোকসংখ্যা
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ)	লিলুয়া, ঘুষুড়ী, ডোমজুড়	৩,১০০
রহড়া	স্থানীয় অঞ্চল, বন্দীপুর, কল্যাণনগর	২,৮০০
বেলঘরিয়া	যতীনদাস নগর ও নন্দননগর কলোনী	১,৭০০
বরাহনগর	ন-পাড়া, মাল্লাপাড়া	১,৭০০
নরেন্দ্রপুর	গোপাল ঘাট, চৌহাটী, আরাপাচ, জগন্নাথপুর ইত্যাদি (১৭ টি গ্রাম)	১৭,০০০
কলিকাতা :		
সেবাপ্রতিষ্ঠান	গোবরা	২,০০০
অদ্বৈত আশ্রম	ট্যাংরা, তিলজলা, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, হাজরা	২,৫০০
উদ্বোধন আফিস	বাগুইআটী অঞ্চল	৪০০

পুরুলিয়ায় খরাত্রাণকার্যে 'গভর্ণমেণ্ট টেস্ট রিলিফ স্কীম'-এ ৩০. ৫. ৭০ হইতে ৪. ৭. ৭০ পর্যন্ত ১৭,০৪১ ব্যক্তিকে ১৩ ৫০৫'১৫ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে এবং ১৩,৫০৫'১৫ কেজি গম ডোল হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৫টি গ্রামের ২,৭৪৭ ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক হিসাবে ও অন্যান্য খরচ বাবদ ৫,০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

গুজরাটে দুঃস্থসেবায় প্রতিদিন ১,২০০ ব্যক্তিকে পূর্ববৎ খাওয়ানো হইতেছে। ৭৫টি পরিবারকে কৃষিকার্যের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং সূচীশিল্পের জন্য বস্ত্র ও সূচসুতা দেওয়া হইয়াছে। বন্যাত্রাণসেবাও আরম্ভ হইয়াছে।

ছাত্রের কৃতিত্ব

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক বিদ্যার্থী ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের জনৈক ছাত্র এই বৎসর অখিল ভারত জাতীয় মেধাবৃত্তি (All India National Talent Search Scholarship) লাভ করিয়াছে।

মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে বট্যানি ব্লক

গত ২৬শে অগস্ট, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের বট্যানি ব্লকের উদ্বোধন করিয়াছেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক দিব্যায়ন পরিদর্শন

গত ১৮ই জুন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাঁচীর রামকৃষ্ণ মিশন দিব্যায়ন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। সেখানকার ছাত্র ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, বর্তমানে দেশে দিব্যায়নের মতো প্রতিষ্ঠানের খুব প্রয়োজন। বহুদূরের গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে আগত আদিবাসী ছাত্রদের নিকট তিনি আশা করেন যে, তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া এখানকার শিক্ষার সদ্ব্যবহার করিবে এবং এ ভাবে গ্রামগুলির উন্নতিসাধন করিবে।

ইহার পূর্বদিন, ১৭ই জুন স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র কর্তৃক রাঁচী জেলার বরাঘাগরা নামক গ্রামে নবনির্মিত আদিবাসী দেবীস্থান মন্দিরটির উদ্বোধন করেন দেবীস্থানে অঞ্জলি প্রদান করিয়া। ১৮ই জুন সন্ধ্যায় এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক বিশাল আদিবাসী জনসমাবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেবাকেন্দ্রের পক্ষ হইতে একটি অর্পণনামায় সই করিয়া মন্দিরটি বরাঘাগরা গ্রামের প্রধান পাহামকে (পুরোহিত) গ্রামবাসীদের জন্য অর্পণ করেন।

স্বামী সদাত্মানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৯শে জুলাই, ১৯৭০ সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে স্বামী সদাত্মানন্দ (মণীন্দ্র মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ নানাবিধ রোগে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

মণীন্দ্র মহারাজ ছিলেন একজন মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট। কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠে ও কনখল সেবাশ্রমে আর্তনারায়ণের সেবাকার্যে নিরত থাকেন, তারপর বাকী জীবন বারাণসী সেবাশ্রমে অতিবাহিত করেন।

স্বামী সদাত্মানন্দ ছিলেন কঠোরী ও ধ্যান-পরায়ণ সন্ন্যাসী। তাঁহার আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

আবেদন

সাম্প্রতিক বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় অবর্ণনীয় ক্ষতির কথা সর্ববিদিত। রামকৃষ্ণ মিশন বহুস্থানে বন্যার্তসেবায় ব্রতী হইয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সেবাকার্য বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আরামবাগ, খানাকুল, গোঘাট, ডোমজুড় প্রভৃতি অঞ্চলে এবং নরেন্দ্রপুরের পার্শ্ববর্তী প্রায় ২০টি গ্রামে এই সেবাকার্য বেশ কিছুদিন চালাইতে হইবে। এই কার্যে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ সর্বসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। যে-কোন প্রকার দান নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে :

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
পো: —বেলুড় মঠ ; জেলা—হাওড়া

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদ

জাতীয় নেতা ও মনীষীদের মূর্তি ও প্রতিকৃতির প্রতি অবমাননা এবং তাঁহাদের সাহিত্য ধ্বংস করা প্রভৃতির প্রতিবাদে 'পূর্ব কলিকাতা গান্ধী শতবার্ষিকী কমিটি'র আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রিদ্বয় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, কয়েকটি সংস্থার সদস্য ও তরুণ ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সর্বমোট প্রায় তিনশত জন গত ৮ই অগস্ট সকাল ৭টা হইতে পরদিন সকাল ৭টা পর্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতার গোল পার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির পাদদেশে অনশনব্রত পালন করেন।

স্বামীজীর পুষ্পমাল্যভূষিত মূর্তিটির নিম্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্যর আশুতোষ, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজীর মাল্যশোভিত প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। স্বামীজীর এই মর্মর-মূর্তিটিকেও গত মাসে দুষ্কৃতকারীরা কালিমালিপ্ত করিয়াছিল; পরে সন্নিকটস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটুট অব কালচার হইতে লোক পাঠাইয়া উহা মুছিয়া দেওয়া হয়।

অনশনের প্রারম্ভে ও শেষে অনশনরত নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে জাতীয় নেতা ও মনীষিবৃন্দের সাম্প্রতিক এই-জাতীয় অবমাননা-প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, এভাবে তাঁহাদের পূণ্যস্মৃতিকে ম্লান করা যায় না, ইহাতে শুধু নিজেদেরই মুখ কলঙ্কিত করা হয়; ইহা জাতির ধ্বংসেরই পথ। নেতারা বলেন, যাঁহাদের অবদানে আমাদের জাতীয় সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি চিরসম্মান দেখাইবার বিবেককে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

একই উদ্দেশ্যে গত ১২ই অগস্ট এখানেই, স্বামী বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তির পাদদেশে 'মনীষী স্মৃতিপূজা কমিটি' কর্তৃক একটি সভা আহূত হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও নাগরিকগণ এই সভায় যোগদান করেন; সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সভাপতির এবং বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীসত্যেন্দ্র

নাথ বসু বলেন যে, বর্তমানে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা রহিয়াছি। দেশের পূর্বগ মনীষীদের প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধাপ্রদর্শনের কথা চিন্তাই করা যায় না। তিনি বলেন, এসবের জন্য কেবল ছাত্রদের দায়ী করা চলে না, দায়ী রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষকগণও ; তাঁহারা অবক্ষয়ের কবল হইতে ছাত্রদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহাদের ছাত্র ও যুবসমাজকে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়া সেদিকে চালিত করিতে হইবে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য চাই সকলের বিপুল পরিশ্রম ; স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবর্ষণ দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায় না। যাঁহারা ভাবেন আগে ভাঙিয়া পরে গড়িব, তাঁহাদের ভাঙাই সার হইবে, গড়া আর হইবে না।

'মনীষী স্মৃতিপূজা কমিটি' কর্তৃক এই উপলক্ষ্যে গত ১৪ই অগস্ট আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তির পাদদেশে। সভাপতির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন, স্বামীজী, নেতাজী, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আদর্শ ও বাণী মুছিয়া ফেলার অপপ্রচেষ্টা কখনই দেশের প্রগতির পথ প্রশস্ত করিবার উপায় হইতে পারে না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ প্রতুল গুপ্ত বলেন, যাঁহারা বাংলা ও সমগ্র ভারতের গৌরব, তাঁহাদের প্রতি অবমাননা-প্রদর্শনের দ্বারা দেশের সংস্কৃতিকে মুছিয়া ফেলা সম্ভব নয়। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় বলেন, যাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ফলে আজ আমরা প্রগতিপরায়ণ হইতে শিখিয়াছি, তাঁহাদের আদর্শকে, ভারতের মহান ঐতিহ্যকেই আজ যুবসমাজের কাছে তুলিয়া ধরিতে হইবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী বলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়া জাতি কখনো বড় হইতে পারে না, স্বামীজী প্রভৃতি মনীষী-প্রদর্শিত পথেই আমাদের দেশগঠনের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীদের অবমাননার প্রচেষ্টা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, এতে জাতির মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হইবে, জাতির পুনর্গঠন হইবে না।

উৎসব-সংবাদ

শান্তিপুর সাহাপাড়া স্ট্রীটে গত ১৯শে জুন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী সাধন কুঞ্জ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সারাদিনব্যাপী উৎসবান্তে বিকালে সভায় ব্রহ্মচারী ভক্তিচৈতন্য কথামৃত পাঠ করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন শান্তিপুর পুরাণ পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক প্রেরিত লিখিত-ভাষণও সভায় পঠিত হয়। সভান্তে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের সৌজন্যে 'শ্রীশ্রীমা' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

নিউ আলিপুর শ্রীসারদা মহিলা সমিতির উদ্যোগে গত ৩রা মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চত্রিংশদাধিক শততম জন্মতিথি পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার জীবনী আলোচনা করিয়া এ যুগে মাতৃজাতির আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবোধনে তাঁহাদের অমূল্য অবদানের কথা বিবৃত করেন।



দিব্য বাণী

আদ্যা শ্রীনির্গুণা কালী বাচ্যাতীতা পরাৎপরা।

—শক্তিসঙ্গম তন্ত্র

অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী॥

—মহাভাগবত

শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।
স্ত্রীপুংনপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ॥

—গন্ধর্বতন্ত্র

পুংরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং স্ত্রীরূপাং বা বিচিন্তয়েৎ।
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥

—কুলার্ণব তন্ত্র

কালিকা নির্গুণা নিত্যা, পরাৎপরা আদিভূতা, বাক্যের অতীতা।
অরূপা সে মহেশ্বরী লীলা তরে দেহ ধরি (হন শিব, হন বিশ্বমাতা॥)

শক্তি শিব ব্রহ্ম এই পরমেশ-নামত্রয় সবই সমার্থক
স্ত্রী-পুরুষ-আদি যেই ভেদ, তাহা শব্দেতেই
শিব শক্তি ব্রহ্ম সবই চরম পরম একই অবিনাশী সত্তার বাচক॥

পুরুষ বা নারী রূপে, সচ্চিদ্‌-আনন্দ রূপে—পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে,
যেভাবেতে প্রাণ চায় সেভাবে ভাবিয়া তাঁয়
ধ্যানে তাঁর অবগাহি (হের চিদানন্দময়ী জননীরে আপন স্বরূপে॥)

কথাপ্রসঙ্গে

'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ী সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীকালিকা

মা কালী সগুণা নির্গুণা দুই-ই

কত খণ্ডতা, কত নানাত্ব, কত বৈচিত্র্য এই জগতে আমরা দেখি, সে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। বৈচিত্র্যের মধ্যেও আবার বৈচিত্র্য। দুটি মানুষ ঠিক এক রকম হয় না—দেহেও না, মনেও না। বৈশেষিক মতে দুটি পরমাণুও ঠিক একরকম নয়। অথচ এক মহান সামঞ্জস্যে সব বিধৃত।

এই বৈচিত্র্য কমিয়া আসে, যত আমরা বিশ্বের মূলের দিকে অগ্রসর হই। মূলে বৈচিত্র্য নাই, খণ্ডত্ব নাই; উহা অখণ্ড, পূর্ণ, অদ্বয়, নির্গুণ, নিরাকার সত্তা। সে সত্তা অবিনাশী, সে সত্তা চৈতন্যস্বরূপ, সে সত্তা আনন্দস্বরূপ।

এই পর্যন্ত, আমাদের শাস্ত্রের দুটি প্রধান বিভাগ বেদ ও তন্ত্র একমত। বেদ সে মূল সত্তাকে বলিতেছেন ব্রহ্ম; তন্ত্র তাহাকেই বলিতেছেন আদ্যাশক্তি—মায়াতীতা মহামায়া—তুরীয়া নির্গুণা মা। শুধু তফাত, তন্ত্র বলিতেছেন এই নির্গুণা মা-ই সগুণা হন, অখণ্ড সত্তাই জগজ্জননীর, জীবের, জগতের রূপ ধারণ করেন; তিনি সগুণা নির্গুণা, সাকারা নিরাকারা দুই-ই—(কালী) 'নির্গুণা সগুণাপি চ' (নিরুক্ত তন্ত্র), 'সাকারাপি নিরাকারা।' (মহানির্বাণ তন্ত্র)।

আমাদের স্বরূপও তাই। মা-ই আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার হইয়াছেন; বিশ্বের সব কিছুই হইয়াছেন। কিন্তু এ স্বরূপবোধ, এ অখণ্ড দৃষ্টি তো আমাদের নাই। আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। বিস্মৃত হইয়া অখণ্ডকেই খণ্ড খণ্ড রূপে দেখিতেছি; নিজেকে দেখিতেছি দেহমনবুদ্ধির সীমায় খণ্ডিত রূপে, জগতের বস্তুচয়কে দেখিতেছি পরস্পর হইতে, আমা হইতে মা হইতে পৃথক রূপে।

কিন্তু কেন এমন হয়? মা কালীই মায়ার রূপ ধরিয়া ইহা ঘটাইতেছেন। সত্য সম্বন্ধে, নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আমাদের যেন ঘুম পাড়াইয়াছেন। তবে একেবারে অচেতন, সুষুপ্ত করিয়া রাখেন নাই, ঘুম পাড়াইয়া ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখাইতেছেন—নিজেকেই পৃথক পৃথক জীব ও জগৎ রূপে দেখাইতেছেন। যেন 'পাশ' দিয়া, বন্ধনরজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন আমাদের জ্ঞানকে। তন্ত্রে এ পাশের নাম 'আণব পাশ'—বেদান্তদর্শনে যাহার নাম মায়ার 'আবরণ'- ও 'বিক্ষেপ'-শক্তি।

এ ঘুম হইতে আমাদের জাগিতে হইবে। উপায় কি? উপায় তো জগতের সর্ব ধর্মমতে, সর্বশাস্ত্রসম্মতিক্রমে একটিই—তাঁহাতে মন একাগ্র করা। কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, করা তো ততটা, ততটা কেন মোটেই সহজ নয়! দুইচারিজনের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা কয়জন একটানা কতক্ষণই বা আর মার চিন্তা করিতে পারি? কিন্তু ঘুম তো সকলেরই ভাঙানো চাই। তন্ত্রে তাই ক্রিয়ার বাহুল্য। তন্ত্র বলিতেছেন, মাকে কেন্দ্র করিয়া পূজা প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকো—যাহা তোমরা সকলেই পারিবে। আবার, নিম্ন অধিকারীদের জন্য আমাদের প্রিয় বিষয়ের

পরিবেশেই ক্রিয়ার ব্যবস্থা—যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, সেখানে থাকিয়াই মাকে ডাকার ব্যবস্থা। উহাতেই কাজ হইবে, মার চিন্তাই—যেভাবেই হউক—আমাদের ঘুম ভাঙাইবে।

কিন্তু নির্গুণা মাকে আরাধনা তো দূরের কথা চিন্তাই যে করা যায় না! নিশ্চয়ই যায় না। তন্ত্র বলিতেছেন, সগুণা সাকারা মাকে চিন্তা কর, তাঁর আরাধনা কর।

দশমহাবিদ্যা—কালীরূপ

কিন্তু কোন্ রূপে চিন্তা করিব, আরাধনা করিব মায়ের? আমাদের যাহার যেরূপ ধারণাশক্তি, মাকে যে রূপ- ও গুণবিশিষ্ট পাইলে আমরা সব চেয়ে বেশী খুশী হইব, আমাদের জন্য মা সেই রূপই ধরিবেন—'গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা' (মহানির্বাণ তন্ত্র)। মায়ের দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণের, একই মায়ের বিভিন্ন রূপ-ও গুণবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভাবের মূল কথা ইহাই! তন্ত্র বলিতেছেন ইহলোকের বিষয়ভোগে আসক্তি তোমার খুব বেশী? —বেশ তো, ঐ ভোগের পথের বাধা সরাইবার জন্যই মাকে ডাকো—বগলা, কমলা, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী রূপে তাঁহার আরাধনা কর। নিজের স্থূলদেহাতীত সত্তায় যদি বিশ্বাস আসিয়া থাকে, যদি বিশ্বাস কর যে এই দেহের নাশের পরও তুমি সূক্ষ্মদেহে থাকিবে, এবং স্বর্গে যাইয়া ভোগ করিবে, তবে মাকে ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ষোড়শী প্রভৃতি রূপে আরাধনা কর। আর যদি ইহলোক ও পরলোকের সব ভোগকে অনিত্য জানিয়া দেহ-মন-বুদ্ধি-বিধৃত এই সব ভোগের স্বপ্ন ভাঙিয়া পূর্ণ জাগ্রত হইতে চাও, নিজের অবিনাশী পরমানন্দময় সত্তা উপলব্ধি করিতে চাও, তবে কালী, তারা ও ত্রিপুরাসুন্দরী রূপে মাকে ডাকো।

এই তিনটি রূপের মধ্যে আবার এবিষয়ে কালীরূপের আরাধনাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন তন্ত্র। দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালী শুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধানা, নির্বিকারা, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশিকা। যোগিনীতন্ত্রে মা কালী নিজেই বলিতেছেন, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে সগুণ সাকাররূপে চিন্তা করিবার পক্ষে কালীরূপই শ্রেষ্ঠ—'ইতঃ পরতরং রূপং ব্রহ্মণো নাস্তি কুত্রচিৎ।' সাধারণ বুদ্ধিতেও আমরা বুঝিতে পারি যে, মা বা সগুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ সবভাবেরই একত্র প্রকাশ কালীরূপের মতো আর কোন রূপেই নাই।

কালীর আবির্ভাব

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য দশমহাবিদ্যার ভিতর বিশেষ রূপগুণসমন্বিতা মূর্তির আরাধনা প্রশস্ত, একথা বলিলেও তন্ত্র ইহাও বলিয়াছেন, দশমহাবিদ্যার সকলেই 'ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী।'

সব রূপই যে তাঁহারই রূপ, সব রূপে উপাসনা যে তাঁহারই উপাসনা, এই সত্যটিও মায়ের দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণের মূলে রহিয়াছে। সনাতন ধর্মের চিরাচরিত প্রথামতো এই সত্যটি সর্বসাধারণের নিকট পরিবেশিত হইয়াছে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে।

শিব এবং শক্তি হইলেন শুদ্ধ চৈতন্য এবং তাহার সহিত সদা-অভিন্ন শক্তির প্রতীক। দক্ষরাজার কন্যা, শিবের অর্ধাঙ্গিনী সতী শক্তিরই এক রূপ। দক্ষরাজ এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু দম্ভভরে শিব ও সতীকে সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন নাই; আর সব দেব দেবীই নিমন্ত্রিত। নারদের মুখে পিতৃগৃহে এই উৎসবের সংবাদ পাইয়া সতী বিনা নিমন্ত্রণেই

সেখানে যাইবার জন্য শিবের সম্মতি চাহিলে শিব সম্মতি দিলেন না। তখন সতী দশ-মহাবিদ্যা রূপ ধারণ করিয়া শিবের দশদিকে আবির্ভূতা হইলেন।

কেন? কালিকা পুরাণ মতে শিব অনুমতি না দেওয়ায় সতী ক্রুদ্ধা হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন। মহাভাগবত পুরাণ মতে, সতী দেখিলেন, শিব তাঁহার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন—তিনিই যে জগতের মূল, তাঁহার ইচ্ছাতেই যে বিশ্বের সব কিছু ঘটিতেছে, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দক্ষালয়ে যাইবার ইচ্ছায় বাধা দিতেছেন; শিবের স্মৃতি ফিরাইয়া আনিবার জন্যই তিনি দশমহাবিদ্যা হন। ঐ সময় সর্বাগ্রে তিনি কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

নারদপঞ্চরাত্র মতে দক্ষালয়ে দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে কালী রূপে জন্মগ্রহণ করেন, 'অনুগৃহ্য চ মেনায়াং জাতা তস্যাস্তু সা তদা কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা···।'

দেবীমাহাত্ম্যে চামুণ্ডাকেই 'কালী' বলা হইয়াছে। শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে যুদ্ধের প্রারম্ভে দেবীর ললাট হইতে কালী অসি ও পাশ হস্তে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছিলেন। আবার, পার্বতীর দেহ হইতে অম্বিকা দেবী নির্গত হইবার পর পার্বতীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাওয়ায় তিনি 'কালী' নামে সমাখ্যাতা হন, ইহাও আছে।

কালী নাম ও রূপের তাৎপর্য

যখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ছিলেন না, পঞ্চভূতও ছিল না, তখন শুধু মা কালী ছিলেন—ব্রহ্মরূপে (মহাকালসংহিতা)। কালী আদি-রূপিণী, সব কিছুর কারণ; প্রলয়ে সব কিছু তাঁহাতেই বিলীন হয়—মহাকাল বিশ্বগ্রাস করেন, তিনি গ্রাস করেন মহাকালকে—তাই তিনি 'কালী' (মহানির্বাণ তন্ত্র)। আবার, বিশ্ব 'কলন' (ক্ষেপণ ও সংহার) করেন বলিয়াই তিনি 'কালী'। কালীরূপও অনেক, দক্ষিণাকালী যার অন্যতম। যমের স্থান দক্ষিণে; 'কালীনাম্না পলায়তে ভীতিযুক্তঃ সমন্ততঃ' (নির্বাণ তন্ত্র), কালী নাম শুনিয়াই যম ভয়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করেন বলিয়া তাঁহার নাম দক্ষিণাকালী।

কালী কৃষ্ণবর্ণা কেন? আসলে মায়ের কোন রূপই নাই, তিনি অরূপা, ব্রহ্মস্বরূপা। আবার, সব রূপই তাঁর রূপ। একদা স্বামী সারদানন্দকে, যিনি জগতের যাবতীয় নারী-মূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাঁহাকে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের কোন রূপ আছে কি? উত্তরে সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, "যাহা কিছু দেখিতেছ সবই তাঁহার রূপ।" তবে, কোন রূপে তাঁহাকে দেখা, সে যেন দূর হইতে—নিজেকে তাঁহা হইতে পৃথক রাখিয়া, দূরে রাখিয়া—দেখা। স্বরূপে পৌঁছিয়া দেখাই হইল নিকটে যাইয়া মাকে দেখা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা, সমুদ্রের জল দূর হইতে নীল বা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়, কাছে যাইয়া হাতে তুলিয়া দেখিলে দেখা যায় কোন রঙ নাই। তেমনি মা কালী দূর হইতে দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কাছে যাইয়া দেখিলে কোন রঙ নাই। আবার, শ্বেত পীতাদি সব বর্ণই যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, তেমনি বিচিত্ররূপমণ্ডিত বিশ্বের সব কিছুই কালীর মধ্যে বিলীন হয় বলিয়াই তিনি কৃষ্ণবর্ণা (মহানির্বাণ তন্ত্র)। মাকে সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের কর্ত্রীরূপে যখন দেখিতেছি, তখনও তাহা দূর হইতেই দেখা। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা, 'তমোরূপা' বলা হইয়াছে। আমরা

সাধারণতঃ যাহাকে 'জ্ঞান' বলি, তাহা অখণ্ডকে খণ্ডরূপে, নানারূপে দেখার জ্ঞান; আসল জ্ঞান, সত্যজ্ঞান নহে। বিশ্বের মূলে যে সত্য, বেদ ও তন্ত্র উভয় মতেই তাহা এক, অখণ্ড; নানাত্ব, খণ্ডত্ব নাই সেখানে · আমাদের অহং-মন-বুদ্ধির-ও পৃথক অস্তিত্ব নাই সেখানে—সবই মায়ের মধ্যে বা ব্রহ্মে লীন। কাজেই তাহা 'বাচাতীতং মনোঽগম্যং' (মহানির্বাণ তন্ত্র), 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (বেদ—তৈত্তিরীয় উঃ)। এই অখণ্ড সত্যকে যদি আমাদের মনবুদ্ধির সীমানায় থাকিয়া, নানাত্বে রঞ্জিত জ্ঞানের মধ্যে ধারণা করিতে চাই, তাহা হইলে প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই। তম বা ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারই উহার উপযুক্ত প্রতীক। আমরা তো দেখি অমানিশা আমাদের জগতের সব রূপকে গ্রাস করিয়া এক অখণ্ড তমিস্রায় লীন করিয়া দেয়। বেদে এই রূপক ব্যবহৃত হইয়াছে, 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে'; মহানির্বাণ তন্ত্রেও, 'সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীৎ তমোরূপম্-অগোচরম্।' সগুণের সীমায় নির্গুণা মায়ের প্রতীক তাই তম, মা তাই কৃষ্ণবর্ণা। তবে এ কৃষ্ণবর্ণ আমাদের সর্ববিধ খণ্ডজ্ঞানশিখার নির্বাণজ্ঞাপক হইলেও অখণ্ডজ্ঞানের, স্বরূপ-জ্ঞানের উদ্ভাসেরই পটভূমি। কালী তাই কৃষ্ণবর্ণা হইয়াও 'জ্যোতির্ময়ী।' সাধক কবি এই কথাই কৈবল্যদায়িনী কালিকাকে বলিতেছেন, 'তমোময়ি, অমানিশা ভালবাস, আঁধার হৃদয়ে স্বরূপ প্রকাশ।' এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা যায়, বেদ ও তন্ত্রোক্ত এই 'তম' আর বৌদ্ধশাস্ত্রের 'নির্বাণ' সমার্থজ্ঞাপক—সর্ববিধ খণ্ডজ্ঞান এবং আমাদের খণ্ডতাশ্রয়ী অহংবোধের বিলোপ যার লক্ষ্য।

মা কালীর করধৃত উদ্যত খড়্গ এই খণ্ডজ্ঞান ও তার আশ্রয় দেহমন-বুদ্ধি-অহংকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সাধককে স্বরূপ-জ্ঞান দিবার জন্যই।

মা দিগম্বরী। অম্বর বস্ত্র, আবরণ; সূক্ষ্মতম এবং মূল আবরণ মায়া, যাহা সত্যকে আবৃত করিয়া রাখে। মায়ের সে আবরণও নাই, তিনি মায়াতীতা, তাই দিগম্বরী।

মা রক্তবর্ণ লোলরসনা বিস্তার করিয়া বিকশিত দন্তপংক্তি দ্বারা তাহা চাপিয়া রাখিয়াছেন। কেন? লোকপ্রচলিত উত্তর হইল, স্বামীর বুকে পা দিয়াছেন দেখিয়া লজ্জাশীলা পল্লীবধূর মতো মা এভাবে লজ্জা প্রকাশ করিতেছেন। অন্য উত্তর, মা যে শুদ্ধসত্ত্বগুণ-প্রধানা, ইহা তাহারই অভিব্যক্তি। রক্তবর্ণ রজোগুণের প্রতীক, শ্বেতবর্ণ সত্ত্বের প্রতীক। প্রথমে রজোগুণের বিকাশ ঘটাইয়া তামসিকতা বিনাশ করিতে হয়, পরে সত্ত্বগুণের প্রকাশে রজ দমিত হইলে সত্যলাভ হয়। শুভ্র দন্তপংক্তি দ্বারা রক্তজিহ্বাকে চাপিয়া থাকার ইহাই তাৎপর্য।

কালীরূপের আরাধনার লক্ষ্য কি, তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি—স্বরূপোপলব্ধি। এই আরাধনা সবলের আরাধনা। এই আরাধনায় দুর্জয় সাহস অবলম্বনে স্থূলসূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহাশ্রিত স্বার্থ ও ভয়কে বলি দিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়—হৃদয়কে শশ্মানে পরিণত করিতে হয়, তবেই 'শ্মশানবাসিনী' মা সেখানে আবির্ভূ'তা হন। 'শ্মশানবাসিনী' ও তমোরূপম্' ভাবের দিক দিয়া সমার্থক, "মৃত্যুরূপাও" তাহাই। তাই যে মাকালীর আরাধনায় "স্বার্থ-সাধ-মান" চূর্ণ করিয়া হৃদয়কে শ্মশান করিতে পারে, "মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে", তাহারই আরাধনা কালীর যথার্থ পূজা,—"মাতৃরূপা তারি পাশে আসে।"

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

শ্রীরামানুজদর্শনের অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে সমাজজীবনে কি সমস্যার উদয় হইয়াছিল তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। কেন যে তিনি তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যে আচার্য শঙ্কর-প্রতিপাদিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যকে দার্শনিক ভিত্তিতে খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, মায়াবাদ নিরসন করিয়া নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ভক্তিবাদ প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তৎকালীন সমাজ জীবনের বিপথগামিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। যখনই সত্য-ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখনই ঈশ্বরাদিষ্ট মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া মানবমনকে একটি উন্নত স্তরে লইয়া যান। আবার কালধর্মে উহা গ্লানিগ্রস্ত হয়, আবার শ্রীভগবানের দক্ষিণামূর্তি —নরশরীরাবলম্বনে—সত্য-ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করে। ইহা ভারত-সংস্কৃতির একটি চিরন্তন ধারা। As a chosen people, ভারত তাহার আর্যসংস্কৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া বিগত বহু সহস্র বৎসর অব্যাহত গতিতে চলমান এবং ভবিষ্যতেও মধ্যে মধ্যে সমুত্থিত দানবশক্তিকে পর্যুদস্ত করিয়া জগৎকল্যাণের প্রয়োজনে স্বমহিমা-মণ্ডিত হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। ইহা বিধি-নির্দিষ্ট সত্য। এই সংস্কৃতির উপর যে শক্তি আঘাত হানিতে চাহিবে, তাহাকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতেই হইবে। ভারতাত্মা অমর, ভারতের প্রাণবাণী চির অমৃতস্যন্দী।

পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী শ্রীরামানুজচরিত গ্রন্থে শ্রীরামানুজ আচার্যের পুণ্য আবির্ভাবের হেতু নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:

"স্বকার্য সাধনপূর্বক দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শঙ্করমূর্তি শঙ্করদেব স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। কাল একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর নূতন বস্তুর আবির্ভাব করাইয়া সকলের চিত্তকে পুলকিত ও আকৃষ্ট করে, অন্যদিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর নবীন পদার্থকে ছিন্নভিন্ন বিশীর্ণ করিয়া দরিদ্রেরও হেয় করিয়া তুলে। ইহাই কাল-ধর্ম। সেই কালধর্মানুসারে শঙ্কর-কথিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্যচতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসিবেশধারী ইন্দ্রিয়পরবশ মানব, আপনাদের উপর এবং সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে তাঁহারা সার্দ্ধ'ত্রিহস্ত-পরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্ম-মৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণদৃষ্টি, অধ্রুবনশ্বরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম অচ্যুত ব্রহ্ম এইরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্রে যেরূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্মবস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য পাপ, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম—সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। এতদপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্তিগণ যে শীঘ্রই আপনাদের স্বদেশের

সর্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোলকল্পিতদুরর্থকারিগণ শঙ্করকথিত পরম-নির্মল ধর্ম ধারণা করিতে না পারিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি ও সত্যের অভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেই অভাব দূর করিবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক! এস এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-প্রচারকর্তা ভগবান শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের নির্মল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্য অগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাববস্তু থাকিতে পারে না। সুখ, শান্তি, সত্য, দাক্ষিণ্য, ধর্ম প্রভৃতি ভাববস্তু এবং দুঃখ, অশান্তি, মিথ্যা, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অধর্ম প্রভৃতি অভাববস্তু। যাহা না থাকিলে মনুষ্যের কষ্ট হয়, তাহাই ভাবপদার্থ। অতএব সুখ-শান্তি প্রভৃতি ভাববস্তু, এবং তৎসমুদায়ের অভাব, দুঃখ অশান্তি প্রভৃতি অভাববস্তু। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার প্রতিবিধান করে, ইহা পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মানুসারেই ভারত-ভূমিতে শ্রীমৎ রামানুজাচার্যের আবির্ভাব হইল।" (পৃঃ ৬২,৬৩)

ইহা অনস্বীকার্য যে, ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষ যখনই কোন নূতন মতবাদ প্রচার করেন তিনি তদানীন্তন ধর্মমত ও পূর্বগ আচার্যগণের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, বুদ্ধদেব গীতার ধর্মের প্রভাবান্বিত, আচার্য শঙ্কর বহুল পরিমাণে আধ্যাত্মিক শূন্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তিবাদে দক্ষিণের মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এবং ভাগবত ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। এমন কি যীশু-প্রচারিত ধর্মমতের উপর গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারা ও ভারতের বৌদ্ধ-ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

শ্রীরামানুজাচার্য যে আবেষ্টনীর মধ্যে জীবনযাপন করিতেন উহা উচ্চাঙ্গের ভক্তি-ভাবপরিপূর্ণ ছিল। তিনি যে সব মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্মচিন্তা, পরম পবিত্র ভক্তিরসাপ্লুত জীবন তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

অনূ্যন ৯০৮ খৃঃ বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনার স্রোত শ্রীশ্রীনাথ মুনি নামক কোন মহাপুরুষের হৃদয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া ভবিষ্যৎ মহাপ্লাবনের সূচনা করিতে লাগিল।

শ্রীনাথ মুনি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় মত তন্মধ্যে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। "এই গ্রন্থদ্বয় শ্রীবৈষ্ণবগণের চিরকাল মহার্ঘ রত্নস্বরূপ ও পরম আদরের বস্তু হইয়া আছে।" শ্রীরামানুজাচার্য এই মতবাদে সিঞ্চিত হইয়াছিলেন।

আবার তাঁহার দার্শনিক চিন্তার উপজীব্য হইল শ্রীযমুনা মুনির মতবাদ। "যমুনাচার্যের হৃদয়ে কেবল মাত্র শ্রীবিষ্ণুই অধিরূঢ় থাকিতেন বলিয়া তাহা তাঁহার সিংহাসনস্বরূপ ছিল।" তিনি শেষ জীবনে সংস্কৃত ভাষায় চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের অমোঘ ইচ্ছায় যেন শ্রীরামানুজ বিগ্রহধারণ করিয়া অচিরে তাঁহার সেই কামনা চরিতার্থ করিয়া দিয়াছিলেন। "শ্রীরামানুজ আলওয়ান্দারের (যমুনাচার্যের) পূর্ণ বিকাশ মাত্র।"

অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নিম্নে বিবৃত হইল:

পরদিবস রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন করিলে তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার সম্বন্ধে গত রজনীতে শ্রীবরদরাজ এইরূপ কহিয়াছেন :

'আমিই জগৎকারণ প্রকৃতির কারণ পরব্রহ্ম। হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের ভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ একমাত্র মুক্তির উপায়। মদীয় ভক্তগণ অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ করিতে না পারিলেও তাঁহাদের মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী। দেহত্যাগ হইলেই আমার পরম ভক্তগণ পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্বগুণ-সম্পন্ন মহাত্মা মহাপূর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর।'"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানুজ বরদরাজের মন্দিরাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পড়িলেন। যে ছয়টি সন্দেহ তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা সর্বতোভাবে উন্মূলিত হইয়া গেল।

তাহার পর শ্রীরামানুজ কাঞ্চীপুরে তপস্বী মহাপূর্ণের নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, শ্রীরামানুজ বিষ্ণু উপাসক মহাত্মাগণের শিক্ষায় প্রভাবান্বিত হইয়া স্বীয় অভিনব দার্শনিক মত শ্রীভাষ্যের মাধ্যমে প্রচার করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্‌-ভাগবতম্ এবং বোধায়নবৃত্তি তাঁহার মতবাদের উপজীব্য ছিল। (ক্রমশঃ)

প্রিয়তম

শ্রীনীরদবরণ চট্টোপাধ্যায়

এসো প্রিয়তম, চির সুন্দর,
এসো প্রেমের সুরেতে মাতিয়া;
এসো নমোরম চির বাঞ্ছিত
হেরিব নয়ন ভরিয়া।
কত যে দীপ গেল জ্বলি,
কত যে ফুল হলো ধূলি;
তোমারই আশায় রহিয়া।
নীড়হারা পাখি ডাকিয়া উঠিলে,
মনে হয় প্রিয়, তুমি কি আসিলে ?
আঁধারের মাঝে খুঁজি যে তোমারে,
তোমার মিলন লাগিয়া;
এসো প্রেমের সুরেতে মাতিয়া।

জগন্মাতার আরাধনা

শ্রীমতী মৃন্ময়ী দত্ত

মা বিশ্বজননী। তবু আমরা তাঁর নাগাল পাই না। শিশু কাঁদতে থাকলে মা কতক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন? অবশ্যই এসে চোখ মুছিয়ে কোলে নেন। সেভাবে কেঁদে কেঁদে ডাকতে হবে মাকে। তবে কেবল দুঃখ এড়াবার জন্য নয়, সুখকেও তুচ্ছ করে মাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হওয়া চাই। সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন :

"আমি দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি
সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে,
তুমি মনে বসে মন দেখ মা,
আমায় দেখা দাও না তাইতে।"

কবি অতুলপ্রসাদ গেয়েছেন :

"আমার চোখ বেঁধে এই ভবের খেলায়
বলছ হরি আমায় ধর ;
আঘাত দিয়ে বারে বারে বলছ এই তো
আমায় কর।"

আমাদের খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে মা লুকিয়ে থাকেন, আমরা মার জন্য কাঁদি কি না তাই দেখতে। এরই নাম লীলা। মায়াসহায়ে মা এই লীলা করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই মায়ার বর্ণনা আছে। এই মায়ার প্রভাবেই জগৎ চলছে। আমরা হয়ত বুঝছি সব। কিন্তু মায়াপাশ ছিন্ন করতে পারছি না—"তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা।"

গীতাতেও শ্রীভগবান বলছেন : "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" আবার তিনি মায়া পার হওয়ার উপায়ও বলে দিচ্ছেন, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

আমাকে যে লাভ করতে পারে সে-ই মায়া কাটাতে পারে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথাও তাই। বৈশ্য সমাধি মায়া কি বুঝেছেন, কিন্তু তার হাত থেকে বের হতে পারছেন না! উপায় কি? মেধা ঋষি তাঁকে বললেন, মহামায়ার আরাধনা কর, মাকে প্রসন্না কর, তাহলেই মা নিজে বাঁধন খুলে দেবেন—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

অনেকের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে জগন্মাতা মহাশক্তির ভাব দেখা যায়। দেবীসূক্তের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা বিদুষী বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলেছিলেন, "আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যা দেবী ও বিশ্বেশ্বরী।" ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষি কুশিক। অনেকের মতে এই রাত্রিসূক্তে কালিকাদেবীর মূল রয়েছে। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ—এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের নিম্নোক্ত উপাখ্যান থেকে জানা যায় :

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হ'ল। স্বশক্তিতে জয় হয়েছে মনে করে দেবতারা গৌরবান্বিত বোধ করলেন। তাঁদের মিথ্যা অভিমান অপনোদন করবার জন্য ব্রহ্ম জ্যোতিরূপে দেবগণের সম্মুখে

আবির্ভূত হলেন। দেবগণ আবির্ভূত পূজ্য এই জ্যোতি কে, তা জানতে না পেরে জেনে আসার জন্য অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরণ করলেন। জ্যোতিরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম ও শক্তি কি?' অগ্নি বললেন, 'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ; এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দগ্ধ করতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে তা দগ্ধ করতে বললেন। অগ্নি সর্বশক্তি দিয়েও তৃণটি দগ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে অবনতমস্তকে দেবগণের নিকট ফিরে এলেন। এবার ব্রহ্মসমীপে বায়ু গমন করলেন। ব্রহ্ম পূর্ববৎ তাঁর নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, ইনি বায়ু এবং পৃথিবীর সব কিছুই উড়িয়ে নিতে সমর্থ। ব্রহ্ম একখণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তি-প্রভাবে তা ওড়াতে না পেরে লজ্জিত বদনে সরে পড়লেন। অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র সেই জ্যোতি অন্তর্হিত হলেন এবং সেখানে আকাশে ইন্দ্র হৈমবতী উমাকে দর্শন করলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলেন যে, ব্রহ্মের শক্তিতেই দেবতাগণ শক্তিশালী হয়ে সংগ্রামে অসুরবিজয়ী হয়েছেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গার এই গায়ত্রীটি আছে—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে। কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' (১০।১।৭)। সায়নাচার্যের ভাষ্যমতে দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন।

মহাভারতের নানা স্থানে উমা ও পার্বতীর কথা আছে, দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আছে। তাছাড়া যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দুর্গাস্তব আছে। বিরাটনগরে যাবার পথে যুধিষ্ঠির অন্যান্য পাণ্ডবগণকে নিয়ে দুর্গাদেবীর স্তব করেন—'বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ। অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্॥ যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্। নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥' কংস-নিধনের জন্য ভগবান দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। কংস পূর্বেই দৈব-বাণীতে একথা টের পেয়েছিলেন এবং জেনে-ছিলেন যে, ঐ সন্তানই তাঁকে হত্যা করবে। তাই বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে রাখেন, এবং এক-একটি করে সন্তান জন্মাবার পর-ই তার পায়ে ধরে একটা শিলাখণ্ডে আছড়ে মেরে ফেলতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তাঁকে নন্দালয়ে রেখে আসেন। নন্দ ও যশোদার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না; কিন্তু যে-রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রেই যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যাসন্তান-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব দৈবনির্দেশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে কন্যাটিকে নিয়ে কারাগারে ফেরেন। কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে জেনে কারাগারে এসে ঐ কন্যাটিকে নিয়ে শিলাতলে যখন আছড়ে মারতে যান, তখন কন্যারূপিণী মহামায়া নিজমূর্তি ধারণ ক'রে আকাশে বিলীন হন। যুধিষ্ঠির সেই 'শিলাতটবিনি-ক্ষিপ্তা' 'আকাশং প্রতিগামিনী' 'বাসুদেবস্য ভগিনী' 'খড়্গখেটকধারিণী' দুর্গার স্তব করেছিলেন। এই মহামায়াই যে মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা, সেকথাও যুধিষ্ঠির স্তবেই বলেছেন: "ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনী। প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব॥"

অর্জুন দুর্গার স্তব করেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, কুরুক্ষেত্রে রণ আরম্ভের পূর্বে, বিজয়ের জন্য মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে—"স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। জয়ো ভবতু মে নিত্যং তৎপ্রসাদাৎ রণাজিরে।"—মা! আমি শুদ্ধ হৃদয়ে তোমার স্তব করছি, তোমার

কৃপায় যুদ্ধে আমার যেন নিত্য জয় হয়।

কৃত্তিবাস-কৃত বাংলা রামায়ণে আছে, রাম ও রাবণ উভয়েই দেবীভক্ত ছিলেন। অবশ্য বাল্মীকি-রামায়ণে একথার উল্লেখ নেই। দুর্গাপূজার মন্ত্রেও দেখা যায়, 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে বোধিতা দেবী…।' শারদীয়া পূজা কৃত্তিবাসের কল্পিত নয়, বহুকাল থেকেই বাংলা দেশে এই প্রবাদ প্রচলিত। কাহারো মতে দেবীভাগবত পুরাণ থেকে এই আখ্যান কৃত্তিবাস গ্রহণ করেছেন। প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর অকাল বোধন করেন রাবণবধের জন্য। রাবণ ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করতেন। রামের আরাধনায় প্রীতা হয়ে দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এই মতানুসারে বাসন্তীপূজাই প্রকৃত দেবীপূজা। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই সুরথ ও সমাধি দেবীপূজা করেন। দেবীভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে যাই হোক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্ম দ্বারা দেবী-পূজার সংকল্প করেন। আবশ্যকীয় পদ্ম সংগ্রহ করা হ'ল। দেবী রামচন্দ্রের ভক্তি পরীক্ষা করার জন্য ছলনা করলেন, একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখলেন। পূজার সময় একটি পদ্মের অভাব হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদ গণলেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হ'লে দেবী সন্তুষ্ট হবেন না; সংকল্পও সিদ্ধ হবে না। রাম পদ্মপলাশলোচন নামে অভিহিত। সেজন্য তিনি স্থির করলেন নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করে পদ্মরূপে মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দেবেন। রামচন্দ্র ধনুর্বাণ-হস্তে চক্ষু উৎপাটন করবার উপক্রম করতেই দেবী আবির্ভূ'তা হয়ে তাঁকে অভীষ্ট বর প্রদান করলেন।

সুরথ রাজা কখন থেকে দেবীপূজা প্রবর্তন করলেন, তা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে নিম্নোক্ত ভাবে পাওয়া যায়:

পুরাকালে সুরথ নামে এক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে আপন সন্তানজ্ঞানে প্রতিপালন করতেন। সে-সময়ে কোলাবিধ্বংসী (দেবী-ভাষ্যমতে কাশ্মীর-প্রান্তদেশস্থ যবন রাজগণ) তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে যুদ্ধ করলেন। সুরথ রাজা অধিকসংখ্যক সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বীয় রাজধানীতে ফিরে এসে স্বদেশের অধিপতি হয়ে রইলেন। তারপর রাজধানীতে দুষ্ট অমাত্যগণ অধুনা বলহীন রাজার ধনভাণ্ডার ও সৈন্যাদি অধিকার করে নিল, রাজা রাজত্ব হারিয়ে মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে গমন করলেন। সেই বনে তিনি শান্তভাবাপন্ন হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ ও শিষ্যশোভিত দ্বিজবর মেধা মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন। সেই মুনি কর্তৃক সমাদৃত হয়ে মুনির আশ্রমে কিছু-কাল অতিবাহিত করলেন। কিন্তু এমন স্থানে থেকেও সুরথ রাজার মনে শান্তি নেই। রাজ্যচিন্তা মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এত সাধের রাজ্যখানি আজ পরপদানত! এত আদরের প্রজারা আজ নিপীড়িত! সযত্নে রক্ষিত কোষের ধন আজ অপব্যয়িত! ইত্যাদি। তারপর সেই আশ্রমে এলেন বৈশ্য সমাধি। সমাধির প্রথমেই সুরথ রাজার সহিত সাক্ষাৎ। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে ভদ্র, আপনি কে, এখানে আসার কারণ কি, কেনই বা আপনাকে শোকাকুল ও দুর্মনা দেখা যাচ্ছে?' বৈশ্য সবিনয়ে আপন পরিচয় দিয়ে বললেন যে তাঁর অসাধু স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে তাঁর সব সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাঁকেও পরিত্যাগ করেছে। অথচ কি আশ্চর্য, বনবাসী হয়েও

সেই স্ত্রীপুত্রের জন্য তিনি চিন্তাকুল! রাজা বললেন, 'সত্যই আশ্চর্য! যারা ধনলোভে আপনাকে পরিত্যাগ করেছে তাদের প্রতি আপনার চিত্ত স্নেহাসক্ত কেন? তারপর উভয়ে মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হয়ে যথারীতি সম্ভাষণ পূর্বক সুরথ মুনিকে বললেন, 'আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহপূর্বক তার উত্তর দিন। আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয়—মমতাই আমার দুঃখের কারণ—একথা জেনেও অজ্ঞের ন্যায় মমতান্ধ হয়ে আছি—এর কারণ কি? আর এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়েও তাদের প্রতি অতিশয় আসক্তই বা কেন?' মুনিবর বললেন, 'সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। অতএব এ বিষয়ে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। মহামায়া সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেছে; তিনি প্রসন্না হলে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন।'

'সেই মহামায়া নিত্যা (জন্মমৃত্যুরহিত,) আবার এই জগৎ প্রপঞ্চই তাঁর বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্যা হলেও তাঁর বহুপ্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন।' তারপর তিনি দেবীকর্তৃক মধুকৈটভবধ, শুম্ভ-নিশুম্ভবধ, চণ্ডমুণ্ডবধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি বর্ণনা করলেন।

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥' অর্থাৎ যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবে জগতে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখনই আমি আভিভূ'তা হয়ে তাদের বধ করবো। সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করে মুনি বললেন, 'দেবী ঈদৃশ প্রভাবান্বিতা; তিনিই এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, আবার তিনিই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে ও অন্যান্য বহুজনকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন। সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও।' তখন রাজা সুরথ এবং সমাধি মেধাঋষির উপদেশ শ্রবণ করে তাঁহাকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণই দেবীর আরাধনার্থ গমন করলেন।

সুরথ ও সমাধি দু'জনে নদীতটে দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবীর পূজা করলেন। কখনো নিরাহারী, কখনো অল্পাহারী হয়ে তিন বৎসর সংযতচিত্তে আরাধনার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের দেখা দিলেন এবং দুজনকেই বর প্রদান করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

পূর্বানুবৃত্তি।

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনন-গ্রন্থ 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচিন্তায় যে স্পেন্সারের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসচেতনার প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ইতিহাসের পরিমাপক হিসাবে 'সাধারণ প্রজা' বা সাধারণ মানুষের কথা স্বামীজী যেমন ভেবেছেন, তেমনি তাঁর বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে ভারতীয় ভাবাদর্শে ধর্মচেতনার প্রাধান্যের কথা। এক হিসাবে ভারত-ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনেরই বিভিন্ন পর্যায় হিসাবে ভারতের ধর্মান্দোলনসমূহের ইতিহাসকে বিন্যস্ত করা চলে। 'বর্তমান ভারতে' সে-কথাই মনে করিয়ে দিয়ে স্বামীজী লিখেছেন—'চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ফেনিল, বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ

এদিক থেকে কার্ল মার্কসের দৃষ্টিতে খৃষ্ট-ধর্মের ইতিহাস-বিশ্লেষণও স্মরণীয়। খৃষ্ট-ধর্মকে মার্কস্ সেকালের দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিবাদের প্রকাশরূপে দেখেছেন। ভারতবর্ষে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাবীর বা বুদ্ধদেবের প্রচেষ্টা ; বৌদ্ধ অবক্ষয়ের প্রতিবাদে শঙ্কর, রামানুজের আবির্ভাব ; হিন্দুমুসলমান-সংস্কৃতির বিরোধনিরসনকল্পে কবীর, নানক, চৈতন্য ; এবং ইংরেজ আগমনে পাশ্চাত্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে রক্ষাকল্পে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ প্রভৃতির ভূমিকা স্মরণীয়।

মোটের উপর ধর্ম ও সমাজচেতনার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বামীজীও স্বীকার করেছেন। কিন্তু মার্কসের মতো মানবমনের বিবর্তনে অর্থনৈতিক তত্ত্বকেই প্রাধান্য[২] না দিয়ে মানব-চৈতন্যের মূলে অধ্যাত্মচেতনার গভীরতর প্রভাবকে লক্ষ্য করেছেন। মার্কস্ ধর্মকে অনাবশ্যক জ্ঞানে পরিহার করেছেন, স্বামীজী ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে ধর্মের অত্যাবশ্যক ভূমিকাটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার ও সাধক-মহাপুরুষদের প্রেরণার মূলে যেমন অধ্যাত্ম-প্রেরণা কার্যকরী, তেমনি সমাজের সাধারণ-মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও আদর্শের সংগ্রামও এই ধর্মীয় আন্দোলনকে অবলম্বন করেই রূপায়িত। ইতিহাসচেতনার এই তত্ত্বটি স্পেন্সারের চিন্তায়ও অবহেলিত। এই ধর্ম-চেতনার সঙ্গে ইতিহাসের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনাকালেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্মান্দোলন ও গণচেতনার নিগূঢ় ঐক্য ধরা পড়েছে। ধর্মতন্ত্র বা রাজতন্ত্র কোনোটিই স্বয়ম্ভূ নয়, এদের মূলে রয়েছে সাধারণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা। নৃপতি-কেন্দ্রিক ইতিহাসের কথা মনে রেখেই স্পেন্সার তাঁর সমকালীন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস রচনাপদ্ধতি

১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : বর্তমান ভারত : পৃঃ ২৩৭

২ On Religion : Marx and Engels দ্রষ্টব্য

সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর বক্তব্য—"That which constitutes History, properly so called, is in great part omitted from works on this subject. Only of late years have historians commenced giving us, in any considerable quantity, the truly vulnerable information. As in past ages the king was everything and the people nothing; so in past histories the doings of the king fill the entire picture, to which the national life forms but an obscure background; while only now, when the welfare of nations rather than of rulers is becoming the dominant idea, are historians beginning to occupy themselves with the phenomena of social progress. The thing it really concerns us to know, is the national history of society."[৩]

'শিক্ষা'-গ্রন্থে স্বামীজীর অনুবাদ—"যথার্থ ইতিহাস অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া যায়। পূর্বে প্রজারা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত, অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্ব, এ কথা ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবনবৃত্তান্ত।"[৪]

তরুণ মননে ইতিহাসপাঠের প্রণালী সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ যে-ধারণা করেছিলেন, 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-বিশ্লেষণ তার অনুগামী। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের (১৩০৫-৬) ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে স্বামীজীর প্রথম ধারাবাহিক রচনা 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হতে থাকে। হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Education' -এর অনুবাদকাল যদি ১৮৮৪-৮৫ হয়ে থাকে তাহলে প্রায় পনেরো-ষোলো বছর পরে সমাজ-চেতনার আলোকে ভারতবর্ষের ইতিহাস-বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দেখা দিল 'বর্তমান ভারতে'র পৃষ্ঠায়।

'বর্তমান ভারতে'র আগে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২)। ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার মানদণ্ডে ভারতের সমাজ-ইতিহাস এবং তুলনামূলক ভাবে বিশ্বসভ্যতার আলোচনার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি স্বামীজী পড়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু ভূদেবের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল ও অমিল দুই-ই আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা স্বামীজী যেভাবে সাধারণ মানুষের জীবনস্রোতকে লক্ষ্য করে ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, ভূদেবের চিন্তায় সে-জাতীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেই। অথচ আধুনিক কালের ইতিহাসচেতনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীই সর্বাধিক স্বীকৃত

'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাস-বিশ্লেষণের সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের সাধারণ প্রজার অবস্থা বর্ণনা করে স্বামীজী লিখেছেন—"রাজ্যরক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিত-কুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।

৩ Education : Spencer : 1st Edn. p 34.

৪ শিক্ষা : স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত : শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ, পৃ : ৭২

"কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই—হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য-শূদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষসম্বন্ধে রাজ্যের প্রথাস্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে-শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে-কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে"।[৫]

'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচেতনায় স্বামীজী ভারতীয় সভ্যতার চারটি স্তর-বিশ্লেষণ করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের আগে প্রধানতঃ 'ব্রাহ্মণ'-যুগ—পুরোহিতপ্রাধান্যের যুগ। বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য। ইংরেজ আমল মূলতঃ বৈশ্য যুগ। ইংরেজ আমলেই স্বামীজীর দৃষ্টিতে বৈশ্যশক্তির শোষণকারী রূপটি ধরা পড়েছে এবং তিনি নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে 'শূদ্রত্বসহিত শূদ্রপ্রাধান্যের' সময় আসন্ন মনে করেছেন। শুধু ভারতের ইতিহাস নয়, মোটামুটিভাবে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসকে স্বামীজী এই ভাবে চারটি ক্রম-পরম্পরায় যুগবিভাগে বিন্যস্ত করেছেন।[৬]

ভারতবর্ষের ইতিহাসই যেহেতু স্বামীজীর লক্ষ্য, সেহেতু ভারতীয় সমাজের যারা ধারক ও বাহক তাদের ক্রম-অভ্যুত্থানের কথাই স্বামীজীর ইতিহাসচেতনায় বিভিন্ন যুগের বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের প্রজাশক্তি তখনও আপন নিহিত বলের সন্ধান পায়নি। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও তিনি দেখিয়েছেন—প্রথমতঃ গ্রামীণ সভ্যতার পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘে ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্যদের সকলের অভিমতের গুরুত্বদানের উদাহরণ। কিন্তু পঞ্চায়েতী স্বায়ত্তশাসন কখনো রাজশক্তির ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি বলে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তার যতই কার্যকারিতা থাক, রাজাশাসনে তার প্রভাব কিছুই ছিল না। অপরপক্ষে সন্ন্যাসীরা নিজেদের মধ্যে যে ব্যবস্থাই করুন, সাধারণ সমাজব্যবস্থায় সেই স্বায়ত্তশাসনের কোনো প্রভাব ছিল না।

ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির সর্বব্যাপী প্রভাবের যুগে প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের পুরো দায়িত্ব রাজার। কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী ক্ষমতার ফলে প্রজাদের রক্ষা সত্যি সত্যি কতটা হয়, সন্দেহের বিষয়। যুধিষ্ঠির, অশোক বা আকবরের মতো র কোনো দেশেই বেশী দেখা যায় না। প্রজাকে আত্মশাসনে স্বনির্ভর করে তোলাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাজশাসনের কালে তা হয়ে ওঠা দুষ্কর। স্বামীজীর মতে—"সমাজ—গৃহের সমষ্টি মাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার

[৫] বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ : ২২২-২২৩

[৬] ..পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"—বর্তমান ভারত : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : ২২৯। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, এ লেখার বছর চারেক আগে ১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী প্রথম বিশ্বসভ্যতার যুগবিভাগ করেন। "Human society is in turn governed by the four castes—the priests, the soldiers, the traders and the labourers." 'বর্তমান ভারতে'র বীজ এই পত্রটিতেই অঙ্কুরিত। Complete Works of S. Vivekananda: Vol VI: Page 381-382; Centenary Edn.

পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজ-শিশু কি সে ষোড়শবর্ষে কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।"[৭]

ভারতবর্ষের সমাজচেতনায় এ-জাতীয় বিপ্লব দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ধর্মান্দোলনের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকেন্দ্র যেমন নৈমিষারণ্যে, কাশীতে, মিথিলায়, তক্ষশীলায়, নালন্দায়, বিক্রমশীলায়, নবদ্বীপে ছিল, তেমনি ভারতের সমাজচেতনার স্ফুরণ ঘটেছে জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন মত ও পথের সাধকবৃন্দের প্রচেষ্টায়।[৮] অন্যান্য দেশে যা রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সাধিত হয়েছে, ভারতের তা হয়েছে ধর্মান্দোলনের দ্বারা। ধর্মচেতনাই এদেশে গণচেতনার অভিব্যক্তি।

বহিরাগত ধর্মান্দোলনের মধ্যে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মও এদেশের ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে ভারতের সাধারণ মানুষের সামাজিক অধিকারলাভের প্রচেষ্টাকে অন্যদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে ভারতে সনাতনধর্মের মধ্যেই যাবতীয় মত ও পন্থার মিলন ও সমীকরণ ঘটেছে। আধুনিকতম কালে ভারতীয় গণচেতনা ও ধর্মচেতনার মিলিত উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

"চার্বাক, জৈন" থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের "ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ" প্রভৃতির কথা উল্লেখ করলেও স্বামীজী স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতঃই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামোল্লেখ করেননি। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ধর্মান্দোলনের গণচেতনাময় ইতিহাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনেও লক্ষণীয়।

[ক্রমশঃ]

[৭] ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ: ২৩৭

[৮] বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা : শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন।

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি সংবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ২ ॥

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চিকাগো প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। মে মাস পর্যন্ত সাধারণভাবে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় চিকাগো প্রদর্শনীর সংবাদের প্রাধান্য ছিল। তারপর থেকে ঐ প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমহাসভা সংবাদপত্রে অধিক স্থানলাভ করতে থাকে। পাঠকদের স্মরণ আছে, স্বামীজী ৩১শে মে ভারতত্যাগ করে যান, এবং তার পরেই ধর্মমহাসভার পরিকল্পনাদির বিস্তারিত রূপ জনসাধারণ জানতে পারে। ভারতীয় জনসাধারণ যে, ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হয়ে যাবে, ভারতত্যাগের পূর্বে স্বামীজীর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। ধর্মমহাসভা হয়ে যাবার পরে এক চিঠিতে তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছিলেন – দেখছি, এখানকার সব সংবাদ ভারতে পৌঁছে গেছে, ইত্যাদি।

এখন আমরা ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সে বিষয়ে সংবাদ কিভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু ইতিহাস সন্ধান করব। ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমেরিকাযাত্রা, এবং তাঁদের প্রাথমিক সংবর্ধনা প্রভৃতি বিষয়েও কিছু কৌতূহলজনক তথ্য এই সূত্রে পেয়ে গিয়েছি।

যতদূর দেখা যাচ্ছে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি' (Printed Circular) মারফত ভারতের সর্বত্র ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা হয়। তার আগে থেকেই বিভিন্ন প্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মসভাসমূহের সাধারণ সমিতির সভাপতি (Chairman, Genl. Com. on Rel. Congress) ডাঃ জন হেনরি বারোজ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে মহাবোধি সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত 'মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী' এইচ. ধর্মপালকে লিখিত ডাঃ বারোজের চিঠি থেকে এই-জাতীয় যোগাযোগের চেহারা দেখতে পাই। ডাঃ বারোজ ২৫ নভেম্বর ১৮৯২ তারিখে লিখেছিলেন :[১]

"প্রিয় ভ্রাতা,···ধর্মমহাসভায় সাহায্যের যে সব প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি, তাতে আমরা খুবই উৎসাহিত। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠের প্রতিনিধির নাম আমাদের কাছে শীঘ্রই পাঠাবেন বলে আশা করি। আপনার প্রেরিত ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র চিকাগোর ইউনিটেরিয়ান পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।"

এর পরে এপ্রিল মাসে মহাবোধি জার্নালে এবং 'ইউনিটি অ্যাণ্ড দি মিনিস্টারে' (এবং নিশ্চয় অন্য সংবাদপত্রেও) ধর্মমহাসভার প্রস্তাবিত কার্যসূচী প্রকাশিত হল। ৯ই এপ্রিল মিনিস্টারে প্রকাশিত কার্যসূচীই অধিক বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয় মহাবোধিতে

১ "My dear brother, . . . we are greatly encouraged by the promise of help we are getting for the Parliament of Religions. We hope that you will soon send to us the name of the delegate from the Southern Church of Buddhism. Your letter of September 6th has been published in the Unitarian paper of Chicago".

অগস্ট সংখ্যায় :[২]

"ডক্টর বারোজ বলেন, ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠানসূচী খুব খেটে, খুব মনোযোগ দিয়ে করা হয়েছে; বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ প্রায় একশো জন পণ্ডিতকে দিয়ে এর দোষগুণ বিচার করিয়ে নেয়া হয়েছে। এই সূচীতে নিম্নোক্ত সাধারণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত: ঈশ্বর; মানুষ; ধর্ম—মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্কের অভিব্যক্তি; বিভিন্ন ধর্মমত; জগতের শাস্ত্রগ্রন্থচয়; পাপ সম্বন্ধে বিশ্বজনীন ধারণা; অবতারবাদ; পতিত ও পাপীদের উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা; মানবজাতির ধর্মনেতাগণ; বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত ধর্মের সম্পর্ক; ধর্ম ও নীতি; ধর্ম ও পারিবারিক ধর্ম এবং নারী; ধর্ম ও দরিদ্র, পথভ্রষ্ট এবং অপরাধী; ধর্ম ও সভ্যসমাজ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব; ইংরেজী ভাষাভাষী জাতিগুলির ধর্মবিষয়ে মনোভাব; ধর্মের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গী; এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে ধর্মবিষয়ে জগতের ঋণ; বিভিন্ন দেশের খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের পুনর্মিলন; সমগ্র মানবপরিবারের মহামিলন; সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মের সার কথা; চরম ধর্মের বৈশিষ্ট্য।"

ঐ একই সংখ্যায় ডাঃ বারোজের একটি প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত হয়েছিল :[৩]

২ "'The programme of the Religious Parliament'—says Dr. Barrows, 'has been elaborated with much care, and with the criticism of nearly a hundred experts in Science, Philosophy, Ethics and Divinity. It covers such general things as God, Man, Religion as the Expression of Man's Relation to God, systems of Religion, the Sacred Books of the World, the Universal Sense of Sin, the Incarnation Idea, different schemes for the restoration of fallen or faulty Man, the Religious leaders of Mankind, Religion in its Relations to Science, Art and letters, Religions and Morals, Religion and the family Religion, and Women. Religion and the Poor, the Erring and Criminal, Religion and Civil Society, the fraternity of Peoples, the religious Notion of the English-speaking Nations, the present outlook of Religion, the world's Religious debt to Asia, Europe and America, the Religious Reunion of Christiandom, the Religious Union of the whole Human family, the elements of a perfect Religion, the characteristic of the Ultimate Religion".

৩ "In the April number of the Review of Reviews (American edition) an explanatory article on the World's First Parliament of Religions, from the pen of Dr. John Henry Barrows, D.D., Chairman of the General Committee on Religious Congresses, appears. He writes :—Side by side with the meetings in the stately Art Palace of the Parliament, which opens on Monday, September 11th, and continues for seventeen days, there will be the presentation, by different religious bodies, of their history and distinctive doctrines, and more than twenty of the leading Churches of Christiandom have already accepted invitations to make before the Parliament these presentations . . . It is safe to say that no opportunity comparable with this has been offered in any generation. It is hard to overestimate the educating and the liberalising influence of such gatherings. Most people know of other Churches and Faiths only through the representations of their own Church and Faith. So soon as we begin to know other Faiths truly, that is, at first hand, we in some measure, modify our views of them, our spiritual attitudes towards them, and thus truth promotes brotherhood'".

"'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রিকায় (আমেরিকা সংস্করণ) ধর্মসভাগুলির সাধারণ সমিতির চেয়ারম্যান ডক্টর জন হেনরি বারোজ, ডি. ডি.-র লেখা জগতের প্রথম ধর্মমহাসভার একটি ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: মহাসভার প্রাসাদোপম 'আর্ট প্যালেস'-এ ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার থেকে সভাগুলির উদ্বোধন হবে এবং ১৭ দিন চলবে; সেখানে একই সঙ্গে পাশাপাশি অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে বিভিন্ন ধর্মসংস্থা কর্তৃক তাঁদের ইতিহাস ও বিশিষ্ট মতবাদগুলিও উপস্থাপিত করা হবে। ইতিমধ্যেই খৃষ্টান-জগতের প্রধান ধর্মসংস্থাগুলির মধ্যে কুড়িটিরও বেশী সংস্থা মহাসভায় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এটুকু নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় যে, এর আগে কোন যুগেই এর তুল্য সুযোগ আর কখনো আসেনি। শিক্ষা ও উদারতাসঞ্চারের দিক থেকে এ-ধরনের সমাবেশের প্রভাব যে কতখানি, তা আন্দাজে ধরা কঠিন। অপর সম্প্রদায় ও ধর্মমতগুলি সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকেরই জ্ঞান হল তাদের নিজের ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে যেভাবে দেখা যায়, তাদের নিজের যাজকসম্প্রদায় সেগুলিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেন, তারই মাধ্যমে আহৃত। অপর ধর্মমত সম্বন্ধে সঠিকভাবে, অর্থাৎ সেই সব ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে সোজাসুজি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে সব ধর্মমত সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেগুলির প্রতি আমাদের আধ্যাত্মিক মনোভাব কিছুটা পালটে যাবেই; আর এভাবে সে যথার্থ জ্ঞান ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়িয়ে তুলবে।"

ডাঃ বারোজ প্রথমশ্রেণীর সংগঠক তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যথার্থই কর্মবীর। ধর্মমহাসভা সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র ও রচনাদিতে তিনি কতখানি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, উপরে উদ্ধৃত অংশে তা যথেষ্ট দেখা যায়। ধর্মমহাসভার উপদেষ্টাসমিতির সদস্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারে নিকট প্রেরিত সার্কুলার চিঠিতে দেখতে পাই, ধর্মমহাসভায় যাতে সর্বধর্মের প্রতিনিধিত্ব যথার্থই ঘটে সে বিষয়ে ডাঃ বারোজ কতখানি সচেষ্ট ছিলেন। মিনিস্টারের ৩০ এপ্রিল, ১৮৯৩ সংখ্যায় ঐ সার্কুলার চিঠিটি ছাপা হয়েছিল:

৪ "The plan of holding a Parliament of Religions at which the representatives of the great historic Faiths shall sit together in frank and friendly conference over the great things of our common spiritual and moral life, is no longer a dream. The religious world in its great branches will be represented in this truly ecumenical conference. There will be Buddhist scholars, both from Japan and India, and probably also from Siam. One of the high priests of Shintoism is expected to be present. Two Moslem scholars, eminent in India, have accepted invitations. The eloquent Mazumdar will speak for progressive Hindusim. Arrangements are being made to secure papers from orthodox Hindus. The Chinese Government has commissioned a scholar to present the Confucianism. It is expected that Parsis from Bombay will speak of their ancient faith. Jewish Rabbis of Europe and America are in earnest sympathy with this movement. The interest in the Exposition and in this approaching Congress will draw to Chicago numerous representatives of the historic religions. Leading Christian missionaries and native Christians of many lands will be present, including some of the foremost men of India. Prominent scholars in America, England and Germany have already accepted invitations to address the parliament. We are encouraged to hope that the Russian, Armenian, and Bulgarian Churches will have representation in the Parliament".

"মহান ঐতিহাসিক ধর্মগুলির প্রতিনিধিরা বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে একসঙ্গে সভায় বসে আমাদের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের প্রধান জিনিসগুলি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করবেন,—এমন একটি ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এখন আর স্বপ্নের জিনিস নয়। এই যথার্থই সার্বজনিক সভায় ধর্মজগতের প্রধান প্রধান বিভাগের প্রতিনিধিরা আসবেন। জাপান ও ভারত থেকে, এবং বোধ হয় শ্যাম থেকেও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এখানে আসবেন। শিন্টো ধর্মের উচ্চপদস্থ পুরোহিতদেরও একজন আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। ভারতের দুজন বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। বাগ্মী মজুমদার প্রগতিশীল হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে বলবেন। নৈষ্ঠিক হিন্দু-দের কাছ থেকে লিখিত ভাষণ আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কনফিউসিয়ান ধর্ম সম্বন্ধে বলার জন্য চীন সরকার একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে বোম্বাই থেকে পার্শীরা এসে তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেবেন। ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদী রাব্বীদের (ব্যাখ্যাতা) আন্তরিক সহা-নুভূতি রয়েছে এই আন্দোলনটির প্রতি। প্রদর্শনীর এবং সামনের এই মহাসভার প্রতি আকর্ষণ ঐতিহাসিক ধর্মগুলির অসংখ্য প্রতি-নিধিকে চিকাগোয় নিয়ে আসবে। প্রসিদ্ধ খৃষ্টান মিশনারীরা এবং বহু অঞ্চলের দেশীয় খৃষ্টানরা এই সভায় উপস্থিত থাকবেন; ভারতের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজনও আছেন তার মধ্যে। আমেরিকা, ইউরোপ ও জার্মানীর বিশিষ্ট পণ্ডিতরা ইতিমধ্যেই মহাসভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আমরা আশান্বিত হচ্ছি যে, মহা-সভায় রাশিয়া, আমেরিকা এবং বুলগেরিয়ার খৃষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিও প্রতিনিধি পাঠাবেন।"

ডাঃ বারোজের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও পরিকল্প-নার সুষ্ঠুতা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম-পালকে লেখা এক চিঠিতে। মহাবোধির যে সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়:[৫]

"আশা করি শিগ্‌গীর আপনার কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাবো এবং তাতে জানতে পারবো কি-ধারায় আপনি ভাষণ দেবেন। সার্বভৌম বৌদ্ধধর্ম মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্বন্ধে, মানবজীবনের কর্তব্য এবং চরমপরিণতি সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয় তা জানবার জন্য আমাদের যতটা আগ্রহ, উত্তর-ও দক্ষিণ-অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মের মধ্যে পার্থক্য কি তা খুঁজে বের করার আগ্রহ ততটা নেই। আশা করি

৫ "I hope to hear from you soon and learn along what line you are to speak. It is not our desire so much to find out the distinctions between Northern and Southern Buddhism as to learn what universal Buddhism teaches of the great subjects of human life, duty and destiny. I hope there will be enough Buddhists present at the Parliament to justify the holding of a Buddhists Conference in one of the smaller hall of the Art Palace where you may meet those who desire amplier information on the subjects to be treated. I think it would be an excellent thing to have choice passages from the Buddhist Scriptures read in English at some of the morning Conferences. I hope you will call upon Mr. Mazumdar and confer with him as to the time of his coming. It would be very pleasant if all Indian Delegates could come from Liverpool to New York on the same Steamer. In that I should be very glad to meet them, give them a personal welcome, and also provide for a cordial reception for them in New York City."

মহাসভায় যথেষ্টসংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উপস্থিত থাকবেন যাঁদের নিয়ে আর্ট প্যালেসের ছোট ঘরগুলির কোনটিতে একটি বৌদ্ধধর্মসভার অনুষ্ঠান অসঙ্গত হবে না; বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃততর সংবাদ যাঁরা জানতে চান, ইচ্ছে করলে আপনি তাঁদের কাছে সে সভায় এসব বিষয় আলোচনা করতে পারেন। আমার মনে হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রের কয়েকটি বাছা বাছা উদ্ধৃতি ইংরেজী করে যদি পূর্বাহ্ণে অ কয়েকটি সভায় পাঠ করা হয়, তাহলে খুবই চমৎকার হবে। আশা করি মিঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আসার সময় সম্বন্ধে পরামর্শ করবেন। ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি সবাই একসঙ্গে লিভারপুল থেকে একই স্টীমারে নিউইয়র্ক আসতে পারেন, তাহলে খুবই সুখের বিষয় হবে। আমি তাহলে অতি আনন্দের সহিত স্টীমারে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যক্তিগত স্বাগত-সম্ভাষণ জানাতে পারি, নিউইয়র্ক শহরে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার আয়োজনও করতে পারি।"

বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা, তার দ্বারা বিশ্বশান্তির পথ পরিষ্কার করার বিষয়ে ডাঃ বারোজের ব্যাকুল আগ্রহ এই সময়ে বহুভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মিনিস্টারের ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সংখ্যায় সে বিষয়ে লেখা হয়:[৬]

"একখানি সমসাময়িক পত্রিকা লিখছে: 'আচার্যস্থানীয় ধর্মযাজক এবং চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রেসিডেণ্ট ডক্টর বারোজ আমাদের জানাচ্ছেন যে, আগামী ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য হল এইগুলি: তুলনামূলক ধর্মালোচনার ব্যবস্থা করা; বিভিন্ন ধর্মগুলিকে পরস্পরসন্নিহিত ও একত্র আলোচনারত করা; ভ্রাতৃত্ববোধের ভাবকে গভীরতর করা; প্রত্যেক ধর্মের বৈশিষ্ট্যমূলক সত্যকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করা; মানুষ কেন ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী তা দেখানো; খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যে, বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক জাতিগুলির মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের গহ্বর, তার ওপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করা; সব মানুষেরই যা সাধারণ উদ্দেশ্য, তা সফল করার জন্য সব সৎ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করানো, এবং আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের পথ প্রশস্ততর করা।"

(ক্রমশঃ)

৬ "An English contemporary writes: "Dr. Barrows, a Presbyterian divine, and the President of the Parliament of Religions at Chicago, tells us that the object of the coming Parliament of Religions is to furnish a great school of comparative religions; to bring the different faiths into contact and conference; to deepen the spirit of brotherhood; to bring out the distinctive truth of each religion; to show why men believe in God, and in the future life; to bridge the chasms between Christians and different names and religious names of all names; to induce good men to work together for common ends, and to promote the cause of international peace".

প্রথম পরিচয় উদ্বোধনের সঙ্গে

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

প্রথম পরিচয় চিরকালই অপূর্ব। আকাঙ্ক্ষিত মানুষ-দেশ-বই—যে যাই হোক না—সমুদ্র, হিমালয়, কোনো মহাশিলা মন্দির কোনারকের মত, মহৎ ব্যক্তি, সাধুসন্ন্যাসী—সবই একটা অপূর্ব বিস্ময় আনন্দময় স্মৃতি হয়ে থাকে চিরকাল।

যদিও কোন্ বইটি সব আগে পড়েছি, কোন্ গলাটি সব আগে শুনেছি, কাকে কবে দেখেছি শৈশবে, তা মনে থাকে না কারুরই।

কিন্তু কবে প্রথম উদ্বোধন খুলে কোন্ গলা খুঁজেছিলাম, তারিখ সাল মনে না থাকলেও সেই 'কবের' আনন্দটি মনে আছে।

বোধহয় আমাদের বাড়ীতেও উদ্বোধনের আবির্ভাব ১৩০৫ সালের মাঘমাসে। বাড়ীতে পাক্ষিক পত্র দেখেছি। আমাদের বয়স তখন ঠিক পাঁচ বছর। নিশ্চয় বর্ণপরিচয় হয়েছিল। হাতেখড়ি মেয়েদের না হলেও। সেকালে ছোটদের বিদ্যাসাগরী পাঠ্যপুস্তক বর্ণপরিচয় থেকে ১০।১১ বছর অবধি বোধোদয়, আখ্যান-মঞ্জরী অবধি পাঠ্যেই পড়াশোনা শেষ হত। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেই ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবই-এর সঙ্গে থাকত একটি করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, একখানি স্তবস্তুতিসমন্বিত শিশুবোধক। কখনো কখনো মহাভারতের কাশীরাম দাস সংস্করণ। আমরা পেয়েছিলাম কালী সিংহের মহাভারতের মাসিক সংস্করণ। কাশীরাম দাস তখন দেখিনি। পড়তে লিখতে শিখেছি কিন্তু তখন

এখনকার মত অনেক বই অসংখ্য মাসিক সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা সেকালে ছিল না। গোনাগাঁথা বঙ্কিমচন্দ্র, কয়েকখানি রবীন্দ্রনাথ, কিছু রমেশ দত্ত আমাদের পাঠ্য সম্বল বা সম্পদ। তাতেও কিঞ্চিৎ বিধিনিষেধ ছিল। তবে সাময়িক পত্র অনেক রকমের সেকালেও ছিল। সেই প্রবাসের রাজস্থানের বাড়ীতে সেগুলি কিছু নেওয়া হত। বঙ্গদর্শন, ভারতী, প্রচার, আর্যদর্পণ, জন্মভূমি, ধর্মতত্ত্ব, হিন্দু পত্রিকা, নব্যভারত ইত্যাদি তাদের কিছুর নাম। ও বইগুলো কবে থেকে ও কেন নেওয়া হয়েছে জানি না আমি। আসলে মনে হয় সেকালে প্রবাসী বাঙালীজীবনে মাতৃভাষার সান্নিধ্য দিয়েই তাঁরা দেশের অন্তরের সান্নিধ্য পেতেন।

কিন্তু উদ্বোধন প্রথম সংখ্যা থেকেই এলো কেন বাড়ীতে—দূর প্রবাসে—তা এখন মনে প্রশ্ন জাগে

মনে হয় ১৮৯১।৯২ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ভারত ভ্রমণ করছিলেন ছদ্ম নামে, সচ্চিদানন্দ ও বিবিদিষানন্দ নামের আড়ালে আত্মগোপন করে রাজস্থান আলো-য়ার উদয়পুর ইন্দোর আবু পাহাড় (যেখানে ক্ষেত্রীর দেওয়ান জগমোহনজীর সঙ্গে পরিচয়) ঘুরছিলেন, তখন গুজরাট কাথিয়া-ওয়াড় ও অন্য নানা স্থানের সঙ্গে জয়পুরেও আসেন। শোনা যায় মাস কয়েক থেকে এক পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জলদর্শন পড়েন।

তখনকার দিনে বাঙালী পথিক, পর্যটন-বিলাসী, তীর্থযাত্রী প্রায় সকলেই প্রবাসী

বাঙালীদের বাড়ীতে আতিথ্য নিতেন। জয়পুরে সে সময়েও কিছু বাঙালী ছিলেন। এক পিসিমার মুখে জিজ্ঞাসা করে কতকাল পরে এই গল্প শুনি—(স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময়ে)—তিনি তখন ৭।৮ বছরের বালিকা—বাইরের দালানে খেলা করছিলেন,—একজন সন্ন্যাসী এসে বললেন, 'খুকি, তোমার মাকে গিয়ে বল একজন অতিথি এসেছেন।'

সেই অশীতিপর পিসিমা এতকাল পরে বললেন সেই বিবেকানন্দ-দর্শনের কথা। এবং বললেন দিন-তিনচার সম্ভবতঃ স্বামীজী ঐ বাড়ীতে বাইরের চারচালা একখানি ঘরে ছিলেন। তখন মেয়েরা পর্দানশীন ছিলেন। গভীর রাত্রে তাঁর গানের সুর তাঁরা শুনেছেন। গানের কথা পিসিমা জননীর মুখে শুনেছেন "নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।" আরো হয়ত। পরেও শুনেছেন; ক্ষেত্রী ফেরত, আবার কোনো সময় অন্যত্র অতিথি, রাজ-অতিথি তখন।

এই সব ঘটনা ও কাহিনীর আশ্চর্য দিক হল এই যে, অত বড় একটি বিরাট আশ্চর্য মানুষের কথা আমাদের কাছে তখন বা পরেও কখনো পৌঁছয়নি। গুরুজনরা পিতা পিতামহ পিতামহী কেউই গল্প করেননি। মাত্র একবার একদিন পিতার কাছে স্বামীজীর কাছে শোনা একটি ভৌতিক কাহিনীর কথা শুনি। আর শতবার্ষিকীর সময়ে শুনেছি জিজ্ঞাসা করে মা এবং পিসিমার কাছে স্বামীজীর গানের কথা। সেকথা স্বামীজীর শতবার্ষিকী উদ্বোধনে একটু বলেছিলাম। যদিও জানবার ও বলবার মত কথা কত ছিল আরো, কেউ সংগ্রহ করে রাখেননি। কৌতূহলও ছিল না কি সেকালে মানুষের?

কিন্তু স্বামীজীর ১৮৯৩ সালে সেপ্টেম্বরে আমেরিকার শিকাগো ধর্ম্মমহাসভার ভাষণ বা বক্তৃতা প্রচারের পর তিনি আর স্বদেশে বা বিদেশে কোনখানেই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। যেন অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মেঘ ভেদ করে এই বীর সন্ন্যাসীর কীর্তির মহাসূর্যোদয় হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ীর পুরুষরা নিশ্চয় সে সব কথা পড়েছিলেন। বাড়ীর মেয়েরাও তখন কাগজে পড়তেন। গভীর লেখাও পড়তেন পরে বাড়ীতে দেখেছি। কিন্তু বিশেষ কোনো আলোচনা আমাদের কানে পৌঁছয়নি।

এই সময়ে পিতা ১৮৯৮-৯৯ সালে কিছু দিন কিষণগড় রাজ্যে একটি কাজ নিয়েছিলেন। এবং তখনই স্বামী কল্যাণানন্দজীও কিষণগড় রাজ্যে বেশ কিছুকাল ছিলেন শুনেছি। সেবারে কিষণগড়ে খুব দুর্ভিক্ষ হয়। মনে হয় তারি কোনো সেবাকর্মভার নিয়ে তিনি ছিলেন। পিতা খুব শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে, প্রভাবিতও হয়েছিলেন। পরে কাকার কাছে শুনেছি। আমি নিজে তখন বছর ছয় সাত বয়সের। পিতার সঙ্গে টাঙ্গায় চড়ে কোনো কোনো জায়গায় গিয়েছি। হয়ত স্বামী কল্যাণানন্দজীকেও কখনো দর্শন করে থাকব। তখন স্বামী বিবেকানন্দ জগদ্বিখ্যাত। কাশ্মীর পাঞ্জাব রাজস্থান আবার ভ্রমণ করছেন বিদেশিনী শিষ্যা বন্ধুদের নিয়ে। ক্ষেত্রীতেও জয়পুরেও এসেছিলেন বোধহয়।

সেই সময়ের একটি উক্তি পড়ি তাঁর জীবন-কথায় ইহা "অবস্থা পূজ্যতে রাজন্"—! ৯।১০ বছর আগের কৃচ্ছ্র সন্ন্যাসজীবন, ভিক্ষান্নে, অনাহারে, অর্ধাশনে ভ্রমণ ও পথচারণের কথা স্মরণে পরবর্তীকালের সমাদর ও সম্মানে

বলা। তারপরই ১৮৯৯ সালে জানুয়ারীতে, ১৩০৫ মাঘ মাসে উদ্বোধনের আবির্ভাব।

মনে জিজ্ঞাসা জাগে, বাড়ীতে কবে এলো? প্রথম সংখ্যা পড়ার ও মনে রাখার বয়স নয় আমার (কিন্তু বাঁধানো প্রথম বর্ষ যেন ছিল), মাত্র পাঁচ বছর বয়স। মোট কথা স্বামী বিবেকানন্দের অখ্যাত দিনের জয়পুরে আতিথ্য-গ্রহণের পরে পৃথিবীখ্যাত দিনের এবং স্বামী কল্যাণানন্দজীর সান্নিধ্যই হলো এই উদ্বোধনের জয়পুরে 'আগমনী' কথা। কিন্তু পড়ার গোড়ার কথা বলি। ধর্মপুস্তক পড়ার বয়স তো তখন নয়। গল্প শোনার বয়স। সেকালে সন্ধ্যাবেলা পিতামহীর কাছে অনেকে বেড়াতে আসতেন প্রায়-নিরক্ষর কিংবা সামান্য সাক্ষর মেয়েরা। তাঁরা ব'ড়ীতে পড়াশোনা করতেন কিনা জানি না। জয়পুরের বাঙালী শিক্ষিত পরিবারের মেয়েরা একটু পড়াশোনা জানে। কিন্তু গোবিন্দজীর গোঁসাই বাড়ীর মেয়েরা প্রায় নিরক্ষর। সব বসে গল্প করতেন। আমরা জড় হতাম গল্পের গন্ধে।

কানে এলো—"সেই এক গামলা জলেই নানা রং কাপড় চুবিয়ে তুলছে একজন কাপড়-রংওয়ালা (রং রেজ)। এবং লাল নীল সবুজ হলুদ এক জলেই সব রং হচ্ছে।" শ্রোত্রীরা সবিস্ময় হাসিমুখে ঐ রূপক গল্প শুনছেন। পিতামহী কি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, বলছেন কি 'কথামৃতে'র কথা? জানি না তা। শুধু শোনা হচ্ছে। কেমন করে রকম রকম রং হচ্ছে? সে প্রশ্ন কেউ করছে না। আমরাও নয়। গল্পে আবার কোথায় প্রশ্নোত্তরের স্থান। বোধ হয় শিশু আমরা আমাদের পুতুলের কাপড় রং করার কথা ভাবছিলাম। কি মজাই না হয় যদি আমরা ঐ রকম 'রং রেজ' পাই।

আবার তার পর এলো সেই আশ্চর্য জন্তুটার গল্প যাকে কেউ দেখেছে লাল রং, কেউ হলদে, কেউ সবুজ। কেউ তাকে ধরতে পারল না। সবাই তর্ক করে। কেউ বলে তুমি ভুল দেখেছ ওটা লাল।—অন্যজন বলে, না, নীল। তর্ক বাদ-বিতণ্ডা প্রমাণ করতে সবাই যায় গাছটার কাছে জন্তুটাকে দেখতে। আমরাও বাগানে গেলাম গিরগিটী মনে করে জন্তুটা খুঁজতে! যার রং বদলায়! জানতাম সে জন্তুটা আসলে কিন্তু কেউ দেখতে পায় না। ভাবি আরো কত গল্প ঐ কথামৃত ভাঁড়ারে আছে! এবার শিশুমনে প্রশ্ন এমন সব ভালো ভালো গল্প কোথায় কোন বইতে আছে? তখন ১৩০৬।৭। জয়পুরে ফিরে এসেছি আমরা। বইয়ের এবং গল্পের সন্ধানে ঠাকুমার ঘরেই সবাই ঢুকি। বই অনেক। কিন্তু সবই গুরুগম্ভীর বই। হিন্দু পত্রিকা। কালী সিংহের মহাভারত। মাসিক রাজস্থান বেরুতো তখন। পেলাম দেখতে 'উদ্বোধন'! কোন্ বছর তা মনে নেই। যা খুঁজছিলাম তা' পাওয়া গেল। গল্পের পর গল্প। উপমা-সমৃদ্ধ। কে এক শ্রী-ম লিখছেন! কে এক 'মাষ্টার' শুনছেন! আর কে একজন ঠাকুর বলছেন!

এবার এলো চমৎকার সহজবোধ্য গল্প একটা। স্পষ্ট। একজনের দোকান। দোকানী অসৎ, জুয়াচোর। তবু বিক্রি বেশ। কর্মচারীও অনেক কারণ দোকানীর গলায় মালা, কপালে তিলক, মুখে হরিনাম। লোকে বিশ্বাস করে। ভাবে ভক্ত। খদ্দের এসেছে। ভালমানুষ খদ্দের।

খদ্দের দেখে একজন বললে, 'কেশব কেশব।' (কে সব? কে সব?) ঠাকুর সহাস্যে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন।

আর একজন বললে উত্তরে, 'গোপাল! গোপাল!' (গো পাল। গো পাল। গরুর (পাল সব!)

বিক্রেতা বললে, হরি! হরি! হরি! (অর্থাৎ হরণ করি) তিলকমালাধারী কর্তা বললেন, 'হর। হর। হর।' (হরণ কর। হরণ কর) কোন্ সংখ্যা কবে পড়েছি বড় হয়ে না সেই বয়সে সব আর মনে নেই। বইতে, উদ্বোধনে, তাও মনে নেই।

শুধু মনে আছে উদ্বোধনের 'কথামৃত।' এবং কথামৃতের গল্প। যে-গল্প ছোটবড় শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিত মূর্খ শিশু নারী বৃদ্ধ সকলকে সমান মুগ্ধ করেছে। করে। হয়তো চির-কাল করবে। অন্ততঃ আমাদের তো করেছিল।

তারপর এ 'কথামৃত' অন্য পত্রিকায়ও বেরিয়েছে (প্রদীপ?)। 'কথামৃত' বই হয়ে বেরিয়েছে। সেও বার্তাতে দেখেছি পরে। তৃতীয় খণ্ড অবধি। (এবং কথামৃতকার 'শ্রী ম' যে মাতামহীর ভগিনীপতি তাও জেনেছি।) ঐ উদ্বোধনেই একটু বড় হয়ে ১০।১১ বছর বয়সে পড়লাম 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। 'ভাববার কথা', অন্য লেখাও। লেখার রস বুঝি আর না বুঝি মনে যে কি ছাপ পড়ে গেল সেই আশ্চর্য ভাষার। দেশবিদেশের চিত্রের। 'হাঙ্গর শিকারের'। চিত্রধর্মী বর্ণাঢ্য লেখা। কবে উদ্বোধনের পাক্ষিক রূপ বদলে মাসিক আকার হয়েছে মনে নেই। বই বাড়ীতে বাঁধাতে দেওয়ার ভার ছিল আমাদের বালিকা দুই বোনের উপর। বিজ্ঞাপনের পাতা ও মলাট ছিঁড়ে মাস সাজিয়ে সূচীপত্র সাজিয়ে সুতো বেঁধে হিন্দুস্থানী দপ্তরীকে গুছিয়ে সাজিয়ে দিতে হ'ত। পিতা দেখিয়ে শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন। পড়ার নেশায় সে সময়েও আবার পড়তে চোখ নিবিষ্ট হত।

একবারকার 'উদ্বোধনে' একটি লেখার কথা আজও মনে আছে। সেটি কোন্ বছর তা মনে নেই। সেটিতে একটি বিতর্ক হয়েছিল একটি গান নিয়ে।—গানটি হ'ল, "হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা। পড়ল বিপথে সখি মালতীর মালা।" (বৈষ্ণব কবিতা) এই লেখা নিয়ে একটু আলোচনা হয় দু সংখ্যায়, তিন সংখ্যায়। উদ্বোধনের মত পত্রিকায় ওই ধরনের লেখা প্রকাশ ঠিক কিনা এই নিয়ে। নিষ্পত্তি কি হয়েছিল মনে নেই।

এখন 'চতুর্থ পুরুষ' চলেছে। পিতামহ পিতা ভাইদের কারু কারুর লোকান্তরের পর। বাঁধানো 'উদ্বোধন', কেশবসেনের 'ধর্মতত্ত্ব', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী', নানা ধরনের পুরাতন বই—বঙ্গদর্শন 'প্রদীপ' 'ভারতী' আর সে বাড়ীর আলমারীতে নেই। আর ছিল দু তিন তাক ভরা সারি সারি 'প্রবুদ্ধ ভারত' বাঁধানো হয়ত প্রথম বর্ষ থেকে। নামটি তখন পড়তে পারতাম। ভিতরে প্রবেশ করার মত বয়সও নয়, বিদ্যাও অর্জিত হয়নি। লুব্ধ চোখে ভেবেছি কখনো পরে যদি পড়তে পারি। এবারে বহুদিন পরে গিয়ে দেখলাম নেই। সেগুলিও নেই।

কোথায় গেল? শুধু নেই? নশ্বর আমাদের মানুষের মতই নেই? আরো গম্ভীর গম্ভীর সহজ হালকা ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত বইও ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সাময়িক পত্র। 'ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট' কার সম্পাদনা জানি না। নেই। তারাও কোথাও নেই। আসলে তাদের সমাদর আর নেই!—তাই নেই! সবাই আজও শুধু হয়ত আমার একলার সশ্রদ্ধ স্মৃতির মধ্যেই রয়ে গেছে। মানুষের সবই বুঝি মনে—শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যেই বেঁচে থাকে! বস্তুতে নয়।

তাই মানুষ স্মৃতিকেই আবার ধরে রাখতে চায় শোনানোর পথে। এই আমার প্রথম পড়া চেনা উদ্বোধনের স্মৃতি যাতে কিষণগড় জয়পুর কলকাতা জড়িয়ে আছে তার স্তরে স্তরে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, কৌতূহল, আনন্দময় প্রশান্ত স্পর্শ নিয়ে। যেন বিশ্বদেবের মহাপ্রসাদ। এবং এর সবচেয়ে আশ্চর্য কথা যে আজ 'উদ্বোধনে'র কথা উদ্বোধনকেই নিবেদন করে দিতে পারলাম।

শিলা-মন্দির [প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

সুদূর অতীতযুগে সভ্যতার প্রসন্ন প্রত্যুষে,
ঋষিকণ্ঠ যেই দিন উচ্চারিল নির্মেঘ আকাশে—
অনাদৃত মহামন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয় মানব-মহিমা,
"অমৃতের পুত্র তুমি, ভালে তব আলোর গরিমা।
পরম জীবন-সত্যে নিত্য তব আছে অধিকার,
অক্ষয় প্রকাশ আছে চিরন্তন বিদেহ-আত্মার।
কিবা ভয়? ঐ হের অপসৃত মৃত্যুর কালিমা,
অনন্ত জীবন-পথ, মিথ্যা কভু না টানিও সীমা!"

সেই কালে, সেই যুগে অভিনব আছে ইতিহাস,
হিমশীর্ষ, হিমগিরি যেথা দেব শিবের প্রকাশ,
স্তব্ধ বায়ু, স্তব্ধ স্থির—নিথর আকাশ।
সেই স্থানে একদিন মহাধ্যানে ছিল নিমগন,
পবিত্র কুমারী কন্যা, সুদর্শনা, অতি অনুপম।
বিশ্বপতি ভোলানাথ, সর্বকালে দেবের বাঞ্ছিত—
তাহারে লভিবে বালা, নিজ পতিরূপে, ছিল আকাঙ্ক্ষিত।
আর কিছু ছিল না কামনা। অন্তর বাহির—
মহামৌন নিসর্গের ধ্যান সুগম্ভীর—
করি আহরণ, অগ্নিশিখা সম স্থির
ছিল সমাহিত। কালে তুষ্ট ভকত-শরণ,
নীলকণ্ঠ, মহাদেব দিল তারে দিব্য দরশন।
কহিল আশ্বাস-বাণী, নিত্য ধ্রুব শাশ্বত-বচন;

"এ গিরি-শিখর ছাড়ি, হে কন্যা কুমারি,
যাও তুমি দক্ষিণ-প্রদেশে, ভারতের শেষে,
যেথা তিন সাগরের বারি এক সাথে মেশে—
দূর চক্রবাল রেখা ছুঁয়ে ঐ নিঃসীম আকাশে।
সেথাকার অন্তরীপে, শান্তদ্বীপে, অনুচ্চশিখরে—
কর ধ্যান, কর আরাধনা, কর ধৈর্যে কঠোর সাধনা।
যথাকালে পাবে সিদ্ধি, অন্তরের পূরিবে কামনা,

আমারে লভিবে পতি—মনে কোন সন্দেহ রেখো না।"
তারপর কত যুগ, মন্বন্তর অতিক্রান্ত হল,
উদয় লগ্নের দিন, অস্তাচল-সায়াহ্নে মিশাল।
মানুষ লভিল কত নব জন্ম, নব জন্মান্তর,
উত্থান-পতন-চিহ্নে হের ঐ এল কালান্তর
বিঘোষিল নবযুগে নিপীড়িত জীবন-কামনা,
লক্ষকোটি মানুষের গূঢ়তম অন্তর-বেদনা।

দুঃখ দৈন্য প্রতিঘাতে ভারতেরও বুকে—
এল বিভীষিকা, কুশিক্ষার শত মসীরেখা।
এল ব্যাধি, অবিশ্বাস, জীর্ণ মরীচিকা।
ধর্মহীন, শক্তিহীন, স্তব্ধবাক্, শ্রান্ত, অসহায়,
সুপ্তিমগ্ন যেন এক বিড়ম্বিত প্রাণী মহাকায়।—
নির্বাপিত-প্রায় শীর্ণ, দগ্ধ দীপশিখা,
রূপ নিল ধূসরিত, ভাগ্যহত ভারত-মৃত্তিকা।

এরই মাঝে একদিন অকস্মাৎ বিগত শতকে—
হৃদিবান্ মহাযোগী ধ্যানমন্ত্রে স্মরিল তোমাকে!
এল তব পাদদেশে, ভাবাবেশে তীব্র ব্যথা বুকে,
বিলুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ঘোর তমো হেরি চতুর্দিকে।
প্রাণে তাঁর দুঃখ, ক্ষোভ, প্রচণ্ড বেদনা,
তুচ্ছ মান, তুচ্ছ জ্ঞান—অতি তুচ্ছ মুক্তির বাসনা।
মানব-কল্যাণ তরে, প্রাণ তাঁর কাঁদে অনিবার,
ভারতের নবজন্ম, পূর্ণ জাগরণ—একমাত্র কামনা তাঁহার।
অদূরের শিলাখণ্ড ঊর্ধ্বমুখে তুলি নগ্নশির,
নিশিদিন মহানীলে মহামৌনে যেথা রহে স্থির—
মহাঋষি সেই স্থানে ধ্যানাসন করিল গ্রহণ,
সঞ্জীব কল্যাণ-মন্ত্র লভিবে জীবনে, অথবা মরণ।
কঠোর সঙ্কল্প এই, এই তার একক স্বপন।
তোমার আশিস ছিল, হে কুমারী, করি অনুমান,
মুহূর্তে গভীর ধ্যান মন্ত্র-অর্থ করিল প্রদান।
মুহূর্তে স্পন্দিত আলো, দিব্য উন্মাদনা,

নিষ্কলুষ প্রাণে তাঁর আনি দিল বিশুদ্ধ চেতনা।
উঠিল ঝঙ্কার এক অন্তহীন, প্রশান্ত আকাশে,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গশীর্ষে জলসিক্ত অশান্ত বাতাসে।
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?"
এই মহামন্ত্র আর অমৃতের এই শুভবাণী,
উচ্ছ্বসিল অকস্মাৎ, এ কালের নব বেদধ্বনি ;
উচ্চকিত, সবিস্ময় সর্বংসহা শুনিল ধরণী।
জীবে প্রেম করে যেই জন, অনুক্ষণ—
দেব-সেবা করে সেইজন, শুধু সেই জন।
তন্ত্র, মন্ত্র, পূজা-আয়োজন—বৃথা আকিঞ্চন,
নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম—এই শুধু অপার্থিব ধন ···
সমগ্র পৃথিবী ক্রমে অভিনব সে-বার্তা শুনিল,
গভীর মননে তার মর্ম-অর্থ আপনি লভিল
'বিবেক-আনন্দ শিলা'—প্রস্তরের অঙ্গে লিখি দিল।
জানাইল প্রাণের আকূতি, সশ্রদ্ধ প্রণতি,
গাহিল প্রভাতী গান, সামছন্দ মঙ্গল আরতি।
তীর্থমান দিল ঐ পুণ্যস্মৃতি ধূসর-প্রস্তরে,
ধ্যানমগ্ন হে কুমারি, শ্বেতশুভ্র তোমার মূর্তিরে।
তারপর আজ দেখি,—দীর্ঘ, অর্ধ শতাব্দীর পরে
প্রতিষ্ঠা করিল তার তৃণহীন অনুচ্চশিখরে—
পূর্ণমূর্তি স্বামীজীর অপরূপ স্মৃতি-নিদর্শন।
বিচিত্র মন্দির-গৃহে, অপূর্ব শোভন।
প্রীতির লাবণ্যে ভরা অকপট ভক্তি-নিবেদন,
শ্রদ্ধায়-মণ্ডিতরূপ, সর্বভাবে সার্থক সৃজন।
গাহিল বন্দনাগীতি এককণ্ঠে লক্ষ নরনারী,
অর্ঘ্যথালি নিবেদিল ভাবাবেগে হৃদয়-উৎসারি।
ধন্য তুমি, হে মনীষি, মহাঋষি অক্ষয়-জীবন,
শাশ্বত তোমার প্রেম, কালজয়ী তোমার সাধন।
ভারত-সমুদ্র বুকে অনির্বাণ তুমি দীপশিখা;
তব হস্তে ধৃত স্থির দ্যুতিময় কালের বর্তিকা।

'একৈবাহং জগত্যত্র'

স্বামী জীবানন্দ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিত্রে (তৃতীয় চরিত্রে) শুম্ভ-নিশুম্ভবধের বিস্তৃত কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। এই চরিত্রে আমরা দেখি আদ্যাশক্তি দেবী চণ্ডিকা বিভিন্ন মূর্তি ধারণ ক'রে অচিন্ত্য অলৌকিক অত্যাশ্চর্য লীলা করেছেন। একই মহাশক্তির নানা মূর্তিতে অসুরসংহার!

অতি প্রাচীন কালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুটি অতি বলগর্বিত ভয়ঙ্কর অসুর দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য হরণ করেছিল; দেবতাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত করেছিল। দেবতারা তখন দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের উপায় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁদের স্মৃতিতে উদিত হ'ল শ্রীশ্রীজগজ্জননীর অপার মাহাত্ম্য।

মহিষাসুরবধের পর দেবতাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে আদ্যাশক্তি মহাদেবী বর দিয়েছিলেন, 'বিপৎকালে যখনই তোমরা আমাকে স্মরণ করবে, আমি তোমাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার ক'রব, তোমাদের সমস্ত বিপদ নাশ ক'রব।'

আবার নিদারুণ সঙ্কট উপস্থিত! তাই গিরিরাজ হিমালয়ের নিভৃত স্থানে সমবেত হয়ে দেবগণ বৈষ্ণবী শক্তি মহাদেবীকে অতি ভক্তিভরে স্তব করতে লাগলেন। দেবতারা যে স্তব করেছিলেন, সেটি শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিখ্যাত 'অপরাজিতাস্তব' বা তন্ত্রমতে সর্বফলপ্রদ দেবী-সূক্ত:

"নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম
তাম্॥" ইত্যাদি

দেবতারা যখন এইভাবে স্তবরত, তখন দেবী পার্বতী জাহ্নবীজলে স্নান করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা এখানে কার স্তব করছেন?' যিনি অন্তর্যামিণী তিনি যেন কিছুই জানেন না, এমনিভাবে প্রশ্ন করলেন! এই সময় এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘ'টল। তখন সেই দেবীর শরীর-কোষ থেকে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হয়ে বললেন, 'নিশুম্ভাসুর কর্তৃক পরাজিত এবং শুম্ভাসুর কর্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হয়ে আমারই স্তব করছেন।'

পার্বতীদেবীর দেহ-কোষ থেকে অম্বিকা উৎপন্না হয়েছেন ব'লে ত্রিজগতে তিনি 'কৌশিকী' নামে অভিহিতা।

শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যদ্বয় তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট ক'রে বর লাভ করেছিল— তারা দেব দানব ও মানব সকল পুরুষের অবধ্য হবে। তাই দুর্ধর্ষ অসুরভ্রাতৃদ্বয়ের বধের জন্য অযোনিজা কৌশিকী দেবীর আবির্ভাব!

কৌশিকী দেবীর নির্গমনের পরই পার্বতী-দেবী কৃষ্ণবর্ণা হলেন এবং হিমালয়ে অধিষ্ঠান ক'রে 'কালিকা' নামে প্রসিদ্ধা হলেন।

অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড ও মুণ্ড অতি মনোহরমূর্তিধারিণী অম্বিকা অর্থাৎ কৌশিকী দেবীকে দেখে শুম্ভের কাছে ছুটে এসে সংবাদ দিল—'মহারাজ! পরমাসুন্দরী এক রমণী হিমাচল আলোকিত ক'রে অবস্থান করছেন।'

অসুররাজ শুম্ভ চণ্ড-মুণ্ডের মুখে দেবীর অনুপম রূপের বর্ণনা শুনে ও তাদের দ্বারা

উৎসাহিত হয়ে মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট দূতরূপে পাঠালেন।

সুগ্রীব উদ্ধত দৈত্যরাজ শুম্ভের কথা দেবীকে নিবেদন ক'রল: 'হে দেবি! এই সংসারে আপনাকে স্ত্রীরত্ন ব'লে মনে করি। ত্রিলোকের সমস্ত রত্ন আমাদের অধিকারে। অতএব আপনি আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবিক্রম নিশুম্ভকে পতিরূপে গ্রহণ করুন।'

দূতের কথা শুনে ভগবতী দুর্গা গম্ভীর হয়ে গেলেন ও মনে মনে হাসতে লাগলেন। এ বলে কি!

সুগ্রীবকে বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ। শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তার মতন শক্তিশালী। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা তোমায় বলছি, শোন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে
যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে
স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥" ৫।১২০

'যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হবেন।'

দেবী আরও বললেন, 'অতএব শুম্ভ বা নিশুম্ভ এখানে আসুক এবং আমাকে পরাস্ত ক'রে আমার পাণিগ্রহণ করুক। বিলম্বে আর কি প্রয়োজন?'

শুম্ভের দূত দেবীকে অনেক বোঝালো যে এরকম করা ঠিক হবে না, আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করলেও আমার পরামর্শ অনুসারে শুম্ভনিশুম্ভের নিকট গমন করুন; কেশাকর্ষণে অপমানিতা হবেন না—"কেশাকর্ষণনির্ধৃত-গৌরবা মা গমিষ্যসি।"

দেবী বললেন: শুম্ভ বলবান্ এবং নিশুম্ভও অতিবীর্যবান্ সত্যিই। কিন্তু কি ক'রব বল আমি? আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি। তুমি শুম্ভের কাছে ফিরে যাও। আমি যা যা তোমাকে বললাম, সব কথা ভাল ক'রে তাকে বল। সে যা সমুচিত বিবেচনা করে, তাই করুক।'

অম্বিকাদেবীর কথা শুনে দূত ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্যরাজের কাছে গিয়ে দেবীর কথা নিবেদন ক'রল। শুম্ভ তখন ভীষণ রেগে গিয়ে দৈত্য-সেনাপতি ধূম্রলোচনকে সৈন্যপরিবৃত হয়ে দেবীকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা ক'রে নিয়ে আসতে আদেশ দিল। ব'লল, এ কাজে যদি কেউ বাধা দেয়, সে দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব যেই হোক না কেন, তাকে নিহত করবে।

ধূম্রলোচন আদেশ পেয়ে ষাট হাজার অসুর সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেল। ধূম্রলোচন দেবীর অভিমুখে ধাবিত হওয়ামাত্র অম্বিকাদেবী হুঙ্কারের দ্বারাই তাকে ভস্মীভূত করলেন। ধূম্রলোচনের অনুচরবর্গের সঙ্গে তখন ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। দেবীর বাহন সিংহ মহোৎসাহে অল্প সময়ের মধ্যেই দৈত্যসৈন্যদের ধ্বংস ক'রে ফেললো।

সসৈন্য ধূম্রলোচনের নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে দৈত্যেশ্বর শুম্ভ মহাবলশালী চণ্ড মুণ্ড নামে দুটি মহাসুরকে আদেশ দিল দেবীকে ধরে আনতে।

সসৈন্য চণ্ড-মুণ্ড হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল—একটি বিরাট হিমাদ্রিশিখরে কাঞ্চনবর্ণা দেবী দিব্য প্রভায় চতুর্দিক উজ্জ্বল ক'রে বাহন সিংহের উপরে সমাসীনা। দেখা-মাত্র তারা দেবীর নিকট ছুটে গেল তাঁকে ধরতে। দেবী ভীষণ ক্রুদ্ধা হলেন। ক্রোধে তাঁর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন দেবীর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ থেকে খড়্গধারিণী পাশহস্তা

করালবদনা কালী নির্গতা হলেন ; তিনি—

"বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥"

চ, ৭।৭,৮

সেই কালী বিচিত্রনরকঙ্কালধারিণী, নৃমুণ্ড-মালিনী। তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। অস্থি-চর্মমাত্রদেহা, অতি ভীষণা, ভয়প্রদা তিনি। তাঁর বিশাল বদন, লোলজিহ্বা, চক্ষু কোটর-গত। তিনি বিকট শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করছেন। তিনি দেবী চামুণ্ডা। শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে তাঁর পূজা হয়। সেই দেবী কালী চতুরঙ্গ অসুরসৈন্য সব গ্রাস ক'রে ফেললেন। তার-পর চণ্ডাসুরের চুলের মুঠি ধ'রে খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। চণ্ডকে নিহত দেখে মুণ্ডও দেবীর দিকে ধাবিত হ'ল। দেবী সক্রোধে তাকেও খড়্গাঘাতে ধরাশায়ী করলেন।

কালী চণ্ডমুণ্ডের মাথাদুটি নিয়ে চণ্ডিকার কাছে এসে প্রচণ্ড অট্টহাস্য ক'রে বললেন, 'এই যুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশু চণ্ডমুণ্ডের মস্তকদ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করবেন।'

কালী কর্তৃক আনীত মহাসুর চণ্ডমুণ্ডের মাথাদুটি দেখে কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী তাঁকে মধুরবাক্যে বললেন :

হে দেবি! আপনি চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক দুটি আমার নিকট এনেছেন ব'লে জগতে আপনি "চামুণ্ডা" নামে বিখ্যাত হবেন।'

চণ্ড মুণ্ড এবং বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় দৈত্য-রাজ শুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলো। অসংখ্য অসুরসৈন্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধার্থে চ'ললো। অসুররা মিলিত হয়ে চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও সিংহকে ঘিরে ফেললো।

এই সময়ে অসুরদের বিনাশ ও দেবগণের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, ইন্দ্র, কার্তিকেয়াদি দেবগণের শক্তিসমূহ তাঁদের শরীর থেকে বহির্গত হয়ে দেবাদির অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণ ক'রে চণ্ডিকার সমীপে উপস্থিত হলেন। যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁর শক্তিও সেইরূপ আকৃতি, ভূষণ ও বাহন নিয়ে অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণীর হস্তে জপমালা ও কমণ্ডলু ; তিনি হংসযুক্ত বিমানে সমাসীনা। মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী বৃষভবাহনা, ত্রিশূল-ধারিণী ; তাঁর ললাটে অর্ধচন্দ্র সুশোভিত, হস্তে তক্ষক ও অনন্ত নাগ বলয়রূপে ভূষিত। কার্তিকেয়ের শক্তি কৌমারী ময়ূরবাহনা। বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী গরুড়বাহনা ; তাঁর চারি-হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা শার্ঙ্গধনু। বারাহী শক্তি হচ্ছেন যজ্ঞস্থলে বরাহমূর্তিধারণকারী বিষ্ণুর শক্তি। নারসিংহী হলেন বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহদেবের শক্তি। ঐন্দ্রীর হস্তে বজ্র, বাহন ঐরাবত ; তিনি সহস্রনয়না।

তখন মহাদেব সেই সকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে চণ্ডিকাকে বললেন—'আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এঁদের সহযোগে আপনি শীঘ্র অসুরদের বিনাশ করুন।' অনন্তর চণ্ডিকা দেবীর শরীর থেকে অতিভীষণা মহাশক্তি আবির্ভূতা হলেন। সেই দেবী মহাদেবকে বললেন, 'ভগবন্! আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট বার্তাবহরূপে গমন করুন এবং তাদের বলুন—পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করবেন, দেবগণ পূর্বের মতো যজ্ঞাহুতি গ্রহণ করতে থাকবেন। তোমরা

অসুররা যদি বাঁচতে চাও পাতালে যাও; আর যদি যুদ্ধ করতে চাও তবে এস; আমার শৃগালীরা তোমাদের মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হোক।'

সাক্ষাৎ শিবকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন ব'লে এই জগতে এই দেবী 'শিবদূতী' নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। মহাদেব-কথিত বাক্য শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে অসুররা দেবীর নিকট গেল এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রল। তখন কালী অনায়াসে তাদের বাণ ও অস্ত্রাদি নিজের বাণদ্বারা ছেদন করলেন। কালী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, বারাহী, নারসিংহী, শিবদূতী মহাসমরে মহাবীর্য প্রকাশ ক'রে অসংখ্য অসুর নিপাত করলেন।

এর পর রক্তবীজ ভীষণ সংগ্রাম ক'রে নিহত হয়। রক্তবীজ-বধের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা হয়েছিল। ভূমিতে পতিত রক্তবীজের রক্ত থেকে শত শত সহস্র সহস্র তার মতো যোদ্ধা উৎপন্ন হ'তে লাগলো। তখন দেবী চামুণ্ডা রক্তবীজের ও তাদের রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই খেয়ে ফেলতে লাগলেন। তখন নিরক্ত রক্তবীজ চণ্ডিকা কর্তৃক নিহত হ'ল। রক্তবীজবধের পর নিশুম্ভ যুদ্ধ করতে এল। সেও ভীষণ যুদ্ধে নিহত হল। দেবীর বাহন সিংহও বহু অসুর নাশ ক'রল।

প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা মহাসুর নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যবল বিনষ্টপ্রায় দেখে শুম্ভ ক্রোধভরে ব'লল:

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাঽতিমানিনী" ॥

চ, ১০।৩

'বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গে! তুমি গর্ব ক'রো না। কারণ অতি গর্বিতা তুমি অন্যান্য দেবীর বল আশ্রয় করেই যুদ্ধ ক'রছ।'

চণ্ডিকাদেবী বললেন:

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।"

চ, ১০।৫

'একা আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি অদ্বিতীয়া। আমি ছাড়া আমার সহায়ভূতা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী প্রমুখ এই সব দেবী আমারই অভিন্না শক্তি—আমারই বিভূতি। আমি আর আমার শক্তি অভেদ, কোন পার্থক্য নেই। এই দ্যাখ্, আমার শক্তিসমূহ আমাতেই বিলীনা হচ্ছেন।'

অনন্তর চণ্ডিকার সমস্ত শক্তি অর্থাৎ যুদ্ধরতা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা—এই অষ্টমাতৃকা দেবীর শরীরে বিলীন হলেন, কারণ তাঁরা আদ্যাশক্তি থেকে অভিন্না।

"ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসাৎ তদাম্বিকা ॥"

চ, ১০।৬

দেবী বলিলেন: 'এই যুদ্ধে আমার মায়া দ্বারা আমার শক্তিপ্রভাবে আমি যে-সকল মূর্তিতে অবস্থান করছিলাম, সবই আমার ভেতরে গুটিয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী আমিই রইলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও। এস, এইবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।'

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো
ভব ॥" চ, ১০।৭

এইবার আদ্যাশক্তি মহামায়া দেবী চণ্ডিকা সমস্ত দেবতা ও অসুরগণের সমক্ষে দৈত্যরাজ শুম্ভাসুরের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর দেবী তার বুকে শূল বিঁধে

তাকে ভূপাতিত করলেন।

দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হ'লে নিখিল বিশ্ব অত্যন্ত প্রসন্ন ও সুস্থ হ'ল এবং আকাশও নির্মল হ'ল।

"ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥"
চ, ১০।২৮

মা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম নিয়ত চলেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, অহংকার, অভিমান, কামনা, বাসনা, হিংসা এসবই তো অসুর! এরা প্রবল হলেই মহা অনর্থ ঘটতে থাকে। এ সব মহাসুর নিপাত না গেলে মাতৃকৃপা লাভ হয় না, মহামায়া ভগবতীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারা যায় না। কাম-ক্রোধ-লোভের প্রতীক বলা যেতে পারে ধূম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ডকে। রক্তবীজ তো মরেও মরে না! এ হ'ল কামনা-বাসনার প্রতীক। কামনা-বাসনারও শেষ নেই। একটি কামনা পূরণ হতে না হতেই তার স্থলে একশটি এমনকি হাজারটি কামনা এসে জোটে। এই কামনা-বাসনাই রক্তবীজ। নির্বাসনা হ'তে পারলেই জ্ঞানলাভ হয়। বাসনাতেই বদ্ধ করে। নির্বাসনা মুক্তি আনে। কামনা-বাসনা নির্মূল হ'লে তবেই মাতৃদর্শন। অহংকার-অভিমানের প্রতীক হচ্ছে শুম্ভ-নিশুম্ভ। অহংকার শেষ পর্যন্ত থাকে। অহংকার গেলেই জগজ্জননী স্ব-রূপ প্রকটিত করেন। সবই মহামায়ার—আদ্যাশক্তির লীলা। তিনিই বদ্ধ ক'রে রেখেছেন, তিনিই আবার মুক্তি প্রদান করছেন। বন্ধন আর বিমুক্তি সবই মায়ের হাতে। তাঁর শরণাগত হ'তে পারলে তিনি আমাদের ভিতরকার সব অসুরকেই নিধন করবেন। চাই শরণাগতি! ঐকান্তিকী ভক্তি!! চাই মহামায়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাস!!!

'একৈবাহং জগত্যত্র' মহামায়ার এই মহাবাণীর মর্ম অনুধাবন ক'রে সাধক সর্বত্র মাতৃসত্তা, এমনকি অণু-পরমাণুতেও তাঁরই অস্তিত্ব অনুভব করেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, এই উপলব্ধি হচ্ছে মাতৃসাধনার চরম পরিণতি। জয় মা! জয় মা!! জয় মহাশক্তিময়ী মা!!!

"ওঁ শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

আমার মায়েরে তুমি ব'লে দাও আমি ডাকি তাঁরে,
এই শরতের দিনে মাকে মনে পড়ে বারে বারে।
শ্রাবণ ভাদ্রের দিন চ'লে গেল কান্নার আবেশে,
এক যুগ অন্ধকার কে যেন দিয়েছে ঢেলে দেশে।

উঠলে আশ্বিনে চাঁদ এ-আঁধার জানি যাবে নাকো,
মা এলে বলতে হ'বে,—'আঁধারে তোমার হাত রাখো,-
তবেই আঁধার যাবে :' মার স্পর্শে জানি সব যায়;
হৃদয়ের মৃগমদ মা এসেই চৌদিকে ছড়ায়।

তিমিরান্ত দিন চেয়ে তাই তো মায়েরে শুধু ডাকি,
মায়ের স্নেহের উৎসে কান পেতে শুধু ব'সে থাকি।

তারকার জন্ম ও মৃত্যু

শিবদাস

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের দূর, সুদূর প্রদেশে একটির পর একটি নতুন নতুন আবিষ্কার করে চলেছেন। যেমন 'কোয়াসার' (quasar), পালসার (pulsar), 'মুমূর্ষু তারকা' (collapsing star) ইত্যাদি। এসব তথ্যের ভিত্তিতে জ্যোতির্বিদদের বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে যা আধুনিক ধারণা, তার সবগুলিকে একটা সংহতিসূত্রে গেঁথে দেওয়া হল এখানে।

সৃষ্টিনাট্যের রঙ্গমঞ্চ : মহাশূন্য

'স্পেস' বা দেশ বলতে যা বুঝি আমরা, এ যাবৎ তার যতদূর পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি গিয়ে পেঁৗছেছে তারই বিস্তার যে কি বিপুল, সৃষ্টিনাট্যের রঙ্গমঞ্চের পরিসর যে কতখানি ধারণাতীত, আমরা সর্বাগ্রে তা বোঝার একটু চেষ্টা করবো।

মনে করা যাক আমরা বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছি, আর কোথাও এক মুহূর্তও না থেমে সমানে এগিয়ে চলেছি আলো যে বেগে ছোটে সেই বেগে, অর্থাৎ সেকেণ্ডে আমরা ২,৯৯,৩০৮ কিলোমিটার (১,৮৬,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম করছি। পথে প্রথমে পাবো চাঁদকে। চাঁদে পেঁৗছুতে কতক্ষণ লাগলো? মাত্র ১.৩ সেকেণ্ড! সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি এবং তারও পরের গ্রহগুলি ছাড়িয়ে সৌরজগতের বাইরে গিয়ে পেঁৗছলাম পাঁচ ঘণ্টা পরে। আরো এগিয়ে চলেছি, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছরও কেটে যাচ্ছে কিন্তু পথে আর কিছুই পড়ছে না। মহাশূন্য। চার বছর এভাবে সমানে এগিয়ে চলার পর গিয়ে পেঁৗছব আমাদের সবচেয়ে কাছে যে তারকাটি আছে, সেখানে। আমাদের সূর্যও একটি তারকা। এমনি কোটি কোটি তারকা নিয়ে তারকার এক একটি ঝাঁক আছে, যার নাম ছায়াপথ (galaxy)। আমাদের সূর্য যে ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত সেটি হল দশ হাজার কোটি তারকার একটি ঝাঁক। আমরা তো সবে এর একটি তারকা (সূর্য) থেকে আর একটি তারকায় এলাম এতক্ষণে। সেখান থেকে এই ছায়াপথের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন মহাশূন্যে চলতে চলতে গড়ে প্রতি পাঁচ বছর পর পথে একটি করে তারকা ছাড়িয়ে যাবো। আর আমাদের এই ছায়াপথ ছেড়ে বেরুতে পারবো ৮০ হাজার বছর পর।

তা হলেই বা, এতক্ষণ তো আমরা আমাদের পাড়াতেই ছিলাম বলা চলে, যেখানে সূর্য বা সৌরজগৎ আমাদের বাড়ী, অপর তারকাগুলিও যেন এই পাড়ারই এক-একটি বাড়ী, আর সমগ্র ছায়াপথটি একটি পাড়া। পাড়া বেড়াবার সময় মিনিটে এক কোটি আশি লক্ষ কিলোমিটার (এক কোটি বার লক্ষ মাইল) বেগে চললেও তবু তো আমরা পাঁচ বছর অন্তর পথে একটা করে তারকা পাচ্ছিলাম। একে মহাশূন্য বললে চলবে কেন? আসল মহাশূন্যে পড়বো আমরা আমাদের এই পাড়া,

---

* Reader's Digest, August, 1970-তে প্রকাশিত Ira Wolfert-লিখিত 'New Visions of the Universe' প্রবন্ধটি অবলম্বনে এবং 'An Approach to Modern Physics' (Andrade) গ্রন্থ হইতে পারমাণবিক তথ্য লইয়া রচিত।

আমাদের ছায়াপথ 'মিল্‌কি ওয়ে' ছাড়িয়ে যাবার পর। বিশ লক্ষ বছর সমান বেগে এগিয়ে চলার পর আমরা অপর পাড়ায়, আমাদের ছায়াপথের পরবর্তী ছায়াপথ 'এ্যাণ্ড্রোমেডা'য় পৌঁছব। এই পাড়িকে অবশ্য মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে আসা বলতে পারেন।

এখন বলছেন বটে, কিন্তু পরে আর হয়তো একেও মহাশূন্য বলবেন না। ছায়াপথগুলির কয়েকটি একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকে। আমাদের দলে আছে ১৭টি ছায়াপথ। এই সতেরোটি ছায়াপথ, সতেরোটি পাড়া নিয়ে মহাশূন্যে যেন আমাদের গ্রাম। আমরা তো সবে এই গ্রামের এক পাড়া থেকে অপর পাড়ায় এলাম। সমান বেগে চলে যখন আমরা আমাদের দলের সব ছায়াপথগুলিকে, আমাদের গ্রামকে ছেড়ে বের হব, তখন অবশ্যই বলতে পারেন আমরা আসল মহাশূন্যে এসে পড়েছি। সে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে অপর গ্রামে, বৃহত্তর ছায়াপথের দল 'হারকিউলিস'-এ গিয়ে পৌঁছতে পারব ৩০ কোটি বছর পরে!

এই হারকিউলিস হল দশ হাজার ছায়াপথ নিয়ে গড়া একটি দল, যার প্রত্যেক ছায়াপথে আছে কোটি কোটি তারকা। বিশ্বের যতটুকুর খবর আমরা রাখি তার ভেতরই আছে অন্তত: এক হাজার কোটি ছায়াপথ। এখন একবার মনে মনে হিসেব করে নিতে পারেন, আমাদের জানা বিশ্বেরই শেষপ্রান্তে পৌঁছতে কতদিন লাগবে, যদি আলোর বেগে চলার শক্তি এবং কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকার পরমায়ু আদৌ কখনো পাই আমরা। তাছাড়া এখানেই তো আর শেষ নয়, এর পরও তো আছে! কতদূর আছে? কেউ জানে না। বলতে পারেন মহাশূন্য অনন্তবিস্তৃত; ওটা তো শব্দ মাত্র, যার সঠিক ধারণাই হয় না।

সৃষ্টিনাট্যের প্রথম অঙ্ক:
ধূলি-মেঘ; হাইড্রোজেন-পরমাণু সৃষ্টি

এতক্ষণ আমরা বিশ্বের বাইরের বিস্তারের দিকে ছুটছিলাম, এবার বিশ্বসৃষ্টির আলোচনা-প্রসঙ্গে তার অন্তরের দিকে চাইতে হবে একটু। এতক্ষণ সত্যের সন্ধানে ফিরছিলাম বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর বিস্তার পার হয়ে, এখন যেতে হবে অণুপ্রমাণ থেকেও ক্ষুদ্রতর পরিসরের ভেতর দিয়ে।

এখন পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে তো বিশ্ব বলতে সপরিবার তারকাদের জন্মানো, বিভিন্নভাবে দলবদ্ধ হয়ে থাকা, পরিবর্তিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, পুনর্জন্ম বা নবকলেবর লাভ প্রভৃতি ঘটনাসমন্বিত মহাশূন্যকেই বোঝায়। মহাশূন্যে এই সব ঘটনা ক্রমান্বয়ে ঘটেই চলেছে। তাই বিশ্ব-সৃষ্টির প্রসঙ্গ আমরা আরম্ভ করছি একটা তারকার জন্ম দিয়ে,—জন্মপ্রক্রিয়ার সেই অংশ থেকে যখন তারকাটির দেহের উপাদান-গুলি তার দেহগঠনের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সে উপাদানগুলি কি? এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, সেগুলি পরমাণু-চূর্ণ—পরমাণু-ভাঙা ধূলিকণা। ধূলিকণাগুলি মহাশূন্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে—স্ফুলিঙ্গের মতো চতুর্দিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।[১] এই ধূলিমেঘে থেকেই বিশ্বের তারকা, সূর্য, পৃথিবী, পৃথিবীর বহুবিচিত্র পদার্থ, আপনার আমার সকল প্রাণীর জটিল দেহযন্ত্র প্রভৃতি সব কিছুরই জন্ম। আবার একসময়

---

১ দুটি তারকার মধ্যবর্তী মহাশূন্যে প্রতি ঘন সেন্টি-মিটারে একটি ক'রে পরমাণু রয়েছে। আমরা যে বাতাসের মধ্যে আছি, তাতে এই হার প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে পাঁচ লক্ষ কোটি কোটি।

এ সবই পরিণত হবে এই ধূলিতেই! ইচ্ছে করলে মহাশূন্যকে লক্ষ্য করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সবাই গাইতে পারে, 'তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার, তোমার ধূলিতে পুনঃ মিশাবে আবার'; তাতে কোন বৈজ্ঞানিকই 'কল্পনাবিলাসী' ব'লে তাদের উপহাস করবেন না। এ ধূলিকণাগুলি মহাশূন্যে কোথা থেকে এল, এগুলির জন্ম কি থেকে, বিজ্ঞানীরা আজও তা জানেন না।

এই ধূলিকণার ভেতর কতকগুলির নাম 'প্রোটন', কতকগুলির নান 'ইলেকট্রণ'।[২] প্রোটনগুলি ধন-বিদ্যুৎযুক্ত, ইলেকট্রণগুলি ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন। দুটি বিপরীতবিদ্যুৎযুক্ত বস্তু কাছাকাছি হলে পরস্পরকে কাছে টানতে চায়, আর সমবিদ্যুৎসম্পন্ন হলে পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তাই একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণকণা কাছাকাছি হলে পরস্পরকে কাছে টানে, আর খুব কাছাকাছি হলে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয়ে যায় তাদের জীবন—ইলেকট্রণকণাটি প্রোটনকণার চারদিকে প্রচণ্ড-বেগে ঘুরতে থাকে, যথেচ্ছ ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা তার আর থাকে না। মিলে তারা একটি কণার সৃষ্টি করে—অর্থাৎ প্রোটনকে ঘিরে যতটা স্থান জুড়ে ইলেকট্রণটি ঘোরে, সেই সবজায়গাটাই, ইলেকট্রণের গতি-পথরূপ জালতিঘেরা মাহাশূন্যের সেই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অংশশটাই একটি কণার মতো ব্যবহার করে। সেই কণার নাম পরমাণু। মাত্র একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণ দিয়ে গড়া এই যে পরমাণুটির সৃষ্টি হল, এটি বিশ্বের সবচেয়ে হালকা মৌলিক পদার্থের, হাইড্রোজেনের পরমাণু। হাইড্রোজেনের পরমাণুসৃষ্টিই হল বিশ্বের পরমাণুসৃষ্টির প্রথম ধাপ। অন্য ভাষায়, বিশ্বের মৌলিক পদার্থসৃষ্টির প্রথম ধাপ (পরমাণু শুধু মৌলিক পদার্থেরই হয়)।

বাকী পরমাণুগুলির সৃষ্টি হয় তারকার গর্ভে বলা যায়, এই পরমাণুসৃষ্টির জন্যই তারকার জন্ম। জন্মের পর তারকাটি তার গর্ভের তাপ ও চাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই হাই-ড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীণে (কেন্দ্রস্থ কণা বা কণাগুলির সমষ্টির নাম কেন্দ্রীণ) একটি একটি করে প্রোটন-কণা জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে নতুন নতুন পরমাণু সৃষ্টি করতে থাকে। এই পরমাণু সৃষ্টির ইতিহাসই তারকার জীবনেতিহাস। সেটি সৃষ্টিনাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক।

সৃষ্টিনাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক:
তারকার জন্ম ও জীবন

মহাশূন্যে ভাসমান হাইড্রোজেন-পরমাণুপুঞ্জ পাতলা কুয়াশার আকারে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে কোন সময় এরকম আরো অনেকগুলি পুঞ্জের কাছাকাছি হয়ে, তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে হাইড্রোজেন-বাষ্পের মেঘ সৃষ্টি করে। যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন-পরমাণু যদি এভাবে মিলিত হয়, তাহলে পরস্পরের প্রতি মাধ্যাকর্ষণের মিলিত শক্তিতে সেগুলি একসঙ্গেই থেকে যায়; মাধ্যা-কর্ষণশক্তিই একত্র বেঁধে রাখে তাদের, দল ছেড়ে কাউকে পালাতে দেয় না। তখন বলা যায়, তারকাসৃষ্টির কাজ শুরু হল। মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে এইরকম আরো বহু মেঘের সঙ্গে জুড়ে যখন তার পরিসর হয়ে দাঁড়ায় ষোললক্ষ কোটি কিলোমিটার (দশলক্ষ কোটি মাইল—আমাদের সৌরজগতের ব্যাসের প্রায় তিন হাজার গুণ), তখন তার মাধ্যা-

২ পজিট্রণ, মেসন প্রভৃতি আরো কয়েকটি কণার সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু সৃষ্টির উপাদান প্রধানতঃ ইলেকট্রণ ও প্রোটন।

কর্ষণশক্তি এত বেশী হয়ে ওঠে যে, তা হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলিকে জোর করে কেন্দ্রের দিকে টেনে আনতে শুরু করে। ফলে পরমাণুগুলি ক্রমশঃ ঘনসন্নিবিষ্ট হয়, মেঘের আকার ছোট হয়ে আসতে থাকে।

তখন তারকাসৃষ্টির নতুন অধ্যায় শুরু হয়। পরমাণুগুলির ক্রমবর্ধমান ঘনসন্নিবেশজনিত চাপের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি যত বেশী ঘনসন্নিবিষ্ট হতে থাকে, মেঘের আকার তত ছোট হতে এবং তাপ ও চাপ তত বাড়তে থাকে। এভাবে কেন্দ্রের তাপ যখন ৫০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ওঠে (ফুটন্ত জলের তাপ ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড), তখন সেখানকার হাইড্রোজেন-পরমাণুগুলি তাণ্ডবনৃত্য শুরু করে দেয়; এতে তারা পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে ধাক্কা খেতে থাকে যে সেগুলি ভেঙে যায়—বহুলাংশে আবার সেই পরমাণু-চূর্ণে, ইলেকট্রণ আর প্রোটনে পরিণত হয়। মেঘটি এখন হাইড্রোজেন পরমাণু, ইলেকট্রণ ও প্রোটনকণার সমষ্টি হয়ে ওঠে। পদার্থের এই অবস্থার নাম 'প্লাজমা'[৩]—দুটি বিপরীতবিদ্যুৎযুক্ত পরমাণু-চূর্ণ-গ্যাসের মিশ্রিত অবস্থা। কেন্দ্রের কাছে প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু করে কণাগুলি—ইলেকট্রণ কণাগুলি পরস্পর থেকে দূরে যেতে চায়, প্রোটন কণাগুলিও তাই (সমবিদ্যুৎসমন্বিত কণাগুলি পরস্পরকে দূরে রাখতে চায়), কিন্তু প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণশক্তির হাত ছাড়িয়ে আগের মতো যেখানে খুশি চলে যেতে পারে না, কেন্দ্রের কাছে হুটোপুটি করাই সার হয়। এই হুটোপুটি চলে প্রায় এককোটি বছর ধরে। ইতিমধ্যে মেঘের ব্যাস ক'মে ক'মে দাঁড়িয়েছে ষোল লক্ষ কিলোমিটারে (দশলক্ষ মাইল), আর কেন্দ্রের তাপ বাড়তে বাড়তে উঠেছে এককোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। তখন সেখানে বেধে যায় অতি বিরাট আকারের তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধ (Thermonuclear War)—প্রতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা ফেটে চললে যা হয়, তাই। প্রোটনগুলি পরস্পরের সঙ্গে এত জোরে ধাক্কা খায় যে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। এভাবে চারটে প্রোটন জোড়া লেগে হিলিয়ামের কেন্দ্রীণ সৃষ্টি করে।[৪] কেন্দ্রীণের দানাগুলি এভাবে জোড়া

৩ পদার্থের চতুর্থ অবস্থা; প্রথম তিন অবস্থায়, কঠিন জলীয় ও বাষ্পীয় অবস্থায় পদার্থের অণু বা পরমাণুগুলি সবই অ-চূর্ণ অবস্থায় থাকে।

৪ হিলিয়ামের পরমাণুর কেন্দ্রে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন জোড়া থাকে, আর তার চারপাশে ঘোরে দুটি ইলেকট্রণ। নিউট্রণগুলিকে বলা যায় বিদ্যুৎহীন প্রোটন; একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন জোড়া লাগালেই নিউট্রণ হয়, আবার নিউট্রণ থেকে একটি ইলেকট্রণ বের করে নিলে প্রোটন হয়ে যায়। ইলেকট্রণ আর প্রোটন পরস্পর বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ-সম্পন্ন বলে দুটি জোড়া লাগলে কণাটি বিদ্যুৎহীন হয়। সব পদার্থই বিদ্যুৎ-ভরা; কোন পদার্থে ধনবিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের পরিমাণ সমান থাকলেই সেটিকে বিদ্যুৎহীন (neutral) বলা হয়, আর দুটির মধ্যে একটি বেশী থাকলে সেই বিদ্যুৎসম্পন্ন বলা হয়। নিউট্রণের ওজন প্রোটনের সমানই, সামান্য বেশী। ইলেকট্রণকণার ওজন প্রোটনকণার ওজনের ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র। মোটামুটিভাবে বস্তুর ওজন হিসেব করার সময় ইলেকট্রনের ওজন তাই বাদ দিলেও চলে।

কোন পরমাণুর কেন্দ্রীণের চারপাশে কতগুলি ইলেকট্রণ ঘুরবে, তা নির্ভর করে কেন্দ্রীণে ক'টি প্রোটন আছে তার ওপর, নিউট্রনের সংখ্যার ওপর নয়। পরমাণুর কেন্দ্রীণে যতগুলি প্রোটন থাকে তার চারপাশে ততগুলি ইলেকট্রণ ঘোরে (পরমাণুটির বিদ্যুৎসাম্য এতে রক্ষিত হয়)। কেন্দ্রীণে একটি করে প্রোটনের সংখ্যা বাড়লে এক-একটি করে নতুন নতুন পরমাণু, নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হয়। সেগুলির গুণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়, ওজনও স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে বেড়ে যায়। কেন্দ্রীণে সংলগ্ন নিউট্রণগুলি এই ওজন আরও বাড়িয়ে দেয়। নিউট্রণ শুধু ওজনই বাড়ায়, পদার্থের মৌলিক গুণ নয়। কেন্দ্রীণে ১ থেকে ৯২ পর্যন্ত সংখ্যার প্রোটনযুক্ত ৯২ টি মৌলিক পদার্থ আছে আমাদের পৃথিবীতে (আরো কয়েকটিকে নিয়ে এই সংখ্যা বর্তমানে ১০৩)। প্রথমটি হাইড্রোজেন, দ্বিতীয়টি হিলিয়াম, ৯২তমটি ইউরেনিয়াম।

লাগার সময় বিপুল শক্তির স্ফুরণ হয়। (হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে ঠিক এই ঘটনাই ঘটানো হয়; তবে আজ পর্যন্ত মানুষ যে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করেছে, তার বিস্ফোরণে মোট-উৎপন্ন হিলিয়ামের কেন্দ্রীণের ওজন কিলোগ্রামের মধ্যেই সীমিত, আর এখানে তারকার গর্ভে তা তৈরী হয়ে চলে সেকেণ্ডে ছাপান্ন কোটি চল্লিশলক্ষ টন হারে!)

এই কেন্দ্রীণ জোড়া লাগাবার কাজ যখন শুরু হল, বলা চলে তখনই একটি তারকা জন্ম নিল—মেঘটি তারকার রূপ নিল। কারণ তখন মেঘটির কেন্দ্রের এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-জনিত শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঠেলা দেয়, আর বাইরে থেকে ভেতরের দিকে তার সমপরিমাণ চাপ দেয় মেঘটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। ফলে এই দুটি বিপরীতমুখী চাপের সমতা রক্ষা হয় এবং মেঘট স্থায়ী বর্তুলাকার—তারকার (বা সূর্যের) যে আকার, সেই আকার ধারণ করে। আমাদের সূর্যটি তারকাজীবনের এই অবস্থাতেই, প্রায় সদ্যোজাত বা বাল্য অবস্থাতে আছে এখন।, তার ভেতর সারাক্ষণ চলেছে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ জুড়ে জুড়ে হিলিয়ামের কেন্দ্রীণ তৈরীর কাজ। সূর্যের ব্যাস এখন ষোল লক্ষ কিলোমিটার (দশলক্ষ মাইল)। তারকার গড়-পড়তা মাপই এই রকম।

তারকা কিন্তু চিরদিন এই অবস্থায় থাকে না। বহু, বহু যুগ এ অবস্থায় থাকার পর তার কেন্দ্রে যখন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ প্রায় ফুরিয়ে যায়, জোড়া লেগে লেগে প্রায় সবটাই হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে রূপান্তরিত হয়, তখন কেন্দ্রের বিস্ফোরণ থেমে যায়। এতদিন এই বিস্ফোরণজনিত বহির্মুখী চাপই কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণশক্তির চাপকে ঠেলে রেখে সমতা রক্ষা করছিল, তারকাটির আয়তন কমতে দিচ্ছিল না। এখন বিস্ফোরণ থেমে যাওয়ার ফলে সে চাপও আর না থাকায় মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবার আগের মতো তারকাটিকে চেপে চেপে তার আয়তন ছোট করে দিতে থাকে। আর তার ফলে কেন্দ্রের দিকে অতি প্রচণ্ড, প্রায় দশকোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ সৃষ্ট হয়। আর সেই তাপে হিলিয়ামের ভারী কেন্দ্রীণগুলিও (হাইড্রোজেনের চেয়ে চারগুণ বেশী ভারী) পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে আরো ভারী, হাইড্রোজেনের চেয়ে বারোগুণ বেশী ভারী আর একটি মৌলিক পদার্থের, কার্বণের,[৫] কেন্দ্রীণ তৈরী করতে শুরু করে।

এর পর তারকাটির ভাগ্য নির্ভর করে তার আকারের ওপর। তারকাটি যদি বৃহদায়তন হয় এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি দিয়ে নিজেকে আরো ছোট করতে করতে কেন্দ্রের তাপমাত্রা ধাপে ধাপে আরো বাড়িয়ে যেতে পারে, তাহলে তার ভেতর সেই সব ক্রমোচ্চ তাপমাত্রায় পূর্বোক্তভাবে কেন্দ্রীণ জোড়া লেগে লেগে আরো ভারী ভারী নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্ট হতে থাকে। তারকাটি যদি এত বৃহদায়তন হয় যে তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের ফলে তার কেন্দ্রের তাপমাত্রা ত্রিশকোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ওঠে তাহলে তার কেন্দ্রস্থ কার্বণের কেন্দ্রীণগুলি জোড়া লেগে আরো ভারী ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রীণ সৃষ্ট হয়। তারকাটি খুব বড় হলে এভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে আরো ভারী, আরো ভারী কেন্দ্রীণ, এমন কি আমাদের পৃথিবীতে যতগুলি মৌলিক পদার্থ

---

৫ কার্বণ-পরমাণুর কেন্দ্রে ৬টি প্রোটণ ও ৬টি নিউট্রণ থাকে।

আছে তার সবগুলিরই কেন্দ্রীণ তৈরী হতে পারে।

সৃষ্টিনাট্যের তৃতীয় অঙ্ক : তারকার মৃত্যু ; তারকার দেহাবশেষ থেকে গ্রহ-সৃষ্টি

কোন অতি বৃহৎ তারকার গর্ভে লোহার কেন্দ্রীণ* গড়ে ওঠার পর তার বিস্ফোরণশক্তির বহির্মুখী চাপ স্তিমিত হতে থাকে; আর বর্ধিত মাধ্যাকর্ষণশক্তি খুব চেপে তারকাটির আয়তন খুব বেশীমাত্রায় কমাতে থাকে। শেষে এই চাপের চোটে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে, তারকাটি তাতে ভেঙে যায়—তারকাটির মৃত্যু হয়। তারকাটি এতদিন ধরে তার ভেতর যে সব মৌলিক পদার্থের পরমাণু তৈরী করেছিল, এই বিস্ফোরণের ফলে সেগুলি চতুর্দিকে ক্রমবিস্তৃত আয়তনে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে সেগুলি আবার মেঘের আকার নেয়; তবে এ মেঘ প্রাথমিক ধূলিমেঘের মতো কেবল ইলেকট্রণ-প্রোটন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সমষ্টি নয়—এ মেঘে আগের তারকাটি যতগুলি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করেছিল সেগুলিও থাকে।

তারকার মৃত্যু এভাবে একটি তারকার ভেঙে ছড়িয়ে পড়া প্রথম লক্ষ্য করেন চীনের একজন জ্যোতির্বিদ, ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে। তারকাটির সেই মেঘাকার দেহাবশেষ এখনো মহাশূন্যে রয়েছে। সেটির নাম 'কর্কট নেবুলা' (Crab nebula)। এটির আয়তন সেকেণ্ডে ১,৬০০ কিলোমিটার (১,০০০ মাইল) করে বেড়ে চলেছে। অনন্তবিস্তৃত মহাশূন্যে এ বাড়ার হার অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

* লোহার পরমাণুর কেন্দ্রীণে ২৬টি প্রোটন ও ৩০টি নিউট্রণ থাকে; ওজন হাইড্রোজেনের চেয়ে ৫৬ গুণ বেশী।

সৃষ্টিনাট্যের প্রথম অঙ্কে আমরা দেখেছিলাম রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ-আবির্ভূত ইলেকট্রণ ও প্রোটন কণা, আর হাইড্রোজেন পরমাণু। এরও আগের ইতিহাস আমাদের এখনো জানা নেই বলেই সৃষ্টিনাট্যে একেই প্রথম অঙ্ক বলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখে এলাম, ইলেকট্রণ, প্রোটন ও হাইড্রোজেন-পরমাণু—এই উপাদান নিয়ে একটি তারকা নিজ অভ্যন্তরের চাপ ও তাপ বাড়িয়ে বাড়িয়ে তৈরী করে রেখে গেছে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি। সৃষ্টির ব্যাপারে এই পরমাণু-গড়ার কাজটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ।[৭] তারপর এই পরমাণুগুলি নিয়ে এটার সঙ্গে ওটা মিলিয়ে নানাভাবে নানাসংখ্যায় জুড়ে, আমাদের গ্রহ-উপগ্রহাদিতে যে-সব যৌগিক পদার্থ আমরা দেখি সেগুলি সৃষ্টির কাজ অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এগুলি সবই পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন। এতে পরমাণু গড়ার মতো অতো চাপ বা তাপ প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের বহু পরিবর্তন তো আমরা চোখের সামনে নিত্যই ঘটতে দেখি—লোহা মরচে হয়ে যাচ্ছে, কাঠ পুড়ে ধোঁয়া, অঙ্গার, ছাই হয়ে যাচ্ছে, আমরা যা খাচ্ছি দেহযন্ত্র তা দিয়ে আমাদের রক্ত মাংস ইত্যাদি গড়ছে, আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন টেনে নিচ্ছি আর দেহযন্ত্র তাতে কার্বণ জুড়ে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড তৈরী করে প্রশ্বাসের সঙ্গে বের করে দিচ্ছে; এমনি কতো।

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি ৪৫০ কোটি বছর আগে হয়েছে বলে

৭ ইলেকট্রণ-প্রোটনগুলি কিভাবে তৈরী হয় সেটা বিজ্ঞানীদের এখনো জানা নেই ব'লে সে কাজ, বা তারও আগের কাজ পরমাণু গড়ার চেয়ে কঠিন না সহজ, তাও জানা নেই। তবে যা দেখা যাচ্ছে তাতে একথাই মনে হয় সে-সব কাজ অধিকতর কঠিনই হবে, কারণ তা পদার্থের ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অবস্থার ব্যাপার।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এদের জন্ম একটি মৃত তারকার দেহাবশেষ-মেঘ থেকে হয়েছে বলে অনেকের অনুমান; সে মেঘে আমাদের পৃথিবী যে ৯২টি মৌলিক উপাদানের সমবায়ে গঠিত, তার সবগুলিরই পরমাণু তারকাটি গড়ে রেখে গিয়েছিল। সেগুলিই জুড়ে জুড়ে ক্রমে পৃথিবীর সবকিছুর, জটিল জীবদেহেরও রূপ নিয়েছে।[৮]

তারকার নবকলেবর :
শ্বেত বামন ও নিউট্রণ-তারকা

একটি তারকার মৃত্যু এবং তার দেহাবশেষ থেকে গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মের, তারকাটির পরজন্মের এই হল ইতিহাস। তারকাটি যদি খুব বেশী বড় আয়তনের হয়, তাহলে মৃত্যু-কালে বিস্ফোরণের সময় তার দেহের সবটাই এভাবে পরমাণু-মেঘ (নেবুলা) হয়ে যায় না; বাইরের অংশটা তাই হয়ে যায় বটে, তবে কেন্দ্রের কাছাকাছি অংশটা বর্তুলাকারে থেকেই যায়, আর ক্রমান্বয়ে আকারে ছোট হতে থাকে; তার ঘনত্ব, তাপ আর ঔজ্জ্বল্য বাড়তেই থাকে। ছোট হতে হতে তার আয়তন যখন আমাদের এই পৃথিবীর মতো হয় (ব্যাস আট হাজার মাইল), তখন তাকে বলা হয় 'শ্বেত বামন' (White dwarf)। এই শ্বেতবামনের দেহের ঘনত্ব এত বেশী যে, এর এক চামচা বস্তুর ওজন একটনেরও বেশী।

আবার অনেক ক্ষেত্রে তারকাটির ক্রমশঃ ছোট ও ঘন হওয়া এখানেও থামে না—আরো ছোট হয়ে মাত্র ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটারে (৯½ থেকে ১৯ মাইলে) এসে দাঁড়ায়! তখন এর এক চামচা বস্তুর ওজন হয় একশো কোটি টন! এর নাম 'নিউট্রণ তারকা' (neutron star)। তারকাটি এর চেয়ে আর ছোট হতে পারে না।

কেন পারে না? আর কেনই বা তার ওজন এত অবিশ্বাস্য রকমে বেড়ে যায়?

আমরা আগেই দেখেছি, সৃষ্টিতে যা কিছু জড়বস্তু আছে, তা সবই ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণ কণা দিয়ে তৈরী; আসলে ইলেকট্রণ আর প্রোটন দিয়েই তৈরী, কারণ একটি ইলেকট্রণ ও একটি প্রোটন কণা জোড়া লেগেই নিউট্রণ কণা হয়।[৯] পরমাণুর ভেতরটা আর একবার দেখি আমরা। কেন্দ্রে যখন এক বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্রণ কণা জোড়া লেগে থাকে, আর তার অনেকখানি দূর দিয়ে কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন আছে তার সমসংখ্যক ইলেকট্রণ কণা ঘুরতে থাকে, তখন ঐ ইলেক-ট্রণ কণা বা কণাগুলির গতিপথ বা গতিবেগ দিয়ে ঘেরা মহাশূন্যের অংশটুকুকেই বলা হয় পরমাণু। পরমাণু আমাদের কাছে নীরেট কণার মতোই মনে হয়, ব্যবহারিক দিক থেকে। কিন্তু আসলে তার ভেতরটা সবই প্রায় ফাঁকা। কতটা ফাঁকা, তার একটা মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারি;—পরমাণুর কেন্দ্রে যে কণাগুলি দানা বেঁধে থাকে, তা যদি একটা মটরদানার আকারের হয়, তাহলে তার দেড়শো ফুট দূর দিয়ে ইলেক-

৮ আমাদের সৌরজগৎ থেকে নিকটতম তারকায় যেতে লাগে চার বছর, আলোর বেগে যেতে পারলে; আর একটি কাছের তারকায় যাওয়া যায় ছয় বছরে; সেটিতে দুটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর কোন তারকার সৌরজগতের মতো গ্রহ আছে কি না এখনো জানা যায় নাই; জানা কঠিনও, কারণ তুলনায় গ্রহগুলি এত ছোট যে, বহু দূরের তারকায় গ্রহ থাকলেও রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়েও সেগুলিকে ধরা কঠিন।

একটি প্রোটন কণার ব্যাসার্ধ ১.৪×১০^{-১৩} সেন্টি-মিটার; ওজন ১.৬৭২৫×১০^{-২৪} গ্রাম। একটি ইলেকট্রণ কণার ব্যাসার্ধ ও ওজন যথাক্রমে এর ১৮৫০ ভাগের একভাগ। একটি নিউট্রণ কণার ওজন ১.৬৭৪৮×১০^{-২৪} গ্রাম।

ট্রণগুলো ঘুরে বেড়াবে, ; আর আমাদের মনে হবে ৩০০ ফুট ব্যাসের পরমাণুটি একটি নিশ্ছিদ্র গোলক। তার মানে ৩০০ ফুট ব্যাসের যে গোলকটিকে আমাদের নীরেট বলে মনে হয়, তার ভেতর 'বস্তু' জায়গা জুড়ে থাকে একটি মটরদানা যতটুকু, ততটুকু মাত্র, বাকী সবটাই ফাঁকা (মোটামুটি হিসেবে ইলেকট্রণ-গুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, কারণ সেগুলো তো প্রোটনের ১৮৫০ ভাগের একভাগ মাত্র)। এমনি কয়েকটা পরমাণু যখন জোড়া লেগে কোন পদার্থের অণু তৈরী করে, তখন সেগুলি জোড়া লাগে বাইরের ইলেকট্রণের গণ্ডীর সীমায়—পরমাণুর ইলেকট্রণগুলো যেন হাত ধরাধরি করে, ভেতরের ফাঁক যেমন ছিল তেমনি থেকে যায়। বহু, বহুসংখ্যক অণু একত্র হলে তবে কোন পদার্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।[১০] এই অণুগুলির মাঝখানেও আবার ফাঁক থাকে ; পদার্থের কঠিন অবস্থায় এ ফাঁক কম, তরল অবস্থায় তার চেয়ে বেশী, বায়বীয় অবস্থায় আরো বেশী। তাই বায়বীয় অবস্থা থেকে কোন পদার্থ তরল অবস্থায় এলে তার আয়তন কমে, কঠিন হলে আরো কমে ; কিন্তু ওজন একই রকম থাকে। কারণ কোন পদার্থের ওজন তো নির্ভর করে তার ভেতরকার 'বস্তু'র —ইলেকট্রণ, প্রোটন ও নিউট্রণ কণার— ওজনের ওপর ; আর এগুলোর সংখ্যা তো থাকে সব অবস্থাতেই এক। এখন, কোন রকমে যদি কোন কঠিন পদার্থের সব ইলেকট্রণ প্রোটন নিউট্রণগুলোকে ঠেলে নিয়ে একত্র জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে পদার্থটির ওজন একই থাকবে. কিন্তু তার আয়তন যাবে বিপুল পরিমাণে ক'মে ; কারণ পদার্থের 'বস্তু'গুলির, কণাগুলির মাঝখানকার ফাঁক আর কিছুই তখন থাকবে না। ৩০০ ফুট ব্যাসের একটি নীরেট লোহার গোলক তখন হয়ে যাবে একটা ছোট মটরদানার আকারের, অথচ ওজন তার থাকবে আগের মতোই—বত্রিশ লক্ষ টন![১১] ঐ মটরদানার আকারের 'বস্তু'ই ছড়িয়ে থাকে ৩০০ ফুট ব্যাসের গোলকটি জুড়ে আর আমাদের মনে হয় ঐ ৩০০ ফুট ব্যাসের গোলকটি নিশ্ছিদ্র 'বস্তু'তে, নীরেট কঠিন লোহায় ভরা।

পদার্থটিকে আর ছোট করা যায় না, কারণ তার ভেতর আর ফাঁক থাকে না। আর, তার ভেতরকার সব কণাগুলিই তখন নিউট্রণ কণা ; কারণ, যে কোন পদার্থে ইলেকট্রণ ও প্রোটন কণার সংখ্যা সমান থাকে ব'লে ইলেকট্রণ ও প্রোটনগুলি একত্র জুড়ে গিয়ে সবই তখন নিউট্রণ হয়ে যায়, একটিও ইলেকট্রণ বা প্রোটন বাড়তি থাকে না।

'নিউট্রণ-তারকায়' ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে। তারকাটি যত ছোট হয় তত ভারী হয়, মাধ্যাকর্ষণের চাপও তত বাড়ে, শেষে সেই চাপ ইলেকট্রণ কণাগুলোকে ঠেলে কেন্দ্রীণে মিশিয়ে দেয়, আর সব কেন্দ্রীণগুলোকে ঠেলে একত্র করে জুড়ে দেয়। তখন সমগ্র তারকাটিই একটি মাত্র কেন্দ্রীণ হয়ে ওঠে, যা কেবল নিউট্রণ দিয়ে গড়া। সেইজন্যই এই তারকার নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রণ-তারকা।

এই নিউট্রণ-তারকা প্রথম আবিষ্কৃত হয়

১০ খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এগুলি 'দেখা' সম্ভবই নয়, কারণ এগুলির ব্যাস আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের চেয়েও ছোট। এগুলির সঙ্গে ধাক্কা খেলে আলোক-তরঙ্গ চূর্ণ হয়ে যায়, প্রতিহত হ'য়ে আমাদের চোখের দিকে ফিরে আসে না।

১১ পৃথিবীতে লোহার (steel) ওজন : একঘন ফুট = ৪৯০ পাউণ্ড, বা প্রায় ২২৩ কিলোগ্রাম।

কেম্ব্রিজে, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে। তারপর এই তিন বছরের মধ্যে আরো ৪০টি নিউট্রণ-তারকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এগুলিকে 'পালসার'-ও (pulsar) বলে। এগুলি নিয়মিত ভাবে, নিয়মিত ব্যবধানে ক্রমাগত অবিশ্বাস্য রকমের শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ মহাশূন্যে ছড়িয়ে চলেছে। পৃথিবীতে প্রথম যেদিন সেগুলি ধরা পড়ল, অনেকেই তখন ভেবেছিলেন বিশ্বের কোন প্রান্ত থেকে আধুনিক মানুষের চেয়েও বিজ্ঞানে বহু উন্নত কোন প্রাণী বুঝি এই প্রবল শক্তিশালী বেতার সংকেতগুলি পাঠাচ্ছে।

তারকার মহামৃত্যু : 'কালো গহ্বর'

এ পর্যন্ত তারকার মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু বলা হল, তা আসলে তার দেহের রূপান্তর মাত্র। একে যদি মৃত্যু বলা হয়, তাহলে তারকার মহামৃত্যুও আছে—যার পর তার আদি অবস্থা পরমাণুচূর্ণও অবশেষ থাকে না, তার সঙ্গে পরমাণুর মিশ্রণের মেঘও না, এ-সবগুলির একত্রীভূত অবস্থা কেবল নিউট্রণও না; বিশ্বের মূলে যে উপাদানগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত, তার কিছুই থাকে না। তারকাটি শূন্যগর্ভ, 'কালো গহ্বর' (black hole) হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, নিউট্রণ-তারকার নিজের প্রচণ্ড চাপের ফলেই এরূপ ঘটে। অবশ্য এই 'কালো গহ্বর'-এর ধারণাটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমানমাত্র; কালোগহ্বর এখনো একটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। কি অনুমান করেন তাঁরা? নিউট্রণ তারকার উপাদান নিউট্রণগুলি কি হয়ে যায় তখন? শূন্য তো আর হয়ে যেতে পারে না, কোন বিজ্ঞানীই তা বলবেন না—বিজ্ঞান-জগতে আজ পর্যন্ত কোন নজির নেই যে শূন্য হতে কিছু হয়েছে, বা কোন পদার্থ শূন্য হয়ে গেছে। যা হোক অন্য একটা কিছু সত্তা বা 'বস্তু'তে কোন 'বস্তু' রূপান্তরিত হতে পারে মাত্র; বিশ্বে তাই-ই ঘটছে অবিরাম। তাহলে নিউট্রণ-তারকাটি এ কালো গহ্বরে লুকালো কোথায়? বা, এখন কিছুতে রূপান্তরিত হল কি, যা ইলেকট্রণ-প্রোটন-নিউট্রণেরও উপাদান, যা চুম্বক-বিদ্যুৎ-তরঙ্গমাত্র, বা তার চেয়েও সূক্ষ্ম কিছু, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এখনো? অনেকে অনুমান করেন, তা হতেও পারে। কিন্তু যাই-ই হোক, তাঁদের অনুমান এ গহ্বর অতলস্পর্শী, এর আকর্ষণও এত বেশী যে, এর ভেতর থেকে শব্দ, আলোক-তরঙ্গ, তাপ প্রভৃতি কোন কিছুই এর আকর্ষণ কাটিয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। আবার বাইরে থেকে কিছু এর ভেতর একবার পড়লে আর বেরুতেও পারে না। এ কালো গহ্বর সর্বগ্রাসী। কাজেই রেডিও-টেলিস্কোপ দিয়েও এর অস্তিত্ব জানার কোন উপায় নেই।

তাই যদি হয়, তাহলে এ কালো গহ্বরের অস্তিত্বের কথা আদৌ অনুমান করা হয় কেন?

অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, বিশ্বের সর্বাধিক উজ্জ্বল আলোক, রহস্যময় 'কোয়াসার'-গুলিই কালো গহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোয়াসারগুলি (quasars বা quasi-stellar objects) আমাদের রেডিও-টেলিসকোপের ধরা ছোঁয়ার সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত। প্রথম কোয়াসার আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে; তারপর শত শত কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব বলেই মনে হয়; কারণ এগুলি আয়তনে আমাদের সূর্যের চেয়ে দশলক্ষগুণ বড়, আর আমাদের সমগ্র ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্য এক করলে যা হয়, তার চেয়ে শতগুণ বেশী উজ্জ্বল। কি হতে পারে

এগুলি ?

পৃথিবীর অতি সুবিদিত জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে কয়েকজন মনে করেন, কোন 'কালো গহ্বর' কর্তৃক বিরাট আকারের একটা বিপর্যয় সৃষ্টির ফলেই এই কোয়াসারগুলির উৎপত্তি। যখন প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটা তারকা-জগৎকে প্রচণ্ডভাবে চেপে 'নিঃশেষ' করে ফেলে, এবং তার পর সে শক্তিকে বাধা দেবার মতো কিছুই আর থাকে না, তখন সে বিপুল শক্তি বাইরে হাত বাড়িয়ে কাছাকাছি যত তারকা থাকে সবগুলিকে টেনে এনে নিজের করাল গ্রাসে পুরে নিঃশেষ করে দেয়। এর ফলে কালো গহ্বর আরো বড়, আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

এভাবে বড় হতে হতে কালো গহ্বর যখন এতখানি বড় হয়ে ওঠে যে একটা ছায়াপথের সবটাকেই বা কিয়দংশকে টেনে এনে পেটে পোরার মতো শক্তিশালী হয়, তখন ছায়াপথের নিযুত নিযুত তারকা সমবেত ভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে এই করাল গ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্য। কালো গহ্বরের আকর্ষণের সঙ্গে তারকাপুঞ্জের এই সংগ্রামের ফলেই কোয়াসার-রূপ বৃহদায়তন বিপুল জ্যোতির উদ্ভব।

আমরা দেখলাম, আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্ব-সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছে. খালি চোখেই হোক আর যন্ত্রের সাহায্য নিয়েই হোক, তার বাইরের দিকে তাকিয়ে তার বিস্তারের কোন কুল-কিনারা পাওয়া যায় নাই; আবার ভেতরের দিকে তাকিয়েও তার ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্মতম সত্তার সন্ধান এখনো মেলে নাই। আমাদের দৃষ্টি যত দূরপ্রসারী এবং যত সূক্ষ্ম-দর্শী হচ্ছে বিশ্ব যেন সৃষ্টির মূল রহস্যকে তত বেশী জটিল করে তুলছে।

নমো সুন্দর নিরুপম*

পদ্মশ্রী নলিনীবালা দেবী

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা]

নমো সুন্দর নিরুপম
সুরভি বিহীন বন কুসুমের
দীন পূজা আয়োজন
সুন্দর নিরুপম।

তোমার চরণধূলির পরশে
প্রাণশতদল ফুটিছে হরষে
প্রেমের মহান মন্ত্র-ধ্বনিতে
মোর সঙ্গীত অনুপম
সুন্দর নিরুপম।

পরম তৃষায় তনুতে নৃত্য-ছন্দ
মুগ্ধ প্রাণে যে সুরের অগরু-গন্ধ
পুষ্প-পরাগে চর্চিত মোর
সুরভিত চন্দন
সুন্দর নিরুপম।

* সুবিখ্যাত অসমীয়া নারী কবি শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর 'সাহিত্য একাদেমী'-পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ 'অলকানন্দা' থেকে মূল কবিতাটি গৃহীত।

দেবী কন্যাকুমারী*

ভারতের সর্বদক্ষিণপ্রান্তে দেবী কন্যাকুমারীর মন্দির। শহরটিরও নাম কন্যাকুমারী। মন্দিরাভ্যন্তরে দেবী কুমারী জপমালা হস্তে পূর্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান।

তামিলসংগম গ্রন্থে পাওয়া যায়, দেবী কুমারী পাণ্ড্যান রাজাদের গৃহদেবী ছিলেন; এ মন্দির নির্মাণ করেন রাজারাই।

কেরল অঞ্চলের উৎপত্তি এবং দেবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত। শ্রীভগবানের ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম একদা তাঁর সমস্ত ভূমি প্রজাদের বিলিয়ে দিলেন, নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। যখন দেখলেন সব প্রজাই জমি পেয়েছে, তখন সমুদ্র-দেবতা বরুণের অনুমতি নিয়ে গোকর্ণ থেকে ছুঁড়ে নিজের কুঠারখানি সমুদ্রে ফেলে দিলেন। সেই কুঠারের আঘাতেই সমুদ্রগর্ভ থেকে কেরল অঞ্চল জেগে উঠল। জনশ্রুতি যাই হোক, কেরলের মাটি দেখে কিন্তু মনে হয় তা একদিন সমুদ্রতলই ছিল।

দেবী কন্যাকুমারীর আখ্যান হল এইরূপ:

একদা দানবরাজ বনাসুরের অত্যাচারে ত্রিভুবন ভরে যায়। ন্যায় ধর্ম সব লোপ পায়। দেবতা, ঋষি ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের দুর্গতির আর শেষ থাকে না। এর প্রতীকারের জন্য তাঁরা সবাই মিলে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু পরাশক্তির আরাধনা করতে বললেন। তাঁর কথামত দেবতা ও ঋষিরা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। দেবী প্রসন্না হয়ে দেখা দিলে সকলে প্রার্থনা জানালেন, 'মা, বনাসুরকে বধ কর।' দেবী অভয় দিয়ে অন্তর্হিতা হলেন।

তারপর দেবী কুমারীমূর্তি ধারণ করে সাগরমধ্যস্থ শিলাখণ্ডের উপর তপস্যা করতে লাগলেন। কুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স হলে সেখান থেকে দশমাইল দূরবর্তী সুচিন্দ্রম্-মন্দিরের শিবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেবার সিদ্ধান্ত হয়। শিবের অনুমতি নিয়ে বিবাহের দিনস্থির হল, বিবাহান্তে ভূরিভোজনেরও আয়োজন চলতে লাগল।

এদিকে নারদ ভাবলেন, এ তো ঠিক হচ্ছে না। কারণ বিষ্ণুর কাছে তিনি শুনেছেন বনাসুর কেবল কুমারীর বধ্য। কন্যাকুমারীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়ে গেলে তো বনাসুরবধ আর হবে না! নারদ কৌশলে এ বিবাহ ভেঙ্গে দিতে মনস্থ করলেন। তিনি এসে ঘোষণা করলেন, বিবাহের সব চেয়ে ভাল লগ্ন রয়েছে নির্ধারিত তারিখে মধ্যরাত্রে।

শিব তো ভোলানাথ। নারদের কথামত বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি মন্দির থেকে যাত্রা করলেন, যাতে মধ্যরাত্রের আগেই কন্যাকুমারীতে পৌঁছান যায়। শিব যখন বাঝুকম্পরাই পৌঁছেন, গন্তব্যস্থল যখন আর তিন মাইল মাত্র দূরে, নারদ তখন কাকের রূপ ধরে পথের ধারের একটি গাছে বসে ডাকতে শুরু করলেন। কাকের ডাক শুনে শিব ভাবলেন তা হলে তো ভোর হয়ে গেছে, বিবাহলগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর গিয়ে লাভ নেই। তিনি সেখান থেকেই ফিরে এলেন।

এদিকে শিব না আসায় কন্যাকুমারীর বিবাহ তো হতেই পারল না, বিবাহান্তে

* সংগ্রহ।—সঃ

ভুরিভোজনের আয়োজনও সব ভণ্ডুল হল। সব খাদ্য বালুকায় পরিণত হয়ে গেল। সেই নানাবর্ণের, নানা আকারের বালুকাকণাগুলিই তো আজও ছড়ানো রয়েছে কন্যাকুমারীর মন্দিরের সামনের বেলাভূমিতে! অনেকগুলির আকার আবার চালের মতো। সেই থেকে দেবী কুমারীই আছেন।

এদিকে বনাসুর কন্যাকুমারীর অপরূপ রূপের কথা শুনে তাঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল। কন্যাকুমারী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বনাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে এসে হাজির হল কন্যাকুমারীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। কন্যাকুমারীর সঙ্গে বনাসুরের ভীষণ যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে দেবী বনাসুরকে বধ করলেন।

এখনো প্রতি বছর নবরাত্রি উৎসবের সময় এই বনাসুরবধ-স্মরণে আনন্দোৎসব করা হয়। মন্দির হতে মাইল দুয়েক দূরে মহাদনপুরম্-এ শোভাযাত্রা করে দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দেবীর পুরোহিতগণ বনাসুরবধ অভিনয় দেখান।

যে শিলাটির উপর দেবী তপস্যা করেছিলেন তার উপর একটি চিহ্ন দেবীর পদচিহ্ন বলে খ্যাত। আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ এই শিলাটিরই উপর বসে ধ্যান করেছিলেন। শিলাটি এখন তাই বিবেকানন্দ-শিলা নামে পরিচিত। এই শিলাটির উপর নির্মিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরের উদ্বোধন হয় কিছুদিন আগে। দেবীর পদচিহ্নের উপর নির্মিত মণ্ডপটির উদ্বোধন হয়েছে তার কয়েকদিন পূর্বে।

নমো বিবেকানন্দায়

শ্রীসুধীরকুমার কর

অতীতে চ হি যো ভাবি-
কালে নিরুপমো ভবে।
তমোঘ্না যস্য ধীরে কা
শ্রীহীনো যো কদাপি ন॥
তস্মৈ নিত্যং মহানন্দ-
দায়িনে হৃত্তমোহৃতে।
বীরেশ্বরাখ্য ভীহীন
বিবেকানন্দ তে নমঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

'কথামৃত' গ্রন্থে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বহুরূপে বহুভাবে আমরা ভবনাথের দর্শন পাই। নরেন্দ্র-ভবনাথ যেন এক বৃন্তে দুই পুষ্প, শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় একান্তভাবে নিবেদিত। কিন্তু পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ সত্যই নরশ্রেষ্ঠ, দেশে বিদেশে বন্দিত; আর ভবনাথ ভবার্ণবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই জানতে পারা যায় তিনি মাষ্টার মশায়ের (শ্রীম) আগেই দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত।

কথামৃত প্রথম ভাগ ৭ম খণ্ডে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি।' [১৮৮২ খ্রীঃ মার্চ মাস]

'কথামৃতে' ১৮৮৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসের অপর চিত্রে দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করে ভক্ত বলরামের গৃহে মধ্যাহ্নে প্রসাদগ্রহণে গিয়েছিলেন। তখন বলরামবসুকে তিনি বলেছিলেন—নরেন্দ্র ভবনাথ রাখাল ও আরও দু-একটি ভক্তকে নিমন্ত্রণ করতে। আর বলেছিলেন—"এদের খাইও, তাহলেই অনেক সাধুকে খাওয়ানো হবে।"

১৮৮৫ খ্রীঃ অপর চিত্র: ২৩শে ডিসেম্বর কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলছেন—"এ অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে তারা অন্তরঙ্গ, আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ। ভবনাথকে দেখলে না, শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এলো। জিজ্ঞাসা করল কেমন আছেন, তারপর দেখা নাই। নরেন্দ্রর খাতিরে তাকে ঐ রকম করি কিন্তু মন নাই।"

ভবনাথ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার ইচ্ছায় অনুসন্ধানে জানতে পারলাম তাঁর একমাত্র কন্যা এখনও জীবিত আছে। তাঁর কাছে কোন নতুন তথ্যাদি হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

সেই বর্ষীয়সী মহিলার (ভবনাথ-কন্যা) নাম শ্রীমতী প্রতিভা দেবী বর্তমান বাসস্থান ভবানীপুর বিহারী ডাক্তার রোডে। একদিন (ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮) শীতকালের সন্ধ্যার পরে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম, শ্রীরামকৃষ্ণলীলা-সহচর ভবনাথের জীবন-কাহিনী জানবার জন্য, নতুন কিছু তথ্য পাবার আশায়।

পশ্চিমমুখো বাড়ীর ফটকের ভেতর দিয়ে আমাদের পৌঁছিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধার সমীপে দোতলার ঘরে। একখানা খাটে তিনি বসে আছেন; তাঁরই ভাসুরপুত্র আমা.ক তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি আপনার কাছ থেকে আপনার পিতা কথামৃতের 'ভবনাথ' সম্বন্ধে কিছু জানতে আর শুনতে চান।

আমাদের বসতে দিলেন বৃদ্ধা। এ বয়সেও তাঁর দেহের গৌরবর্ণের লাবণ্য ক্ষীণ হয়নি।

তিনি বললেন—'আমার কি আর অতো পুরানো দিনের কথা স্মরণে আছে! বয়স তো প্রায় আশির কাছাকাছি।'

বললাম, 'আপনাকে দেখে তো মনে হয়, আপনার দেহকান্তি দেখে বার্ধক্য ভয়ে আপনার

কাছ থেকে দূরে পালিয়ে আছে। আর আমরা যা তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি কথামৃত আর উদ্বোধন পত্রিকা থেকে, তাতে এখন আপনার বয়স ৭৬ বছর পার হতে চলেছে।'

বৃদ্ধা—'তোমরা জানলে কি করে?'

বললাম, 'কেন, উদ্বোধনের এক প্রবন্ধে আছে ভবনাথের জন্ম ১২৭৪ সালে. আর মৃত্যু ১৩০৪ সালে, তখন ভবনাথের কন্যার বয়স মাত্র ছয় বছর।'

বৃদ্ধা হেসে বললেন—'তা হলে দেখছি আমার কোষ্ঠী তোমাদের হাতে রয়েছে!'

বৃদ্ধার এ কথায় আমরা হেসে ফেললাম আর বললাম—'চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধি দেখি শুক্লকৃষ্ণপক্ষে, কিন্তু চাঁদের নিজের কিছু হয় না। কিন্তু তা দেখে জগতের লোক নিজেদের তিথি-নক্ষত্রের করণীয় ঠিক করে নেয়। কথামৃতে পাই ভবনাথ সুপুরুষ ছিলেন। 'আপনার সে-সব কিছু মনে আছে?'

বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বললেন—'আমার মা বাবা দুজনেরই দেহের রূপ-লাবণ্য আর নিটোল স্বাস্থ্য ছিল। বাবার যেমনি গৌরবর্ণ দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান চেহারা, তেমনি সুকণ্ঠ। মায়ের গায়ের রং ছিল বেশ ফর্সা। আমি তাঁদের কোনো গুণের অধিকারী তো হইনি, রূপেরও কিছু পাইনি। বাবা কিন্তু চাকরী উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলো।'

বিয়ের পরে শ্বশুরকুলে এসে রামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগও কমে যায়। শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি, কিন্তু শ্রীমকে দেখা ভাগ্যে হয়নি।

আমার ঘরের দেয়ালে ঐ দেখ আমার মা-বাবার ছবি। ঘরের পশ্চিমের দেয়ালে একখানা বড় ফটো। তিনজনের। একটি ছোট্ট বালিকা, ফ্রকপরা, চেয়ারের মধ্যে পা গুটিয়ে বসা; আর একজন গলাবন্ধ জামাপরা, দস্তুরমত সুপুরুষ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁর বামে ঐ যে পুরানো দিনের সর্বঅঙ্গ জামায় ঢাকা, মাথায় শাড়ী টেনে দেওয়া মহিলা, তিনিও চেয়ারে বসা।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'ছবিখানি বুড়ো হয়েছে, আপনি কিন্তু এ বয়সেও বুড়ো হতে পারেননি।'

বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, 'সেদিনের ফ্রকপরা ঐ ছোট্ট মেয়েটিই তোমাদের সামনে থান-পরা বুড়ী আর ঐ ভদ্রলোকই শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই সঙ্গে আমার মাতা।'

এই ফটো দেখেই মনে পড়ল, ফটো-সংক্রান্ত ব্যাপারেই ভবনাথ রামকৃষ্ণলীলায় বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অপরূপ চিত্র নিজ অন্তরে গ্রহণ করেছেন, আর ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় উপবিষ্টাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে ফটোচিত্র সর্বত্র সর্বজনের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে, সেই ফটোও ভবনাথের উদ্যোগে তোলা হয়েছে। ভবনাথ কৌশল করে বরাহনগরের অবিনাশচন্দ্র দাঁ দ্বারা দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের সামনের রোয়াকে সমাধিস্থ (বসে থাকা) শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো তুলেছিলেন। এই একটি কাজের দ্বারাও ভবনাথ রামকৃষ্ণলীলায় বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ফটোটিই আজ ঘরে ঘরে পূজিত হয়।

ভবনাথই বরাহনগরের পুরানো মঠবাড়িটি (মাত্র দশ টাকা ভাড়ায়) খুঁজিয়া দিয়াছিলেন।

কথার স্রোত অন্যদিকে গড়াতে লাগলো। আমি বললাম, 'আপনার পরিবারের অপর সকলের নাম জানতে পারি কি?'

বৃদ্ধা বললেন—'আমার নাম প্রতিভাদেবী। হালকালের বদলানোর পাল্লায় মুখার্জি হইনি। বাবার নাম তোমরা জান, স্বামীর নাম, ভাসুরের নাম তোমরা সংগ্রহ করবে! তবে একটি কথা—মায়ের নামটা বলব না।'

'কেন বলবেন না?'

'ঠাকুরের সেই গল্পটি জান তো? একটি মেয়েছেলের ভাসুরদের নামে হরি কৃষ্ণ ইত্যাদি থাকাতে সে জপ করত···ফরে ফৃষ্ট ফরে ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে··। আমারও প্রায় সে অবস্থা। চাঁদের মধ্যে আমার মা আর ভাসুর লুকিয়ে আছেন। বল তো কি নাম হবে?'

'তবে কি তাঁর নাম চন্দ্রমুখী, চন্দ্রকণা, শশীবালা এরকম কিছু?'

'হাঁ, প্রায় কাছাকাছি এসেছ, মায়ের নাম ছিল কিরণশশী। শেষ অংশটুকু ভাসুরের নাম কিনা, তাই নিতে সঙ্কোচ। তাই চাঁদ দেখলে মা আর ভাসুরকে একসঙ্গে মনে পড়ে। আর আমি মুখে উচ্চারণ করতে সঙ্কোচ বোধ করি। তোমরা আমাকে হয়তো সেকেলে বলে উপহাস করতে পার।

ঠাকুরমার নাম ইচ্ছাময়ী দেবী। মামাবাড়ী মল্লিকপুরে (ডায়মণ্ড-হারবার লাইনে)।

আমার কর্তা মেয়ের নাম রেখেছিলেন রাণী; আর ছেলেদের নাম রেখেছিলেন কামজিৎ ক্রোধজিৎ লোভজিৎ মোহজিৎ। কাম ক্রোধ লোভ আমার সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে। মোহকে নিয়েই এখন সংসারে বদ্ধ হয়ে বেঁচে আছি।'

'আমরা কিন্তু সংগ্রহ করেছি আপনার স্বামীর নাম ৺শরৎচন্দ্র মুখার্জি, ভাসুরের নাম ৺শশিভূষণ মুখার্জি

আপনার বাবার সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন।'

'নতুন কি আর বলব! যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে। কথামৃতে যা আছে, তার বাইরে কিছু বলতে গেলে সে সব হবে বাজে কথা।

বাবার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন মায়ের বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। আমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; এটি একদিক দিয়ে ঠিক, কারণ আমার অপর এক ভগ্নী আড়াই বছরে মারা যায়। তাকে হিসাবের মধ্যে কেউ ধরেনি।

বেলুড় মঠ থেকে যখন আমার কাছে ভবনাথের বড় ফটো চাওয়া হয়েছিল, তখন আমি ঐ গ্রুপ ফটো তাঁদের দেখাই। তাঁরা সন্ন্যাসী, মেয়েছেলের সঙ্গে ছবি পছন্দ করলেন না। তাঁর অপর একটি ছবিও আমার কাছে ছিল, যে ছবিতে ভবনাথের কাঁধে স্বামীজীর হাতের ছাপশুদ্ধো উঠেছে। তাঁরা সে ছবি গ্রহণ করলেন। সেই ছবির বৃহদাকার (enlarged) ফটো কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আছে। মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে ঐ ফটো দেওয়া হয়েছিল।

স্বামীজীর ভালবাসার তো তুলনা নেই, তিনি ভবনাথকে ভালবাসতেন আন্তরিকভাবে। যে জন্য ভবনাথের মেয়েকেও তিনি স্নেহ করতেন। সেকারণে বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে পড়ে, আমি স্বামীজীর আদর পেয়ে কোলেও উঠেছিলাম।'

এইটুকু বলেই বৃদ্ধার চক্ষু বাষ্পাকুল হল, আমাদের মুখের ভাষাও স্তব্ধ হয়ে গেল।

সোনার মানুষ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

"কে যে কৃষ্ণ রাধাকান্ত—কে যে রাধা কৃষ্ণবিনোদিনী,"
এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে খুঁজে অখণ্ড মেদিনী
ভক্তেরা ব্যাকুল যবে, জন্ম নিয়ে তুমি বাঙ্গলায়
নদীয়ার মিশ্রগৃহে, ব্রজভাব-কদম্ব তলায়
দেখালে তা জানালে তা ওহে রাধা-প্রেমাব্জ-মধুপ
শিখালে তা জনে জনে ; পরিতৃপ্ত হলো ভক্তগণ
হেরিয়া তোমার মাঝে রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন।

কৃষ্ণ যে লুকাতে চায় আপনারে রাধার ছায়ায়—
রাধা চায় ডুবে যেতে ষোলআনা কৃষ্ণের কায়ায়
সে খেলা দেখায়ে নিজ ভাবে, ধর্মে, কর্মে, আচরণে
বিশ্বাস আনিয়া দিলে অভিমানী সংশয়ীর মনে।

বিশ্ব যাহা পারে নাই, হে মহান্, নিজ মহিমায়
তুমি তাহা করিয়াছ, অসীমেরে এনেছ সীমায় !
একত্ববাদের ঋষি, "ভগবান্ এক না অনেক"—
বুঝিতে পারে নি যাহা বড় বড় জ্ঞানীর বিবেক—
যাহা নিয়ে এত কথা, এত তর্ক, এত আলোড়ন,
তাহাই বুঝায়ে দিল হে প্রেমিক, তোমার জীবন !

ত্যাগপূত চিত্তে তব অদ্বয় অরূপ পারাবারে
মেশে লীলা, ভাসে পুনঃ অতিশুদ্ধ ভক্তির আধারে !
দীনার্ত জনের বন্ধু, কে তুমি হে সোনার মানুষ—
পুণ্য, প্রেম, নাম-মূর্তি নবদ্বীপচন্দ্র নিষ্কলুষ।
তোমার শীতল, স্নিগ্ধ, উচ্ছ্বসিত চন্দ্রিকা ধারায়
অবগাহি ইন্দ্র চন্দ্র দেবাদিও ধন্য হতে চায় !

সমালোচনা

জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ: ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক: সাধনা সোম, সবিতা প্রকাশন, সি ৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা: ২২১। মূল্য: পাঁচ টাকা।

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর স্বামীজীর ভাবের প্রভাব পড়ে ছাত্রজীবনেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের কয়েক জনের, বিশেষ করিয়া স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি পুনরায় পড়িয়া তিনি এই জীবনীটি রচনা করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ছোট বড় অনেক জীবনী বাহির হইয়াছে, তবে আবার এই নূতন প্রচেষ্টা কেন? ইহার উত্তরে লেখক বলিয়াছেন, 'ভাল জিনিস যত বিভিন্ন ভাবে লোকের সামনে ধরা যায়, ততই ভাল।' সেদিক দিয়া আদর্শনিষ্ঠ-জীবন ডঃ ঘোষের লেখা এই 'জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ' বইটির যথেষ্ট মূল্য আছে বলিয়া মনে করি।

বইটির প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথচ ইহারই মধ্যে স্বামীজীর জীবনের সব প্রধান ঘটনাগুলিকে লেখক স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন। রচনাভঙ্গী সহজ ও সাবলীল।

জীবনী আরম্ভের পূর্বে ২৪ পৃষ্ঠার ভূমিকায় লেখক তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী স্বামীজীর একটি ভাবমূর্তি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অংশে এবং জীবনী অংশের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঘটনার উপর এবং কোথাও কোথাও স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করিয়া লেখক মন্তব্য করিয়াছেন। সেগুলির অধিকাংশই আমাদের ভাল লাগিল। তবে, স্বামীজীকে 'ভক্তিপ্রধান' (পৃ: ৬) বলা, 'নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী স্বামীজী এর (সেবার) ওপর বেশী জোর দিয়েছেন' (পৃ: ১০), ইত্যাদি জাতীয় দু-চারটি মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নই। কয়েকটি তথ্যগত মন্তব্য পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত করিলে ভাল হয়। যেমন, স্বামীজী 'এই সময় মা সারদাদেবীর প্রেরণায় সংসার ত্যাগ করাই স্থির করেন' (পৃ: ২৩) (এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই), 'ডেট্রয়েটে বিষ খাইয়ে মারতে পারে এমন ধারণাও হয়েছিল স্বামীজীর' (পৃ: ৯২), '১৮৯০ সালের পর উভয়ের মধ্যে (স্বামীজী ও প্রমদাদাস মিত্র) কোন চিঠির আদান-প্রদান হয় নি' (পৃ: ৪৭)। ডেট্রয়েটে স্বামীজী পানীয়-গ্রহণে উদ্যত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া উহা খাইতে নিষেধ করেন; কাজেই পূর্বে এ বিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ 'ধারণা' হইবার অবকাশ নাই। প্রমদাদাস মিত্রকে ৩০শে মে, ১৮৯৭-এ লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি আছে, এবং উহাতে স্বামীজী লিখিতেছেন যে, ইহার পূর্বে ৪।৫ বছর উভয়ের মধ্যে কোন চিঠির আদান-প্রদান ছিল না; অর্থাৎ ১৮৯২-৩ পর্যন্ত ছিল।

এই রকম সামান্য দু-চারটি বিষয় ছাড়া সমগ্র গ্রন্থটি খুব সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ : (তৃতীয় খণ্ড) : স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। প্রকাশক : রাম কৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পো: বারাসত, ২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৪৭৬ ; মূল্য ৬'৫০।

মানবজীবনের সেরা তিনটি সৌভাগ্য —মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়। এ তিনের শুভ সম্মেলন যদি কারু জীবনে ঘটে তাহলে তিনি নিজে যেমন ধন্য, তেমনি তাঁর সংস্পর্শে এসেও মানুষ ধন্য হয়। মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিচারণের যে-ব্রত স্বামী অপূর্বানন্দজী গ্রহণ করেছিলেন, তৃতীয় খণ্ড স্মৃতিসংগ্রহে এসে সে ব্রত পূর্ণাঙ্গ। তবু, পাঠক হিসাবে আমাদের আশা এ মহা-জীবনে আরো যদি অজানা স্মৃতি কিছু থাকে, তাহলে চতুর্থ খণ্ডে আমরা যেন সেগুলি সংগৃহীত দেখি। কারণ যতই দিন যাবে ততই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের সংখ্যা কমে আসবে।

এ-জাতীয় স্মৃতিকথায় ঘটনা এবং বাণী —দুই-ই মিশে থাকে। মাঝে মাঝে লেখকের আত্মকথনও অপরিহার্য। কোনো কোনো লেখায় শুধু মাত্র লেখকের ভক্তি-আবেগই দেখা দেয়, তথ্য বিশেষ কিছু থাকে না। তবু স্মৃতিপূজার উপকরণে এ সবই সার্থক উপকরণ। আচার্য শঙ্কর তো লিখেছেন,

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥'

সন্দেহ নেই, জীবনতরণীর কর্ণধারকে একবার দেখতে পাওয়াও অপরিমেয় পুণ্যফল। সুতরাং সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের স্মৃতিচারণে যেখানে যতটুকু স্বর্ণরেখা অঙ্কিত হয়ে আছে, পাঠকের কাছে তা পরম মূল্যবান।

আর ভবিষ্যতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহাজীবনের ইতিহাস-রচনায় তাঁর সন্তানদের ব্যক্তিত্ব-মাধ্যমে বিচ্ছুরিত আলোকরাশি মানব-জাতিকে কল্যাণের আমোঘ নির্দেশ দেবে —একথাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পূর্ববর্তী দুটি খণ্ডের মতো এই তৃতীয় খণ্ডের সংকলয়িতা স্বামী অপূর্বানন্দজী তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞভাভাজন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

চরিতাভ : শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাণ্ডারী : প্রকাশক : যুগপ্রবর্তক প্রকাশিকা। পো: রাজপুর (মিশ্রপাড়া রোড) ২৪ পরগণা। দাম—৫·০০ ; পৃষ্ঠা : ১৯৭।

যীশুখৃষ্টের অমর জীবনকথা অবলম্বনে শ্রীঅক্ষয়কুমার ভাণ্ডারী বাংলা সাহিত্যে একটি চরিতকাব্য উপহার দিয়েছেন। এ যুগে চরিতকাব্য-রচনার উদাহরণ বিরল। গদ্যসাহিত্য এসে কাব্যের এক বিশেষ উপকরণকে একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। তবু এখনও কেউ কেউ শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য চরিতকাব্য-রচনার পন্থা অনুসরণ করে থাকেন। কারণ অনুভূতির গভীর থেকে যা সৃষ্টি হয় তাই কাব্য। এ-ক্ষেত্রে গদ্য ও পদ্যে কোনো তফাত নেই।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট অংশটির যথাযথ অনুসরণে মূলতঃ ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে লেখা এই কাব্য যীশুজীবনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। ভক্তজনদের আনন্দের কারণ এবং সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসুর পক্ষে উপকারী। ভাষা ও ছন্দ আরো মার্জিত হলে পাঠকদের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী হতো। কিন্তু এ-জাতীয় প্রচেষ্টার আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

—নীলাঞ্জন সোম

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা

গত জুনমাসে চারদিনব্যাপী প্রবল বারিবর্ষণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার বিরাট অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত করিয়া জনগণকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে ফেলিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন গত ৪.৯.৭০ হইতে এই সব বিপন্ন বন্যার্তদের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন।

৪.৯.৭০ হইতে ১৬.৯.৭০ পর্যন্ত হাওড়া জেলার লিলুয়া, বালী ও হাওড়ায়; কলিকতার ট্যাংরা, তপসিয়া ও বালিগঞ্জ অঞ্চলে; এবং রহড়া, বেলঘরিয়া, বরাহনগর, সাতগাছি, লাহা মার্কেট, দক্ষিণপাড়া, সরিষা ও টাকী অঞ্চলে এই সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন দৈনিক গড়ে প্রায় ৮০ হাজার ব্যক্তিকে সাহায্যদান করিয়াছেন।

বর্তমানে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, জগৎবল্লভপুর, আমতা (১নং ব্লক) এবং দক্ষিণমানসিংহপুরে, হুগলী জেলার খানাকুল অঞ্চলের ৩০টি গ্রাম, আরামবাগ মিউনিসিপালিটির সমগ্র এলাকা জুড়িয়া (প্রায় ১০০ বর্গমাইল), এবং ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর ও বারুইপুর থানার ৭০টি গ্রামে (৮০ বর্গমাইল এলাকায়) এবং ডায়মণ্ড হারবারে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য চালাইতেছেন; সাহায্য পাইতেছেন দৈনিক গড়ে ১,২৭,০০০ জন।

প্রথমদিকে বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা হইতে বন্যার্তদের উদ্ধার করিবার কাজে মনোনিবেশ করা হইয়াছিল। বর্তমানে তাঁহাদের চাল, ডাল, গম, গুঁড়া দুধ, কাপড়, কম্বল, লণ্ঠন প্রভৃতি দেওয়া হইতেছে।

আরো কিছুদিন ধরিয়া এই সেবাকার্য চালাইতে হইবে। এই সেবায় জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি। যে কোন প্রকার সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে সাদরে গৃহীত হইবে:

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

২। ম্যানেজার, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা-১৪

৩। কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন আফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

৪। সম্পাদক, ইনস্‌টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

৫। সম্পাদক, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা-২৬

বেলুড় মঠ
২৭. ৯. ৭০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার্তসেবা

অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চল গোবরা, ট্যাংরা তপসিয়া ও বালিগঞ্জে, হাওড়া জেলার বেলুড়, লিলুয়া ও বালি এলাকায়, এবং ২৪পরগণার রহড়া, বেলঘরিয়া, বরানগর, সাতগাছি, লাহা-মার্কেট, দক্ষিণপাড়া, সরিষা ও টাকি অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ৪. ৯. ৭০ হইতে ১১. ৯. ৭০ পর্যন্ত যে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দৈনিক গড়ে ৭৯,৭৮৬ জন দুঃস্থ ব্যক্তির সেবা করা হইয়াছে।

বর্তমানে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বন্যার্ত-সেবাকার্য চলিতেছে :

(ক) **হাওড়া জেলায়** ডোমজুড়, উলুবেড়িয়া, জগৎবল্লভপুর, আমতা ব্লক নং ১, এবং দক্ষিণ মানসিংপুর অঞ্চলে ;

(খ) **হুগলী জেলায়**—গোঘাট, খানাকুল (৩০টি গ্রামে), আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির সমগ্র এলাকায় (১০০ বর্গমাইল স্থান) ;

(গ) **২৪ পরগণায়**—সোনারপুর ও বারুইপুর থানায় ৮০ বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া এবং ডায়মণ্ড হারবার এলাকায়।

সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা দৈনিক গড়ে ১,২৭,০০০।

সেবাকার্যের ধারা : বন্যাপ্লাবিত বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপন্ন জনগণকে উদ্ধার করার পর বর্তমানে তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক চাল, আটা, ডাল, গুঁড়া দুধ এবং কাপড় জামা, প্যাণ্ট ইত্যাদি, কম্বল, ত্রিপল, লণ্ঠন ও ঔষধপত্র বিতরণ করা হইতেছে। কয়েকটি স্থানে বাসগৃহ নির্মাণের সরঞ্জামও সরবরাহ করা হইতেছে। গত ৪. ৯. ৭০ হইতে ২১.৯.৭০ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রদত্ত জিনিসপত্রের পরিমাণ :

চাল ৩০৮ কুইণ্ট্যাল, আটা বা গম ২,১৭১ কুঃ, ডাল ৩২০ কুঃ, চিঁড়া ১১কুঃ, গুড় ৩কুঃ, গুঁড়া দুধ ৫ কুঃ, রুটি ৩,৩৭৫ পাউণ্ড, পুরাতন বস্ত্রাদি ৪,০০০ খানি, নূতন বস্ত্রাদি ৩০০ খানি, কম্বল ১,৫০০ খানি, ত্রিপল ১০৮টি, লণ্ঠন ১৩৯টি।

হাসনাবাদ ও বসিরহাট উদ্বাস্তু ত্রাণ কেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ৩০. ৮. ৭০ পর্যন্ত মোট শরণার্থী আসিয়াছেন ১,৫৪,৭১৫ জন। তাঁহাদের মধ্যে ১৩. ৪. ৭০ হইতে ৩০. ৮. ৭০ পর্যন্ত বিতরিত ডোলসংখ্যা ৩৩,৯১,৪২২। অগস্ট মাস পর্যন্ত দেয় বস্তুর পরিমাণ : চাল ১১,০১০ কুইণ্ট্যাল ২৮ কেজি ; ডাল ১,১২৬ কুইণ্ট্যাল ৬০ কেজি ; আলু ৭৪ কুইণ্ট্যাল ৬১ কেজি ৪৪২ গ্রাম ; গুঁড়া দুধ ৯১ কেজি ৩০৮ গ্রাম ; চিনি ৪ কুইণ্ট্যাল ১১ কেজি ৫০০ গ্রাম ; লবণ ৭৬৮½ বস্তা ; পেঁয়াজ ৮৫৬¾ বস্তা ; বার্লি ৪ ১½ পাউণ্ড।

সৌরাষ্ট্রে বন্যার্তসেবা

রাজকোট : প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয়। বন্যাপীড়িত নরনারীর সেবায় রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্থানীয় সাহায্যে ২৮ অগস্ট থেকে ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯,৫৪০ জনের মধ্যে প্রস্তুত খাদ্য বিতরণ করেন। এ-ছাড়া ৪১৫ খানি কম্বল, ২৭১ সেট তৈজসপত্র ও ১৬ খানি শাড়ী

বিতরিত হইয়াছে।

মালিয়া :—খাদ্যবিতরণ ছাড়াও ৪½ মিঃ মার্কিন কাপড়, ১টি ধুতি, ১টি ছাপানো শাড়ী, ১টি ব্লাউজ, ১টি তপেলি, ১টি থালি, ১টি ভাটকা, ১টি গ্লাস এবং ১টি বড় চামচ সহ একটি করিয়া সেট প্রতি পরিবারকে দেওয়া হইয়াছে; মোট ৫০০টি পরিবার এই সাহায্য পাইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনগর ও মালিয়ায় সেবাকার্যের বিস্তারসাধন সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করা হইয়াছে, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। (২৭.৯.৭০)

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম। সুদীর্ঘকাল এই সেবাশ্রম জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে অকুণ্ঠভাবে আর্তনারায়ণের সেবায় নিরত রহিয়াছে।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের ৬৩তম বর্ষের কার্যবিবরণী (এপ্রিল, ১৯৬৯—মার্চ, ১৯৭০) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ তীর্থ বৃন্দাবনে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই সেবাশ্রমে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, রেডিওলজি, এক্স-রে, ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি প্রভৃতি সুপরিচালিত বিভাগে অ্যালোপ্যাথিক মতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান-সম্মত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বৃন্দাবন সেবাশ্রম বর্তমানে বিভিন্ন-বিভাগ-সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল।

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ : ইনডোর এবং আউটডোর।

ইনডোর : অন্তর্বিভাগে ১০৫টি শয্যা আছে। এই বিভাগে চক্ষুরোগী সহ আলোচ্য বর্ষে ২,৪৬৬ জন রোগী ভরতি হয় এবং ২,০৭৮ জন আরোগ্যলাভ করিয়া চলিয়া যায়। বর্ষশেষে ৫৭ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকে। অন্তর্বিভাগে চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ১,৩৩৩টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আউটডোর : আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৪১,৭৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ২৬,৫৫৭। এই বিভাগে চক্ষুরোগী-সহ মোট ১,২১৫ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। আউটডোরে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮২।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ১,৭৮৬টি এক্স-রে ছবি তোলা হইয়াছে এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ২৫,১৭৫টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হইয়াছে। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২৩০ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে

হোমিওপ্যাথিক বিভাগ : সেবাশ্রমের হোমিওপ্যাথিক বিভাগটি একজন অভিজ্ঞ হোমিও-চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সুপরিচালিত; সাধারণতঃ এখানে শিশুদের এবং বহুপুরাতন রোগীদের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৭১৮ ও ১৬,৯৫৪।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের বিভাগগুলির মধ্যে চক্ষুবিভাগটিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। চক্ষু-বিভাগটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। সুপরিচালিত এই বিভাগে সহস্র সহস্র চক্ষুরোগী নিরাময় হইতেছে।

রোগীদের জন্য সেবাশ্রমে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার করা হইয়াছে; এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী এবং পত্রপত্রিকা রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে চিকিৎসকগণের জন্য একটি মেডিক্যাল লাইব্রেরিও রহিয়াছে।

পরলোকে স্বামী রামেশ্বরানন্দ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১-২০ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী রামেশ্বরানন্দজী (ভাব মহারাজ) ৭৭ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অর্শজনিত রক্তক্ষরণ এবং অত্যধিক রক্তাল্পতাই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ। বৎসর খানেক হইতে তিনি রক্তাল্পতায় ভুগিতেছিলেন। বেলুড় মঠ হইতে সপ্তাহকাল পূর্বে তাঁহাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

স্বামী রামেশ্বরানন্দ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে মন্ত্র-ও ব্রহ্মচর্যদীক্ষা লাভ করেন; তাঁহার নিকট হইতেই সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে।

তিনি জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ ছিলেন। জনৈক ভক্ত কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়া জামতারায় একটি আশ্রম করিবার জন্য বেলুড় মঠকে অনুরোধ জানাইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে সেখানে পাঠাইয়াছিলেন। জামতাড়ায় বেশ কয়েক বৎসর কাটাইবার পর তিনি জীবনের বাকী অংশ প্রধানতঃ বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করেন। ইহার মাঝে মাঝে তিনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দুর্গম হিংলাজ তীর্থ যেগুলির অন্যতম।

স্বামী রামেশ্বরানন্দের দেহত্যাগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ একজন মধুরভাষী, অমায়িক প্রকৃতির প্রাচীন সন্ন্যাসীকে হারাইল। তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

লুনা-১৬ মহাকাশযানের সাফল্য

রাশিয়ার মনুষ্যহীন মহাকাশযান লুনা-১৬ চাঁদের মাটি এবং অন্যান্য বহু তথ্য লইয়া গত ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে (ভারতীয় সময়) জেখাজগানের কজাক শহরের ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্বে ধীরভাবে ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। নামিবার পর চাঁদের মাটি এবং তথ্যসংগ্রাহক যন্ত্রগুলি হেলিকপটার করিয়া মস্কো লইয়া যাওয়া হয়।

লুনা-১৬ গত ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর চাঁদকে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। পরে চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বনিম্ন ১০ ও সর্বোচ্চ ৬৭ মাইল দূরত্বের একটি ডিম্বাকার পথে স্থাপিত হইয়া দুইদিন এভাবে চন্দ্রপ্রদক্ষিণের পর ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল ১০-৪৮ মিনিটের সময় চাঁদের 'উর্বর সাগরে' অবতরণ করে। আমেরিকার অ্যাপোলো-১১ চাঁদের 'নিস্তরঙ্গ-সমুদ্রের' যেস্থানে অবতরণ করিয়াছিল, লুনা-১৬-র অবতরণস্থল তাহার ২৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে। অবতরণের পরই এই মনুষ্যহীন যানটি স্বয়ংচালিত যন্ত্রসহায়ে চাঁদের মাটিতে গর্ত করিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেকটা

নীচের মাটি সংগ্রহের ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগিয়া যায়। কাজ শেষ হইবার পর লুনা-১৬-র একাংশ চন্দ্রপৃষ্ঠের ১২ ফুট নীচ হইতে সংগৃহীত মাটি ও তথ্যবাহী যন্ত্রাদি সহ গত ২১শে সেপ্টেম্বর সেখান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পথে যাত্রা করে।

রাশিয়ার লুনা-১৬র এই সাফল্য মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ; গ্রহগুলি হইতেও এভাবে মাটি আনিবার দ্বার ইহাতে উন্মুক্ত হইল। যানটি মনুষ্যহীন হওয়ায় এরূপ অভিযানে সময়ের প্রশ্ন এবং বিপদের সম্ভাবনা তো নাই-ই, তাছাড়া খরচও অনেক কম—মনুষ্যসহ এরূপ একটি অভিযানের খরচ ইহা অপেক্ষা ২০ হইতে ৫০ গুণ অধিক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ রাশিয়া হইতে উৎক্ষিপ্ত লুনা-২ পৃথিবী হইতে পাঠানো চন্দ্রপৃষ্ঠস্পর্শকারী প্রথম যান ; এটি অবশ্য চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ভাঙিয়া যায়। রাশিয়ারই মনুষ্যহীন যান, লুনা-৯, সর্বপ্রথম ধীরভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে (৩. ২. ৬৬)।

উৎসব-সংবাদ

নাথোয়া হাট (জলপাইগুড়ি) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৮ই ও ১৯শে আষাঢ়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত উৎসবে জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যোগদান করেন এবং দেড় হাজার দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী ইজ্যানন্দ সভাপতির এবং শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তর বঙ্গের বিভাগীয় কমিশনার) প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি ও সভাপতির সহিত সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন শ্রীহরিগোপাল রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার সিংহ এবং শ্রীক্ষীরেন্দ্রমোহন মিত্র।

বন্যাত্রাণসেবা

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাচলা থানার রাণীহাট প্রাইমারী স্কুল, ঘোষালপাড়া, হাকলা প্রাইমারী ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে প্রায় ১১০০ জন বন্যার্তের মধ্যে রুটি, তরকারি, আটা, চিড়া, গুড়, বেবীফুড, চাল এবং পুরানো জামাকাপড় ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। একটি মেডিক্যাল ইউনিটও লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

পরলোকে অমিয়কুমার মজুমদার

গত ২৯শে জুলাই, ১৯৭০ অমিয়কুমার মজুমদার ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে অমিয়বাবু কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরপূজায় নিযুক্ত ছিলেন। কামারপুকুর মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেও তিনি কিছুকাল ছাত্রদের দেখাশুনা করিয়াছিলেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী অমিয়বাবুর পূর্ব নিবাস নদীয়া জেলার খোকসা গ্রাম। প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ভ্রমসংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যা উদ্বোধনের ৪৪০ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের চতুর্দশ লাইনে '১৯৮০' স্থলে '১৯০০' হইবে।



দিব্য বাণী

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥ ২।৫৯

(সংযম সাধন তরে কিম্বা দেহ-বিকলতা হেতু)
বিষয় সম্ভোগ হতে বিরত যে জন,
বিষয় এলেও কাছে ইন্দ্রিয়-দুয়ার হতে তার
প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায় ফিরিয়া তখন।
'ভোগ সুখকর' এই বোধটুকু মনে তার রয়ে যায় তবু।
প্রত্যক্ষ করিলে সেই চরম পরম সত্যে, প্রভু পরমেশে
এই রসবোধও যায় চিত্ত হতে মুছিয়া নিঃশেষে॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥ ৬।২৩

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

যাহা পেলে মনে হয় জীবনের অন্য পাওয়া অতি অকিঞ্চিৎ,
ভীষণ দুঃখেরো মাঝে প্রশান্তি হইতে চিত্ত না হয় স্খলিত,
'যোগ' তাহা ; দুঃখসনে সংযোগসূত্রই তাহা চিরছিন্ন করে।
উদাসী না হয়ে তায় অবিরাম প্রচেষ্টায়
রত হও সেই যোগ, সত্য সনে সে সংযোগ লভিবার তরে॥

কথাপ্রসঙ্গে

মানুষ ও তাহার মন

১

কোন কার্যসিদ্ধির জন্য শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহার ফল নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর। একটি হইল, যে-শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে তাহার পরিমাণ, অপরটি হইল শক্তি-প্রয়োগের দিক। মাঠে একটি ফুটবল পড়িয়া আছে; আমি সেটিকে আঘাত করিয়া সরাইয়া দিলাম। বলটি কোন্‌দিকে কতদূর যাইবে, তাহা নির্ভর করে আঘাতপ্রয়োগের শক্তির পরিমাণ ও দিকের উপর।

এই নিয়ম কেবল জড়শক্তির বা জড়বস্তুর উপর নয়, আমাদের মানসিক শক্তি ও জীবনের সাফল্যের উপরও প্রযুক্ত। তাই এই দুইটি বিষয়েই যাঁহারা সজাগ তাঁহারাই জীবনে সফল হন: মনের শক্তি বা ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার প্রচেষ্টা এবং জীবনের যথার্থ কল্যাণপথের দিঙ্‌নির্ণয়।

ইচ্ছাশক্তিকে না বাড়াইলে মানুষ কখনো কোন বিষয়েই বড় হইতে পারে না। তবে নিজশক্তিকে সে জগতের কল্যাণ কি অকল্যাণ সাধনে প্রয়োগ করিবে, সে দেবতা হইবে কি অসুর হইবে, তাহা নির্ভর করে তাহার শক্তি-প্রয়োগের দিকের উপর।

সেজন্য ব্যক্তিগত জীবনকে ও সমাজকে কল্যাণমণ্ডিত করিতে হইলে যেমন জনসাধারণের জীবনে ইচ্ছাশক্তির বর্ধন এবং জীবনের যথার্থ কল্যাণের দিঙ্‌নির্ণয় উভয়ই সমভাবে প্রয়োজন, তাহার সহস্র গুণ অধিক প্রয়োজন সমাজ বা রাষ্ট্র-নেতাদের জীবনে। কারণ দেশ বা সমাজের সমষ্টি-শক্তির প্রয়োগ তাঁহাদেরই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলিয়া বহুজনের কল্যাণ বা অকল্যাণও তাঁহাদেরই উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে, যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাধনার সাফল্যে অমিতপ্রভাব আণবিক শক্তি মানুষের করতলগত, এই কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধনের সীমা আজ জগতের কোন ক্ষেত্র-বিশেষে আবদ্ধ নাই, সমগ্র জগৎই উহার ক্ষেত্র। মানবজাতিরই অস্তিত্ব, মানবসভ্যতারই অস্তিত্ব আজ নির্ভর করিতেছে শক্তিমানদের মানসিক প্রবণতা কোন্ দিকে, তাহার উপর—মানুষের কল্যাণ বলিতে তাঁহারা কেবল স্বদেশের বা স্বমতানুগ মানুষের না সব দেশের সব মানুষের কল্যাণ বুঝেন, তাহার উপর। আমরা জানি, দেশ-জাতি-বর্ণ-মত-বাদের বেড়া ভাঙ্গিয়া আমরা এখনো হৃদয়ে সব মানুষকে একাসনে বসাইতে পারি নাই।

অথচ মানবজাতির এই চরম বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়াও মানুষের মনকে কল্যাণমুখী করিবার জন্য কার্যকরী কোন পন্থার কথা কেহই ভাবিতেছেন না, বরং কোথাও কোথাও ইহার বিপরীত প্রচেষ্টার সাহায্যেই, মানুষের মনে সহজাত মানবপ্রেম এবং শুভসংস্কার-টুকুকেও নষ্ট করিয়া সেখানে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও জিঘাংসার উদ্রেক করাইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণের, সাম্যস্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে!

মানবজাতির এই বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করিয়া আর্নল্ড টয়েনবী ইহাকে "মানব-ইতিহাসের চরম বিপজ্জনক মুহূর্ত" বলিয়াছেন,—যখন পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যা

"পৃথিবীর মানুষের হাতে বিপুলবিধ্বংসী অস্ত্রসমূহ তুলিয়া দিয়াছে, পৃথিবীর দেশগুলির দূরত্ব কমাইয়া পরস্পরের উপর সরাসরি আঘাত হানিবার মতো অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে, অথচ যখন তাহারা পরস্পরকে ভালরূপে বুঝিতে ও ভালবাসিতে শিখে নাই।" মানসিক উন্নয়নের ব্যাপক ব্যবস্থা ছাড়া পরস্পরকে বুঝা ও ভালবাসা কোনদিনই সম্ভব হইবে না; কারণ ইহার জন্য প্রয়োজন উন্নত বুদ্ধিমাত্র নয়, উন্নত —সমবেদনাশীল ও নিঃস্বার্থ বা কম স্বার্থপর —মন। তিনি বলিয়াছেন, "মানবেতিহাসের এই চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পন্থাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ।" ইহা স্বামী বিবেকানন্দের সাবধানবাণীরই প্রতিধ্বনি : পাশ্চাত্যকে বাঁচিতে হইলে তাহার সভ্যতাকে জড়বাদের ভিত্তি হইতে সরাইয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতা বলিতে আমাদের নিজ দেহ-মন-চৈতন্য প্রভৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের অনুসন্ধানমুখতা, বা সহজ কথায় অন্তর্মুখতা বোঝায়, সংযম ও একাগ্রতার সাধনা যাহার মূল কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় সভ্যতার জীবনচর্যা অর্থাৎ ভারতীয়তা বলিতে যাহা বোঝায় তাহা হইল জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই সংযম এবং একাগ্রতার সাধনারই বিভিন্নরূপ প্রয়োগ।

একমাত্র এই সাধনাই মানুষের ইচ্ছাশক্তি বাড়াইয়া দিতে, এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন-প্রচেষ্টাকে কল্যাণমুখী করিতে সমর্থ। ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার নিয়ামকগণ তাই হাজার হাজার বছর ধরিয়া রাষ্ট্র ও সমাজের সর্ববিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথোচিত প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থন দিয়াও সর্বাধিক জোর দিয়াছেন এই অধ্যাত্মসাধনার উপর। কারণ, ইহার অভাব ঘটিলে সমাজ জাগতিক বিষয়ে যত উন্নতই হউক না কেন, উহা মানব-সমাজ না হইয়া দানবসমাজে রূপায়িত হইবে, যাহার অনিবার্য পরিণাম পরস্পরের সহিত স্বার্থ-সংঘাতের ফলে জাতির মৃত্যু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জড়বাদের ভিত্তি বালির ভিত্তি; উহার উপর গঠিত সভ্যতার আয়ু বড় জোর দুইশত বৎসর। তিনি তাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যে কোন আন্দোলনের পূর্বে সমগ্র দেশকে আধ্যাত্মিকতার ভাবে প্লাবিত করিতে হইবে; কেবল আধ্যাত্মিক সাধনা বা কেবল জাগতিক প্রয়োজন মিটাইবার বা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকারী হইতে পারে না—উভয় সাধনারই সমন্বয় ঘটাইতে হইবে জাতীয় জীবনে। স্বামী-জীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের' মিলন, 'ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের', সত্ত্বগুণের সহিত 'শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণের' মিলন প্রভৃতি কথার ইহাই তাৎপর্য। শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্যই ইহা প্রয়োজন; বিশেষ প্রয়োজন বর্তমান যুগে, যখন কোন দেশ বা জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের সহিত শুধু সেই দেশ বা জাতি নয়, সমগ্র পৃথিবীই জড়িত। তবে, একমাত্র ভারতই এ সমন্বয়ের আদর্শ জগতে স্থাপন করিতে পারে। (এই কারণেই ভারতের কল্যাণের জন্য তাঁহার প্রাণ এত ব্যাকুল ছিল, ভারত শুধু জন্মভূমি বলিয়াই নহে।) তিনি বলিয়াছেন, যদিও 'আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন'—যদিও আধুনিক ভারতবাসীর জীবন প্রাচীন ঋষিদের মতো আধ্যাত্মিক অনুভূতিসমুজ্জ্বল নহে, তথাপি 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আনিকধু

ভারতবাসীতেও পৈতৃক শক্তি বিদ্যমান।' এবং 'মহাশক্তির কৃপায় যথাকালে তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।' যদি আমরা বাঁচিতে চাই, যদি যথার্থ সাম্য এবং বিশ্বপ্রেমে বিশ্বাসী হইয়া সারা জগতের মানুষকেও বাঁচাইতে চাই, তাহা হইলে আমাদের এই দুইটিরই সাধনা একসঙ্গে করিতে হইবে - আমাদের অন্তরে আচ্ছাদিত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এবং পাশ্চাত্যজাতিগুলির মতো সর্ববিষয়ে জাগতিক উন্নতির সাধনা।

মানুষের মানসিক শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া, মানুষকে দেহসর্বস্ব ভাবিয়া জ্ঞানবিজ্ঞান সহায়ে কেবল তাহার দৈহিক প্রয়োজন মিটাইবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আজ যে পথে চলাকে প্রগতির পথ ভাবা হইতেছে, সে পথ জাতির মৃত্যুরই পথ। আর, ভারতীয়তাকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে শুধু উপেক্ষা মাত্র নয়, ধ্বংস করিয়া প্রগতির পথ সৃষ্টির সে অপপ্রয়াস আজ স্থূল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে, তাহা অবাধিত হইলে এই মৃত্যু হইবে অতি আসন্ন।

ভারতীয় জাতির মৃত্যু, ভারতীয়তার মৃত্যু মানেই সমগ্র পৃথিবীতে মানবতারই মৃত্যু, যাহার অনিবার্য পরিণাম মানবসভ্যতার ধ্বংস; স্বামীজীর ভাষায়, তখন "দেবদেবীরূপে কাম ও বিলাসিতা যুগ্ম রাজত্ব চালাইবে; অর্থ সে পূজার পুরোহিত, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা তাহার বলি।"

অবশ্য ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আশ্বাসবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, "তাহা হইবার নহে"।

আজ জনগণের পর্যাপ্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান, ও সম-বণ্টন, জাগতিক জীবনের মান-উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য আমরা যতখানি আগ্রহশীল, ততখানিই বা ততোধিক আগ্রহশীল হইতে হইবে ইহারই সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মানসিক উন্নয়নের জন্য। ইহারই অভাবে আজ শুধু দরিদ্র দেশের নয় বিপুল সম্পদশালী দেশেরও অগণিত মানুষ, বিশেষ করিয়া যুবকগণ জীবনের কোন উদ্দেশ্য না পাইয়া, আনন্দের কোন স্থায়ী অবলম্বন না পাইয়া বিপথগামী হইতেছে, উন্মাদের মতো উচ্ছৃঙ্খল প্রচেষ্টায় ইহার সন্ধানে ফিরিতেছে, এবং বোধ হয় বলিলে ভুল হইবে না, ইহারই অভাবে আমরা আজ দেশের সমস্যাগুলির সুসমাধানের কোন নিশ্চিত পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

২

মনই জীবনের চালক

শরীরের অতিরিক্ত মন বলিয়া কোন সত্তা আছে কিনা—ইহা শরীর জন্মাইবার পূর্বেও ছিল, শরীরের বিনাশের বা মৃত্যুর পরও থাকিবে, অথবা শরীরের সঙ্গেই ইহার জন্ম ও মৃত্যু ঘটে—এ বিষয়ে মতান্তর থাকিলেও এবং সাধারণ অবস্থায় ইহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি শরীর ব্যতিরিক্ত 'একটা কিছু' আছে। আমরা সকলেই একথা স্বীকার করি যে মনই আমাদের শরীরের চালক, মনের হাতেই জীবনরথের অশ্ববল্গা। যাহা আমাদের মনের ভাল লাগে, মন তাহাই পাইতে চায়; যে পথে চলিলে তাহা পাওয়া যাইবে, মন সে পথেই আমাদের টানিয়া লইয়া যায়। বলিতে পারি, সে মন নয়, বুদ্ধি; বুদ্ধি কল্যাণের পথ চিনিতে না পারিলে, দিঙ্‌নির্ণয়ে ভুল করিলেই জীবন বিপথে চলে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, শুধু তাহাই নয়, বুদ্ধি শুধু পরামর্শ

দিতে পারে, কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা নয়, তাহা বলিতে পারে—কিন্তু মনকে সেই মতো কাজ করাইতে হইলে শুধু ভালমন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বোধই যথেষ্ট নয়, ইহার অতিরিক্ত একটি শক্তির, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। শুভপথ চেনা এবং সে পথে চলার শক্তি, দুই-ই প্রয়োজন। মন যদি বুদ্ধির কথা শুনিয়াই সেই মতো চলিত, অর্থাৎ মনের ইচ্ছামতো না চলিয়া মনকে আমরা চালাইতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা প্রায় সকলেই মহামানব হইয়া যাইতাম। জীবনের ভালমন্দ বুঝিতে না পারার জন্য যে আমরা জীবনে উদ্দেশ্য লাভে বিফল হই, তাহা নহে: আমাদের এই বিফলতার একমাত্র কারণ আমরা যাহা ভাল বলিয়া বুঝি, মনের তাহা সব সময় ভাল লাগে না, আর মনকে আমরা সব সময় জোর করিয়া নিজের মতো চালাইতেও পারি না।

ইচ্ছাশক্তির তারতম্য লইয়াই মানুষ জন্মায়, ঠিক কথা। কিন্তু চেষ্টা করিয়া, অভ্যাসের দ্বারা আমরা মনের শক্তিকে বাড়াইতেও পারি। যেমন পারি বুদ্ধির যথোপযুক্ত প্রয়োগে জীবনের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে।

মনের ভাল লাগা

কোন কিছু মনের ভাল লাগে কেন? কারণ মন তাহাতে সুখ পায়, আনন্দ পায়। মন যাহা কিছু চায়, ভালমন্দ যাহা কিছু করাইতে চায় আমাদের দিয়া, তাহার পিছনে কোনও না কোনও ভাবে এই ভাললাগার, আনন্দলাভের ইচ্ছা বর্তমান। মন যদি আনন্দের আস্বাদ না পাইত, জীবনে আনন্দ বলিয়া যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে জীবনে কোন কাজে, সৎ অসৎ কোন কর্ম সাধনের জন্য কোন প্রেরণাই কাহারো আসিত না—

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"—হৃদয়ে যদি আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কে-ই বা জীবনের ধারক প্রাণক্রিয়া করিত, কে-ই বা অপানক্রিয়া করিত?—অর্থাৎ জীবনকে ধরিয়া রাখিবার কোন চেষ্টা কেহ করিত না। কবির ভাষায়, 'আকাশ আনন্দপূর্ণ না হইত যদি / জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।'

তবে ভাললাগা দুই রকমের আছে। একটি হইল ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগের ফলে উৎপন্ন। এ ভাললাগার সহিত সব মানুষই, সব প্রাণীই পরিচিত, প্রাণীমাত্রেই এ সুখ সাধারণ। দেহের মাধ্যমে বাহিরের বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া মন এই আনন্দের রূপ লয়। ইহার জন্য মনের কোন শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, এভাবে আনন্দ লাভ করিবার প্রবৃত্তি প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক। মানুষের আর এক ধরনের আনন্দ আছে; যেমন বিদ্যাচর্চার আনন্দ সম্মানলাভের আনন্দ, প্রতিপত্তি বা অন্য কিছুর অধিকারবোধের আনন্দ ইত্যাদি। অন্য প্রাণী এ আনন্দের অধিকারী হইতে পারে না। এগুলি কিন্তু স্থূল না হইলেও সূক্ষ্মভাবে বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত আনন্দই, যাহা বাহিরের কোন কিছু প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। আনন্দলাভের সহজ ও স্বাভাবিক উপায় বলিয়া এবং আনন্দলাভের অন্য উপায় না জানার জন্য এই পথকেই, বিষয়ভোগের পথকেই আমরা একমাত্র বাস্তব পথ বলিয়া মনে করি, এ পথে চলিতেই সর্বাধিক উৎসুক হই।

বিষয়ভোগ মনকে শান্তি দিতে পারে না

কিন্তু জীবনে শান্তি বা তৃপ্তি আসে কি এ পথে? মনের চাহিদা যতটা, ততটা আনন্দ

সে পায় কি? আমরা জানি, ইহার উত্তর, না। মনের চাওয়ার কোন সীমা নাই, যতই তাহাকে দেওয়া যাক, সে আরো চাহিবে—'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্যাপ্তং'—পৃথিবীতে যত ধন সম্পদ-শস্য-স্ত্রীলোকাদি আছে, একজন মানুষের মনের তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষেও তাহা যথেষ্ট নহে—মহাভারতের একথা অতি সত্য। এখন যাহা পাইলে তৃপ্ত হইবে বলিয়া আমাদের মন ভাবিতেছে, তাহা পাইলে কিছুদিন মাত্র তৃপ্ত থাকিয়াই সে আরও চাহিবে; সেটুকু পাইলে আরো বেশী চাহিবে; যতই পাউক, তাহার চাওয়া কোনদিন থামিবে না—সমগ্র পৃথিবীর সবকিছুকেই সে করায়ত্ত করিতে চাহিবে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এবং পৃথিবীর যে কোন দেশের দিকে, যে কোন সমাজের দিকে, যে কোন কর্মক্ষেত্রের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইলেই মানুষের মনের এই চির-অতৃপ্ত তৃষ্ণাকে স্পষ্টরূপে, বর্তমান জগতে তো অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

পৃথিবীতে সব মানুষের জন্যই আজ যদি জীবনধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজন মতো থাকা-খাওয়া-পরার ব্যবস্থা সমানভাবে করা সম্ভবও হয়, তাহা হইলেই কি মানুষের মনের সমস্যার সমাধান হইবে? তাহা হইলেই কি তাহার জীবনসমস্যার সমাধান হইবে? হইবে না যে, তাহা তো প্রমাণ করিতেছে যেসব দেশে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়, সে দেশগুলিরও আরো চাওয়ার এবং ন্যায় অন্যায় যেভাবেই হউক তাহা পূরণের প্রচেষ্টার বিকট রূপ। আর পৃথিবীর সব মানুষের ভাণ্ডারই যদি কুবেরের ঐশ্বর্যে ভরাইয়া দেওয়াও সম্ভব হয় কখনো, তাহা হইলেই কি মানুষের মনের চাহিদা সেখানে সীমারেখা টানিবে? টানিবে না যে, তাহাতেও জীবনকে যতখানি চায় ততখানি আনন্দে ভরপুর ভাবিতে পারিবে না যে, তাহার সাক্ষ্য বর্তমান জগতের অতি সমৃদ্ধ দেশগুলির মানসিক অস্থিরতা।

বরং, সর্বত্রই এই কথারই সমর্থন আজ পাওয়া যাইতেছে যে, বিষয়ভোগের মাধ্যমে যে সুখ মন আহরণ করে, তাহার পরিমাণ-বৃদ্ধিই মানুষের মনকে তৃপ্ত করিতে পারে না; বরং তাহা মনের অশান্তি আরও বাড়াইয়া দেয়, তাহার চাহিদাকে বর্ধিত করিয়া।

অবশ্য, আমাদের একথা বলার উদ্দেশ্য কখনই এই নয় যে, মানুষের অন্নবস্ত্রাদির অভাব মিটাইবার বা তাহার জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য উদ্যমের প্রয়োজন নাই; বলার উদ্দেশ্য, উহা তো করিতেই হইবে, কিন্তু মানুষের মানসিক উন্নতিকে উপেক্ষা করিয়া তো নয়ই, সে-বিষয়ে বরং অধিকতর সজাগ থাকিয়া।

তাছাড়া যে-কোন বিষয়ভোগের আনন্দই ক্ষণস্থায়ী, অধিকতর বুভুক্ষাসৃষ্টিকারী, মনের আনন্দ-উপভোগের চাহিদার তুলনায় অত্যল্প, এবং সর্বক্ষেত্রেই অবসাদ ও বিষণ্ণতা তার অনুগামী। আবার অত্যধিক ভোগের পরিণামও বিষময়। মানুষের ভোগতৃষ্ণার তুলনায় ভোগের শক্তিও সীমিত। একটি জীবন সে তৃষ্ণা মিটাইবার পক্ষে কিছুই নয়। এদিকে শরীর জীর্ণ হয়, ভোগতৃষ্ণা কিন্তু সেইসঙ্গে জীর্ণ হয় না, 'ন সা জীর্যতি জীর্যতঃ'। তাই, মানুষের দেহাতীত সত্তায় অবিশ্বাসীর কাছে, বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দের সন্ধান যে পায় নাই তাহার কাছে ইহার পরিণাম অধিকতর বিষময়।

তবু মন, ঘা খাইয়াও, পরিণাম জানিয়াও এই আপাতসুখলাভের পথেই জীবনকে বার বার পরিচালিত করে, কারণ আনন্দলাভের অন্য কোনও পথ তাহার জানা থাকে না। জানা থাকা মানে কেবল শোনা, বা 'সত্য হইতেও পারে' ভাবা নয়, বিষয়ভোগে আনন্দ পাওয়া যায় এ বিশ্বাস তাহার যতখানি দৃঢ়, ততখানি দৃঢ় বিশ্বাস। যে ভাবেই হউক এ বিশ্বাস যদি মনে একবার আসে, যদি সে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয় যে, বিষয়-ভোগ ছাড়াও আনন্দ লাভ সম্ভব, যে আনন্দ বিষয়ভোগে পাইতেছি তাহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী আনন্দ, প্রতিক্রিয়াহীন স্থায়ী আনন্দ লাভ সম্ভব, তাহা হইলে সে আনন্দলাভের জন্য বিষয় আহরণার্থে উদগ্র লালসা লইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া আর কখনো অগ্রসর হইবে না, অন্ততঃ সে-ইচ্ছাকে যথেষ্ট সংযত রাখিতে পারিবে। মানুষের সমস্যা মিটাইবার জন্য তাই মূল কথা হইল মনকে এই আনন্দের আস্বাদ একটু দিয়া মনের বিশ্বাস উৎপাদন।

৩

মনকে উন্নত করার সার্বজনীন উপায়

কিন্তু সত্যই কি বিষয়ভোগ ছাড়া আনন্দ-লাভের অন্য পথ কিছু আছে? মনকে তাহাতে আকৃষ্ট করা যায়? নিশ্চয়ই আছে, এবং নিশ্চয়ই যায়।

কিন্তু ইহার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা জোর করিতে হয়। ইহার জন্য ভারতের মনস্তাত্ত্বিকগণ শুধু অনুমান সহায়ে নয়, মন দেখিয়া, উহার প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া কয়েকটি সার্বজনীন পদ্ধতি দিয়া গিয়াছেন। যেগুলির মধ্যে প্রধান হইল দুইটি—নিয়মিত-ভাবে মনকে স্থির করার এবং মন যাহা চায় তাহাকে উহা না দিবার অভ্যাস; যাহার অপর নাম, একাগ্রতা ও সংযম অভ্যাস। দুটি নাম ভিন্ন হইলেও এদুটি মূলতঃ একটি চেষ্টারই দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ মাত্র —চিন্তার ক্ষেত্রে এবং কর্মের ক্ষেত্রে মনকে তাহার ইচ্ছামত চলিতে না দিয়ে নিজের বশে লইয়া আসিবার চেষ্টা।

কোন একটিমাত্র বিষয়ে মন স্থির করিতে যাইলেই প্রাথমিক অবস্থায় দেখা যায়, মন কোন্ ফাঁকে আমাদের অজ্ঞাতসারেই সেখান হইতে সরিয়া অন্য বহু চিন্তায় চলিয়া গিয়াছে —অবশ্য যে-বিষয়চিন্তা মনের ভাল লাগে তাহাতে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কিছুক্ষণ লাগিয়া থাকে। অর্থাৎ সে আমাদের কথা শুনিবে না, নিজের ইচ্ছামত চিন্তা করিবে! চেষ্টা করিয়া কোন একটি বিষয়ে উহাকে স্থির করিবার সময় যখনই আমরা টের পাই যে, সে অন্য চিন্তায় চলিয়া গিয়াছে, তখনই তাহাকে পূর্ব চিন্তায় ফিরাইয়া আনিতে হয়। ইহাই একাগ্রতার অভ্যাস। চেষ্টা-আরম্ভ মাত্রই মন স্থির হইবে না সত্য কথা, কিন্তু নিয়মিতভাবে এই অভ্যাসের ফলে ক্রমে স্থির হইয়া আসে। এবং এই চেষ্টার ফলেই ক্রমে মানুষ মনের অধীশ্বর হইয়া উঠে। যতবার আমরা মনকে ধরিয়া আনিয়া পূর্ব চিন্তায় নিয়োগ করি, ততবারই, যত অল্পই হোক, আমাদের ইচ্ছা-শক্তি—মনকে বশে আনার শক্তি—কিছুটা বাড়িয়া যায়।

আবার সংযমের বেলাও তাই। মন যখন যাহা চাহিতেছে, তখন তাহাকে তাহা না দিলে তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাশক্তি কিছুটা বাড়িবেই। ছোট-খাট জিনিস লইয়া, যেমন বিশেষ দিনে উপবাস, কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ-পালন, ইত্যাদি লইয়া ইহা আরম্ভ করিতে হয়, যাহা

আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ইহা ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার একটি উপায়।

একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে মন একটু স্থির হইলেই সে বিমল আনন্দের আস্বাদও একটু পায়। এ আনন্দ তাহার সচরাচর পরিচিত বিষয়ভোগজনিত আনন্দ হইতে পৃথক। কারণ ইহা আমাদের ভিতর হইতেই আসে। আমাদের মন সচরাচর যে আনন্দের সহিত পরিচিত তাহার জন্য বহির্জগতের কোন কিছু পাওয়ার উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়—কোন স্থূল ভোগ্যবস্তু, অথবা প্রশংসা আধিপত্য ইত্যাদি; কিন্তু একাগ্রতাজনিত আনন্দের জন্য বাহিরের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাই এ আনন্দ লাভের জন্য ভোগ্যবস্তুর আহরণ, সংরক্ষণ ও অধিকার লইয়া অপরের সহিত কোন সংঘর্ষেরও প্রশ্ন উঠে না, অপরকে ভালবাসার পথে কোন প্রতিবন্ধকও ইহা আনে না।

অবশ্য সব আনন্দ ভিতর হইতেই আসে, আনন্দ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। বিষয়ানন্দের ক্ষেত্রে বহির্বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে মনে এই পরিবর্তন আসে, একাগ্রতা-জনিত আনন্দের ক্ষেত্রে বিষয়নিরপেক্ষ ভাবেই, মন আপনা-আপনি পরিবর্তিত হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

আমাদের মন সাধারণতঃ এই আনন্দের সহিত পরিচিত নয় বলিয়াই বিষয়ানন্দের জন্য উন্মত্ত হয়। একাগ্রতাজনিত আনন্দ বিষয়া-নন্দের চেয়ে উচ্চতর, প্রতিক্রিয়াহীন ও দীর্ঘকালস্থায়ী আনন্দ। একবার এই আনন্দের আস্বাদ পাইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মন নিজেই উহা পুনরায় লাভের জন্য চেষ্টা করিবে, যেমন সে করিয়া থাকে বিষয়ানন্দের লাভের ক্ষেত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, মিছরীর পানার আস্বাদ একবার পাইলে কেহ আর চিটে গুড়ের পানা খাইতে চাহিবে না।

মনের শক্তি বাড়ানো এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত যথার্থ কল্যাণের দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য এই সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস তাই অপরিহার্য। ইহা ছাড়া মানুষের ভোগলালসা কমানো যায় না। আর সেই জন্য মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ কমানো যায় না, কারণ সর্ববিধ বিদ্বেষ এবং সংঘর্ষ মূলতঃ উদ্ভূত হয় ভোগ্যবস্তুর অধিকার লইয়াই।

৪

ভারতীয় জাতির নিয়ামকগণ সর্বসাধারণের মানসিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি সজাগ রাখিয়াই সামাজিক প্রথাগুলি প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, যাহার মধ্যে সাবলীলভাবে সংযম ও একাগ্রতার সাধনা ওতপ্রোত। প্রথাগুলির বাহ্য পরিবর্তন যুগে যুগে হইয়াছে, কিন্তু সেগুলির মূল তত্ত্বকে অপরিবর্তিত রাখিয়াই; হাজার হাজার বছর ধরিয়া সেসব তত্ত্বের ভিত্তি সামাজিক প্রথায় অটল হইয়া রহিয়াছে। ইহারই বলে অতীতে বারংবার সে বহু দুর্যোগ কাটাইয়া উঠিয়াছে, বর্তমানেও ইহারই বলে জড়বাদের দুর্যোগও কাটাইয়া স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই। জাগতিক দুঃখমোচন আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই; অধিকার- এবং ভোগ-সাম্যেরও প্রয়োজন। কিন্তু ইহার জন্য পথ আমাদের করিতে হইবে এই সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই দাঁড়াইয়া। বিদেশাগত অগভীর চিন্তায় প্রভাবান্বিত হইয়া এগুলির মূল্য সম্বন্ধে যেন বিভ্রান্তি না আসে আমাদের। মণিকে যেন কাঁচখণ্ড ভাবিয়া তাহার মূল্যায়ন না করি। জীবনে গ্রহণযোগ্য কোন কিছুর মূল্য-নির্ণয় সাময়িক ফল দেখিয়া বা অগভীর কয়েকটি যুক্তির সাহায্যে করা যায় না,—কালের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা দ্বারাই তাহা সঠিকভাবে করা সম্ভব।

ওঙ্কার

স্বামী ধ্যানানন্দ

ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় ক'রে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। ধর্মের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হ'ল—যা ধারণ করে। রক্ষণার্থক 'অব্' ধাতুর উত্তর ঐ 'মন্' প্রত্যয় করেই আমরা 'ওম্' শব্দটি পাই। ওম্-এর অর্থ হ'ল—যিনি রক্ষা করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর।

এখন, প্রথম প্রশ্ন হ'ল, ধর্ম-শব্দটি অ-কারান্ত; কিন্তু ওম্-শব্দটি ম্-কারান্ত কেন? 'ওম' হওয়াই তো উচিত ছিল।

এর উত্তর এই যে, ব্যাকরণের একটি সূত্র রয়েছে—'অবতেষ্টিলোপশ্চ' অর্থাৎ অব্-ধাতুর বেলায় বিশেষ নিয়ম এই যে, তার উত্তর মন্-প্রত্যয় করলে, মন্-এর 'অন্' অংশ লোপ পাবে, থাকবে শুধু 'ম্'।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, 'ও' এল কোথা থেকে?

এর উত্তর: পাণিনির ঈষৎ দীর্ঘ ও দুরুচ্চার্য সূত্র, 'জ্বরত্বর……' ইত্যাদির দ্বারা, 'অব্-'এর 'অ' ও 'ব্' এই উভয় স্থানেই 'উ' হবে। সুতরাং 'অব্ + মন্' দাঁড়াল 'উ + উ + ম্'। সন্ধি ক'রে হ'ল 'উম্'। 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ'—সূত্রানুসারে উ-কারের গুণ 'ও' হওয়ায় 'উম্' রূপান্তরিত হ'ল 'ওম্'-এ।[১]

'ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ' এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিদগ্ধ টীকাকার শান্তনু চক্রবর্তীও ওম্-এর এই ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি বলেছেন, পাণিনির 'কৃন্মেজন্তঃ' সূত্র অনুসারেই 'ওম্' একটি অব্যয়। এ বিষয়ে তিনি ভট্টোজী দীক্ষিত বা উজ্জ্বল দত্তকে অনুসরণ করেননি।

ব্যাকরণ-সূত্রের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচা গেল মনে হলেও, 'ওম্' যে 'অব্' ধাতু থেকে এসেছে এবং এর ধাতুগত অর্থ যে রক্ষাকর্তা ঈশ্বর, এই সারটুকু পাওয়ার জন্য বৈয়াকরণদের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করতেই হবে।

কেউ কেউ আরও সহজে 'ওম্' পদটি সিদ্ধ করেন। তাঁদের মতে 'অ' 'উ' 'ম্' দ্বন্দ্বসমাসবদ্ধ হলে 'ওম্' হয়।[২] এইভাবে পদটি সিদ্ধ করার উপযোগিতাও যথেষ্ট রয়েছে, কারণ বৈদিক যুগ থেকেই অকার, উকার ও মকারকে ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা, পাদ, বা অবয়ব রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত অকার উকার ও মকারের নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনেকগুলি ব্যাখ্যারই একটি সারসংক্ষেপ প্রসিদ্ধ শিবমহিম্নঃস্তোত্রের ২৭-সংখ্যক শ্লোকটিতে পাওয়া যায়—

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরান্
অকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥

আক্ষরিক অনুবাদ করলে শ্রুতিকটু হবে, তাৎপর্যও সম্ভবতঃ সুপরিস্ফুট হবে না, তাই শ্লোকটির ভাবানুবাদ দেওয়া হচ্ছে।

হে শরণদাতা শিব! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ তোমারই মূর্তি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও

১ সিদ্ধান্তকৌমুদী, উণাদি প্রকরণ

২ শিবমহিম্নঃস্তোত্র (Arthur Avalon Edn.) শ্লোক ২৭, সারার্থদীপিকা টীকা, পৃঃ ৫৭

সুষুপ্তি তোমারই অবস্থাত্রয়। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোকও তুমি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রও তোমারই রূপ। আর যেহেতু ওঙ্কারের তিনটি অবয়ব—অকার, উকার ও মকার যথাক্রমে ঐ ঋগাদি তিন বেদ, জাগ্রদাদি তিন অবস্থা, পৃথিবী আদি তিন লোক ও ব্রহ্মাদি তিন দেবতার বাচক সেই হেতু ওঙ্কার পৃথক্ পৃথক্ ঐ তিন বর্ণের দ্বারা তোমার স্তুতি করছে। আবার ঐ তিন বর্ণের একত্র সমাবেশে যে সূক্ষ্ম ওঙ্কার নাদ স্ফুরিত হয়, তা তোমারই তুরীয় স্বরূপের স্তুতি করছে।

এখন আমরা অকার, উকার ও মকারের কয়েকটি ব্যাখ্যার বিশদ আলোচনা করছি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভক্তিযোগ[৩] ও রাজযোগ[৪] গ্রন্থ দুটিতে অকার, উকার ও মকারের একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে সেই ব্যাখ্যা সাধারণভাবে আলোচিত হচ্ছে। অকার সমস্ত বিশেষবর্জিত একটি ধ্বনি যা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ যদিও কণ্ঠ্য অন্যান্য বর্ণ রয়েছে, যেমন 'ক' 'খ' 'গ' ইত্যাদি, তবু সেগুলির উচ্চারণে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছেই। —একটু মনঃসংযোগ করে 'অ' এবং 'ক' 'খ' 'গ' প্রভৃতি উচ্চারণ করলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, এই গুলির উচ্চারণস্থান কণ্ঠ হলেও, কণ্ঠের ঠিক একই জায়গা থেকে এরা উচ্চারিত হয় না।

অনুরূপভাবে, উকার ও মকার উভয়ই ওষ্ঠ্য বর্ণ হলেও, উচ্চারণ-প্রযত্নের পার্থক্য আছে। উকারের ধ্বনি কণ্ঠ থেকে ওষ্ঠ অবধি গড়িয়ে যায়। মকারের উচ্চারণস্থান শুধু ওষ্ঠ।

অকার, উকার ও মকারের উচ্চারণকালে ওষ্ঠদ্বয় যথাক্রমে উন্মুক্ত থাকে, সঙ্কুচিত বা সন্নিহিত হয়, ও সম্পূর্ণ মিলিত হয়। সুতরাং শব্দোচ্চারণের সমগ্র প্রক্রিয়াটিই 'অউম' উচ্চারণের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে। অতএব যে কোনও শব্দ আমরা উচ্চারণ করি না কেন, তা' 'অউম' অর্থাৎ ওঙ্কার ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি বস্তুরই একটি রূপ আছে এবং সেই রূপের একটি বা একাধিক নাম আছে। কিন্তু যত নামই থাকুক না কেন, সব নামই পূর্বোক্ত প্রকারে ওঙ্কারধ্বনির অন্তর্গত। সুতরাং ওঙ্কার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাচক। আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরেরই বাহ্যরূপ ব'লে ওঙ্কার ঈশ্বরেরও বাচক। ব্যক্তিতে যেমন একটি দেহের অন্তরালে দেহী রয়েছেন, দেহটি দেহীরই রূপ এবং তার একটি নাম রয়েছে, সমষ্টিতেও ঠিক সেই রকম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ঈশ্বর রয়েছেন এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই রূপ।

আচার্য নিম্বার্ক ওঙ্কারের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অকারের অর্থ 'ব্রহ্ম' (অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি, গীতা ১০।৩৩) উকারের অর্থ 'গুরু' (উন্নয়তি ইতি উঃ—নেতা গময়িতা, ঈশ্বরের নিকট যিনি পৌঁছে দেন এবং মকারের অর্থ হ'ল 'জীব' অর্থাৎ সাধক (বর্গীয় বর্ণসমূহের মধ্যে 'ম' হচ্ছে পঞ্চবিংশতি-তম বর্ণ; সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হচ্ছে প্রকৃতি, এবং পুরুষ বা জীব হচ্ছে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব; শ্রুতিতেও আছে—'পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ')। এখন, গীতার 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি-র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্'—ইত্যাদি শ্লোক (৪।২৪) অনুসারে ওঙ্কার-জপকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণরূপ একটি যজ্ঞে পরিণত করতে হবে। হোমকালে

---

৩ বাণী ও রচনা ১ম সং, ৪।৩৬৩-৮
৪ ঐ ১।৩১৮

যেমন প্রথমে ঘৃত অর্পণে অর্থাৎ স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রে (হাতায়) রাখা হয় এবং তারপর অগ্নিতে অর্পিত হয়, ঠিক সেই রকম সাধক প্রথমে হবিঃস্থানীয় মকাররূপী নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞপাত্রস্থানীয় উকাররূপী গুরুতে নিহিত করে অবশেষে অগ্নিস্থানীয় অকাররূপী ব্রহ্মে আহুতি দেবেন। অর্থাৎ সাধক যে শ্রীগুরুর মাধ্যমেই নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করছেন, এইভাব তাঁর হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকবে ওঙ্কার-জপের সময়ে। এইভাবে আচার্য নিম্বার্ক ওঙ্কারের তিনটি বর্ণ যে উপাসনার তিনটি অবয়ব—ঈশ্বর, সদ্‌গুরু ও সাধকের প্রতীক তা বলেছেন এবং উপাসনা-তত্ত্বের ও প্রণালীর সারকথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছেন।[৫]

আচার্য শংকর তাঁর রচিত 'পঞ্চীকরণ'-এ ওঙ্কারের ভিতর সমগ্র অদ্বৈতবেদান্ত অনুপ্রবিষ্ট দেখিয়েছেন। 'পঞ্চীকরণ' শংকররচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিমাত্র। তার উপর তাঁর শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যের ৬৪ শ্লোকের একটি বার্ত্তিক আছে এবং আনন্দগিরি-রচিত একটি টীকাও আছে। শংকর অবশ্য পঞ্চীকরণের বিষয়বস্তু মাণ্ডূক্য উপনিষৎ থেকেই নিয়েছেন! তবে ওঙ্কার সহায়ে কি ভাবে নির্গুণোপাসনা করতে হয়, তার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। শংকর বলেছেন: অকারের অর্থ হ'ল—(১) জাগ্রৎ অবস্থা, (২) স্থূল শরীর এবং (৩) জাগ্রৎ অবস্থা ও স্থূল শরীরে অভিমানী চৈতন্য, যাকে 'বিশ্ব' বলা হয়; উকারের অর্থ হ'ল—(১) স্বপ্নাবস্থা, (২) সূক্ষ্ম শরীর এবং (৩) স্বপ্নাবস্থা ও সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী চৈতন্য, যাকে 'তৈজস' বলা হয়; মকারের অর্থ হ'ল—(১) সুষুপ্তি অবস্থা, (২) কারণ শরীর এবং (৩) সুষুপ্তি অবস্থা ও কারণ শরীরে অভিমানী চৈতন্য যাকে 'প্রাজ্ঞ' বলা হয়।

আরও কথা এই যে, ব্যষ্টিতে যে চৈতন্যকে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলা হয়, সমষ্টিতে তাকেই যথাক্রমে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর বলা হয়। এজন্য অকার, উকার, মকার বলতে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরকেও বোঝায়।

নির্গুণ উপাসনার প্রণালী হচ্ছে স্থূলকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে কারণে এবং কারণকে নির্বিশেষ চৈতন্যে লয় করতে হয়। অর্থাৎ অকারকে উকারে, উকারকে মকারে এবং মকারকে সর্বাভিমানবর্জিত আত্মাতে—শুদ্ধ চৈতন্যে লয় করতে হয়। এই শুদ্ধ চৈতন্যই ওঙ্কারের তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রা, মাণ্ডূক্য উপনিষদে যাকে 'অমাত্রা' বলা হয়েছে—'অমাত্রঃ চতুর্থঃ অব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবঃ অদ্বৈতঃ এবম্ ওঙ্কারঃ আত্মা এব' (১।১২)।

বস্তুতঃ মাণ্ডূক্য উপনিষদে যে নির্গুণ উপাসনার কথা বলা হয়েছে তার অনুষ্ঠান-প্রণালী আচার্য শংকর পঞ্চীকরণে বিবৃত করেছেন। পঞ্চদশীকারও ঐ কথাই বলেছেন:

মাণ্ডূক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা।
অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ॥

৯।৬৩-৬৪

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ওঙ্কারোপাসনা কেবল যে নির্গুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা, তা পঞ্চদশীকারের মত নয়। পঞ্চদশীতে আছে:

প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।
ক্বচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা প্রণবোপাসনস্য হি॥

৯।১৪৭

অর্থাৎ, বেদে যে সব ওঙ্কারোপাসনার

---

৫ মন্ত্ররহস্যষোড়শী, শ্লোক ৩, ৭-৯

কথা বলা হয়েছে, সে সব প্রায়ই নির্গুণোপাসনা; তবে কোন কোন জায়গায় সগুণোপাসনার কথাও বলা হয়েছে।

মাণ্ডূক্যের পরই আমরা প্রশ্নোপনিষদের উল্লেখ করছি। এতে ওঙ্কারের তিনটি মাত্রার কথা বলা হয়েছে। এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে ওঙ্কারোপাসনা ও তার ফল সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। যদিও মূলে অকার, উকার ও মকারের কোনই উল্লেখ নেই, তবু আচার্য শংকর তাঁর ভাষ্যে পরিষ্কারভাবে অকার, উকার ও মকারের উল্লেখ করেছেন। ভাষ্যে এই উল্লেখ না থাকলে আমরা এখানে এই উপনিষদের অবতারণা করতুম না, কারণ আপাততঃ অকার উকার ও মকারের ব্যাখ্যাই আমাদের বর্ণনীয় বিষয়। এই উপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে যে, ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকারের অর্থ হ'ল পৃথিবী ও ঋগ্বেদ; দ্বিতীয় মাত্রা উকারের অর্থ হ'ল অন্তরিক্ষ ও যজুর্বেদ এবং তৃতীয় মাত্রা মকারের অর্থ হ'ল সূর্য ও সামবেদ। অকারমাত্রার উপাসক দেহান্তে অকারমাত্রারূপা ঋগ্বেদপ্রভাবে অচিরেই পুনরায় এই পৃথিবীতে মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ করেন এবং তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও শ্রদ্ধাসহায়ে বিভূতিমান হন; অকার* ও উকারমাত্রার উপাসক দেহান্তে উকারমাত্রারূপী যজুর্বেদ কর্তৃক অন্তরিক্ষে চন্দ্রলোকে নীত হন এবং সেখানে ঐশ্বর্যভোগান্তে তাঁর পুনরাবর্তন হয়। কিন্তু যিনি অকার, উকার ও মকার এই তিন মাত্রাযুক্ত ওঙ্কারকে পরব্রহ্মের প্রতীক জেনে উপাসনা করেন, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে যান এবং সেখানেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ ক'রে মুক্তি পেয়ে থাকেন, তাঁর আর পুনরাবৃত্তি হয় না। বেদান্তদর্শনেও 'ঈক্ষতি কর্মব্যপদেশাৎ সঃ'—সূত্রে (১।৩।১৩) এই উপাসনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে।

বহু উপনিষদেই ওঙ্কারের অকার, উকার, মকার—এই তিনটি মাত্রার ব্যাখ্যা রয়েছে; মাণ্ডূক্য, প্রশ্ন, ধ্যানবিন্দু, নৃসিংহতাপনী, যোগচূড়ামণি প্রভৃতি বিভিন্ন উপনিষৎ থেকে ওঙ্কারের মাত্রাত্রয়ের যে সব অর্থ পাওয়া যায় তা' নীচে দেওয়া হ'ল :

	অ	উ	ম
১।	স্থূল	সূক্ষ্ম	কারণ (শরীর)
২।	জাগ্রৎ	স্বপ্ন	সুষুপ্তি (অবস্থা)
৩।	বিশ্ব	তৈজস	প্রাজ্ঞ (ব্যষ্টি চৈতন্য)
৪।	বিরাট	হিরণ্যগর্ভ	ঈশ্বর (সমষ্টি চৈতন্য)
৫।	ঋক্	যজুঃ	সাম (বেদ)
৬।	ভূঃ	ভুবঃ	স্বঃ (লোক)
৭।	ব্রহ্মা	বিষ্ণু	রুদ্র (দেবতা)
৮।	সৃষ্টি	স্থিতি	লয় (ক্রিয়া)
৯।	রজঃ	সত্ত্ব	তমঃ (গুণ)
১০।	রক্ত	শুক্ল	কৃষ্ণ (বর্ণ)
১১।	গায়ত্রী	ত্রিষ্টুভ্	জগতী (ছন্দঃ)
১২।	গার্হপত্য	দক্ষিণ	আহবনীয় (অগ্নি)

এ ছাড়াও আরও অনেক ত্রিপুটি বা ত্রয়ীর উল্লেখ দেখা যায়, যাতে ওঙ্কারদৃষ্টি করতে বলা হয়েছে, যদিও সেই সব জায়গায় অকার উকার ও মকারকে যথাক্রমে স্থাপিত বা চিহ্নিত করা সমস্যার ব্যাপার। সম্ভবতঃ ত্রিপুটিত্ব

---

* এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আনন্দগিরির মতে কেবল উকারমাত্রার কথা এই দ্বিতীয় উপাসনায় বলা হয়েছে। তবে তিনি তাঁর টীকাতেই উল্লেখ করেছেন যে, দীপিকাতে মাত্রাদ্বয়ের মিলিত উপাসনার কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রীভাষ্য এবং 'বেদান্ত-কৌস্তুভ'-এও মিলিত উপাসনা গৃহীত হয়েছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণনও এই অর্থই গ্রহণ করেছেন (The Principal Upanisads: p. 664)। যে ধারায় উপাসনাগুলি কথিত হয়েছে, তাতে মিলিত উপাসনাই সমীচীন মনে হয়।

উভয়ত্র সমান বলেই ঐ ভাবে ওঙ্কারদৃষ্টির প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন মৈত্রী উপনিষদে —স্ত্রী, পুং ও নপুংসক; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য; প্রাণ, অপান ও ব্যান; প্রাণ, অগ্নি ও সূর্য; অন্ন, জল ও চন্দ্রমা, বুদ্ধি, মন ও অহংকার ইত্যাদি ত্রিপুটিগুলিকে যথাক্রমে আত্মার লিঙ্গবতী তনু, কালবতী তনু, ভাস্বতী তনু, প্রাণবতী তনু, প্রতাপবতী তনু, আপ্যায়নবতী তনু ও চেতনবতী তনু ইত্যাদি বলা হয়েছে এবং মাত্রাত্রয়রূপী ওঙ্কারের উচ্চারণ দ্বারা আত্মার এই সব বিভিন্ন রূপের স্তুতি ও পূজা করা হয়, বলা হয়েছে।[৭]

মূল কথা এই যে ওঙ্কার সগুণ ও নিগুর্ণ দ্বিবিধ ব্রহ্মেরই বাচক—যিনি বিশ্বরূপী তাঁরও বাচক এবং যিনি বিশ্বাতীত তাঁরও। যিনিই বিশ্বরূপী, তিনিই বিশ্বাতীত। কিন্তু প্রথমেই বিশ্বাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব ধারণা করা যায় না। তাই বিশ্বরূপী ব্রহ্মতত্ত্বকে ওঙ্কারসহায়ে বুদ্ধিতে আরূঢ় করতে হয়। তা'ও প্রথমে সম্ভব হয় না, তাই প্রত্যেক ত্রিপুটিতে—বিশেষ বিশেষ বস্তুতে ওঙ্কারদৃষ্টি করতে বলা হয়েছে। এই সাধনার ফলশ্রুতি হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দর্শন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উদ্দেশ্যেই বিভূতিযোগের কথা মুখ্যত: দশম ও অংশত: সপ্তম, নবম ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন। উপনিষদ্‌গুলিতেও ঐ একই ব্যবস্থা দেখা যায়।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে যাকে অমাত্রা বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাকেই অর্ধমাত্রা বলা হয়েছে। অর্ধমাত্রার অন্য রকমের ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু চণ্ডীর অধিকাংশ টীকাকার অর্ধমাত্রাকেই ওঙ্কারের তুরীয়মাত্রা বলে উল্লেখ করেছেন। হরির যোগনিদ্রা ভঙ্গের জন্য ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করছেন: বলছেন—তুমি 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা' অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-রূপিণী এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন—'অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষত:' অর্থাৎ, তুমি নিত্যা, তুরীয়মাত্রারূপিণী, উচ্চারণ করে তোমায় উচ্ছিষ্ট করা যায় না। এখানে অকারের অর্থ সৃষ্টি, উকারের অর্থ স্থিতি এবং মকারের অর্থ প্রলয়। পূর্বে উল্লিখিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত, অকার-উকার-মকারের বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে, এই অর্থ খুবই স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায়। উপনিষদ্‌গুলি থেকেও আমরা এই অর্থ পূর্বেই পেয়েছি। দেবীভাগবতেও আছে—'অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকার: স্যাদ্ হরি: স্বয়ম্, মকারো ভগবান্ রুদ্র:' ইত্যাদি (৫।১।২২-২৩)। সুতরাং লক্ষণার দ্বারা 'ত্রিধামাত্রাত্মিকা'র অর্থ হয়—যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। 'অর্ধমাত্রাস্থিতা'র অর্থ তুরীয়া—যখন এই তিনটি কাজ করেন না, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া। মা কালীর ধ্যানচিত্র এই তত্ত্বেরই প্রতীক। শিবরূপে যিনি মায়ের পদতলে শায়িত তিনিও নিষ্ক্রিয়া মা-ই। 'একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম-রূপ-ভেদ'—এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা।[৮] তত্ত্ব একটিই, দু'টি নয়। গীতার ১৪শ অধ্যায়ে অন্তিম শ্লোকের 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' এই অংশের শংকর যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন, তা'তে বলেছেন—'অহম্' অর্থাৎ আমি নিগুর্ণ

৭ Dr. Radhakrishnan: The Principal Upanisads. pp. 818-19

৮ কথামৃত, ১।২।৪

ব্রহ্ম, 'ব্রহ্মণঃ' অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের—'প্রতিষ্ঠা' (pedestal)—সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। শংকরের এই ব্যাখ্যা উপরে উক্ত মায়ের ধ্যানচিত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এখানে pedestal statue (মূর্তি) থেকে পৃথক বস্তু নয়। 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

'শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি'—এখানে ত্র্যম্বকার প্রচলিত অর্থ হ'ল ত্রিনয়না। তবে 'ওঙ্কার-প্রতিপাদ্যা', অর্থাৎ ওঙ্কারের প্রতিপাদ্যা যিনি —এই অর্থও হয়। অম্বা শব্দের অর্থ বর্ণ। তিনটি বর্ণ—অকার, উকার ও মকার যাতে আছে, তিনি ত্র্যম্বকা। 'ত্রয়ো বর্ণাঃ অকারোকারমকারাঃ প্রতিপাদকা যস্যাঃ। প্রণবপ্রতিপাদ্যা ইত্যর্থঃ। স্বার্থে কঃ'।[৯]

শ্রীশ্রীচণ্ডী যে-পুরাণের অংশবিশেষ, সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণেই 'ওঙ্কারস্বরূপকথন' নামে একটি অধ্যায় (৪২শ) রয়েছে। তাতে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য এবং অকার, উকার ও মকারের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই সব ব্যাখ্যা অধিকাংশই উপনিষৎ-প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একটি মাত্র প্রসিদ্ধ পুরাণের ওঙ্কার-প্রসঙ্গ এখানে দিগ্-দর্শনরূপে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হ'ল, নচেৎ প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হয়ে পড়বে।

ওঙ্কারের তিনটি ও চারটি মাত্রার কথা আমরা উপনিষৎ ও পুরাণসহায়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনাই এখানে যথেষ্ট মনে করি। তবু উল্লেখ্য এই যে, ওঙ্কারের ৮টি মাত্রা, ১২টি মাত্রা ও ১৬টি মাত্রার কথাও আমরা উপনিষদ্গুলিতে পাই। বরাহোপনিষদে[১০] ওঙ্কারের অ, উ, ম এবং অর্ধমাত্রাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ এবং সাক্ষী অংশক্রমে এইভাবে বিভক্ত করা হয়েছে :

অ=জাগ্রদ্বিশ্ব, জাগ্রৎ-তৈজস, জাগ্রৎ-প্রাজ্ঞ, জাগ্রৎ-তুরীয়

উ=স্বপ্নবিশ্ব, স্বপ্নতৈজস, স্বপ্নপ্রাজ্ঞ, স্বপ্ন-তুরীয়

ম=সুষুপ্তিবিশ্ব, সুষুপ্তিতৈজস, সুষুপ্তিপ্রাজ্ঞ, সুষুপ্তিতুরীয়

অর্ধমাত্রা=তুরীয়বিশ্ব, তুরীয়তৈজস, তুরীয়প্রাজ্ঞ, তুরীয়-তুরীয়

মোট এই ১৬টি মাত্রার অতীত অর্থাৎ ষোড়শ মাত্রা তুরীয়-তুরীয়েরও অতীত, একটি মাত্রা আছে।

অকারের ৪র্থমাত্রায় অর্থাৎ জাগ্রৎ-তুরীয় অবস্থায় থাকেন মুমুক্ষুরা—এঁদের তিনটি ভূমি, 'শুভেচ্ছা', 'বিচারণা' ও 'তনুমানসী' (১ম, ২য়, ৩য় ভূমি); উকারের ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ স্বপ্নতুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্রা এঁদের ভূমি হচ্ছে 'সত্ত্বাপত্তি' (৪র্থ ভূমি); মকারের ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ সুষুপ্তি-তুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্বরেরা, এঁদের ভূমি হচ্ছে 'অসংসক্তি' (৫ম ভূমি); অর্ধমাত্রার ৪র্থ মাত্রায় অর্থাৎ তুরীয়-তুরীয় অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্রা—এঁদের ভূমি হচ্ছে 'পদার্থভাবিনী' (ষষ্ঠভূমি); এটি ওঙ্কারের ষোড়শ মাত্রা। এরও অতীত অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠরা ; তাঁদের ভূমি হচ্ছে 'তুরীয়গা' (৭ম ভূমি)। ওঙ্কার ছাড়া যখন কিছুই নেই, তখন এই সপ্তম ভূমিকে ওঙ্কারেরই একটি মাত্রাহীন মাত্রা বা মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভাষায় 'অমাত্রা' বলতে হবে। এইভাবে

৯ শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১।৯, নাগোজীভট্টের টীকা

১০ নির্ণয়সাগর প্রেস : ১০৮ উপনিষদ্, ৪র্থ অধ্যায়, পৃ: ৫৩১-৩২

ওঙ্কারকে মুমুক্ষু ও মুক্তপুরুষদের সাতটি অবস্থার প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে

নাদবিন্দু[১১] উপনিষদে ওঙ্কারের ১২ মাত্রার এবং তারসার[১২] উপনিষদে ওঙ্কারের ৮ মাত্রার উল্লেখ ও বিশদ বিবরণ আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে তা' আলোচিত হ'ল না।

অকারাদি মাত্রার দিক থেকে আমরা ওঙ্কারের কয়েকটি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছি। এখন শাস্ত্রে সাধারণভাবে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সব কথা পাওয়া যায়, তার কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ শুরু করা হয়েছে ওঙ্কার উপাসনার কথা দিয়ে এবং প্রথম অধ্যায়ে নানাভাবে ঐ প্রসঙ্গের অবতরণা ক'রে ওঙ্কারের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে।

ঐ উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকর লিখছেন : 'ওঁ' এই অক্ষরটি পরমাত্মার 'নেদিষ্ঠ অভিধান', অর্থাৎ পরমাত্মার বাচক অন্যান্য শব্দ রয়েছে বটে, তবে ওঙ্কার তাঁর নিকটতম বাচক; ওঙ্কারের প্রয়োগে পরমাত্মা প্রসন্ন হন, লোকে যেমন প্রিয় নামে সম্বোধিত হ'লে হয়ে থাকে; এটি পরমাত্মার প্রতীকও বটে; এইভাবে নাম ও প্রতীক এই উভয় হওয়াতে পরমাত্মার উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন হচ্ছে ওঙ্কার—সর্ব বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত। জপাদি কার্যে এবং বেদপাঠের আদিতে ও অন্তে বহুল প্রয়োগ হেতু ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব অতি প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি।

প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে যেমন ওঙ্কারকে পর ও অপর ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক বলা হয়েছে, কঠোপনিষদেও তাই বলা হয়েছে :

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

১।২।১৬

এই ওঙ্কারই অপর ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম। এই ওঙ্কারকে জেনে যিনি যা ইচ্ছা করেন, তাঁর তাই সিদ্ধ হয়।[১৩]

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

১।২।১৭

এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এবং অপর-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মবিষয়ক। এই অবলম্বনকে জেনে সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হ'ন অথবা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।[১৪]

এখানে লক্ষণীয় এই যে, নচিকেতা যখন সমস্ত প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে কালত্রয়েও যা পরিচ্ছিন্ন হয় না, সেই পরম সত্যকে জানতে চাইলেন, তখন যম প্রথমেই তাঁকে ওঙ্কার উপদেশ দিলেন :

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

১।২।১৫

বেদসমূহ যে অভীষ্ট বস্তু প্রতিপাদন করেন, সমস্ত তপস্যা যাঁকে ঘোষণা করে, যাঁর প্রাপ্তির ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করে, আমি সংক্ষেপে সেই প্রাপ্য বস্তু সম্বন্ধে তোমায় বলছি—, সেটি ওঁ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শীক্ষাধ্যায়ের অষ্টম অনুবাকে দশটি ছোট ছোট বাক্য আছে। তার নয়টি বাক্যেরই আদিতে ওঁ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে :

১১ নির্ণয়সাগর প্রেস : ১০৮ উপনিষদ্, মন্ত্র ১—১৬, পৃ: ২৪২
১২ ঐ ২য় অধ্যায়, পৃ: ৫০৭

১৩, ১৪ শঙ্করভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥

এর শাংকরভাষ্যের মর্মার্থ এইরকম :

'ওমিতি ব্রহ্ম' (ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে) এই প্রথম বাক্যটির দ্বারা শ্রুতি, সমস্ত উপাসনার অঙ্গীভূত ওঙ্কারের উপাসনার বিধান দিয়েছেন। 'ওমিতীদং সর্বম্' এই দ্বিতীয় বাক্যে কেন ওঙ্কারোপাসনা করতে হবে তার কারণ দেখানো হয়েছে; শব্দরূপ এই সব কিছুই ওঙ্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—এই হ'ল কারণ। অবশিষ্ট ৮টি বাক্যে ওঙ্কারের স্তুতি করা হয়েছে—ওঙ্কারপুটিত সমস্ত ক্রিয়া ফলবতী হয়, সুতরাং ওঙ্কার ব্রহ্মরূপে উপাসনীয়, এই হ'ল বাক্যগুলির তাৎপর্য—'ওঙ্কারপূর্বং প্রবৃত্তানাং ক্রিয়াণাং ফলবত্ত্বং যস্মাৎ, তস্মাৎ ওঙ্কারং ব্রহ্ম ইতি উপাসীত, ইতি বাক্যার্থঃ।' (শাংকর ভাষ্য)।

এই ৮টি বাক্যে বৈদিক যুগে ওঙ্কারের বহুল প্রয়োগের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায় :

ওম্ এই শব্দটি সম্মতিজ্ঞাপক ব'লে প্রসিদ্ধ। (দর্শ,[১৫] পূর্ণমাস আদি যজ্ঞে) 'ও শ্রাবয়' ('ও', 'ওম্'-এরই আদ্য অংশ—সায়ণ) এই প্রৈষ[১৫] মন্ত্র যজুর্বেদীয় ঋত্বিক উচ্চারণ করলে, অন্যান্য ঋত্বিকরা দেবগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠ করেন। ওম্ উচ্চারণ করেই সামবেদীয় ঋত্বিক সামগান করেন। 'ওঁ শোম্' উচ্চারণ ক'রে ঋত্বিকেরা শস্ত্র নামক স্তোত্রসমূহ (গীতরহিত সামসমূহ) পাঠ করেন। ওম্ উচ্চারণ ক'রে অধ্বর্যু প্রতিগর (শোং সামো দৈবম্[১৬]—এই উৎসাহবর্ধক মন্ত্র) উচ্চারণ করেন। ওম্ উচ্চারণ ক'রে ব্রহ্মা (যজ্ঞ-পরিচালক প্রধান ঋত্বিক) যজ্ঞের অনুজ্ঞা দেন। যজমান ওম্ ব'লে অধ্বর্যুকে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুমতি দেন। (সেই রকম, ব্রহ্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েও) বেদ অথবা পরমাত্মাকে লাভ করব মনে ক'রে বেদপাঠক বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ওম্ উচ্চারণ করেন এবং তার ফলে তিনি অবশ্যই বেদ বা পরমাত্মাকে লাভ ক'রে থাকেন।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে :

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

২।২।৪

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ২।২।৬

অর্থাৎ, ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্মকে ঐ বাণের লক্ষ্য বলা হয়। প্রমাদহীন হয়ে লক্ষ্যভেদ করতে হবে। বাণের মতো তন্ময় হতে হবে—লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হতে হবে।

আত্মাকে ওঙ্কারসহায়ে ধ্যান করো। অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত দেশে যাওয়ার পথে তোমাদের মঙ্গল হোক। (ক্রমশঃ)

---

১৫ দর্শ, পূর্ণমাস, প্রৈষ ইত্যাদির সরল বিবরণ ও ব্যাখ্যার জন্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা' দ্রষ্টব্য।

১৬ স্বামী গম্ভীরানন্দ : উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১।১৭৫

'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের একটি কবিতা পড়তে পড়তে ভগবদ্গীতার যেটি পরমতত্ত্ব, সেই তত্ত্বের কথা মনে হচ্ছিল। আমি কবির Prayer of Columbus পড়ছিলাম। এই কবিতাটি একজন সমালোচকের মতে The poetic autobiography of a soul. 'কলম্বাসের প্রার্থনা' কবিতাটিতে কবি কাব্যের ভাষায় নিজের পরিচয়কে অবারিত করেছেন। এই কাব্যময় আত্মজীবনীর মুকুরে কবিকে আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনসায়াহ্নের পরিপ্রেক্ষিতে। শালপ্রাংশু মহাকায় কবি দুশো পাউণ্ড ওজনের সুকঠিন বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে হেঁটে চলেছেন ওয়াশিংটনের রাজপথ দিয়ে। যেন মূর্ত গণতন্ত্র। এই ছিলো কবির জীবন-মধ্যাহ্নের ছবি। সেই ছবি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি জীবনসন্ধ্যায় চলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। দুঃখের মধ্যেই তাঁর দিনগুলি অতিবাহিত হয়। সে দুঃখ অপরিসীম —নিঃসঙ্গ নির্যাতিত কলম্বাসের শেষজীবনের দুঃখের মতোই সীমাহীন। কবির ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের গভীর থেকে মর্মান্তিক বেদনা বেরিয়ে এসেছে :

> I am too full of woe!
> Haply I may not live another day :
> I cannot rest, O God, I cannot eat
> or drink or sleep.

"আমার বেদনা সহ্যের সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে গেছে, সৌভাগ্যের কথা, আমি হয়তো কাল পর্যন্ত বাঁচবো না, হায় ভগবান, আমি যদি একটু বিশ্রাম নিতে পারতাম, আমি খেতে পারিনে, কিছু পান করতে পারিনে, ঘুমাতে পারিনে।"

কবির জীবনসন্ধ্যা যখন দুঃসহ ব্যথায় এমনি ক'রে ভরে উঠেছে কানায় কানায় তখন ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝাকে হালকা করবার জন্য। কবি নম্র নত একটি নমস্কারে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিয়েছেন তাঁরই চরণমূলে যাঁকে অনুক্ষণ চেতনায় রেখে জীবনের সমস্ত অভিযান শুরু করেছেন তিনি, সমস্ত দুঃখ-ব্যথাকে যাঁর দান ব'লে তিনি গ্রহণ ক'রে এসেছেন মনের মধ্যে কুণ্ঠার বিন্দুবিসর্গও না রেখে। ভগবানের কাছে কবির এই আত্ম-নিবেদন Prayer of Columbus কবিতাটির মধ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে।

ভগবানকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন :

"তুমি জানো, আমি একটিবারের জন্যও তোমাতে হারাইনি আমার বিশ্বাস অথবা প্রত্যয়। শৃঙ্খলিত, কারারুদ্ধ, অপমানিত— কোনো অবস্থাতেই আমি হা-হুতাশ করিনি, সবই গ্রহণ করেছি তোমার দান ব'লে, তোমার প্রেরিত আমার প্রাপ্য ব'লে।" ঈশ্বরে কবির বিশ্বাস এতই গভীর, প্রত্যয় এতই অবিচলিত যে শত নির্যাতনের, শত লাঞ্ছনার মধ্যেও তাঁর মনে উদ্বেগের ছায়ামাত্রও নেই। কেন মনে উদ্বেগের ছায়া পড়বে? হালের কাছে যে মাঝি রয়েছে! সেই মাঝিতে শক্তিরই শুধু পরিপূর্ণতা? তাঁর প্রেমের মধ্যেও কি পরিপূর্ণতা নেই? সেই মাঝিই জীবনতরীকে

পৌঁছে দেবেন দুঃখ-জলধির পারে। কবির মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। ভুবনের ভার কি মানুষের হাতে? Man proposes, God disposes. আমরা শুধু চাইতে পারি। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? 'যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' আমাদের দৌড় চাওয়া পর্যন্ত। আমরা পরিকল্পনা করতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি, স্বপ্নকে ফলবান করবার জন্য চেষ্টাও করতে পারি। বাস্, ঐ পর্যন্ত। ফল তাঁরই হাতে, যাঁর হাতে রয়েছে ভুবনের ভার। মা ফলেষু কদাচন। Prayer of Columbus কবিতায় কবি তাই বলেছেন:

Intentions, purports,, aspirations mine, leaving result to Thee.

আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, ব্যাকুলতা আমার, ফল সমর্পণ ক'রে দিয়েছি তোমারই হাতে।

গীতায় কর্তব্যের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। অর্জুনের ভিতরে একটি নিদারুণ দ্বন্দ্ব চলেছে। আত্মীয়স্বজনের রুধির ঝরাতে পার্থের মন কুণ্ঠিত। মমতায় অভিভূত হয়ে পার্থ যুদ্ধ করতে নারাজ। কৃষ্ণ বললেন, মমতার মুখোস প'রে ক্লৈব্য বাসা বেঁধেছে তোমার মনে। নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। তুমি ক্ষত্রিয়। দুষ্টের দমন ও ধরিত্রীর উদ্ধার তোমার কর্তব্য। ওঠো, যুদ্ধ করো। কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য করার উপদেশ গীতায়। এর মধ্যে হৃদয়াবেগের কোনো স্থান নেই। ফলের দিকে আকুল অঞ্জলি বাড়ানোকে কৃষ্ণ আদৌ সমর্থন করেননি। নিরাসক্ত হয়ে কর্তব্য করে যেতে হবে। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং। গীতায় কর্মের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। কর্মে মানুষের অধিকারকে কৃষ্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু ফলে নয়।

ভগবদ্গীতায় দুটি মৃত্যুহীন শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরমতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই দুটি শ্লোকের প্রথমটির শুরুতে মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ। দ্বিতীয়টি শুরু হয়েছে সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য দিয়ে। শ্লোকদুটির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। ভগবদ্গীতার উদ্গাতা এই দুইটি শ্লোকের অর্থকে সম্প্রসারিত করবারও চেষ্টা করেননি। কেন? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভাষ্যে এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন: গীতার এই বাণীগুলির মধ্যে যে তাৎপর্য অনুস্যূত হয়ে আছে তা অসীম, তা কোনোকালেই ফুরোবার নয়। সেই অসীম অর্থ তো ভাষ্যে পরিস্ফুট হবার নয়। এই দুটি শ্লোকের অর্থ মর্মের গভীর থেকে গভীরে বসে যাবার জন্য। আত্মার অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার আলোতেই শুধু শ্লোক দুটির অর্থকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

গীতার পরমতত্ত্বের উপরে শ্রীঅরবিন্দের এই যে মন্তব্য এর মধ্যে চিন্তার খোরাক প্রচুর আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বাস আর শরণাগতির কথা বলেছেন। শরণাগতির কথা, ভগবদনুগ্রহের কথা কি গীতারও চরম কথা নয়? আর নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু—এ বোল সহজে মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরুতে চায় না। জীবনের নিষ্করুণ রথচক্রে মানুষের সমস্ত অহংকার ধুলায় রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গেলে তখনই সে অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে বলে, 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে।' মানুষের গর্ব সহজে চূর্ণ হবার নয়। তা চূর্ণ হবার জন্য অপেক্ষা করে অজানা দিগন্ত থেকে আকস্মিক আঘাতের পর আঘাতের। যে-সকল অভিজ্ঞতার জন্য আমরা কোনদিনই প্রস্তুত ছিলাম না, যে নৈতিক অধঃপতনের কথা স্বপ্নেও কখনো

ভাবতে পারিনি তাদের বজ্রাগ্নিশিখার আলোয় একদিন আসল সত্যটি আমাদের উপলব্ধিতে ধরা দেয়। আর এই সত্যটি হোলো, যাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি ব'লে থাকি, যে ইচ্ছাশক্তিকে অপরাজেয় বলতে আমাদের একটুও বাধে না, তা আসলে কত ক্ষণভঙ্গুর! এত যে নৈতিক এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বাঁধ-বাঁধার প্রয়াস ইতিহাসের কোন্ আদিপর্ব থেকে আমাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলির প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য—সে বাঁধ আচম্বিতে কখন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়! ভিতরের শৃঙ্খলিত পশুরা খাঁচা ভেঙে বাইরে আসে বেরিয়ে। জীবনের আকাশে ঘনিয়ে আসে নৈতিক দুর্গতির গাঢ়তম অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে নিঃসহায় মানুষ কার চরণপ্রান্তে আশ্রয় নেবে? ভিতরের অশান্ত সমুদ্রের ক্ষিপ্ত জলোচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দেবে কে? যে ইচ্ছাশক্তিতে ভর দিয়ে এতদিন সে জীবনে অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে এসেছে সেই শক্তি যে কত ঠুন্‌কো, তা জানা হ'য়ে গেছে তার। এখন সমুদ্রের দেবতা বরুণের শরণ লওয়া ছাড়া তার গতি কোথায়? যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে যে-ঈশ্বরের কোনো পাত্তাই সে পায়নি, জীবনের কঠিন কঠিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ক্রমাগত ধাক্কার পর ধাক্কা খেতে খেতে সে অবশেষে সেই ঈশ্বরের দিকেই তার ব্যগ্র বাহু দুটি বাড়িয়ে দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গীতাভাষ্যে ঠিকই বলেছেন, The last, the closing supreme word of the Gita expressing the highest mystery is spoken in two brief, direct and simple slokas and these are left without further comment or enlargement to sink into the mind and reveal their own fulness of meaning in the soul's experience. বাছুর কি সাধে হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে তুহুঁ তুহুঁ বলতে শুরু করে? বাছুরটা ম'রে যায়। তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি শুকিয়ে ফেলা হয়। সেই নাড়ি ধুনুরির তুলো-ধোনা ধনুকের ছিলায় রূপান্তরিত হ'লে বাছুর তখন নূতন বোল শুরু করে—তুহুঁ তুহুঁ, ওগো আমি নই, আমি নই; তুমি, ওগো তুমি। সকল অহঙ্কারকে ডুবিয়ে দাও আমার চোখের জলে। হৃদয়-পদ্ম-দলে তুমি এসে দাঁড়াও আমাকে আড়াল ক'রে। অহঙ্কার যে কত মিথ্যা এবং শরণাগতি যে কত সত্য সে তো মন্মনা ভব এবং পরবর্তী শ্লোকটির টীকাটিপ্পনি দিয়ে বুঝাবার নয়। কেন ভগবান শ্লোক দুটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে অর্জুনকে শরণাগতির অর্থ বুঝাবার চেষ্টা করলেন না? গীতাভাষ্যে শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: For it is alone this inner incessantly experience that can make evident the infinite deal of meaning with which are forever pregnant these words in themselves apparently so slight and simple. সত্যই তো শ্লোক দুটি আপাতদৃষ্টিতে কতই না সহজবোধ্য! বুঝতে একটুও বেগ পেতে হয় না। দুটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান বলেছেন, অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা আমাকে ভজনা করো, সমস্ত হৃদয়কে আমার দিকে উন্মুখ রাখো, প্রত্যেক কর্মকে আহুতি দাও আমাতে। তার পর জীবনতরীর হাল আর তোমার হাতে রেখো না। আমাকে তোমার জীবন, আত্মা, কর্ম

সব সঁপে দাও। তোমার মন নিয়ে, হৃদয় নিয়ে, জীবন নিয়ে, কর্ম নিয়ে আমার যা খুশি তাই করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। আমার হাতে জীবনতরীর হাল তুলে দেবার পর জীবনে যা কিছু ঘটুক তাতে উদ্বিগ্ন হোয়ো না, 'সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা'—আমাকে সংশয় কোরো না। গীতার এই পরমতত্ত্ব মগজের বুদ্ধির আলোয় আমরা একরকম ক'রে বুঝতে পারি; জীবনের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দুঃখ-ব্যথার অন্ধকারের মধ্যে এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্যকে উপলব্ধির নূতন আলোয় উদ্ভাসিত দেখে চমৎকৃত হ'য়ে যাই।

গীতার অরবিন্দ-ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে হুইট্‌ম্যানের Prayer of Columbus পাঠ করলে মনে হবে, ঐ কবিতায় গীতারই পরম তত্ত্বটি যেন একটি নবতর সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। কবি বলছেন:

All my enterprises have been fill'd with Thee, / My speculations, plans began and carried on in thoughts of Thee, / Sailing the deep or journeying the land for Thee.

"আমার যত কিছু প্রয়াস সমস্তই পূর্ণ ছিলো তোমারই চিন্তায়, আমার সমস্ত ভাবনা, সমস্ত পরিকল্পনা শুরু হয়েছে তোমাকে স্মরণ করে, তাদের কার্যে পরিণত করার চেষ্টার মধ্যেও তোমারই চিন্তা ছিল অনস্যূত হয়ে, সমুদ্রে সমুদ্রে তরী বেয়েছি, স্থলপথে ভ্রমণ করেছি - সেও তোমারই জন্য।" এই লাইন-গুলির মধ্যে গীতার মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু—এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি কি আমরা শুনতে পাইনে এবং আত্মার পরম উপলব্ধিগুলির মধ্যে একই শাশ্বত মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখে চমৎকৃত হয়ে যাইনে? ঐ শ্লোকের শ্রীঅরবিন্দ অনুবাদ ক'রে তাঁর গীতাভাষ্যে লিখেছেন: Turn all thy mind to me and fill it with the thought of me and my presence. Turn all thy heart to me; make thy every action whatever it be a sacrifice and offering to me. হুইট্‌ম্যান্ যেন লাইনগুলিকে কাব্যের ভাষায় নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন! কূলহীন সাগরবক্ষের অজানায় তরী বেয়ে চলেছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—সে তো তোমারই জন্য প্রভু! সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে নাম-যশের কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না, ছিল না স্বার্থবুদ্ধির কোন গন্ধ। অচেনা দেশের বিপদসঙ্কুল স্থলপথে পদব্রজে অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ভ্রমণ করেছি—সেও তো প্রভু আত্মপ্রীতির বশে নয়, সে পরিভ্রমণও তোমারেই ভালোবেসে, তোমারই জন্য। তোমাকে অনুক্ষণ আমার ভাবনায় রেখে সব কাজে হাত দিয়েছি, চরম বিপদের মধ্যেও আমার স্বপ্নকে ফলবান করতে সচেষ্ট থেকেছি।

পাশ্চাত্য দেশের আর কোনো কবির লেখায় গীতার মর্মবাণীর এই ঝঙ্কার শুনেছি বলে মনে হয় না। ব্রাউনিং-এর কাব্যেও ঈশ্বরের অসীম করুণায়, প্রার্থনার অমোঘ শক্তিতে একটা জীবন্ত বিশ্বাস প্রভাতী তারার মতোই জলজল করছে! ব্রাউনিংও মরমী ভক্ত কবি। কিন্তু হুইটম্যানের Prayer of Calumbus কবিতায় ভগবদ্‌গীতার মূল সুর যেমনটি প্রকাশ পেয়েছে এমনটি আর কোনো পাশ্চাত্য কবির কবিতায় পাইনি।

জীবনের নাট্যলীলায় ভগবানের ভূমিকা—অঙ্কে অঙ্কে, দৃশ্যে দৃশ্যে। আমাদের দুঃখ-সুখ

লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, আমাদের জীবনের তুচ্ছতম প্রতিটি ঘটনা—সমস্তের উপরেই তাঁর চরণচিহ্ন জলজল করছে। আমাদের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির মধ্যেও তাঁরই শুভ্রহস্তের স্পর্শ রয়েছে! তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই নেই। ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ "ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁহার দর্শন লাভ করাই হিন্দুদের সমুদয় সাধনপ্রণালীর লক্ষ্য।" এই একটি বাক্যের মাধ্যমে স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের মর্মবাণীকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন।

জীবনের নাট্যলীলায় তা'হলে মানুষের কি কোনো ভূমিকা নেই? আছে, নিশ্চয়ই আছে। কী সে ভূমিকা? অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁকে ভজনা করা। তিনি তো আমার দিকে দশ পা এগিয়ে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু আমাকেও তাঁর দিকে অন্ততঃ এক পাও এগিয়ে যেতে হবে। মানুষ ভগবানের জন্য কোনো সাধনাই করবে না, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে চুপচাপ ব'সে থাকবে এবং তাঁর করুণা-ধারা আপনা থেকেই মানবজীবনে নেমে আসবে, এমনটি হবার নয়। ঠাকুর শুধু ভগবদনুগ্রহের উপরে জোর দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। বারংবার সাধনার কথাও বলেছেন, নির্জনে প্রার্থনার উপরে কত জোর দিয়েছেন। এই সাধন আসলে স্মরণেরই সাধন। ভগবানের পায়ে ষোলো আনা মন ঢেলে দেবার কথাই ঠাকুর বলেছেন। নানা উপমার সাহায্যে ঐ একই কথা ভক্তদের মনের মধ্যে ঘা মেরে মেরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ষোলো আনা মনের এক কড়া-ক্রান্তিও কম নয়। সুতোর একটি মাত্র ফেঁসোও বাইরে থাকলে ছুঁচের মধ্যে সুতো যাবে না কখনো। ভগবান মানুষের ভালোবাসা পাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। মানুষের হৃদয়ের দরজায় নিত্য তিনি জেগে ব'সে আছেন উপবাসী অতিথির মতো সেই শুভ মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় যখন মানুষ রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁকে ভিতরে ডেকে নেবে অসীম প্রেমে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরেছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছো জাগি।

বেদ বলছেন, তাঁর ভয়ে অগ্নি তাপ দিচ্ছে, সূর্য কিরণ বর্ষণ করছে, মেঘ জল ঢালছে, বায়ুর চলাচল অব্যাহত রয়েছে। মৃত্যুর ঘরে ঘরে যাওয়ার বিরাম নেই। তবে তিনি দুয়ার ভেঙে মানুষের হৃদয়মন্দিরে ঢুকলেই তো পারেন। তা পারেন ঠিকই। কিন্তু জোর ক'রে তিনি ঢুকবেন না। তিনি মানুষের ভালোবাসার শুধু ছিটে-ফোটাতে খুশী নন। তিনি চান, মানুষ শুধু তাঁকেই ভালোবাসবে। গীতায় কি তিনি এই কথাই বলেননি, মন্মনা ভব? অর্জুন, তোমার সমস্ত মনকে আমার দিকে তুলে রাখো। 'মন্মনা'র পরই আছে মদ্ভক্তঃ। শুধু তোমার মনকে আমার চিন্তা দিয়ে ভরিয়ে রাখাই যথেষ্ট নয়। তোমার সমস্ত হৃদয়কেও আমার দিকে কি উন্মুখ ক'রে রাখবে না? মদ্ভক্ত হও—এই কথাটি বলেও ভগবান ক্ষান্ত থাকলেন না। বললেন মদ্‌যাজী হও অর্থাৎ তোমার জীবনের ছোট বড়ো সমস্ত কর্মই আহুতিস্বরূপ সমর্পণ করো আমাকে। বাইবেলেও খ্রীষ্টের বাণীতে ঠিক গীতারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়: "তোমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসো সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে, সমস্ত মন

দিয়ে।" ভগবান শিশুর মতোই নম্র। তাই জোর করেন না। দরজার গোড়ায় চুপ ক'রে বসে আছেন। মাঝে মাঝে দুয়ারে মৃদু করাঘাত করছেন। দরজা খোলার নাম নেই। দুয়ার খুলে ভগবানকে যে ভিতরে অভ্যর্থনা করবে তার মন তো ধনে জনে জড়িয়ে রয়েছে; চিত্ত ছড়িয়ে রয়েছে পার্থিব কত তুচ্ছ বিষয়ে! ভগবান মাঝে মাঝে দরজায় টোকা দিচ্ছেন। অকস্মাৎ মানুষ চমকে উঠে শুনতে পায় হৃদয়ের দরজায় কার করাঘাতের মৃদু শব্দ! যে-আনন্দকে চেয়ে সে জীবন ভরে আসক্তির ডালা ভরিয়ে তুলেছে কাঙালের মতো, ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে ছুটে ছুটে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করেছে শুধু ক্লান্তির দুঃসহ ভারে, মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ ক'রে ফেলেছে অশ্রুজল আর দীর্ঘশ্বাস—সেই আনন্দের অনন্ত নির্ঝর পরমানন্দঘনমূর্তি বাসুদেব স্বয়ং এসেছেন তার দ্বারে। দরকার নেই ধনে, দরকার নেই পুত্রে পৌত্রে, দরকার নেই সুন্দরী ভার্যায় আর পাণ্ডিত্যে। যাঁকে এতদিন ধরে খুঁজে বেরিয়েছি নানা আনন্দের মধ্যে তিনিই তো এসেছেন মানুষের প্রেমের কাঙাল হ'য়ে!

দরজা খুলে যায়! মানুষের সেই জন্মান্তরের শুভলগ্নে ভগবানের কোলে মাথাটি রেখে মানুষ শুধু বলে, এখন থেকে আমি শুধু তোমারই, শুধু তোমারই। "দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।"

জীবনের নাট্যে মানুষের ভূমিকা ভগবানের দিকে সমস্ত মনকে তুলে রাখা, সমস্ত হৃদয়কে তাঁর দিকে তুলে ধরা, সমস্ত কর্মকে তাঁর চরণপদ্মে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করা। তার আর কিছু করার নেই। মানুষের এই স্মৃতিসাধনের কথাই কাব্যের ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে গীতাঞ্জলির নানা কবিতায় নানা ছন্দে নানা ভঙ্গীতে। যথা—

> কেবল থাকা কেবল চেয়ে থাকা,
> কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
> সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
> সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে।

অথবা,

> এমন করে মুখোমুখি
> সামনে তোমার থাকা,
> কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
> পূর্ণ ক'রে রাখা,
> এ দয়া যে পেয়েছে তার
> লোভের সীমা নাই—
> সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
> তোমায় দিতে ঠাঁই।

সাধনার দুর্গম ক্ষুরধার পথকে অতিক্রম করতে হয় মানুষকে একা একা। এ পথে তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই। কবির ভাষায়,

Not I, not any one else can travel that road for you, you must travel it for yourself.

ঐ রাস্তা তোমার হয়ে পর্যটন করবার শক্তি আমার অথবা আর কারও নেই, তোমাকে নিজেই ঐ পথ পর্যটন করতে হবে।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে, কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতেই সেই আঁধার ঘরের রাজার কাছে পৌঁছাতে হয়। কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখা কি সহজ? ভগবান, বললেন, 'মন্মনা হও। আমার কাছে তাহ'লে আসবেই।' কিন্তু প্রভু, 'তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।' মন যে বায়ুর মতো, কারও শাসন মানে না। ভগবান আশার বাণী শুনিয়ে অর্জুনকে আবার বললেন 'অভ্যাসের এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মন-করীকেও বশে আনা যায়।'

মনকে ম্যামনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত

ক'রে তাকে ভগবদ্‌চিন্তায় অনুক্ষণ পূর্ণ ক'রে রাখতে পারলেই কেল্লা ফতে! তখন মানুষের সাধনার পালা শেষ হোলো। সমস্ত মনকে, সমস্ত হৃদয়কে তাঁর দিকে উন্মুখ রাখার সাধনা সাফল্যে যেই মুকুটিত হোলো আর তো সাধকের করার কিছু রইলো না। 'জীবনখানি উজাড় ক'রে স'পে দে তাঁর চরণমূলে।' আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত ভূমিকা মানুষের। That done, leave me to do my will with thy life and soul and action. সেই ভূমিকা শেষ হলে জীবনবাঁশী আমার হাতে তুলে দাও। সেই বাঁশীকে বাজতে দাও আমার সুরে। জীবন-তরীর হাল তুলে দাও আমার হাতে। তাকে চলতে দাও আমার ইঙ্গিতে। যদি দুঃখ আসে, বিপর্যয় ঘটে—মা শুচঃ।

দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

মানুষের দিক থেকে পুরুষকারের ভূমিকা অনুক্ষণ ভাবনার ভজনার মধ্যে সমাপ্ত হ'লে জীবনের নাট্যলীলায় দৈবের ভূমিকা শুরু হয়ে গেলো। সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয় যখন ভগবানের দিকে উন্মুখ হয়ে আছে, ব্যক্তিগত চেতনার ক্ষেত্র থেকে উত্তমপুরুষের একবচন যখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কর্মের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধির যখন নামগন্ধ আর রইলো না, মানবীয় ইচ্ছা-শক্তিতে সেই অটুট বিশ্বাস যখন ধূলিতলে লুণ্ঠিত তখন ঊর্ধ্ব'লোক থেকে নেমে আসে করুণার ধারা। নেমে আসে অফুরন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা, নেমে আসে অপরাজেয় ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা, নেমে আসে দৈববাণী যাকে উপেক্ষা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। Prayer of Columbus-এ কবির কণ্ঠে এই ভগবদনুগ্রহের অকুণ্ঠ জয়ধ্বনি!

O I am sure they really came from
Thee,
The urge, the ardour, the
unconquerable will,
The potent, felt, interior command
stronger than words,
The message from the Heavens
whispering to me even in sleep,
These sped me on.

"আমি নিঃসংশয়ে জানি ওরা সত্যই এসে-ছিল তোমারই কাছ থেকে,

ঐ উদ্দীপনা, ঐ উৎসাহ, ঐ অপরাজেয় সংকল্প.

ঐ যে ভিতরের অমোঘ আহ্বান—বাক্যের চেয়েও কঠিনতর, যা শুধু অনুভব করা যায়, ঐ আকাশবাণী যা ঘুমের মধ্যেও চুপে চুপে এসেছে আমার কানে, এরাই তো আমাকে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।" কবি, দরিদ্র এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত কবি যেখানে তাঁর প্রার্থনা শেষ করেছেন সেখানে ভাষায় উপনিষদের ঋষিদেরই যেন প্রতিধ্বনি:

"আমার জীবনে আলো জ্বালিয়েছিলে
তুমিই প্রভু,
অকম্পিত অবর্ণনীয় ঐ আলোকরশ্মি
এসেছিলো তোমারই কাছ থেকে।"

ভগবানকে কবি বলেছেন, অনির্বচনীয় দুর্ল'ভ জ্যোতিস্বরূপ তুমি, lighting the very light. আলোর তুমি আলো। উপনিষদের সেই কথা 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ গণ-আন্দোলন ও ধর্ম-আন্দোলনের যে একাত্মতা অনুধাবন করেছিলেন, 'বর্তমান ভারতে'র ইতিহাসচেতনা-প্রসঙ্গে তা বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। আধুনিককালে প্রধানতঃ মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌সের চিন্তাধারার অনুসরণ-কারীরা ধর্মচিন্তাকে মানব-ইতিহাসের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকেন। পৌরাণিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ধর্মসংস্কৃতিকে বর্তমানকালের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করতে না পেরে একদিকে অতীতের যা-কিছু পূজা-অর্চনা, মন্ত্র-তন্ত্র সব কিছুরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রবণতা যেমন ঊনবিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, তেমনি এ যুগে অর্থনীতির বিবর্তনেই সমাজচেতনার প্রাণসত্যকে নির্দিষ্ট করে দেখাবার ফলে যা-কিছু সাময়িক রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অননুমোদিত তাকেই উপহাস করার প্রবণতা সমাজে দেখা দিয়েছে। এদিক থেকে ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর সমাজ-বিশ্লেষণে এক ভাবে নয় আর এক ভাবে সমাজচেতনার সমগ্র স্বরূপ উপলব্ধির পক্ষে সমকালীন মতবাদ-গুলিই অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তাৎপর্য সম্বন্ধেও এযুগের সমাজশাস্ত্রীদের চিন্তায় তাই অনিশ্চয়তার নিদর্শনই বেশী। একদল মনে করেন, প্রাচীন ও প্রচলিত হিন্দুয়ানির অন্ধ অনুকরণই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের পরিণামফল, আর একদল মনে করেন সর্বধর্মসমন্বয়ের পর থেকে আর আমাদের কোনো ধর্মানুসরণেই নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, ভাসাভাসা ভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মগুরুদের বচনসংগ্রহেই ধর্মচিন্তার চরিতার্থতা। তাছাড়া মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক বলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আবির্ভাবের ফলে আমাদের পাশ্চাত্যমুখী প্রগতির দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে—এ-জাতীয় মতবাদের সমর্থক 'আধুনিক' পণ্ডিত তো শিক্ষিত সমাজে অনেকই মেলে।

সেদিক থেকে ভারত-ইতিহাসের পর্যালোচনাকালে 'বর্তমান ভারত'-গ্রন্থে স্বামীজীর ইতিহাস-বিশ্লেষণে ভারতের বিভিন্ন যুগের মানস-সংঘাতে "সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ" [১]—এই বিশ্লেষণটি অবশ্যস্মরণীয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মচেতনার দ্বৈত থেকে অদ্বৈত সব কয়টি স্তরকে মর্যাদার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করে মানবচিন্তার সোপান-পরম্পরা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় সাকারবাদী ঈশ্বর-উপাসনার অন্তর্নিহিত মহাসত্যই যে যোগীঋষিদের ধ্যানে পরমতত্ত্বের নিরঞ্জন নিরাকার অদ্বৈত চেতনায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে—এ কথাটি শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্তের দ্বারা নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা তাঁরা ভারতবাসীর সামনে প্রমাণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনে রাম-মোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম

১ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ; বর্তমান ভারত : পৃ : ২০৭

চিন্তানায়কেরা যখন সমগ্র দেশের ঐতিহ্যকে তাঁদের নিজস্ব বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে চাইছিলেন, তখন বিশেষ কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্যশিক্ষিতের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার বাইরে চিরন্তন ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির রূপ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ও সাধনায় প্রতিভাত হ'লো তারই ফলে ভারতীয় জীবনপ্রবাহের মূল স্রোতস্বিনী 'আর্য'-সভ্যতার ধারায় নূতন গতিবেগসঞ্চার। সেই সঙ্গে ইসলাম ও খৃষ্টীয় সাধনার অন্তরঙ্গ সত্যের সম্মেলনে নবযুগের ধর্মচেতনার বিশ্বতোমুখী প্রসার।

পাশ্চাত্যের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনধারা—এসব কিছুর প্রবল প্রভাবে আত্মস্থতার প্রয়োজনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা আমাদের অন্তরে যথার্থ আদর্শগত গৌরববোধ জাগিয়ে নবজাতীয়তার পথ প্রশস্ত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিল তার পিছনে ইতিহাসের আরো অনেক উপকরণের কথা মনে রেখেও বলা চলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জাতির আত্মস্থতার মূল ভিত্তিটি এযুগে নূতনভাবে আবিষ্কার করেছিলেন বলেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এ জাগরণ সম্ভব হতে পেরেছিল।

আবার স্বাধীনতালাভের পর আধুনিককালে যখন "অভাবের হাত থেকে" আমরা মুক্তি চাইছি, তখনও গণ-জাগরণের আহ্বানে স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের বাণী ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত— "...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"[২]

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই 'নূতন ভারত' বলতে কি আজকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত শ্রমিক-কৃষকদের আন্দোলন বোঝাবে? বলা বাহুল্য, সাম্প্রতিক কালের গণজাগরণ নিশ্চয় বিবেকানন্দ-আদর্শের বিপ্লব নয়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই সব আন্দোলনও যে সাধারণ মানুষের অন্তরে নানা প্রশ্ন তুলছে, সচেতনতা এনে দিয়েছে—তাও অস্বীকার করা যায় না। এখন প্রয়োজন, এই গণচেতনাকে ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ-সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপ গড়ে তোলা।

*   *

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Education' গ্রন্থে ইতিহাসের যে গণভিত্তিক রূপ দেখতে চেয়েছিলেন, সে-সম্বন্ধে দু'চারটি প্রশ্ন এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ-ই ইতিহাসের মূল বিষয়,—এ সিদ্ধান্ত আজকের দিনে অনেকেই মেনে নেবেন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষেরই মধ্যে বিভিন্ন গুণের তারতম্যে সাধক, মহাপুরুষ, রাজা, সেনাপতি, নেতা—এঁরা দেখা দিয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে কেউ ধর্মের ক্ষেত্রে, কেউ সমাজে বা রাষ্ট্রে নানাভাবে নূতন চিন্তা ও কর্মের তরঙ্গ তুলে যান। পরবর্তীকালের অনেক মানুষ তাঁদেরই চিন্তাপদ্ধতিকে রূপায়িত করতে গিয়ে সভ্যতার বিভিন্ন যুগ গড়ে তোলে। সুতরাং স্পেন্সারের মন্তব্য—"রাজ্যশাসন কি প্রকারে হইতেছে, তাহারই প্রয়োজন, শাসকদিগের

২ তদেব : পরিব্রাজক : পৃঃ ৮২

ব্যক্তিগত জীবনী লইয়া কি করিব?"[৩]—কতদূর সমর্থনযোগ্য তাও ভেবে দেখা দরকার। আসলে গণচেতনার প্রবক্তারা একথা ভুলে যান যে সমাজে যেমন সাধারণ মানুষ আছে, তেমনি আছে সাধারণ মানুষের পরিচালক নেতৃস্থানীয় মানুষ। প্রথম দল যদি ইতিহাসের উপকরণ হয়ে থাকেন, তাহলে দ্বিতীয় দলও ইতিহাসের উপকরণ। বরং যাঁদের জীবনে ও মননে অন্যদের উদ্বুদ্ধ, প্রভাবিত ও পরিচালিত করার শক্তি আছে, তাঁদের কথা ইতিহাসে বিশেষভাবেই আলোচ্য। সাম্যবাদী দেশগুলির ইতিহাসেও দলনেতাদের জীবনবৃত্তান্ত এই কারণেই অনেক পাতা জুড়ে থাকে। তবে মতবাদের অনুরোধে ইতিহাসকে প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন করার চেষ্টা সাম্যবাদী দেশগুলির ক্ষেত্রে একটু বেশী পরিমাণে দেখা দেয়।

সুতরাং রাজ্যশাসনের পদ্ধতিও যেমন জানা দরকার তেমনি জানা দরকার কাদের মননে ও প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রের বিশিষ্ট রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কোনো মতবাদ বা রাষ্ট্রনীতিকে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যহীন ভাবমূর্তির দ্বারা পুরোপুরি জানা যায় না। অতীতের কীর্তিগাথা বর্তমানকেও ভালোবাসতে শেখায়। সুতরাং গণচেতনার স্বাক্ষর যেমন ইতিহাসে প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনচরিত। হয়তো সেযুগে তাঁরা রাজা বা সেনাপতি, এযুগে দলনেতা বা অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক—এই পার্থক্য।

দেশের ইতিহাসকে আমরা বিশিষ্ট আদর্শের প্রকাশরূপে যদি দেখতে চাই, তাহলে সেই বিশিষ্ট আদর্শ যাঁদের জীবনে রূপায়িত হয়েছে তাঁদের জীবন-কাহিনী থেকেই আমাদের অনুসরণযোগ্য সম্পদ আহরণ করতে হবে। ভারতের ইতিহাস যদি ধর্মপ্রাণতার ইতিহাস হয়ে থাকে তাহলে সুদূর অতীত থেকে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিলয়ের কাহিনীর দ্বারাই ভারতীয় চেতনার বিশ্লেষণ সম্ভব! আবার এক একটি বিশেষ ধর্মান্দোলনের প্রাণপুরুষকে অবলম্বন করেই জাতির অন্তরের বাণীটি উপলব্ধির আলোকে ধরা দেয়।

এদিক থেকে বেদ বা উপনিষদের ঋষিদের প্রত্যক্ষ জীবনচরিত না থাকাটা আমাদের জাতীয় অভাব। কিন্তু বেদ-উপনিষদের সেই উপলব্ধিই তো যুগে যুগে বুদ্ধ, শংকর, রামানুজ, দাদূ, নানক, কবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের মতো মহামানবদের জীবনে রূপায়িত। সুতরাং এঁদের জীবনেতিহাস বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা ভারতীয় মানসের ক্রমবিকাশ যেমন ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করতে পারি, তেমনি আবার রাজনৈতিক ইতিহাসের ছিন্নসূত্রগুলি উদ্ধারের দ্বারা রাষ্ট্রীয় চেতনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও পেতে পারি।

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছিলেন। আর বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' খুঁজেছেন অধ্যাত্ম তথা গণচেতনার ইতিহাস। কারণ ধর্মই ভারতের মর্মবাণী। ভারত-ইতিহাসের মর্মসূত্র নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলনের উত্থানপতনে। (ক্রমশঃ)

৩ শিক্ষা: হার্বার্ট স্পেন্সার: স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত: শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ: পৃ: ৩২

ঋষি মার্কণ্ডেয়

শ্রীদ্বারকানাথ জ্যোতির্ভূষণ

[মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র বলিয়া ইঁহার নাম মার্কণ্ডেয়। ইঁহার আয়ু ছিল মাত্র ১২ বৎসর, পরে দৈব কৃপায় তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। নৃসিংহপুরাণে আছে, মৃকণ্ডু ঋষি ও তাঁহার পত্নী পুত্রের স্বল্পায়ুর কথা জ্ঞাত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতেন। পিতামাতাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বালক মার্কণ্ডেয় নিজ স্বল্পায়ুর কথা জানিতে পারেন। পিতা-মাতাকে তিনি বলেন, 'আপনারা ভাবিবেন না, দেখিবেন আমি দীর্ঘজীবী হইব।' এই বলিয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সম্মুখে কঠোর তপস্যায় রত হন এবং নিজ তপস্যাবলে দীর্ঘজীবন লাভ করেন।

পদ্মপুরাণে আছে, পুত্রের স্বল্পায়ুর কথা জানিয়া পিতা মৃকণ্ডু কমবয়সেই তাঁহার উপনয়ন দেন। উপনয়নের পর বালক যখন ঋষিদের প্রণাম করিতেছিলেন, তখন ঋষিরা "চিরায়ু হও" বলিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে বালকের স্বল্পায়ুর কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মা তাঁহাকে দীর্ঘজীবনের বর দেন।

মার্কণ্ডেয় ঋষি পূর্বে স্বল্পায়ু ছিলেন, পরে যে ভাবেই হউক, দৈব প্রভাবে তাঁহার আয়ু বাড়িয়া যায়—ইহারই ভিত্তিতে আখ্যানগুলি রচিত হইয়াছে। বর্তমান আখ্যানটিও তাই।]

হিন্দুদিগের যতগুলি পবিত্র ভাবগ্রাহী পৌরাণিক গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে দুইখানি গ্রন্থ। প্রথমখানি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অপরখানি শ্রীশ্রীচণ্ডী। এই দুইখানি গ্রন্থ অতি পবিত্র। এই দুইটি গ্রন্থের মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী শ্রীমৎ মার্কণ্ডেয় ঋষি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে এক বিভীষিকার পরিবেশে তিনি দেবীর দর্শনলাভ এবং তাঁহার নিকট হইতে দেবীমাহাত্ম্য-কথনের জন্য বরলাভ করেন।

পুরাকালে কোন কোন দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর দস্যুদল লুণ্ঠন করিতে বাহির হইবার পূর্বে দেবী কালিকা বা চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়া যাইত। সে-সময় তাহাদের অনেকে আবার নরবলি দিতেও দ্বিধা করিত না।

সেই যুগের এক মঙ্গলবারে এমনি একটি দস্যুদল চণ্ডিকাদেবীর নিকট বলি দিবার জন্য বহু অনুসন্ধানের পর একটি হৃষ্টপুষ্ট অক্ষতদেহ ব্রাহ্মণ বালককে পাইয়া লইয়া আসিয়াছে। এই বালকই ভাবী কালের ঋষি মার্কণ্ডেয়। বালক একটি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তভাগে একখানি ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটিরে বিধবা মাতার স্নেহশীতল বক্ষে প্রকৃতির সহজ মনোরম পরিবেশে চন্দ্রকলার ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। দস্যুগণ এই বালককে তাহার মাতার নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া যায়। অসহায় দুঃখিনী মাতা পুত্র-শোকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া হাহাকার করিতেছেন, আর কায়মনোবাক্যে কাতরকণ্ঠে বিপত্তারিণী মহামায়া চণ্ডীকে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। দস্যুরা যখন কাড়িয়া লইয়া যায় তখন তিনি পুত্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন,

'আমার তো শক্তি নাই, কিন্তু মহামায়া তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। এ মহাবিপদে তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহাকে ডাক।'

অমাবস্যার গভীর রাত্রি, গাঢ় অন্ধকারে ধরণী আবৃত। দস্যুদল বালককে লইয়া আসিল শ্বাপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্যে। চারিদিক নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরবমাত্র স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ঈষৎ আলোক-স্পন্দনে মাঝে মাঝে বনস্থলী যেন চমকিয়া উঠিয়া বালকের মনে আরও ভীতি-সঞ্চার করিতেছে। বনেরও যেন শেষ নাই, অন্ধকারেরও অন্ত নাই। এই বিরাট বিভীষিকার মধ্যে বালক মার্কণ্ডেয় একটি বৃক্ষকাণ্ডের সহিত দৃঢ় রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া মাতৃ-আদেশে সারাক্ষণ মহামায়া চণ্ডীকে স্মরণ করিতেছেন। দস্যুগণ অদূরে মদ্যপানে রত। দস্যুসর্দার পূজায় ব্যস্ত। কিন্তু বলি দিবার পূর্বক্ষণে একটি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। বিদ্যুৎবরণী মহামায়া চণ্ডিকা সহসা সেখানে আবির্ভূ'তা হইলেন। সমস্ত বনভূমি তাঁহার অঙ্গের প্রভায় আলোকিত ও পদ্মগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। মাতা চণ্ডিকা মার্কণ্ডেয়কে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা, ভয় নাই। তোর কাতর আহ্বান আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তোকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি।" বালকের চক্ষুদ্ব'য় দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত লইয়া উঠিল। মাতা চণ্ডিকা মার্কণ্ডেয়ের মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দস্যুগণ ভীতিবিহ্বল চিত্তে সাষ্টাঙ্গে মাতৃপাদপদ্মে পতিত হইল।

কিন্তু সহসা যমরাজ সেখানে আবির্ভূ'ত হইয়া করজোড়ে দেবীকে কহিলেন, "মার্কণ্ডেয়ের আজ মৃত্যুর দিন, মার্কণ্ডেয়ের আয়ুষ্কাল সমাপ্ত হইয়াছে। দেবি! আপনি মার্কণ্ডেয়কে পরিত্যাগ করুন।"

দেবী ব্যথিতা হইয়া কহিলেন, "যমরাজ! মার্কণ্ডেয় এখন আমার আশ্রিত, আমি তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়াছি। নিয়ম আমার সৃষ্টি, আমি নিয়মের অধীন নই। মৃত্যুপতি, সে আর তোমার অধিকারভুক্ত নহে। তাহার আশা পরিত্যাগ কর।"

কিন্তু নিজ অধিকারে অহঙ্কৃত যমরাজ তৎকালে বিস্মৃত হইলেন যে, মহামায়ার শক্তিতেই তিনি শক্তিমান। নিজ অধিকার স্থাপনের জন্য মহামায়ার নিকট হইতে বল-পূর্বক মার্কণ্ডেয়কে লইয়া যাইবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। তখন ব্রহ্মা নারায়ণাদি দেবগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া যমরাজের এই চপলতাকে নিরস্ত করেন। নারায়ণ মার্কণ্ডেয়কে এই সময় বরদান করেন, "তুমি আজ হইতে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাক।" মহামায়া বর দিলেন, "তুমি আমার মহিমার কথা প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্তি লাভ করিবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

কোন বস্তুরই সমগ্র সত্তার নাগাল পাওয়া সীমিত মনের সাধ্য নয়। তাই আমরা প্রায়ই অন্ধহস্তিন্যায়ে দেখে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে মন চোখের দেখাকে বিশ্বাস করে না। প্রশ্ন করে: "ইনি কি মানুষ, না ভগবান?" কিন্তু এটা কোনও সমস্যা নয়। যিনি অনেকের চেয়ে বেশী করে তাঁকে দেখেছিলেন, সেই বিবেকানন্দ বলেছেন, "তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার-আপনার ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।"

Max Muller শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেছিলেন: "He was a wonderful mixture of God and man." এতে অবশ্য পূর্বোক্ত আপাতসমস্যা এড়ানো যায়—ভগবান মানুষ হয়েছিলেন, না মানুষ ভগবান হয়েছিলেন—"As if," Max Muller-এর ভাষাতেই, "there could be priority in philosophical or religious truth." কিন্তু এমন "mixture" -এর কল্পনা এ দেশের মানসে কষ্টকল্পনামাত্র। তার কারণটাও তাঁর ভাষাতেই প্রকাশ করছি: "In India the distance between deity and humanity is very small; gods are believed to become men, and men gods, without much ado about it."

"ভারতবর্ষে দেবত্ব ও মনুষ্যত্বের পার্থক্যটা নিতান্তই কম; বেশী হৈচৈ না করেই সেখানে দেবতারা মানুষ হয়ে দেখা দেন, আবার মানুষও দেবত্ব লাভ করেন।"

আজ যখন পৃথিবীর মানুষ একদিকে চন্দ্র ও গ্রহতারকার দিকে হাত বাড়াচ্ছে আর অন্যদিকে আন্তর আকাশের মহাশূন্যে দিশাহারা তখন এই দেবমানব-প্রসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন। আজ সমস্ত জগৎ এক বিরাট সভ্যতাসংকটের সম্মুখীন। Hamlet-এর প্রসিদ্ধ প্রশ্ন "to be or not to be" নতুন রূপ নিয়েছে—"to bomb or not to bomb!" Old Testament-এর আস্তিক্যসূচক প্রশ্ন, "Have we not all one Father?"—আজ বড় পুরাতন। মানুষ ভুলেছে: "পিত্রৈকতাবান্ ন চ জাতিভেদঃ।"

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত চিকাগো ধর্মমহাসভার পঞ্চসপ্ততিতম বার্ষিকী উপলক্ষে চিকাগো শহরেই অনুষ্ঠিত ধর্মালোচনাচক্রে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ Father Robert Campbell আক্ষেপ করে বলেছেন, "It seems to me that there has developed a crisis in Christianity, the worst crisis in its history." "আমার মনে হয় খৃষ্টধর্মে এর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকট দেখা দিয়েছে।" তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আরও বলেন, "The liberal Christian outlook is sympathetic to a great extent to the Hindu outlook. As a matter of fact, on many points, I think, you will find the liberal Christian outlook moving in the direction of the East in much of its philosophy—both in its concept of an impersonal God and in the concept that we are all divine." "উদার খৃষ্টান

দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু দৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আমার মনে হয়, বস্তুত অনেক বিষয়ে আপনারা দেখবেন উদারনৈতিক খৃষ্টান দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে - এর দর্শনের দিকে অনেকখানিতে,—নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের কল্পনায় বা আমরা সকলেই দেবত্ব-সম্পন্ন এ চিন্তায়।"

আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি উদারমতাবলম্বী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের এ নতুন চিন্তাধারার কারণ কোথায়। এমন কি Father Campbell এ কথাও বলেন, "This concept [original sin] is very offensive to liberal Christianity which holds that man is perfectable by training and proper education." "নব্য খৃষ্টান চিন্তাধারায় প্রাথমিক পাপের কল্পনাটিও নিতান্ত অপ্রীতিকর, কেননা এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ প্রকৃত শিক্ষা ও চেষ্টার দ্বারা পূর্ণতালাভে সক্ষম।" বিষয়গুলি বিচার করলেও সহজেই প্রতীয়মান হয় বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের পাশ্চাত্তো প্রচারের ফলেই এ সকল নতুন দৃষ্টির সৃষ্টি। "With five words he (Vivekananda) conquered the world, so to say, when he addressed men and women as 'ye divinities on earth !—Sinners ?' " যেন পাঁচটি কথায় বিবেকানন্দ জগৎ জয় করলেন, 'মর্ত্যভূমির দেবতা তোমরা! পাপী ?'—প্রথম চারটি প্রাচ্যের কথা—আশার কথা, উৎসাহের কথা। শেষটি পাশ্চাত্তোর কথা—নৈরাশ্যের কথা, অবসাদের কথা। বিবেকানন্দের জয় প্রাচ্যের জয় পাশ্চাত্তোর ওপর, উৎসাহের জয় অবসাদের ওপর, আশার জয় নৈরাশ্যের ওপর। Romain Rolland'ও স্বীকার করেছিলেন, "It is incontestable that a relationship reveals itself between the Vedantic ideas and many of the ideas and tendencies which are appearing now in the West." "এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বৈদান্তিক চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্তোর কিছু কিছু আধুনিক চিন্তাপ্রবণতার মধ্যে বেশ একটা সম্বন্ধ রয়েছে।" কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল যে, এই চিন্তার পরিবর্তনের জন্য বৈদান্তিক চিন্তাধার আধুনিক কালের প্রচার দায়ী। স্বামী অশোকানন্দজী **The Influence of Indian Thought on the Thought of the West**-এ Romain Rolland-এর এ সন্দেহের নিরাকরণ করেছেন।

এই নতুন প্রচারের কথা বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন :

"The present upheaval of the spiritual tide, the waves of which, traversing nearly half of the world, have touched the shores of America, was produced by the Christlike character and divine personality of Bhagavan Sri Ramakrishna—revered and worshipped in India today as an ideal manifestation of the divine glory." "আজ অধ্যাত্মচেতনার যে নতুন জোয়ার উঠেছে, যার ঢেউ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক অতিক্রম করে আমেরিকার তটে তটে আছড়ে পড়ছে, তার কারণ খৃষ্টের মতো চরিত্র ও ও ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি আজ ভারতে ভগবদৈশ্বর্যের এক আদর্শ প্রকাশ বলে সম্মানিত ও পূজিত।" Max Muller লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর সময়েই : "Some Vedantist missionaries, such

as Vivekananda, Abhedananda, Saradananda, and others, who were sent to America, are lecturing there before large audiences, and have actually made some converts who accept the Vedantic view of the world." "কিছু বৈদান্তিক প্রচারক, যেমন বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, এবং অন্যান্যরা যাঁদের আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে, বিরাট শ্রোতৃবর্গের সামনে বক্তৃতা করছেন এবং বেশ কিছু ব্যক্তিকে তাঁদের মতে নিয়েছেন, যাঁরা জগৎ সম্বন্ধে বৈদান্তিক ভাবকে গ্রহণ করেছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকীর সময়ে আমাদের দেশের মনীষী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারও দেখেছিলেন: "Today in 1936 it is possible to observe objectively that among all the agencies that are contributing to the expansion of the intellctual horizon both in the East and the West, and the establishment of international rapprochement none is more substantial and profound as a world force than the Vedanda centres in the U. S. A." "আজ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বাস্তবসাক্ষ্যে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব যে, যুগপৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মানসিক দিগন্তের সম্প্রসারণে ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের স্থাপনায় যে-সকল মাধ্যম কাজ করছে, তাদের মধ্যে বিশ্বশক্তি হিসাবে আমেরিকার বেদান্ত কেন্দ্রগুলি অপেক্ষা অন্য কোন সংস্থা গভীরতর ও উপযুক্ত কাজ করেনি।"

যে মানুষটির জীবন ও চরিত্রই মুখরিত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বিশ্বে এই নব-উদ্বোধন সৃষ্টি করেছিল, যিনি নিরক্ষর হয়েও অক্ষর সত্যের কথা 'বহতা নীরের' মতো গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ করে তথাকথিত শিক্ষিতের বিদ্যামদোন্মত্ত অভিমানকে লজ্জিত করেছিলেন, যিনি 'আপনি আচরি ধর্ম' লোকারণ্যের বনস্পতিস্বরূপ তিনি ভগবান্ হ'ন বা না হ'ন, এই যুগন্ধর মহাপুরুষকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ভারতের সনাতন ধর্মের জয়ধ্বজা যখন ভূলুণ্ঠিত, ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতে জনমানসে যখন সন্দিগ্ধতা ভিন্ন সকল আস্তিক্যবুদ্ধিই অবলুপ্ত,—বক্তৃতা, গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-রচনা বা সমাজসংস্কার তখন ভারতের মাটিতে কার্যকর হবার নয়। তাই এর কোনটিই করেননি রামকৃষ্ণ। সংশয়িত মনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন বিশ্বাস জন্মায় না। জীবনেই যেখানে অনাস্থা সেখানে জলন্ত জীবন ভিন্ন আর সকলই নিষ্ফল। রামকৃষ্ণ এই মহাসংকটকালে সকল নাস্তিক্যের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে সংশয়াকীর্ণ জনমানসের সামনে আপন জীবনবেদটিকে খুলে ধরলেন। রামমোহন থেকে শুরু করে (আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসমাজ, ধর্মসভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, প্রার্থনা-সভা, আর্যসমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি) এ দেশের ভাবজগতে সে যুগে যে নতুন নতুন তরঙ্গ উঠেছিল যাকে আমরা ভারতের নবজাগরণ বা রেঁনেসাস বলে থাকি, তা কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, শুধু জাগরণই—চলা নয়, কোন নতুন পথে ঠিক ঠিক চলা নয়। নবজাগরণ ও পুনরুজ্জীবনে এই খানেই পার্থক্য। সেই হিসাবে পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা করেছিল রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য। কারণ দীপই দীপকে জ্বালাতে পারে। জীবনই উজ্জীবনের কারণ হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশব সেনের স্মরণসভায় কলকাতার টাউন হলে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন: "It has been truly said that a great man is the product of his age and that

he is made by his age. But, in a larger and far truer sense, he makes the age and impresses upon it his genius and his character." "ঠিকই বলা হয় যে, কোন বিরাট পুরুষকে তাঁর যুগই সৃষ্টি করে। কিন্তু আরও এক বৃহত্তর সত্য-দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায় যে, তিনিই তাঁর যুগকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর মনীষা ও চরিত্রের ছাপ রেখে যান তাঁর সৃষ্ট সেই যুগের বুকে।" রামকৃষ্ণের পক্ষে এ কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখানে স্মরণ হয় **Origin and Evolution of Religion** গ্রন্থে E. W. Hopkins-এর মন্তব্য: "Every great thinker adds to home and heritage something not be interpreted in terms of either, what he hands on to posterity is the old religion **plus himself**, which may be the most important factor of all." "প্রত্যেক চিন্তানায়কই তাঁর দেশ ও তাঁর ঐতিহ্যে এমন একটা কিছু যোগ করেন, যা এগুলির কোনটি দিয়েই ব্যাখ্যা হয় না; তিনি তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে যা দিয়ে যান তা সেই প্রাচীন ধর্ম আর তার সঙ্গে আপনাকে—আর এই যোগটিই হয়ত দেখা দেয় সবচেয়ে মূল্যবান্ উপাদান হিসেবে।" রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও প্রতিধ্বনিত এই বার্তা:

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

সুপ্তির ঘোরে ঢলে পড়া দেশবাসীর কাণে নবজাগরণের বাণী যাঁরা শুনিয়েছিলেন তাঁরা স্মরণীয়, তাঁরা বরণীয়। সে বাণী তাদের উদ্‌ভ্রান্ত পথের যাত্রাকে 'তিষ্ঠ' বলে স্তব্ধ করেছে, কিন্তু নবযাত্রার পথিকৃতের হাতছানি ছিল না সে বাণীর সামনে। কারণ তখনও সেখানে যে জীবনের যোগ হয়নি যাতে ফুটে উঠেছিল 'দুহাজার বছরের ভারতের সুমহান্ সাধনা।' তাই বলছিলাম নবজাগরণ এলেও পুনরুজ্জীবনের তখনও ছিল বাকী! বিবেকানন্দের মন্তব্য—'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গেই শুরু হয়েছে সত্যযুগ'—এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ঐতরেয় ঋষি ব্রাহ্মণে বলছেন:

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি চরৈবেতি॥"

মোহনিদ্রার কালই কলিকাল। জেগে ওঠার নাম দ্বাপরে বাস। আত্মবিশ্বাসে দাঁড়িয়ে উঠলে হয় ত্রেতাযুগ। আর এগিয়ে চলাই সত্যযুগের লক্ষণ। এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" বলে দ্বাপরের কৃষ্ণের মত আহ্বান জানিয়েছিলেন নবজাগরণের যুগের নবঋষিরা। প্রত্যক্ষ জীবনের গতি যখন যুক্ত হল তখনই এল এগিয়ে চলার যুগ। তাই রামকৃষ্ণ-আবির্ভাবকে সত্যযুগের প্রবর্তন বলার সার্থকতা।

এখন দেখা প্রয়োজন—এ পথ-চলা কেমন, এ পথ চলার লক্ষ্য কি? এই আলোচনার শুরুতেই বিনয় সরকারের আর একটি কথা মনে পড়ছে: "His **Kathamrita**, 'the nectar of words' has turned out to be the most dynamic social philosophy of the age, and this has created for him a position of one of the greatest 're-makers' of mankind."

"তাঁর (রামকৃষ্ণের) 'কথামৃত', অমৃতময়ী বাণী, এ যুগের সবচেয়ে গতিশীল সমাজদর্শন হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাঁকে দিয়েছে

মানবজগতের শ্রেষ্ঠ পুনর্গঠকদের অন্যতম আসন।"

"দয়া কিরে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" নবজাগরণের পর শিবজ্ঞানে দাঁড়িয়ে ওঠা ও জীবসেবায় এগিয়ে চলা। এই হল এ নব যুগের সাধনা ও লক্ষ্য। রামকৃষ্ণের সমাজদর্শনের প্রথম প্রবক্তার মুখে তাই শুনি—"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—নিজের মুক্তি ও জগতের হিত। 'Philosophy' কথাটা আজকাল বহু ব্যবহারে ধার হারাতে বসেছে। এমন কি আমরা উচ্ছৃঙ্খলতারও philosophy বার করার একটা চেষ্টা করি। কিন্তু যখন আমরা রামকৃষ্ণের philosophy বা দর্শনের কথা বলি তখন আমাদের প্রাচীন অর্থের দর্শনের কথাই বলি। ভারতীয় চিন্তায় দেবত্ব-মনুষ্যত্বের মত দর্শন ও ধর্ম অবিভাজ্য।[১] —"Philosophy or religion, the two being really inseparable from the Hindu point of view." (Max Muller). প্রযুক্তি বা ব্যবহারই এখানে আসল কথা। দর্শন-লাভ ও দর্শনদান উভয় ক্ষেত্রেই তাই জীবনের স্পর্শের একান্ত আবশ্যকতা। কথার ফুল-ঝুরিতে দর্শন হয় না। এ কথা স্মরণ না থাকায় আমরা অনেক সময় ভাবি, রামকৃষ্ণের আবার দর্শন কি? তিনি তো প্রায় নিরক্ষর। 'He did not know a word of Sanskrit, and it is doubtful whether he knew enough Bengali,' 'he was ignorant of English', 'Ramakrishna never wrote a philosophical treatise.'—এই সব কথা, আবার যদি কয়েকটা বিদেশীর কথা হয়, তবে আমাদের পক্ষে অবশ্যই সন্দেহ হয় তাঁর দর্শন আছে কিনা। আবার এর পর যখন Max Muller-এর কাছে শুনি: "Ramakrishna was in no sense of the word an original **thinker**, the discoverer of a new idea or the propounder of any new view of the world," তখন আমরা ধরেই নিই এখানে নতুন কিছু নেই; তাই খুঁজে দেখি কোন্ দার্শনিকের সঙ্গে (অর্থাৎ যাঁর লেখা বই আছে) তাঁর কথা কতটা মেলে। Max Muller-এর কথা না মেনে অনেক কথাই যুক্তি দিয়ে বলা যায়, তবে এ কথা মেনে নিয়েও একটা কথা কিন্তু এই যে, ওঁদের দেশে যাঁরা thinker (চিন্তা করেন) তাঁরা philosopher, আর আমাদের দেশে যাঁরা 'দর্শন' করেন (দেখেন) তাঁরা দার্শনিক। সত্যিই রামকৃষ্ণ নতুন কিছু 'চিন্তা' করেননি, নতুন তত্ত্ব 'দর্শন' করেছিলেন এবং জগৎকে দেখার নতুন ভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আশ্চর্য, Max Muller কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত কথার পরেই বলেছেন: "But he **saw** many things which others had not seen, he recognized the Divine Presence where it was least suspected, **he was a poet.**"

কিন্তু তিনি এমন অনেক জিনিস 'দেখে-ছিলেন' যা অন্যে দেখেননি, যেখানে কেউ ভাবেও নি, সেখানেও তিনি ঐশ্বরিক সত্তাকে চিনেছিলেন, তিনি ছিলেন এক কবি।" যিনি মনের অগোচর তাঁকে তিনি চিন্তা দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেননি, কিন্তু যা অনেকে দেখেননি তা তিনি দেখেছেন। তাই তাঁর চেয়ে আর বড় দার্শনিক কে? তারপর Max Muller তাঁকে কবি বলেছেন, আরও বলেছেন,

১ লেখকের 'ধর্ম ও দর্শন', বিশ্ববাণী, ১৩৭২, পৃ: ৭০৯

'a dreamer of dreams', যদিও এই স্বপ্নাবলীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। আমরাও রামকৃষ্ণকে কবি বলি, এক যথার্থ কবি। কেননা তিনি দর্শনক্ষম। 'কাব্য-কৌতুকে' ভট্টতৌত বলেছেন :

"নানৃষিঃ কবিরিত্যুক্তমৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।"

—যিনি ঋষি নন তাঁকে কবি বলা যায় না, আর যাঁর দর্শনশক্তি আছে তিনিই ঋষি।

"দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।"

—দর্শনের পর বর্ণন করলে তবেই দার্শনিক কবিখ্যাতি লাভ করেন। এই অর্থেই রামকৃষ্ণ কবি। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কবি ও দার্শনিককে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী বলে মনে করেন। আমরা তাঁদের কথায় সায় দিই না। ঋষিকবির কাব্যই তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

এমন ঋষিকাব্যে কোথাও দেখি দেহবৃক্ষে দুটি পাখীর কথা। একটি স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে, অপরটি উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। Goethe-এর Faust-এ এর প্রতিধ্বনি শুনি :

"Two souls contend
In me, and both souls strive for masterdom."

দ্রষ্টা কবি রামকৃষ্ণের ভাষায় এরাই 'আমি'র রূপে দেখা দেয়, 'কাঁচা আমি' 'পাকা আমি'। একেই বলি কাব্য। যে দেখেছে তার প্রকাশে থাকে না কোনও অস্পষ্টতা। এমন ঋষিকবিই অন্যের গুরু হতে পারেন, অর্থাৎ অন্ধকার দূর করতে পারেন। যাঁর দেশ দেখা আছে তিনিই অন্যকে সে দেশের পথ দেখাতে পারেন। "ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে।"—(ঋগ্বেদ); যে দেখেনি তার কথায় ধাঁধা লাগে। রামকৃষ্ণ বলতে পারেন : "ওদের কথায় ধাঁদা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।"—(রবীন্দ্রনাথ); ঋষিকবির মত তিনি বলতে পারেন : 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'—"সেই মহান পুরুষকে জেনেছি।" তার পরেও বলতে পারেন, "তোমাকেও দেখাতে পারি।" কারণ তাঁর যে দেখা আছে, ভাবা নয় যে (not speculation' কথার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাবে। তাই তিনি বলতে পারেন, "এখানকার (শ্রীরামকৃষ্ণের) অনুভূতি বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।"

(ক্রমশঃ)

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানীরা বলেন, তরঙ্গের ব্যাপ্তি অসীম। একবার কোন তরঙ্গ উঠলে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে, ব্যোমে। ভাবতরঙ্গের বেলাতেও কি তাই নয়? ব্যোমে ব্যাপ্ত না হ'লেও তা কি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে না? চোদ্দ শতকে উত্তর ইতালীতে যে ভাবতরঙ্গ উঠেছিল এবং যা ষোল শতকে ফ্রান্স জার্মানী হল্যাণ্ড স্পেন ও ইংল্যাণ্ডকে প্লাবিত করেছিল তার কি পরিসমাপ্তি ঐখানেই ঘটেছিল? স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, না, ঐ তরঙ্গপ্রবাহ ষোল শতক বা ইয়োরোপে—কোনখানেই ফুরোয়নি; ঐ ভাবজলোচ্ছ্বাসই এসে উনিশ শতকে আঘাত করেছিল ভারতের উপকূলে।[১]

ভারতের নবজীবন:

ভারতে এই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লোকমান্য তিলক (১৮৫৬-১৯২০), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), গোপালকৃষ্ণ গোখেল (১৮৬৬-১৯১৫), শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) প্রভৃতি লোকোত্তর প্রতিভা ও যুগাবতার পুরুষ।

এই সময়ের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: আমি যে সময় জন্মগ্রহণ করি সেই সময়টা ছিল বাংলা দেশের এক মহাযুগ। তিনটি আন্দোলনের ধারা তখন আমার দেশের জীবনে মিশেছিল: রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ধর্ম-আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত পথে সাহিত্য-আন্দোলন এবং একরকম জাতীয় আন্দোলন যাকে ঠিক পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলন বলা যায় না।[২] আন্দোলন তিনটির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়-প্রবর্তিত আন্দোলনকে ঠিক 'ধর্ম-আন্দোলন' না ব'লে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন' ব'লে অভিহিত করাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত।

যা হোক উল্লিখিত আন্দোলন তিনটি কোনমতেই স্বতন্ত্র আন্দোলন ছিল না, ছিল একই আন্দোলনের তিনটি বিভিন্ন দিক। এই আন্দোলনকেই বলা হয় ভারতীয় রেনেশাঁ বা ভারতের নবজীবন। অনেক সময় অবশ্য নবজীবন না ব'লে 'নবজাগরণ', 'নবযুগ' বা 'জাগৃতি'[৩] ব'লেও অভিহিত করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ নবমন্ত্রের ধারক না স্রষ্টা?

উনিশ শতকের এই ভাব-আলোড়নের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিরাট পুরুষকে রেনেশাঁ বা নবযুগের সন্তান বলেই ধরা হয়। অর্থাৎ বলা হয়, নবজীবনের মন্ত্র আগেই পুঁথিবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, এবং এঁরা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তন্ত্রধারকের। এ রকম ধারণাকে বড়জোর অর্ধসত্য ব'লে স্বীকার করা চলে।

---

১ The East and the West

২ My Life—A lecture delivered in China in 1924

৩ Renaissance-এর বাংলা 'জাগৃতি' বোধ হয় করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়

এই সব প্রতিভাধর পুরুষ শুধু নবমন্ত্রের উদ্গাতাই ছিলেন না, নবমন্ত্রের স্রষ্টা বা (জ্ঞাননেত্রে দেখে থাকলে) দ্রষ্টাও ছিলেন। শুধু মন্ত্রপ্রচারই নয়, অন্তত: মন্ত্রের শুদ্ধিকরণ (sublimation) এবং সুসংবদ্ধকরণে (synthesis) এঁদের ভূমিকা ছিল সমগুরুত্বপূর্ণ। এই শেষোক্ত ভূমিকায় যাঁদের দেখা গিয়েছিল তাঁদের তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করলে মোটেই ভুল হয় না। কারণহিসেবে এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, শ্রীঅরবিন্দ যাকে 'পূর্ণতর রূপে আমাদের সংস্কৃতিতে পুনরাবর্তন' ব'লে অভিহিত করেছেন[৪] তা বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দই সম্ভব করেছিলেন। মনীষী রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় "তাঁকে (বিবেকানন্দকে) দ্বিতীয় স্থানে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যেখানেই তিনি কোন ভূমিকা নিয়েছেন, সেখানে তিনিই ছিলেন প্রথম।"[৫] ভারতীয় রেনেশাঁ বা ভারতের নবজীবনের প্রসঙ্গে উক্তিটি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ব'লেই ধরা যায়।

এই অভিমতের সপক্ষে ভারতের নবজীবনের চরিত্র সামান্য ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এবং তার জন্যে প্রয়োজন হ'লো রেনেশাঁর কিছুটা চরিত্র-বিশ্লেষণের।

রেনেশাঁ শব্দের অর্থ ও রেনেশাঁর চরিত্র

রেনেশাঁ বলতে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ এবং পরস্পরসম্পর্কিত ঐতিহাসিক বস্তুনিচয় (historical category)—উভয়ই বুঝায়। এই সন্ধিক্ষণ হলো, যাকে বলা হয় মধ্যযুগ তার এবং যা'কে আধুনিক যুগ ব'লে অভিহিত করা হয় তার যোগসূত্র; আর পরস্পরসম্পর্কিত বস্তুনিচয় বলতে পাশ্চাত্য দেশবাসীদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে যে যে পরিবর্তন বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঐ যুগসন্ধিক্ষণকে সূচিত করেছিল তাদেরই বোঝায়।

শব্দগত অর্থে রেনেশাঁ হ'লো নবজন্ম (Renascence বা Rinascita)। এইজন্যে অনেক সময় রেনেশাঁকে শিক্ষাসংস্কৃতির পুনর্জন্ম ব'লেই ধরা হয়। কিন্তু এরকম সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে রেনেশাঁকে দেখা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে রেনেশাঁ বলতে বোঝায় ব্যক্তির নবজন্ম বা ব্যক্তিত্বের মুক্তি। এইজন্য মানবতা বা humanismই হলো রেনেশাঁর কেন্দ্রীয় ধারণা।[৬]

রেনেশাঁ ও আধুনিকতা

অনেক সময় রেনেশাঁ ও আধুনিকতাকে একই অর্থে ধরা হয়। এরকম ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ রেনেশাঁ হ'লো যুগসন্ধিক্ষণ—মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণ। অতএব, রেনেশাঁ আধুনিক যুগের প্রবেশদ্বার—প্রতিশ্রুতি মাত্র। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে, আধুনিক যুগে সূচিত হয় দুইটি প্রধান পরিবর্তনধারা: বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্ব এবং ফলে, ধর্মীয় অনুশাসনের ক্রমহ্রাসমান কর্তৃত্ব।[৭] ইতালীয় রেনেশাঁর যুগেই খৃষ্টধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ক্রমহ্রাসমান হ'তে শুরু করেছিল সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান কিন্তু বিশেষ প্রভুত্ব বিস্তার ক'রতে সমর্থ হয়নি। ঐ রেনেশাঁর পুরোহিতরা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা স্বীকারের মধ্যে বিজ্ঞানের পথে যতটুকু পদসঞ্চার সম্ভাবনা নিহিত ঠিক

৪ The Renaissance in India

৫ Prophets of the New India

৬ Encyclopaedia Britannica, Vol, XIX, article by Preserved Smith.

৭ History of Western Philosophy

ততটুকুই করেছিলেন। রেনেশাঁ যাঁকে প্রথম আধুনিক ব্যক্তি ব'লে অভিহিত করেছেন সেই পেত্রার্ক[৮] এর বেশী কিছু করেননি।

আরও বলা যায়, আধুনিক দু'টো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হ'লো গতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিকতা। রেনেশাঁ গতিশীলতার বাণী বহন করলেও গণতান্ত্রিকতাকে বিশেষ আথিথেয়তা প্রদর্শন করেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, রেনেশাঁ এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেও ঠিকমত পথনির্দেশ—সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা বা সমবায়ের পথনির্দেশ করতে পারেনি। আর আপামর সাধারণের প্রতি সহানুভূতিও রেনেশাঁরই কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অর্থাৎ, কি ইতালীয় কি বৃহত্তর ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ কখনই জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না, কারণ ঐ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিবাদভিত্তিক আন্দোলন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুরুতে ভারতীয় রেনেশাঁ বিশেষ সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও পরে ব্যাপ্তিতে সম্প্রসারিত হ'য়ে জনগণকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল, এবং এই রূপান্তর বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দেরই দান।

রেনেশাঁ এবং ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ

রেনেশাঁর যুগে ইতালীয়রা শিল্পসংস্কৃতি এবং মানবতার পুনরুদ্ধার নিয়েই ব্যস্ত ছিল, ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। খৃষ্টান ধর্মগুরুদের মার্জিত ল্যাতিন সংস্কৃতির আবরণে ঢাকা ছিল শত সহস্র অনাচার। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডির বাইরে মানবতাবাদিগণ অতি-অহংবাদ দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে এই সব অনাচারকে মোটামুটি মেনেই নিয়েছিলেন। এককথায় বলা যায়, তাঁদের ছিল নীতিবোধের সহিত সম্পর্কহীন দৃষ্টিভঙ্গি (amoral attitude)। এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রসারিত হয়েছিল বৃহত্তর ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর ক্ষেত্রে।

রেনেশাঁর মানবতাবাদিগণ কোন ধর্মসংস্কারও করতে সমর্থ হননি এবং এর ফলে মানব-শ্রেষ্ঠত্বের (apotheosis) ধারণাও সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেনি।

যাজকরা মানুষের বিচারশক্তিতে আংশিক বিশ্বাস করতেন। তাঁদের অভিমত ছিল, মানুষ বিচারবুদ্ধি ও পাপের সমন্বয়। স্বর্গ থেকে আদমের পতনের ফলে মানুষের মূল প্রকৃতি এতটা বিনষ্ট হয়েছে যে, চার্চের বিশেষ সহায়তা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি লাভ করা অসম্ভব।[৯]

মানবতাবাদিগণ অবশ্য ধর্মযাজকদের এই বক্তব্য মেনে নেননি, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিবাদভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির তাঁরা এই বিশেষ সক্রিয় বিরোধিতাও করেননি।

ইয়োরোপকে অবশ্য ধর্মবিশ্বাসের মুক্তির জন্যে বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল ধর্মসংস্কার বা টিউটনিক রেনেশাঁর দ্বারা, ইতালীয় রেনেশাঁর দ্বারা নয়। ঐতিহাসিকদের মতে, সতর শতকের যা কিছু শ্রেষ্ঠত্ব তার মূলে রেনেশাঁর চেয়ে ধর্মসংস্কারের দানই বেশী।

তবুও বলা যায়, উভয় আন্দোলনের উৎস ছিল একই—মানবতার মুক্তির তাগিদ।

ভারতীয় নবজীবন ও ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ যদিও জেমস কাজিনস (James H.

৮ Will Durant: Renaissance (The Story of Civilisation, III)

৯ F. M. Watkins: The Age of Ideology

Cousins) প্রভৃতির মতে, ভারতের প্রসঙ্গে রেনেশাঁ বা নবজীবন শব্দটির ব্যবহার সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তবুও ভারতীয় রেনেশাঁ কথাটি ইতিহাস সাহিত্য দর্শনে বিশেষ সুপ্রচলিত। যেমন কাজিনসের বক্তব্য হ'লো : ভারত সকল সময়ই জাগ্রত ছিল। সুতরাং সুপ্তি থেকে জাগরণের কোন প্রশ্নই ছিল না। যুক্তিটি মাত্র আপাতদৃষ্টিতে সত্য. কারণ আঠার শতকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষের আগে ভারত যে বিশেষভাবে সুপ্তিমগ্ন হ'য়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সুতরাং নব-জাগরণের প্রয়োজন ছিল এবং ভারতের প্রসঙ্গে রেনেশাঁ বা নবজীবন শব্দটির ব্যবহারে আপত্তির কিছুই নেই। আরও বলা যায়, এই ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা বা একটু পৃথক ধরনের ঘটনাকেও একই নামে অভিহিত করা হয়।

এর পর বিরাট বিষয় হ'লো, ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ এবং ভারতের নবজীবনের মধ্যে সাদৃশ্য কতটুকু আর বৈসাদৃশ্যই বা কতটুকু।

সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় উদ্ভবগত দিক দিয়ে, তাও অবশ্য পুরোপুরি নয়। ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর জন্ম হয়েছিল ফ্লোরেন্স নগরীতে এবং তারপর উত্তর ইতালী থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে। ভারতীয় রেনেশাঁর উদ্ভব হয়েছিল কলকাতা নগরীতে এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিগত দিক থেকেও দেখা যায় যে, ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর ন্যায় ভারতীয় রেনেশাঁও ছিল সুপ্তি থেকে জাগরণ এবং নবজীবন-গঠনের প্রচেষ্টা।

এর পর কিন্তু সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া কঠিন। ছাপাখানা ও পুঁথিপত্রের পুনরাবিষ্কারের দরুন প্রাচীন গ্রীসীয়-রোমান সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ফলে ইয়োরোপীয় রেনেশাঁর সূত্রপাত হয়েছিল। ভারত কিন্তু নবজীবনের প্রেরণা পেয়েছিল পাশ্চাত্য ভাবধারার আমদানি এবং বিস্মৃত অতীতের পুনরুদ্ধার—উভয়ের ফলে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় রেনেশাঁ আন্দোলন ছিল যুক্তি, নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস—এই তিনেরই মুক্তি-আন্দোলন। এর দরুনই ভারতীয় রেনেশাঁ শুরু থেকেই ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ, ইয়োরোপের মতো নীতিবোধের মুক্তি উপেক্ষিত হয়নি, আর ধর্মসংস্কারের প্রচেষ্টা পরে মূল-রেনেশাঁর ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়নি। যুক্ত হয়েছিল রেনেশাঁর পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় থেকেই।

আরও দেখা যায়, নীতিবোধের সহিত সম্পর্কহীন হওয়ার দরুন ইয়োরোপীয় রেনেশাঁ কোনদিন জনপ্রিয় আন্দোলন হ'য়ে ওঠেনি, ভারতীয় রেনেশাঁ নীতিবোধেরও মুক্তি আন্দোলন অল্পসময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় রূপ গ্রহণ করেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটা প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দেরই অবদান।

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজীবন

এইবার আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে, ভারতীয় নবজীবনের পূর্ণতর রূপদানে যে যে প্রতিভাধর অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের নামই সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত। তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ইয়োরোপীয় জীবনধারা ও খৃষ্টধর্মের মন্ত্র-তন্ত্র যখন এদেশে প্রথম আমদানি হ'লো তখন তার ছটায় রাজা রামমোহনের মতো দু-এক-জন ছাড়া সকলেরই চোখ ঝলসে গিয়েছিল। আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ফলে যাকিছু আপন, যাকিছু জাতীয় তা ভেঙে

ফেলার প্রবণতাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল।

তারপর দৃষ্টি কতকটা ফিরল যা কিছু নিজস্ব তার দিকে। এর ফলে অনেকটা উপেক্ষা অবজ্ঞা অস্বীকারের ভাব এলো আমদানিকরা সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি।

তৃতীয় পর্যায়েই এলো পূর্ণতর পদ্ধতিতে নিজস্ব সংস্কৃতিতে পুনরাবর্তন। এই পূর্ণতর পদ্ধতি হ'লো প্রথমোক্ত পদ্ধতি - পদ্ধতি দু'টোর সার্থক সমন্বয়। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে এই সমন্বিত পদ্ধতি আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির মূলসূত্রটি খুঁজে বের ক'রবার প্রচেষ্টা করেছিল। এই প্রাচীন সংস্কৃতির রূপ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা ক'রলেও প্রয়োজনমত তাকে ঢেলে সাজতে দ্বিধা করেনি। বৃহত্তর বিবর্তনের প্রয়োজনে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সার্থক সমন্বয়ের প্রচেষ্টায় কোনকিছুই বাদ দেয়নি।

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রচেষ্টাকে 'পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংস্করণ' (preservation through reconstruction) ব'লে অভিহিত করেছেন, এবং তাঁর মতে, এতে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা সম্পূর্ণ অতুলনীয়।[১০]

এখন প্রশ্ন, এই ভূমিকাগ্রহণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজীবনকে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে কতটা সমৃদ্ধ করেছিলেন? ওপরের আলোচনা থেকেই এর বেশ খানিকটা উত্তর পাওয়া যাবে। বলা হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় রেনেশাঁর জনপ্রিয় রূপদান করেছিলেন; ফলে নবজীবনকে দিয়েছিলেন গণতান্ত্রিকতার ছাপ। একা কোন সংস্কার সাধন করা যায় না, নূতন জীবনধারার পথে চলা যায় না; এর জন্যে প্রয়োজন হ'লো সমবায়ের এবং আপামর সাধারণের মধ্যে আশা-উদ্দীপনা সঞ্চারের—আধুনিক জীবনের এই মৌলিক শিক্ষা স্বামী বিবেকানন্দেরই দান।

সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় নবজীবনকে দিয়েছিলেন আধুনিকতার প্রধানতম উপাদান গণতান্ত্রিকতা।

মানব-শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় যে ভারতীয় রেনেশাঁ ইয়োরোপীয় রেনেশাঁকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাও স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হ'লো, মানুষ অপূর্ণাঙ্গ হলেও কখনও পাপী নয়। এই বাণীকেই স্বামী বিবেকানন্দ পরিণত করেছিলেন তাঁর জীবনবেদের অন্যতম প্রধান সূত্রে।

পাপী যখন নয় তখন ধর্মীয় সহায়তা বা পুরোহিতের সাহচর্যের প্রশ্ন ওঠে না। মানুষ তার স্বীয় প্রচেষ্টার ফলে, স্বীয় পুরুষকারের বলে আত্মার উদ্বোধন সম্ভব ক'রে দেবত্ব লাভ করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। এর জন্যে যা দরকার তা হ'লো অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণের বা 'বিদ্যামায়ার' আবাহনের।

আবার পথ নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেক আত্মাতেই ঐশীশক্তি নিহিত; লক্ষ্য হ'লো এই অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন সার্থক করা। কর্মের মাধ্যমেই হোক, পূজার্চনা উপাসনার মাধ্যমেই হোক, যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হোক আর দার্শনিক জ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই হোক—লক্ষ্য ঐ একই। এই হ'লো ধর্মের মূলকথা, তত্ত্বসূত্র মন্ত্রতন্ত্র মন্দির বিগ্রহ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বিস্তার মাত্র।[১১] অতএব, তোমার পথ তুমি নিজেই বেছে নাও। চল

১০ The Renaissance in India, op. cit.

১১ স্বামী বিবেকানন্দ : রাজযোগ

সেই পথে—উদ্বোধনের পথে। বল আমিই ঈশ্বর—আমিই পরিপূর্ণতা; তুমিই ঈশ্বর, তুমিই পূর্ণাঙ্গতা।

মানবের এই পরিপূর্ণতা, এই পূর্ণাঙ্গতা হ'লো রেনেশাঁর মৌলিক মন্ত্র। কিন্তু ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের আগে এই মৌলিক মন্ত্র আর কেউ কি এমন ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন, আর কেউ কি রেনেশাঁর জীবনদর্শনের এমন ব্যাখ্যা দিতে পেরেছিলেন? উত্তর 'না' বলা হলে নবজীবনের রূপদানে স্বামী বিবেকানন্দের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত জীবন-দর্শনের এই যে নূতন ব্যাখ্যা, একে বলা যায় 'নব্য বেদান্ত'। এর ব্যাখ্যা বারান্তরে বা স্থানান্তরে ক'রব। (ক্রমশঃ)

জননী সারদামণি

শ্রীনৃপেন আকুলি

নিখিল ধরার দুঃখ ও শোক, স্মরণ করিয়া এলে—
যত ব্যথাভার করিতে মোচন অসীম করুণা ঢেলে।
অতি সাধারণ মাটির কুটির, তুমি সেথা এলে যবে—
জ্বলেনি সেদিন আলোকের মালা বরণের উৎসবে।
স্নেহ-করুণার অলকানন্দা ছিল ও বুকের তলে,
স্মরিতে সে কথা নয়নের কূল উছলিয়া ওঠে জলে!
নিষ্ঠা ও ত্যাগে দীপময়ী তুমি, মূর্ত পবিত্রতা;
যেন নারীত্বে শত দল মেলি লভিয়াছ পূর্ণতা।
দিয়েছ নূতন পূজার মন্ত্র কায়-মনে জনসেবা;
দেখায়েছ তুমি অমৃতের পথ, তোমারে ভুলিবে কেবা?
স্মৃতির বেদীতে আসন দিয়েছি সীতা ও সাবিত্রীরে,
দাঁড়াতে পেরেছি কি সৌভাগ্য, তোমার চরণ ঘিরে!
নিশীথলগ্ন, আকাশ-বাতাস, আজি বিভীষিকাময়;
জননী তোমার অভয় অঙ্কে পেতে দাও আশ্রয়।
নূতন উষার মঙ্গলরবি জাগুক পূর্বাচলে,
পারিজাতরাজি হোক বিকশিত এধরার ধূলিতলে।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

(৩)

পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তা বুদ্ধিজীবীদিগের intellectual gymnastic (বুদ্ধির ব্যায়াম)। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগকে ভিত্তি করিয়া বুদ্ধিসহায়ে একটি সামগ্রিক world theory (জাগতিক তত্ত্ব) প্রতিপাদনের চেষ্টা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের মতবাদগুলি সমসাময়িকভাবে সত্য এবং বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া problematic (সংশয়াত্মক); incontrovertible certitude (অকাট্য নিশ্চয়তা) ইহাদের নাই বলিলেই চলে। তাই বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'। History of Western philosophy is history of exploded theories (প্রতীচ্যের দর্শনেতিহাস ভ্রমাত্মক তত্ত্ববহুল প্রমাণিত সুতরাং বহু তত্ত্ব পরিত্যক্ত)—ইহা বলা চলে।

প্রাচ্যদর্শনের মূল্যায়ন অন্যরূপ। ইহা বোধিপ্রসূত সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব। ইহা অবিসংবাদিত, অবাধিত এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণমূলক। অবশ্য যুক্তি-অবলম্বনে এই তত্ত্বগুলিকে logic (তর্কশাস্ত্র)-এর ছাঁচে ফেলিয়া সর্বসাধারণ বুদ্ধির এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাছে অযৌক্তিক কিছু নহে বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। প্রাচ্য-দর্শনালোচনার ক্ষেত্রে যুক্তি শ্রুতিমূলক এবং শ্রুতি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ইহাই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার দিক-নির্ণায়ক মূল সূত্র।

আমাদের দেশে যে সকল প্রতিভাবান দার্শনিক ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই শ্রুতিকে অপৌরুষেয় ও চরম সত্যানুসন্ধানের একটি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাই এই ধর্মপ্রবর্তক দার্শনিক ব্যক্তিগণ স্বানুভবের সহিত মিলাইয়া শ্রুতিকে উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে শ্রুতিপ্রতিপাদিত তত্ত্বরাশির উপর নিজেদের দার্শনিক চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। একমাত্র গৌরপাদকারিকায় যে আত্ম-স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে তাহা সবটাই যুক্তিমূলক। সেখানে গৌরপাদ জীবের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ করিয়া সাক্ষী তুরীয় সত্তাকে নির্দেশিত করিয়াছেন। বৌদ্ধ শূন্যবাদের বিরুদ্ধে চিরবর্তমান স্বসংবেদ্য প্রত্যক্‌চৈতন্যকে প্রমাণিত করিতে গিয়া তিনি এই যুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তবে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'মাণ্ডূক্যকারিকা' 'মাণ্ডূক্যশ্রুতি'কে অবলম্বন করিয়াই বিরচিত হইয়াছে।

এই প্রাচ্য দার্শনিক সমীক্ষার ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে নিজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ইঙ্গিত করিয়াছেন। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"অখিলভুবনজন্মস্থেমভঙ্গাদিলীলে
বিনতবিবিধভূতব্রাতরক্ষৈকদীক্ষে।
শ্রুতিশিরসি বিদীপ্তে ব্রহ্মণি শ্রীনিবাসে
ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা ॥"

এই শ্লোকানুসারে বলা যাইতে পারে

র্যর মতে জগৎকারণ ব্রহ্মবস্তু সৃষ্ট জগতের ভূতগ্রামের স্রষ্টা, নিয়ন্তা ও প্রতিপালয়িতা। যদি প্রশ্ন তোলা হয়—কেন তিনি জগতের স্রষ্টা ইত্যাদি হইলেন? শ্রীরামানুজের মতে ইহা অচিন্ত্য—ব্যষ্টিমন সমষ্টিমনের স্বরূপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অপারগ। Intrinsically (বস্তুত:) এই মাত্র বলা যাইতে পারে 'সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়' তাঁহার creative self-expression (সৃজনকারী আত্মপ্রকাশন)—সৃষ্টি অর্থে ইহা বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মে যাহা যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। 'অসৎ' কিছু হইতে 'সৎ' হইতে পারে না। কারণ আচার্য 'সৎকার্যবাদী' ছিলেন। ইহা বিজ্ঞানসম্মতও বটে।

এই সৃষ্টি তাঁহার মতে 'বিরামহীন'—ব্রহ্ম অধিষ্ঠান-কারণ, উপাদান-কারণ এবং efficient cause (নিমিত্ত-কারণ) ; সবই তিনি একাধারে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব এক সত্তায় বিধৃত হইয়া আছে—unity in diversity (বহুত্বে একত্ব) হচ্ছে চরম সত্য। 'Bare identity' বা 'নিগু'ণ সত্তা' চরম সত্য মানিয়া লইলে 'বৈচিত্র্য ও বহুত্বে'র কোন ন্যায়-সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্কর-প্রচারিত মায়াবাদ-খণ্ডনপ্রসঙ্গে ইহা বিস্তারিত আলোচিত হইবে। জগৎ ও জীবের বৈচিত্র্যকে উড়াইয়া না দিয়া প্রত্যক্ষানুভূতিসিদ্ধ বিষয় শ্রুতিপ্রমাণবলে মানিয়া লইয়া একটি জগদ-তীত সত্তার লীলাবিকাশরূপে ভাবিলে সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে কোন বাধা হইতে পারে না। যদি অন্য কোন উচ্চস্তর থাকে আপনিই প্রকাশিত হইবে—কালেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিচার্য যে, ব্যবহারিক অদ্বৈতসাধনায় শ্রীশঙ্করাচার্য 'শূন্যবাদ'কে প্রত্যাখ্যান করিয়া বাদরায়ণের 'জন্মাদ্যস্য যত:' মানিয়া লইয়া জগৎকারণরূপে ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে বলা যাইতে পারে আধ্যাত্মিকজীবন-দর্শন প্রতিপাদনে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজের মধ্যে মতানৈক্য নাই বলিলেই চলে।

তৃতীয় তত্ত্ব—আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষীভূত দুইটি সত্তা আছে। জড় প্রকৃতি ও অজড় ভোক্তা জীব—শ্রীরামানুজের ভাষায় চিৎ ও অচিৎ—ভোক্তা বা ভোগ্যরূপে জড়িত আছে। কিন্তু এই দুইটি সত্তাই পরমপুরুষ ব্রহ্ম বা অন্য ভাষায় শ্রীবিষ্ণুর অপার্থিব চিন্ময় সত্তায় বিধৃত হইয়া আছে। যেমন গীতায় আছে—'এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়'। এই তিন সত্তার সম্বন্ধ 'অপৃথক্‌সিদ্ধি'-সম্বন্ধ—যেমন বৃক্ষ ও তাহার শাখাসমূহ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, নীলত্ব ও পদ্মবস্তু সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীরামানুজের Theory of Knowledge (জ্ঞানতত্ত্ব) অনুসারে substance (বস্তু) এবং attribute (গুণ) পৃথক করা যায় না। বিশেষণের জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুসত্তা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মবস্তু চিৎ ও অচিৎকে লইয়াই সত্তাযুক্ত। এক এবং বহু অপৃথকসিদ্ধি তত্ত্ব—ইহা অনস্বী কার্য। কারণ শ্রুতিতে আছে 'একোঽহং বহু স্যাম্'—তিনি ইচ্ছা করিয়া বহু হইয়াছেন। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।' এক ও বহু নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আছে। উক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে রামানুজদর্শনকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা দরকার যে নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদের' সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতের সাদৃশ্য বহুল; কিন্তু ভাস্কর ও যাদবের 'ভেদাভেদবাদে'র সঙ্গে বহু বিষয়ে অনৈক্য আছে। যদিও শ্রীশঙ্করের 'মায়াবাদ'

খণ্ডনে এই তিনটি দার্শনিক মতই এক-পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ তত্ত্ব—শ্রীরামানুজাচার্য ব্রহ্মবস্তুকে 'শ্রীনিবাস' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'শ্রী' অর্থ 'লক্ষ্মী'—ইহা ঈশ্বরকৃপা সূচিত করে। এই মতানুসারে ব্রহ্ম অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর এবং কৃপাশক্তিযুক্ত হইয়া জীবের আশ্রয়স্থল, মুক্তিদাতা এবং চিৎ ও অচিৎ বস্তুর নিয়ন্তা ও লয়স্থান। এই ভাবমূলক বলিয়া শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়কে 'শ্রীসম্প্রদায়' আখ্যা দেওয়া হয়।

পঞ্চম তত্ত্ব—আচার্য প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন, আমার জ্ঞান ভক্তিরূপা হউক। আচার্যের মতবাদে জ্ঞান ও ভক্তি আলাদা নহে। যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তিতে পর্যবসিত হইবেই। এই বিষয়ে পরপর্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীরামানুজাচার্য-বিরচিত 'লঘুসিদ্ধান্ত' কিয়দংশ বিবৃত হইল।

১। পরমাত্মা—চিৎশক্তি, আনন্দশক্তি ও প্রেমশক্তি-যুক্ত অক্ষয় সত্তা। ইনি সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামিরূপে সর্বভূতে বিদ্যমান—জীবাত্মারও আত্মা তিনি।

২। জগৎ এবং কর্তা ও ভোক্তা জীব তাঁহার শরীর। তিনি ইহাদের অন্তরাত্মা, সর্বনিয়ন্তা। তিনি নিত্য ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। তবে জীবের জ্ঞান ও কর্মের নিত্য পরিবর্তন হয়।

৩। প্রকৃতি—প্রকৃতিও নিত্য পরিবর্তন-শীল। সুখ ও দুঃখ দিয়া জীবাত্মাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহজীবনের ঘটনা-বলী জীবের শিক্ষার স্থল। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া শ্রীভগবান বিষ্ণু প্রত্যেক জীবাত্মাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহা তাঁহার কৃপার নিদর্শন (ক্রমশঃ)

শ্যামা মা

শ্রীমতী জয়ন্তী বসু

তুমি কালো,
আবার রূপেরও আলো—
চিন্ময়জ্যোতিঃরূপা!
সব বাতায়ন বন্ধ করে
হৃদয় অন্ধকার করে
আমি তোমায় সেখানে খুঁজে বেড়াই।
আবার প্রেমের আলো জ্বেলেও খুঁজি।
তুমি লুকিয়ে থাকো, খুঁজে পাই না;
তুমি নিজে দেখা না দিলে কি কেউ
খুঁজে পায় তোমায়?
কৃপা করে দেখা দিয়ে
জীবন সার্থক কর, পূর্ণ কর মা!

জননী কুন্তী

শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ

পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। যুগে যুগে এই পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন কত মহাপুরুষ, কত শত মহীয়সী নারী—যাঁদের অনবদ্য চরিত্র, অম্লান গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি-কাহিনীর কথা আজও ভারতের মহাকাব্যের—ভারত-ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত—ভারতবাসীর চিত্তপটে চিরসমুজ্জ্বল। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নির্ধন অগণিত নরনারী আজও শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে স্মরণ করে তাঁদের কথা, আর ভাবে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'

বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে একমাত্র এশিয়া ভূখণ্ডই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত, সুপ্রাচীন গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী, আবার সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যে দেশ এত অধিকসংখ্যক মহামানব আর মহীয়সী নারীর জন্মদাত্রী। ভারত ছাড়া আর কোন্ দেশ এই মহান সৌভাগ্যলাভের গর্ব করতে পারে?

বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে তাই একদা উচ্চারিত হয়েছিল—"আমাদের মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ, ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র। শুধু এই দেশেই সুদূর অতীত হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব-জীবনের মহত্তম আদর্শগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। ……জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর, যেখানেই সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে দেখিতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত মানবসমাজের কাছে অমূল্য ভাবসমূহের খনি হইয়া রহিয়াছে। যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই—রোমের কথা কেহ ভাবে নাই—বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্ব-পুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অরণ্যবাসী মাত্র ছিল—সেই সুদূর যুগেও ভারত তাহার সংস্কৃতি-সাধনায় মুখর। তাহারও পূর্বে যে অতীতের খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না—যাহার কুয়াসা ভেদ করিতে কিংবদন্তীও সংকুচিত, সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত কত উচ্চ উচ্চ ভাব শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া ভারত হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।…সত্যই আমাদের জন্মভূমির কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম।"

যাঁদের আবির্ভাবে বিশ্বের দরবারে ভারত এমন গৌরবময় স্থান লাভ করেছে, ভারত-বাসীর কুল পবিত্র হয়েছে, কৃত-কৃতার্থ হয়েছে, সেই অগণিত প্রণম্য পূত-চরিত্র মহামানব এবং মহীয়সী নারীদের মধ্যে অন্যতমা হয়েও যাঁর চরিতকথা বর্তমানকালে সর্বজনসমক্ষে ততখানি সমুজ্জ্বল নয়, সেই মহিমময়ী দেবী কুন্তীর কথাই আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

পুষ্পের সৌন্দর্য বা সৌরভ যেমন অপরের দেখা না দেখা, বলা না বলার উপর নির্ভর করে না—আপন সৌন্দর্য ও সৌরভে সে জগৎকে আমোদিত করে, জনচিত্তে আনে আনন্দের স্পর্শ—আদর্শচরিত্র মানুষও তেমনই তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে, তাঁর

অনন্যসাধারণ প্রতিভায়, অনবদ্য চরিত্রে মুগ্ধ করেন বিশ্বজনকে। তাঁদের জীবনই তাঁদের বাণীর মূর্ত রূপ। এমনই এক আদর্শ-চরিত্রা মহীয়সী নারী ছিলেন মহাকাব্য মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্ররাজির মধ্যে অন্যতমা জননী কুন্তী।

ধর্মাত্মা, সুধীর, প্রাজ্ঞ বসুদেবের পিতা যদুশ্রেষ্ঠ মহারাজ শূরের কন্যা পৃথা পালিত হলেন ভোজরাজগৃহে। রাজা কুন্তিভোজের নামানুসারে রাজপুত্রী পৃথা পরিচিত হলেন কুন্তী নামে। জন্মেছেন রাজগৃহে, লালিত পালিত হয়েছেন রাজপ্রাসাদে, রাজকন্যার উপযুক্ত আদর-যত্নেই কেটেছে তাঁর শৈশবের দিনগুলি। বিবাহান্তে রাজকুলবধূরূপেই তিনি এলেন সেকালের বিখ্যাত রাজবংশ কুরুকুলে।

মহারাজ বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা পাণ্ডুর হাতেই তাই সমর্পিত হল কুরুবংশের রাজদণ্ড। কিন্তু রাজকন্যা, রাজকুলবধূ, পাণ্ডুপত্নী মহারাণী কুন্তীর এ সুখের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হল না। অচিরেই অস্তমিত হল তাঁর সৌভাগ্যসূর্য। মহারাজা পাণ্ডু অকালে অতি অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করলেন। 'পতিঃ হি পরমো গুরুঃ।' ভারতীয় নারীর এই সনাতন আদর্শে যাঁর জীবন গড়া, সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী যাঁর জীবনের আদর্শ, প্রিয়তমের বিরহে তিনি জীবনধারণ করবেন কেমন করে? পতির সঙ্গে সহমৃতা হবার—স্বেচ্ছায় চিতাগ্নিতে জীবন-বিসর্জনের সঙ্কল্প করলেন কুন্তী দেবী। সহমরণে যাত্রার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করার পূর্বে তাই সপত্নী মাদ্রীর হাতে নাবালক পুত্রদের ভার অর্পণ করে স্বীয় সঙ্কল্প ব্যক্ত করে বললেন, "আমি জ্যেষ্ঠা পত্নী, ভর্তার সহমৃতা হব। তুমি এই নাবালক পুত্রগণকে পালন কর।' কিন্তু এ গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মতা হলেন না মদ্ররাজতনয়া। সহমরণে যেতে তিনিও কৃতসঙ্কল্প।

মাদ্রীদেবী বললেন, 'আমি তোমার পুত্রদের আমার নিজপুত্রের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারবো না; তুমি কিন্তু আমার পুত্রদের নিজপুত্র জ্ঞানে পালন করতে পারবে।'

শোকের চেয়েও কর্তব্য বড়। ভগিনীপ্রতিম স্নেহে একদিন যাঁকে সপত্নীরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন, আজ সহমরণে যাবার মহান গৌরবটুকু তাঁকে দিয়ে নীরবে সরে দাঁড়ালেন পতিবিয়োগবিধুরা কর্তব্যপরায়ণা দেবী কুন্তী। সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণী কথা'য় বলেছেন, "প্রাণদান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক, প্রাণ একবার বই দেওয়া যায় না, যদি বহুবার প্রাণ দেওয়ার কোনো পথ থাকে তবে তাহাকেই জীবনদান বলা যাইতে পারে।" (রামায়ণ ও সমাজ)। দেবী কুন্তীর সমাজ-জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সহমৃতা হবার গৌরবে বঞ্চিত হলেও এই জীবনদানের গৌরবে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কুন্তী-চরিত্র।

কুরুকুলপ্রদীপ মহারাজ পাণ্ডু মহাপ্রয়াণ করেছেন সহমৃতা হয়েছেন রাজ্ঞী মাদ্রী, পাণ্ডুর পঞ্চপুত্র আজ অনাথ, অসহায়। কে তাদের মানুষ করে তোলবার ভার গ্রহণ করবে? কে কুরুবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারিরূপে ভারতের আদর্শ সন্তানরূপে গড়ে তোলবার গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে বহন করবে? ব্যক্তিগত শোকদুঃখের কথা ভুলে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিলেন কুন্তী দেবী। কৌরব-বংশপ্রদীপ এই শিশুদের রক্ষার ভার আজ তাঁকেই নিতে হবে, শোকে মুহ্যমান হয়ে

থাকলে তো চলবে না। কুরুকুলদীপশিখাকে সমুজ্জ্বল করে রাখার জন্য মনের দুঃখ মনে চেপে বুক বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন ধৈর্যময়ী জননী কুন্তী—নিজের তিনটি শিশুপুত্রের সঙ্গে মাদ্রীর দুটি তনয়কেও সমান স্নেহে কোলে তুলে নিলেন তিনি।

তারপর কত ঝড়-ঝাপটা, কত ঘাত-প্রতিঘাত এলো তাঁর জীবনে। সর্বংসহা অচঞ্চলা ধরিত্রীর মতো সব নীরবে সহ্য করে তিনি পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেন। কতবার প্রাণপ্রিয় পুত্রদের এমন কি তাঁর নিজের জীবননাশেরও নানা চক্রান্ত হয়েছে, পুত্রদের কল্যাণার্থে শেষ পর্যন্ত ভারতগৌরব, বিখ্যাত কুরুকুলবধূ ভোজরাজকন্যা পৃথাকে পরগৃহে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ পর্যন্ত করতে হয়েছে—কিন্তু কি মহান্ চরিত্র এই মহীয়সী নারীর! খাঁটি সোনার মতো দুঃখাগ্নির দহনে তা' যেন আরও উজ্জ্বল, পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। "না পোড়ালে সোনা খাঁটি হয় না, না ঘষলে চন্দনের গন্ধ বেরোয় না"—এ প্রবাদবাক্যটি কুন্তী-চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সামান্যা রমণীর মত কখনও তিনি অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করছেন না, নিজের দুর্ভাগ্যে বিলাপ করছেন না, প্রসন্নভাবে সব কিছু সহ্য করে স্বীয় আদর্শের পথে অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তিনি। গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন, 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়' (২।৪৮)—এই যোগযুক্ত কর্মের পরিচয় পাই কুন্তীদেবীর সারাজীবনে।

রাজার প্রাসাদ থেকে শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য, দরিদ্রের পর্ণকুটীর—কোথায় না বাস করতে হয়েছে তাঁকে, নানাবিধ সুস্বাদু মনোহর রাজভোগে যিনি আশৈশব অভ্যস্তা, বনের ফলমূল এমন কি ভিক্ষালব্ধ অন্নেও জীবনধারণ করতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু সব পরিবেশেই শান্তভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল এই মহীয়সী নারীর আর এই adjustment-ই তো শিক্ষা। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করে, নানা 'ডিগ্রী' লাভ করেও যে শিক্ষা আজ আমরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না, তথাকথিত আধুনিক উচ্চশিক্ষা লাভ না করলেও জননী কুন্তীর চরিত্রে দেখি সেই প্রকৃত শিক্ষারই বাস্তব রূপায়ণ।

সব পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি, ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে, নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাঁর, কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে গিয়ে আপন ব্যক্তিত্বকে খর্ব করেননি কখনও, বিসর্জন দেননি নিজ জীবনের মহান আদর্শকে। তাই দেখি প্রাণপ্রতিম যে পুত্রগণের প্রাণরক্ষার্থে কুরুকুলবধূ রাজ্ঞী কুন্তীকে পরগৃহে ছদ্মবেশে দীন জীবন যাপন করতে, এমন কি ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করতে হয়েছে, আশ্রয়দাতার জীবনরক্ষার্থে সেই প্রাণপ্রিয় পঞ্চপুত্রের মধ্যে অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ ভীমকে রাক্ষসের করালগ্রাসের সম্মুখে প্রেরণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হননি তিনি, বরং নিজেই সোৎসাহে উত্থাপন করেছিলেন এই নিদারুণ প্রস্তাব। বিপদে পরম সহায়, মহাপরাক্রমশালী ভীমকে রাক্ষস-সকাশে প্রেরণের প্রস্তাব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেননি। জননীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "যাঁর বাহুবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই, যাঁর ভয়ে দুর্যোধন প্রভৃতি বিনিদ্র থাকে, যিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন, আপনি কোন্ বুদ্ধিতে তাঁকে ত্যাগ

করছেন ?" প্রত্যুত্তরে কুন্তীদেবী ধীরকণ্ঠে শুধু জানিয়েছিলেন, 'ভীম বলবান, তাছাড়া আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করা মানুষের কর্তব্য।'

আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার করার জন্য, পরের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপ্রিয় পুত্রকে এমন করে মৃত্যুমুখে পাঠাতে সাহস করবেন কোন্ মা ? ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে এমন মহিমোজ্জ্বল নারীচরিত্রের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। হয়তো কেউ বলতে পারেন, 'ভীম অসাধারণ পরাক্রমশালী—এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই জননী কুন্তীর পক্ষে ভীমকে রাক্ষস-সকাশে প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল।' একথা যে আংশিকভাবে সত্য তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়, ভীম যে অমর নন, এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রাণহানিও যে ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা কি তাঁর মাতৃহৃদয়ে জাগেনি ? মায়ের প্রাণ স্বভাবতই সন্তানের জন্য সদা উদ্বিগ্ন। সদাসতর্ক সদাশঙ্কিত তাঁর স্নেহদৃষ্টি চায় সন্তানকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করতে—পুত্রের দেহে কণ্টক বিদ্ধ হলে মাতৃহৃদয়ে সে ব্যথা বাজে বজ্রসম, মাতা কুন্তীও তার ব্যতিক্রম নন নিশ্চয়ই। কিন্তু 'মা' হলেও তিনি যে শুধু পাণ্ডবজননী নন, তিনি লোকমাতা, স্বার্থলেশশূন্যা কর্তব্যপরায়ণা নির্ভীকহৃদয়া ক্ষত্রিয়রমণী, একথা তিনি মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি, আর এই খানেই তাঁর অসাধারণত্ব। তাই স্ত্রীজাতিসুলভ সকল দুর্বলতাকে সর্বতোভাবে পরিহার করে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সানুনয় অনুরোধ উপেক্ষা করে এমন কি অপর চারিপুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি পুত্র ভীমকে পাঠালেন ভীমদর্শন নরখাদক বকরাক্ষসের কাছে। মাতৃ-আশীর্বাদে ভীম জয়লাভ করলেন, দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, দেশে শান্তি ফিরে এলো। এমন বীরহৃদয়া না হলে কি ভীমার্জুনের মতো মহাবীর পুত্রের মা হওয়া সম্ভব ?

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে। নরেন্দ্রনাথ তখন শিশু। ছোট্ট 'বিলে' (নরেন্দ্রনাথের ডাক নাম) সঙ্গী সাথীদের নিয়ে চড়কের মেলা দেখে বাড়ী ফিরছেন। হঠাৎ দলভ্রষ্ট হয়ে 'ফুটপাথ' থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো একটি ছেলে আর ঠিক সেই সময়েই তার সামনের দিক থেকে ছুটে এলো একটা ঘোড়ার গাড়ী। 'গেল !' 'গেল !' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো সবাই কিন্তু কারও সাহস হল না অসহায় শিশুটিকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে যেতে। এমন সময় সকলকে অবাক করে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো আর একটি শিশু, অপর ছেলেটির হাত ধরে প্রায় অশ্ব-পদতল থেকে টেনে আনল তাকে। বিলের পরার্থপরতা বন্ধুপ্রীতি অসম সাহস দেখে মুগ্ধ হল সবাই। বাড়ী পৌঁছে মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে সব কথা বলতেই তিনি বিলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সব সময় এই রকম মানুষের মতো কাজ ক'রো, বাবা !' বহু সাধনায় লব্ধ, পরম স্নেহাস্পদ নয়নের মণি স্বীয় একমাত্র পুত্রের প্রাণও যে বিপন্ন হয়েছিল, সে চিন্তার চেয়ে পুত্র যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অপরের প্রণরক্ষা করতে পেরেছে, সেই গর্বে মাতৃহৃদয় তখন গর্বিত। আধুনিক যুগেও দেখি পৌরাণিক যুগের শাশ্বত ভারতের একই মহান আদর্শের পুনরভিব্যক্তি।

জননী কুন্তী জানতেন একতাই বল। পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাতে কখনও মনোমালিন্যের অবকাশ না ঘটে সেদিকে ছিল তাঁর অতন্দ্র

দৃষ্টি। সপত্নীর পুত্রদ্বয় এবং স্বীয় পুত্রত্রয়ের প্রতি তাঁর ব্যবহারে বৈষম্য দেখা যায়নি কখনও।

রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজমাতা কুন্তীর জীবনে দুঃখের যেন শেষ ছিল না। তাই কৌরবদের নানা ষড়যন্ত্র, নানা চক্রান্ত এড়িয়ে বহু দুঃখ-কষ্টভোগের পর পাণ্ডবরা আবার রাজ্যের অধীশ্বর হলেও সে সুখ বেশীদিন ভাগ্যে সইল না তাঁদের, কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে রাজ্য ধনসম্পত্তি সব হারিয়ে দ্রুপদনন্দিনী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে পুনরায় বনবাসে যেতে হল। কিন্তু কী অদ্ভুত সহনশীলতা দুঃখভারজর্জরিতা কুন্তীদেবীর! নিয়তির এই নিষ্ঠুর বিধানে বুক ভেঙ্গে গেলেও সাধারণ নারীর মতো বিলাপ করছেন না তিনি! বনবাসযাত্রার প্রাক্কালে আদরিণী বধূ দ্রৌপদী বিদায় প্রার্থনা করলেন। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠল, বাক্যস্ফুরণ হল না কারও, ধৈর্যময়ী কুন্তীদেবী ধীরকণ্ঠে শুধু বললেন—'কৌরবগণ ভাগ্যবান, তাই তোমার কোপে তারা ধ্বংস হয়নি। নির্বিঘ্নে যাত্রা কর—আমি সর্বদাই তোমাদের শুভ-চিন্তা করব। সহদেবকে দেখো সে যেন এই বিপদে অবসন্ন না হয়।' নিরাভরণ বন-গমনোদ্যত পুত্রগণকে বিদায়কালে আশীর্বাদ করে শোকার্তা মাতা পুত্রদের সঙ্গে বনগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন—'তোমরা ধার্মিক, সচ্চরিত্র, ভগবদ্ভক্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় হল কেন?' দুঃখে জর্জরিত হয়েও দুর্যোধনাদির কূটবুদ্ধির নিন্দা করছেন না, পুত্রদের অন্যায়ভাবে প্রতিশোধগ্রহণের জন্য উত্তেজিত করছেন না, বরং তারা যে ধর্ম-পরায়ণ সে কথাটিরই বিশেষ করে উল্লেখ করছেন। চরম বিপদে কী আত্মসংযম!

কিন্তু সহনশীলতা আর কাপুরুষতা সমার্থক নয়। তাই দেখি দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরান্তে শ্রীকৃষ্ণ যখন যুধিষ্ঠিরের দূতরূপে শান্তিস্থাপন-প্রয়াসী হয়ে এসে ব্যর্থমনোরথ হলেন তখন তাঁর মাধ্যমে ক্ষাত্রধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরকে এই গল্পটি বলে পাঠালেন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে:

বিদুলা নামে এক তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া রাণী ছিলেন। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম সঞ্জয়। বারংবার শত্রুহস্তে পরাজিত হয়ে সঞ্জয় উৎসাহহীন হলেন এবং যুদ্ধ না করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। পুত্রকে হতোদ্যম দেখে রাণী বিদুলা তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে বললেন, '.. ...নিজেকে অবজ্ঞা কোরো না। নির্ভীক হও। লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না, সে মানুষের সংখ্যা বাড়ায় মাত্র। নির্বাপিত অগ্নির ন্যায় ধূমায়িত হয়ো না, মুহূর্তকালের জন্যও জ্বলে ওঠো, শত্রুকে আক্রমণ কর।'

হতোদ্যম সঞ্জয় কাপুরুষের মতো উত্তর দিলেন, 'আমার যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয় তবে সমগ্র পৃথিবী পেয়ে আপনার কি লাভ হবে?' সত্যই সসাগরা ধরণীর চেয়ে, ত্রিভুবনের চেয়েও জননীর কাছে প্রিয় তার সন্তান। কিন্তু মা হলেও বিপুলা সামান্য নারী নন, ভাবের ললিত ক্ষেত্রে অলস বিহারের চেয়ে তেজোদীপ্ত কর্মময় জীবনই তাঁর কাছে প্রেয়। তাই পুত্রের প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'যুদ্ধের ফলে তোমার সমৃদ্ধি-লাভ হবে কিংবা ক্ষতি হবে তার বিচার না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, মনে রেখো তোমার শত্রু সিন্ধুরাজ অজেয় নন। যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন অথবা শত্রুর বিনাশ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তিলাভ হতে পারে না।' এভাবে বারবার উৎসাহিত হয়ে সঞ্জয় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং জয়লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

ছন্দে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নাম ও কবিতাবলী—রাজেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক: শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু। পো: ও গ্রাম—সরিষা, জেলা—২৪ পরগণা। পৃষ্ঠা ৬৮; মূল্য দুই টাকা।

সরলপ্রাণ ধর্মনিষ্ঠ এক ব্যক্তির মনোগত ভাব বাল্যকাল হইতে বিভিন্ন সময়ে ছন্দোবদ্ধ হইয়াছিল, সেগুলির সংকলন-রূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনন্ত নাম', 'মায়ামুদ্গর', ও 'কবিতাবলী'—এই তিন ভাগে কবিতাগুলিকে সাজানো হইয়াছে। কয়েকটি কবিতায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার ছাপ আছে। একটি নিদর্শন:

'নিজ দোষে অন্ধ তুমি দেখ পরদোষ।
পরনিন্দা ক'রে তুমি থাক হে সন্তোষ॥
নিজে তুমি বুঝে চল, পরে কেন মন্দ বল,
পরগ্লানি শুনিলেই বড় পরিতোষ।
আত্মকুৎসা শুনিলেই অতিশয় রোষ॥'

Ramakrishna Mission Vidyapith Souvenir (March, 1970). Published by Swami Suddhasattwananda, R.K. Mission Vidyapith, Deoghar (S.P.), Bihar.

ইংরেজী ও বাংলায় সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধাবলী সংবলিত এই স্মরণিকার আত্মপ্রকাশ বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম দেওঘর বিদ্যাপীঠ শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, স্মরণিকার কয়েকটি রচনায় তাহা পরিস্ফুট। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ: Swami Vivekananda's Call to the Youths of India, Facts About Apollo 11 & 12, India's Role in the Present World Crisis, My Second Innings at the Vidyapith, প্রথম পরিচয়, বৈদ্যনাথধামে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিদ্যাপীঠ (১৯৭০), প্রকাশক: সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর। পৃষ্ঠা ৮০।

দেওঘর বিদ্যাপীঠের এই বার্ষিক পত্রিকাটিতে ১৩টি ইংরেজী, ১২টি বাংলা, ৮টি হিন্দী এবং ৫টি সংস্কৃত রচনা স্থান পাইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্নভাষাভাষী ছাত্র বিদ্যাপীঠে যে একসঙ্গে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহার ছাপ পত্রিকার মধ্যে বিদ্যমান। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা ছাত্রদের সাহিত্যপ্রীতি- এবং ভবিষ্যৎসম্ভাবনাসূচক। শিক্ষকগণের প্রবন্ধাবলী সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী। ছাত্রদের আঁকা চারখানি ছবিই এবং 'Mathematical Puzzle' বেশ ভাল লাগিল।

দীপশিখা (বার্ষিক পত্রিকা, ১৯৬৯) আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়, পো: আসানসোল, জেলা বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৯৪।

'দীপশিখা' নামটি যেমন সুন্দর, তেমনি ছাত্রদের অন্তরে পত্রিকার লেখাগুলির মাধ্যমে জ্ঞানের দীপ জ্বালাইবার প্রচেষ্টাও সুন্দর। প্রচ্ছদটিও 'দীপশিখা' নামের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাত্রদের যত্নসহকারে লিখিত এবং সুসম্পাদিত লেখাগুলির মধ্যে 'বালক বিবেকানন্দ', 'যারা এনে দিল আলোর বন্যা', 'হয়তো ভবিষ্যতে', 'A True Father' আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়গণের রচনাগুলি সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী। 'আমাদের সায়েন্স ক্লাব', 'বিদ্যালয়-প্রসঙ্গ' ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্যালয়-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিজ্ঞাপিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহানন্দে প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু পূজার অন্যান্য দিন আবহাওয়া ভাল থাকায় ভক্ত-সমাগম বেশ হইয়াছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় ১৬,০০০ ভক্ত হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

শাখাকেন্দ্রসমূহে দুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, গৌহাটি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটী, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, রেঙ্গুন, শিলং, শিলচর, শেলা (চেরাপুঞ্জী, খাসিহিল) ও শ্রীহট্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভা

গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৭০, বেলুড় মঠে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬১তম সাধারণ বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের ব্রহ্মচারিগণ মঙ্গলাচরণ করিবার পর সভার আনুষ্ঠানিক কাজ আরম্ভ হয়। স্বামী বুধানন্দ গত অধিবেশনের কার্যবিবরণী, স্বামী ভূতেশানন্দ ১৯৬৯-৭০ সালের মিশনের কার্যসংক্রান্ত গভর্নিং বডির বিবরণী এবং স্বামী ভাস্করানন্দ আলোচ্য বর্ষের হিসাব পাঠ করিবার পর স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বর্তমান পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শেষে প্রেসিডেণ্ট মহারাজের ভাষণের পর শ্রী কে. কে. ঘোষের ধন্যবাদজ্ঞাপন ও শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সমাপ্তি সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন, বর্তমানে জগতে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নিম্নাভিমুখী, আমাদের জাতীয় জীবন সংঘর্ষময়—যাহার আঁচ রামকৃষ্ণ মিশনেও লাগিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন নবযুগের উদ্বোধনের জন্য, সে যুগ আসিতেছে; এখন যুগসন্ধিক্ষণ।

৭০ বৎসর পূর্বে স্বামীজী বলিয়াছেন, দরিদ্র জনগণের উন্নতি ছাড়া দেশ উন্নত হইবে না। স্বাধীন ভারতে এতদিন দরিদ্র জনগণের উন্নতিবিধান প্রায় অবহেলিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষ তাহারই ফলে উদ্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ যাহা চাহিয়াছিলেন, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে উন্নত করিয়া তোলা—তাহা করা হয় নাই, তাই এই সংঘর্ষ। এখনো এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় আছে। রামকৃষ্ণ মিশন তাহার সাধ্যমত সীমিত ক্ষেত্রে এই কাজ করিয়া আসিতেছেন।

কম্যুনিজমের কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথই যথার্থ সাম্যস্থাপনের পথ। তাঁহার সাম্যের ভিত্তি মানুষের দেবস্বরূপতার উপর প্রতিষ্ঠিত—কাহারো কোনওরূপ

বিশেষ অধিকারের স্থান সেখানে নাই।

বর্তমান সময়ে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইলেও উহার সমাধান আমরা করিবই —শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি আমাদের পিছনে রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণীই সারা জগৎ জুড়িয়া রূপগ্রহণ করিতে উদ্যত—কাহারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা কর্মের উপর উহা নির্ভরশীল নয়, উহা সারা জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ভারত সম্বন্ধে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণীয়: আর কখনো সে নিদ্রিত হইবে না, জগতের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতির ভাষণে বলেন, আজিকার জগৎ সম্বন্ধে একটা হতাশার দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকট, কিন্তু সাবধানে দেখিলে দেখা যায়, ধ্বংসের পাশাপাশি একটি সংগঠনী শক্তিও ক্রিয়াশীল। একটি নবযুগের অভ্যুত্থান ঘটিতেছে।

আমরা এখন বাস করিতেছি যুগসন্ধিক্ষণে। আধ্যাত্মিক শক্তিই সভ্যতার চালক। সভ্যতার একটি বিশেষ অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে মানুষ কেবল জাগতিক উন্নতি চাহিতেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর দিকেই তাহার দৃষ্টি পূর্ণনিবদ্ধ। কেবল ইহার দ্বারা কিন্তু জগতের সমস্যার সমাধান হইবে না—মানুষের অন্তর পরিবর্তিত না হইলে সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। মানুষ যন্ত্রমাত্র নয়, ভিতরের মানুষটিকে পরিবর্তিত করিতে পারিলে তবে সব ঠিক হইবে।

ইহার জন্য ঠাকুর-স্বামীজী ভাবাদর্শ দিয়া গিয়াছেন। তাহা শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা জগতের জন্যই। সমাজকে সেভাবে গড়িতে হইবে। ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শানুযায়ীই জগতের দৃষ্টিভঙ্গী পালটাইতে হইবে। ঠাকুর-স্বামীজী সারা জগতে শান্তি স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন। প্রকাশন, আলোচনাদির মাধ্যমে, সর্বোপরি নিজ জীবনে সে আদর্শকে প্রতিফলিত করিয়া আমাদের তাহা প্রচার করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সে শক্তি আমাদের দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৯-৭০ সালের কার্যবিবরণী

গত দুই বৎসর ধরিয়া যে চাপের মধ্য দিয়া মিশনকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইতেছে, ১৯৬৯-৭০ সালে তাহা খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল; এ চাপের অবস্থার কথা পূর্ববর্তী বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি কয়েক মাস ধরিয়া বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে মিশনকে শ্রমিক- ও ছাত্র-আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে এ সমস্যা এত প্রবল হইয়াছিল যে, মিশনের কয়েকটি কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষা করাই দায় হইয়া উঠিতেছিল—যে কেন্দ্রগুলি সুদীর্ঘ দুই-দশকব্যাপী বিপুল শ্রম ও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে, যেগুলি আন্তরিকভাবে জনসাধারণের সেবা পর্যাপ্ত পরিমাণে করিয়া আসিতেছে এবং জনগণের শ্রদ্ধাও অর্জন করিয়াছে। এই সব সমস্যায় জড়িত হইয়া পড়ার ফলে মিশনের অনেকখানি শক্তি ইহাতে ব্যয়িত হইতেছে।

আধুনিক সমাজচিন্তার একটি প্রবণতা হইল অধিকতর দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত এলাকাগুলির উপর কার্যকর ভাবে অধিক মনোযোগ দেওয়া। আমাদের মহান প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাই বহু পূর্বে বলিয়া গিয়াছেন।

গভর্ণিং বডি সব সময়ই এ বিষয়ে পূর্ণ সজাগ; কিন্তু বিশেষভাবে এই কার্যের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের স্বল্পতা, অন্যান্য কার্যের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং প্রয়োজনানুরূপ সাধু-কর্মীর অভাবের জন্য স্বামীজীর এই ভাবকে কার্যে পরিণত করা বহুল পরিমাণে বিঘ্নিত হইয়াছে। তাই বলিয়া একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে, চোখে পড়ার মতো কিছুই আমরা করি নাই। নিম্নে যে সব পরিসংখ্যান দেওয়া হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু করা হইয়াছে; মিশনের সভ্যগণ এবং জনসাধারণও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মিশন গ্রামাঞ্চলের কাজ অধিকতর প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে, এবং সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় একটানা কোন-না-কোন প্রকার ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই জাতীয় কাজের জন্য আরো সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেন এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবার যোগ্যতর যন্ত্ররূপে আমাদের গড়িয়া তোলেন। সেই সঙ্গে একথাও আমাদের ভোলা চলে না যে, আমাদের মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিকতা-বোধ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েরও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন। মিশনকে এসব ক্ষেত্রেও কাজ করিতে হইবে। স্বামীজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের মাধ্যমে সকলকে ব্রাহ্মণত্বের স্তরে তুলিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন; একই নিম্নতর স্তরে সকলকে টানিয়া নামাইতে চান নাই। জনসাধারণের জন্য কাজ করিবার সময় এই আদর্শকে আমাদের দৃষ্টিপথে সদা ভাস্বর রাখিতে হইবে।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৮ জন সাধু সদস্য এবং ৬ জন গৃহস্থ সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে মিশনের মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৭০৬ (সাধু ৩৬৭, ভক্ত ৩৩৯)।

কর্মপ্রসার

আলোচ্য বর্ষে সমাজবিরোধী পরিবেশের সহিত মোকাবিলা করা এবং আরব্ধ কর্মগুলির সংহতিতে প্রধানতঃ ব্যাপৃত থাকার জন্য মিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রসার সম্ভব না হইলেও প্রধান কেন্দ্র ও অনেকগুলি শাখা-কেন্দ্রে কিছু কর্মবিস্তৃতি হইয়াছে। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে সারগাছি আশ্রমের নূতন অতিথি-ভবন উদ্বোধন করা হয়। নভেম্বরে রায়পুরে বিবেকানন্দ সৎসঙ্গ ভবনের উদ্বোধন হইয়াছে। ডিসেম্বরে আলং-এ নূতন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের উদ্বোধন হয়। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লক্ষ্নৌ-এ বিবেকানন্দ পলিক্লিনিকের এবং মার্চ মাসে দেওঘর বিদ্যাপীঠে নবনির্মিত প্রার্থনাভবনের উদ্বোধন উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সিংহলের কলম্বোতে স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতিভবনের উদ্বোধন হয়।

এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠের কর্মপ্রসার বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কাঞ্চীপুরমে নূতন মন্দিরের উদ্বোধন এবং ডিসেম্বরে মহীশূরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায়তনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিদেশে কর্মপ্রসারের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গঙ্গা নগরীতে (Ganges Town) আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা কেন্দ্র কর্তৃক নিজস্ব ভবনের জন্য জমিসংগ্রহ

উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যবিভাগ

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ব্যতীত ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্দ্র ছিল; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া, অবশিষ্ট ৬০টি ভারতে। এতদ্ব্যতীত ৬২টি মঠকেন্দ্র আছে—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১০টি, পূর্বপাকিস্তানে ৮টি এবং সুইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও আরজেণ্টিনায় একটি করিয়া; বাকী ৪১টি ভারতে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক কথিত ও তাঁহার জীবনে রূপায়িত বৈদান্তিক সত্যসমূহের ভিত্তিতে নিঃস্বার্থ সেবাই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট আদর্শ। মিশনের এই আদর্শানুগ বহুমুখী কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ: (১) সেবাকার্য (relief), (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

মঠকেন্দ্রগুলির বিশেষ কার্য জনসাধারণের জীবনে ধর্মভাববৃদ্ধির সহায়তা করা হইলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণে কর্মরত। মঠ ও মিশন উভয় কেন্দ্রেরই রাজনীতির সহিত কোনও সংস্পর্শ নাই, তথাপি বিরুদ্ধ ভাবধারা ও পরিবেশের মধ্যে, এমনকি হিংসাত্মক পরিবেশের মধ্যেও কেন্দ্রসমূহকে কাজ করিতে হইয়াছে।

(১) **সেবাকার্য:** গত বৎসরে মিশন কর্তৃক যে-সমস্ত রিলিফ করা হইতেছিল, সেগুলি ছাড়াও আলোচ্য বর্ষে ভারতের বিভিন্ন অংশে সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

অগস্ট ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত আসামের কাছাড় জেলায় বন্যার্তসেবা এবং জুলাই ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের ওঙ্গোল জেলায় চিরালায় সাইক্লোন রিলিফ করা হয়। চিরালাতে একটি স্কুল, কম্যুনিটি হল ও ৭০টি পাকা বাড়ী সমন্বিত একটি কলোনী গড়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলায় বন্যার্তসেবাকার্য ১৯৬৯-র অগস্টে শুরু করিয়া অক্টোবরে শেষ করা হয়। গত বৎসর হইতে যে-সব সেবাকার্য চলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ বন্যার্তসেবা ও গুজরাট বন্যার্তসেবা যথাক্রমে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ ও মে মাসে সমাপ্ত হয়। উত্তরবঙ্গ বন্যার্তসেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক ২৮৭টি গৃহ, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি কম্যুনিটি হল নির্মিত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ৮৩টি কূপ খনন করা হইয়াছে। গুজরাট বন্যার্তসেবাকার্যে মিশন কর্তৃক সিমেণ্ট কন্‌ক্রিটের ঘর তৈরি করিয়া ২১টি কলোনী নির্মাণ করা হইয়াছে; এখানে ১,৩৬৬টি দুঃস্থ পরিবার আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এইসব কলোনীতে ২টি বিদ্যালয়, ২১টি সমাজমন্দির, ৫টি ইলেকট্রিক-পাম্প-যুক্ত উচ্চ জলাধার তৈরি করা হইয়াছে।

এই সকল রিলিফ-কার্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক জিনিসপত্রের মূল্য সমেত ২৫,০০,০০০ টাকার বেশি ব্যয় করা হয়। ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের পরে মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণার বসিরহাট মহাকুমায় পূর্বপাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সেবাকার্য এবং কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বন্যাত্রাণকার্য এবং গুজরাটে খরাত্রাণকার্য আরম্ভ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঠ-মিশনের স্থায়ী কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব অঞ্চলে স্থানীয় জন-

সাধারণকে অর্থ ও দ্রব্যাদি দ্বারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্রও প্রভূত অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্র প্রধানত: শাখাকেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও, সেখানে হইতে নিয়মিতভাবে ১২৬টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ১৮৯ জন দরিদ্র ছাত্রকে এবং সাময়িকভাবে ১১৮টি পরিবারকে ও ২১ জন ছাত্রকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে; এই সাহায্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২২,১৯৮ টাকা।

(২) **চিকিৎসা:** ভারত ও পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রকর্তৃক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগগ্রস্ত জনসাধারণের সেবাকল্পে অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিসপেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে মোট শয্যা-সংখ্যা ছিল ১,০৩৯; এই গুলিতে ২১,৭৫০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য ছিল। ৫৩টি আউটডোর ডিসপেন্সারীতে পুরাতন রোগীসহ ২৭,৬০,৫৪৮ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। রাঁচির ডুঙ্গরি স্যানাটোরিয়াম এবং নিউ দিল্লীর ক্যারলবাগ হাসপাতাল কেবল যক্ষ্মারোগীদের জন্য। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার অন্যান্য বিভাগ ব্যতীত একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয়। এই নার্স ট্রেনিং স্কুলের দুইটি বিভাগ: জুনিয়র ও সিনিয়র।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণত: অ্যালোপাথিক ও হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

(৩) **শিক্ষা:** আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হইয়াছে:

৫টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি. টি. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ৬টি জুনিয়র বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট, ১টি শারীর-শিক্ষা কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীণ-শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ, ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, (পলিটেকনিক), ১৫টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৬টি ছাত্রাবাস, অনাথাশ্রম প্রভৃতি, ৩টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৭টি অন্যান্য বিদ্যালয়, ৫৯টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কম্যুনিটি সেণ্টার, ১টি পরিষেবিকা-শিক্ষণ স্কুল, ১টি অন্ধ ছাত্রদের জন্য বিদ্যালয়, ১টি দিবা-ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার স্কুল।

এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৫,৮৫৩, তন্মধ্যে ছাত্র ৫০,০৭১ এবং ছাত্রী ১৫,৭৮২।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার:** এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসবাদি, চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যান্টার্ন প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাস বক্তৃতা ও সেমিনারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তকাদি প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কলিকাতা ইনস্টিট্যুট অব কালচারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রসারের মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক যে বিপুলপরিমাণ কার্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে, এখানে তাহা উল্লেখ করা হইল না, কারণ মঠকেন্দ্রগুলির ইহাই প্রধান কাজ। এজন্য বক্তৃতা-সফর, শাস্ত্রালোচনা, ক্লাস প্রভৃতি ছাড়াও অনেকগুলি

বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

(৫) **গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য:** মিশনের কেন্দ্রগুলি শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেগুলি কেবল উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের জন্যই, এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন প্রয়োজন। মিশনের অন্ততঃ ৯টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলেই অবস্থিত, আলোচ্য বর্ষে এই কেন্দ্রসমূহ এবং এগুলির পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১৩৭টি বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক, ৩৯টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক ও মধ্যইংরেজী, ৩৯টি প্রাথমিক এবং ৫০টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র। ১২টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২৩টি লাইব্রেরী, ১৪৮টি দুগ্ধবিতরণকেন্দ্র, ৬টি অডিও-ভিসুয়্যাল ইউনিট, ৯টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৮টি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শিলং কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া আলোচ্য সময়ে ২২,৬৭৭ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কামারপুকুর মিশন কেন্দ্র কর্তৃক ১টি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। নেফা অঞ্চলের কেন্দ্রটি উৎসাহ সহকারে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং এই কার্য গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছে।

লক্ষণীয় যে, শহরাঞ্চলের চিকিৎসা-কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র নরনারী চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতেছে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্র ছাত্র অর্থসাহায্য অথবা বিনা-ব্যয়ে থাকিবার ও শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিশন কর্তৃক প্রায় প্রতি বৎসরই আর্তত্রাণসেবাকার্য (relief) করা হয় এবং এই সেবাকার্যেও গ্রামাঞ্চলের সহস্র সহস্র দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্য লাভ করেন।

বিদেশে কার্য

ব্রহ্ম, সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস, সিংহল এবং ফ্রান্সে যে কেন্দ্রগুলি অবস্থিত সেগুলি মিশনের কেন্দ্র; এগুলির মধ্যে ফ্রান্সের কেন্দ্রটি ব্যতীত অন্যগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশে অবস্থিত অন্যান্য সমস্ত কেন্দ্রই রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র। মঠকেন্দ্রগুলি বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধারাপ্রচারে নিরত।

উল্লেখযোগ্য যে, শাখাকেন্দ্রগুলিকে চালাইবার জন্য মিশন কিংবা মঠের কোন কেন্দ্রীয় তহবিল নাই। প্রত্যেক শাখা-কেন্দ্রকে স্থানীয় সাহায্য সহায়ে নিজ ব্যয়ভার নিজেকেই বহন করিতে হয়। বিদেশের কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধেও একথা সমভাবে সত্য। আবার ইহাও সমভাবে সত্য যে, ভারতীয় কেন্দ্রগুলি বিদেশ হইতেও কোন অর্থসাহায্য পায় না, কোথাও অতি সামান্য যাহা পায় তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে; প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সেগুলি ভারতীয় অর্থের উপর নির্ভরশীল।

বিবিধ সংবাদ

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে আমরা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছি :—

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব (কলিকাতা-৩), বিশ্বসংস্কৃতি মিশন (কলিকাতা-৪), সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কলিকাতা-৫০), রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (কাসুন্দিয়া, হাওড়া), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (গাঙ্গাইল রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠ (আখাউড়া রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা), শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির (উত্তর বাঁ্যাটরা, হাওড়া), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (নাথোয়াহাট, জলপাইগুড়ি), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (কলিকাতা-১৯), ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বারাণসী) প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানসূচী

[অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র, ১৩৭৭ ; বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

তিথি-কৃত্য

১১।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লানবমী	২১শে অগ্রহায়ণ	সোমবার	৭ই ডিসেম্বর
১২।	**শ্রীশ্রীমা**	**অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাসপ্তমী**	**৪ঠা পৌষ**	**রবিবার**	**২০শে ডিসেম্বর**
১৩।	শ্রীযীশুখ্রীষ্ট	—	৮ই পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৪শে ডিসেম্বর
১৪।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাএকাদশী	৮ই পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৪শে ডিসেম্বর
১৫।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লাষষ্ঠী	১৭ই পৌষ	শনিবার	২রা জানুয়ারী
১৬।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লাচতুর্দশী	২৫শে পৌষ	রবিবার	১০ই জানুয়ারী
১৭।	**শ্রীশ্রীস্বামীজী**	**পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী**	**৫ই মাঘ**	**মঙ্গলবার**	**১৯শে জানুয়ারী**
১৮।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লাদ্বিতীয়া	১৪ই মাঘ	বৃহস্পতিবার	২৮শে জানুয়ারী
১৯।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লাচতুর্থী	১৬ই মাঘ	শনিবার	৩০শে জানুয়ারী
২০।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	২৭শে মাঘ	বুধবার	১০ই ফেব্রুয়ারী
২১।	**শ্রীশ্রীঠাকুর**	**ফাল্গুন শুক্লাদ্বিতীয়া**	**১৪ই ফাল্গুন**	**শনিবার**	**২৭শে ফেব্রুয়ারী**
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		**১৫ই ফাল্গুন**	**রবিবার**	**২৮শে ফেব্রুয়ারী**
২২।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণাচতুর্থী	২রা চৈত্র	মঙ্গলবার	১৬ই মার্চ

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লাপঞ্চমী	১৭ই মাঘ	রবিবার	৩১শে জানুয়ারী
২।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণাচতুর্দশী	১০ই ফাল্গুন	মঙ্গলবার	২৩শে ফেব্রুয়ারী

ভ্রমসংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যা উদ্বোধনের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের ২৮শ লাইনে 'পাতঞ্জল দর্শন' স্থলে 'পাতঞ্জল মহাভাষ্য' পড়িবেন।



দিব্য বাণী

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥ ১৪০
রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী॥ ১৪২
দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥ ১৪৩

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।৯

দেবদেব নারায়ণ লীলাভরে এভাবে যখন
অবতীর্ণ হন নিজে লীলাদেহ করিয়া ধারণ
সঙ্গে তাঁর সর্বদাই অবতীর্ণা হন নারায়ণী
অনুরূপ দেহ ধরি, কর্মে তাঁর হন সহায়িনী।
সীতা ও রুক্মিণী রূপে এসেছেন রাম আর কৃষ্ণ-অবতারে,
অন্য অন্য অবতারে সহায়িনী হয়েছেন তাঁর বারে বারে।
নারায়ণ অবতীর্ণ হন যবে দেব কিংবা নরদেহ ধরি,
অনুরূপ দেহ লয়ে লক্ষ্মীও আসেন সাথে যেথায় শ্রীহরি।
বিশ্বপতি নারায়ণ দেবলোকে দেবদেহ গ্রহণ করিলে
জগন্মাতা নারায়ণী গ্রহণ করেন দেবী-দেহ লীলাছলে।
মানুষ হইয়া যবে ধরাধামে অবতীর্ণ হন নারায়ণ
লক্ষ্মীও আসেন সাথে লীলায় মানুষী তনু করিয়া ধারণ।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা

আমাদের সাধারণ ধারণা, অধ্যাত্মিকতায় উন্নত হইতে হইলে জাগতিক কর্মের প্রতি উদাসীন থাকিতে হয়; দুটি দিকেই নজর দেওয়া চলে না। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই ভারত বেশ কিছুকাল জাগতিক উন্নতিকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে, যাহার ফল জাতির এই ঐহিক অবনতি। আবার, কর্মে এই অবহেলার ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেও সে পিছাইয়া পড়িয়াছে, সাত্ত্বিক ভাবের অনুকরণ করিতে যাইয়া অধিকতর তামসিকতাতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে, পাশ্চাত্য জাতিগুলি বিপুল উদ্যমে কর্মে নিরত—ধর্ম তাহাদের নিকট একটি সামাজিক প্রথামাত্রেই পর্যবসিত বলা যায়।

স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এই ধারণা আমাদের পালটাইতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন হইয়াও যে কর্মে পরিপূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব—শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনেই তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে লোককল্যাণকর্মে নিরত থাকিলেও, শ্রীরামকৃষ্ণদেব গার্হস্থ্য জীবন হইতে দূরেই ছিলেন; বিবাহ করিলেও, আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ না করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিলেও যাহাকে 'সংসার' বলে, তাহার সহিত কোন সংশ্রবই তাঁহার ছিল না। অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হইয়াও যে নিখুঁতভাবে 'সংসারের' কাজও করা যায়, এ দৃষ্টান্ত-স্থাপনের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমাকে। গীতায় সাত্ত্বিক কর্মের কর্তার বর্ণনা রহিয়াছে—ধৃতি ও উৎসাহ লইয়া সে কর্ম করে,—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যতখানি উৎসাহী হইয়া কর্ম করে ততখানি বা ততোধিক কর্মোদ্যমই তাহার মধ্যে দেখা যায়—অথচ সর্বাবস্থায় সে সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার এবং আসক্তি-ও অহঙ্কাররহিত থাকে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ইহার জলন্ত উদাহরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন আসিয়াছিলেন 'দুখিনী-ব্রাহ্মণী-কোলে', শ্রীশ্রীমাও তাই। কামারপুকুর তবু সমৃদ্ধ পল্লী, জয়রামবাটী তাহাও নয়, অতি ক্ষুদ্র। পল্লীর এই দরিদ্র সংসারে শৈশব হইতেই তিনি তাঁহার জননী শ্যামাসুন্দরীকে সংসারের কাজে সহায়তা করিয়াছেন—গরুর জন্য 'একগলা জলে নামিয়া দলঘাস কাটা', ক্ষেতে গিয়া ধানের শিষ কুড়ানো ইত্যাদিও করিয়াছেন, আবার ছোট ভাইদের লালন-পালনেও শ্যামাসুন্দরীকে সাহায্য করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের ছোট্ট ঘরটির মধ্যে (৮´×৮´, অষ্টকোণ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য রান্না ও সেবা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জননী চন্দ্রামণির সেবা, প্রভৃতি ছাড়াও ভক্তদের জন্য প্রায় প্রতিদিনই রান্না করিতে হইত, পান সাজিতে হইত। এসব করিয়াও কিছু অবসর আছে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার কিছু পাটের ফেঁসো আনিয়া শিকে তৈরি করিতে দিয়াছিলেন—মেয়েদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে নাই! শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমায়ের অনলস

নীরব সেবার কথাও সর্বজনবিদিত। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কামারপুকুরে থাকাকালীন কিছুদিন তিনি নিজে কোদাল দিয়া কোপাইয়া জমি তৈরি করিয়া শাক বুনিয়াছেন, আক্ষরিক অর্থেই সে সময় শাকান্নে জীবনধারণ করিয়াছেন, অনেক সময় নুনও জোটে নাই! পরবর্তীকালে ভক্তজননীরূপে যখন তিনি বহুজন-পূজিতা, তখনও জয়রামবাটিতে পল্লী-জননীর মতোই সন্তানদের জন্য রান্না প্রভৃতি সব কার্যই করিয়াছেন। তাছাড়া সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, পাগল রাধুদিদি ও তাঁহার মা প্রভৃতিকে লইয়া যে-সংসারে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রারব্ধ লোককল্যাণকর্মকে সুস্পষ্ট রূপ দিবার জন্য দেহরক্ষার প্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশে স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন এবং যেরূপ 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' হইয়া তিরোধানের প্রায় পূর্ব পর্যন্ত সে সংসার চালাইয়াছিলেন, কয়জন পাকা সংসারীও তাহা সেভাবে চালাইতে সক্ষম, জানি না। এক মহিলা তো একদিন বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন, 'মা, আপনাকে মায়ায় ঘোর বদ্ধ দেখিতেছি!' (মা শুনিয়া অবশ্য মৃদুস্বরে স্বগতোক্তি করিয়াছিলেন, কি করি মা, নিজেই যে মায়া!')

অথচ, এই 'মায়ায় ঘোর বদ্ধ' সংসারীর মতো কর্মরত অবস্থায় তাঁহাকে 'মুক্তসঙ্গ', 'অনহংবাদী' ও 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকার' বলিলেও খুবই কম বলা হইল, ইহা তো সাত্ত্বিক সাধকের অবস্থা। তিনি ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী—যাঁহাকে কোন কর্ম বা কর্মফল লিপ্ত করিতেই, স্পর্শ করিতেই পারে না। নিজের এ অবস্থার কথা মা একদিন প্রকাশও করিয়াছিলেন,—তাঁহার জনৈকা আত্মীয়া তাঁহাকে খুবই বিরক্ত করিলে বলিয়াছিলেন, 'আমি তোকে ইচ্ছে করলে এখনি মেরে ফেলতে পারি, আর তাতে আমার পাপও হবে না, পুণ্যও হবে না।' ব্রহ্মজ্ঞান বিরল হইলেও বহু সাধকের হইতে পারে। তিনি যে ইহারও বহু ঊর্ধ্বে—জ্ঞানস্বরূপিণী—যাঁহাকে আমরা মহামায়া, জগন্মাতা, কালী প্রভৃতি বলি তাহাই, একথাও তিনি জানিতেন এবং কখনো কখনো বিভিন্ন ভাষায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেনও। স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই তাঁহার সন্তান।

যে নিরাকার নির্গুণ সত্তা লীলাচ্ছলে সাকারা সগুণা হইয়া জগদীশ্বরী ও জীবজগৎ হন বলিয়া মহানির্বাণতন্ত্র বলিতেছেন, যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শিবঠাকুর বলিতেছেন, তুমি 'অস্মাকমপি জন্মভূ'—আমাদেরও (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও) জননী তুমি, দেবীভাগবতে যিনি নিজেই সে কথা বার বার বলিতেছেন,—সেই সত্তাই সাধারণ পল্লীমাতার রূপ ধারণ করিয়া বলিয়া গেলেন, 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই আমার সন্তান।' বাল্যকাল হইতেই তিনি নিজ অসাধারণত্বের ইঙ্গিত পাইয়াছেন, দলঘাস কাটিবার সময় দেখিতেন তাঁহারই মতো আর একটি মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ঘাস কাটিয়া দিতেছে—'এক আঁটি রাখিয়া আসিয়া দেখি সে আর এক আঁটি কাটিয়া রাখিয়াছে'; কামারপুকুরে খিড়কীর দরজা দিয়া হালদারপুকুরে স্নানে যাইবার সময় কোথা হইতে তাঁহারই সমবয়সী আটটি মেয়ে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, স্নান করিত, তাঁহাকে আবার পৌঁছাইয়া দিত (মহামায়ার অষ্টসখী?)। পরবর্তীকালে তাঁহার নিজ সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় সে-সবের সমর্থন ও সাক্ষাৎ জগন্মাতা-জ্ঞানে তাঁহাকে পূজা, এসবও তো হইয়াছিল। কিন্তু

কখনও, কোথাও, তাঁহার জীবনের কোন আচরণে এই বিপুল মহিমা বিন্দুমাত্র 'অহং'-এর ছায়াপাত করিতে পারিয়াছিল কি? যদি পারিত, তবে কাহারও পক্ষে, কোন মুহূর্তেও তাঁহাকে 'ঘোর বদ্ধ' ভাবা সম্ভবই হইত না। আর সম্ভব হইত না স্বামী বিবেকানন্দ,-ব্রহ্মানন্দপ্রমুখ কয়েকজন বাছা বাছা সন্তান ছাড়া আর কাহারও পক্ষে 'মা' বলিয়া তাঁহার কাছে অগ্রসর হওয়া।

এরূপ হইয়াও তিনি যে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞানীর মতো দেখাইলেন, আধ্যাত্মিকতা-সমুজ্জ্বল জীবন লইয়াও নিজেকে সাধারণ পল্লীমাতার মতো, বা সাধিকার মতো দেখাইয়া জাগতিক কর্মে, সংসারে লিপ্ত হইয়া রহিলেন, ইহা শুধু আমাদের কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য; যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন, নবযুগের যে আদর্শের কথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই বার বার কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন: আধ্যাত্মিকতার সহিত কর্মোদ্যমের মিলন।

ইহাই যুগধর্ম। আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়া কেবল জাগতিক কর্মে উন্মত্তের মতো লিপ্ত থাকা নয়, আবার আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কর্ম ত্যাগ করাও নয়। শ্রীভগবানই সব হইয়া রহিয়াছেন, সব কর্মই তাঁহারই সেবা—এই ভাবই জাগতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সংযোগসেতু—যে সেতুবন্ধন অতি সাধারণ মানুষের পক্ষেও যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারীর পক্ষেও। তাহাই জীবনে দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আর তাঁহার সহায়করূপে আসিয়াছিলেন মহাশক্তি স্বয়ং, আমাদের শ্রীশ্রীমা-রূপে। এবারেই শুধু নয়, ভগবান যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই তাঁহার শক্তিও সঙ্গে আসেন তাঁহার কাজে সহায়তা করিতে: 'এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ। অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎ-সহায়িনী॥'—(বিষ্ণুপুরাণ, ১৷৯৷১৪০)। জগৎপতি দেব জনার্দন যখনই অবতীর্ণ হন, তখনই তাহার শক্তিও তাহার সহায়িনীরূপে সঙ্গে আসেন। শ্রীশ্রীমা যে পূর্ব পূর্ব অবতারের সঙ্গে সীতাদেবী, শ্রীরাধা প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও নিজেই সোজাসুজি বা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন।

আমাদের মাতৃজাতি আধুনিক যুগসন্ধিকালে বহির্জীবনে যিনি যাহাই করুন, তাঁহাদের অন্তর্জীবন যেন সদা নিবদ্ধদৃষ্টি থাকে শ্রীশ্রীমায়ের অমল-ধবল চিরপ্রশান্তিস্নিগ্ধ অধ্যাত্মজীবনের প্রতি। আমাদের জাতীয় চরিত্রগঠনে তাহা বিপুলভাবে সহায়ক হইবে। কুমারী কন্যারূপে, বিবাহিতা স্ত্রীরূপে, জননীরূপে—সর্বাবস্থাতেই পুরুষদের চরিত্রের উপর নারীর চরিত্রের প্রভাব প্রচণ্ড। স্বামীজীর কথা, "জননীগণ উন্নতা হইলে তাঁহাদের সন্তানবর্গের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে, আর তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।" সনাতন ভারতের যোগ্য সন্তান বলিয়া আমরা বুক ফুলাইয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারিব সেইদিনই।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

(৪)

পূর্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য সশক্তিক ব্রহ্মবাদী এবং জগৎসত্যতাবাদী। এই মতবাদ তাঁহার সৎকার্যবাদ ও সমানাধিকরণ্য ন্যায় মানিয়া লইলে অনস্বীকার্য। 'কার্য'সত্তা 'কারণ'সত্তায় চিরবর্তমান। উহা কখনও লীনাবস্থায় থাকে, কখনও ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জগৎ ও জীব ব্রহ্মেতেই অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং ব্রহ্মের 'ঈক্ষণ'শক্তির প্রভাবে উভয়ই ব্যক্ত অবস্থায় পরিণমিত হয়। আবহমানকাল হইতে এই সৃষ্টির ধারা চলিয়া আসিতেছে। আচার্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রীভাষ্যে স্বমত স্থাপন করিয়াছেন।

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥' (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

[(পরমেশ্বরের) পরাশক্তি বিচিত্র কার্য-কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্টিক্রিয়া করেন তাহাও স্বাভাবিক।]

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ (শ্বেঃ উঃ ৬।৭)

[লোকপালদিগের নিরঙ্কুশ মহেশ্বর, দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিদিগের অধিপতি, অক্ষর হইতেও উত্তম জগৎপতি, এবং স্তবনীয় সেই জ্যোতিকে আমরা জানি।]

'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ' ॥
(মুণ্ডক উপঃ ১।১।৭)

[মাকড়সা যেরূপ নিজ শরীর হইতে সুতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে।]

অন্য উপনিষদ্ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন —'অগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।' (বৃহঃ ৬।২।২-৩) পূর্বে এক অদ্বিতীয় সদ্রূপই বর্তমান ছিল [তিনি সঙ্কল্প করিলেন বহু হইব, সৃষ্টি করিব।]

এই-জাতীয় উপনিষদের বহু মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য স্বানুভবসিদ্ধ দার্শনিক মত উপস্থাপিত করিয়া প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যে আচার্য শঙ্কর প্রচারিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন :—

'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'
(মুণ্ডক উঃ ১।১।৫)

ইত্যত্রাপি প্রাকৃতান্ হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ব-বিভুত্ব-সূক্ষ্মত্ব-সর্বগতত্বাব্যয়ত্ব-ভূতযোনিত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদি-কল্যাণগুণযোগঃ পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতঃ। (শ্রীভাষ্য ১।৮০)

['অনন্তর পরাবিদ্যার উপদেশ করা হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।' এই শ্রুতিতে ও মুণ্ডক উপনিষদেও পরব্রহ্মের প্রকৃত হেয় গুণের নিষেধ করিয়া তাঁহার নিত্যত্ব, প্রভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অব্যয়ত্ব বা নির্বিকারত্ব, সর্বভূতকারণত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণসকলের সম্বন্ধই প্রতিপাদিত হইয়াছে।]

জীবাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে,

'জীব' ব্রহ্মাশ্রিত কিন্তু নিগুর্ণ স্বরূপ নহে। তাহার 'অস্মিতা' সর্বাবস্থায় থাকে এবং সুষুপ্তিতে এই 'আমিবোধ' লইয়াই জীব 'ব্রহ্ম-সত্তাকে' স্পর্শ করে।

শ্রীভাষ্যে আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন :

'তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্। অহংভাববিগমে তু জ্ঞপ্তেরপি ন প্রত্যক্ত্বসিদ্ধিরিত্যুক্তম্' (১।১৩)।

[স্বভাবতঃই জ্ঞাতারূপে প্রসিদ্ধ যে 'অহং পদার্থ' তাহাই আত্মা, (এই আত্মা) কেবল জ্ঞানমাত্র নহে (কিন্তু জ্ঞাতাও)। অহংভাব-বিরতি কেবল জ্ঞানমাত্রের যে আত্মত্ব সিদ্ধ হয় না, তাহা ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে]

তারপর আবার বলিতেছেন :

তমোগুণাভিভবাৎ পরাগর্থানুভবাভাবাচ্চ, অহমর্থস্য বিবিক্তস্ফুটপ্রতিভাসাভাবেঽপ্যাপ্রবোধাদ্ অহং ইত্যেকাকারেণাত্মনঃ স্ফুরণাৎ সুষুপ্তাবপি নাহং ভাববিগমঃ। ভবদভিমতায়া অনুভূতেরপি তথৈব প্রথেতি বক্তব্যম্। (১।১৩)

শ্রুতিবাক্য—'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি'। (বৃ. উঃ ৪।৩।৯)

[সুষুপ্তিকালে তমোরূপে অভিভূত থাকার জন্য এবং (ইন্দ্রিয়গম্যবাদ) পদার্থেরও প্রতীতি না থাকার জন্য তখন যদিও অনেক প্রকারের প্রতীতি থাকে না এবং স্পষ্ট প্রতীতিও থাকে না বটে; কিন্তু তথাপি তখন এই অহং-ভাবটি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। করণ অহং (আমি) এই ভাব প্রত্যগাত্মায় স্ফুরণের (আত্মাস্ফূর্তি) প্রতীতি বিদ্যমান থাকে। (হে অদ্বৈতবাদিগণ) আপনাকেও (আত্মরূপ স্বীকৃত) অনুভূতিরও সুষুপ্তিকালে ঐরূপ স্ফুরণ স্বীকার করিতে হইবে।]

[এই অবস্থায় এই প্রত্যগাত্মা স্বয়ংজ্যোতি হন।]

উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

নহি সুষুপ্তোত্থিতঃ কশ্চিদহংভাববিযুক্তার্থান্তরপ্রত্যনীকাকারা জ্ঞপ্তিরহমজ্ঞান-সাক্ষিতয়াবতিষ্ঠে, ইত্যেবংবিধাং স্বাপসমকালামনুভূতিং পরামৃশতি। এবং হি সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শঃ—"সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি। অনেন প্রত্যবমর্শেন তদানীমপ্যহমর্থস্যৈবাত্মনঃ সুখিত্বং জ্ঞাতৃত্বং চ জ্ঞায়তে॥ (১-১৩)

[কোন ব্যক্তিই সুষুপ্তিভঙ্গের পর মনে করে না যে-অহংভাবরহিত এবং বাহ্যপদার্থ-রহিত (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়াদির বিশেষ স্ফুরণরহিত) কেবল জ্ঞপ্তিমাত্র (জ্ঞানস্বরূপ) আমি সুষুপ্তি-কালে অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থান করিয়া-ছিলাম। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি স্মরণ করিয়া থাকে—'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম।' নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এই স্মৃতির ফলে বুঝা যায় যে, সুষুপ্তিকালেও অহংবাচ্য আত্মায় জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমান ছিল।]

তাঁহার মতে এই 'আমি-প্রত্যয়-সমন্বিত চৈতন্যময় জীব' ব্রহ্মাংশস্বরূপ। তাঁহার মতে 'মেঘের কোলে বিদ্যুৎপ্রভা'সদৃশ। জীবসত্তা ব্রহ্মসত্তার অংশ এবং তিনি অন্তর্যামিরূপে ইহার নিয়ন্তা। 'বৃক্ষেরই শাখা হয়, শাখার বৃক্ষ হয় না'। পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, 'গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউ-এর গঙ্গা নহে'।

গীতাতে আছে—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'। (১৫।৭)

[পরমাত্মারই সনাতন অংশ সংসারে কর্তা ভোক্তারূপে প্রসিদ্ধ জীব।]

'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত'। ১৩।৩

[হে অর্জুন, সকল ক্ষেত্রেই আমাকে (পরমেশ্বরকে) ক্ষেত্রজ্ঞ (প্রত্যগাত্মা) বলিয়া

জানিবে।]

শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা 'ব্রহ্মকলা'— যেমন অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ। জীবের চিদ্রূপতা স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন নাই।

জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম—এই তত্ত্ব বিশিষ্টাদ্বৈতের মূল কথা। এই পরিণামের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া শ্রুতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, জগৎপরিণাম ব্রহ্মের 'ঈক্ষণশক্তি'-প্রসূত। 'কেন' তিনি ইচ্ছা করিলেন? এই প্রশ্নোত্তর আমাদের সীমায়িত বুদ্ধি দিয়া বোঝা যাইবে না। সীমিত বুদ্ধি অসীম সম্বন্ধে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ দিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারে না—ইহা 'যুক্তির' ক্ষমতার বাহিরে। পাশ্চাত্যের মহামতি দার্শনিক কান্ট (Kant) এই বুদ্ধির সীমা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—Thing-in-itself (বস্তুর যথার্থ স্বরূপ) সম্বন্ধে বুদ্ধি কিছু বলিতে পারে না।

অন্য দার্শনিক বার্গসন ও (Bergson) বলিয়াছেন, 'Intellect is a constitutional materalist. It cannot grasp the flow of life, i.e. "Elan vital", in its true nature.'

[বুদ্ধি আভ্যন্তরীণ জড়প্রকৃতিসম্পন্নই সুতরাং বুদ্ধি আবেগময় প্রাণশক্তিপ্রবাহের প্রকৃত স্বাভাবিক অবস্থা-বিষয়ে তাৎপর্যগ্রহণে অসমর্থ।]

বুদ্ধির ক্ষেত্র সীমায়িত বলিয়া শ্রীরামানুজ শ্রুতিকেই বা বোধকেই চরমসত্য নির্ধারণে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই 'শ্রুতিপ্রমাণ'-বলে শ্রীরামানুজাচার্য জগতের ও জীবনের মিথ্যাত্ব অপ্রতিপাদন করিয়াছেন।

(ক) 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্'। (শ্বেতঃ উঃ ৪।১০)

[প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ জানিবে]

এই মন্ত্রবাক্য বুঝাইতেছে যে মায়াশক্তি ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং তিনি মায়াশক্তিযুক্ত।

(খ) রজতে শুক্তিভ্রম দ্বারা বহুত্ব যে কল্পিত, বুঝান হয়। এখানে শুক্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং জ্ঞানহিসাবে সত্য। শুক্তিজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইলেও রজতজ্ঞান থাকাকালীন উহাকে অস্বীকার করা যায় না। তেমনি 'বহুত্ব'-জ্ঞান ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান এবং উহা 'শশবিষাণবৎ' অলীক নহে। বহুত্বের অর্থ, 'ক্রিয়াকারিত্ব' আছে। তবে বলা যায় এই জ্ঞান আংশিক। এই জন্যই 'মায়াবাদ'বাচ্য। 'বহুত্বকে' 'একের' সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া জানাই 'পূর্ণজ্ঞান'। ইহা হইলে সেই আংশিক জ্ঞান বাধিত হয় মাত্র। বহুত্ব অলীক স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয় না। তখন এই অনুভূতি হয়—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ব্রহ্মকে বাদ দিয়া জগতের তথা বহুত্বের স্বাধীন সত্তা স্বীকার করাকেই 'ভ্রমজ্ঞান' বলা হয়। 'ভ্রমজ্ঞান' অর্থ স্বপ্নবৎ অলীক নহে।

(ক্রমশঃ)

পৃথিবীর হে ঠাকুর!

কাব্যশ্রী পূর্ণেন্দু গুহরায়

পৃথিবীর প্রয়োজনে জেগে
প্রত্যাশার সতৃষ্ণ প্রহরে,
মরণে জীবন এলে দিতে
নবোষার দীপবর্ত্তি করে।
সূক্ষ্ম এক ক্রান্তি-বিন্দু 'পর
প্রকম্পিতা পৃথ্বী থর-থর,
চৌদিকে দ্বান্দ্বিক জড়বাদ,
লালসার লাভার প্লাবন,
লোভের ললিত ইন্দ্রজাল,
হিংসার জান্তব নাচন।
মুহূর্তের অবহেলা, ভ্রম,
স্থৈর্যের বিন্দু ব্যতিক্রম,
দৃষ্টির ক্ষণ অসংযম,
চাঞ্চল্যের নিমেষ আরোপ,
অমনি সে অস্তিত্বের
অবধার্য চির অবলোপ।
দুর্যোগেরে স্তব্ধতায় ভরি',
স্তব্ধতারে তরঙ্গিত করি',
অনাগত আয়ুষ্মান্ দিন
সম্ভাবনা করি' স্বতোচ্ছল,
হে ঠাকুর, জ্যোতির্ময় রূপে
পৃথ্বী-পটে হইলে প্রোজ্জ্বল।
পৃথিবীর যত কিছু ব্যথা,
হৃদয়ের আর্তি বিরূপতা
স্পর্শে হ'ল চন্দনিত ধূপ,
আশ্বাস-এষণা হয়ে অভীপ্সিত
নবলগ্নে নিল নব রূপ।

লৌকিকে শরীরী তুমি,
অলৌকিকে জীবন-মৌসুমী,
পৃথ্বীর জীবন-পাত্রে
প্রেমের ক্ষমারে ঢালি',
দিলে স্বাস্থ্য, দিলে শান্তি বল
অশুচিতা হেলায় প্রক্ষালি'।
হর্ষে, হাস্যে তুলিলে কুসুমি'
পাদোদকে দিয়া পুণ্য স্নান;
পৃথিবীর প্রাণ তাই তুমি,
তাই ঋণী পৃথিবীর প্রাণ।
শংকাহরণ মৃত্যু-তরণ
পৃথিবীর হে ঠাকুর!
সত্যের সৌন্দর্যে তুমি কর ভরপুর
পৃথ্বীর হৃদয়,
'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' এ মহাপ্রার্থনা
পূর্ণ হোক চরাচরময়।

ওঙ্কার

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী ধ্যানানন্দ

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে[১৬] আছে :

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ২।৮

বিদ্বান্ ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত ক'রে, শরীরকে ঋজু রেখে, ইন্দ্রিয়সমূহকে মনোবলে হৃদয়ে সংযত ক'রে, ওঙ্কাররূপী ভেলার সাহায্যে সংসারের ভয়াবহ সমস্ত স্রোত অতিক্রম করেন।

ওঙ্কারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্তি প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ বহু উপনিষদেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আর বেশী উদ্ধৃতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

অতএব উপনিষৎ থেকে আমরা এখন গীতাদি শাস্ত্রে প্রবেশ করছি।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেখানে নিজেকে সর্ববস্তুর সার ব'লে বর্ণনা করছেন, সেখানে আছে—"প্রণবঃ সর্ববেদেষু" (৭।৮) অর্থাৎ সর্ববেদের সার হচ্ছে ওঙ্কার এবং আমিই সেই ওঙ্কাররূপী। দশম অধ্যায়ে, বিভূতিযোগে ঐ একই কথা বলেছেন—"গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্" (১০।২৫)—শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঙ্কার অর্থাৎ ওঙ্কার আমারই বিভূতিরূপে চিন্তনীয়। নবম অধ্যায়েও বলেছেন—'আমি ওঙ্কার' (৯।১৭)। অষ্টম অধ্যায়ে তিনটি শ্লোকে (৮।১১-১৩) শ্রীভগবান যোগীদের ওঙ্কার-উপাসনা ও ওঙ্কার-সহায়ে স্বচ্ছন্দ-তনুত্যাগের প্রসঙ্গে ওঙ্কারমাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। 'যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি' (৮।১১) ইত্যাদি শ্লোকটি পূর্বে আলোচিত কঠোপনিষদের 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' (১।২।১৫) ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত তুলনীয়। সপ্তদশ অধ্যায়ে ত্র্যবয়ব বৈদিক মন্ত্র 'ওঁ তৎ সৎ'-এর উল্লেখ করেছেন (১৭।২৩) এবং বলেছেন যে, শাস্ত্রীয় যজ্ঞ, দান, তপঃ আদি সমস্ত ক্রিয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করেই বেদজ্ঞগণ শুরু করে থাকেন।

পাতঞ্জল যোগদর্শনে ওঙ্কারকে ঈশ্বরের বাচক বলা হয়েছে : 'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' (১।২৭) এবং সমাধিলাভের জন্য ওঙ্কারের জপ ও অর্থভাবনা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে : 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্' (১।২৮)। অর্থ-ভাবনাসহ ওঙ্কারজপের ফল হচ্ছে যোগবিঘ্ন-সমূহের নাশ ও অন্তর্দৃষ্টিলাভ : 'ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ' (১।২৯)।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন : 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' (১।২৩)—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও সমাধিলাভ হয়। ঈশ্বরের নাম, ওঙ্কার-জপের দ্বারাই ভক্তি হয়, অন্তরায়সমূহ দূর হয় এবং সমাধিলাভ হয়ে থাকে।

ওঙ্কারের মাত্রাত্রয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আমরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ঈশ্বরের উল্লেখ করেছি। পতঞ্জলি ঐ ভাবে অকার, উকার ও মকারের বিশ্লেষণ করেননি। তিনি ঈশ্বরকে অন্য পন্থায় উপস্থাপিত করেছেন—ব্যাসের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র[১৭] দিয়ে নয়, অথবা 'রসো বৈ সঃ'[১৮]—

১৬ স্বামী গম্ভীরানন্দ : উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১।২৭৫

১৭ ব্রহ্মসূত্র ১।১।২

১৮ তৈত্তিরীয় উপ. ২।৭

রসস্বরূপের দিক থেকে নয়। তাঁর ঈশ্বর হচ্ছেন আদিগুরু, কালাতীত,[১৯] নিরতিশয় সর্বজ্ঞ[২০] (সিদ্ধ যোগীরাও সর্বজ্ঞ হ'ন, কিন্তু তাঁদের সর্বজ্ঞত্ব ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের সমান নয়) এবং জীব যেমন পঞ্চবিধ ক্লেশ, সুখদুঃখাদি কর্মফল ও কর্মসংস্কারের দ্বারা যুক্ত, ঈশ্বরে সে সকলের নামগন্ধও নেই।[২১] ওঙ্কারের অর্থভাবনা মানে ওঙ্কারবাচ্য, এইরূপ গুণাবলী-যুক্ত ঈশ্বরকেই চিন্তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—'হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নেই।'[২২] এখানে যে সমাধির কথা বলা হয়েছে, সেটি বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধি। ওঙ্কারের সাহায্যে এই নির্বিকল্প সমাধি কি ভাবে হতে পারে তা পঞ্চদশীকার জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—গুরু ও শাস্ত্র থেকে তত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁর পরোক্ষ জ্ঞান হয়েছে এবং যাঁর মনও কামক্রোধাদিদোষশূন্য হয়েছে, তাঁর বাকী থাকে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করা, বৃত্তিশূন্য করা। এটি করতে হলে তাঁকে একান্তবাস করতে হবে এবং 'দীর্ঘপ্রণব' উচ্চারণ করতে হবে। দীর্ঘপ্রণবের অর্থে প্রসিদ্ধ টীকাকার রামকৃষ্ণ লিখেছেন যে, ৬ থেকে ১২ মাত্রা বা তারও বেশী সময় একবার ওঁ উচ্চারণ করতে লাগবে। একটি মাত্রাকে মোটামুটি ৬ সেকেণ্ড ধরা যেতে পারে। সুতরাং ৩৬ থেকে ৭২ সেকেণ্ড অথবা সম্ভব হলে তারও বেশী সময় নিয়ে এক একটি প্রণব উচ্চারণ করতে হবে। এইভাবে 'বিলম্বিত লয়ে' ওঙ্কার অভ্যাস করলে পূর্বোক্ত অধিকারী সাধক নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতে পারবেন। বলা বাহুল্য, শুধু বই থেকে পড়ে এই সাধন সম্ভব নয়। ওঙ্কার-উচ্চারণের ফল যে কত ব্যাপক, কত সুদূর-প্রসারী হতে পারে, শুধু সেটি বলবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। পঞ্চদশীর শ্লোকটি এই :

বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥

৪।৬৩[২৩]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আমরা ওঙ্কার সম্বন্ধে বেশ কিছু নূতন আলোক পাই :

১) "সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করছেন। সেই ওঁ হতে 'ওঁ শিব', 'ওঁ কালী', 'ওঁ কৃষ্ণ' হয়েছেন। নিমন্ত্রণে কর্তা একটি ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তার কত আদর! কেন না সে অমুকের দৌহিত্র কি পৌত্র।"[২৪]

এখানে ওঙ্কার-প্রতীক নির্গুণ-ব্রহ্ম যে ওঙ্কার-প্রতীক সগুণ-ব্রহ্মের 'প্রতিষ্ঠা' তাই বলা হয়েছে। এই কথাগুলির বিষয়বস্তু আমরা অবশ্য পূর্বেই আলোচনা করেছি—গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকের শঙ্করের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ভাষা ও উপমার গুণে এই দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বও কতই না হৃদয়গ্রাহী ও সুখ-বোধ্য হয়ে উঠেছে! মাণ্ডূক্য উপনিষদে উক্ত, ওঙ্কার-প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত, পঞ্চদশীকারের

১৯ পাতঞ্জল যোগদর্শন ১।২৬
২০ ঐ ১।২৫
২১ ঐ ১।২৪
২২ কথামৃত ১।২।৪

২৩ বিভিন্ন সংস্করণে শ্লোকসংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। আমরা দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়েছি।
২৪ কথামৃত, ৫।১৩।১

'প্রণবোপাস্তয়: প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগা:' শ্লোকটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২) "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং—ট—অ—ম্। যোগী নাদ ভেদ ক'রে পরব্রহ্মে লয় হন। সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্মত্যাগ হয়।"[২৫]

৩) "এই মায়া জীব জগৎ পার হয়ে গেলে তবে নিত্যেতে পৌঁছান যায়। নাদভেদ হলে তবে সমাধি হয়। ওঙ্কার সাধন করতে করতে নাদভেদ হয় আর সমাধি হয়।"[২৬]

৪) "অনাহত শব্দ সর্বদাই এমনি হচ্ছে। প্রণবের ধ্বনি পরব্রহ্ম থেকে আসছে, যোগীরা শুনতে পায়। বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে উঠে ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে।"[২৭]

৫) "ওঙ্কারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বলো অকার উকার মকার। ···আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট—অ—অ—ম—ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধ'রে ধ'রে লীলা, আবার লীলা ধ'রে ধ'রে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নেই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।"[২৮]

আগে মানুষ ওঙ্কারধ্বনি শুনেছে—নাদ ভেদ ক'রে সমাধিস্থ হয়েছে, পরে ওঙ্কারের ৩ মাত্রা, ৩½ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৮ মাত্রা, ১২ মাত্রা, ১৬ মাত্রা ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আগে ভূধর, সাগর, দেশ-দেশান্তর সৃষ্টি হয়েছে, পরে মানচিত্র তৈরী করা হয়েছে। আগে ঘটনা ঘটেছে, পরে ইতিহাস রচিত হয়েছে। আগে মানুষ গান গেয়েছে, পরে স্বরলিপি হয়েছে। আগে মানুষ কথা কয়েছে, পরে ব্যাকরণ হয়েছে। সেই আড়াই হাজার বছর আগে পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখলেন, আজও তা' সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে। খুবই আশ্চর্য লাগে! কিন্তু ভাষা তার চেয়েও অদ্ভুত নয় কি? পাণিনিকে বোঝাবার জন্য ও প্রয়োজন-মত শোধরাবার জন্য কাত্যায়ন-প্রমুখ বার্ত্তিক-কারেরা বার্ত্তিক লিখলেন। কিন্তু তা'তেও কুলোচ্ছে না দেখে, তাতেও ভাষার সবটা ব্যাকরণের আইনে পড়েছে না দেখে পতঞ্জলি মহাভাষ্য লিখলেন—চেষ্টা করলেন যাতে গতিশীল ভাষার সমস্ত প্রয়োগ যথাসম্ভব ব্যাকরণের আওতায় আনা যায়। তা'হলে

২৫ কথামৃত, ১।১১।২
২৬ ঐ ৩।৪।২
২৭ ঐ ২।১৩।১

২৮ কথামৃত, ১।১৩।৬

কোন্‌টা বড়—ভাষা না ব্যাকরণ ?

আমরা দেখছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অকার, উকার, মকারাদি ব্যাখ্যাকে তত আমল দিচ্ছেন না, আক্ষেপ ক'রে বলছেন—'তোমরা কেবল বলো অকার উকার মকার।…আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এইসব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নেই' ইত্যাদি।

ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু শুধু ব্যাকরণ পড়ে কেউ ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে না। ভাষা শিখলে ব্যাকরণ একধারে পড়ে থাকে। স্বরলিপির উপযোগিতা আছে, কিন্তু শুধু তা দিয়ে সঙ্গীত শেখা যায় না—ওস্তাদের কাছে যেতে হয়। সঙ্গীত শিখলে স্বরলিপি একধারে পড়ে থাকে। মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু দেশ-দেশান্তর ঘুরে এলে, মানচিত্রটা একধারে পড়েই থাকে। বেদ-বেদান্তে লেখা ব্যাখ্যা পড়ে ওঙ্কারতত্ত্ব বোঝা যায় না—সমাধিমান পুরুষের কাছে যেতে হয়, যোগ্য অধিকারী হ'য়ে। সমাধি হলে, সব ব্যাখ্যা একধারে পড়ে থাকে—যাবান্ অর্থঃ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে, তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।[২৯] সর্বত্র জলে জলময় হ'লে ডোবার জলের আর দরকার হয় না; ব্রহ্মকে জেনে তিনি ব্রাহ্মণ হয়েছেন, সমস্ত বেদবেদান্তে তাঁর কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: 'তাঁকে যখন লাভ হয়, বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র—কত নীচে পড়ে থাকে! ওঁ উচ্চারণ করবার জো নাই।—এটি কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ উচ্চারণ করতে পারি না।'[৩০] নিজের অনুভূতি সম্বন্ধে বলেছেন—'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।'[৩১] তাই তাঁরই বাণীর আলোকে বেদবেদান্ত বুঝতে হয়।

সমাধির পর 'হিসাব পচে যায়।'[৩২]। 'গুণতে গেলে ১-৭-৮ এই রকম গণনা হয়'।[৩৩] ওঙ্কারের অমন যে সুন্দর বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা স্বামীজী দিলেন, তারও গুরুত্ব তিনি নিজেই কমিয়ে দিয়েছেন—'আনুমানিক গবেষণা'[৩৪] ব'লে। এর কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নয়, ওঙ্কারের যথার্থ স্বরূপ সমাধির অনুলোম ও বিলোম মার্গে, স্বামীজী দিবালোকবৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য সাধককে সমাধিসহায়ে অনুভূতি করতে প্ররোচিত করা মাত্র। তাই ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থিত রূপ নেই। কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই যে, একটি ব্যাখ্যাই ব্যাখ্যা, অন্য-গুলি কিছু নয়, বা আর নূতন ব্যাখ্যা হতে পারে না। যার যেটা মনে ধরে, তার জন্য সেই ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যার চরম সার্থকতা অপরোক্ষ অনুভূতিতে।

"গাই গীত শুনাতে তোমায়"—কবিতাটিতে স্বামীজী লিখেছেন:

আমি হই বিকাশ আবার।
মম শক্তি প্রথম বিকার,
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার
বাজে মহাশূন্যপথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী,
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু।[৩৫]

২৯ গীতা, ২।৪৬

৩০ কথামৃত, ৪।২০।৬

৩১ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ২ ও মূলগ্রন্থ পৃঃ ৫১

৩২, ৩৩ কথামৃত, ১।১৬।৩

৩৪ বাণী ও রচনা, ১।৩১৮

৩৫ বাণী ও রচনা, ৬.২৬৬

এই কবিতাটি শুধুই কাব্যরসের নির্ঝর নয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় লব্ধ, স্বীয় সমাধির কথা উদ্ধৃতাংশের একটু আগেই স্বামীজী পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন

সর্ববৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়
কোটি সূর্য অতীত প্রকাশ
চিৎসূর্য হয় হে বিকাশ,
গলে যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল,
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।[৩৬]

সুতরাং সমাধি থেকে অবতরণপথে ঐ আদিবাণী ওঙ্কারের কথা তিনি যে স্বানুভূত প্রজ্ঞাসহায়েই বলেছেন, তা' সহজেই বোঝা যায়।

নিজের এই অনুভূতি থেকেই স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে একদিন বলেছিলেন :

সমাধিমুখে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর ওঙ্কারধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়। তারপর তা'ও শুনা যায় না। তা'ও আছে কি নেই—এরূপ বোধ হয়। ঐটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্‌ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। ...অবতারকল্প মহাপুরুষেরা সমাধিভঙ্গের পর আবার যখন 'আমি আমার' রাজত্বে নেমে আসেন, তখন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অনুভব করেন; ক্রমে নাদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঙ্কার অনুভব করেন, ওঙ্কার থেকে পরে শব্দময় জগতের প্রতীতি করেন, তারপর সর্বশেষে স্থূল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্য সাধকেরা কিন্তু অনেক কষ্টে কোনরূপে নাদের পারে গিয়ে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে, পুনরায় স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিম্নভূমিতে—সেখানে আর নামতে পারে না। ব্রহ্মেই মিলিয়ে যায়—'ক্ষীরে নীরবৎ'।"[৩৭]

সমাধি কোন ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের স্বাধিকারভুক্ত সম্পত্তি নয়। পৃথিবীর যে-কোন দেশের, যে-কোন জাতির, যে-কোন ধর্মের মানুষ সমাধিলাভ করতে পারেন এবং সমাধিমার্গে ওঙ্কারধ্বনি নিশ্চয়ই তাঁর শ্রুতিগোচর হবে। সুতরাং 'ওঁ' এই শব্দটি সকল ধর্মেই ঈশ্বরের সার্বজনীন বাচকরূপে গৃহীত হতে পারে। এইখানেই ওঙ্কারের বিশেষ উপযোগিতা। দ্বেষ, দর্প, হিংসা ও কলহে উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম আনতে হ'লে বিভিন্ন ধর্মসমূহের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান ও কথা-কাহিনীর অন্তরালে যে শাশ্বত অধ্যাত্মবিজ্ঞান রয়েছে সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে ভারতবর্ষকেই এই ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে, কারণ এদেশ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি। এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রচারে ও অনুশীলনে ওঙ্কারতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে, সন্দেহ নেই। স্বামীজী বলেছেন :

"ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্মভাব আছে, সব এই ওঙ্কারকেই কেন্দ্র করিয়া, বেদের বিভিন্ন ধর্মভাবসমূহ এই ওঙ্কারকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ? ইহার সহজ উত্তর এই—সর্বদেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন ধর্মভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার প্রত্যেক সোপানেই

৩৬ ৬।২৭৫

৩৭ বাণী ও রচনা, ৯।৪২-৪৩

পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী, এমন কি নাস্তিকগণ পর্যন্ত তাঁহাদের উচ্চতম আদর্শ-প্রকাশের জন্য এই 'ওঙ্কার' অবলম্বন করিয়াছিলেন। যখন এই ওঙ্কার মানবজাতির অধিকাংশের ধর্মভাব-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সকল দেশের সকল জাতিই উহা অবলম্বন করিতে পারেন। ইংরেজী 'গড্' (God) শব্দ ধর, উহাতে যে ভাব প্রকাশ করে, তাহা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। যদি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন সগুণ (Personal), নির্গুণ (Impersonal), পূর্ণ বা পরম (Absolute) ইত্যাদি। অন্য সব ভাষায় ঈশ্বর-বাচক যে-সকল শব্দ আছে, সে সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; ঐগুলির অতি অল্প ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি আছে। কিন্তু 'ওঁ'-শব্দে উক্ত সর্বপ্রকার ভাবই রহিয়াছে। অতএব উহা প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত।"[৩৮]

[৩৮] বাণী ও রচনা, ১।৩১৮-১৯

প্রার্থনা নীরবে জাগে

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

প্রার্থনা নীরবে জাগে
অন্তরের নীড় হ'তে আকাশের মুক্ত বিস্তৃতিতে—
জীবনের কাছ থেকে গভীর কথাটি ছড়াইতে,
অনন্তের বাতায়নে কে যেন রয়েছে মনে ক'রে :
কে আছে ? সে কোন্ সত্য ? মানুষ সে জেনেছে অন্তরে !

কারণ মানুষ পৃথিবীতে
অনেকের মাঝে থেকে একান্ত একাকী :
মন তার বহুদূরে টলে যায় কেন থাকি থাকি
নিজেই বোঝে না কিছু তার ;
নীলের স্ফটিক ভেঙে ধ্বনি ওঠে তাই বারবার।

ধূপের নম্রতা জাগে আত্ম-নিবেদনে :
যেই শান্তি ধ্যানের গহনে ;—
সেখানে সে খুঁজে পেতে চায়
অতল রহস্যময় কোন্ গূঢ় জীবনের মানে।

জননী কুন্তী

[ ]

শ্রীমতী সিংহ

সঞ্জয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে কুন্তীদেবীর কি সুন্দর শিক্ষাদানের ভঙ্গী! 'এরূপ কর' কিংবা 'এরূপ করা অনুচিত'—কেবলমাত্র এটুকু বলেই শেষ করার পরিবর্তে সরস গল্পের মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে এত প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে, তা হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো ব্যক্তিরই বিলম্ব হয় না, আজ আমরা শিক্ষাদানের নানাবিধ উপায়ের কথা চিন্তা করছি, দেশে-বিদেশে সর্বত্র কত নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কত শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ফল কি আমরা লাভ করতে পারছি? আদর্শচরিত্র, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত সুনাগরিকের আজ একান্ত অভাব। হায়! আলেয়ার পিছনে না ঘুরে, নানাদেশের অন্ধ অনুকরণ করবার চেষ্টায় বৃথা কালক্ষেপ না করে যদি আমরা একবার ভারতের সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম, প্রাচীন ভারতের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কণামাত্রও অনুসরণ করতাম, তাহলে হয়তো সত্যই সে শিক্ষা সুফলপ্রসূ হতো—ভারত তার সন্তান-সন্ততির জন্য গর্ববোধ করতো, আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারতো।

প্রখরবাস্তবজ্ঞানসম্পন্না, দূরদর্শিনী, বুদ্ধিমতী কুন্তীদেবী অসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে থেকে সুচারুরূপে সংসার-জীবনের সকল কর্তব্য সম্পন্ন করলেও সংসার তাঁকে বদ্ধ করতে পারেনি। গৃহীর ছদ্মবেশে পরম যোগী ছিলেন তিনি। লোভ-ক্রোধ-মোহাদি ষড়-রিপুর প্রাবল্য তাঁর জীবনে কখনও দেখা যায়-নি,—তাঁর মতো ভক্তিপরায়ণা ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পিতজীবন রমণী জগতে দুর্লভ।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছেন। সমগ্র কুরু-রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর তিনি। দুর্জন-বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনরূপ আরব্ধ কর্মসমাপনান্তে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলেন। সম্পর্কে তিনি কুন্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র—রীতি অনুযায়ী যাত্রার পূর্বে তাই প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে এলেন পিতৃষ্বসার কাছে। কুন্তীদেবী কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ ভেবে ভুল করলেন না, স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে সম্বোধন করলেন না তাঁকে।

প্রয়াণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ পরমপুরুষ, স্বয়ং ভগবান, এ পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর বন্দনা করলেন, বললেন—

"নমস্যে পুরুষন্ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্॥

১।৮।১৮

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা॥

১।৮।১৯

* * *

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ॥

১।৮।২৭

অর্থাৎ 'হে ভগবান, প্রকৃতির অতীত, সর্বনিয়ন্তা, সকল প্রাণীর অন্তর ও বাহিরে স্থিত

তথাপি সকলের অলক্ষ্য ও দুজ্ঞের্য় তোমাকে আমি প্রণাম করি। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারূপ যবনিকার দ্বারা তুমি আবৃত হও না, তুমি ইন্দ্রিয়জ্ঞানবেদ্যও নহ। অভিনেতা নটকে যেমন অনভিজ্ঞ দর্শকবৃন্দ জানিতে পারে না, তেমনি মায়াবদ্ধ অজ্ঞান জীবও তোমাকে জানিতে পারে না।······ভক্তগণই যাঁহার সম্পদ, সত্ত্বরজাদি গুণ হইতে যিনি মুক্ত, পূর্ণানন্দস্বরূপ, শান্তমূর্তি, মুক্তিপ্রদাতা তোমাকে নমস্কার করি।' (শ্রীমদ্ভাগবত-১ম স্কন্ধ)

নররূপধারী নররূপে লীলাকারী নারায়ণের মায়ায় অভিভূত না হয়ে, নরদেহধারণকালেই তাঁর স্বরূপ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা কি সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব? বেশী দিনের কথা নয়—মাত্র একশতাব্দী পূর্বে যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু তিনি নরদেহে থাকাকালে ঐশীশক্তির অধিকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া আর কে তাঁকে চিনেছিলো? তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ তো দূরের কথা বরং তাঁকে বিদ্রূপ করতে অবজ্ঞা করতেও বাধেনি লোকের, 'পাগলা বামুন', 'কালীবাড়ীর পূজারী'—এমন কি 'ভণ্ড' নামেও অভিহিত করেছেন অনেকে। তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাদ যাননি।

কুন্তীর সমগ্র স্তবটি এই স্বল্প পরিসরে উদ্ধৃত বা আলোচনা করা সম্ভব নয়—কিন্তু উদ্ধৃত সামান্য অংশটুকুও অনুধাবন করলে স্তবের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, প্রতিটি শব্দে পাই জননী বা রাজরাণী কুন্তীর নয়, গার্গী-উপালা-মৈত্রেয়ী-উভয়ভারতীর ন্যায় মহাজ্ঞানী তত্ত্বদর্শিনী দেবী কুন্তীর অপূর্ব পরিচয়।

অনবদ্য তাঁর এই স্তবটি! যিনি সারাজীবন অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে, বহু বাধাবিঘ্ন-বিপদকে পরাভূত করে জীবন-সায়াহ্নে চরম পার্থিব সুখের অধিকারিণী হয়েছেন, সেই কুন্তীদেবীই অকম্পিত কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥ ১।৮।২৫

—'হে জগৎগুরু, যে বিপদ উপস্থিত হইলে পুনর্জন্মনিবারক তোমার দর্শনলাভ হইয়া থাকে, সেই সকল বিপদ আমার জন্মে জন্মে নিত্যই হউক' (শ্রীমদ্ভাগবত, ১ম স্কন্ধ)। দুঃখ-বিপদের স্বাদ তাঁর অজানা তো নয়ই, বরং বলা চলে সারাটি জীবন দুঃখের অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়েছেন তিনি, তবু এতটুকু দ্বিধা নেই তাঁর মনে—ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে, 'অকিঞ্চনগোচরের' জন্য নিঃস্ব হতে তিনি সদাপ্রস্তুত।

ভগবানের দর্শন লাভ করতে কে না চায়? ভগবানলাভ বা মুক্তি আমাদের পরম কাম্য বটে, কিন্তু তাঁর মতো এমন করে অকুতোভয়ে দুঃখবিপদকে আহ্বান করার সাহস কি আমাদের আছে? বরং 'বিপদে মোরে রক্ষা কর'—এই প্রার্থনাই করি আমরা। বর্তমান যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দও আমাদের এই কথাটিই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন—'সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, / কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

যোগী মুনি-ঋষি-তাপসদের একান্ত কাম্য—অনন্যচিত্তে ভগবদ্-ভজনা করা, বাসনাশূন্য হওয়া; কেননা বাসনাই বন্ধন, বাসনাই মনকে ভগবদ্‌বিমুখী করে, সংসারাসক্ত করে। দেবী কুন্তীর স্তবেও তাই দেখি আকুল প্রার্থনা—

"অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥ ১।৮।৪১
ত্বয়ি মেঽনন্যাবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।

রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ ১।৮।৪২

—অর্থাৎ হে সর্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বমূর্তে, আত্মীয় যাদব ও পাণ্ডবগণের প্রতি আমার স্নেহবন্ধন ছিন্ন কর। হে মধুপতি! ভাগীরথী যেমন স্বীয় প্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন গতিতে সমুদ্রে প্রেরণ করেন, আমার মতিও সেইরূপ অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুক্ষণ তোমাতে অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ-প্রবাহ বর্ধন করুক। (শ্রীমদ্ভাগবত-১ম স্কন্ধ)

এমন ভক্তিমতী, পরমজ্ঞানী, আন্তরসম্পদে সম্পদশালিনী ছিলেন বলেই রাজমাতা কুন্তী আজীবন দুঃখভোগের পর পার্থিব সুখের চরম অবস্থায় উপনীত হয়েও সর্বসম্পদ, সকল ভোগ-বিলাস, এমন কি মাতৃভক্ত মহাবীর পরম স্নেহাস্পদ পঞ্চপুত্রের শত অনুরোধ তুচ্ছ করে—সর্বমমত্ববন্ধন ছিন্ন করে—স্বেচ্ছায় প্রসন্নচিত্তে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পেরেছিলেন,—(জীবনসায়াহ্নে যোগি-জনকাম্য সমাধিযোগে দেহত্যাগের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর) মহামায়ার মায়া তাঁকে মোহিত করতে পারেনি।

অনন্যসাধারণ চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন বলেই মহাকাব্য মহাভারতের বিষয়সূচী-প্রসঙ্গে দেবী কুন্তীর কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয়েছে। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে শুনি—

"বিস্তারং কুরুবংশস্য গান্ধার্য্যা ধর্মশীলতাম্।
ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যা সম্যগ্‌দ্বৈপায়নোব্রবীৎ ॥
বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাং চ সত্যতাম্।
দুর্বৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রাণামুক্তবান্ ভগবান্ ঋষিঃ ॥"

—মহাভারতের কথা রচনা করেছেন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। এতে বর্ণিত হয়েছে কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্যের কথা। সেই মহান ঋষি আরও বর্ণনা করেছেন বাসুদেবের মহিমা, পাণ্ডবদের সততা, ধার্তরাষ্ট্রগণের দুষ্কার্যকথা।

অবশ্য 'ধৈর্য' কুন্তী-চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে এক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লিখিত হলেও এইটিই তাঁর একমাত্র গুণ বলে মনে করলে যে গুরুতর ভুল করা হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সবদিকে যিনি ছিলেন রমণীকুলের আদর্শ—কেবল ভারত-বাসীর নয়, বিশ্ববাসীর চিরনমস্যা—মহাভারতের সেই মহীয়সী নারী দেবী কুন্তীর চরণে জানাই আমাদের শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণতি; প্রার্থনা করি তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের নারী আবার ভবিষ্যৎ ভারত-ইতিহাসের গৌরব উজ্জ্বল করে তুলুক, বিস্মৃত অতীত লাভ করুক নতুন মর্যাদা।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণ-রূপেই স্বার্থকতর সে বিষয়ে স্পেন্সার[১] ও স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ একমত। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, জাতীয় গৌরববোধের ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্য কতখানি ?

আজকাল সর্বত্রই 'জনসাধারণ' বা 'গণচেতনা' শব্দটি বহুলশ্রুত জনগণের মন বলে যে বিশেষ একটি ভাবমূর্তি আমরা মনে মনে এঁকে থাকি, সে মন নিজে কিছু চিন্তা করে কি ? অনেক লোকের একমত হলেই তা যে গ্রহণীয় বা প্রামাণ্য তা কখনোই হতে পারে না। সমাজের একদিকে গণচেতনা আর একদিকে প্রতিভাবানদের ক্রান্তদর্শী পথনির্দেশনা—এ দুয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ই সমাজ, জাতি বা দেশকে সংগঠিত করে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে কাছের দিনের উদাহরণ সদ্য-লোকান্তরিত ফরাসী গণনায়ক চার্লস দ্য গ্যল। ফরাসীরা অনেকটা বাঙালীর মতো স্ব-প্রধান, কল্পনাপ্রিয় এবং ভাবলোক-চারী। ফ্রান্সের ইতিহাসে একাধিকবার এই অসংবদ্ধ গণচেতনাকে একতাবদ্ধ করতে বিশেষ কোনো প্রতিভাশালী নায়কের প্রয়োজন হয়েছে। স্বৈরতন্ত্র যেমন কাম্য নয়, স্বেচ্ছাতন্ত্রও তেমনি পরিহার্য। ফ্রান্সের ইতিহাসে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বপ্ন বারবার স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিপরীত মেরুর আকর্ষণে দোলায়িত কিন্তু নেপোলিয়ন বা দ্য গল ফরাসীজাতির অন্তর্লোকে সেই ঐতিহাসিক গৌরববোধ জাগাতে পেরেছিলেন, যার বলে পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসীজাতির অগ্রগামিতা আজও শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য।

সমকালীন বাংলাদেশে যাঁরা বামপন্থী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত, তাঁরা ইতিহাসকে জনগণের সংগ্রামরূপে দেখতে চান। এক হিসাবে, বিভিন্ন যুগের ইতিহাসে অতীতের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে বর্তমানের বঞ্চিতদের সংগ্রাম চিরকালই রয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অথবা বর্তমান ভারতের ইতিহাসে বৈশ্য-শূদ্রের সংগ্রামে তার প্রমাণ মেলে। কিন্তু বঞ্চিত নিপীড়িত জনসাধারণের জীবনাদর্শও নিশ্চয় কোনো মহৎ ভাবের পটভূমিকায় গড়ে উঠবে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম—এ সবের শ্রেষ্ঠ ফল তাদের জীবনে সঞ্চারিত হলে, তবেই না সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ সম্ভবপর ! অতীত ইতিহাসের সমস্ত ধারাটিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে আর জনগণ আপনা আপনি এক মহৎ সভ্যতা সৃষ্টি করে ফেলবেন—এমন আজগবী ধারণা কোনো যথার্থ বিপ্লবীর মনে ঠাঁই পেতে পারে না। কিন্তু এদেশে তা অনায়াসে সম্ভব। দেড়শো বছর আগে হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের (নব্য বঙ্গ) দল পাশ্চাত্য সভ্যতার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ইংল্যাণ্ডের নকল করে সভ্যতার ধ্বজাধারী হতে চাইতেন, আর স্বাধীন ভারতবর্ষের তথাকথিত

[১] "...the highest office which the historian can discharge, is that to the lives of nations, as to furnish materials for a Comparative Sociology : Education : Spenser : 1st Edn. p36.

তরুণ পাশ্চাত্য সভ্যতার আর এক ভগ্নাংশ সাম্যবাদাদের অনুকরণে দেশকে ঢেলে সাজতে চেয়ে যা কিছু এদেশের পবিত্র শ্রদ্ধেয় গৌরবজনক স্মৃতি, তাই ধ্বংস করতে উদ্যত। বলা বাহুল্য, কালাপাহাড় একদিন থামতে বাধ্য হয়েছিলেন, এরাও থামবে—কিন্তু জাতীয় ইতিহাসে অনুকরণবৃত্তির সবচেয়ে লজ্জাজনক উদাহরণ কোনো দিন মুছে যাবে না।

সাম্প্রতিক কালের তরুণমানসে এই মনোবৃত্তির সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করলে ইতিহাস-চেতনার একটি মূলসূত্র ধরা পড়ে। প্রত্যেক দেশ, জাতি ও সমাজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব—সেই জাতির সর্বসাধারণের সম্পদ। কোণারকের মন্দির বা তাজমহল যেমন সর্বভারতের গৌরবের সামগ্রী, তেমনি রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ বা মহাত্মা গান্ধী—এঁরাও সমগ্র ভারতের মহাসম্পদস্বরূপ। ব্যক্তি বা আদর্শ হিসাবে এঁদের পার্থক্য আছে, কিন্তু এঁদের মহত্ত্ব আমাদেরও মহত্ত্বের অধিকারী করেছে—এই মহত্ত্ববোধ জাতীয় ইতিহাস-চেতনার প্রধান অবলম্বন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বাঙালী-মানসে এই ইতিহাস-চেতনার কথা বঙ্কিম-চন্দ্রের অন্তরেই সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না।...যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্বপুরুষ চিরকাল দুর্বল—অসার, আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।

"কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি*, মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে সার কথা কিছু আছে?"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-জিজ্ঞাসায় বাঙ্গালীর অবিস্মরণীয় কীর্তিমানদের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সমাজের বহুকালপ্রবাহিত জীবনধারাসম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা। সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠদের বিবরণ এবং সাধারণ মানুষের জীবন-প্রবাহের উপলব্ধি—এ দুয়ের সমন্বয়েই সমগ্র ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে। আবার অতীত ও বর্তমানের যথাযথ মিলনের উপরেই উপযুক্ত ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা।

এদিক থেকে স্পেন্সারের গণচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ মহত্ত্বের অধিকারীদের জীবন ও সাধনার ইতিহাসের সম্মিলিত আলোচনার দ্বারাই যে ইতিহাসদৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' তেমন ইতিহাসেরই দৃষ্টান্ত। তাই ভারত-ইতিহাসের

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট কবি বিদ্যাপতি যে মিথিলার কবি, তা এখন সর্বস্বীকৃত কিন্তু বাংলা দেশের একাধিক কবি 'বিদ্যাপতি' নাম গ্রহণ করে অনেক ভালো ভালো পদ রচনা করে গেছেন, সেকথাও স্মরণীয়।

২ 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধ : বঙ্কিমরচনাবলী : ২য় খণ্ড : পৃ : ৩৩৬ [সাহিত্যসংসদ সং]

মূলপ্রবাহ ধর্মচেতনার শ্রেষ্ঠ অধিকারীদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বৈদিক যুগ থেকে সমকালীন ইংরেজ যুগ অবধি ভারত-ইতিহাস-সমীক্ষার প্রচেষ্টা স্বামীজীর 'বর্তমান ভারতে' লক্ষণীয়।

*

১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বর শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে স্বামীজী ইতিহাসের যে চারটি যুগবিভাগ করেছিলেন, তার শেষ দুটি 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' ('the traders and labourers')[৩]-পরিচালিত যুগ। বস্তুতঃ ইতিহাসের এই শেষ দুটি পর্বেই অভিজাত-শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে চলে আসে। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস মূলতঃ রাজশক্তি থেকে বৈশ্যশক্তিতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ইতিহাস।

বৈশ্যশাসনের যুগ সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য —"এর ভিতরে শরীরনিষ্পেষণ ও রক্তশোষণ-কারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ। এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার। কিন্তু ঐ সময় সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।"[৪]

পরবর্তীকালে 'বর্তমান ভারতে' এই বৈশ্য-শক্তিকে তিনি ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সমীকৃত করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'[৫] — ইংরেজ শাসনে মূলপ্রকৃতিই ছিল বণিকশাসন।

"ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাটগণের ভারত-বিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"[৬]

ইংরেজশাসনের অবসানে স্বাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজ্য-উত্তরাধিকারী মূলতঃ মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ই সবচেয়ে লাভবান হয়ে থাকেন। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, বা এ যুগের ভারতবর্ষ তার বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ।

সমাজজীবনে বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানকে ঈষৎ নাটকীয় ভঙ্গিমায় উঁচুদরের ব্যঙ্গমিশ্রিত ভঙ্গিমায় স্বামীজী এইভাবে প্রকাশ করেছেন— "বৈশ্য বলিতেছেন, 'উন্মাদ! অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্ত শক্তিমান আমার হস্তে। দেখ, ইঁহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তি-মান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যা-বুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র তেজবীর্য-ইহার কৃপায় আমার অভিমত-সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু সে মধু পান করিবে কে? - আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"[৭]

বলা বাহুল্য, শ্রমজীবী মধুকরেরা এ যুগে আর অন্যের হাতে আপন পরিশ্রমের মধুসঞ্চয় তুলে দিতে রাজী নয়। তারই ফলে স্বামীজীর ভাষায়, "শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্যের"[৮] সূচনা। (ক্রমশঃ)

৩ Complete Works of S. Vivekananda: Vol. VI: pp. 81-82 (Centenary Edn.) দ্রষ্টব্য।

৪ বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড: পৃ: ৩০১-৩০২ দ্রষ্টব্য।

৫ শিবাজী উৎসব: সঞ্চয়িতা: রবীন্দ্রনাথ

৬, ৭, ৮ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ: ২৩১, ২৩৯, ২৪১

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামী জীবানন্দ

মা কে? যিনি সন্তানকে ঘিরে থাকেন কল্যাণকারিণী সমস্ত শক্তি দিয়ে, দুঃখে বিপদে যিনি তার মন প্রাণ অধিকার ক'রে থাকেন, তিনি মা। যাঁর কথা সন্তান বলতে পারে না, বলবার ভাষা পায় না, যাঁর ভালবাসা শুধু অনুভব করে, তিনি মা। প্রত্যেক শিশুর কাছে মায়ের মতন আপন জন আর কেউ নেই। জগতে অগণিত মায়ের অগণিত সন্তান। নানা দেশে নানা ভাষাভাষী অসংখ্য সন্তানের অসংখ্য জননী। সর্বদেশে সর্বকালে মায়ের আসন আপন সন্তানের হৃদয়ে নির্দিষ্ট। শুধু মানুষেরই নয়, পশুপক্ষীরও মাতৃস্নেহ বিদ্যমান। সর্বত্র মায়ের প্রতি সন্তানের দুর্বার আকর্ষণ!

শ্রীশ্রীমা কে? তিনি সকল মায়ের সমষ্টি, সব মায়ের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে গড়া অনুপম মাতৃমূর্তি। জগতের কোটি কোটি মাতৃহৃদয়ের স্নেহকরুণাধারা যেন একটি আধারে সঞ্চিত হয়ে আবার উচ্ছ্বসিত আবেগে নির্গত হয়ে সারা বিশ্বের অজস্র সন্তানশিরে সিঞ্চিত হচ্ছে। সে স্নেহে ভালমন্দের বিচার নেই। সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত!

'তুমি কি রকম মা?'—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বয়ং বলেছিলেন, 'আমি সত্যিকারের মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা নয়, সত্য জননী।'

সমস্ত দেবতার সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ হলেন ভগবতী দুর্গা, আর সমগ্র মাতৃস্নেহের করুণা-মণ্ডিত রূপ শ্রীশ্রীমা সারদা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে পূজা ক'রে জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন—তিনি সাক্ষাৎ জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। পরম-কল্যাণময়ী বিশ্বজননীরূপে তাঁর পরিচয় জগতে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্মা মহাশক্তির যে স্তব করেছেন, তাতে আছে:

"ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥"

—তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী। তুমি হ্রী, তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। তুমি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি। তুমি শান্তি ও ক্ষান্তি।

এই শ্লোকে যা বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীমা যেন তার প্রতিচ্ছবি। শ্রীশ্রীমা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী—নারায়ণী। তিনি অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী, পরমা প্রকৃতি। অধর্মবিমুখতা-শক্তি হ্রী তাঁতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি শুদ্ধবুদ্ধিদাত্রী। তিনি লজ্জাপটাবৃতা মহাশক্তি। সর্বজীবের পোষণকারিণী পরমশান্তিরূপা শান্তিদাত্রী তিনি, ক্ষমার প্রতিমূর্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শক্রাদি-কৃত দেবীস্তুতিতে বলা হয়েছে: হে দেবি! যে পরা বিদ্যা মুক্তির কারণ, দুরনুষ্ঠেয় মহাব্রত যার সাধন, সেই পরমা ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী তুমিই। এ জন্য জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বনিষ্ঠ শুদ্ধচিত্ত মুমুক্ষু মুনিরা তোমারই সাধননিরত।

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥"

এখানে দেবী ভগবতীর যে ছবি মানসপটে ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে জননী সারদাদেবীর

ভাবগত সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। শ্রীশ্রীমা জ্ঞানদায়িনী বিদ্যাশক্তি, তাঁর কৃপাকটাক্ষে ভক্তি মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। তিনি 'জ্যান্ত দুর্গা'!

শ্রীশ্রীমা হচ্ছেন মানবীর রূপ ধ'রে দেবী। মানুষের মূর্তি যখন ধরেছেন, তখন মানুষের মতো কর্মও করেছেন। সে কর্ম সাধারণ কর্ম, আবার অসাধারণও। অতি সাধারণ কর্মের মধ্যেও অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে। কর্মের মধ্যে বিকশিত হয়েছে দেবী-মূর্তি। জ্ঞানে ভক্তিতে অনাসক্তিতে শরণাগতিতে মহিমময় দিব্য রূপ।

গরীব ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভাব ব'লে দরিদ্র সংসারের ছোটবড় খুঁটিনাটি সব কর্মই করতে হয়েছে শ্রীশ্রীমাকে। প্রত্যেক কর্মের মধ্যে তাঁর সেবাপরায়ণা মূর্তি! সেবার দ্বারা, নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা যে ব্রহ্মভাব বিকশিত হয়, তা জীবনে দেখিয়েছেন। জীবনচর্যায় ধর্ম আর কর্ম আলাদা হয়ে দেখা দেয়নি, এক হয়ে গেছে। কর্ম আধ্যাত্মিক জীবন-গঠনে কিভাবে সহায়ক হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কর্ম কেমন? তার সামান্য পরিচয়: জয়রামবাটীতে ছোটবেলায় মজুরদের জলখাবারের মুড়ি নিয়ে যেতেন। তাঁর মার সঙ্গে ক্ষেত থেকে তুলো তুলে তার থেকে পৈতা কাটতেন। মাঝে মাঝে এক-গলা জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটতেন। মা অসমর্থা হ'লে রাঁধতে বসতেন, কিন্তু কোমল কচি হাতে ভাতের হাঁড়ি নামাবার সামর্থ্য ছিল না, বাবা এসে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন। ভাইদের দেখাশোনা করা তাঁর একটি প্রধান কাজ ছিল। ভাইদের নিয়ে আমোদর-নদে স্নান করতে যেতেন, স্নানান্তে আবার তাদের নিয়ে ফিরে আসতেন।

স্নেহশীল মাতাপিতার ঈশ্বরপরায়ণ জীবনের সংস্পর্শ, দৈনন্দিন কর্মের ভিতরে স্বার্থত্যাগ ও সেবাবৃত্তি তাঁর অন্তর্নিহিত দিব্যভাবকে পরিস্ফুট করেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের মা শ্যামা-সুন্দরী দেবী বলতেন, 'মা সারদা, জনমে জনমে যেন তোমার মতো কন্যারত্ন পাই।'

এরপর যখন দক্ষিণেশ্বরে, তখন সেই ছোট্ট নহবতঘরে—স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠে 'বিন্দু-বাসিনী' হয়ে অবস্থান করেছেন, অপরূপ সে চিত্র! একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে! সাধারণ মানুষ জানতেও পারতো না তিনি সেখানে থাকেন। রাত তিনটে সাড়ে তিনটেই উঠে গঙ্গাস্নানাদি সেরে পূজা জপ ধ্যান, তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কী অকুণ্ঠ সেবা!

কলিকাতা শ্যামপুকুরবাটীতে ও কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি কি একনিষ্ঠভাবে আত্মবৎ সেবা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, তা লোকে কল্পনাও করতে পারবে না!

পরবর্তীকালে জয়রামবাটীতে তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা: সকালবেলা দুঘণ্টা ধ'রে শাক-তরকারি কোটা, রান্নার জন্য ভাঁড়ার বের ক'রে দেওয়া, পূজার সব যোগাড় ক'রে নিজে পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও জলখাবার বেঁটে দেওয়া, অন্ততঃ একশ' খিলি পান সাজা, ভক্তগণকে ও বাড়ীর লোকদের খাওয়ানো, বৈকালে নিজহাতে লুচি রুটি তরকারি প্রভৃতি করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কার করা। সবই তিনি নিত্য নূতন প্রীতির সঙ্গে ক'রে যেতেন।

কি জয়রামবাটীতে, কি কামারপুকুরে, কি উদ্বোধনে, কি অন্যান্য স্থানে সর্বত্র তাঁর প্রাণ ঢেলে কর্ম করার ছবি, তাঁর করুণা-বিগলিত মূর্তি! নিয়ত কর্মময় জীবন, কর্মযোগের মধ্য দিয়ে নৈষ্কর্ম্যলাভের অপূর্ব

নিদর্শন! 'হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত' তা সর্বাবস্থায় অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অনুভব করতেন ব'লে শ্রীশ্রীমায়ের করুণামণ্ডিত আনন্দময়ী মূর্তি সকলের অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে যেত।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রার্থনা কেমন? সে প্রার্থনা শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা। তার উপরে আর কোন প্রার্থনা হ'তে পারে না। তিনি প্রার্থনা করেছেন নির্বাসনা। নির্বাসনার উপর আর কোন প্রার্থনা নেই। নির্বাসনায় সর্ববন্ধন-বিমুক্তি, তত্ত্বজ্ঞান, স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি। তাই নিজে প্রার্থনা ক'রে শিখিয়েছেন—যদি শরীর মন বুদ্ধি অহংকার জাতি কুল মান ইত্যাদি বন্ধনের পারে যেতে চাও, তবে আর কিছু চেয়ো না, কেবল নির্বাসনা চাও, তাহলে এইক্ষণেই পূর্ণানন্দের অধিকারী হবে।

জগন্মাতার আর একটি প্রার্থনা। তারও তুলনা নেই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে চাঁদের দিকে চেয়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করেছেন, 'তোমার এ জ্যোৎস্নার মতো আমায় নির্মল ক'রে দাও।' কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন, 'চাঁদেও কলঙ্ক আছে; হে ভগবান, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' পরমশুদ্ধ না হ'লে কেউ এমন প্রার্থনা করতে পারে না। শ্রীশ্রীমা পবিত্রতাস্বরূপিণী, তাই স্বামী অভেদানন্দজী মাতৃস্তোত্রে প্রণতি নিবেদন করেছেন:

'পবিত্রং চরিত্রং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥'

শ্রীশ্রীমা কিভাবে তীর্থদর্শন করতেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পুরীতে জগন্নাথক্ষেত্রে তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে যাবেন। পালকি ক'রে মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তিনি হেঁটে যেতে চাইলেন আর বললেন, 'আমি দীনহীন কাঙালের মতো যাব আমার প্রভুর মন্দিরে, জগৎপতি ৬জগন্নাথকে দেখে আসব।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে ক'রে, তাঁকে জগন্নাথ দর্শন করাবেন ব'লে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীধামে যাওয়া হয়নি, তাই তিনি আগে ঠাকুরকে জগন্নাথ দর্শন করালেন, তারপর নিজে দর্শন করলেন। তার কাছে 'ছায়া আর কায়া সমান'।

দেওঘর, কাশী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে তীর্থদেবতার সান্নিধ্য ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি ক'রে তিনি তীর্থের মহিমা বাড়িয়েছেন। 'তীর্থী-কুর্বন্তি তীর্থানি'। কোন কোন তীর্থে কোন্ যুগান্তরের জন্মান্তরের লীলাস্মৃতি জেগে উঠত তাঁর অন্তরে! রামেশ্বর তীর্থে শিবপূজান্তে তিনি অসতর্কভাবে ব'লে ফেলেছিলেন, 'যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।' ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাসঙ্গিনী সীতা-দেবীরূপে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল এবং তখন তিনি এখানে শিবপূজা করেছিলেন, একথায় তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাকে অভেদদৃষ্টিতে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায় বলেছেন,

'দাস তোমা দোঁহাকার,
সশক্তিক নমি তব পদে।'

স্বামীজী একখানি চিঠিতে লিখেছেন, 'মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষগুণ বড়।' 'মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে, দেখা যায় ভারতীয় নারীত্বের মহিমময় দিকগুলি উজ্জ্বল হয়ে পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে—পিতৃগৃহে কন্যার আদর্শ,

পতিগৃহে সহধর্মিণীর আদর্শ, সর্বোপরি জননীর মহত্তম আদর্শ! জননীর আদর্শ তাঁর মধ্যে দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে শাশ্বত মাতৃসত্তায় তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর জীবনে ও চরিত্রে তপস্বিনী উমা, সহনশীলা সীতা, ব্রহ্মবাদিনী বাক্, পতিব্রতা সাবিত্রী, হ্লাদিনী শ্রীরাধার ছবি প্রতিফলিত। আবার তাঁর অনুধ্যানে পুণ্যময়ী যশোধরা, ভক্তিপ্রাণা মীরা এবং জপনিরতা বিষ্ণুপ্রিয়ার ছবিও স্মৃতিপটে উদিত হয়।

একদিকে পুরাতন মহিমার আদর্শ ও তিহ্যের পূর্ণাঙ্গ রূপ শ্রীশ্রীমা, অপরদিকে তাঁর সর্বসংস্কারবিমুক্ত মনে নূতনের অভিনন্দন! তিনি নবীন পন্থীদেরও অগ্রদূত। তাই বি নী মহিলাদেরও সন্তানস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছেন তিনি ; তাঁর দিব্য স্নেহচ্ছায়ায় উপবেশন ক'রে তাঁরা আত্মহারা হয়ে গেছেন —ভগিনী নিবেদিতা তো তাঁকে মেরী মাতা ব'লে উপলব্ধি করেছেন প্রার্থনাকালে।

কোথায় জয়রামবাটী, আর কোথায় সুদূর ইওরোপ আমেরিকা! দূর দূরান্তরেও করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের জয়গান ; সর্বত্র মা মা ধ্বনি!

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়ে মুছে তাকে কোলে তুলে নিতে হবে।' তাই শরণাগত সন্তান পায় পরম আশ্বাসবাণী।

শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 'দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি ক'রে যে তাকে ভাল করতে হবে তা জানে কজনে?' বাস্তবিকই তিনি মন্দ লোককেও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে উন্নত করতেন। অদোষদর্শিনী ক্ষমাস্বরূপিণী জননীর অশেষ করুণা আপামর সকলের উপর অজস্রধারায় নিপতিত!

কোন শিষ্য কাজে কোথাও বেরিয়েছেন, ফিরেছেন যখন তখন বেলা দুটো। শ্রীশ্রীমা তখনও তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন! শিষ্য অনুযোগ করলে বলেছেন, 'বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি—আমি কি ক'রে খাই?' এমনি মা!

শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী ছিল অতিসুন্দর। একটি উদাহরণ : একজন উঠান ঝাঁট দিয়ে ঝাঁটাটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। তিনি বললেন, 'ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি অশ্রদ্ধা ক'রে ছুড়ে দিলে? ছুড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস ব'লে কি তুচ্ছ বোধ করতে আছে? যাকে রাখ, সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে। তাছাড়া এ সংসারের ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। ঝাঁটাটিকেও মান্য ক'রে রাখতে হয়। সামান্য কাজটি শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।'

একজন মহিলাভক্তকে উপদেশ দিয়েছেন : 'কারো কাছে কিছু চেয়ো না—বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। লোকের দেওয়া জিনিস কি থাকে গো? ঠাকুর যখন দেবেন তখন রাখবার জায়গা পাবে না—ঠাকুরের দেওয়া জিনিস ফুরতে জানে না। যে চায় সে পায় না, যে চায় না সে পায়। তুমি কারু কাছে কিছু চেয়ো না।'

শিল্প-বিজ্ঞানের যুগে সুখভোগের বিচিত্র উপকরণ পেয়ে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোগমুখর। ভোগবাদের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন অপূর্ব আলোক-বর্তিকা। বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবহাওয়ায় যখন ভারতীয় নারীর আদর্শ থেকে দূরে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন

পরমকল্যাণী শ্রীশ্রীমায়ের অনবদ্য জীবন সামনে রাখতে পারলে আর কোন ভয় থাকবে না, উপযুক্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেও ভারতীয় আদর্শের যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারা যাবে। পাশ্চাত্য মহিলাগণও তাঁর ভাবাদর্শ লাভ করলে অধিকতর মহিমান্বিতা হয়ে উঠবেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

সারা বিশ্বে হবে দিব্য শকতির নব সূর্যোদয়,
অভ্যুদয়ে ভাবী কাল অতীতের চেয়ে
জ্যোতির্ময়!

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চোখের জলে ধুইয়ে দেবেন
মনের কাদা,—তাই কাঁদান্!
দুঃখ-ব্যথার হালের ফালে
ভাঙেন যখন কঠিন প্রাণ—
বন্ধ্যামাটির বক্ষে হাসে
লক্ষ গোলাপ কী উল্লাসে!
লজ্জা-পাপে সর্বনাশে
অদ্বিতীয় এক ঈশান!
বেদনারই বহ্নিশিখায়
পুড়িয়ে তিনি অঙ্কে নেন!
ডুবলে অহং নয়ন-জলে
কমল-চরণ বাড়িয়ে দেন!
অরণ্যের এই পাখীর গানে
যে-মধুরের আভাস আনে
কালবোশেখীর ঝড়-তুফানে
সেই বঁধুয়াই বীণ বাজান।

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ*

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

নব্য জীবনবেদের কথা

"Vivekananda performed the extraordinary feat of breathing life into the purely static monism of Sankara."

R. C. Zaehner

পূর্বাভাষ

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদানকে 'নয়া বেদান্ত' বলে অভিহিত করা হ'য়েছে। ভারতীয় রেনেশাঁর প্রতিটি দিকেই এই জীবন-দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—অর্থাৎ উনিশ শতকের ধর্ম ও সমাজ-আন্দোলন, সাহিত্য-আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলন সকলই—'নয়া বেদান্ত' দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, নয়া বেদান্তের (কার্যপরিণত বেদান্তের) মাধ্যমে স্বামীজী ব্যক্তিকে তার সত্তার উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সত্তার উদ্বোধন (liberation of the spirit) ব'লতে বোঝায় ব্যক্তির সামগ্রিক মুক্তি—তার যুক্তি চেতনা চিন্তা বিশ্বাস সব-কিছুরই মুক্তি। সত্তার উদ্বোধনের আবার সমষ্টিগত তাৎপর্য আছে। এই তাৎপর্যকে এক কথায় 'ন্যায়' (justice) বা সমষ্টিগত জীবনে 'ন্যায্য ব্যবস্থা' ব'লে বর্ণনা করা যায়। তৃতীয়তঃ, স্বামী বিবেকানন্দ জীবনদর্শন-সম্পর্কিত বাণী এবং নির্দিষ্ট কর্তব্যভার দুই-ই নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং ফলে নয়া বেদান্তের তত্ত্বগত বিশ্লেষণ এবং প্রয়োগ এক অখণ্ড রূপ ধারণ ক'রেছে। চিন্তা ও প্রয়োগের এরকম অখণ্ডতা ইতিহাসে অতি বিরল ঘটনা, যা মাত্র লোকোত্তর-প্রতিভাশালী শিক্ষাগুরুদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এবং যুগান্তকারী আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে এই অখণ্ডতা থেকেই। রেনেশাঁয় মুক্তিস্নাত ব্যক্তি অনুভব করে যে, ভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীকে তার কিছু দেবার আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্তব্যভার সম্বন্ধে চেতনার অভাবে সে তার অনুভূতিকে আন্দোলনে প্রবাহিত করতে পারে না। অপরদিকে উক্ত শিক্ষাগুরুদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তব্যভার সম্বন্ধে চেতনাই তাঁদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করে এবং তাঁদের বাণী থেকে নিঃসৃত হয়ে রূপ গ্রহণ করে নব্য জীবনবেদ।[১] মার্টিন লুথার, রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি কালজয়ী পুরুষ হলেন এই গোত্রীয়। এঁরা প্রত্যেকেই রেনেশাঁয় মুক্তিস্নাত ব্যক্তি, আবার এঁরা মহান শিক্ষাগুরু।

এইবার ভারতের নবজীবনের তিনটি আন্দোলনের ওপর প্রভাবের দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তের বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

সংস্কার-আন্দোলন সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি

রেনেশাঁকে এক কথায় মুক্তি-আন্দোলন (liberation movement) ব'লে অভিহিত

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট থিসিস হিসাবে অনুমোদিত Social and Political Ideas of Swami Vivekananda গ্রন্থ ভিত্তি করে রচিত।

১ Crossman : Plato Today

করা যায়। ইতালীতে এই মুক্তি-আন্দোলন শুধু যুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতীয় রেনেশাঁর ক্ষেত্রে কিন্তু শুরু থেকেই নৈতিক চেতনার মুক্তিসাধন ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য। এই অভিমতের সপক্ষে প্রমাণ হ'লো যে, রাজা রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্বেই আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছিল। জওহরলাল নেহরু ঠিকই বলেছেন, এদেশে বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অসঙ্গতি হ'লো যে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজরা ছিল এদেশের বহু সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের 'পূর্বসূরী ও প্রতিনিধি'।[২] ইংরেজদের মধ্যে অনেকের কাছেই সতীদাহের ন্যায় আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো ছিল বিভীষিকার মতো, এবং এই বিভীষিকা দূর করবার বেশ কিছুটা প্রচেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন। ওয়েলেসলী ১৮০৩ সালে গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন রদ করেছিলেন এবং হিন্দুধর্মের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে—এইরকম জনশ্রুতি ও প্রচার যাতে না ঘটে তার আশঙ্কায় আর কিছু না করলেও শাসক-সম্প্রদায় পরবর্তী সময়ে সতীদাহ-প্রথার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তারপর ২৬ বছর পরে ১৮২৯ সালে, বেণ্টিঙ্ক আইন পাস করে ঐ প্রথা বিলুপ্ত করেন। এই সময়ের মধ্যে মেটকাফ তাঁর শাসনাধীন দিল্লী অঞ্চলে (১৮১১-১৮) ঐ প্রথা রহিত করেন। জে. পেগস্ (J. Peggs) এবং ফ্যানি পার্কস্ (Fanny Parks) নামে দুজন ইয়োরোপীয় তাঁদের দু'খানি পুস্তিকায়[৩] সতীদাহপ্রথা-রোধের জন্য বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের অবতারণা ক'রে গভীরভাবে আবেদন করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঐ যুগের 'প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি' (representative man)[৪] রাজা রামমোহন সতীদাহপ্রথার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে পারেননি।[৫]

দ্বিতীয়তঃ, ঐ যুগ ছিল ধর্মসংঘর্ষের যুগ, যার প্রকৃতি আমরা ঠিক আজকের দিনের লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করতে পারি না। উদারনৈতিক দর্শনের প্রভাবের দরুন ঐ যুগে আবার স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) সম্বন্ধে লোকের মনে একরকম মোহের সৃষ্টি হয়েছিল। যে অধিকারকে আমরা ভারতীয়রা চিরকালই অপরিহার্য মনে ক'রে সবার ওপরে স্থান দিয়ে এসেছি তা হ'লো স্বাধীনতা, যাকে সাধারণতঃ 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার দরুন আমাদের এই চিরন্তন মৌলিক অধিকারই ব্যাহত হচ্ছিল। উদারনৈতিক দর্শনের প্রস্রবণ থেকে আকণ্ঠ পান

২ Discovery of India

৩ পুস্তিকা দু'খানির নাম—'The Suttee's Cry to Britain' এবং 'Twenty Years in the East with Revelations of Life in the Zenana'

৪ 'Representative man' বর্ণনাটি ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের। গ্রন্থের নাম Rammohan —the Universal Man

৫ রাজা রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বলেছেন যে সতীদাহপ্রথার প্রতি রাজার বিরুদ্ধ ভাব ছিল বাল্যকাল থেকেই যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের স্ত্রী সহমরণে গমন করেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ করেন। R. C. Majumder: Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

করার পর রাজা রামমোহনের পক্ষে আর এ-বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না ; স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁকে অবতীর্ণ হতেই হয়েছিল। কিন্তু যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তাঁর পক্ষে আবার ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে প্রচলিত উচ্ছৃঙ্খলতা যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করাও সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'বিসদৃশ পরস্পরবিরোধী বিবদমান' ধর্মশক্তিসমূহের জন্য একটা মিলনভূমি।[৬] তিনি ভেবেছিলেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ধর্মনীতির সঙ্গে যে খাদ মিশে গেছে তা দূর করতে পারলেই এই মিলনভূমির সন্ধান পাওয়া যাবে। এবং তখনও যদি খৃষ্টধর্মের আক্রমণ চলতে থাকে তবে হিন্দুধর্ম তার যথাযোগ্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। এইভাবে একরকম একত্ব-বাদমুখী সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজা রামমোহন ধর্মীয় আক্রমণকারীদের নিরস্ত্র করতে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা করেছিলেন। এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'adjustment on the spiritual plane'[৭] ব'লে অভিহিত করা যায়।

রাজা রামমোহনের এই অভিনব প্রচেষ্টা কিন্তু সার্থক হয়নি ; তিনি হিন্দুত্ব (Hinduism) বা ভারতের জীবনদর্শনকে (the 'ism' of India) নূতনভাবে রচনা করতে সমর্থ হননি। এর কারণ হলো 'বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যকে' সমুচ্চ স্থান দিতে তিনি পারেননি।[৮] হিন্দু জীবনদর্শনের এই মূলসূত্রটি তিনি ঠিক ধরতে বা অনুসরণ করতে পারেননি। তাঁর যুক্তিবাদ উপনিষদের আলোয় উদ্ভাসিত হলেও হিন্দুধর্মের জাগৃতির পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না।

প্রায় এক শতকের তিন-চতুর্থাংশ পরবর্তী সময়ে বিবেকানন্দ ঐ একই দ্বৈত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু সমাধানের প্রচেষ্টা করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে এবং সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, হিন্দুধর্মের গণ্ডী ব'লে যেগুলোকে ধরা হয়, সেগুলো সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রথা (Social institutions) মাত্র ; মূলতঃ হিন্দুধর্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। ঐ অনুষ্ঠান-প্রথাগুলো হিন্দুসমাজকে বিকৃত করলেও হিন্দু-ধর্মের কোন মূলসূত্রকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুতরাং ওদের বিলোপসাধনের প্রয়োজন হলো সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার জন্য, হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য নয়। সামাজিক ন্যায়ের প্রতিবন্ধক নয় এমন কোন কিছুরই উৎখাত করার প্রয়োজন নেই। ফলে তিনি মূর্তিপূজার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন এবং বর্ণভেদপ্রথার সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এই ব'লে যে, আদিতে বর্ণভেদপ্রথার একটা উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল যদিও বর্তমানের অধঃপতিত রূপে প্রথাটি সামাজিক ন্যায়ের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দুধর্মসার সংহিতা ও উপনিষদেই নিহিত, যার সূত্র হিসাবে বর্ণভেদপ্রথা কখনও গণ্য হয়নি। অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও প্রথাটি হ'লো সম্পূর্ণভাবে সামাজিক বিবর্তনের ফল। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন ও অন্যান্য সংস্কারকদের সমালোচনা ক'রে স্বামীজী বলেছেন, "Beginning from Buddha down to Rammohan Roy, everyone made the mistake of holding the caste to be

---

৬ Seal, op. cit.

৭ My Master

৮ Tagore : Society and State

a religious institution and tried to pull down religion and caste together and failed."[৯]

অতএব, যেসকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তিশীল, সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির পরিবর্তনসাধন অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু আমাদের মৌলিক ধর্মনীতির বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করা হবে না; সেগুলি অস্পৃষ্ট থাকবে।[১০]

বিরোধী অভিমতের অভাব না থাকলেও[১১] সর্দার পানিক্কর প্রভৃতি ঐতিহাসিকের মতে সামাজিক প্রথা ও ধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের ওপর এই যে গুরুত্ব আরোপ, এ হ'লো সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দেরই দান এবং এর ফলেই পরবর্তী যুগে আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন সম্ভব হয়েছিল।[১২]

সর্দার পানিক্করের এই উক্তি সমর্থন করা হোক আর না হোক এটা স্বীকার ক'রতে হবে যে, সমাজসংস্কার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের উপরি-উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ও নব্য দর্শনের এক সার্থক সমন্বয়। এর মধ্যে সামাজিক ন্যায়ের তত্ত্ব হ'লো নয়া জীবনদর্শনের দ্যোতক এবং প্রাচীন আদর্শের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই বিশেষ স্মারকের মধ্যে যে, পুনর্গঠনের জন্য ধ্বংস কখনই অপরিহার্য নয়। ভারতবাসীকে বিশেষভাবে এই সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দকে 'পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণের' উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং প্রধানতম প্রবক্তা ব'লে অভিহিত করেছেন।[১৩]

নয়া বেদান্ত বা ফলিত বেদান্ত

যে আদর্শের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগ ছিল প্রবলতম তাকে সংক্ষেপে মুক্তি বা স্বাধীনতা (freedom) ব'লে অভিহিত করা যায়, এবং তাঁর কাছে স্বাধীনতার কোন প্রকারভেদ বা বিভাগ নেই। সামাজিক ন্যায় (social justice) যখন আংশিক মুক্তির সূচক তখন মাত্র এই ন্যায়ের আদর্শ তাঁর দর্শনের লক্ষ্য হ'তে পারে না। মানুষের সত্তার মুক্তিই হ'লো এই লক্ষ্য এবং এর জন্যে তিনি এমন এক সংহত ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রেছিলেন যা বিভিন্ন যুগে আহৃত জ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান দিনের দাবি ও প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্যবিধান করতে সমর্থ হবে। এই ধর্মবিশ্বাস, এই জীবনদর্শনের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বেদান্তদর্শনের মধ্যে। অবশ্য যে বেদান্ত তিনি প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর নিজের দান, নিজের ব্যাখ্যা বেশ কিছুটা আছে। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের স্থৈতিক অদ্বৈতবাদে (Static monism) প্রাণসঞ্চারের অনন্যসাধারণ কার্য সম্পাদন ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন।[১৪] অন্যভাবে বলা যায়,

৯ C. W., V (Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. V)

১০ Vedantism (C. W., III)

১১ J. N. Farquhar : The Crown of Hinduism দ্রষ্টব্য।

১২ Panikkar : In Defence of Liberalism.

১৩ The Renaissance in India

১৪ অভিমতটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক R. C. Zaehner-এর। গ্রন্থের নাম Hinduism। উক্তিটি এই প্রবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

স্বামীজী বেদান্তদর্শনকে ফলিত দর্শনে রূপায়িত ক'রে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনবেদে পরিণত করেছিলেন। এজন্যেই একে বলা হয় 'নয়া বেদান্ত' বা 'ফলিত বেদান্ত'। এই রূপদান-কার্যে তিনি অবশ্য তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে ঋণী। স্বামী বিবেকানন্দকে প্রশ্ন করা হ'য়েছিল : "Did Buddha say that the many was Real and the ego unreal, while orthodox Hinduism regards the One as the Real, and the many as unreal?" উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন : "Yes. And what Ramakrishna Paramahansa and I have added to this is that many and the One are the same Reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes."[১৫] এক ও বহুর মধ্যে এই অভিন্নতার উপলব্ধিই নয়া বেদান্তের মূলসূত্র এবং এই জীবনবেদ হ'লো নবজাগরণের যুগে দুই লোকোত্তর পুরুষের সম্মিলিত অবদান। এই কারণে নয়া বেদান্ত আন্দোলনকে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন' ব'লেও অভিহিত করা হয়।

হিন্দুধর্মের জাগৃতির ওপর বিখ্যাত গবেষক ডি. এস. শর্মা নয়া বেদান্ত বা ফলিত বেদান্তের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রেছেন : (ক) বিশ্বজনীনতা (universality), (খ). নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) (গ) যুক্তিসিদ্ধতা (rationality), (ঘ) উদারমনতা (catholicity) এবং (ঙ) আশাবাদ (optimism)।[১৬] আমরা 'আশাবাদের' পরিবর্তে 'মানবতা' (humanism) ব্যবহার ক'রে এবং 'গণতন্ত্র' (democracy) ও ব্যবহারিকতা (practicality) —এই দুইটি নূতন বৈশিষ্ট্য যোগ ক'রে তালিকাটির কিছুটা হেরফের ক'রতে পারি। এক অর্থে ব্যবহারিকতাকে নয়া বেদান্তের সর্বপ্রধান লক্ষণ বা মূল উপাদান ব'লে গণ্য করা যায় এবং এজন্যই নয়া বেদান্তকে বলা হয় ফলিত বেদান্ত। এবার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ক। বিশ্বজনীনতা

বেদান্ত বিশ্বজনীন ধর্ম, কারণ বেদান্ত এই শিক্ষাই দেয় যে, সকল ধর্মের মূলনীতি সম্পূর্ণ অভিন্ন। তবুও যে ধর্মের ক্ষেত্রে ভেদ দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ হ'লো বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ এবং ধারণক্ষমতার পার্থক্য। এক চিঠিতে স্বামীজী তাঁর এক পরিচিত মুসলমান ভদ্রলোককে লিখেছিলেন, "Mankind ought to be told that religions are but the varied expressions of THE RELIGION, which is Oneness, so that each may choose the path that suits him best."[১৭] ব্রাহ্মসমাজের সারগ্রাহী ধর্ম (electicism) বা আর্যসমাজের প্রকারভেদ-নিরপেক্ষ বেদবিহিত ধর্মের (Vedicism) সঙ্গে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিশেষ লক্ষণীয়। এখানে মনে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী : ঈশ্বরকে সাকার ও নিরাকার দুই ভাবেই দেখা যায়।

আবার, বহুর মধ্যে একের সন্ধান—হিন্দুধর্মের এই শাশ্বত আদর্শপ্রচারে স্বামী বিবেকানন্দ আধা-বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে

---

১৫ Nevedita : The Master as I saw Him এবং Aggressive Hinduism

১৬ Sarma : Studies in the Renaissance of Hinduism in the Nineteenth and Twentieth Centuries

১৭ C. W., IV

কখনও অলৌকিক শক্তি বা কুসংস্কারের সমর্থন করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত, যাঁরা এরূপ করেছেন তাঁরা ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির বা হিন্দুধর্মের ক্ষতিই করছেন এবং দুর্বল জনগণকে দুর্বলতর ক'রে তুলছেন। সুতরাং তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এইসকল অলৌকিকতাকে পরিহার করে শক্তির আরাধনা করতে এবং তার জন্যে বলদায়ী, সমুজ্জ্বল জীবনদর্শন উপনিষদে ফিরে যেতে।[১৮]

নয়া বেদান্তের এই বিশ্বজনীনতা হ'লো ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এক নূতন পথের নির্দেশ এবং তখন থেকে এই পথেই ধর্মসংস্কার-আন্দোলন চলছে বলা যায়।

খ। নৈর্ব্যক্তিকতা

দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত কতকগুলি মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন ঐতিহাসিক পুরুষের জীবনীর উপর নয়।[১৯] অর্থাৎ, বেদান্ত নৈর্ব্যক্তিক। এই বৈশিষ্ট্যের দরুন বেদান্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ছাড়াও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব করে। স্বামীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, এই রকম কোন নৈর্ব্যক্তিক ধর্মই শুধু ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মসমাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে সমর্থ।

গ। যুক্তিসিদ্ধতা

তৃতীয়তঃ, বেদান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ জীবন-দর্শন। সুতরাং আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। মাত্র বেদান্ত-বিশ্বাসীর পক্ষেই আধুনিক জড়বিজ্ঞানসমূহের তত্ত্বের সঙ্গে ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন সম্ভব।[২০] ভগিনী নিবেদিতা বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: **"All knowledge is sacred. In the truth that has been snatched from the abyss, it is not for us to say what is more and what is less binding. Mathematics is also of God's. Men of science are also Rishis."**[২১] কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. টি. এম্ব্রি (A. T. Embree) বলেছেন: ভারতে যখন বিখ্যাত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুবর্তিতাকে আমাদের চিরন্তন ধর্মীয় মূল্যমানের ওপর আক্রমণ ব'লে প্রচার করছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তখন এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ; সুতরাং পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলে ভারত সবলই হবে, দুর্বল নয়।[২২] স্বামীজীর নিজের ভাষায়, "আধুনিক জড়বাদীরা যদি বেদান্তের সিদ্ধান্ত-সমূহ গ্রহণ করেন তবে তাঁরা তাঁদের তত্ত্ব-সমূহকে অবলম্বন করে থাকতে পারবেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পথেও পদসঞ্চার ক'রতে পারবেন।"[২৩]

বেদান্তের প্রধান সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হ'লো জীবন সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ (unity of the existence)। এই ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত জীবনকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলতে বাধ্য। কারণ এই মূল সিদ্ধান্তের

১৮ My Plan of Campaign (C. W. III)

১৯ The Mission of the Vedanta (C. W. III)

২০ Ibid

২১ Religion and Dharma

২২ C. V. (Centenary Volume)

২৩ The Mission of the Vedanta

অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত হ'লো সৌভ্রাত্র বা সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধে একাত্মবোধ।

এই অনুসিদ্ধান্তকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হ'লে যুগ যুগ ধরে যে স্বৈরাচার শোষণ পীড়ন চলে আসছে তার অবসান ঘটবে এবং ফলে সমাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এক সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা বা সমবায়ী সাধারণতন্ত্র (a cooperative commonwealth)। অতএব বেদান্ত বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার মুক্তিসাধন ক'রে নৈতিক সূত্রসমূহের দার্শনিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। জীবন সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ মেনে নিলে কেন আমি প্রতিবেশী বা পরদেশীকে ভালবাসব, তার কারণ খুঁজতে হয় না। এইভাবে একই সঙ্গে সমাজচেতনা ও প্রজ্ঞার মুক্তিসাধন বেদান্তের মাধ্যমেই সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই রমাঁ রোলাঁ বেদান্তকে 'বিশ্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম' (universal science-religion) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২৪]

(ক্রমশঃ)

---

২৪ Romain Rolland : Prophets of the New India

শ্রীরামকৃষ্ণঃ

শ্রীসুধীরকুমার কর

যো রামশ্চ হি কৃষ্ণশ্চ
রামকৃষ্ণো হি প্রেমতঃ।
সকৃৎ স্মৃতে পদে যস্য
কৃষ্ণতা শ্বেততাং গতা ॥
যো নরাণাং চিরং ত্রাতা
যো মোহকাম-নাশনঃ।
যো নট রসিকস্তস্মৈ
নমঃ সুশিল্পিনে নমঃ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

Six Systems of Indian Philosophy-র ভূমিকায় Max Muller বলেছেন: "Vedanta philosophy [is] a system in which human speculation seems to me to have reached its very acme. "আমার মনে হয় বেদান্ত-দর্শনই মানুষের বিচারের সর্বোচ্চ শিখর।" কাজেই তারপর দূর থেকে যতটুকু তিনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন তাতে রামকৃষ্ণের দর্শনকে পূর্বোক্ত চিন্তার শিখরকে ছাড়িয়ে যাবার মতো কিছু বলে তাঁর মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। তাই Max Muller থেকে শুরু ক'রে রামকৃষ্ণের দর্শনকে বেদান্ত-দর্শনের (বিশেষ ক'রে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত) আলোকেই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে এবং তাঁর সাধন-মালিকার একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন হিসাবে তন্ত্র-দর্শনেরও সহায়তা নেওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান-লাভের সমস্যা সম্বন্ধে দু-একটি কথা এখানে আলোচনা করা যাক। মনে হতে পারে, একটি বিষয়ে জ্ঞানলাভের অর্থ হল আমাদের জ্ঞানজগতের (অর্থাৎ এতাবৎ আহৃত জ্ঞান-সঞ্চয়ের) মধ্যে এই বিষয়টির স্থান নির্ণয় করা। আমি কলকাতা শহর চিনি; উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম অনেকবার ঘুরেছি। কিন্তু একটি নতুন রাস্তার কথা শুনলাম—যে রাস্তায় আমি কখনও যাইনি। জেনে নিলাম কলকাতার কোন অঞ্চলে, কিভাবে যেতে হয় ও অন্যান্য বর্ণনা এবং গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু এমনও হতে পারে যে. রাস্তাটি আদৌ কলকাতায় নয়, হাওড়ার শহরে। তখন কলকাতা থেকে হাওড়ায় যাবার জন্যে আমায় হাওড়ার সেতুর সাহায্য নিতে হবে এবং রাস্তাটি খুঁজে বার করতে হবে। এখন আমরা যদি মনে করি, কলকাতা মস্ত শহর, অতএব এ-রাস্তা কলকাতায়ই হবে এবং এই বলে বর্ণনা অনুসারে খুঁজতে থাকি তবে হয়ত ঐ রকম (মিল আছে এমন) কোনও রাস্তা খুঁজে পাব, কিন্তু তা যে রাস্তা চাই তা হবে না। **The Nature of Thought** গ্রন্থে Brand Blanshard কিন্তু ঐ দ্বিতীয় উপায়ে জানবার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন: "We think to solve problems, and our method of solving problems is to build a bridge of intelligible relation from the continent of our knowledge to the island we wish to include in it."—"আমরা সমস্যা-সমাধানের জন্য চিন্তা করি, এবং আমাদের সমস্যা-সমাধানের পদ্ধতি হল আমাদের সঞ্চিত জ্ঞানের মহাদেশ থেকে যে অজানা দ্বীপটিকে আমরা আমাদের জ্ঞানের মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই সে পর্যন্ত বোধগম্য সংযোগের একটি সেতু গড়ে তোলা।" অতএব আমাদের প্রথম পদ্ধতি ছেড়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিই নিতে হবে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে বোঝবার জন্য। ধরে নিলে হবে না যে, পরিচিত দর্শনরাজ্যের মধ্যে তাঁর স্থানটি আবিষ্কার করাই আমাদের কাজ। মনে রাখতে হবে পূর্বোদ্ধৃত Hopkins-এর কথা: "What he hands on to posterity is the old religion plus himself." এই plus-টির

জন্যই সংযোগ-সেতুর প্রয়োজন, জানা জগতে খুঁজলেই শুধু হবে না।

সমাজদর্শনের ক্ষেত্রে জীবসেবায় এগিয়ে চলা ঠিকই। কিন্তু সেই একমাত্র এগিয়ে চলা নয়। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ—রামকৃষ্ণ বলেছেন। মানুষের সঙ্গে আর সব কিছুর তফাত তার ধর্মবোধে, এ কথা সকলে স্বীকার না করলেও তার বৈশিষ্ট্য যে তার বুদ্ধি—এ বিষয়ে কোনও মতান্তর নেই। সে তার বুদ্ধি দিয়ে চায় সব কিছুকে অধিকার করতে বস্তু-জগতে, মনোজগতে। আর এই সব কিছুকে পাওয়াও ঈশ্বরলাভ কারণ, একে পেলে আর অন্য কোনও পাওয়াকে এর চেয়ে বড় মনে হয় না। সব পাওয়ার চেয়ে আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে মানুষের? মানুষের বিশুদ্ধ মনই একমাত্র এ পথের সহায়। তাই ব্যক্তিই তাঁর প্রদর্শিত পথে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নৈতিক প্রচার, সমাজসংস্কার বা জাতিগঠনের মতো বড় বড় প্রকল্প দেখা যায়নি তাঁর কাছে। আর একই কারণে মানুষের স্বাতন্ত্র্যও তাঁর কাছে পেয়েছে সম্মান—যারই পরিণতিস্বরূপ তাঁর "ধর্মীয় গণতন্ত্র"। বহুর মধ্যেই যে সেই এক, কি ক'রে সেই একের প্রকাশমালার বহুকে অস্বীকার করা যায়? "এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়ীতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার পেটে যা সয়।...মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।...যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। শাস্ত্র বললেন: "উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' কেউ হয়ত অর্থ করলেন, "ব্রহ্মের যখন আসলে কোনও রূপ নেই, তখন উপাসক কাজের সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করেন।" তা কেন? রামকৃষ্ণ বললেন, "নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এসব করেছেন।" তন্ত্র এখানে রামকৃষ্ণকে সায় দিয়ে স্পষ্ট বলবেন: "সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।" সন্দেহ রইল না কিছু· সাধকের জন্য অরূপ যিনি তিনিই রূপপরিগ্রহ করলেন, না সাধকই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করলেন। কারণ এমন হলে দোষস্খালনের জন্য আবার বলতে হবে, "ধ্যানে রূপবিবর্জিতের রূপ বর্ণন করে হে রূপহীন, তোমার যে বিকলতা করেছি তার জন্য ক্ষমা করো।" তবে কি অসত্য থেকে সত্যে যাওয়া হয় না? তাও কি সম্ভব? রামকৃষ্ণ বলবেন, রূপে রূপে প্রতিরূপে অরূপা রূপধারিণী। "কি রকম জানো? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূলকিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ-আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না।" তিনি নিরাকার, আবার সাকার, আবার তাঁর কথা বলা যায় না। এ যেন জৈন দর্শনের[১] সপ্তভঙ্গি নয়ের সপ্তম ভঙ্গি—'স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ, অবক্তব্যম্ চ।' কোনও ভাবে তিনি আছেন (সাকার সগুণ), কোনও ভাবে তিনি নেই (নিরাকার নিগুর্ণ), আবার কোনও ভাবে তাঁর স্বরূপ অপ্রকাশ্য। সাকারের থেকে নিরাকার বেশী সত্য বা পারমার্থিক দৃষ্টিতে সাকার মিথ্যা, নিরাকারই সত্য, সাকারের একটা কাজ চলা সত্যতা আছে এমন নয়। রামকৃষ্ণের পরমার্থ-দৃষ্টিতে সাকারও যেমন সত্য

১ লেখকের 'জৈন পরামর্শবাদে উদারতা', বিশ্ববাণী, ১৩৭৩, পৃঃ ৫৫৮।

নিরাকারও তেমন সত্য, সগুণ যেমন সত্য নির্গুণও তেমন সত্য, দ্বৈতও সত্য অদ্বৈতও সত্য, আবার দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত ভাবও সত্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব, কিন্তু তা একান্ত হবে কেন? আমার দেখার ওপর নয়, সেই তত্ত্বই বিভিন্ন রূপে দেখা দেন, তিনি এক হলেও অনেকান্ত। এই হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব বিষয়ে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (realist), বিজ্ঞানবাদী নন। আমরাও রামকৃষ্ণকে দেখার সময় আমাদের জ্ঞান তাতে আরোপ করে একান্ত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে চাই না [২] সেই ইঙ্গিতই প্রবন্ধের প্রারম্ভে দেওয়া হয়েছে।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোনও কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপভেদ।" এই হল রামকৃষ্ণের কালীব্রহ্ম-রূপ অদ্বয়তত্ত্ব। ব্রহ্ম নিত্য, কালী লীলাময়ী। যাঁর নিত্য, লীলা যদি তাঁরই না হয় তবে তত্ত্ব অদ্বয় হয় না। এই লীলারূপিণীকে যদি মায়া বলা যায়, তবে সে ব্রহ্মমায়া ব্রহ্মের মায়া নয়, ব্রহ্মই মায়া। রামকৃষ্ণ তাঁকেই মহামায়া বলেছেন। মহামায়া আবরণ- ও বিক্ষেপ-শীলাই ন'ন, তিনি মুক্তিদায়িনীও। আদ্যা-শক্তিতে অবিদ্যা বিদ্যা। অবিদ্যা যেমন কামক্রোধাদি দ্বারা মুগ্ধ করেন, বিদ্যা তেমন বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে মুক্তিপথে চালিত করেন। "তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।" কাজেই শক্তি বা কালীর মত জীব-জগৎও সত্য, তবে এরা লীলা, তাই শাশ্বত নয়। শাঙ্কর বেদান্তমতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে এরা মিথ্যা, কেননা অবিদ্যাপ্রসূত। "This has been called the weak, the human the vulnerable point in the Vedanta."—(Max Muller). "এইটেই বেদান্তের দুর্বল, মানবীয়, ভঙ্গুর অংশ।" কিন্তু রামকৃষ্ণের সবল অদ্বয় শক্তি-তত্ত্বে এমন অংশ নেই। রামকৃষ্ণ-দর্শনে পরমার্থ ভিন্ন ব্যবহার নেই, তাই দৃষ্টিরও দ্বৈত নেই। ব্যবহারের সত্য আর পরমার্থের সত্য সেখানে ভিন্ন নয়। অথচ এ শক্তিতত্ত্বে ব্রহ্মই শক্তি বলে তন্ত্রদর্শনের শিব-শক্তির মিথুনতত্ত্বের থেকে এর অদ্বয়তত্ত্ব ভিন্নশ্রেণীর।

এই সব আলোচনায় সহজেই মনে হয় তাঁর চিন্তায় এ সকল বিরোধের সমন্বয় হয়েছে। এখানেও কয়েকটি কথা ভাববার আছে। প্রথমতঃ, যা আগেই আমরা বলেছি স্পষ্ট করে, তাঁর দর্শন চিন্তাপ্রসূত (speculation) নয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি (direct experience) তাঁর সহজ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই তাঁর সমন্বয় চিন্তায় নয়। দ্বিতীয়তঃ, সমন্বয় বললে আমাদের অনেক সময় মনে হয়—কতকগুলি খাপ খায় বা খাপ খায় না এমন বিষয়কে মিলিয়ে দেওয়া; বাঘে গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে দেওয়ার মত একটা কিছু বাহাদুরী। তাই 'রামকৃষ্ণ সমন্বয় করেছিলেন'—এমন প্রস্তাবকে আমরা একটু সাবধানে ব্যবহার করব। সত্যই কিন্তু এত প্রকারের পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ও বিষয় তাঁর দৃষ্টির আলোকে সমন্বিত হয়েছে যে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সব চেয়ে বড় উদাহরণ

২ লেখকের 'স্বামী অভেদানন্দের বেদান্তদৃষ্টিতে ধর্ম', বিশ্ববাণী, ১৩৭৪, পৃ: ৪৪২-৪৩

সর্ব-ধর্ম-সমন্বয় এর মানে এই নয় যে, সব ধর্মকে এক ঘাটে নিয়ে এলেন তিনি তো বলেইছেন—বিভিন্ন ঘাট দিয়ে নামলেও একই জলকে পাওয়া যায়। এ সমন্বয়ের মানে প্রত্যেক ভিন্ন ঘাটকে স্বীকার করা। এক ঘাটে জল খাওয়ানো নয়। সব ধর্ম তুলে তুলে তোড়া বাঁধা নয়। প্রত্যেক ধর্মের চরম অনুভূতি লাভ করে তার সত্যতা তিনি জেনেছিলেন, তাই প্রত্যককেই তিনি স্বীকার করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু কিছু পড়লে এ সমন্বয় হয় না। যেমন বিবেকানন্দ বলতেন, "খানিকক্ষণ বসে নাক টিপলে, খানিক পূজা করলে. খানিক কাজ, করলে আর খানিক বললে 'সোঽহম্'—তা হলেই যোগ-সমন্বয় হয়ে যায় না।" তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণের দার্শনিক তত্ত্বসমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অর্থে একটু ভিন্নতা আছে। সেখানে সমন্বয়ের অর্থ—সকল তত্ত্ব ভিন্নভাবে সত্য এমনই মাত্র নয় বা সকল তত্ত্বের সমাহারই (combination) তত্ত্ব-সমন্বয় নয়। বিসদৃশ তত্ত্বের সামঞ্জস্য-বিধান বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া. যেট রামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে পূর্বাবধি আমরা অপ্রযুক্ত বলেছি। আর বৌদ্ধিক সামঞ্জস্য-বিধানে তত্ত্বের প্রকৃত সমন্বয় হয় না, তাদের মাঝে ফাটল থেকেই যায়। বিচারের সামান্য হেরফেরেই তত্ত্ব বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তাই আমরা বলতে চাই না, রামকৃষ্ণ দর্শন-সমন্বয় করেছিলেন, কিন্তু দেখি যে তাঁর সাধনানুভূত তত্ত্বে বহু ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বই বিধৃত, আশ্রিত, সমন্বিত। সমন্বয়-তত্ত্বে বহু সমন্বিত তত্ত্বকে দেখা গেলেও সমন্বয়-তত্ত্বকে ভেঙে সেগুলিতে আসা যায় না। অর্থাৎ সমন্বয় যৌগিক নয়, সে প্রত্যেক সমন্বিত তত্ত্বের মতই মৌলিক, নিত্য অভিনব। সে বৌদ্ধ মিলিন্দ-পঙ্‌হোর রথের মতো। রথচক্র, রথাশ্ব, আসন - এদের কোনটিই রথ নয়, আবার এদের সমাহারমাত্রই রথ নয়। এদের সব কিছুর ওপর আরও কিছু নিয়েই রথ, যা চলমান। এই প্রকার সমন্বয়েই রামকৃষ্ণের রামকৃষ্ণত্ব। এইখানেই সার্থকতা শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেই কথার : এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তের পারে যায়! গ্রন্থের গ্রন্থি এঁদের বাঁধে না। এঁদেরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

"তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।"

প্লাবনের সময় যেমন কূপোদকের সার্থকতা, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছেও বেদাদি শাস্ত্র দর্শনাদি গ্রন্থের তেমনই প্রয়োজনীয়তা। তাঁদের দর্শন এসবের পারে যায়

বিদ্যাসাগর

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধশততম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে নানাভাবে তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ হইতেছে। আমরাও কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাই। বিদ্যাসাগরের মতো শক্তিমান পুরুষ ভারতবর্ষে বিরল জন্মিয়াছেন। মহাপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন: "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোট দেখাইবার যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ঐ গ্রন্থখানি একবার সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙ্গালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উন্নত চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।"

এই অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনের নানা দিক আলোচনা করিলে ইতি করা যায় না। আমরা প্রধানতঃ তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এস্থলে প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন: বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাসবান ছিলেন না; নচেৎ এত বড়ো পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন উক্তি তিনি করেন নাই কেন? বস্তুতঃ প্রাজ্ঞের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্র এ সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই বলিয়াছেন, "যে লোক শিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। · ভগবানলাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়।··· উপদেশ দেওয়া যায়। লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন তা হলে হতে পারে।"

বিদ্যাসাগর বালকদের পাঠ্যপুস্তক 'বোধোদয়' রচনা করেন। ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা না থাকায় কেহ কেহ বইটির ত্রুটি ধরিয়া বলেন,—অল্পবয়সে পাঠ্য-পুস্তক হইতে ঈশ্বরের কথা না শুনিলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইবে কি করিয়া?" যাহা হউক এসব শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তী সংস্করণে বইটির প্রথমেই ঈশ্বরের কথা লিখিলেন: ঈশ্বরের দয়ার সীমা নাই। তিনি না চাহিতে আমাদিগকে সকল জিনিস দিয়াছেন —ইত্যাদি। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন: "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।" কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বেদান্তদর্শনকে বিদ্যাসাগর 'ভ্রান্ত দর্শন' বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কোথায় এরূপ উক্তি আছে জানি না। এমন কি 'লাল কিল্লা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসেও বিদ্যাসাগরের এই উক্তির কথা এক জনের মুখ দিয়া বাহির করা হইয়াছে। নাস্তিকতার কথা আলোচনায় এ যুগে অনেকেই উৎফুল্ল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক স্কুলে শ্রীমহেন্দ্র-নাথ গুপ্ত শিক্ষকতা করিতেন। তিনি তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' 'শ্রীম' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। 'শ্রীম' শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের বিশিষ্ট ভক্ত। তিনি পরমহংস-দেবের নিকট খুব যাতায়াত করিতেন। তাহার

ফলেই দিনলিপি হইতে 'কথামৃত'-রচনা সম্ভবপর হইয়াছে। ঐ গ্রন্থই আমার এ প্রবন্ধে প্রধান উপাদান। ধর্মপরায়ণ গুণী জ্ঞানী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের নিকটবর্তী ছিল। 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাসাগরকে দেখিবার বড় সাধ হয়। শ্রীম বা মাস্টারকে একথা ঠাকুর বলিলে তিনি সকল ব্যবস্থা করিলেন—বিদ্যাসাগরকে শ্রীম আগেইএবিষয় জানাইয়াছিলেন। গাড়ী করিয়া মাষ্টার কতিপয় ভক্তসহ ঠাকুরকে লইয়া বিদ্যাসাগরের দ্বিতল গৃহের উপর তলায় সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কামরায় প্রবেশ করিলে বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২।৬৩, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসর বড় হইবেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিলেন। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন। তারপর ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল। মিষ্টিমুখের পর ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সহিত হাস্যমুখে কথা আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ সাগরে এসে মিললাম। এত দিন খাল, বিল, হৃদ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো! নোনা জল কেন? তুমি ত অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! ক্ষীরসমুদ্র।

বিদ্যাসাগর। তা বলতে পারেন বটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয় দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছ; এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তুমি ত

বিদ্যাসাগর। মহাশয়, কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আলু পটোল সিদ্ধ হলে ত নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। তোমার কত দয়া! (হাস্য)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। কলাইবাটা সিদ্ধ ত শক্তই হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকোচা পড়া! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে। তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ব্যাকরণ দর্শন ইত্যাদিতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইংরেজী বিশেষজ্ঞের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। হিন্দী ভাষাও তিনি জানিতেন।

সকলেই জানিত বিদ্যাসাগর কাহাকেও ধর্ম-শিক্ষা দিতেন না। শ্রীম একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হিন্দুদর্শন আপনার নিকট কিরূপ বোধ হয়?' বিদ্যাসাগর উত্তর করেন, 'আমার ত বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।' কিন্তু এই বলিয়া বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত দর্শন বলিয়া তিনি অভিহিত করিবেন, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। বিদ্যাসাগর ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমুদায় করিতেন। গলদেশে ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ করিতেন। তাঁহার লেখা যে-সকল পত্র সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলির প্রত্যেকটির শিরো-দেশে 'শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্'—ভগবানের এরূপ প্রশস্তি লিখা রহিয়াছে।

শ্রীম বিদ্যাসাগরকে আর একদিন জিজ্ঞাসা করেন—ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা? বিদ্যাসাগর তদুত্তরে বলেন, "তাকে ত জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যাবে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা বলিতে বলিতে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড়দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। ··· ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না। ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর—(বন্ধুদের প্রতি) বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

এরূপ অনেক উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা বলিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরকে বলেন—"তাঁকে কি বিচার ক'রে পাওয়া যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁকে ডাকো। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) আচ্ছা, তোমার কি ভাব?"

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন,—"আচ্ছা, সেকথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না।" এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন—'কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন।'

সকলে অবাক হইয়া নীরবে সব শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জিহ্বায় অবস্থিত থাকিয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া লোকের হিতের জন্য কথা কহিতেছেন। রাত্রি নয়টা বাজে। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব এখন বিদায় নিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) এ যা বললুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে—বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর—(সহাস্যে) তা আপনি বলতে পারেন। [কথামৃত, ৩য় ভাগ]

অতঃপর একদিন এক ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, বিদ্যাসাগরকে

দেখেছেন—কি রকম বোধ হ'লো ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাহিরের কাজ যা কচ্চে সে সব কম পড়ে যেতো ; শেষে একবারে ত্যাগ হ'য়ে যেতো। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন—একথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান-চিন্তায় মন যেতো। কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐ দিকে মন যায়, ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়। [কথামৃত, ২য় ভাগ]

মাষ্টার মশায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরও কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীম (ভক্তদের প্রতি)—"আহা, বিদ্যাসাগর মশায় কি কথাই না বলেছিলেন! বলতেন, 'ঈশ্বর তো আমাদের পিতা।'…কি বিশ্বাসের কথা! [শ্রীম-দর্শন, ৫ম ভাগ]

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাসাগরের এরূপ জ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি কাহাকেও ধর্মোপদেশ দিতেন না। তাহা বলিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা যায় না। তিনি মূর্তিপূজারও বিরোধী ছিলেন না। তবে পূজার চেয়ে যে লোকের প্রতি দয়াপ্রদর্শন অধিক সমীচীন একথা তিনি কখন কখন মনে করিতেন। একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মা, বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা ভালো ?" ইহা শুনিয়া জননী উত্তর করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" (বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লিখিত 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত')।

শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া প্রথমেই যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥

বৃক্ষবল্লরী প্রাণ ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু সে-ই প্রকৃতভাবে জীবিত, যে মননের দ্বারা বাঁচিয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের মুখ্য জীবন ছিল মননজীবন, তাই তিনি গতানুগতিকভাবে চলিতেন না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : "বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ছিলেন না ; তিনি স্বতন্ত্র সচেতন পারমার্থিক ছিলেন। …আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না ; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য আর সেসব উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল না থাকিলে জনসনের মনুষ্যত্ব লোক-সমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে।" সুখের বিষয় বিদ্যাসাগরের অনেক তথ্যপূর্ণ জীবনী এ বৎসর প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার প্রকৃত স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপসংহারে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন নিষ্কাম কর্মী—কর্মযোগী, প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ —এ যুগের দধীচি।

যীশুর প্রেম ও করুণার একটি কাহিনী

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

লোকোত্তর মহাপুরুষগণ প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁরা সপ্রেম দৃষ্টি, করুণা, দিব্যস্পর্শ, এমন কি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অন্যের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার ক'রে জীবনের গতি আমূল পরিবর্তিত করতে পারেন। তাঁরা কৃপাপরবশ হয়ে কত পাপী-তাপীকেই না উদ্ধার করেছেন! মেরি ম্যাগ্‌ডালেনের প্রতি কৃপা যীশুখ্রীষ্টের জীবনের একটি বিস্ময়কর কাহিনী।

ভোগবিলাসপরায়ণা কলঙ্কিনী মেরি ম্যাগ্‌ডালেন ইহুদী সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয়া ছিলেন এ নারী নিজের পাপ-জীবনের জন্য অনুতপ্তা হ'য়ে পরম কারুণিক যীশুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং যীশুর কৃপায় খৃষ্টান জগতে সাধ্বী (saint) পদবীতে উন্নীতা হন।

সাধ্বী ম্যাগ্‌ডালেনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করার জন্য সমগ্র খৃষ্টান জগতের রোমান্ ক্যাথলিক গির্জাগুলিতে জুলাই মাসে একটি ভোজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবে খৃষ্টানগণ পাপের বিষময় পরিণাম, প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুশোচনার ফল এবং প্রভু যীশুর অসীম প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ মনন ও অনুধ্যান ক'রে থাকেন।

পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করো না—এটি সকল ধর্মশাস্ত্রের চিরন্তনী বাণী, সকল মহাপুরুষের উপদেশ। যীশু পাপকে অতি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন, পাপের বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, উদ্ধত পাপীদের প্রতি অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন আবার প্রকৃত অনুতাপীদের প্রতিও অপার্থিব প্রেম ও করুণা দেখিয়েছেন।

যীশু বলেছেন: যে-কেহ পাপ করে, সে-ই ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করে, কারণ পাপানুষ্ঠান মাত্রই ঈশ্বরের নিয়ম-লঙ্ঘন। যে-কেহ পাপ করে, সে-ই ঈশ্বরকে দেখেনি এবং জানেনি। যে পাপ অনুষ্ঠান করে, সে শয়তান, কারণ শয়তান সৃষ্টির আদি থেকেই পাপ করে।

যীশুর ধর্ম অনুশোচনার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। পাপ ক'রে পাপের অসারতা ও ব্যর্থতা প্রাণে-প্রাণে উপলব্ধি করার পর ঠিক ঠিক অনুতপ্ত হলে এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলে শরণাগতকে ঈশ্বর উদ্ধার করেন। খৃষ্টানগণ বিশ্বাস করেন—যীশু মহান পরিত্রাতা, তিনি জগতের পাপ-তাপ হরণ করবার জন্যই আবির্ভূত হয়েছেন। যীশু বলেছেন: যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, ঈশ্বর ন্যায়- ও করুণাপরবশ হয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদের সমস্ত অধর্ম থেকে পরিত্রাণ করেন।

নিউ টেস্টামেন্টের ল্যুক-লিখিত সুসমাচারে (Gospel) মেরি ম্যাগ্‌ডালেনের দীক্ষার অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত আছে। প্রায় দু'বছর ধর্ম-প্রচারের পরই যীশুর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তাঁকে ঈশ দূত ব'লে স্বীকার করতে আরম্ভ করে।

সাইমন নামে জনৈক ফারিসি (Pharisee) যীশুর সঙ্গে ভোজন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। যীশুকে সেবা করবার অথবা তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাবার কোন অভিপ্রায় সাইমনের

ছিল না। যীশুর পবিত্র উপস্থিতিতে তার গৃহ বহুমানিত হবে—এ অভিপ্রায়েই সাইমন যীশুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে যীশু সাইমনের গৃহে এসে ভোজনে বসলেন। সাইমন কিন্তু যীশুর মতো একজন মর্যাদাসম্পন্ন অভ্যাগতের যথোচিত সম্মান ও সংবর্ধনার কোন আয়োজনই করেনি। যীশুর সেদিকে বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি সাইমনের গৃহে গিয়েছিলেন সেবা করতে, সেবা গ্রহণ করতে যাননি। সম্মানলাভের প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। অতিথি গৃহস্বামীর সঙ্গে খট্টায় বসে ভোজন ও কথাবার্তায় সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নগরবাসিনী জনৈকা অর্থসম্পন্না কলঙ্কিনী নারী সাইমনের গৃহে যীশুর শুভাগমন-সংবাদ শুনে স্পাইকনার্ড (spikenard) নামক বহুমূল্য সুবাসিত তেলের একটি পাত্র হাতে ক'রে সেখানে উপস্থিত হন। স্ত্রীলোকটি গৃহে প্রবেশ করেই যীশুর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অবিরল অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন। তাঁর দরবিগলিত অশ্রুধারায় প্রভু যীশুর পদযুগল সিক্ত হ'ল। স্ত্রীলোকটি তাঁর দীর্ঘকেশ দ্বারা যীশুর পদযুগল মুছে দিলেন এবং সুবাসিত তেল মাখিয়ে পদচুম্বন করতে লাগলেন।

সাইমন এ অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে মনে মনে ভাবতে লাগল: এ লোকটি যদি ঈশ্বরের বার্তাবহ হতেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই জানতেন স্ত্রীলোকটি কে এবং তার চরিত্র কিরূপ; তিনি কিছুতেই এ পাপীয়সী-প্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্য ও সেবা গ্রহণ করতেন না। এ স্ত্রীলোকটির কলঙ্কিত চরিত্রের কথা কে না জানে?

যীশু স্ত্রীলোকটির দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাইলেন এবং সাইমনকে বললেন: সাইমন, স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য কর। আমি যখন তোমার গৃহে প্রবেশ করেছিলাম তখন তুমি আমায় পা ধোয়ার কোন জল দাওনি, কিন্তু এ স্ত্রীলোকটি তার চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে পরে নিজের মাথার চুল দিয়ে মুছে দিয়েছে। তুমি আমার পদচুম্বন করনি, কিন্তু তোমার গৃহে আসা অবধি এ স্ত্রীলোকটি আমার পদচুম্বন করতে ক্ষান্ত হয়নি। তুমি আমার মাথায় তেল মাখাওনি, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি বহুমূল্য সুবাসিত তেল দিয়ে আমার পা দুখানি লেপন করেছে। এজন্য তোমাকে বলি, এ স্ত্রীলোকটির বহু পাপ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ক্ষমা করেছি, কারণ সে আমাকে অধিক ভালবেসেছে এবং শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু যে অল্প ভালবাসে ও অল্প শ্রদ্ধা করে, তাকে অল্পই ক্ষমা করা যায়।

একথাগুলি ব'লেই যীশু প্রেম-ও করুণা-বিগলিত কণ্ঠে মেরি ম্যাগ্‌ডালেনকে বললেন: মেরি, তোমার সকল পাপ ক্ষমা করলাম। তোমার বিশ্বাস তোমাকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছে। তোমার কল্যাণ ও শান্তি হোক্‌। ভোজগৃহে যারা বসেছিল তারা সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে মনে মনে বলতে লাগল: এ ব্যক্তি কে, যিনি পাপসকলও ক্ষমা করেন?

এভাবে যীশুর অশেষ কৃপায় ম্যাগ্‌ডালেন যীশুর ধর্মে দীক্ষিতা হন। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হ'য়ে গেল! যীশুর দিব্যস্পর্শে ও সপ্রেম কটাক্ষে মুহূর্তমধ্যে কলঙ্কিনী মেরি ভক্তিমতী সাধ্বী মেরিতে পরিণতা হলেন।

পরবর্তী জীবনে মেরি ম্যাগ্‌ডালেন মহীয়সী খৃষ্টান নারীদের সঙ্গে সম্মিলিতা হয়ে উপযুক্তা শিষ্যার মতো যীশুর ধর্ম প্রচার করেন। যীশুর শেষকৃত্যের সময় তিনি বহুমূল্য বস্ত্র ও প্রসাধন-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। কথিত

আছে, যীশুকে কবর দেওয়ার পর ভক্তিমতী শিষ্যা মেরি একাকিনী কবরের নিকট দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং মাথা নত ক'রে নিম্ন-দিকে চেয়েই দেখতে পান যীশু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন: মেরি, কেঁদো না; আমি সকলের পিতা ভগবানের নিকট চলে যাচ্ছি—সকলকে একথা বলো। আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদাই আছি। তোমরা স্বর্গস্থ পিতা, ঈশ্বরপুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে আমার শিক্ষা প্রচার কর।

আন্তরিক বিশ্বাস, প্রেম ও ব্যাকুলতার বলেই মেরি যীশুর এরূপ দর্শনলাভ ক'রে কৃতার্থা হয়েছিলেন। যে রত্ন একদা কর্দমে আচ্ছাদিত ছিল, তাই পবিত্রীকৃত হয়ে রাজ-রাজেশ্বর প্রভুর শিরোভূষণে স্থাপিত হবার উপযোগী হয়েছিল। মেরির পূর্বজীবনের সমস্ত কালিমাই অনুতাপের অশ্রুতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছিল। খৃষ্টান জগতে ঘোষিত হল: ভালবাসা যতই গভীর, ঈশ্বরের করুণা ও ক্ষমা ততই অধিক।

চিত্তশুদ্ধি

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ মিত্র

সুবর্ণে করিতে শুদ্ধ স্বর্ণকারগণ
বার বার অগ্নিতাপে করে সমর্পণ।
ভক্ত তাই ঈশ-পদে এ প্রার্থনা করে,
'অশুদ্ধ বলিয়া মোরে রাখিও না দূরে।
বিশুদ্ধ করিতে মোরে যতো প্রয়োজন
দুঃখের অনলে দেব, করিও দহন।
পরমেশ, পূর্ণ করো এই অভিলাষ—
আমারে করিয়া রাখ তব চিরদাস!'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

স্বামী চেতনানন্দ

মানুষ নানা রকম পদবী ক্রয় করে—কেউ অর্থের বিনিময়ে, কেউ বিদ্যার বিনিময়ে। উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়েই তদনুযায়ী পদবী লাভ করা যায়। চিত্তরঞ্জন দাশকেও 'দেশবন্ধু' পদবী ক্রয় করতে হয়েছিল ত্যাগের বিনিময়ে। তিনি ছিলেন ভারতের মধ্যে এক সেরা বিলাসী। শোনা যায় ফরাসী দেশ থেকে তাঁর জামাকাপড় কেচে আসত। তিনি স্বসুখেচ্ছা ও বিলাস ত্যাগ করে দেশের জন্য বিরাগী হলেন। শাস্ত্র বলেন—'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ' অর্থাৎ যিনি ত্যাগ (মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদ) সহ্য করতে পারেন না, তাঁকেই বন্ধু বলে। স্নেহের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা সমগ্র জাতিকে বাঁধতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দেশবন্ধু। 'দেশবন্ধু' বললে আর 'চিত্তরঞ্জন' নামের প্রয়োজন হয় না। দেশবন্ধু স্বমহিমায় মহীয়ান। তিনি 'একশ্চন্দ্রঃ'। তাঁর 'দুই-এ পক্ষ' নাই।

তিনি ছিলেন প্রকৃত নেতা। নেতা হতে গেলে নিজের 'শির' আগে বাড়িয়ে দিতে হয়। এ পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আইন-অমান্য আন্দোলনে তিনি নিজে কেবল কারাবরণে ক্ষান্ত হননি। তিনি সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী এবং ভগিনী উর্মিলাদেবীকেও কারাবরণে নিয়োজিত করেন। নিজে আচরণ করে সবাইকে দেখালেন। এই অভাবনীয় ব্যাপারে তদানীন্তন সমাজে খুব হৈ চৈ পড়ে গিছিল।

চিত্তরঞ্জনের জনপ্রিয়তা ছিল তুলনাহীন। পূর্ববঙ্গের লোকগীতিতে তাঁর নামের উল্লেখ আছে। বাংলার বাউলেরা দেশবন্ধুর উপর গান রচনা করে দুয়ারে দুয়ারে গেয়ে বেড়াত। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় দেশবন্ধুর মৃতদেহ যখন দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসে তখন এত লোকসমাগম ও এমন শোভাযাত্রা হয়েছিল, যা অন্য কারো বেলা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশে নাকি হয়নি।

এই মহা মনীষীর চরিত্রের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করব। বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় বলেন—'যে-সমস্ত শক্তিকেন্দ্র হইতে সমুৎসারিত ভাবধারায় স্বদেশী আন্দোলন পুষ্ট হইয়াছে—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়যুগ তাহার অন্যতম। ফেরঙ্গ সভ্যতার আঘাতে ও মোহে বিপর্যস্ত বাঙালী জাতিকে আত্মস্থ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়। এক শতাব্দী যাইতে না যাইতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায়, জাতি তাহার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত জাতীয় আদর্শকে অতি দ্রুত কেন্দ্রীভূত ও সংহত করিয়া লইল। বিবেকানন্দ সেই আদর্শের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন।'

এক কথায় বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের বুকে যত আন্দোলন—শিক্ষা-আন্দোলন, ধর্ম-আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রভৃতি মাথা তুলেছে—সে সবের উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা

স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কেহ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, কেহ করেননি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন দাশ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। সুতরাং ঐ সমাজের আবেষ্টনীতে লালিত হয়েও পরবর্তী জীবনে তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেন। ধর্ম বিষয়ে দেশবন্ধু উদারভাবই পোষণ করতেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অনুরাগী বন্ধু ছিলেন।

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন : 'আমি দেখিতেছি ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি সেই বাংলার প্রাণধর্ম ধীরে ধীরে কোমল লীলাচঞ্চল স্রোতের মত চলিতেছে। আজ ফেরঙ্গযুগেও বাংলা সেই ধর্মের আন্দোলন ভুলে নাই। কত শতাব্দী পরে আবার দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে বাঙ্গলার স্বভাবধর্ম যে প্রাণ মূর্ত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই সময়েই এই নগরোপ্রান্তে (ঢাকা) সেই অদ্বৈতবংশধর গোঁসাই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গেণ্ডেরিয়ার গহনবনে সেই প্রাণধর্মের মূর্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দেখিতেছি, পদ্মা-গঙ্গার লীলার স্রোত একই প্রাণের আন্দোলন।'

১৯১৭ সালে বাঙ্গলার রাজনৈতিক সম্মিলনীতে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ দেন—তার প্রায় প্রত্যেকটি কথাই নব্যভারতের মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দের বাণীর প্রতিধ্বনি : 'ঐ যে বাঙ্গালী কৃষক, সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা-অবসানে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাঙ্গলার কুটিরে কুটিরে, বাঙ্গলার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসি, তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ি, তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কি কেহ না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও।'

স্বামীজী বলেছেন—'ত্যাগ ও সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ'। তদানীন্তন ভারতীয় যুবশক্তি স্বামীজীর ঐ বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কতটা ঐশীশক্তিতে ভরপুর হয়েছিলেন—তা তাদের কর্মে ও কথায় বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দের উপাস্য ছিল সর্বাত্মক ব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম সবকিছুতে ওতপ্রোত। তার মধ্যে বিশেষরূপে উপাস্য ছিল—পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্ব জাতির দরিদ্রনারায়ণ। স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে তিনি নরের মধ্যে নারায়ণ দেখতে সচেষ্ট ছিলেন। নরের মধ্যে যাতে নারায়ণের উদ্বোধন হয়—সেই বাণী প্রচারের জন্য তিনি 'নারায়ণ' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। অধুনা তা লুপ্ত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৫ সালের ৺বিজয়া দশমীর পরদিন হিমালয়ের অন্তর্গত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে উপস্থিত হন। মায়াবতী আশ্রমের দিনলিপিতে লেখা রয়েছে :

18th October 1915, Monday

Day clear. Snow visible. Mr. C. R. Das with his party reached here at about 2-30 p. m. this day. The

party consisting of Mr. Das, Mrs. Das, two daughters, one son, one clerk, one brother-in-law, one friend and the servants. They were given their accommodation at the Bungalow (Mother Sevier's Bungalow). Gonen moharaj also came with them.

দেশবন্ধু সপরিবারে মায়াবতীতে খুব আনন্দেই ছিলেন। ডায়রীতে অনেক সব টুকরা টুকরা খবর আছে। আশ্রম থেকে সুদূরে অবস্থিত এক পাহাড়ী গ্রাম থেকে তাঁদের দুধের ব্যবস্থা করা হয়। পাহাড়ী চাকরেরা শিকার করে এনে তাঁদের দিত। কারণ এই পাণ্ডববর্জিত জনমানবশূন্য কুমায়ুন পর্বতমালার জঙ্গলের মধ্যে রান্নার জিনিসপত্র মেলান তখনকার দিনে খুবই মুস্কিল ছিল।

১৯১৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর ছিল বৃহস্পতিবার। তারপর দিন ছিল দেশবন্ধুর জন্মদিন। দেশবন্ধু গরীব পাহাড়ী চাকরদের কম্বল দান করবেন বলে ১০০৲ টাকা দেন। এগুলি ছিল তাঁর জন্মদিনের উপহার।

5th Nov. Friday

This was the birth-day of Mr. C. R. Das. The three volumes of Swamiji's life were presented by the Ashrama with some vases of flower. The gardener got Re 1 from Mr. Das Chinta and Kuma (servants) who carried the presents got 8 as. each, Most of us with the Das party went to Dharamgar at noon and had our tea there.

দেশবন্ধু যখন মায়াবতী আসেন তখন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি 'Buddhism' সম্বন্ধে একদিন তাঁর বাংলোতে আলোচনা করেন (২৭'১০।১৯১৫)।

8th Nov. Monday

Day clear. Snow visible. Mr. Das with the family members was given a parting dinner in the Ashrama. They left Mayavati this day at about 3 p. m. Brahmachari Atmachaitanya went upto the Champavat with them. Udya Singh will go upto Sukindung. Mr. Das gives Rs. 500/- to the Ashrama.

তিন সপ্তাহের অধিক তাঁরা মায়াবতীর এই মনোরম পরিবেশে কাটান। আশ্রমের ডায়রীতে (৭।১১।১৯১৫) আর একটা মজার ঘটনা আছে। মিসেস দাশ বলেন যে, তিনি রাতে যখন শুতে যান তখন একটা বাতি জেলে রাখেন। আর ঐ বাতিটার সারারাত জলবার কথা। কিন্তু কি আশ্চর্য, রাত ৩টার সময় সেটা আস্তে আস্তে নিভে যায়—অথচ নিভবার কোন কারণ থাকে না। তাঁর ধারণা নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য ব্যক্তি এসে নিভিয়ে দিয়ে যায় এবং ইনি নিশ্চয়ই কাপ্তেন সেভিয়ার[১] হবেন।

যাহোক, মিশনের সঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বেলুড় মঠে রাত কাটাতেন। ১৯২৫ সালে তার শরীর গেলে, উদ্বোধন পত্রিকায় (২৭ বর্ষ—৭ম সংখ্যা : শ্রাবণ ১৩৩২) শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি

১ কাপ্তেন সেভিয়ার—স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ শিষ্য। ইনি স্বামীজীর নির্দেশে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম গড়ে তোলেন। মায়াবতীতে তাঁর মৃত্যু হয় ২৮শে অক্টোবর, ১৯০০।

প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর স্মৃতিলিপি থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

'তাৎকালিক জাগ্রত যুবক-শক্তির অধিকাংশই বিবেকানন্দের সেবাধর্মের পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আমরা চিত্তরঞ্জনকেও দেখিয়াছি। এবং এইখানেই সেই সরল উদার আত্মভোলা প্রেমিক পুরুষটির সহিত আমরা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেকালে তাঁহাকে প্রায়ই বেলুড় মঠে আমরা দেখিয়াছি। অনেকদিন তিনি মঠে রাত্রিযাপনও করিতেন। উৎসবের দিন, সর্বসাধারণ দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে বসিয়া প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং ভাবানন্দে গদগদ হইয়া বলিতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমার জাতির সহিত প্রাণের যোগসূত্র অনুভব করিয়া ধন্য হইলাম!"

এস্থলে এক রাত্রির একটা ঘটনা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির পূর্বদিন অপরাহ্নে আমরা মঠে আসিয়া দেখি, চিত্তরঞ্জন বসিয়া পূজনীয় স্বামী প্রেমানন্দজী ও প্রজ্ঞানন্দজীর সহিত আলাপ করিতেছেন। রাত্রে তিনি মঠে থাকিবেন। মঠের সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি বাড়ীতে তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেম ও স্নেহের মূর্তবিগ্রহ বাবুরাম মহারাজ এই অতিথির যত্ন ও সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মঠে কোন অতিথি আসিলে, তা তিনি যেই হউন—বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যস্ত হইতেন। তিনি বলিলেন—"অত বড় বিলাসী সাহেব; এই গরমে কেমন করিয়া ঘুমাইবে!" চিত্তরঞ্জন তাঁহাকে ব্যস্ত হইবার জন্য যতই নিষেধ করুন না কেন, বাবুরাম মহারাজের মায়ের মত স্বাভাবিক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা যেন কিছুতেই দূর হয় না। তিনি রাত্রে বাতাস করিতে এবং চিত্তরঞ্জনের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে জনৈক সেবককে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন! চিত্তরঞ্জন শুইয়া আছেন; সেই ব্যক্তি তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। চিত্তরঞ্জন নিষেধ করিলেও, সে বাবুরাম মহারাজের আদেশের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি আর কিছু বলিলেন না। তখন রাত্রি ১২টা। তাঁহার নিদ্রা আসে নাই। তিনি সহসা তাহাকে শয্যাপ্রান্তে বসিতে বলিলেন, সে সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে বসিল। চিত্তরঞ্জন স্নেহভরে তাহাকে বাড়ীঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আকর্ষণের কথা বলিলেন। প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের এমন সহজ সরল আলাপে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন সময়ে তিনি স্নেহভরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, তুমি কাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাস?"

প্রশ্ন শুনিয়া সে লজ্জায় মাথা নোয়াইল।

চিত্তরঞ্জন আদর করিয়া বলিলেন,
কি, তুমি বল, তারপর আমিও বলিব।"

সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া জনৈক বন্ধুর নাম করিল।

চিত্তরঞ্জন হাসিয়া উঠিলেন। সে লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। তখন চিত্তরঞ্জন প্রগাঢ় স্নেহে বলিলেন, "আমাকে যদি তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, তবে আমি বলিতাম, আমার বাঙ্গলাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি। এই বাঙ্গলাদেশকে ভালবাস। ইতিহাস পড়—

বাঙ্গলাকে জানবার চেষ্টা কর। যেখানে থাক, আর যাই কর—এই বাঙ্গলাকে ভালবাসিও।"

সব কথা ভাল মনে নাই। কিন্তু সেই আবেগময়ী কণ্ঠস্বর, সেই বঙ্গমাতার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের অপূর্ব বাণীর ঝঙ্কার এখনও কানে লাগিয়া আছে। সেই স্বল্প পরিচয়ের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব মহান হৃদয়ের পরিচয়ের সৌভাগ্যে আমরা ধন্য হইয়াছিলাম।'

দেশবন্ধুর 'বাংলা' শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র মাতৃভূমি। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ছিল তাঁর জীবনপণ। কারাগারে অনভ্যস্ত জীবন, দেশবাসীর জন্য দারিদ্র্য-বরণ, নানাবিধ অত্যাচার প্রভৃতি তাঁর শরীরের উপর ক্রমাগত আঘাত হানছিল।

তিনি ছিলেন তদানীন্তন কালে বাংলা সমাজে একজন অভিভাবকের মত। সুভাষ-চন্দ্র বসুর 'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থের প্রারম্ভে দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে সেই মর্মস্পর্শী চিঠিগুলি পড়লে মনে হয়—সে সময়কার তরুণ-সমাজ তাঁর কাছে চাইছিল একটা নির্দেশ যার দ্বারা মাতৃভূমির মুক্তি হয়। বহু প্রতিভাবান ছাত্র 'গোলামখানা' (বিশ্ববিদ্যালয়) ত্যাগ করেন—তাঁরই কথায়।

তাঁর মানবতার একটা কাহিনী :৯২৬ সালের আগস্ট মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারতে' ছাপা হয়। কাহিনীটা অপূর্ব। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে। একজন দাগী আসামী ও ডাকাত—যাকে পরিবর্তিত করা ছিল অসম্ভব *ব্যাপার—দেশবন্ধুর ভালবাসায় তার সেই* দুর্বৃত্ত হৃদয় নরম হয়ে যায়। তাঁর হাজত-জীবন শেষ হওয়া মাত্র তিনি তাকে বাড়ী নিয়ে যান এবং নিজের কাজে লাগান। লোকটি হয়ে ওঠে খুব বিশ্বাসী সে দেশ-বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ তিন বছর দেশের নানা জায়গায় ঘোরে। তার চরিত্রটি ছিল Victor Hugo-র Jean Valjean-এর মত। দেশবন্ধু দার্জিলিং-এ বিশ্রামের জন্য যখন যান, সে তখন কলকাতার বাড়ীতে থাকে। কিন্তু পুরণো স্বভাবের আবার পুনরাবৃত্তি হল। লোকটি দেশবন্ধুর বাড়ীর রূপার বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে পালাল। কিন্তু এ কথা ঠিক যে দেশবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তবে ঐ লোকটি নিশ্চয়ই ফিরে আসত এবং ক্ষমা চেয়ে সেই মহান পুরুষের হৃদয়ের কোণে আবার স্থান করে নিত। পুনরাবৃত্তি হত সেই একই ঘটনার—যেমনটি ঘটেছিল Jean Valjean এর জীবনে। দুষ্কৃতকারী পেত ক্ষমা, প্রেমের দ্বারা হত বশীভূত, আর মহান হৃদয়ের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তন হত একটা কলুষকালিমায় ভরা জীবনের।

আজকাল বহু দেশনেতা দেখছি আমরা, কিন্তু 'দেশবন্ধু' কোথায়?

পরলোকে ভারতরত্ন ডক্টর সি. ভি. রামন

*সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ও 'নোবেল'-পুরস্কার-*বিজয়ী ডক্টর সি ভি. রামন (চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন) গত ২১শে নভেম্বর, ১৯৭০ সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের সময় বাঙ্গালোরে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। গত ৭ই নভেম্বর তাঁহার ৮৩-তম জন্মদিনের আগে তিনি হৃদ্‌রোগে গুরুতর-ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর তিনি ত্রিচিন-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন; শিক্ষালাভ করেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে।

সি. ভি. রামনের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল স্বভাবজাত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রামন তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 'রামন এফেক্ট'-এর জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণকালে ভূমধ্য-সাগরের উপর দিয়া যাইবার সময় সমুদ্রের জল এত নীল দেখায় কেন—এই প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে। ঐ বৎসরই কলিকাতায় ফিরিয়া ইহা লইয়া তিনি গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহাতে সাফল্যলাভ করেন। তিনি দেখিলেন কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের উপর কোন একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক (যেমন 'মারকারী ল্যাম্পে'র আলো) ফেলিলে উহার মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি যখন চলিয়া যায়, তখন পদার্থের অণুগুলি ঐ আলোকের কিছু অংশ বিচ্ছুরিত করিয়া পাশে ছড়াইয়া দেয়। এই বিচ্ছুরিত আলোকের বর্ণালী (spectrum) বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখিলেন, উহার মধ্যে মূল আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছাড়া আরো কতকগুলি নূতন, বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (সাধারণতঃ দীর্ঘতর তরঙ্গ-বিশিষ্ট) আলোকও উহাতে রহিয়াছে। বায়বীয় বা তরল পদার্থের ভিতর দিয়া গমন-কালে উহার মধ্যস্থ ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অণুগুলির সহিত আঘাত লাগার ফলে ঐ আলোকের কিয়দংশের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমিয়া বা বাড়িয়া যায়, যাহার ফলে এরূপ ঘটে। ইহার নাম 'রামন এফেক্ট' এবং এভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণের নাম 'রামন স্পেক্‌ট্রস্কোপি'। বিভিন্ন পদার্থে এই 'এফেক্ট' বিভিন্ন রূপ হয় বলিয়া ইহা দ্বারা পদার্থটির আণবিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। এই আবিষ্কার তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পাইবার পর তাঁহার নাম সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশু-তোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিভা বহু পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্যার আশুতোষের আগ্রহেই তিনি প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপকরূপে যুক্ত থাকেন (১৯১৭-১৯৩৩)। ইহার পর তাঁহার নানা কীর্তি, সমগ্র বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স-এ তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাদামী প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে তিনি বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর গান্ধীজীর জন্মদিনে তিনি একটি নূতন গবেষণার কথা বিজ্ঞান-জগতে

জানাইতেন। তিনি বলিতেন, 'বিজ্ঞানই আমার ধর্ম এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধর্মকেই আমি অনুসরণ করিয়া চলিব।'

১৯২২ খৃষ্টাব্দে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্‌. সি. উপাধি প্রাপ্ত হন; লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির 'ফেলো' হন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার অপটিক্যাল সোসাইটির সদস্য হন, ১৯৪২-এ আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন মেডেল লাভ করেন, ১৯৪৭-এ সোভিয়েট অ্যাকাদামীর সদস্য হন এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক লেলিন পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাদামীরও তিনি সদস্য হইয়াছিলেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপকের পদও অলঙ্কৃত করেন।

পরিণত বয়সেই এই আদর্শবাদী জ্ঞান-তপস্বীর দেহত্যাগ হইয়াছে; তবু তাঁহার তিরোধানে বিজ্ঞান-জগতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানসাধক চিরকাল অমর হইয়া থাকিবেন। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অতন্দ্র বিজ্ঞান-সাধনা বিজ্ঞানীদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করিবে।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পরলোকে কবিরঞ্জন কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাংলার সর্বজনপরিচিত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া গত ১৪ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। এই দিন কলিকাতার কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বহু সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ বর্ধমান জেলার কোগ্রামে কুমুদরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলাসাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পাশ করিবার পর তিনি কোগ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী মাথরুন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে ব্রতী হইয়া পরে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন; এখানে তিনি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাদান করিয়াছেন।

জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্তই কুমুদরঞ্জন কবিতাঞ্জলি প্রদানে সরস্বতীদেবীর পূজা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা বাংলার আবাল-বৃদ্ধবনিতার প্রাণস্পর্শ করিয়াছে। 'শতদল', 'স্বর্ণসিন্দুর', 'বীথি', 'অজয়' প্রভৃতি প্রায় বিশখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন।

সুদীর্ঘকাল হইতে তাঁহার লেখায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা সমৃদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহার সহজ, সরল, অমায়িক ব্যবহার তাঁহার উন্নত হৃদয়ের পরিচয়ই বহন করিত। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

সমালোচনা

শ্রীনিম্বার্কাচার্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। ব্রজবিদেহী মহন্ত ও চতুঃ-সম্প্রদায়ের শ্রীমহন্ত শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়-দাসজী কাঠিয়াবাবা প্রণীত। কাঠিয়াবাবার আশ্রম, পোঃ সুখচর, জেলা ২৪ পরগনা। তিন ভাগের পৃষ্ঠা ও মূল্য যথাক্রমে ৩৭০, ৩৫৭, ৩৫৯ ও ৮'০০, ৭'৫০, ৭'৫০।

ভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে নিম্বার্ক-দর্শনের জ্ঞানও অপরিহার্য। আচার্য শ্রীনিম্বার্কের নামেই এই দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবনী সুবিস্তৃতভাবে উপন্যস্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যকালের কাহিনীগুলি দিব্যভাবে পূর্ণ। তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন, সুকঠোর তপশ্চর্যা, ধর্মপ্রচার সমস্তই জগৎকল্যাণের জন্য সাধিত হইয়াছিল। আচার্য নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের সংস্কৃত ভাষায় যে ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভঃ'। এই ভাষ্য সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, সুবোধ্য ও পূর্বাপর-সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'বেদান্ত-কামধেনুঃ' নামকরণ করিয়া দশটি সংস্কৃত শ্লোকে আচার্য কর্তৃক স্বীয় দার্শনিক মতবাদ বিবৃত। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম ভাগে সানুবাদ 'বেদান্তপারিজাতসৌরভঃ' ও 'বেদান্তকামধেনুঃ' উপস্থাপিত হওয়ায় গ্রন্থ-খানির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবনী-অংশে নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে গবেষণা আছে, তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আচার্য নিম্বার্ক-রচিত গ্রন্থসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ম জীব জগৎ মোক্ষ ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে যুক্তিভিত্তিক বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়; ইহাতে আচার্যের জীবন ও বাণীর একটি সামগ্রিক পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে বেদান্তের অন্যান্য মতবাদের আলোচনা সহ নিম্বার্ক-মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা আছে।

শ্রীনিম্বার্কের জীবনী ও তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে জানিতে হইলে এই গ্রন্থ বিশেষভাবে কাজে লাগিবে এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেরই নিকট ইহা আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (প্রথম খণ্ড) ব্রজলীলা—জিজ্ঞাসু। প্রকাশক: শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি, শ্রেয়োজিজ্ঞাসা প্রকাশনী, কুমারপুর, কাঁথি, মেদিনীপুর। পৃষ্ঠা ৩৯৮+১২; মূল্য পাঁচ টাকা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুঘটনাসমন্বিত লোকোত্তর জীবন অনুধ্যানের সময় সাধকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে, যেগুলির সুষ্ঠু সমাধান দুঃসাধ্য; আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই রকমের কতকগুলি দুরূহ প্রশ্নের সহজ-সরলভাবে উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। 'বর্তমান রুচি-বিকারের দিনে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আদৌ পাঠক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিনা—সে-সন্দেহ

অন্তরে পোষণ করা সত্ত্বেও আমরা এই প্রসূনটি পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিচ্ছি—এই ভরসায় যে, বিরাটপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হবে।'—প্রকাশকের একথা সমর্থনযোগ্য; গ্রন্থের অনেক স্থলে এবং বিশেষভাবে গ্রন্থশেষে দুই বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমে তাহার পরিচয় বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইতে ব্রজলীলা পর্যন্ত তাঁহার মহাজীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা এই গ্রন্থে উপস্থাপিত। 'শ্রীকৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা' নামকরণটি সার্থক, কারণ এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থখানির উপাদান-সংগ্রহ, সম্পাদনা ও রচনা। ব্রজলীলাপাঠের পর শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পরবর্তী লীলাগুলি অনুধ্যানের জন্য পাঠকগণের যে ঔৎসুক্য জাগিবে, গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে তাহা পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন, আশা করি।

শ্রীচৈতন্যলীলাপ্রসঙ্গে—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীতমাল গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে রথীন্দ্র গীতা-প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ৩১। পৃষ্ঠা ৭৫; মূল্য এক টাকা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালীর জীবনে সর্বত্র। বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতি মহাপ্রভুর প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অপূর্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুধী গ্রন্থকার দীর্ঘ কাল ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অনুধ্যান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছেন তাহা প্রবন্ধের মাধ্যমে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই নিবন্ধগুলিরই গ্রন্থ-রূপ। 'পুরুষসিংহ শ্রীচৈতন্যদেব', 'নিমাইসন্ন্যাস', 'মহাপ্রভুর দক্ষিণাপথ পরিক্রমা', 'কঠোর সন্ন্যাস-জীবন', 'শ্রীচৈতন্য-জীবনের অন্তিম অধ্যায়', 'কলিযুগের নবগায়ত্রী', 'মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ' ও 'মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক'—এই সকল পরিচ্ছেদে লেখকের গভীর মনন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় রহিয়াছে। ক্ষুদ্র হইলেও শ্রীচৈতন্যলীলা-প্রসঙ্গে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হিসাবে এই গ্রন্থের সমাদর হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। প্রেমধর্মপ্রসঙ্গে তথাকথিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে গ্রন্থখানি সকলেরই পঠনযোগ্য।

মায়ের গান—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: ডি. মেহ্‌রা, রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৬০; মূল্য তিন টাকা।

গান প্রাণের জিনিস। গানের উৎস, আবেদন, অনুভূতি—সবই প্রাণে। সুধী লেখকের মায়ের গানগুলি অন্তর স্পর্শ করে। আলোচ্য পুস্তকে ৬০ খানি গানের সমাবেশ। প্রত্যেকটি গানে কিছু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য আছে; ভাব ভাষা অতি সহজ সরল, যেন স্বতঃস্ফূর্ত। কয়েকটি গানের আংশিক উদ্ধৃতি:

'দয়াময়ী নাম যে মা তোর
ভুলবি আমায় কেমন করে?
আমি পথ চলি, মা, এই কথাটি
শক্ত করে মনে ধরে।' (৪৭)

'(আমি) জানতে চাই না, বুঝতে চাই না,
চাই শুধু তোর চরণ ছুঁতে,
বিদ্যে চাই না, বুদ্ধি চাই না,
সাধ যায় মা, ঐ কোলে শুতে।' (৫৩)

সুর তাল লয়ে গীত হইলে গানগুলি অন্তর স্পর্শ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কাগজ মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেণ্টলুই বেদান্ত সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ১৯৬৯—মার্চ, ১৯৭০) সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎ-প্রকাশানন্দ।

(১) সাপ্তাহিক প্রার্থনা ও ধর্মালোচনা সভা: রবিবার সকালে ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে কেন্দ্রাধ্যক্ষের পরিচালনায় নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রবিবার প্রাতে তিনি ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এবং প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধ্যানের ক্লাসের পর ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন। বিশেষ বিশেষ দিনে বক্তৃতাদির পর ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সর্বসাধারণের জন্য এইসভাগুলিতে সোসাইটির সভ্য ও বন্ধুবর্গ ব্যতীত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন —যথা লিন্‌ডেনউড কলেজ, সেণ্ট্রাল চার্চ অফ ক্রাইস্ট, মার্কটোয়েন হাই স্কুল, ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়েন চার্চ, ফার্স্ট কনগ্রিগেশন্যাল চার্চ, ওয়াশিংটন ইউনিভারসিটি, সেণ্ট লুই ইউনিভারসিটি প্রভৃতি হইতে বিদ্বজ্জন ও ছাত্রগণের সমাবেশ হইয়াছিল। ছাত্রেরা সাধারণত: শিক্ষকগণের সহিত আসিয়াছিলেন। এই সকল সভায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিন বেলা ১১ হইতে ১২ টা ধ্যান ও নীরব প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মাবকাশের সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের 'টেপরেকর্ড করা' বক্তৃতা শোনানো হয়।

(২) 'কথামৃত' ক্লাস: প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় The Gospel of Sri Ramakrishna (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত) আলোচিত হইয়াছিল। এই সময় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নিকট শ্রুত ঘটনাবলী প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত করেন এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৩) উৎসব: আলোচ্য বর্ষে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, আচার্য শঙ্কর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি পূজা উপাসনা ও আলোচনাদির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। গুডফ্রাইডে ও খ্রীষ্টজন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজার সময় পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) সন্ন্যাসী পরিদর্শকবৃন্দ: আলোচ্য বর্ষে স্বামী অসক্তানন্দ ও স্বামী সর্বগতানন্দ সেণ্ট লুই বেদান্ত সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৫) অতিরিক্ত সভা: স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ডি অ্যানড্রিস্ হাই স্কুলে আমন্ত্রিত হইয়া 'হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। কার্কউড চার্চের মেম্বারদের জন্য সোসাইটিতে একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়।

(৬) কেন্দ্রাধ্যক্ষের ভ্রমণ: (ক) আলোচ্য বর্ষে জুলাই মাসে চিকাগোয় বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে মিচিগান 'গঙ্গা' নগরে বিবেকানন্দ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করেন স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আর একবার চিকাগো বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গমন করেন। (খ) নভেম্বর মাসে

তিনি ক্যানসাস শহরে যান এবং ক্যানসাস বেদান্ত সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত সভায় 'মানবজীবনের সুনিশ্চিত ভিত্তি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। (গ) ডিসেম্বর মাসে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কো গিয়াছিলেন। বার্কলে কেন্দ্রে তিনি 'স্বামী প্রেমানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

(৭) অন্যান্য সংবাদ: আলোচ্য বর্ষে সেণ্ট লুই কেন্দ্রে ১৮০ জন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ধর্মবিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হন।

আমেরিকার বিভিন্ন স্থান এবং ভারতবর্ষ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সোসাইটি পরিদর্শনে আগমন করেন।

সোসাইটির সদস্যগণ গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

ভিত্তিস্থাপন

গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এলাহাবাদ কেন্দ্রে নূতন ডিস্পেন্সারীর ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

স্বামী গিরিশানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে নিবেদন করিতেছি, গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০ সন্ধ্যা ৭টার সময় স্বামী গিরিশানন্দ (প্রকাশ মহারাজ) পরিণত বয়সে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য ব্যাধিতে অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার দেহ বারাণসীর পবিত্র গঙ্গায় সলিল-সমাধি দেওয়া হয়।

স্বামী গিরিশানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হইয়াছিল। কিছুকাল তিনি মাদ্রাজ মঠে এবং অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে নিরত থাকেন, তারপর বারাণসী, হৃষীকেশ, উত্তরকাশী ও অন্যান্য স্থানে জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

তিনি ছিলেন ধ্যানপরায়ণ মধুরস্বভাব ও কঠোরী সন্ন্যাসী। এই তপস্বী সন্ন্যাসী সর্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

পরলোকে স্বামী অচিন্ত্যানন্দ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৩ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় স্বামী অচিন্ত্যানন্দ (মনু মহারাজ) নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬৮ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বেলুড় মঠেই তাঁহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে তিনি মন্ত্র-দীক্ষা ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ, ঢাকা, দিল্লী (১৯২৮-১৯৩২), লাহোর, কনখল (১৯৩৮-১৯৪১) প্রভৃতি স্থানে কর্মরত থাকার পর পাটনা (১৯৪ -১৯৪৮) এবং দিনাজপুর আশ্রমের (১৯৫২-১৯৫৪) অধ্যক্ষরূপে তিনি সঙ্ঘের সেবা করেন। দিল্লী আশ্রম বর্তমান নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে; দিল্লীতে থাকাকালীন আশ্রমের এই জমি সংগ্রহের কাজে তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। জীবনের পরবর্তীকাল প্রধানতঃ তিনি বেলুড় মঠেই অতিবাহিত করিয়াছেন। অধ্যয়ন ও সংস্কৃতিমূলক কাজে তিনি আজীবন অনুরাগী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

চন্দ্রশকট 'লুনাখোদ-১

রাশিয়া মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে নূতন বিস্ময় সংযোগ করিয়াছিল মানুষহীন মহাকাশযান লুনা-১৬কে চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরভাবে নামাইয়া তাহার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের নিম্নভাগ হইতে মাটি খুঁড়িয়া সংগ্রহ করিবার পর ঐ মাটি সহ তাহাকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিয়া (সেপ্টেম্বর ১২-২০)। আবার সে নূতন রেকর্ড করিল বেতার-পরিচালিত চন্দ্র-শকট লুনাখোদ-১কে চাঁদের উপর চালাইয়া।

গত ১০ই নভেম্বর রাশিয়ার মনুষ্যহীন মহাকাশযান লুনা-১৭ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং চাঁদের কাছে পৌঁছিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫১ মাইল দূরে থাকিয়া ১১৬ মিনিটে একবার করিয়া চাঁদকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে; পরে ১৭ই নভেম্বর সকাল ৯টা ১৭ মিনিটের সময় (ভারতীয় সময়) চন্দ্রপৃষ্ঠে বর্ষণ-সাগরে (sea of rains) ধীরভাবে অবতরণ করে। ঘণ্টা আড়াই পরে লুনা-১৭-এর ভিতর হইতে আটটি চাকা লাগানো শকট লুনাখোদ-১ বাহিরে আসিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে চলিতে শুরু করে। এই সময় সে তার চারিদিকের ছবি তুলিয়া টেলিভিশনে পৃথিবীতে পাঠায়। লুনা-১৭র ছবিও তুলিয়াছিল। ঐ ছবি দেখিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠের অবস্থা ও সেখানে লুনাখোদের অবস্থান বুঝিয়া পৃথিবী হইতে সুগম পথে শকটিকে পরিচালিত করা হয়। বর্ষণ-সাগরের এই অংশটি প্রায় সমতল হইলেও সেখানে বন্ধুরতাও বেশ আছে; লুনাখোদকে যে সব উচ্চ নীচ স্থানের উপর দিয়া চলিতে হইয়াছে তাহার সর্বোচ্চ ঢাল অবশ্য দশ ডিগ্রীর বেশী নয়।

১৭ই হইতে ২২শে নভেম্বর পর্যন্ত লুনাখোদ প্রতিদিনই চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে। এই কালে সে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপন করিয়াছে; চাঁদের মাটি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, যেখানেই গিয়াছে তাহার চারিপাশের ছবি তুলিয়াছে, আরো বহুবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছে এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে। শকটটিতে একটি প্রতিফলক-যন্ত্রও লাগানো আছে,—পৃথিবী হইতে পাঠানো লেসার রশ্মিকে প্রতিফলিত করিয়া ফেরত পাঠাইবার জন্য। শকটটিকে পৃথিবী হইতে বেতার-তরঙ্গ-সাহায্যে পরিচালিত করা হইলেও উহার শক্তির উৎস সূর্য-কিরণ। চাঁদের যে অংশে লুনাখোদ-১ রহিয়াছে, সেখানে ২৩শে নভেম্বর হইতে চাঁদের রাত্রি শুরু হইয়াছে, ১৪ দিন পরে সেখানে সূর্যোদয়। সূর্য-কিরণের অভাবে এ-কয়দিন লুনাখোদকে অচল হইয়া থাকিতে হয়। এ সময় চাঁদের তাপমাত্রাও নামিয়া যাইবে শূন্যের নীচে প্রায় ২৫০ ডিগ্রী ফারেনহিট। তাই এই প্রচণ্ড শীতের রাত্রি কাটাইবার মতো একটি স্থান বাছিয়া লইয়া গত ২২শে নভেম্বর লুনাখোদকে সেখানে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে এক পক্ষকাল বসিয়া থাকিবার পর আবার সে বেতার সঙ্কেত পাঠাইতে, চলিতে ও কাজ করিতে শুরু করিয়াছে। বৌচাম মহাকাশ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক হিঞ্জ কামিন্স্কি জানাইয়াছেন, সূর্যালোক পাইবার পরই গত ৮ই ডিসেম্বর হইতে লুনাখোদ-১ পুনরায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমেরিকা ও রাশিয়া হইতে পাঠানো যন্ত্রচালিত ও মনুষ্যহীন যানগুলির চন্দ্রপৃষ্ঠে তথ্য সংগ্রহ করিবার পরিধি এতদিন সীমিত ছিল। লুনা-১৭-বাহিত লুনাখোদ-১ সে পরিধি অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। চাঁদের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি চন্দ্রযান না পাঠাইয়া একটিমাত্র চন্দ্রযান পাঠাইয়া তাহা দ্বারা বাহিত যন্ত্রসমন্বিত শকটের সাহায্যে চন্দ্র-পৃষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চল পরীক্ষা করিবার সম্ভাবনার দ্বার ইহাতে উন্মুক্ত হইল। এক্ষেত্রে শক্তির উৎস সূর্যকিরণ হওয়ায় শক্তির ভাণ্ডার অফুরন্ত; শকটটি মনুষ্যহীন হওয়ায় যতদিন না উহার যন্ত্রপাতি বিকল হয় ততদিন পর্যন্ত উহাকে চাঁদে রাখিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরাইবার পক্ষে তাড়াহুড়া করিবারও কোন প্রশ্ন নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থের জাতীয় পুরস্কারলাভ

উত্তর কলিকাতার ৫৬/৪ গে স্ট্রীট স্থিত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থকে উপরাষ্ট্রপতি জি. এস্. পাঠক গত ১৭ই নভেম্বর ১৯৭০ অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, শিক্ষাব্রতে একনিষ্ঠতা এবং রচনাশৈলী— কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ এই টোলে ৭০ বৎসর অধ্যাপনা করিতেছেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় ৯৫ বৎসর। ইনি বাল্য-কালে (৮।৯ বৎসর বয়সে) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন ও তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি প্রায় পাঁচ হাজার সংস্কৃত শ্লোক এবং তৎসহ বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সমন্বিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাগবতম্' রচনা করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার বগড়ী কৃষ্ণনগর খুনীবেড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামচন্দ্র শিরোমণির বংশে তাঁহার জন্ম।

সুশীলাবালা বসুর লোকান্তর

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসিদ্ধ গৃহস্থ ভক্ত পরমধার্মিক বলরাম বসু মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলাবালা বসু গত ৭ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৭৭ (২৩শে নভেম্বর, ১৯৭০) সোমবার বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে অবস্থিত বলরাম-মন্দিরে ৮৪ বৎসর বয়সে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও পরম-ভক্তিমতী। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ছাড়া তাঁহার বিশেষ কোন অসুখ ছিল না। দেহত্যাগের দিন তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসত্যাগ হয়। বেলুড় মঠ ও বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয় হইতে সাধুগণ তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া বলরাম মন্দিরে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী পুষ্প ও মালা প্রদান করা হইয়াছিল।

১২৯৩ সনের ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখেই ৮৪ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সুশীলাবালা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ১৩০৩ সনের ২৭শে বৈশাখ ১০ বৎসর বয়সে বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী তাঁহাকে কোলে বসাইয়া কিছু উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা মাতৃচরণে চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'২০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

বাণীসঞ্চয়ন—১ম সংস্করণ। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্বাচিত উপদেশাবলী। স্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। পৃষ্ঠা ৩১২; মূল্য ৩'২৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

ভারতীয় নারী—১০ম সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান্ আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজীর মনোরম ছবি-সংবলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৩৫।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুইভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲ ২য় ভাগ ৮৲
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে „ ৯৲ „ ৭·২০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে:

মূল্য—		উঃ গ্রাঃ পক্ষে
১ম ভাগ	২·০০	১·৮০
২য় „	৩·৭৫	৩·৪০
৩য় „	৩·০০	২·৭০
৪র্থ „	৩·০০	২·৭০
৫ম „	৩·৫০	৩·১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— ৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১১৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ১০৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্র-নাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১·৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্র-দয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের জীবনী। মূল্য—০·৬০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত — ২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪·০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ— ১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়-কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২·০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—১·৭৫।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য ৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নিবেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২·০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১৲।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫·৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরা-নন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড ৮৲, ২য় ও ৩য় খণ্ড ৭৲ করিয়া। একত্র লইলে ২১৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২০৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথ-নাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩·৬০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ৮·৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্র-দয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—০·৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য—৭৲

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত প্রায় পাঁচ শত সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান:—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১'২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

রামানুজ-চরিত—স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রণীত। যে-সকল মহাপুরুষের চরিত্র-প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, আচার্য রামানুজ তাঁহাদের অন্যতম। সুললিত সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ০'৭৫।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০'৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩'০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২'৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫'৫০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—২'৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় ক্ষোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২'৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২'০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪'০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩'৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫'৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১'[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বেলুড়ের ট্রাষ্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক-- স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

Udbodhan—Phone : 55-2447 ; December, 1970 Regd. No. C. 33

বার্ষিক মূল্য ৭·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ৭০ পয়সা